পবিত্র ত্রিপিটক

(চতুর্দশ খণ্ড)

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (চতুর্দশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

চতুর্দশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**]

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু | ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু | শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু | শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (চতুর্দশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড**]

অনুবাদক : শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-14
(Khuddak Nikaye Jatak - 1st & 2nd part)
Translated by Sree Ishan Chandra Ghosh
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3076-2

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পাচিত্তিয়’ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের ‘পারাজিকা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড’ এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের ‘পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড’ বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের ‘অঙ্গুত্তরনিকায়’ (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে ‘সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ’ গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অর্থাৎ, গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত
ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

প্রথম খণ্ড

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

সূচিপত্র

এক নিপাত

ভূমিকা

১৮৫৮ সালের মে মাসে যশোহর জেলার এক অখ্যাত কোণে খরসূতি গ্রামে ঈশানচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। খরসূতি একেবারেই পাড়াগাঁ, কারণ ঈশানচন্দ্রের জীবদ্দশায় সেখানে কোনো ডাকঘর পর্যন্ত হয় নাই। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনীর যে খুব মোটামুটি বর্ষপঞ্জি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার অন্তত পাঁচ ছয় ঊর্ধ্বতন পুরুষ এই গ্রামেই বসবাস করেন। ঈশানচন্দ্রের পিতার নাম ছিল চন্দ্রকিশোর ঘোষ, মাতা শ্রীকণ্ঠ মজুমদারের কন্যা কালীতারা। ইহাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে; কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয় পিতার মৃত্যুর মাস দুই পরে। পুত্রদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। তাঁহার নয় বছর আট মাস বয়সে একই দিনে পিতা চন্দ্রকিশোর ও প্রথম ভগিনীর মৃত্যু হয় এবং তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি খুল্লতাতকেও হারান। চার বছর পরে কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাহার এক বছর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ঈশানচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দুইটি প্রবল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—একটি নিদারুণ দারিদ্র্য আর একটি স্বয়ং যমরাজ। বুদ্ধি, মেধা, সততা ও একনিষ্ঠতার দ্বারা তিনি দারিদ্র্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ জীবনের আঙিনায় মৃত্যুর আনাগোনা কমে নাই, এমন কি তাঁহার নিজের অন্তর্ধানের পরও সর্বব্যাপী অভিশাপের মত অকালমৃত্যু এই পরিবারকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অসীম নৈতিক বল, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় সততা ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অভিনিবেশ। সেইজন্য কঠোর দারিদ্র্য বা প্রতিকূল পরিবেশ তাঁহার বুদ্ধি, অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুর মধ্য হইতে তিনি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করিয়া নতুন পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে শুনিয়াছি চন্দ্রকিশোর ঘোষ সামান্য বেতনে কোনো গ্রাম্য জোতদার ও ব্যবসায়ীর গোমস্তা বা কেরানীর কাজ করিতেন বা 'খাতা লিখিতেন'। তাঁহার অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না; ১৮৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর স্ত্রী কালীতারা দুই পুত্র ও এক কন্যা লইয়া কঠিন দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। ১৮৭১ সালে তিন বৎসরের কন্যা এবং পর বৎসর দশ বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্রকে হারান। এই সময় কালীতারার সংসার অতিশয় কষ্টে চলিত। পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয় এবং তিনি এক গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হন। অনশন-অর্ধানশনে থাকিয়া বাড়ি হইতে বেশ

খানিকটা দূরে হাঁটিয়া এই বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। তিনি অতিশয় মিতাচারী, সংযতচরিত্র ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা তাহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তাঁহার কোনো ব্যসন থাকিতে পারে এই কথা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু তাঁহার একটি অপরিত্যাজ্য নেশা ছিল—প্রায় বিরামহীন ধূমপান। শেষ বয়সে তাঁহার ফুসফুসের ব্যাধি হয় এবং কলিকাতার প্রধান ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু এই সংযমী পুরুষ তাঁহার আবাল্য সঙ্গী হুঁকা-গড়গড়া পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। এই অনুরাগের একটা করুণমধুর ও ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। অধ্যাপক ঘোষের কাছে শুনিয়াছি বালক ঈশানচন্দ্র যখন কোনোদিন অনাহারে থাকিয়া বা আধপেটা খাইয়া পাঠশালার পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন তখন পথিমধ্যে এক মুদীর দোকানে তিনি একটু বিশ্রাম করিতেন এবং মুদী তাঁহাকে এক ছিলিম তামাক খাইতে দিত। পরে ঈশানচন্দ্র যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন সেই মুদীকে তিনি ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দান করেন।

পিতার মৃত্যুর পর অভাব-অনটনের জন্য পড়াশোনার নানা অসুবিধা হয়; এই সময় বছরখানেক ঈশানচন্দ্র ফরিদপুরেও অবস্থান করেন, কিন্তু পড়াশোনার কোনো সুব্যবস্থা করিতে পারেন না। ১৮৭১ সালে তিনি M. V. বা উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন, কিন্তু কোনো বৃত্তি পান না। বলা যাইতে পারে যে, ছাত্রজীবনে প্রথম পরীক্ষায় তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই সময় তাঁহার অর্থকষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় এবং তিনি নিজ গ্রাম হইতে আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী গ্রামের (ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর) স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েন। এখানে তাঁহার বন্ধুলাভও হয় এই কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এই বন্ধু বোধহয় রামচরণ বসু, যাঁহাদের বাড়িতে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই বৎসর পর ১৮৭২ সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতিত্বের ভিত্তিস্বরূপ।

জঙ্গলাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ের বালক ঈশানচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াস ও সাফল্যের পরিমাপ করিতে হইলে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার দরকার। আমাদের দেশে পূর্বে বহু পাঠশালা ছিল যেখানে বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর ক্রমে ইংরেজি ভাষা সরকারি কাজের বাহন হইয়া দাঁড়ায়, মিশনারী সাহেবরা ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচার করিতে চাহেন এবং ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতবাসীও উন্নতির সোপান হিসেবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। এই কারণে প্রাচীন পাঠশালাগুলো জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতে থাকে অথচ ইংরেজ সরকার অর্থব্যয়ের ভয়ে এবং

পাছে দেশিয় সংস্কারে আঘাত দেওয়া হয় সেই জন্য ইংরেজি বিদ্যার প্রচারে খুব বেশি আগ্রহ দেখান না। সরকার জেলায় জেলায় একটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়া, দেশিয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলোকে কিছু সাহায্য দিয়া বা পরিদর্শকের মারফতে সামান্য দেখাশোনার বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করেন। মিশনারীদের চেষ্টাও কলিকাতায় ও কোনো কোনো নির্ধারিত জায়গায় সীমিত ছিল। দেশি লোকের যতটা সাধ ছিল ততটা সাধ্য ছিল না। এই সমস্ত কারণে এবং শিক্ষার প্রচার যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই জন্য অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের অনুমোদনের জন্য কোনো নিয়ম রচনা করে নাই। এই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ই গ্রামেগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়। দেশিয় পাঠশালা হইতে পাঁচ ক্লাসবিশিষ্ট বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের উদ্ভব হয় এবং কিছুকাল পরে তাহার সঙ্গে আর এক ক্লাস যোগ করিয়া একশ্রেণীর স্কুলের সৃষ্টি হয় যাহাকে মাইনর স্কুল বলা হইত। ইহার প্রথম শ্রেণী দশ ক্লাসবিশিষ্ট হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী বা ক্লাস সিক্সের সমান বলিয়া ধরা হইত। এই সব স্কুলের বিশেষ করিয়া গ্রাম্য স্কুলের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, চরম লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরেজির পাঠ্যক্রমের মান উন্নত ছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্যও ইংরেজিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হইত। অথচ ইংরেজি পড়াইবার বিশেষ কোনো আয়োজন ছিল না। গ্রামীণ ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ইংরেজি একটা বাড়তি বিষয় হিসেবে পড়ানো হইত বলিয়া মনে হয়; উচ্চাভিলাষী ছাত্রকে স্বকীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যেই ইংরেজি আয়ত্ত করিতে হইত। পাড়াগাঁয়ের নিঃস্ব বালক ঈশানচন্দ্রের পক্ষে ইহা খুব বেশি করিয়া প্রযোজ্য। তিনি ভাল বাংলা শিখিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ সুগম করিয়া লইলেন। তাহার অপেক্ষাও বড় কৃতিত্বের কথা এই যে প্রধানত নিজের চেষ্টায় গ্রামে বসিয়া ইংরেজি জ্ঞানের ভিত এতটা পাকা করিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি এন্ট্রান্স হইতে এম. এ. পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং কর্মজীবনেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঈশানচন্দ্রের সময়ের তো কথাই নাই, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও স্কুলে পড়া ছেলে এবং দশ-বার বছরের মেয়ের বিবাহের প্রচলন ছিল। বঙ্গেশ্বরদী গ্রামের গঙ্গাধর নাগ মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনি সাধারণত ফরিদপুর শহরে বাস করিতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত সদ্বংশজাত ঈশানচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া ১৮৭৩ সালে ফরিদপুর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে—বর্তমান হিসেবে ক্লাস সেভেনে ভর্তি করিয়া

দেন। ঈশানচন্দ্রের পক্ষেও ইহাকে সৌভাগ্যের প্রথম সোপান মনে করিতে হইবে। কারণ বঙ্গেশ্বরদীর উচ্চ প্রাইমারি বা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তো পঞ্চম শ্রেণীর অধিক পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না এবং অন্যত্র শহরে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। গঙ্গাধর নাগ ও তদীয় স্ত্রী শিবসুন্দরীর তিন সন্তান—শশিমুখী, ক্ষীরোদাসুন্দরী এবং পুত্র অমৃতলাল। ভাবী শ্বশুরের বাড়িতে বছরখানেক থাকার পর ১৮৭৪ সালে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ঈশানচন্দ্র শশিমুখীকে বিবাহ করেন (৮ই ফাল্গুন ১২৮০)।

ইহার পর ঈশানচন্দ্রের পাঠ্যজীবন ও কর্মজীবন অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবার সময় তিনি ক্রমশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকেন এবং ১৮৭৬ সালে সরকারি বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে তখন উচ্চশিক্ষা কেবল আরম্ভ হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ঈশানচন্দ্রের বয়স অপেক্ষা মাত্র এক বৎসর বেশি। যাহাকে আমরা পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা বলিয়া জানি সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তখন অনুমোদিত কলেজ ছিল মাত্র বারটি এবং তাহারও অর্ধেক খাস কলিকাতায়। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঈশানচন্দ্রকে কলিকাতায়ই আসিতে হয়। তিনি ঈশানচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং ১৮৭৮ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে—তখন রেঙ্গুন হইতে লাহোর পর্যন্ত ইহার পরিধি—চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিসহ এফ. এ. পাস করেন। পরে এই পরীক্ষার নাম রাখা হয় ইন্টারমিডিয়েট আর্টস ও ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স। এখন ইহা স্কুল ও কলেজের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থান করিতেছে। তখনও মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে বিএ ক্লাস খোলা হয় নাই বলিয়া ঈশানচন্দ্র জেনারেল এসেম্বলী ইন্স্টিটিউশনে (বর্তমান নাম স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হয়েন। এই সময় বিশেষজ্ঞতা অপেক্ষা বহুমুখী জ্ঞানের উপর বেশি জোর দেওয়া হইত। এক বা একাধিক বিষয়ের অনার্স পরীক্ষা তখনও প্রবর্তিত হয় নাই; বিএ পরীক্ষায় দুই ভাগ ছিল 'এ' কোর্স আর 'বি' কোর্স। ইংরেজি ও অঙ্ক উভয় বিভাগে অবশ্য পাঠ্য ছিল। ইহা ছাড়া 'এ' কোর্সে পড়িতে হইত—একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, উচ্চমানের অঙ্ক, ইহাদের মধ্য হইতে যেকোনো দুইটি বিষয়। 'বি' কোর্স ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। এন্ট্রান্স ও এফ. এ. এর মত এখানেও উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। ১৮৮০-৮১ সালে ঈশানচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ বিএ পাস করেন। শুনিয়াছি 'এ' কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 'এ' কোর্সের ছাত্র হইলেও তিনি গণিতেও পারদর্শী ছিলেন। তখনকার

দিনের গণিতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে লিখিয়াছিলেন যে, ঈশানচন্দ্র গণিতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। যাহা হউক, ঈশানচন্দ্র ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং ১৮৮১-৮২ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ স্থান লাভ করেন। শুনিয়াছি কি একটা পরীক্ষা বিভ্রাটের জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস করিতে পারিলেন না।

১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসে এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হয় এবং ঐ বৎসরের জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্যন্ত তিনি সামান্য চাকুরি করিয়াছিলেন। জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যাপকদের কয়েকজন সহযোগী নিযুক্ত হইতেন যাঁহাদের কাজ ছিল রচনা শুদ্ধ করা এবং এই কাজের জন্য ইহাদিগকে স্বল্প পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। ইহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্র গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়াও কিছু অর্থ উপার্জন করিতেন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি যশোহর জেলার নড়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন এবং প্রায় দুই বৎসর সেই কাজ করেন। অর্থের দিক দিয়া তিনি তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন। নড়ালে চাকুরি করার সময়ই ১৮৮৩ সালে ৩ মার্চ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৮৪ সালে জুলাই মাসে তিনি নড়াল স্কুলের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার পরিচালনায় ঐ স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয় এ কথা স্কুলের কর্তৃপক্ষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে অস্থায়ী পদে মাস দুই কাজ করেন ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'ইংলিশম্যান' কাগজে লিখিয়া কিছু অর্থোপার্জন করেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সরকারি চাকুরিতে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত হয়েন।

তাঁহার সার্ভিস বুক বা সরকারি চাকুরিপঞ্জিতে দেখিতে পাই ১৮৮৫ সালে ১০ মার্চ তিনি ১০০ টাকা বেতনে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এবং ১লা জুন হইতে স্থায়ীভাবে সরকারি চাকুরির পঞ্চম শ্রেণীতে ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর রূপে নিযুক্ত হয়েন। এই বৎসরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সরকারি চাকুরিতে একটানা ৩১ বৎসর কাজ করিয়া তিনি হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে ১৯১৬ সালে ১৬ জানুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার যে তালিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শৈশব ও বাল্যে তিনি বহুবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘ ৩১ বৎসরের চাকুরি জীবনে তিনি কখনো অসুখের জন্য ছুটি নেন নাই; একবার অসুস্থতার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, তখনও কিন্তু ডেপুটি ইন্সপেক্টরের পরিশ্রম ও ভ্রমণসাপেক্ষে কাজ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই সেই অসুস্থতা গুরুতর হইতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি

বেশ কর্মঠ ছিলেন; অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন এমনটা দেখি নাই। তিনি বলিষ্ঠ শালপ্রাংশু মহাভুজ লোক ছিলেন না অথচ বুড়ো বয়স পর্যন্ত সর্বদা কর্মতৎপর থাকিতেন। মনে হয় বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং পরবর্তীকালে যে কখনো অসুস্থ হয়েন নাই ইহার প্রধান কারণ মিতচার ও নিয়মনিষ্ঠতা। বাস্তবিকপক্ষে ধুমপান ছাড়া তাঁহার অন্য কোনো নেশা ছিল না; বার্নার্ড শয়ের মত তিনিও বলিতে পারিতেন যে, এক কর্ম ছাড়িয়া আর এক কর্ম গ্রহণই ছিল তাঁহার একমাত্র রিক্রিয়েশন বা অবসর বিনোদন। অশনে, বসনে বাক্যব্যয়ে, অর্থব্যয়ে সর্বত্রই তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের ইহাই প্রধান গুণ এবং ইহাই তাঁহার অনন্যসাধারণ সাফল্যের চাবিকাঠি।

কেবল স্কুল শিক্ষা নয় সরকারি শিক্ষা দপ্তরের প্রায় সকল বিভাগের সঙ্গেই ঈশানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বহুদিন স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ও সহকারী ইন্সপেক্টর ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি গ্রামের ও শহরের নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেন। বেশ কিছুদিন ছোটনাগপুর শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত থাকায় হিন্দী পঠন-পাঠন পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। ১৮৯৫-৯৬ সালের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে ছোট নাগপুর দুর্গম অঞ্চলে তাঁহার অক্লান্ত ভ্রমণ, হিন্দী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি এবং সেই জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সকল স্তরে পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থায় তাঁহার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়। শিক্ষা দপ্তরের বিবরণী বা প্রতিবেদন লিখিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। ইহাতে তিনি শিক্ষা বিভাগের নানা দিক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সংযত সাবলীল রচনারীতির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন। বেশ কিছুকাল হুগলী ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ থাকায় তিনি যোগ্য শিক্ষক তৈরি করার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রশাসনিক দিক হইতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সহকারি ডি.পি.আই পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বোধহয় তিনিই প্রথম বাঙালী এই পদ পাইয়াছিলেন। আজকাল এই জাতীয় দাবি খুব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য স্মরণ করিলে এই সকলের আপাত সামান্য পদোন্নতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, পরাধীনতার অন্যতম অভিশাপ এই যে দেশিয় লোকেরা কর্মদক্ষতার বা প্রতিভার সম্যক পুরস্কার পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথাই বলা যাইতে পারে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সন্তান, বোধহয়

সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চাকুরি জীবনে তিনি বঙ্গীয় সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির উপরে উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ডেপুটি ইন্সপেক্টর হইতে ঈশানচন্দ্র যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হইতে পারিয়াছিলেন ইহাকে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের নিবিড় সংযোগের ফলশ্রুতি ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক আজকাল এমন ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হইয়াছে যে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সুধীজন নাক সিঁটকাইবেন। কিন্তু একসময় এইরূপ ছিল না। তখন নতুন শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হইত এবং যদিও এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লেখককে বিত্তশালী করিয়াছে তবু শিক্ষাদানই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পুস্তকের গুণগত উৎকর্ষই ইহাদের সাফল্যের প্রধান কারণ। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও ঈশানচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রণী। তাঁহার বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, সংস্কৃত উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করিয়াছে। এই পথেই অগ্রসর হইয়া ঈশানচন্দ্রের সহাধ্যায়ী কালীপদ বসু বীজগণিত, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী পাটীগণিত রচনা করিয়াছিলেন; শরৎকুমার লাহিড়ীর Lahiri's Selected Poems, ঈশানচন্দ্রের নতুন শিশুপাঠ, হিতোপদেশ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মহাপুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধারাকেই প্রশস্ত ও প্রসারিত করিয়াছে।

তিনি নিজে নানা বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় তেরখানা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং অন্য গ্রন্থকারের সহযোগিতায় আরও ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু (আদর্শ শিশুপাঠ) ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (বিজ্ঞান পাঠ)।

ঈশানচন্দ্রের শিক্ষাবিভাগ কর্মজীবনের চরম ও পরম পরিণতি ১৯০৩ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত হেয়ার স্কুলে হেডমাষ্টার রূপে অধিষ্ঠান। এই দাবির তাৎপর্য বুঝাইতে হইলেও একটু ভূমিকার প্রয়োজন। আধুনিককালে বোধহয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সরকারি চাকুরির নতুন বিন্যাসের ফলে সকল হাইস্কুলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এখন এক স্কুল হইতে আর এক স্কুলের হেডমাষ্টারিতে বদলি স্থানান্তর মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহার পূর্বে সকল স্কুলের সমান মর্যাদা ছিল না এবং সবচেয়ে কৌলীন্য ছিল হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের। ইহাদের ঐহিত্যও গৌরবময়। মহামতি ডেভিড হেয়ার যে স্কুল সোসাইটি স্থাপন করেন তাহারই পরিণতি একালের হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু স্কুল

তো ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বটবৃক্ষ' হিন্দু কলেজেরই নিম্নাংশ। ইহাদের পরিচালনার ভারও ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের উপর। সুতরাং এই দুইটি স্কুলে পঠন-পাঠনের মান উন্নত রাখার জন্য শিক্ষা বিভাগের যোগ্যতম ব্যক্তিকেই ইহাদের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত এবং তাঁহাদের বেতনও অন্যান্য প্রধান শিক্ষকের বেতন অপেক্ষা বেশি ছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি স্কুলেরও খানিকটা আভিজাত্য ছিল, কিন্তু হেয়ার ও হিন্দু স্কুল ছিল সকলের উপরে।

শুধু হেয়ার ও হিন্দু কেন তখন অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি অলংকৃত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের নীতি এবং তখনকার দিনের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের বিদ্যোৎসাহিতারও সম্পর্ক ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারের রাজ্যশাসনে প্রধানত নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহারা এই বিরাট দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না এবং হেয়ার সাহেবের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদী উদ্যোক্তাদের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না। কাজেই ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার এই নীতি গৃহীত হইল যে, কর্তৃপক্ষ শুধু উচ্চস্তরে শিক্ষাদান করিবেন; তারপর এ দেশিয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ই শিক্ষা প্রসারিত করিবেন। রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, তাহার উপরে যে জল ঢালিবেন তাহাই চোঁয়াইয়া নিচে ছড়াইয়া পড়িবে। সেই কারণে প্রথমে শুধু জেলায় একটি করিয়া হাই স্কুল স্থাপিত হইল; কলিকাতায় ও আশেপাশে এবং হুগলী বা ঢাকার মত বড় শহরে মিশনারী বা অপর উৎসাহীর চেষ্টায় বা ধনী ব্যক্তিদের বদান্যতায় উত্তরপাড়া, কোন্নগর, সিরাজগঞ্জ, কান্দীর মত জায়গায় দুই চারিটি স্কুল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তখন দেশের লোকের ইংরেজি বিদ্যা আহরণের সাধ্য না থাকিলেও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই কারণেই যাঁহারা প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বরেণ্য তাঁহাদের উপরেই এই সকল স্কুলের ভার আপনা হইতেই ন্যস্ত হইল। ইহারা যেন মরুভূমিতে ওয়েশিস বা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ। এই ট্রাডিশান বহুদিন এদেশে সজীব ছিল। সেই কারণে এই দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু মনীষী প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বহুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া উচ্চতর পদে নিযুক্ত হয়েন। সেই আমলে বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙালী খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভ করেন, যেমন সংসারচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহারাও স্কুলের শিক্ষক হিসেবেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। আমাদের এই 'বুনো'

রামনাথের দেশে তখন আর্থিক সমৃদ্ধির অভাব শিক্ষকের মর্যাদার পক্ষে হানিকার হয় নাই। এখন অবশ্য অর্থতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক জগতে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রধান শিক্ষকদের সেই মর্যাদা নাই, সেই জাতীয় শিক্ষকও এখন বিরল। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'হৈমন্তীর বাবা হিমালয়ের অন্তর্বর্তী দেশিয় রাজ্যে চাকুরি করিতেন; হৈমন্তীর শ্বশুর ভাবিয়াছিলেন তিনি সেখানকার প্রধানমন্ত্রী গোছের কিছু হইবেন। পরে খবর লইয়া জানিলেন বৈবাহিক সেখানকার 'শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ' অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাষ্টার সংসারে ভদ্রপদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা।' কিন্তু এই মন্তব্য শুধু অমার্জিত অর্থলোভীর বর্বর রুচির সাক্ষ্য দান করে। এই হেডমাষ্টারের সত্যতর পরিচয় কবি নিজেই হৈমন্তীর স্বামীর সাহায্যে আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 'আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন পিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।' সৌভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের সমতল ভূমিতে অনেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে কবির এই বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারিত।

[২]

ঊনবিংশ শতাব্দী কেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই জাতীয় বরেণ্য প্রধান শিক্ষক একেবারে বিরল ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন হিন্দু স্কুলের রসময় মিত্র ও হেয়ার স্কুলের ঈশানচন্দ্র ঘোষ। ইঁহারা সমবয়সী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ইহাদের মধ্যে মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইঁহারা যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একসঙ্গেই দুইজনের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের কৃতিত্বের বিশ্লেষণ ও অবদানের কথাই বর্তমান নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়। ঈশানচন্দ্র যখন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন অধিকাংশ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য জেমস সাহেব, যাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রশাসনিক দক্ষতা সুবিদিত। ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহার এত আস্থা ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের সময়েও তিনি কখনো কখনো ঈশানচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উভয়ের অবসর গ্রহণের পরও জেমস মাঝে মাঝে বিলাত হইতে ঈশানচন্দ্রকে চিঠি লিখিতেন। একবার লিখিয়াছেন, 'You have had

illustrious predecessors in the past; but you have the satisfaction of reflecting that the school was never more flourishing than in the years under your control.'

ঈশানচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ধীর, স্থির, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন তাহাই নহে; জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানতপস্যা অব্যাহত ছিল। তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস স্কুলপাঠ্য সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার যুক্তবিন্যাস ক্ষমতা এবং রচনার পরিচ্ছন্নতা প্রসাদগুণের জন্যই সরকার তাঁহাকে বারংবার প্রতিবেদন লিখিতে নিযুক্ত করিতেন। এই কারণেই তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার দ্বারা ছাত্রগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত; তাঁহার একাধিক ছাত্র তাঁহার ক্লাসে শেক্সপীয়র ও পোপের কবিতা পাঠের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে বহু দুরূহ বিষয়ের মধ্যে অবগাহন করিলেও বালক ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যের বিষয়ে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁহাকে হেরডটাস, থুকিদিদিস, সুয়েটেনিউস প্রভৃতি লেখকদের রচনা অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে দেখা যাইত। ব্ল্যাকি এণ্ড সন্‌স ছোটদের জন্য ইউরোপীয় ক্লাসিকদের যে সংক্ষিপ্ত সরল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বাংলায় তদনুরূপ গ্রন্থমালা রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং নিজে ইলিয়াড ও বিক্রমোর্বশী সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সংকল্প ও প্রচেষ্টা তাঁহার অনুসন্ধিৎসার গভীরতা জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং কিশোরদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু ইহার একটি বিস্ময়কর ফলশ্রুতি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক (কলিম-লিখিত) ইলিয়াদ সম্পাদনা। প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যের যেকোনো অনুরাগীর মনে ইহা যুগপৎ আনন্দ ও ঈর্ষার সঞ্চার করিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের অন্য প্রধান লক্ষণ তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আমরা তাঁহাকে জীবনের শেষ দশ-বার বছর দেখিয়াছি—তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ, বহু জনাকীর্ণ পরিবারের প্রধান, প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী, সর্বদা কর্মব্যস্ত। কিন্তু যে গৃহের তিনি সর্বময় কর্তা, সেইখানে তিনি সর্বাপেক্ষা স্বল্পবাক্; এমন কি তিনি বাড়ি আছেন কিনা তাহাই অনেক সময় বোঝা যাইত না। অথচ প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে চলিতেছে, কেহই তাঁহার কাছে যাইতেছে না কিন্তু সবাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অনেক অতিথি অভ্যাগত ও আগন্তুককে আসা যাওয়া করিতে দেখিয়াছি, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা বলিতেছেন, তিনি খুব সহজে ধীরে ধীরে দুই একটি বাক্যে তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছেন, মনে হইত যে

সবাই অতি নিকটস্থ অথচ একটা অলক্ষ্য ব্যবধান আছে যাহা কেহই অতিক্রম করিতে সাহস পাইতেছে না।

তাঁহার মত পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল মননশক্তি সচরাচর দেখা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজের জন্য নিয়মিত, নির্দিষ্ট সময় আছে। বাজারের হিসাব লিখিয়া, সংসারের ব্যবস্থা করিয়া ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করিতেছেন; ঠিক সময় হইলে স্নান-আহারাদি করিয়া তিনি শেয়ার বাজারে চলিয়া গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে এ.বি.টি. এ-র কাজ করিতেছেন বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট কাজে হাত দিতেছেন, আবার তাহা সমাপন করিয়া নিরিবিলিতে জাতকের অনুবাদে মনোনিবেশ করিতেছেন। এই লোক কোনো স্কুলের হেডমাষ্টার হইলে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হইলে, সেখানকার কাজে আপনা হইতেই সুশৃঙ্খলা আসিবে। চঞ্চলমতি ছাত্ররা যথাসময়ে যে যার ক্লাসে থাকিবে, শিক্ষকরা যে যাঁর কাজ করিয়া যাইবেন; পাঠ্যক্রম ঠিক মত অনুসৃত হইবে এবং প্রধানের উপস্থিতিতেই সমস্ত হৈচৈ গোলমাল থামিয়া যাইবে।

স্কুলের ডিসিপ্লিন বলিতে আমরা পূর্বে মনে করিতাম কড়া শাসনের দ্বারা ছাত্রদিগকে শায়েস্তা রাখা। পাঠশালার গুরুর বেত ছিল শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক। আজকাল অবশ্য সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। শাস্তির দ্বারা শাসন হয়, কিন্তু শিশুমনের বিকাশ সাধিত হয় না এই নীতি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন যে এই স্বীকৃতিই উপযুক্ত শিক্ষাদানের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে। সেই বিতর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ না করিয়া ঈশানচন্দ্রের স্কুল পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার ছাত্ররা বলেন কৃশকায়, মৃতভাষী এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি পাণ্ডিত্য, শিক্ষানৈপুণ্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সৌজন্যের দ্বারা যে সম্ভ্রম জাগ্রত করিতেন তাহার ফলেই ছাত্ররাও নিয়মানুবর্তী হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক লক্ নাকি কোথায় বলিয়াছেন যে, যেমন নড়বড়ে কাগজের উপর অক্ষর বসান যায় না সেইরূপ (ভয়ে) কম্পমান মনের উপর শিক্ষার দাগ বসে না। এই নীতি শিরোধার্য করিয়া তিনি স্কুল পরিচালনা করিতেন এবং সেই কার্যে প্রার্থিত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তারপর নিজে সরকারি কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও পরিদর্শক হিসেবে তিনি প্রশাসনিক কর্মব্যপদেশে বঙ্গদেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করেন এবং এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জীবনের নানা

সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। কেবলমাত্র ছাত্রবেতনের উপর নির্ভরশীল বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন, পরিচালকমণ্ডলীর অস্থিরতা ও অক্ষমতা এবং সরকারের ঔদাসীন্য—এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত হন। শিক্ষকরা নিজেরাও এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার মত প্রবীণ খ্যাতিমান প্রভাবশালী শিক্ষকের নেতৃত্ব সাদরে গ্রহণ করেন। এইভাবে ১৯২১ সালে অখিল বঙ্গ শিক্ষক সংস্থা এ.বি.টি.এ স্থাপিত হইলে তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে বৃত হয়েন এবং ঐ বৎসরই তাঁহার সম্পাদনায় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র টিচার্স জার্নাল আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে এই সংস্থার আয়তন ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার জন্ম হইতে প্রথম তের বৎসর অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণধার ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের এত গভীর আস্থা ছিল যে ১৯৩২ সালে তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইতে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্ চ্যান্‌সেলর প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি এইভাবে সরিয়া যাওয়ায় ডাক্তার সরকার বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং ইহারা স্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

[৩]

প্রবাদ আছে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এবং ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, একই গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একসঙ্গে বিরাজ করেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি প্রচুর ধনেরও মালিক হন। আবার বিরল হইলেও এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে, সরস্বতীর আরাধনার পথেই লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ হইয়াছে এবং বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। ঈশানচন্দ্র এই অসাধারণ পুরুষদের অন্যতম। তিনি প্রচুর অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাচর্চাই তাঁহার ভিত্তি এবং এই অর্থোপার্জনের মধ্যেও তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও পরিমিতিবোধ দীপ্যমান। তিনি যাহা বেতন পাইতেন তাহাতে সেইদিনের মোটামুটি সচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত, কিন্তু তাহার দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব হইত না। জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করার ফলে তাঁহার অর্থাগম হয়। সেই অর্থ তিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করিয়া ক্রমে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েন। তিনি নিজের জীবনের যে ঘটনাপঞ্জি

লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ৩৫-৩৬ বৎসর বয়সে (১৮৯৩-৯৪ সালে) তিনি অর্থ লাভের নতুন পথ আবিষ্কার করেন। ইহাই শেয়ার মার্কেটে তাঁহার অনুপ্রবেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ইংরেজরা এই দেশে যৌথ কারবার বা সীমিত দায়িত্বভিত্তিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মারফতে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন এবং নিজেরা বহু বড় বড় কোম্পানী স্থাপন করেন যাহার শেয়ার কিনিয়া বাহিরের লোকও অংশীদার হইতে পারিত। ইহা হইতেই শেয়ার মার্কেট বা লায়ন্স রেঞ্জের উৎপত্তি। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের অগ্রগতি ও স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর ক্রমবর্ধমান সরকারি নিয়ন্ত্রণের জন্য শেয়ার বাজারের জৌলুস খানিকটা কমিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু একসময় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেট লায়ন্স রেঞ্জ ও দালাল স্ট্রিট খুব জমজমাট ছিল। এই শেয়ার মার্কেট এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। ইহা বাজার, কিন্তু এখানে পণ্য নাই; এই বাজারের ধরুন কলিকাতার লায়ন্স রেঞ্জে কোম্পানীর অংশ বা শেয়ারের কেনাবেচা হইতেছে, কিন্তু যে সব কোম্পানীর মালিকানার অংশের বেচাকেনা হইতেছে তাহারা কলিকাতার ত্রিসীমানার মধ্যেও অবস্থিত নহে এবং যাঁহারা মালিকানার ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন তাঁহারা কারবারে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক ইহাদের সঙ্গে তাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হইতেছে না। কাজেই এই ব্যবসায় অনেকটা কৃত্রিম, অনেকটা অলীক। অথচ প্রতিদিন মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হইতেছে, ধনী গরিব হইতেছে আবার গরিব বড়লোক হইতেছে। এই রকম স্থানে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সাধু অর্থ-বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আসল ও নকল দালাল, জুয়াড়ী, বাটপাড়ের সমাবেশ হইবেই। যাঁহারা ব্যবসায়ের বাজারে প্রভুত্ব করিতে চান তাঁহারা কোনো কোম্পানীর বেশি শেয়ার কিনিয়া ফেলিতেছেন; আবার শুধু সেই কোম্পানীর শেয়ারের বাজারের দাম বাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোনো দালাল তাঁহার শেয়ারের জন্য আগাম অর্ডার দিতেছেন। ইহার অপর দিকও আছে। যাঁহার নগদ টাকার দরকার তিনি গচ্ছিত শেয়ার বিক্রি করিবার জন্য ছাড়িতেছেন আবার কোনো দালাল কোনো কোম্পানীর শেয়ার দাম কমাইবার উদ্দেশ্যেই বেচিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। এই বাজারে অসাধু ভাগ্যান্বেষী ও বাটপাড় দালালরা অজ্ঞ অর্থলোভীকে কীভাবে প্রবঞ্চনা করে তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র পরশুরাম আঁকিয়াছেন শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও সার্থকনামা গণ্ডেরীরাম বাটপেড়িয়ার চরিত্রে।

এই শেয়ার মার্কেটে ঈশানচন্দ্রকে দেখা যাইবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। প্রথমত, স্কুল মাষ্টারদের নিকট হইতে কেহ ব্যবসায় বুদ্ধি প্রত্যাশা করে না। তারপর বাড়ি বসিয়া কেহ বাড়তি কিছু টাকা কোনো নামজাদা

কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া কিছু লাভ-লোকসান করেন তাহা যদি সম্ভব না হয়, যিনি আজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন, বই লিখিয়াছেন, সরকারি রিপোর্ট লিখিয়াছেন বা স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি উত্তরকালে শেয়ার বাজারের কেনা-বেচার হৈ-হুল্লোড়ের দালালি ফাটকাবাজির মধ্যে সঞ্চরণ করিবেন ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অবসর গ্রহণ করিবার পর বৃদ্ধবয়সে তিনি এই জগতের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছিলেন, প্রতিদিন দুপুরবেলা এখানে যাইতেন এবং এইখানে প্রচুর অর্থও উপায় করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র কলিকাতায় জমি কিনিয়াছিলেন ১৮৯৩ সালে কিন্তু বাড়ি করেন দেওঘরে ১৯০১ সালে। কলিকাতায় প্রথম বাড়ি করেন ১৯০৮ সালে। পরে, বিশেষ করিয়া অসবর গ্রহণান্তে, তিনি কলিকাতায় একাধিক বাড়ির মালিক হয়েন এবং ব্যাংকে, কোম্পানীর কাগজে, শেয়ারে প্রভূত অর্থ গচ্ছিত রাখেন। শুধু তাই নয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজেই বলিতেন যে, তিপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ পিতার জীবদ্দশায়, তিনি 'পি.সি. ঘোষ' সহি করা ছাড়া আর কোনো সংসারী কাজ করেন নাই। পিতা ঈশানচন্দ্র পুত্রের উপার্জিত অর্থের এমন সুপ্রয়োগ করিয়াছিলেন যে তিনিও বেশ ধনী হইয়াছিলেন। কাশীতে ও কলিকাতায় তাঁহার বিরাট সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার লাইব্রেরির মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে; তিনি জীবিতকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র (ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতিতে) মোটা টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার সম্পত্তি নানা হাসপাতাল এবং আত্মীয় ও আশ্রিতদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পত্তিও অনেকটা তাঁহার পিতার ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারাই অর্জিত।

শেয়ার মার্কেটেও ঈশানচন্দ্র তাঁহার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ তিনি এই বাজারে অন্য পাঁচ জনের মত হঠাৎ বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে দালালি করেন নাই বা লটারি খেলার মনোভাব লইয়া প্রবেশ করেন নাই। তিনি বহুদিন ধরিয়া নানা ব্যবসায়ের গতিবিধি লক্ষ করিয়াছিলেন, বড় বড় কারবারের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, লাভ-লোকসানের কারণ যাচাই করিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া ধীর স্থির পদক্ষেপে এই পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার অর্থ প্রায় সব সময়েই নিশ্চিত লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইত। সেই আমলে কলিকাতার বাণিজ্য বেশির ভাগ বিদেশিয়দের হাতে ছিল, কতকগুলো বড় বড় সাহেবী কোম্পানী ইংরেজ রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া মনে হইত। এইসব কোম্পানীর প্রধানরা ঈশানচন্দ্রের জ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ডিরেক্টর বা

পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য করিয়া লইয়াছিলেন। আয়কর বিভাগের কর্মচারীর কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তাঁহার ব্যক্তিগত বিরাট আয়ের মোটা অংশই আসিত সেই আমলের অভিজাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের 'ফি' হইতে। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি দালালি করিতেন না বা দালালের মাধ্যমে কাজ করিতে হইলেও স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা চালিত হইতেন। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, শেয়ার বাজারের অনেক নামী দালাল তাঁহার বাড়িতে আনাগোনা করিতেন তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ লইবার জন্য।

আমার সঙ্গে শেয়ার জগতের কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জে ঈশানচন্দ্রের একাধিক, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিপত্তি যাচাই করিবার সুযোগ আমি নিজেই পাইয়াছিলাম। সেটা ১৯২৬ সালে, আমি তখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। আমার বিহারপ্রবাসী জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পিতার কিছু সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়। যতদূর মনে হয় তিনটি সরকারি ঋণপত্র মূল্য পনের হাজার টাকার মত। তিনি এই ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। আমি সরকারি ঋণপত্রও কোনো দিন দেখি নাই, এত টাকার সংস্পর্শেও কোনো দিন আসি নাই। আমাদের তখন রেওয়াজ ছিল সব কিছুতেই স্যার অর্থাৎ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা। তিনি আমার বন্ধু পিতাকে নামে চিনিতেন। আমাকে তাঁহার নিজের পিতৃদেবের কাছে লইয়া গিয়া আমার প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। স্থির হইল আমি পরদিন দুপুরে বিক্রেয় ঋণপত্র লইয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার গাড়িতে স্টক এক্সচেঞ্জে যাইব। আমাকে তিন দিন তিনখানি কাগজ বিক্রয় করিতে যাইতে হইয়াছিল। তিন দিনই একই রকমের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রথম দিনের বিস্ময়ানুভূতি কাটিয়া গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের জুড়িগাড়ি যখন রাইটার্স বিল্ডিং অতিক্রম করিয়া কেবল স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকিতেছে তখন রাস্তায়, বাড়ির খোলাছাদ বা দোতলার বারান্দা হইতে দুর্বোধ্য চেঁচামেচি শুনিয়া, হৈ-হুল্লোড় বা ছুটাছুটি দেখিয়া আমার ভয় হইল যে এখানে কোথাও আগুন লাগিয়াছে বা একটা দাঙ্গা বাধিয়াছে এবং কোথাও দেখিলাম কেহ কেহ শুধু আঙুল নাড়িতেছে। তবে কি একাধিক পাগলাগারদের অধিবাসীরা ছাড়া পাইয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছে? পরে শুনিয়াছি ইহাই শেয়ার বাজারে দর হাঁকাহাঁকি ও কেনাবেচা। কিন্তু আমাদের গাড়ি যেই থামিল আর ঈশানচন্দ্র নামিলেন, অমনি আমাদের সামনের শব্দসমুদ্র ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইল, জনতার ভিড় মাঝখানে পথ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আমরা একটা বড় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানেও নিচের তলায় এবং সিঁড়িতে সেই ভিড় ও সেই চিৎকার এবং ঈশানচন্দ্রকে দেখিয়া সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা। সিঁড়ির লোক একপাশে সরিয়া

যাওয়ায় আমরা সহজেই উপরে উঠিলাম, ঈশানচন্দ্র আমাকে দরজায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একটা প্রশস্ত অফিসঘরে ঢুকিলেন। আমি দূর হইতে লক্ষ করিলাম তিনি যে টেবিলে যাঁহার কাছে যাইতেছেন সবাই অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তিনি কোথাও বসিলেন না এবং যখন যাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন সেই ব্যক্তিও আসন গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আমাকে লইয়া অন্য একটা বাড়িতে একটা অফিসে লইয়া গেলেন, যতদূর মনে আছে তাহার নাম প্রসাদদাস বড়াল অ্যান্ড সন্স। সেইখানে আমার কাগজখানা বাহির করিলাম। তাঁহারা হাতের কাজ রাখিয়া হিসাব করিয়া চেক লিখিয়া আমাকে দিয়া দিলেন। ঈশানচন্দ্র আমাকে দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, জ্ঞানের গভীরতায় ও চরিত্রবলে তিনি এখানেও অনন্য, নিঃসঙ্গ, একাকী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

[৪]

ঈশানচন্দ্র ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ের মধ্যেও সংযম, পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবনযাত্রায় সচ্ছলতার পরিচয় ছিল, বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না, সর্বোপরি তিনি অপব্যয় পরিহার করিতেন, স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কোথাও বাহুল্য ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সকল দিক দিয়াই তাঁহার গৌরবের বস্তু ছিলেন, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছেন :

"ভাগ্যবান—তোমার পুণ্যের পরিচয়
গুণীপুত্র, কাছে যার তব পরাজয়।"

শেষ পঁচিশ বছর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ইঁহাদের একমাত্র সন্তান আট বছর বয়সেই মারা যায়; কাজেই সংসারে ইঁহাদের জন্য ব্যয় ছিল সবচেয়ে কম, কিন্তু সংসারযাত্রার মাসিক ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ তিনি নিজে বহন করিতেন এবং এক তৃতীয়াংশ প্রফুল্লচন্দ্রের আয় হইতে লইতেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্রকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনিই যেন সমস্তটা বহন করেন।

ঈশানচন্দ্র নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দারিদ্র্যের ভীষণতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপার্জিত সম্পত্তি হইতে পুত্র ও পৌত্রদের যাহাতে সঙ্গতি থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্রের যথেষ্ট অর্থ ছিল; সুতরাং তাঁহাকে শুধু সদ্ব্যয়ের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যমপুত্র অনুকূলচন্দ্র তাঁহার জীবিতাবস্থায় মারা যান; নাবালক দুই পুত্র ও তাহাদের অপেক্ষাও কনিষ্ঠ এক কন্যা রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র প্রতুলচন্দ্রের

একটি মাত্র পুত্র ছিল। পরলোকগত পুত্র অনুকূলচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ইহাদিগকে দেয় সম্পত্তির তিন ভাগ করিলেন, অনুকূলচন্দ্রের দুই পুত্র—হেমচন্দ্র ও নারায়ণচন্দ্র—এবং প্রতুলচন্দ্রের পুত্র জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র তখন নাবালক ছিল বলিয়া বোধহয় তৃতীয় অংশটা প্রতুলচন্দ্রের নামেই লিখিয়া দেন এবং অনুকূলচন্দ্রের কন্যার বিবাহের জন্য পৃথকভাবে টাকার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাঁহার বাকি প্রচুর সম্পত্তি প্রধানত জনহিতকর উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট করিয়া যান। ইহাতে তিন পুত্রবধু ও পৌত্রীদের হাতখরচার এবং আশ্রিত আত্মীয়দের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে। ইহারা সব মিলিয়া সংখ্যায় অনেক হইলেও কাহারও জন্য মোটা টাকার বরাদ্দ করা হয় নাই। তিনি অনেক অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই পল্লী অঞ্চলের জন্য যেখানে বাল্যে ও কৈশোরে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে তিনি দেখিয়াছেন জঙ্গলাকীর্ণ বসতিতে মানুষ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, পানীয় জলের অভাবে, কলেরা মহামারীতে, অচিকিৎসায় মারা যাইতেছে, সেখানে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সত্ত্বেও মেধাবী বালক বিদ্যার আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পল্লীসংস্কারের কথা বলেন অনেকেই, কিন্তু কাজ হয় খুব কম। জন্মস্থান খরসূতি গ্রাম যশোহর জেলার একপ্রান্তে; তাহার আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার বঙ্গেশ্বরদী গ্রাম যেখানে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েন। এই বঙ্গেশ্বরদীই তাঁহার শ্বশুরের বাসস্থান। এই জনপদ এক সময়ে সীতারাম রায়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল; তখন উহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ঈশানচন্দ্রের বাল্যকালে বঙ্গেশ্বরদী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন হইলেও খরসূতি ও তাহার আশেপাশের অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল। এখানে রাস্তাঘাট চলাফেরার পক্ষে অনুপযুক্ত, বছরের অধিকাংশ সময় জলকষ্ট, চিকিৎসাব্যবস্থার একান্ত অভাব এবং দরিদ্রের বিদ্যাশিক্ষার মনোরথ উত্থায় এবং হৃদি লীয়ন্তে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে জঙ্গল কাটাইয়া, রাস্তা বানাইয়া এই অঞ্চলকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, দুইটি বড় বড় দীঘির ও টিউবওয়েল কাটাইয়া জলকষ্টের উপশম করেন, মাতার নামে কালীতারা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, পিতার নামে চন্দ্রকিশোর উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা করেন এবং পূজার্চনার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার উইলে তিনি যে ট্রাস্ট গঠন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মোটা টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল দাতব্য চিকিৎসালয়কে ছয়শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করিতে এবং খরসূতি হইতে বঙ্গেশ্বরদী—এই সমগ্র অঞ্চলে নলকূপ খনন করিয়া পানীয় ও সেচের জলের ব্যবস্থা করিতে। ইহা ছাড়া চন্দ্রকিশোর বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে

উন্নীত করিবার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন এবং সংস্কৃত পাঠের জন্য চতুষ্পাঠী নির্মাণের ও কবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। তদুপরি খরসূতি হইতে নিকটবর্তী রেল স্টেশন ঘোষপুর পর্যন্ত ভাল রাস্তা তৈরি করার জন্য যশোহর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইহা ছাড়া খরসূতি গ্রামের দরিদ্রদের চিকিৎসার সাহায্যার্থে, গরিব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার উদ্দেশ্যে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন; দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্যের জন্যও অর্থ দান করেন। নিজের সম্পিত্তি হইতে এত বিস্তারিত কর্মসূচি রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না; এইজন্য তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দকে এই কার্যের জন্য ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করিতে নির্দেশ দেন। বাল্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাগলা কুকুরে কামড় দেয়; তখন উত্তর ভারতবর্ষে এই আক্রমণের চিকিৎসার একমাত্র ব্যবস্থা ছিল সিমলার কাছে কসৌলীতে পাস্তুর ইন্স্টিটিউটে। আক্রান্ত পুত্রকে চিকিৎসার্থ ওখানে লইয়া যাইয়া ঈশানচন্দ্র বহিরাগত রোগী ও তাহাদের সঙ্গীদের বাসস্থানের সুবিধা দেখিয়া প্রধানত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আগত রোগীদের থাকার জন্য স্ত্রী শশিমুখীর নামে একটি বাংলো তৈরি করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা ভুবনেশ্বরীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হওয়ার পর তিনি কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থপ্রদান করেন।

১৯৩৫ সালের ২৮ শে অক্টোবর ৭৭ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উইলের প্রবেট নেওয়া হয় এবং যে প্রচুর ট্রাস্ট সম্পত্তি তিনি রাখিয়া যান এবং তাহার আয় হইতে খরসূতি-বঙ্গেশ্বরদীতে যে বিস্তীর্ণ কর্মসূচির নির্দেশ দিয়া যান তাহা নির্বাহ করার জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয় এবং একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। যতদূর জানি পল্লীগ্রামে কাজও আরম্ভ করা হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান কর্মকর্তা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন এবং ১৯৪৮ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর সুস্থ হইতে পারেন নাই। এদিকে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের উদ্ভব হয় এবং যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলাই তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ঈশানচন্দ্রের আরম্ভ কাজ আর সম্পূর্ণ হয় নাই; যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা আজ কি অবস্থায় আছে তাহাও বলিতে পারি না। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পত্তি হইতে অনেক টাকা কলিকাতায় একাধিক হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ শুনিয়াছি। ইহাই বোধহয় সেই পরিকল্পনার একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিণতি।

ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহু শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নানা পত্রপত্রিকায় ছোট বড় প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী লিখিত হয় ও তাঁহার পাণ্ডিত্য, কর্মকুশলতা ও

দানশীলতার প্রশস্তি রচিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনাতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের কোনো যোগাযোগ ছিল না; তিনি কটক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি এই সময় অধ্যাপক ঘোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি দিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান করিব।

C/o, American Express
Company
Vienna
19.12.35

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সংবাদপত্র মারফত আপনার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের খবর জানিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলাম। তিনি বিদ্বান, চরিত্রবান ও সকল দিক্ দিয়া যোগ্য পুরুষ ছিলেন; তদ্ব্যতীত তাঁহার সমাজহিতৈষিতা সকলের গৌরবের বিষয় ছিল। তাই তাঁহাকে হারাইয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আমি ধন্য মনে করিতেছি।

আপনারা আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।

ইতি
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

(৫)

ঈশানচন্দ্র ও শশিমুখীর আটটি সন্তান—চার পুত্র ও চার কন্যা—জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র এবং প্রথমা, তৃতীয় ও চতুর্থা কন্যা শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে। কাজেই এই দম্পতির পারিবারিক জীবন তিন পুত্র ও এক কন্যা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সংসারের মেয়ে শশিমুখী হাসিমুখে স্বামিগৃহের দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে সৌভাগ্যে অনুৎসেকিনী ছিলেন। শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় কণ্বমুনি আদর্শ গৃহিণীর যে ছবি আঁকিয়াছেন মিতভাষী ঈশানচন্দ্র সহধর্মিণীর বর্ণনা দিতে যাইয়া তাহা স্মরণ করিয়াছেন। সেবাপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী ১৯১০ সালে স্বামী ও চার সন্তানকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

কৃতী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তির কথা আমি অন্যত্র লিখিয়াছি।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা।

ইহা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতি কথায়, প্রতি কর্মে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তি উদ্বেল হইত কিন্তু ঈশানচন্দ্রের স্নেহ প্রকাশ পাইত ক্বচিৎ বিদ্যুৎ চমকের মত; তবে তাহা বিদ্যুতের আলোকের মতই দীপ্যমান। প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০৩ সালে এম.এ পাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ছুটি নেওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অল্প কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনার চাকুরি পান। প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে যান, ছেলে ঠিক মত কাজ করিতে পারিল কিনা এই চিন্তায় ঈশানচন্দ্র সেই দিন নিজে আর কাজে মন দিতে পারেন নাই, উৎকণ্ঠিত চিত্তে হেয়ার স্কুলের বারান্দায় পায়চারি করিয়া সময় কাটাইয়াছিলেন। উত্তরকালে যিনি অধ্যাপনা নৈপুণ্যের জন্য অপরাজেয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য পিতার এই উদ্বেগের কথা শুনিয়া আমরা যুগপৎ আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আর এক দিনের কথা বলিব। ঈশানচন্দ্রের এক লব্ধ প্রতিষ্ঠ সহাধ্যায়ীর (অলীক) মৃত্যুসংবাদের কথা ঐ বাড়িতে পহুঁছায়। শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিলেন যে ইহা সত্য না হওয়াই সম্ভব। কারণ সেই দিনই পিতৃবন্ধুর পুত্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল এবং পুত্রের মধ্যে তিনি শোক-বিহ্বলতার কোনো চিহ্ন দেখিতে পান নাই। ঈশানচন্দ্র শুধু বলিলেন, 'তুমি নিজেকে দিয়া সব ছেলেকে বিচার করিও না।'

দ্বিতীয় পুত্র অনুকূলচন্দ্র বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি পুস্তক প্রকাশক ছিলেন। যতদূর জানি তিনিই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার প্রথম প্রকাশক। অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে এবং মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯৩১ সালে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কনিষ্ঠপুত্র প্রতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০ সালে। তিনি কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন; এখন বালিগঞ্জে অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। প্রতুলচন্দ্রের দুই বৎসর পরে যে পুত্রের জন্ম হয় সে দুই মাস বয়সেই মারা যায় এবং কন্যাদের মধ্যেও তিন কন্যা শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনেশ্বরীকে ঈশানচন্দ্র সৎপাত্রস্থ করিয়াছিলেন। কৃতবিদ্যা জামাতা অবিনাশচন্দ্র বসু সরকারের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। অবিনাশ বসু দীর্ঘায়ু হইলেও ভুবনেশ্বরী ১৯১৫ সালে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে দুই পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া স্বর্গত হয়েন। জামাতা, পুত্রবধূরা, নাতিনাতনীরা সকলেই ঈশানচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং তিনিও সকলকেই স্নেহ করিতেন। ইহা ছাড়া তিনি অপেক্ষাকৃত দূর আত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতিও যথাযোগ্য কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শুধু একটি লোকের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না দিলে এই আলেখ্য অসম্পূর্ণ হইবে।

ঈশানচন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার পিতা খরসূতির অদূরবর্তী গোয়ালবাড়ি গ্রামে

কুণ্ডুবাবুদের অধীনে চাকুরি করিতেন। নিজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি খোঁজ লইয়া দেখিলেন তাঁহার পিতার 'অন্নদাতাদের'কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন। শুনিতে পাইলেন যে তাঁহাদের অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে, বংশের প্রায় সবাই চলিয়া গিয়াছেন; পুরুষদের মধ্যে শুধু রেবতীমোহন নামে একজন বালক গোয়ালবাড়িতে বসবাস করিতেছেন। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া ঈশানচন্দ্র রেবতীমোহনকে নিজগৃহে লইয়া আসেন এবং নিজের সন্তানদের মতই তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। রেবতীমোহন প্রফুল্লচন্দ্রের অপেক্ষা সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; পরিণত বয়সেও ইহাদিগকে দুই সহোদরের মত মনে হইত। ঈশানচন্দ্র রেবতীমোহনকে পরে গোয়ালবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। ইহাদের তখনও ভূসম্পত্তির যে অবশেষ ছিল তাহাতেই ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন হইত। বিবাহের অল্প কিছুকাল পরেই রেবতীবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হয়; যতদূর জানি ঈশানচন্দ্রের আনুকূল্যেই তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহ হয়। ঈশানচন্দ্রের শেষ বয়সে যখন অসুখ করিল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন বার্ধক্যে এই ক্ষয়রোগই তাঁহার শেষ রোগ, তখন তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে রেবতীকে আনাইতে নির্দেশ দেন। রেবতীমোহন ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ঈশানচন্দ্রের সমস্ত সেবার ভার নেন এবং ইহারা যে পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাহাই বিপত্নীক বৃদ্ধের শেষ দিনগুলোকে স্যার নীলরতনের চিকিৎসা অপেক্ষাও অধিকতর সহনীয় করিয়া তোলে। স্যার নীলরতন ক্ষয়রোগে ধূমপানে আপত্তি করেন, কিন্তু ঈশানচন্দ্র তাঁহার আবাল্য সুহৃদ হুঁকা-গড়গড়াকে পরিত্যাগ করেন নাই। রেবতীবাবুর প্রয়োজন খুব সামান্যই ছিল; ঈশানচন্দ্র উইলে তাঁহার জন্য সামান্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর রেবতীমোহন এই বাড়িতেই থাকিয়া যান। তাঁহার প্রয়োজনও ছিল; কারণ তিন-চার বছরের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র অসুস্থ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়েন এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সুদীর্ঘ অসুস্থতায় তিনিই ঐ গৃহের প্রধান রক্ষক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর পরও তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই; ঈশানচন্দ্রের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাড়িতেই তাঁহারও জীবনাবসান হয়।

ঈশানচন্দ্র বাল্যে পিতৃহারা হয়েন এবং তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীরাও শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যে বিধবা জননী দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন পুত্রের ভাগ্যোদয়ের পূর্বেই তিনিও স্বর্গত হয়েন। তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ছয় বৎসর পূর্বেই (১৯১০) জীবনসঙ্গিনী শশিমুখী ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার তিন বৎসর পর (১৯১৩) জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র সন্তান পৌত্র বিমলচন্দ্র পিতামহের মনে নিদারুণ আঘাত দিয়া আট বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহার দুই বৎসর পর (১৯১৫) তিনি কন্যা ভুবনেশ্বরীকে হারান, তাঁহার মধ্যম পুত্র

অনুকূলচন্দ্র মারা যান ১৯৩১ সালে। অকালমৃত্যু এই পরিবারের অনতিক্রম্য অভিশাপ। ঈশানচন্দ্রের তিরোধানের পরে যমের অপ্রত্যাশিত পদধ্বনি অহরহ এই পরিবারে শোনা গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের কন্যা বাসন্তী বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণচন্দ্র বালক পুত্র ও বালিকা কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন (১৯৫৮)। জ্যেষ্ঠপুত্র পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান অশোক বালিকা বধূ ও পিতামাতাকে রাখিয়া ক্যান্সার রোগে অনধিক চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে; নারায়ণচন্দ্রের পুত্র দীপক কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। ঈশানচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী নারায়ণচন্দ্রের মৃত্যুর একমাস পরেই ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। রাখিয়া যান স্বামী, পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র জগদীশচন্দ্রকে। ইহাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা সাবিত্রী স্বামী ও পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। এই জীবনী রচনায় অন্যতম উদ্যোক্তা জগদীশচন্দ্র গত ৩০শে চৈত্র (১৩৮৩) রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় হার্টফেল করিয়া স্ত্রী, বালক পুত্র, বালিকা কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। জামাতা অবিনাশচন্দ্রের যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল। তবু ঈশানচন্দ্র পরলোকগতা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্র মাতৃহারা সুকুমারের বিবাহের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সুকুমার অল্প বয়সে অবিবাহিত থাকিয়াই চিরবিদায় গ্রহণ করে।

[৬]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, গিরিশৃঙ্গের দেবদারু দ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণঘাতক হিমানী বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া নিজের অভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখা পল্লবসম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে, তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন শক্তিসম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্য কোনো লোকের তুলনা করিলে শুধু যে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের প্রতি অবিচার করা হয় তাহাই নহে, যিনি উপমেয় তাঁহাকেও অসুবিধায় ফেলা হয়। এই ব্যবধান স্মরণ রাখিয়া বলিতে পারি যে, ঈশানচন্দ্র ও স্বীয় অভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারাই জঙ্গলাকীর্ণ পল্লিগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যার সাগর ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল এমন কি গণিত ও বিজ্ঞানেও পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের

অন্যতম স্রষ্টা এইরূপ দাবি করা বাতুলতা হইবে, কিন্তু 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতির ন্যায় বহু সহজ সরল গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের সহজ সারসংকলন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সর্বত্যাগী বিদ্যাসাগরের দানের তুলনায় ঈশানচন্দ্রের মহৎ দান সাগরের কাছে গোষ্পদের তুল্য। কিন্তু তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনিও গিরিশৃঙ্গজাত দেবদারু দ্রুমের মত সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছেন।

প্রাণঘাতক বিরোধিতার মধ্যেও তাঁহার এই অপরাজেয় শক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁহার মহত্তম কীর্তি জাতক অনুবাদ গ্রন্থমালায়। ঈশানচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মরণ, যাহা প্রতিপদে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত করিতে চাহিয়াছে, তাঁহার সৌভাগ্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু তিনি পত্নীবিয়োগ, পুত্রশোক ও কন্যার শোক গভীরভাবে অনুভব করিলেও বিচলিত বা বিহ্বল হয়েন নাই। শুধু একটি শোক তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়াছিল। ১৯১৩ সালে তাঁহার নিজের বয়স যখন পঞ্চান্ন বছর তখন তাঁহার প্রিয় পৌত্র প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র (ভানু) আট বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। শুনিয়াছি এই শোকে তিনি কাতর হইয়া শিশুর মত কাঁদিতেন; এমনকি তিনি যাহাতে বিচলিত হইয়া না পড়েন সেই ভয়ে তিনি বাড়ি থাকিলে বিমলচন্দ্রের মাতা স্বীয় কষ্ট সম্বরণ করিয়া থাকিতেন। এই নিদারুণ শোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ঈশানচন্দ্র জাতকমালা অনুবাদের দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই বিরাট কর্মের মধ্য দিয়াই তিনি অশান্ত হৃদয়কে সংযত করিয়া স্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া পান। বহু কাহিনীবিশিষ্ট জাতকের অনুবাদ করিতে এবং ছয় খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার ষোল বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইলেও এই কাজের জন্য তাঁহাকে কত গভীরভাবে পালি ভাষা অধ্যয়ন করিতে ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য গবেষণা করিতে হইয়াছিল তাহা অনুবাদ, ভূমিকা এবং পাদটীকা দেখিলেই অনুমিত হইবে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ইহার বিক্রয় হইতে তাহার এক চতুর্থাংশও ফিরিয়া পান নাই। সুতরাং যে বিপুল ক্ষতি তিনি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছিলেন ইহাও পরোক্ষভাবে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি জাতকমালার ইংরেজি অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিতে ছয়জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পের সমগ্র দায়িত্ব লইয়াছিল। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে, অনুবাদ হইতে প্রুফ সংশোধন পর্যন্ত এই শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কর্মের সকল ভার ঈশানচন্দ্র একা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শোকে মুহ্যমান হওয়া যেকোনো লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্রতা কমিয়া আসে। তাহা ছাড়া শোকের দাগ মন হইতে একেবারে মুছিয়া না গেলেও প্রায় সকল প্রিয় বিয়োগ বেদনাহত মানুষ অন্য কর্মে মন দিয়া, অন্য সম্পর্কের আকর্ষণের মধ্য দিয়া অথবা সংসার হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া শোকের অপনোদন করে। ইহাই সংসারধর্ম। কিন্তু ঈশানচন্দ্র যে উপায়ে জীবনের গভীরতম শোককে পরাস্ত করিয়া তাহার অবিস্মরণীয় স্মারক রচনা করিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধার করিয়া বলা যায়, গিরিশৃঙ্গে অঙ্কুরিত দেবদারু দ্রুমের ন্যায় এই কায়স্থ সন্তান অভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা শুধু দারিদ্র্যকে জয় করেন নাই পরন্তু আপন অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধি দ্বারা মৃত্যুশোককে অবিস্মরণীয় রূপ দান করিয়াছেন।

জাতক কাহিনীগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ভূমিকায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যে শুধু যে তাঁহার সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ও সূচিত হইয়াছে। এইখানে শুধু দুইটি লক্ষণের উল্লেখ করিব যাহার সঙ্গে ধর্মোপদেশের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই। জাতক গ্রন্থের অন্যতম মাহাত্ম্য ইহার প্রাচীনত্ব। ভগবান বুদ্ধ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হইয়া গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার শিষ্যরা এই প্রথায় বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীর মাধ্যমে তৎ প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করে। বুদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কাহিনী নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতবর্ষীয় ও অন্য দেশিয় সাহিত্যে ইহা নানান রূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া পরিণতি লাভ করে জাতকের গল্পগুলো পড়িলে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অগ্রগতির স্বরূপ বোঝানো যাইতে পারে। নিজের শরীরের মাংস দান করিয়া পরের উপকারের গল্প বলা হইয়াছে নিগ্রোধমৃগ জাতকে। মনে হয় ইহাই এই জাতীয় গল্পের আদিরূপ। পরে মহাভারতে শিবি রাজার উপাখ্যানে ইহা আরও বর্ণাঢ্য আকার ধারণ করে। কালক্রমে এই কাহিনী পাশ্চাত্য দেশে Gesta Romanarum প্রভৃতি গ্রন্থে নব কলেবর গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে শেক্সপীয়র এই রূপকথা অবলম্বন করিয়া অ্যান্টোনিও ও শাইলকের কাহিনী ও চরিত্র রচনা করেন। আর একটি দৃষ্টান্তে সাহিত্যে একই কাহিনীর ক্রমপরিণতির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। কটাহারি (কাষ্ঠহারি) জাতকে রাজা ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে যাইয়া এক রমণীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং সহবাসের

ফলে সেই রমণী গর্ভিনী হয়। রাজা তাহাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং পরে পুত্র (বোধিসত্ত্ব)-সহ সেই স্ত্রী উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহা অসম্ভব নয় যে মহাভারতকার জাতক হইতে এই অস্বীকৃতির কাহিনী লইয়া বিশ্বামিত্র মেনকার দুহিতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্যন্তের বিবাহ এবং পুরুবংশীয় সার্বভৌম রাজা ভরতের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞানের উল্লেখ নাই। সুতরাং মহাভারতের কাহিনী হইতে গৃহীত নাও হইতে পারে। অনেক পরে কালিদাস 'বৌদ্ধ অভিজ্ঞান কাহিনী' ও মহাভারতের শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়া জাতকের অভিজ্ঞানকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া দুর্বাসার অভিশাপ, মহর্ষি মরীচির আশ্রমে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন প্রভৃতি সংযোজন করিয়া এমন একটি বাক্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে একই সঙ্গে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের রস আস্বাদন করা যাইতে পারে।

মহাভারতের কোন অংশ কখন রচিত হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং শিবির কাহিনী হইতে জাতক প্রাচীন নাও হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধধর্ম যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যখন জাতকের কাহিনী মুখে প্রচলিত ছিল। তখনকার কাহিনী হইতে কালিদাস অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আর একটি প্রভাবের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। সেই গর্বে পাশ্চাত্য জগতের বিদগ্ধ সমাজ প্রাচ্যদেশে উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় পাইলে তাহার উৎস পশ্চিমে অনুসন্ধান করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সুলেখক কিংলেক (A. W. Kinglake) Eothen-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অনুমান করিয়াছেন যে আরব্য উপন্যাস (Arabian Nights)-এর মত শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি প্রাচ্যদেশিয় কোনো গ্রন্থকারের মৌলিক সৃষ্টি হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহা পশ্চিমী কোনো সূত্র হইতে আহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু লোসক জাতক পড়িলে দেখা যায় যে, সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্র যাত্রার সঙ্গে মিত্রবিন্দকের অভিযানের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং আরব্য উপন্যাসের উৎস খুঁজিবার জন্য অনির্দেশ্য ইউরোপীয় কিংবদন্তী ও সাহিত্য অনুসন্ধান করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না। ঈশপের গল্প এবং বাইবেলে বর্ণিত যীশুর জীবনের কোনো কোনো কাহিনীর সঙ্গেও জাতকের কোনো কোনো গল্পের সাদৃশ্য আছে। এই সব সাদৃশ্য আলোচনা করিলে জাতকের প্রভাবের ব্যাপকতা অনুমিত হইবে এবং সাহিত্যসৃষ্টির ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যও প্রমাণিত হইবে।

নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ঈশানচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন

করিয়া সন্তান-সন্ততির জন্য সঙ্গতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বল্পায়ু সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই তাহা ভোগ করিতে পারে নাই। স্বীয় পল্লির উন্নয়নের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং প্রচুরতর অর্থের সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্বদেশ বিদেশ হইয়া যায়; তিনি জীবিতাবস্থায় যে সকল সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোনো চিহ্ন আছে কিনা সন্দেহ এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে প্রকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আট বৎসর বয়স্ক প্রিয় পৌত্রকে হারাইয়া শোকাপনোদনের জন্য তিনি যে বিরাট এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিবে।

বিমলচন্দ্রের পিতা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র কোনো বংশধর রাখিয়া যান নাই, তিনি কোনো বিরাট গ্রন্থও রচনা করেন নাই; পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি জাতকের অনুকরণে অনুবাদমালা রচনার জন্য যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া আছে, তাঁহার অসামান্য লাইব্রেরি তদীয় স্ত্রী তরুলতা বিদ্যাভিলাষীদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন; শুনিয়াছি অব্যবস্থার জন্য সেই অমূল্য, বহু ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, জীর্ণ এবং ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রেরা তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে যে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সমাজবিরোধীদের হাঙ্গামায় তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র বিমলচন্দ্র শয়নগৃহের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়া দুইটি শিশুসুলভ বাক্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী তরুলতা স্থপতির সাহায্যে সেই স্থানেই সেই বাক্য দুটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সান্নিধ্যের জন্য আমরণ সেই ঘরে বাস করিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী পর তাঁহাদের দুইজনেরই মৃত্যু হইলে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের সেই বাড়িই বিক্রি হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সেই স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যাপনার স্মৃতি এইভাবে মুছিবার নহে। তিরিশ বৎসর অধিককাল তাঁহার ছাত্রগণ ইহারা সবাই ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ নহেন যে আনন্দ ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া রহে নাই, আলাপে আলোচনায় তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাপনা বা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা গুরু-প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা পরবর্তীকালে হস্তান্তরিত করিয়াছেন। কালক্রমে সেই আলোকবর্তিকার আকার বদলাইতেছে, সেই শিক্ষাও যে পরিবর্তিত থাকিবে তাহা নহে। সুতরাং কালিদাস যে রাজা রঘু ও যুবরাজ অজ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'ন... বিভিদে প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' সেইরূপ সাদৃশ্য না

থাকিলে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অধ্যাপক ঘোষের শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারার মধ্য দিয়া অদৃশ্য, অনির্দেশ্যভাবে তাঁহার রসোপলব্ধির অধরা মাধুরী চিরস্থায়ী হইবে এবং এইভাবে তাঁহার বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবে।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

উপক্রমণিকা

জাতকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক ফৌসবোল সম্পাদিত 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক পালি গ্রন্থের জাতক-সংখ্যা ৫৪৭; তন্মধ্যে প্রথম ১৫০টি এই খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। 'জাতকার্থবর্ণনা' কেবল জাতকসংগ্রহ নহে; ইহাতে নিদানকথাকারে অতীত বুদ্ধগণের, বিশেষত গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত, প্রত্যেক জাতকের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথাসমূহের সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। গত দুই বৎসর নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে এই অনুবাদের কোনো কোনো আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তন্মাত্র পাঠ করিয়া জাতকরূপ সুবিশাল গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে অগ্রে দুই একটী স্থূল স্থূল কথা বলা আবশ্যক।

বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীতজন্ম বৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার বিভূতিসম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে পারেন না; তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্বনিবাসজ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান।[১] গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত কথাসমূহ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। তিনি মহাধম্মপালজাতক বলিয়া নিজের পিতাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকিন্নরজাতক বলিয়া যশোধরার পাতিব্রত্যধর্ম্ম যে পূর্ব্বজন্মসংস্কারজ তাহা বুঝাইয়াছিলেন এবং স্পন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম্ম ও সম্মোদমন এই পঞ্চ জাতক শুনাইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের বিরোধ নিবারণ করিয়াছিলেন।[২] প্রত্যেক জাতকই এইরূপ কোনো না কোনো বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল এবং উত্তরকালে গৌতমের

---

[১]। পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান কেবল অভিসম্বুদ্ধ-লক্ষণ নহে; যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরও এই ক্ষমতা জন্মে।

[২]। মহাধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫) ও স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এই পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে, এবং দদ্দভজাতক (৩২২) ও লটুকিকজাতক (৩৫৭) ৩য় খণ্ডে থাকিবে। সম্মোদমানজাতক (৩৩) এবং বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) প্রথম খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট।

শিষ্যগণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল আখ্যায়িকাও লোকহিতার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও খুদ্দকনিকায়েরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

জাতকার্থবর্ণনা পালি ভাষায় রচিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, ইহার উৎপত্তি-স্থান মগধে বা কলিঙ্গে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদদিগের বিচার্য্য। শব্দগত, উচ্চারণগত, এমন কি ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, ইহা উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচ্যভাষার জননীও হইতে পারে। অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্ব্বে ইহাতে যে কোনো গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রযত্নে শেষে ইহা নানারত্নের প্রসূতি হইয়াছিল। উত্তরে কপিলবাস্তু ও শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যা হইতে পূর্ব্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল গৌতমবুদ্ধের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আপামরসাধারণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করাই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মদেশনা করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ যত্নসহকারে তাঁহার বাক্যগুলি যথাসাধ্য অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধারণের ভাষা ছিল এরূপ অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত নহে। উত্তরকালে বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগের-চেষ্টায় পালির তদপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিপিটক, বিসুদ্ধিমাগ্গ, দীপবংস, মহাবংস, মলিন্দ পঞ্‌হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারে মহার্ঘ রত্ন।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা বলেন যে খ্রীষ্টের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট ধর্ম্মাশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র[১] যখন ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষে, কি কারণে বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাহ্মণ-কুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়া পালি ভাষায় উহাদিগের পুনরনুবাদ করেন। বিস্ময়ের কথা এই যে শেষে সৈংহল অনুবাদও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের

[১]। উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত।

পালি অনুবাদকেই মূলস্থানীয় করিয়া পূনর্ব্বার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, জাতকার্থবর্ণনাও বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইহা বোধহয় সত্য নহে। বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার ইহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব নামক অপর তিনজন পণ্ডিতের নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ-কর্ত্তৃক অনূদিত না হইলেও জাতকার্থবর্ণনা তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে পুনর্ব্বার লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

প্রত্যেক জাতকের তিনটী অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্ত্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে বা কোন প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটী প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা; ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধের অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্রদর্শন।

উল্লিখিত অংশবিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদের সমর্থক। যাঁহারা আত্মা মানেন না তাঁহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি?[১] বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি;[২] মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্ম তন্মুহূর্ত্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কর্ম্মকেই আত্মা বল না কেন? বৌদ্ধেরা উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম্ম তাহা নহে; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে; কিন্তু কর্ম্মও নশ্বর—বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান ধারণার পর কর্ম্মের লয় হয়; তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না; ইহারই নাম নির্ব্বাণ।[৩] জগতে আকাশ ও নির্ব্বাণ কেবল এই পদার্থ দুইটি নিত্য, অন্য সমস্ত

---

[১]। যাঁহারা আত্মা মানেন তাঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী। শাশ্বতবাদীদিগের মতে আত্মা অবিনশ্বর; উচ্ছেদবাদীরা বলেন, দেহের সঙ্গেই উহার বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধমতে এ জন্মেই বল, জন্মান্তরেই বল আত্মা নামে কোনো পদার্থ নাই।

[২]। প্রাণিভেদে স্কন্ধের তারতম্য ঘটে। যাঁহারা অরূপব্রহ্মলোকবাসী, তাঁহাদের রূপস্কন্ধ নাই।

[৩]। কেহ কেহ বলেন নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—উপাধিশেষ এবং নিরুপাদিশেষ। উপাধিশেষ নির্ব্বাণ ইহালোকেই লভ্য—ইহা বৈদান্তিকদিগের জীবন্মুক্তি। নিরুপাদিশেষ নির্ব্বাণের নামান্তর পরিনির্ব্বাণ। ইহা লাভ করিলে পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না।

অনিত্য।

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের জাতকমালা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টী মাত্র জাতক দেখা যায়।[১] কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টীই আদিজাতক এবং এই সমস্ত জানিতেন বলিয়া গৌতমবুদ্ধ 'চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্রিশটী জাতক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে; বিশেষত উদীচ্য বৌদ্ধদিগেরই মহাবস্তু নামক অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টী জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজ্‌সনও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টী জাতকবিশিষ্ট একখানি বৃহৎ জাতকমালা আছে। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে বুদ্ধের 'চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ' নাম আর্য্যশূর-রচিত জাতকমালার পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধশাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্র অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। ইহাতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু ইহাও বোধহয় স্থূলনির্দ্দেশ মাত্র। পালিগ্রন্থকারেরা বহুসংখ্যাদ্যোতনার্থ এক একটা স্থূলসংখ্যা নির্দ্দেশের বড়ই পক্ষপাতী। যিনি ধনী তিনি অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত; যিনি আচার্য্য তিনি পঞ্চশত-শিষ্যপরিবৃত; যিনি সার্থবাহ তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিতে যান। সম্ভবত এই অভ্যাসবশতই তাঁহারা জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতকার্থবর্ণনার ৫৪৭ জাতকেই দেখা যায় সূক্ষ্মভাবে গণনা করিলে এ সংখ্যা প্রকৃত নহে। উদাহারণস্বরূপ এখানে বর্ত্তমান খণ্ডের কুলায়জাতক (৩১) প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই একটী মাত্র জাতকে বোধিসত্ত্ব দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে এবং চারিটী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা কষ্টকল্পনা সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মুনিকজাতক (৩০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শালূকজাতক (২৮৬), প্রথম খণ্ডের মৎস্যজাতক (৩৪) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মৎস্যজাতক (২১৬), প্রথম খণ্ডের আরামদূষকজাতক (৪৬) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের

---

[১]। এই জাতকগুলির নাম—ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, উন্মাদয়ন্তী (উন্মদয়ন্তী), সুপারগ, মৎস্য, বর্ত্তকাপোতক, কুম্ভ, অপুত্র, বিস, শ্রেষ্ঠী (২য়), চুল্লবোধি, হংস, মহাবোধি, মহাকপি, শরভ, রুরু, মহাকপি (২য়), ক্ষান্তি, ব্রহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অয়োগৃহ, মহিষ, শতপত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও হস্তী এই চারিটী ব্যতীত অন্যগুলি জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায়; তবে আখ্যায়িকাগুলির নাম উভয়ত্র এক নহে; যেমন জাতকমালার শ্রেষ্ঠিজাতক পালিতে খদিরাঙ্গারজাতক (৪০); জাতকমালার যজ্ঞজাতক পালিতে দুর্মেধাজাতক (৫০)।

আরামদূষকজাতক (২৬৮), প্রথম খণ্ডের বানরেন্দ্র জাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কুম্ভীরজাতক (২২৪) প্রভৃতি কতকগুলি কথা উপাখ্যানাংশে এক, কেবল গাথার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন। আবার প্রথম খণ্ডের সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন (১১০), গর্দ্দভ-প্রশ্ন (১১১) ও অমরাদেবী-প্রশ্ন (১১২) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কৃকণ্ঠকজাতক (১৭০), শ্রীকালকর্ণীজাতক (১৯২) ও মহাপ্রণাদজাতক (২৬৪) কেবল সংখ্যাপূরণের জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ইহাদের উপাখ্যানাংশ জানিতে হইলে প্রথম পাঁচটীর জন্য মহাউন্মার্গজাতক (৫৪৬) এবং ষষ্ঠটীর জন্য সুরুচিজাতক (৪৮৯) পাঠ করিতে হইবে। একই খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতকের পুনরুক্তিও নিতান্ত বিরল নহে। প্রথম খণ্ডে ভোজাজানেয়জাতক (২৩) এবং আজন্নজাতক (২৪) একই আখ্যায়িকা; শুদ্ধ ভিন্নাকারে বর্ণিত। সেইরূপ প্রথম মিত্রবিন্দকজাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় মিত্রবিন্দকজাতকে (১০৪), পরসহস্রজাতকে (৯৯) এবং পরশতজাতকে (১০১), ধ্যানশোধনজাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রাভাজাতকে (১৩৫) পার্থক্য অতি সামান্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত 'জাতকে'র সংখ্যা, অর্থাৎ যে সকল কথায় বোধিসত্ত্ব এক একবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত সেইগুলি গণনা করিলে জাতকার্থবর্ণনার জাতক-সংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথাতে মহাগোবিন্দজাতকের নাম দেখা যায়; অথচ পরবর্ত্তী ৫৪৭টী জাতকের মধ্যে উহা স্থান পায় নাই। সুত্তপিটক প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতক আছে। ফলত জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই সকল আখ্যানের সঙ্কলন দ্বারা পণ্ডিতেরা নানা সময়ে নানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিব্বতদেশীয় বৃহজ্জাতকমালা এবং সিংহলের জাতকার্থবর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাতকার্থবর্ণনার সংগ্রাহক বোধহয় ৫৫০টী জাতকই লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কারণ প্রথম খণ্ডে প্রথম পঞ্চাশটী জাতকের শেষে তিনি 'পঠমো পঞ্ঞাসো' এবং দ্বিতীয় পঞ্চাশটীর শেষে 'মজ্ঝিম পঞ্ঞাসকো নিট্ঠিতো' এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন। জাতকের সংখ্যা ৫৫০ হইবে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে পঞ্চাশটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা সম্ভবপর হইত না।

যদি 'জাতকের' সংখ্যা গণনা না করিয়া আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতির সংখ্যা গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তুসমূহে ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে। এক

মহাউন্মার্গজাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পৃথিবীর নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেবল তাহা নহে; পরে প্রদর্শিত হইবে যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।

জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলি গাথার সংখ্যানুসারে ২২টী অধ্যায়ে বিভক্ত। যে সকল জাতকে একটীমাত্র গাথা আছে সেগুলি 'এক নিপাত' (এক নিপাঠ, অর্থাৎ এক শ্লোকের প্রবন্ধ) নামে অভিহিত। এইরূপ দুক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। প্রথম তেরটী নিপাতে ৪৮৩টী জাতক শেষ হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ১৩টী জাতক 'পকিণ্নক (প্রকীর্ণক) নিপাত'-ভুক্ত, কারণ ইহাদের গাথার সংখ্যার কোন বান্ধাবান্ধি নাই, কোনটীতে ১৫টী, কোনটীতে ৪৮টী পর্য্যন্ত গাথা দেখা যায়। ইহার পর সাতটী নিপাতের নাম যথাক্রমে বীসতি, তিংস, চত্তালীস, পঞ্ঞাস, সট্ঠি, সত্ততি ও অসীতি। যেগুলিতে ২০ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত গাথা আছে সেগুলি বীসতিপর্য্যায়ভুক্ত। এইরূপ তিংস ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে ৫৩৮ হইতে ৫৪৭ পর্য্যন্ত দশটী জাতক মহানিপাতের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই গাথার সংখ্যা শতাধিক।

এরূপ বাহ্যলক্ষণ দ্বারা অধ্যায় নির্দ্দেশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ ইহাতে আখ্যানগুলির বিষয়গত কোন ভাব ব্যক্ত হয় নাই, একই উপদেশাত্মক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার গাথার সংখ্যানির্দ্দেশে নিজেও যে ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা নহে। 'দশ নিপাতে' দেখা যায় কৃষ্ণ-জাতকের গাথার সংখ্যা দশ না হইয়া তের হইয়াছে। এইরূপ আরও কোন কোন জাতকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তথাপি পালি গ্রন্থকারেরা গাথার সংখ্যা দ্বারা অধ্যায় নির্ণয় করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ গাথাগুলিই প্রায় সর্ব্বত্র প্রবন্ধের বীজ বা প্রাণস্বরূপ।

আবার এক হইতে নবনিপাত পর্য্যন্ত দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটী 'বগ্গ' (বর্গ) গঠিত হইয়াছে। এক নিপাতে এইরূপ ১৫টী বর্গ আছে। ইহাদের কোন কোনটী স্ব স্ব শ্রেণীর প্রথম জাতকের নামে অভিহিত, যেমন অপণ্নক বগ্গ (১-১০); আবার কোন কোনটী বিষয়গত সাদৃশ্য লইয়া কল্পিত, যেমন সীলবগ্গ (১১-২০), ইত্থি বগ্গ (স্ত্রীবর্গ, ৬১-৭০); কিন্তু ইহাতেও যে ভ্রম প্রমাদ না আছে এরূপ বলা যায় না। স্ত্রীবর্গেই দেখা যায় কুদ্দালজাতকের সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী জাতকের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পাঠকদিগের অবগতির জন্য বর্গগুলি সূচিপত্রে পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত হইল।

একই জাতক সর্ব্বত্র এক নামে অভিহিত নহে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের তৈলপাত্রজাতককে স্থানান্তরে তক্ষশিলাজাতক বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ যাহা প্রথম খণ্ডে বানরেন্দ্রজাতক, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে কুম্ভীরজাতক আখ্যা পাইয়াছে। জাতকার্থবর্ণনার কচ্ছপজাতক ধম্মপদে বহুভাণিজাতক বলিয়া অভিহিত। বেরুট স্তূপেও একটী চিত্র বিড়াল-জাতক ও কুক্কুটজাতক উভয় নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ নামভেদের কারণ সহজেই বুঝা যায়। কোন কথার নামকরণ-সময়ে কেহ উহার উপদেশটীর দিকে লক্ষ্য করেন এবং 'সাধুতার পুরস্কার' এইরূপ কোন নাম দেন, কেহ বা কথাটীর পাত্রদিগের দিকে লক্ষ্য করেন এবং উহাকে 'কাঠুরিয়া ও জলদেবতা' এই নামে অভিহিত করেন। অন্য একজন হয়ত উহাকে 'অসাধু কাঠুরিয়া'ও বলিতে পারেন। বিরোচনজাতকটী নামকারকের ইচ্ছামত 'সিংহজাতক' বা 'শৃগালজাতক' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণাম' আখ্যাও পাইতে পারে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথার আদি শব্দ দ্বারা অভিহিত। উদাহরণস্বরূপ প্রথম খণ্ডের সত্যংকিলজাতক প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গাথাগুলিই জাতকের বীজ বা প্রাণস্বরূপ। ইহাদের ভাষা অতি প্রাচীন—এত প্রাচীন যে অংশবিশেষে দুর্ব্বোধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রাচীন সময়ে, আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের সারাংশ সচরাচর গাথাকারেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, গাথা শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটী, নয় তাহার উপদেশ বুঝিয়া লইত। এখনও দেখা যায়, 'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে, ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি', 'এক বুদ্ধিরহং ভদ্রে ক্রীড়ামি বিমলে জলে' প্রভৃতি শ্লোকের বা শ্লোকাংশের এবং 'পুনর্মুষিকো ভব', 'বিড়াল তপস্বী', 'বকোহহং পরমধার্ম্মিকঃ', 'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' ইত্যাদি বাক্যের বা বাক্যাংশের সাহায্যে কতপ্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

কোন কোন জাতকের গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষার ও ভাবের কোন প্রভেদ নাই; গদ্যাংশ যেন গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। ইহাতেও বোধহয় গাথার প্রণয়ন আখ্যায়িকাগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী। আখ্যায়িকার গাথাগুলি সন্নিবেশিত করিবার সময় অনবধানতাবশতঃ পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জাতকার্থবর্ণনা যখন সৈংহল অনুবাদের অনুবাদ, তখন প্রাচীন পালি গাথাগুলি অবিকৃত রহিল কিরূপে? ইহার কারণ বোধহয় এই যে ভিক্ষুসমাজে পালি গাথাগুলি পুরুষপরম্পারায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। অপিচ, সমস্ত গাথাই যে জাতকের নিজস্ব তাহাও নহে; ধম্মপদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও ইহাদের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল

গাথা জাতকের নিজস্ব, সেগুলিতে প্রায়শঃ আখ্যানটীর ধ্বনি আছে। বণ্ণুপথজাতকের গাথাতে সমস্ত আখ্যানটীই সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে উপদেশাংশ সংযোজিত হইয়াছে। আরও অনেক জাতকে এইরূপ দেখা যাইবে। উত্তরকালে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক শুদ্ধ আখ্যানের জন্যই রচিত হইয়াছে; যেমন কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা", "মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদগবঃ" ইত্যাদি। আবার কতকগুলি শ্লোক মহাভারত, শান্তিশতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও গৃহীত হইয়াছে।

ভাষা ও ভাবেও সমস্ত গাথা এক নহে, কোথাও ভাষা নির্দ্দোষ, ভাব কবিত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী; কোথাও ভাষা জটিল এবং ভাবের দৈন্যে নিকৃষ্ট, গদ্য অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত না হইলে এরূপ পার্থক্য ঘটিতে পারে না।

জাতকের অধিকাংশ গাথার বক্তা বোধিসত্ত্ব কিংবা অতীতবস্তু-বর্ণিত অন্য কোন প্রাণী; কিন্তু কোথাও কোথাও বুদ্ধপ্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে বুদ্ধ আখ্যানটী বলিতে বলিতে, কিংবা উহার উপসংহার-কালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ঐ গাথা বলিয়াছিলেন। ইহারা "অভিসম্বুদ্ধ গাথা" নামে অভিহিত।

জাতকের প্রাচীনত্ব

জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতকই যে গৌতমবুদ্ধ কর্ত্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না। আখ্যানগুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তি-দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখা যায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়; তাহাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ-দেবতাদিরূপে ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প-শৃগাল-কাক-পেচক-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদির প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন; তিনি রসজ্ঞ হইলে ইহাদের চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কথা রচনা করিতেন, ঐ সকল কথা দ্বারা কখনও সভা-সমিতিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন, কখনও মানব হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকল্প প্রতিবেশীদিগকে সাধুতা, প্রভুপরায়ণতা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি সহজ ধর্ম্মগুলি শিক্ষা

দিতেন।

ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিরও উন্নতি হইল, পশুপক্ষীর পর ভূত, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত ও প্রকৃত প্রাণী এবং জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়পাত্র, কাংস্যপাত্র প্রভৃতি নির্জীব পদার্থও কুশীলবরূপে দেখা দিল, সাধুতা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রভৃতি অনেক জটিল ধর্ম্ম তাহাদের উপদেশের বিষয়ীভূত হইল। যে কথা অল্পে অধিকভাব ব্যক্ত করিত, হাসাইয়া কান্দাইত বা কান্দাইয়া হাসাইত, তাহাই অধিক চিত্তগ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুক্ত-বিচারণা ছিল না; কোন অংশ স্বাভাবিক, কোন অংশ অস্বাভাবিক লোকে সে দিকে লক্ষ্য করিত না। ব্যাঘ্র কখনও কঙ্কণ পরিধান করে কি না, ব্যাঘ্রে চান্দ্রায়ণব্রত করিতেছে এ কথা কখনও মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি না, লোকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না; মোটের উপর কথাটী রসযুক্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। রচকদিগেরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাইত; তাঁহারা ব্যাঘ্রদ্বারা মহাভারতের বচন আবৃত্তি করাইতেন, বিড়ালকে তপস্বী সাজাইয়া তাহার মুখে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন।

এইরূপে কত কথার উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যেগুলি সরস ও সারগর্ভ লোকে তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিত; যেগুলি অসার ও নীরস তাহা উৎপত্তির পরেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইরূপে বহুকথার উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু সকল দেশে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভারতবর্ষে এবং গ্রীস দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; এখনও এদেশেই কত মজ্‌লিশি গল্প বা খোসগল্প কেবল লোকের মুখে মুখে চলিতেছে।

শুদ্ধ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কেন, তর্কশাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাজাবন্ধন-ন্যায়, অর্দ্ধজরতী-ন্যায়, অন্ধ-হস্তি-ন্যায় প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রে কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতক (১৪৯), বাজাববাদজাতক (১৫১), বর্দ্ধকিশূকরজাতক (২৮৩), প্রভৃতি রাজনীতিমূলক পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থদ্বয় রাজকুমারদিগেরই শিক্ষাবিধানার্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায়, গ্রীসে ও রোমে কথার প্রভাবে সময়ে সময়ে রাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। ঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার কথা বলিয়া রাজদ্রোহাভিযুক্ত এক ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন; মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদ ও তাহার পরিণাম শুনাইয়া প্রাচীন রোমের কুলীন সম্প্রদায়দ্বেষী জনসধারণকে বশে

আনিয়াছিলেন।

কথাসমূহ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে বেদচতুষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাদেরও কোন কোন অংশে কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। অনেকে মনে করেন ঋগ্বেদে (১০/২৮/৪) ক্ষুদ্রকায় মৃগকর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহের প্রাণনাশসংক্রান্ত কথার ধ্বনি আছে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার আভাস ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়।[১] রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা মহাভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ সমস্ত গ্রন্থই গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি লক্ষ্য করিয়াই গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ সেগুলিকে ধর্ম্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়া ছিলেন। উত্তরকালে যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরাও প্রচলিত গ্রাম্য কথাবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধেরা যে সকল প্রচলিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে পশু বা মনুষ্য বা দেবতা দান-ত্যাগ-শৌর্য্য-বীর্য্যাদি কোন বিশিষ্টগুণে অলঙ্কৃত বলিয়া আখ্যানের নায়ক-স্থানীয়, সে বোধিসত্ত্বের পদ লাভ করিত এবং তাহার শত্রু, মিত্র ও সহচরগণ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পারিপার্শ্বিকরূপে কল্পিত হইত।[২]

---

[১]। ঠিক এইভাবে না হউক, এই আকারে গঠিত একটী গল্প প্রাচীন মিশরে ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের গল্পটী বোধহয় খ্রীষ্টের বার তের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

[২]। কতটী জাতক কোথায় কথিত হইয়াছিল এবং অতীতবস্তুতে বোধিসত্ত্ব কতবার কি বেশে দেখা দিয়াছেন, কেহ কেহ গণনাদ্বারা তাহা এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

কথনস্থানানুসারে—জেতবন বিহারে ৪১০টী জাতক, বেণুবনে ৪৯টী, শ্রাবস্তীতে ৬টী, রাজগৃহে ৫টী, কৌশম্বীতে ৫টী, কপিলবাস্তুতে ৪টী, বৈশালীতে ৪টী, আলবীতে ৩টী, কুণ্ডলদহে ৩টী, কুশিনগরে ২টী, মগধে ২টী, সট্‌ঠিবনে ১টী, দক্ষিণগিরিতে ১টী, মৃগদাবে ১টী, মিথিলাতে ১টী এবং গঙ্গাতীরে ১টী। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮টী জাতক কথিত হইয়াছিল এইরূপ দেখা যায়।

বোধিসত্ত্ব ৮৫টী জাতকে রাজা, ৮৩টীতে ঋষি, ৪৩টীতে বৃক্ষদেবতা, ২৬টীতে আচার্য্য, ২৪টীতে অমাত্য, ২৪টীতে ব্রাহ্মণ, ২৪টীতে রাজপুত্র, ২৩টীতে ভূম্যাধিকারী, ২২টীতে পণ্ডিত, ২০টীতে শুক্র, ১৮টীতে বানর, ১৩টীতে শ্রেষ্ঠী, ১২টীতে আঢ্যলোক, ১১টীতে মৃগ, ১০টীতে সিংহ, ৮টীতে রাজহংস, ৬টীতে বর্ত্তক, ৬টীতে হস্তী, ৫টীতে কুক্কুট, ৫টীতে দাস, ৫টীতে গৃধ্র, ৪টীতে অশ্ব, ৪টীতে গো, ৪টীতে ব্রহ্মা, ৪টীতে ময়ূর, ৪টীতে সর্প, ৩টীতে কুম্ভকার, ৩টীতে নীচজাতীয় লোক, ৩টীতে গাধা, ২টীতে মৎস্য, ২টীতে গজচালক, ২টীতে মূষিক, ২টীতে শৃগাল, ২টীতে কাক, ২টীতে কাষ্ঠকুট্টক, ২টীতে চোর, ২টীতে শূকর এবং এক একটীতে

অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই 'অতীতে বারাণসিয়াম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে' এইরূপ ভণিতা আছে।[১] আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও অনেক গল্পে 'খলিফা হারুণ উর্ রসিদের রাজত্বকালে' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। হারুণ উর্ রসিদ ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তি, অস্মদ্দেশীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শ মহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন; অতএব কথার মনোহারিত্ব সম্পাদনের জন্য লোকে যে তাহার সহিত এবংবিধ লোকরঞ্জক ভূপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতকের ব্রহ্মদত্ত কে?

বৌদ্ধমতে গৌতমের পূর্ব্বে বহু কল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের নাম কাশ্যপ। কাশ্যপ সম্বন্ধে বৌদ্ধসাহিত্যে এই বর্ণনা দেখা যায়—তাঁহার জন্মস্থান বারাণসী এবং পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার দেহ দ্বাবিংশতিহস্ত-পরিমিত এবং আয়ুষ্কাল বিংশতিসহস্র বৎসর, ইত্যাদি। এই ব্রহ্মদত্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত কি এক?

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেব্রিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি রোম্সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের পুত্রের শিক্ষাদানার্থ গ্রীকভাষায় প্রায় তিন শত কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইনি নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে লীবিয়া দেশের প্রাচীন কথাকারের নাম কৈবিসেস্।[২] বেব্রিয়াসের বহু পূর্ব্বে এরিষ্টটলও লীবিয়াদেশজ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথার কোন কোনটী জাতক কেবল দেশকালভেদে সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল; খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল হইতে বৌদ্ধদূতেরাও আলেকজান্দ্রিয়া নগরে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক জাতককথা প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা যখন ঐ সকল কথা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা উহাদিগকে লীবিয়াদেশজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবিসেস্ কে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে কুবসিস্ নামক যে কথাকারের উল্লেখ দেখা যায় তিনি এবং বেব্রিয়াসের কৈবিসেস্ একই ব্যক্তি এবং ভাষাভেদে উচ্চারণ-প্রভেদ বিবেচনা করিলে কৈবিসেস্ এবং কাশ্যপ এই নামদ্বয় অভিন্ন। অতএব কোন কোন জাতক এত

কুক্কুর, বিষবৈদ্য, ধূর্ত্ত, বর্দ্ধকী, কর্ম্মকার ইত্যাদিরূপে বর্ণিত। এই গণনায় ৫৩০টী জাতক পাওয়া যায়।

একই জাতক কোথাও কোথাও সংখ্যাপুরণের জন্য ২/৩ বার ধরা হইয়াছে বলিয়া উভয়ত্রই নির্দ্ধারিত সংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইয়াছে।

[১] । ৫৪৭ জাতকের মধ্যে ৩৭২টীর ঘটনা বারাণসী রাজ্যে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত।

[২] । Kybises.

প্রাচীন যে তাহারা গৌতমের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্যপবুদ্ধ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছিল। এই কারণেই উল্লিখিত অনুমাতাদিগের মতে কাশ্যপের পিতা ব্রহ্মদত্তের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক জাতকারম্ভ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অনুমানপরম্পরা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ—গৌতমের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান। কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সহিত বারাণসীর সম্বন্ধস্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অপিচ, কাশ্যপ বুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধহয় 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত' একটী কল্পিত নাম মাত্র। সকল দেশেই একটা না একটা মামুলিভাবে কথা আরম্ভ করিবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেরা 'একদা' (Once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বসময়ে' দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জাতকাখ্য সমস্ত কথার প্রথম রচক না হইলেও বৌদ্ধেরাই যে এদেশে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের[১] জাতকগুলির কথা বলা হইয়াছে। চরিয়াপিটকে ৩৫টী জাতক দেখা যায়; ইহাদের দুই একটী ব্যতীত অন্য সমস্তই জাতকার্থবর্ণনার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতমের দেহত্যাগ ঘটিলে সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকত্রয় তাহাতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান না; কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে) বৈশালীতে যে সঙ্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিটকগুলি অধিকাংশ বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব শেষোক্তমতের অনুসরণ করিলেও দেখা যায় জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য্য খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগরাদি সে দিনের গ্রন্থ মাত্র।

অপিচ, অনেকগুলি জাতকের উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপণ্নকজাতক, ন্যগ্রোধমৃগজাতক, খদিরাঙ্গারজাতক, লোশকজাতক, নক্ষত্রজাতক, মহাশীলবজ্জাতক, শীলবণ্নাগজাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুটিত যে তাহাদিগকে বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত মনে

[১]। দীর্ঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায় ও সংযুক্তনিকায় সুত্তপিটকেরই শাখা। এই সকল গ্রন্থেও কোন কোন জাতক দেখা যায়। জাতক (১ম)—৪

করা যায় না। তবে জাতকার্থবর্ণনার অধিকাংশ কথার কোন কোনটী বৌদ্ধ সময়ে, কোন কোনটী গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাদের কোন কোন কথা মহাভারতে দেখা যায়; দশরথ জাতকটী ত একখানি ছোটখাট রামায়ণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন, মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, 'কে বলিল রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? মহাভারতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে তদন্তর্গত জাতকাসাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ-আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতেই বল, বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেই বল, বর্ণনাচাতুর্য্যে, ভারমাধুর্য্যে ও চরিত্র বিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না কি যে জাতক-সংগ্রহকালে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সকল আখ্যানের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল; শেষে বাল্মীকিব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্পপল্লবের বিকাশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জন্মিয়া ও পচিয়া ভূমির সসারতা সম্পাদনা করিলে তাহাতে শেষে শালতালাদি মহাবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের পরে তাহাদের সঞ্চয়সমবায়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবির্ভাব ও পুষ্টিসাধন ঘটে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাণ্ডে প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রাচীন কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়মে রামপণ্ডিতের ও কাষ্ঠহারিণীর কথা রামায়ণে ও শকুন্তলাবৃত্তান্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মেই লিয়ারের ও ম্যাক্‌বেথের কথা সেক্‌সপিয়ার প্রণীত তত্তন্নামধেয় নাটকে কাব্যোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধহয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে শ্রোতার ও পাঠকের মনে

বিরক্তিরই উদ্রেক হয়; তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায় বৌদ্ধেরা রামায়ণ ও মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহাদের আদিগুরু গৌতমও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রামায়ণের ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।'[১]

জাতক যে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্তৎস্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যেমন পুরাণ-শ্রবণে নিরক্ষর লোকে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধদেশেও জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া থাকে। সিংহল প্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করিবার সময় জাতক-শ্রবণ একরূপ নিত্যকার্য্য। এদেশের শিশুরা সন্ধ্যার পর যেমন উপকথা শুনে, সিংহলের শিশুরাও সেইরূপ জাতক-কথা শুনিয়া থাকে। শিশুরা শুনে,

---

[১]। আশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ দেখা যায়। উহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত, অতএব গৌতম-বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। অধ্যাপক মাক্‌ডনেল বলেন যে মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বৃত্তান্ত এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; তবে শিবি রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি কোন কোন গল্প এতদূর বৌদ্ধভাবাপন্ন যে মনে হয় সেগুলি উত্তরকালে জাতকাদি গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায় বটে; কিন্তু উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথজাতকের সহিত রামায়ণের অ্যাখ্যানের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? 'দস বস্‌স-সহস্‌সানি সটঠি বস্‌স-সতানি চ কম্বুগীরো মহাবাহু রামো রাজ্যং অকারয়ি' দশরথজাতকের এই গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামরাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মালোকং প্রযাস্যতি)। কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?

ঘটজাতকটী একখানা ছোট খাট ভাগবত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণচরিত্র যে তাতে বর্ণিত আছে, ঘটজাতকে তাহার সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, ভাগবত যে জাতকের বহুপরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জাতককারদিগের সময়েও যে কৃষ্ণের বাল্যলীলা লোকসমাজে সুবিদিত ছিল ইহা হইতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল জাতকরচনাকালে কেন, মহাকবি ভাষের সময়েও কৃষ্ণলীলা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঘটজাতকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বৃদ্ধেরাও শুনেন। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহকজাতক শুনিলে শিশুর মুখে হাস্য দেখা দেয়; বিশন্তরজাতক বা শিবিজাতক শুনিলে বৃদ্ধের চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

যখন বৌদ্ধপ্রভাব ছিল তখন ভারতবর্ষে আপামরসাধারণ সকলেই জাতক-কথা জানিত। বেরুটে যে বৌদ্ধস্তূপ আছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের চিত্র শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের কোন কোন চিত্রের পার্শ্বে তত্তৎ জাতকের নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে উক্ত স্তুপের নির্ম্মাণকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, ঐ সকল জাতক লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। হর্ষচরিতে বাণভট্ট বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর মিত্রের আশ্রমবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তত্রত্য পেচকগুলি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিসত্ত্বজাতকসমূহ জপ করিতে শিখিয়াছি। শেষে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে তখন জাতকগুলির বৌদ্ধভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদিগের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি বা এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব

রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক-কথা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি 'বৃহৎকথা' নাম দিয়া পৈশাচী ভাষায় এক বৃহৎ কথাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। অন্ধ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের শাতকর্ণি গোত্রে জন্ম ব্রাহ্মণত্বের প্রতিপাদক। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না, তবে তাঁহাদের অনেকেই যে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের হিতার্থে বহু দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ কতিপয় অনুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কিরূপ ছিল তাহাও জানা অসম্ভব, কারণ উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথার নাম দেখা যায়; তাহার পর ইহা যে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধহয় না। হর্ষচরিতে বৃহৎকথার 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই বিশেষণদ্বারা রচকের হিন্দুভাবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন করিয়াই কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে।

বৃহৎকথার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ-জাতক হইতে এবং অনেকগুলি সম্ভবতঃ বৃহৎকথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতবর বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল; তখন ইহার নামও বোধহয় স্বতন্ত্র ছিল; শেষে কি কারণে বলা যায় না, পাঁচটী অংশ পৃথক্ হইয়া পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।[১] বেন্‌ফির মতে পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধগ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক জাতকের আখ্যান আছে; জাতকের ন্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্য-পদ্য মিশ্রিত; এমন কি কোথাও কোথাও পালি গাথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত। অধিকন্তু কোন কোন আখ্যানের বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটাক্ষও লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকডনেল কিন্তু বলেন যে পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন। আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থারম্ভে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লোকচরিত্রের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। দোষী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র। আরও একটী কথা এই যে যদি তিনি বৌদ্ধ হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমূলক কথাগুলি হইতে বোধিসত্ত্বকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধজাতকের নিকট ঋণী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশল অতিসুন্দর। তাঁহার হাতে পড়িয়া বকজাতক, বানরেন্দ্রজাতক, কূটবাণিজজাতক, মিতচিন্তিজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সরস ও চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথক্‌ভাবে কথিত নহে; এক একটী তন্ত্রে এক একটী কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতালপঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি, আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবন্ধ না থাকিলে বোধহয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পারস্যরাজ খস্‌রু নসীরবানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক এবং

---

[১]। কেহ কেহ বলেন আদিম অবস্থায় এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ 'করটক ও দমনক' নামে অভিহিত হইত এবং এরূপ পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের লোকে এই নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন। করটক ও দমনক পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত দুইটী শৃগালের নাম।

আরবী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহার নাম সিরিয়াক ভাষায় 'কলিলগ ও দমনগা' এবং আরবীভাষায় 'কলিলা ও দিমনা।' ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরববাসীরা মনে করিতেন কলিলা ও দিমনার আদিরচক বিদ্‌পাই (বিদ্যাপতি)। এই বিদ্‌পাই শব্দ অপ্রভ্রষ্ট হইয়া শেষে 'পিল্‌পাই' বা 'পিল্লে' হইয়া পড়ে; কাজেই য়ুরোপবাসীরা যখন কলিলা ও দিমনা স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি য়ুরোপখণ্ডে 'পিল্পের গল্প' নামে প্রচারিত হইল। হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্পের গল্প নামে পরিচিত। ইহাতে বোধহয়, পহ্লবী ভাষায় যে গ্রন্থের অনুবাদ হয় তাহা আদিম দ্বাদশ খণ্ডাত্মক 'পঞ্চতন্ত্রের' অংশ। উত্তরকালীন অনুবাদকেরা ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গল্পগুলিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। হিতোপদেশকে পঞ্চতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের প্রয়োগ অধিক এবং সেই সকল শ্লোকের অধিকাংশই সুরচিত ও উৎকৃষ্টভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশেও অনেক জাতককথা পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র 'মঞ্জরী' নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। ন্যক্ক নামক জনৈক বৌদ্ধবন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামঞ্জরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটি তন্ত্র আছে, সমগ্র বেতালপঞ্চবিংশতিখানি আছে, শিবিরাজের ও বাসবদত্তের কথা আছে, আরও কত শত কথা আছে। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল জাতককথা দেখা যায়, কথাসরিৎসাগরে তাহার অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে চুল্লশ্রেষ্ঠীজাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোমদেব ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি আখ্যায়িকা সংগ্রহ আছে। জৈনেরাও কথাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে 'অবদান' নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথাভাণ্ডার।

অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বলিলে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায়; 'অবদান' বলিলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগেরও অতীত জন্মবৃত্তান্ত বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান খণ্ডে চুল্লশ্রেষ্ঠীজাতকের এবং লোশকজাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু অবদানস্থানীয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাহাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত সেগুলি জাতকস্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব

বিদেশের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস গ্রীস দেশের ঈষপ নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে ঈষপ নামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল। যে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল কথা ঈষপের গল্প বলিয়া ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি বা অপরের রচনা।

গ্রীকসাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে।[১] তদনুসারে ঐ কথাকার খ্রীষ্টীয় প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌতম-বুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন; তিনি সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং য়্যাড্‌মন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষি সম্বন্ধে কথা রচনা করিতে তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ডেল্‌ফাই নগরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোকচরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীসদেশে অনেকে বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ রাজপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কোন কথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈষপ তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূতা দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন।

কিন্তু প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে কোন কোনটী ঈষপ প্রণীত তাহা কিরূপে বলা যাইবে? খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত এরিষ্টটল তাঁহার অলঙ্কারসংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া দুইটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—একটী অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার সম্বন্ধে।[২] ইহাদের মধ্যে প্রথমটী তিনি

[১]। ২/১৩৪ (হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টেয় প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

[২]। (১) হরিণ মাঠের ঘাস খাইতে দেখিয়া অশ্ব তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে; মানুষ অশ্বের মুখে বল্গা দিয়া এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল;

ষ্টেসিকোরাশ-প্রণীত (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টী ঈষপ প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান, সময়ে দুইটীই ঈষপের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীসদেশে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেসিয়ডের কাব্যে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০) বুলবুল পক্ষীকে অবলম্বন করিয়া রচিত একটী কথা দেখা যায়; এর্কিলোকাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৭০০), সোলন (খ্রীঃ পূঃ ৬০০), এলসিউস্ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) প্রভৃতিও কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ঈষপের পূর্ব্ববর্ত্তী। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১ম প্রকরণে) একটী কথা দিয়াছেন; উহা পারস্যরাজ সাইরাস্ গ্রীকদূতদিগকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে ইহা বলিলেই বোধহয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা যে সকল কথা ঈষপের গল্প নামে পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতিবশতঃ উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈষপ-রচিত বলিয়া কল্পিত।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক সাহিত্যেও কতিপয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ডেমক্রিটাস্ বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটোবর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই আমরা বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই। কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্গহজাতকের (৩৭৪) রূপান্তর। গ্রীক কথায় দেখা যায় কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল; ইহা কিন্তু অস্বাভাবিক। জাতকে (এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্চতন্ত্রে) দেখা যায় শৃগাল নদীতটে মাংস রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে শকুনে উহা লইয়া যায়; ইহা স্বাভাবিক। সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথাও সিংহচর্ম্মজাতকের (১৮৯) অনুরূপ। গ্রীক গল্পে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না; কিন্তু বৌদ্ধগল্পে দেখা যায় গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত।

কিন্তু তদবধি অশ্ব মানুষের দাস হইল। (২) শৃগাল নদী পার হইবার সময় স্রোতোবেগে নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল; সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোক লাগিল। সজারু তাহার কষ্ট দেখিয়া জোকগুলি তুলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু শৃগাল বলিল 'না ভাই, তুমি তুলিয়া কাজ নাই। ইহারা যতদূর সাধ্য রক্ত খাইয়াছে; ইহাদিগকে ফেলিয়া দিলে আর এক আসিয়া জুটিবে।'

অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের রচনা পদ্ধতিতে ভারতবর্ষীয় কথাকারেরাই অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; বিশেষতঃ সিংহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট যত পরিচিত ছিল, গ্রীকদিগের নিকট তত ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে এ কথা বলা যাইতে পারে কি না যে উক্ত কথা দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই গ্রীসে গিয়াছিল? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে হেরোডোটাস্ একটী আখ্যায়িকাকে পারস্যদেশ হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পশুপক্ষি প্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একরূপ কেন, সাধারণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ দেশীয় কথাসংগ্রাহক গ্রীক ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায় যখন একত্র বাস করিতেন, তখনই এই সকল সাধারণ কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বলেন শুদ্ধ আর্য্যসম্প্রদায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে কেন? আর্য্যেতর জাতিদিগের মধ্যেও ত এই সকল সাধারণ কথার প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও একইরূপ কথা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যদি এগুলি আর্যজাতির আদিম বাসভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ কি? তাঁহারা বলেন, মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পর্য্যবেক্ষণশীল মানব সকল দেশেই কাকের লৌল্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, সিংহের সাহস প্রভৃতি দোষগুণ দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিয়তাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া কথা রচনাপূর্ব্বক সমসাময়িক লোকের চরিত্র সমালোচনা করিত বা জনসাধারণকে উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবেও যে একরূপ কথার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা আর বিচিত্র কি? বেনফি বলেন, অন্য আখ্যান সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাধারণ কথায় কেবল পশুপক্ষ্যাদির উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে রচিত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও বর্ণনাগত এত সাদৃশ্য থাকিত না। কাকের স্তুতিবাদ করিয়া তাহাকে কথা বলাইতে হইবে, নচেৎ জম্বুফল বা ক্ষীরের মিঠাই পাইব না, শৃগালের এই বুদ্ধি, হৃৎপিণ্ডটা গাছে রাখিয়া আসিয়াছি বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মর্কটের আত্মরক্ষা, হংসদিগের সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গমন এবং কথা বলিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু—এরূপ সৌসাদৃশ্য আদানপ্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার নিদর্শন নহে।

আদান প্রদানের কথা তুলিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। গ্রীক জাতি যে স্বাধীনভাবে কতকগুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যেসকল গ্রীককথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ তাহার বিচার করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক কোন

সময়ে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন? সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতের ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর। ঐ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দরায়ুস পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জারক্সেস্ও গ্রীস জয় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। দরায়ুসের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সাইরাস প্রভৃতির রাজত্বকালে পারস্য রাজসভায় গ্রীক ও হিন্দু উভয় জাতিরই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী গ্রীস জয় করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষীয় ভৃতিভুক সৈনিক ছিল। জারক্সেসের পুত্র আর্টাজারাক্সেসের সভায় টিসিয়াস্ নামক একজন চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত ও অনেক অপ্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গৌতম বুদ্ধের সময়, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বেও গ্রীকেরা অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমক্রিটাস ও প্লেটো যে পূর্ব্ববর্ণিত কথা দুইটীর জন্য পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের নিকটই ঋণী ইহা বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা লোকমুখে এই কথা দুইটী শুনিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেক্জাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষ্যে গ্রীক ও হিন্দুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অতঃপর বৌদ্ধপ্রচারকদিগের চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৌদ্ধপ্রচারকেরা য়ুরোপখণ্ডেও ধর্ম্মদেশন করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টের জন্মের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অগাষ্টাস্ সীজারের রাজত্বকালে ভৃগুকচ্ছনিবাসী একজন শ্রমণকাচার্য্য এথেন্স নগরে অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। গ্রীকেরা এই অদ্ভুত-কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিতার উপর একটা সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রীকদিগের সর্ব্বপ্রাচীন কথাসংগ্রহ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরে সম্পাদিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বিখ্যাত পুস্তক-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাতা ডেমিট্রিয়াস, ফেলিরিয়ুস এই সংগ্রহের কর্ত্তা। ইনি প্রায় দুই শত কথা সংগ্রহ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সেগুলিকে ‘ঈষপের কথা’ নাম দিয়া প্রচার করিয়া যান। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিড্রাস নামক একজন গ্রীক ঐ কথাগুলি লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য কথাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ফিড্রাসের অনুবাদই এখন অবিকৃতভাবে বা ঈষৎপরিবর্ত্তিত আকারে ঈষপের গল্প বলিয়া প্রচলিত।

এদিকে বাণিজ্যাদির উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের লোকের সহিত মিশরের লোকের মিশামিশি হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষজাত অনেক কথা মিশরে প্রচলিত

হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকেরা সেগুলিকে কৈবিসেস্ (কাশ্যপ)-প্রণীত বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ফিড্রাস-সংগৃহীত ঈষপ এবং এই সকল প্রাচ্যকথা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিকষ্টেটাস নামক এক ব্যক্তি এক কথাকোষ প্রচার করেন এবং ইহারও কতিপয় বৎসর পরে বেব্রিয়াস্ নামক একজন রোমকলেখক উক্ত উভয়বিধ কথা অবলম্বন করিয়া গ্রীকভাষায় আর একখানি পদ্য ঈষপ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রায় তিনশত গাথা আছে।

এইরূপে অনেক জাতক ও ভারতবর্ষজাত অন্যান্য কথা য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।[১] বেব্রিয়াস্ প্রভৃতি যে প্রাচ্যের আদর্শে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার অপর একটী প্রমাণ প্রত্যেক কথার শেষে তাহার উপদেশ-ব্যাখ্যা। এই প্রথা জাতকার্থবর্ণনাদিতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু ইহা রচনানৈপুণ্যের পরিচায়ক নহে। যে কথা সুরচিত, তাহার উপদেশ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; স্বতন্ত্রভাবে তাহার উপদেশ শুনাইতে গেলে

---

[১]। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী জাতকের এবং তথাকথিত ঈষপের কয়েকটী আখ্যানের নাম করা যাইতেছে—

জাতক	ঈষপ	
মুণিজাতক (৩০)	যণ্ড ও গোবৎস	(The Ox and the Calf).
নৃত্যজাতক (৩২)	কিকি ও ময়ূর	(The Jay and the Peacock).
মশকজাতক (৪৪)	খল্লাট ও মক্ষিকা	(The Baldman and the Fly).
সুবর্ণহংসজাতক (১৩৬)	স্বর্ণডিম্বপ্রসবিণী হংসী	(The Goose with golden eggs).
সিংহচর্ম্মজাতক (১৮৯)	সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ	(The Ass in a lion's skin).
কচ্ছপজাতক (২১৫)	কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী	(The Eagle and the Tortoise).
জম্বুজাতক (২৯৪)	কাম ও শৃগাল	(The Crow and the Fox).
জবশকুনজাতক (৩০৮)	নেক্ড়ে বাঘ ও বক	(The Wolf and the Crane).
চুল্লধনুর্গ্রাহজাতক (৩৭৪)	কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব	(The Dog and the Shadow).
কুক্কুটজাতক (৩৮৩)	শৃগাল, কুক্কুট ও কুক্কুর	(The Fox, the Cock and the Dog).
দ্বীপিজাতক (৪২৬)	নেক্ড়ে বাঘ ও মেষশাকব	(The Wolf and the Lamb).

জাতকের সিংহ বা দ্বীপী ঈষপে নেক্ড়ে বাঘ; জাতকের হংস ঈষপে ঈগলপক্ষী, জাতকের ছাগী ঈষপে মেষশাবক, জাতকের কাষ্ঠকুট্ট ঈষপে বক, এইরূপ সামান্য প্রভেদ থাকিলেও উপাখ্যানাংশে ইহারা একরূপ। এক প্রাণীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রাণীর উল্লেখ দেশভেদে স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশে সকল প্রাণী নাই। তথাপি পাশ্চাত্য কথাকারেরা ময়ূর, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত প্রাণীদিগকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষজাত অন্য যে আখ্যানগুলি 'ঈষপে' স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক। উদাহরণস্বরূপ ঈষপের কুক্কুট ও মুক্তা, কৃষক ও কৃষ্ণসর্প, সহরের ইন্দুর ও পাড়াগাঁয়ের ইন্দুর, শৃগাল ও ঈগলপক্ষী, কাক ও ঈগলপক্ষী, সিংহ ও মূষিক, যণ্ড ও ভেক ইত্যাদি কথার নাম করা যাইতে পারে।

পুনরুক্তি ও রসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেরা, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটা না একটা উপদেশ যোজনা করিয়া কথাগুলিকে নিরর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্যেরাও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকন্তু মূলের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় না থাকায় পাশ্চাত্য লোকেরা উপদেশ-ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কচ্ছপজাতকে বাচালতার পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু তথাকথিত ঈষপের সংগ্রাহক ইহা ধরিতে পারেন নাই।

কেবল উপদেশ-যোজনার প্রথা নহে, ছবিদ্বারা কথাগুলি লোকের প্রত্যক্ষীভূত করিবার রীতিও য়ুরোপবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেরুটস্তুপের ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তরকালে বিদ্‌পাই এর গল্প প্রভৃতিতে আরববাসীরাও ছবি ব্যবহার করিতেন এবং য়ুরোপবাসীরা এই সমস্ত গ্রহণ করিবার সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলির অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল করিয়া লইতেন।

প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচারকদিগের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং অনেক জাতককথা ইহুদি প্রভৃতি জাতির সুবিদিত হইয়াছিল। বাইবলের পূর্ব্ব খণ্ডে[১] সলোমনের অদ্ভুত বিচারপটুতা সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। দুই গণিকা একটী বালক লইয়া বিবাদ করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বলে বালকটী তাহার গর্ভজাত সন্তান। সলোমন তরবারি হস্তে লইয়া প্রস্তাব করিলেন, বালকটীকে দুই খণ্ড করিয়া দুইজনকে দেওয়া যাউক। যে প্রকৃত জননী নহে সে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল; কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী বলিল, ‘কাটিয়া কাজ নাই; আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীই বাছাকে লইয়া যাউক।’ মহা-উন্মার্গ জাতকেও বোধিসত্ত্বের বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকায় বর্ণনা আছে। এক যক্ষিণী ও এক মানবী একটী শিশু লইয়া উক্তরূপে বিবাদ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। বোধিসত্ত্ব মাটিতে একটী রেখা আঁকিয়া তাহার উপর শিশুটীকে রাখিয়া দিলেন এবং বিবদমানা রমণীদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা শিশুটীর পা ধরিয়া টান, যে উহাকে নিচের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে সেই উহার গর্ভধারিণী বলিয়া স্থির হইবে। কিন্তু রমণীদ্বয় শিশুটীর পা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রকৃত গর্ভধারিণী কান্দিতে কান্দিতে উহার পা ছাড়িয়া দিল।

এই আখ্যানটী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইটালী পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কারণ পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার একটী

---

[১]। 1 Kings 3.

ছবি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর গেইডোজ দেখাইছেন যে রোমানেরা ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, ইহুদিদিগের নিকট হইতে নহে। সত্য বটে পম্পিয়াই নগরের ছবিতেও শিশুটীকে দুইখণ্ড করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটীতে আদিম অবস্থায় এইরূপ বর্ণনাই ছিল; পরে জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাটিবার পরিবর্ত্তে টানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাইবেলের এই অংশে ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃতজাত নাম দেখা যায়[১]। ফিনিকীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী অভীর নামক পট্টন হইতে য়িহুদিরাজের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকের কথাটী যখন বাইবেলের এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে য়িহুদিরাই ইহা এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা কেন, বাইবলের কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। বাইবলের উত্তরখণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায় যীশুখ্রীষ্ট দুইবার অতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহু লোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঈল্লীশজাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে দেখা যায়, গৌতমও ঠিক এইরূপে নিজের লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্যপরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।

য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষ ও গ্রীস উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল, কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীসে ছিল না, কতকগুলি গ্রীসে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল না; আর কতকগুলি ভারতবর্ষেও ছিল না, গ্রীসেও ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরোচনজাতকের ও জবশকুনজাতকের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে কাকজাতকের ও সঞ্জীবজাতকের আখ্যান দেখা যায়; তদ্‌ভিন্ন পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত কোন কোন কথাও পাওয়া গিয়াছে। য়িহুদিরা কখনও পশুপক্ষিসংক্রান্ত গল্পরচনায় নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাহিত্যে এইরূপ কথার সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পাঁচ-ছয়টী মাত্র তাঁহারা আত্মরচিত বলিতে পারেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ দাতা এবং য়িহুদিরা গ্রহীতা। কতকগুলি কথা কৈবিসেস্-প্রণীত এই পরিচয় দিয়া য়িহুদিরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন গ্রীসে, সেইরূপে যুডিয়াতেও রাজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিসংক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী)।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্বন্ধে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী

---

[১]। যথা : তুক্কিম কোফ্, শেন্হব্বিম, কার্পাস। তুক্কিম তামিল-মলয়ালাম্ ভাষায় তুকেই (সংস্কৃত শিখী অর্থাৎ ময়ূর); কোফ = কপি; শেন্হব্বিম্ = গজদন্ত (সম্ভবতঃ সংস্কৃত ইভশব্দজ)।

বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস্ নগরবাসী জন নামক এক সাধুপুরুষ গ্রীকভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখনির নাম "বার্লাম্ ও যোয়াসফ্"। যোয়াসফ্ বা যোসাফট্ ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র; তিনি বার্লামের নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য এরূপ কোন আখ্যায়িকা লিখিত হয় নাই; এই নিমিত্ত 'বার্লাম্ ও যোয়াসফ্' য়ুরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ, সুইডিস, ওলন্দাজ, আইস্ল্যাণ্ডিক প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়; এবং রোমান কাথলিক্দিগের উপাসনাদিক্রিয়ায় অন্যান্য খ্রীষ্টান সাধুপুরুষদিগের নামের ন্যায় বার্লাম্ ও যোসাফটের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা হয়। যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভুদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব স্মরণ করিবার জন্য এক একটী দিন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে, রোমান কাথলিক্ সাধুপুরুষদিগের জন্যও সেইরূপ প্রথা আছে। এই নিয়মানুসারে ২৭শে নবেম্বর বার্লামের ও যোসাফটের স্মরণার্থ উৎসর্গ করা হইত। য়ুরোপের প্রাচ্য খ্রীষ্টান সমাজেও[১] যোসাফটকে 'যোসাফ' এই নামে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে বার্লাম্ কোন স্থান পান নাই। প্রাচ্যসমাজে ২৬ শে আগষ্ট সাধু যোসাফটের স্মারক দিন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যোসাফট্ কে? তিনি যে ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র ইহা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং গৌতম-বুদ্ধ। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে গৌতম ছিলেন 'বোধিসত্ত্ব'। এই শব্দটী আরবী ভাষায় হইয়াছিল 'যোদাসফ্' এবং আরব হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিবার সময় হইয়াছিল 'য়োসাফট্'।[২] য়োমাফটের জীবনবৃত্তান্ত সেন্ট জন যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গৌতম-বুদ্ধই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক। জাতকের অনেক কথাও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।[৩] কপিলবাস্তুর করুণাসিন্ধু যে অদ্যাপি রোমান কাথলিক্দিগের নিকট সাধুশ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা পাইতেছেন ইহা ভাবিলে এদেশে এমন কে আছেন যাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব

---

[১]। Greek Church.

[২]। প্রথমে ইহা আরবী ভাষায় 'বোদাসফ্' এইরূপ উচ্চারিত হইত, পরে লিপিকর প্রমাদবশতঃ 'বে' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া 'য়োদাসফ্' এই রূপান্তর গ্রহণ করে; অতঃপর আরবী হইতে গ্রীকে যাইবার সময় পুনর্ব্বার লিপিকরের দোষে 'ডেলটা' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'আল্ফা' অক্ষর প্রযুক্ত হইয়া য়োয়াসফ্' রূপ ধারণ করিয়াছিল। এদিকে বাইবলে 'য়েহোসাফট্' নামক রাজার উল্লেখ আছে; খ্রীষ্টানেরা এই শব্দের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত মনে করিয়া 'য়োয়াসফ্' কে শেষে 'য়োসাফট' করিয়া তুলিয়াছিলেন।

[৩]। যেমন অলাম্বুষাজাতক (৫২৩)।

আনন্দরসের উৎস না ছুটিবে? যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা এইরূপেই সর্ব্বত্র বরেণ্য হইয়া থাকেন।

কোন কোন জাতককথার দেশভ্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। যাঁহারা জাতক-সাহিত্যের অত্যধিক ভক্ত, তাঁহারা ইহাতে অডিসিউসের ভ্রমণবৃত্তান্তেরও আভাস পাইয়াছেন (যথা মিত্রবিন্দকজাতক)। কিন্তু অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন না। তথাপি মনে হয় মিত্রবিন্দকের সহিত সিন্দবাদের হয়ত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। ইটালী দেশীয় পণ্ডিত কম্পারেট্টির মতে মিত্রবিন্দকই সিন্দবাদের আদিপুরুষ। রাধাজাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতক যে আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে ইহা আমরাও বুঝিতে পারি। নৈশোপাখ্যানমালা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এশিয়ার মধ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল; আবার এই বৌদ্ধেরা শেষে মুসলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক আখ্যান মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরববাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিরক্ষর নিগ্রোরা পর্য্যন্ত জাতককথা শিখিয়াছে। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস্ কাকার সে সকল কথা শুনে, তাঁহাদের কোন কোনটীর সহিত পঞ্চায়ুধ-জাতকের সাদৃশ্য আছে। উত্তরকালে যখন যীশুখ্রীষ্টের সমাধিমন্দির লইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সজ্ঘর্ষ হয়, তখনও কোন কোন প্রাচ্যকথা য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডরাজ সিংহবিক্রম রিচার্ড স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহী ভূস্বামীদিগকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সত্যংকিল-জাতকের আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন; মহাকবি চসার বেদব্ভজাতক অবলম্বন করিয়া Pardoner's Tale রচনা করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়ার প্রণীত Merchant of Venice নামক নাটকে অৰ্দ্ধসের মাংসের এবং পেটিকাত্রয়ের সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহাও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষীয় কথা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়ে লা-ফন্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভারতবর্ষীয় কথাকারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; গ্রীম্ভ্রাতৃদ্বয়-সংগৃহীত কথাকোষে দধিবাহনজাতক প্রভৃতি সতর আঠারটী জাতকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জাতকের উপযোগিতা

এখন জাতকের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। কথাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, আদিম অবস্থায় তাহারা কিরূপ ছিল ও কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, কি কারণে দেশভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইলে জাতক ও

অন্যান্য প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিতা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকার্থবর্ণনা ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। গত পঁচিশ বৎসরে জাতকগুলি য়ুরোপবাসীদিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে তাঁহারা ইহাদের কোন কোন চিত্তরঞ্জক আখ্যান অবলম্বন করিয়া শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জাতকের আলোচনা করিলে আমাদের কি কি উপকার হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

প্রথমতঃ—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ মহাপুরুষবাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্‌গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

দ্বিতীয়তঃ—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য বা কূর্ম্ম ছিলেন; যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক স্কন্ধসমষ্টিমাত্র এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

তৃতীয়তঃ—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচারব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কথা কল্পনাসম্ভবা, কিন্তু সত্যগর্ভা। কথাকার অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া বর্ণনা করিবেন ইহাই তাঁহার ব্যবসায়; কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাহিরে যাইতে পারেন না; নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজনীতি হয় স্পষ্টভাষায়, নয় ধ্বনি দ্বারা বলিয়া যান, নচেৎ তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জাতক-সংগ্রহকালে দেশান্তরের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের বিকৃতি ঘটে নাই; কাজেই তদানীন্তন সমাজের নিখুঁত চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোকে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন; জলপথে জল-নিয়ামকেরা ও

স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময় স্থলনিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন; মহানগরসমূহের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন, এবং অনাথ বালকেরা পুণ্যশিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠফলক বা তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কষিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল; কাশী প্রভৃতি দেশ হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। তখন তক্ষশিলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এবং তত্রত্য কোন কোন ছাত্র শল্য-চিকিৎসায় এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিল যে বর্ত্তমান শল্যকর্ত্তাদিগের মধ্যেও সে শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তখন এদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন লোকে মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করিতেন। তখন শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু রাজপদ নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিয়া অন্য কাহাকেও রাজত্ব দিত; কখনও কখনও রাজার পুত্রেরা পর্য্যন্ত পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানভাবে চলিতে হইত। তখন কন্যাগণ যৌবনোদয়ের পর পাত্রস্থা হইতেন; ক্ষত্রিয়েরা পিতৃস্বসৃসুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দিগকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিতেন; সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইত এবং পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিত এবং ভূতবলি, পিশাচবলি প্রভৃতি দিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিত; তখন লোকে অর্থদ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করিত।

যাঁহারা প্রব্রাজক হইতেন তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। এই জন্য কোন কোন জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মনে নারীসম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতির ইতিবৃত্তে দেখা যায় তখন নারীরাও ধর্ম্মচর্য্যায় পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন।

চতুর্থতঃ—জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যুৎপন্ন অংশ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়—কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্দ্ধসহস্রবৎসর পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে

যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমরা অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা দেখিতে পাই প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্তের কুপরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতৃবধ করিলে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম বিনষ্ট করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; ঐ যুদ্ধে প্রসেনজিৎ প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, অতঃএব প্রসেনজিৎ ও নিজের পুত্র বিরূঢ়ক কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; এই বিরূঢ়কই কিয়ৎকাল পরে কপিলবাস্তু বিধ্বস্ত করিয়া শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী নগর সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বারাণসীর কৌশেয়বস্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরগুলির তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই। বৈশালীতে কুলতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল; তত্রত্য লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং এ সমস্ত অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিন্‌সেন্ট স্মিথ্ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—যেমন গ্রীকশিল্পে হোমারের ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকির ও ব্যাসের, সেইরূপ বৌদ্ধশিল্পে জাতককারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাঁচী, বেরুট, বরবুদোরো[১] প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের

---

[১]। বরবুদোরো যবদ্বীপের অন্তঃপাতী একটী স্থান; সাঁচী ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত—ভূপাল হইতে গোয়ালিয়র আসিবার পথে জি.আই.পি. রেলওয়ের একটী ষ্টেশন; বেরুট মধ্যপ্রদেশে সাতনা ষ্টেশনের অনতিদূরে। পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁচী ও বেরুট উভয় স্থানই উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে যাইবার পথে অবস্থিত। সাঁচীর ৩ ক্রোশ দূরে বেত্রবতীতীরস্থ বিদিশা বা ভিল্‌সা।

বেরুটস্তুপে নিম্নলিখিত জাতকগুলির ছবি চিনিতে পাওয়া গিয়াছে—মখাদেবজাতক (৯), ন্যাগ্রোধমৃগজাতক (১২), নৃত্যজাতক (৩২), আরামদূষকজাতক (৪৬), অন্ধভূতজাতক (৬২), দুভিয়মক্কটজাতক (১৭৪), অসদৃশজাতক (১৮১), কুরঙ্গমৃগজাতক (২০৬), কর্কটজাতক (২৬৭), সুজাতজাতক (৩৫২), কুক্কুটজাতক (৩৮৩), মুগপক্খজাতক (৫৩৮), লটুকিকজাতক

অদ্ভুত প্রতিভার যে সকল নিদর্শন আছে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে জাতকের সহিত পরিচয় আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ—জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু-ধর্ম্মেরই একটী শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্ম্মফল আছে; ইহাতে ইন্দ্রাদিদেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সর্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচবর্ণে জন্মপ্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধহয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গ মাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্য, বৌদ্ধেরা তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুর মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে; সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব যে হিন্দুর সংখ্যা বিংশটি কোটি নহে, সপ্ততি কোটি, বুঝিব যে কেবল দশগুণোত্তর অঙ্ক-লিখনে নয়, কেবল বীজগণিতে বা রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয়ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকারের বিষয় নহে।

সপ্তমতঃ—জাতক পাঠ করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই ফলিতজ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারতা বুঝাইয়া দিতেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান খণ্ডের নক্ষত্রজাতকের (৪৯) ও মঙ্গলজাতকের (৮৭) গাথাগুলি দ্রষ্টব্য। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা যতদূর পারিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে

---

(৩৫৬), দশরথজাতক (৪৬১), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫), ষড়্দন্তজাতক (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গজাতক (৫২৩), বিধুরজাতক (৫৪৫), মহাজনকজাতক (৫৩৯)। তদ্ভিন্ন এখানে নিদানকথাবর্ণিত অনেক দৃশ্যও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সাঁচীস্তূপে শ্যামজাতকের (৫৪২), অসদৃশজাতকের এবং বিশ্বম্ভরজাতকের ছবি পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নতি হইয়াছিল।

অষ্টমতঃ—বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্যক। অনেক শব্দ সংস্কৃতজাত হইলেও এত বিকৃতি পাইয়াছে যে আমরা সহজে তাহাদিগের মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাদিতে তাহাদিগকে 'দেশজ' আখ্যা দিয়া 'সাধুভাষার' বাহিরে রাখি। কিন্তু পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিকৃতির প্রথম সোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তি নির্ণয় সুকর নয়। জাতক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল 'নর্দ্দামা' শব্দ দেশান্তরগত; প্রকৃতিবাদ প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যখন কুক্কুরজাতকে (২২) দেখিলাম রাজভৃত্যেরা বলিতেছে, 'দেব, নিদ্ধমন-মুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্‌স চর্ম্মং খাদিংসু' (মহারাজ, কুকুরেরা নর্দ্দামার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং রথের চর্ম্ম খাইয়াছে), তখন বুঝিলাম এই সমাজচ্যুত শব্দটী বহুপ্রাচীন এবং ভদ্র-বংশজাত—সংস্কৃত 'ঝা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুশ্রুতে 'নির্ঝাপন' শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ ফুৎকার দ্বারা নিষ্কাশিত করা। অনন্তর বোধহয় লক্ষণদ্বারা ইহা জলনিষ্কাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। 'ছানি' (চক্ষুরোগ-বিশেষ) আপাতদৃষ্টিতে 'ছদ্‌' ধাতুজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পালিতে দেখা যায় 'সাণী' শব্দটী 'পর্দ্দা' অর্থে ব্যবহৃত হইত ইহা 'শণ' শব্দজ, এবং ইহার উৎপত্তিগত অর্থ শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র বা চট। প্রকৃতিবাদকার কিন্তু অতি অন্ত্যজ মনে করিয়া অভিধানে ইহাকে স্থানই দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চাষারা বলে 'অমুক ঘরে নাই' পাট লইতে গিয়াছে'। শকুনজাতকে (৩৬) দেখা যায় চাষারা ক্ষেত নিড়াইয়া, ফসল কাটিয়া ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত্বা ও মদ্দিত্বা) ভিক্ষুর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছিল। কাজেই এখানে কেবল 'লওয়া' শব্দের নহে, 'নিড়ান' এবং 'মলন' শব্দেরও মূল বাহির হইল—বুঝা গেল যে প্রথম দুইটী যথাক্রমে ছেদনার্থক 'লূ' ও 'দা' ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 'মর্দ্দ' ধাতুর সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ আরও অনেক 'দেশজ' শব্দের উৎপত্তি জানা যাইতে পারে, যেমন :

সংস্কৃত	পালি	বাঙ্গালা
অর্দ্ধ + তৃতীয়	অড্‌ঢতিয়	আড়াই
অলাবু	লাপু	লাউ
উদঙ্ক	উলুঙ্ক	ওড়ং
উদ্ধান, উদ্‌ঝান	উদ্ধান	উনান
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কানাই
ক্ষাম	ঝাম	ঝামা

খাদ্য	খজ্জ	খাজা
গবী	গাবী	গাভী
—	চঙ্গোটক	চাঙ্গাড়ি
ছন্দক	ছন্দক	চাঁদা
—	দরথ	দরদ (ব্যথা)
দুহিতা	ধীতা	ঝি
দ্বিতীয় + অৰ্দ্ধ	দিয়ড্‌ঢ	দেড়
—	পিল্লক	পোলা (ছেলেপিলে)
ফাণিত	ফাণিত	ফেণি (ফেণি বাতাসা)
যবাগূ	যাগু	যাউ
শাল্মল	সিম্বল	শিমূল
স্নান	নহান	নাওয়া (ইত্যাদি)

অপিচ, জাতকপাঠে দেখা যায় পুরাকালে এমন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল, যাহা এখন আমরা হারাইয়াছি। তখন pilot ছিল, তাহারা ‘জলনিয়ামক’ নামে অভিহিত হইত; তখন Foundation stone-কে মঙ্গলেষ্টক, laying the foundation-কে মঙ্গলেষ্টক-স্থাপন, viceroy-কে উপরাজ, viceroyalty-কে ঔপরাজ্য, crown-price-কে পরিনায়ক, hospital-কে বৈদ্যশালা, surgeon-কে শল্যকর্ত্তা, nosegay-কে পুষ্পগুল, sugar mill-কে গুড়যন্ত্র, bench-কে ফলকাসন, earnest money (বায়না)-কে সত্যাঙ্কার (সচ্চকার) এবং সায়াহ্নভোজনকে সায়মাশ বলা হইত। এই সকল অচল শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় কি না তাহা সাহিত্যসেবীদিগরে বিবেচ্য।

উপসংহার

জাতকার্থবর্ণনায় নিদানকথা নামে যে উপক্রমণিকা আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকৃত জাতকের অংশ নহে বলিয়া আমি ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই। তবে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাহা এই অংশ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পালি ভাষায় নিদান শব্দের সাধারণ অর্থ হেতু বা কারণ; কিন্তু ইহা পুস্তকের উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ এই অর্থেও প্রযুক্ত হয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু নামক গ্রন্থেও নিদান শব্দটী ‘উপক্রমণিকা’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথা[১] তিন অংশে বিভক্ত—দূরেনিদানম্, অবিদূরেনিদানম্ এবং সন্তিকেনিদাকম্। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সঙ্কল্প করেন। সেই সময় হইতে বিশ্বন্তর-লীলাবসানে তুষিত স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত দূরেনিদানে বর্ণিত। তুষিত স্বর্গত্যাগ হইতে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত অবিদূরেনিদানের কথা। ইহাতে দীপঙ্কর হইতে কাশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪জন অতীত বুদ্ধের বৃত্তান্ত আছে। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের নানাস্থানে ভ্রমণ, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা সন্তিকেনিদানে বর্ণিত। এই অংশে গৌতম বুদ্ধের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত নাই; অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তৃক জেতবন-বিহারের উৎসর্গ বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থকার উপক্রমণিকাংশ শেষ করিয়াছেন।

জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু ও সমবধানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, কাজেই সেগুলি অবিকৃত রাখিয়া দিয়াছি; তবে তাহাদের কোনটীর কি অর্থ, পাদটীকায় যথাসাধ্য তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ব্যক্তি ও স্থানসমূহের নাম সাধারণতঃ সংস্কৃতাকারে দিয়াছি; কিন্তু কোথাও কোথাও পালি শব্দই রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত পালি নামের অনুরূপ সংস্কৃত নাম নির্ণয় করা বোধহয় সম্ভবপর নহে।

ফলতঃ অনুবাদখানি যাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেরই সুখপাঠ্য হয় তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমার দেহ বয়োভারাক্রন্ত; উপর্য্যুপরি কয়েকবার কঠোর শোক ভোগ করিয়া মনও স্থৈর্য্য হারাইয়াছে; বিশেষতঃ এতাদৃশ দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি এমন যোগ্যতাই বা কোথায়? তথাপি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ভয়ে ভয়ে এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিলাম। যদি ইহা সুধীসমাজে পরিগৃহীত হয় এবং আমার বয়সে কুলায়, তবে অতঃপর

---

[১]। বোধিসত্ত্বের চর্য্যা তিন অংশে বিভক্ত—(১) অভিনীহার অর্থাৎ আমি যে বুদ্ধ হইতে পারি এই অভিলাষ; (২) ব্যাকরণ অর্থাৎ যে বুদ্ধের নিকট তিনি এই অভিলাষ করেন তৎকর্ত্তৃক ইহার ভবিষ্যৎ সিদ্ধি সম্বন্ধে উক্তি; (৩) কোলাহল অর্থাৎ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইতেছেন, তিনবার এই সুসংবাদের ঘোষণা—একবার লক্ষবর্ষ পূর্ব্বে, একবার সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এবং একবার শতবর্ষ পূর্ব্বে। দীপঙ্করের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার নাম ছিল সুমেধা। গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থায় প্রথম জন্ম সুমেধরূপে এবং শেষ জন্ম বিশ্বন্তররূপে। উদীচ্য বৌদ্ধমতে বোধিসত্ত্বচর্য্যা চারি অংশে বিভক্ত—(১) প্রকৃতি-চর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই অভিলাষের পূর্ব্বাবস্থা; (২) প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই দৃঢ় সঙ্কল্প; (৩) অনুলোম চর্য্যা অর্থাৎ সেই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ পারমিতাদির অনুষ্ঠান; (৪) অনিবর্ত্তন চর্য্যা অর্থাৎ যেভাবে চলিলে ঐ প্রতিজ্ঞা হইতে পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সেই ভাবে চলা।

উত্তরখণ্ডগুলিও সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব। গাথাগুলি পদ্যে বা গদ্যে অনুবাদ করা ভাল ইহা ভাবিতে অনেক সময় গিয়াছে। শেষে দেখিলাম গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে রাখিলেই মূলগ্রন্থের প্রকৃতি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। সমস্ত গাথাই যে উৎকৃষ্ট কবিতা তাহা নহে; বিশেষতঃ অকবির হাতে পড়িয়া কবিতারও কবিত্বহানি অপরিহার্য্য। অতএব পদ্যাংশে যে ত্রুটি রহিয়া গেল তাহার জন্য অনুবাদকই দায়ী।

জাতকে যে সকল ব্যক্তির ও স্থানের নাম আছে, তাহাদের সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত না জানিলে গ্রন্থখানি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত আমি ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়া একটী পরিশিষ্ট যোজনা করিলাম। ইহাতেও যে ভ্রমপ্রমাদ না ঘটিয়াছে এরূপ বলিতে পারি না, কারণ একে তো আমার হাত অপরিপক্ক, তাহাতে আবার প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নানা মুনির নানা মত। এক স্থবির মহেন্দ্রই এক মতে অশোকের ভ্রাতা, অন্য মতে তাঁহার পুত্র। দেবদত্ত প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ দেখা যায়। তথাপি পরিশিষ্টটী যে পাঠকদিগের কাজে লাগিবে ইহা আমার বিশ্বাস। শুদ্ধ এই অংশের সঙ্কলনে আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনায় অনুবাদকার্য্য অনায়াসসাধ্য বলিয়াই মনে হয়।

দুরূহ অংশসমূহের ব্যাখ্যার নিমিত্ত আমার প্রিয় ছাত্র সিংহলবাসী শ্রীমান শ্রমণ সিদ্ধার্থ এবং জগজ্জ্যোতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহাশয় সময়ে সময়ে আমায় সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। উপক্রমণিকা এবং পরিশিষ্ট প্রণয়নের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি পর পৃষ্ঠে তাহাদের একটী তালিকা দিলাম।

কলিকাতা — শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

১০ই পৌষ, ১৩২৩ সাল

অনুবাদে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের তালিকা

১। Fausboll-সম্পাদিত জাতকাত্থবণ্ণনা

২। The Jatakas (translated into English under the editorship of the late Profesor E. B. Cowell—Cambridge Universtity Press).

৩। Oldenberg's Eassay on the Jatakas,

৪। Rhys David's Buddhist Birth Stories,

৫। Hardy's Manual of Buddhism,

৬। Kern's Manual of Indian Buddhism,

৭। The Vinaya Pitaka (Sacred Books of the East series).

৮। মলিন্দপঞ্ঞ্হ (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী-প্রণীত বঙ্গানুবাদ),

৯। ধম্মপদ (মূল এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু-প্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১০। থেরীগাথা (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার-প্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১১। Sir Monier William's Buddhism,

১২। Childers' Pali-English Dictionary.

১৩। Professor Macdonnel's History of Sanskrit Literature,

১৪। Professor Bhandarkar's History of Deccan,

১৫। Vincent Smith's Early History oF India,

১৬। Arthur Lillie's Buddhism in Christianity,

১৭। The Fables of Bidpali, edited by Joseph Jacobs,

১৮। The Fables of Asop edited by Joseph Jacobs,

১৯। Barlaam and Josaphat edited by Joseph Jacobs ইত্যাদি।

উৎসর্গ পত্র

যাহাকে পৌত্ররূপে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম, যে রূপে, গুণে, সর্ব্বাংশে আমার কুলপ্রদীপ হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, যাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে 'ভানু' ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে 'বিমলচন্দ্র' উভয় নামই সার্থক হইয়াছিল, যে আমার পাপসংসর্গ সহিতে না পারিয়া অকালে দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছে, এবং যাহার বিয়োগের পরে শোকমন্থর সময় অপনোদন করিবার জন্য আমি জাতকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আজ তাহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি-সাধনার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

খুদ্দকনিকায়ে

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।
(সেই ভক্তিভাজন ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার)

এক নিপাত

১. অপণ্ণক-জাতক[১]

[ভগবান শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্ত্তী জেতবনস্থ[২] মহাবিহারে অবস্থান করিবার সময় ধ্রুবসত্য শিক্ষাদানার্থ নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন। সে উপলক্ষ্যে ইহার অবতারণা হইয়াছিল তাহা এই :]

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের[৩] পঞ্চশত বন্ধু বৌদ্ধশাসন গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য গুরুর শিষ্য হইয়াছিলেন।[৪] একদিন অনাথপিণ্ডদ ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর মাল্য, গন্ধ, বিলেপন এবং তৈল, মধু, গুড়, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার ছিল। তিনি মাল্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি[৫] উপহার দিলেন এবং

---

[১]। অপণ্ণক—ধ্রুবসত্য।

[২]। শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী একটী বিখ্যাত উদ্যান। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[৩]। অনাথপিণ্ডদ (পালিভাষায় 'অনাথপিণ্ডিক') একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ উপাসক। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই অনুবাদে ইহার নাম কোথাও 'অনাথপিণ্ডদ', কোথাও বা 'অনাথপিণ্ডিক' লেখা হইয়াছে।

[৪]। মূলে 'অঞ্ঞতিত্থিয়সাবকে' এই পদ আছে। 'শ্রাবক'—যে (উপদেশ) শ্রবণ করে, অর্থাৎ শিষ্য। 'তীর্থ' শব্দের অন্যতম অর্থ 'উপদেষ্টা' বা 'গুরু'। যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতেন, তাঁহারা তীর্থক, তৈর্থ্য, তীর্থিক, তৈর্থিক বা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হইতেন। গৌতমের সময় এইরূপ, পরস্পরবিরোধী অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে পুরণকাশ্যপ, নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি ছয়জন বৌদ্ধশাসন বিরোধী তীর্থদের নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইহাদিগকে নীচকুলজ ও ভণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধ সাধুপুরুষগণ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন; কিন্তু তীর্থকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা পরিণামে জনসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন।

[৫]। ভেসজ্জ (ভৈষজ্য) বলিলে পালিভাষায় ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্যও বুঝায়; এখানে এই অর্থই লইতে হইবে।

অতি শিষ্টভাবে[১] একান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও তথাগতের[২] চরণ বন্দনা করিয়া তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ভগবানের লোকাতীত বিভূতি—পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল, বুদ্ধত্বব্যঞ্জক সর্ব্বসুলক্ষণ-মণ্ডিত ও ব্যামপ্রমাণ-প্রভাপরিবৃত ব্রহ্মকলেবর[৩] এবং তন্নিঃসৃত, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পূর্ণপ্রজ্ঞাজাত রশ্মিমালা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান তাঁহাদের উপদেশার্থে মনঃশিলাসমাসীন-তরুণসিংহনিনাদসদৃশ কিংবা বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জন সদৃশ গুরুগম্ভীর অথচ অষ্টাঙ্গপরিশুদ্ধ[৪] এবং কমনীয় ব্রহ্মস্বরে নানাবৈচিত্র্যবিভূষিত মধুর ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ-গঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে, কিংবা বাক্যচ্ছলে রত্নদাম গ্রথিত হইতেছে।

ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহারা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দশবলের[৫] চরণবন্দনাপূর্বক অপরাপর শরণ পরিহার করিয়া তাঁহারই শরণ

---

[১]। মূলে 'নিসজ্জ-দোসে বজ্জেত্বা' (অর্থাৎ উপবেশন-সংক্রান্ত ষড়ুবিধ দোষ পরিহার করিয়া) এইরূপ আছে। অতি দূরে, সন্নিকটে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উচ্চস্থানে ও বায়ুপ্রতিরোধ করিয়া উপবেশন নিষিদ্ধ।

[২]। ভগবান, শাস্তা (উপদেষ্টা), দশবল, সুগত, বুদ্ধ, সম্যকসম্বুদ্ধ, তথাগত ইত্যাদি গৌতমের উপাধি। পিটকে দেখা যায় গৌতম আপনাকে অনেক সময়ে 'তথাগত' নামেই অভিহিত করিতেন। বুদ্ধঘোষ এই শব্দটীর বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, 'যিনি অতীত বুদ্ধগণ-প্রদর্শিত পথে গমন করিয়াছেন' এই অর্থই বোধহয় সমীচীন। 'যিনি তত্রাগত ('তথা' শব্দ 'তত্র' শব্দের অপ্রভ্রংশ), অর্থাৎ যিনি অমুত্র বা নির্ব্বাণে উপনীত হইয়াছেন,' কিংবা 'যিনি অপর মানুষের ন্যায় আসিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন' এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। শেষোক্ত ব্যাখ্যায় 'তথাগত' শব্দ সকল মনুষ্যসম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও বুদ্ধবাচক হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরাও যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্য-পুত্র বলিয়া থাকেন।

[৩]। বৌদ্ধসাহিত্যে গৌতমের দেহ লোকাতীত সৌন্দর্য্যবিভূষিত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। আকৃতি, কণ্ঠস্বর, দেহপ্রভা, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন।

[৪]। যিসৃষ্ট মধুর, বিজ্ঞেয়, শ্রবণীয়, অবিসারী, অনর্গল, গম্ভীর ও নিনাদী হইলে স্বর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

[৫]। দশবল—ইহা বুদ্ধের একটী উপাধি। দশবিধ বল যথা, স্থানাস্থানজ্ঞান, সর্ব্বত্রগামি-প্রতিপদাজ্ঞান, অনেকধাতু-নানাধাতুজ্ঞান, সত্ত্বদিগের নানাধিমুক্তিকতা-জ্ঞান, বিপাকবিমাত্রতা-জ্ঞান, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থানজ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরাপরত্ব-বিমাত্রতা-জ্ঞান, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান, দিব্যচক্ষুজ্ঞান এবং আসবক্ষয়-জ্ঞান। [স্থানাস্থান = কি সম্ভবপর, কি অসম্ভব ইহা। সর্ব্বত্রগামিপ্রতিপদা-জ্ঞান = মৃত্যুর পর কে কোন্ যোনিতে জন্মিবে ইহা জানিবার ক্ষমতা (প্রতিপদা = মার্গ)। ধাতু = পদার্থ। অধিমুক্তি = প্রকৃতি। বিপাক = ফল, পরিণতি। বিমাত্রতা = পার্থক্য; এই জ্ঞান দ্বারা কে প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোন্ কার্য্যের অধিকারী তাহা বুঝা যায়। ব্যবদান = পরিশুদ্ধতা (কি করিলে ধ্যানাদির বিঘ্ন ঘটে, বা পরিশুদ্ধতা জন্মে বা ইচ্ছামত ধ্যান ত্যাগ করিতে পারা যায়, সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থান জ্ঞানে

লইলেন। তদবধি তাঁহারা প্রতিদিন গন্ধমাল্যাদি লইয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত বিহারে যাইতেন, ধর্ম্মকথা শুনিতেন, দান করিতেন, শীলসমূহ[১] পালন করিতেন এবং উপোসথদিবসে যথাশাস্ত্র সংযমী হইয়া থাকিতেন।[২]

ইহার পর শাস্তা শ্রাবস্তী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন এবং তিনি প্রস্থান করিবামাত্র ঐ পঞ্চশত ব্যক্তি বৌদ্ধশরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পূর্ব্বশরণ প্রতিগ্রহণ করিলেন; কাজেই তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, আবার তাহাই হইলেন।

এদিকে ভগবান রাজগৃহে সাত আট মাস অবস্থিতি করিয়া জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ পুনর্ব্বার সেই পঞ্চশত বন্ধুসহ শাস্তার নিকট উপনীত হইয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া পূর্ব্বের মত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর ইহারা কিরূপে তথাগতের ভিক্ষাচর্য্যার সময় বৌদ্ধশরণ পরিহার করিয়াছেন এবং অন্যান্য শরণের আশ্রয় লইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনাথপিণ্ডদ সেই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

তচ্ছ্রবণে ভগবান মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে উপাসকগণ[৩], তোমরা ত্রিশরণ[৪] পরিহার করিয়া শরণান্তর গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?' ভগবান যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত

তাহা জানিবার ক্ষমতা জন্মে)। ইন্দ্রিয়পরাপরত্ববিমাত্রতা-জ্ঞান = জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে কাহার কতদূর সাধ্য ইহা জানিবার ক্ষমতা।] আবার কেহ কেহ বলেন, গৌতমের শরীরে দশটা হস্তীর বল ছিল বলিয়া তিনি 'দশবল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

[১]। শীল চরিত্র, চরিত্ররক্ষার উপায়। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চশীল এবং উপোসথদিনে অষ্টশীল রক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রামণেরগণ দশশীল পালন করেন। প্রাণাতিপাত (প্রাণিহত্যা), অদত্তাদান (চৌর্য্য), কামে মিথ্যাচরণ, মৃষাবাদ ও সুরাপান এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরতি পঞ্চশীল। প্রাণাতিপাত অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ, সুরাপান, বিকালভোজন (অসময়ে আহার), নৃত্যাদিদর্শন ও মাল্যগন্ধানুলেপন এবং উচ্চাসনে মহার্ঘাসনে শয়ন এই অষ্টবিধ পাপ হইতে বিরতি অষ্টশীল। দশশীল বলিলে এই আটটী ও অর্থাদান (স্বর্ণরৌপ্যাদি গ্রহণ) বুঝিতে হইবে। এস্থলে নৃত্যাদি দর্শন (বিসুখদর্শন) ও মাল্যগন্ধানুলেপন পৃথক বলিয়া ধরা হয়।

[২]। 'উপোসথ' বলিলে উপবাস বুঝায়; কিন্তু হিন্দুরা যেমন উপবাসকালে অনাহারে থাকেন, বৌদ্ধেরা সেরূপ থাকেন না; তাঁহারা কেবল সংযমী ও বিষয়কর্ম্ম-বিরত হইয়া চলেন। মাসের চারি দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণা অষ্টমী, অমাবস্যা ও শুক্লা অষ্টমী—উপোসথের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উপোসথ-দিবসে উপাসকেরা পরিষ্কৃত শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া বিহারে সমবেত হন এবং কোন ভিক্ষুর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেন যে, সে দিন তাঁহারা অষ্টশীল রক্ষা করিয়া চলিবেন। উপবাস শব্দেরও প্রকৃতিগত অর্থ 'ভগবানের সমীপে সংযমী হইয়া বাস।'

[৩]। গৃহী বৌদ্ধেরা 'উপাসক' নামে অভিহিত।

[৪]। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। ইহার নামান্তর 'ত্রিরত্ন' বা 'রত্নত্রয়'।

দিব্যগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল—হইবারই কথা, কারণ সে মুখমণ্ডল হইতে কোটিকল্পকাল কেবল সত্যই উচ্চারিত হইয়াছে। তাহা রত্নকরণ্ড-স্বরূপ, উদঘাটিত হইলে উপদেশ-রত্ন লাভ করিয়া ত্রিলোক কৃতার্থ হয়।

শ্রেষ্ঠীবন্ধুগণ সত্য গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, 'হাঁ ভদন্ত,[১] এ কথা মিথ্যা নহে।' তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপাসকগণ, সর্ব্বনিম্নে অবীচি হইতে সর্ব্বোপরি ভবাগ্র[২] পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্বে এমন কেহই নাই যিনি শিলাদিগুণে বুদ্ধের তুল্যকক্ষ হইতে পারেন; তাঁহা হইতে উচ্চকক্ষ হওয়া ত সুদূরপরাহত।' অনন্তর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সূত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক রত্নত্রয়ের গুণব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'যে উপাসক বা উপাসিকা এবংবিধ উত্তমগুণসম্পন্ন ত্রিরত্নের শরণ লয়, নরকাদিতে জন্মিতে হয় না; সে ক্লেশকর পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেবলোকে গমন করে এবং সেখানে অতুল সুখের অধিকারী হয়। অতএব তোমরা এ শরণ পরিহার এবং শরণান্তর গ্রহণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছ।'

যাহারা মোক্ষকামনায় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় ত্রিরত্নের শরণাগত হয়, তাহারা কখনও ক্লেশকর জন্ম ভোগ করে না, ইহা বিশদ করিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি শুনাইতে হয় :

বুদ্ধের শরণাগত নরকে না যায়;
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।
ধর্ম্মের শরণাগত নরকে না যায়;
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।
সঙ্ঘের শরণাগত নরকে না যায়;
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

ভূধর কন্দর কিংবা জনহীন বন,
শান্তি-হেতু লয় লোক সহস্র শরণ।
*   *   *
ত্রিরত্ন-শরণ কিন্তু সর্ব্বদুঃখহর;
লভিতে ইহারে সদা হও অগ্রসর।

শাস্তা কেবল এই উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না; তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—'উপাসকগণ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি ও সঙ্ঘানুস্মৃতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মস্থান[৩] দ্বারা লোকে স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ,

---

[১]। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অর্হৎ প্রভৃতি পূজনীয় ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবার সময় এই পদ ব্যবহৃত হইত। ইহা 'আর্য্য' বা 'ভগবৎ' শব্দের তুল্যার্থবাচক।

[২]। অবীচি—বৌদ্ধমতে অষ্টনরকের অন্যতম। ভবাগ্র—অবীচির বিপরীত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্লোক নৈবসংজ্ঞান সংজ্ঞায়তন। অবীচির অধিবাসীরা সৃষ্টিপর্য্যায়ের নিম্নতম এবং ভবাগ্রবাসী দেবগণ উচ্চতম স্তরে স্থাপিত।

[৩]। কর্ম্মস্থান—ধ্যানের বিষয়। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সবিস্তর বিবরণ দ্বিতীয় জাতকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও অর্হত্ত্বফল[১] লাভ করে।' উপাসকদিগকে এবংবিধ নানা উপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, 'তোমরা ঈদৃশ শরণ পরিত্যাগ করিয়া অতিনির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছ।'

(বুদ্ধানুস্মৃতি প্রভৃতি কর্ম্মস্থান হইতে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রভৃতি লাভ করা যাইতে পারে, ইহা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনাদি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইবে—'ভিক্ষুগণ, জগতে একটীমাত্র ধর্ম্ম আছে, যাহার অনুষ্ঠান ও সম্প্রসারণ দ্বারা মানুষ একান্ত নির্ব্বেদ,[২] বৈরাগ্য, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বুদ্ধি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। সেই একমাত্র ধর্ম্ম কি? তাহা বুদ্ধানুস্মৃতি' ইত্যাদি।)

ভগবান নানা প্রকারে উপাসকদিগকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'উপাসকগণ, পূর্ব্বকালেও লোকে বিরুদ্ধযুক্তিবলে অশরণের শরণ লইয়া যক্ষসেবিত কান্তারে বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা ধ্রুবসত্যের আশ্রয় লইয়া অবিরুদ্ধ পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই কান্তারেই স্বস্তিভাজন হইয়াছিলেন।'

শাস্তা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবানকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার গুণগান করিতে করিতে অঞ্জলিপুট দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'প্রভু, এই উপাসকগণ যে ইহজন্মে উত্তমশরণ পরিহার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু অতীতকালে যক্ষসেবিত কান্তারে তার্কিকদিগের বিনাশ এবং সত্যপথাবলম্বীদিগের ঋদ্ধিলাভের কথা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সে বৃত্তান্ত কেবল আপনারই জানা আছে। এখন দয়া করিয়া আমাদিগের প্রবোধের জন্য

---

[১]। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণলাভের চারিটী মার্গ অর্থাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—স্রোতাপত্তিমাগ্গ, সকদাগামিমাগ্গ, অনাগামিমাগ্গ, অহরত্তমাগ্গ। পালি ভাষায় শ বা ষ নাই, কাজেই 'সোতাপত্তি' বা 'শোতাপত্তি' তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 'স্রোতাপত্তি' (স্রোতস্ + আপত্তি) শব্দ 'পৃষোদরাদি' সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে; 'শোতাপত্তি' শব্দ (শ্রোতৃ + আপত্তি) শ্রোত্রাপত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রথম ব্যুৎপত্তি ধরিলে যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্রে উপনীত হইবেন, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যিনি ধর্ম্ম-দেশন শ্রবণ করিয়া তাহাতে নিহিত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবে। বলা বাহুল্য যে উভয় ব্যাখ্যাতেই চরম অর্থ একরূপ। স্রোতাপন্নগণ সাতবার জন্মগ্রহণ করিবার পর কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সকৃদাগামিগণ একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অনাগামিগণ আর কামলোকে জন্মেন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। অর্হতেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহাদের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়াছে; তাঁহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধমতে এই অধঃপতিত যুগে অর্হত্ত্ব-লাভ অসম্ভব। উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রথমে মার্গ লাভ, পরে তাহার ফল প্রাপ্তি। মার্গচতুষ্টয়ের বহিঃস্থ ব্যক্তিরা 'পৃথগ্জন' নামে বিদিত। যাহারা কর্ম্মফল মানে তাহারা কল্যাণ-পৃথগ্জন, যাহারা মানে না তাহারা অন্ধ পৃথগ্জন।

[২]। নির্ব্বেদ—সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে বিরক্তি জন্মে।

সেই কথা বলুন—আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেই অতীত কাহিনী শুনিয়া আমাদের অবিদ্যাও তদ্রূপ দূরীভূত হইবে।'

ইহা শুনিয়া ভগবান কহিলেন, 'আমি জগতের সংশয়নিরাকরণার্থই কোটিকল্পকাল দানাদি দশপারমিতার[১] অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি। অতএব লোকে যেমন সাবধান হইয়া সুবর্ণনালিকায় সিংহবসা[২] পূর্ণ করে, তোমরাও সেইরূপ এই কথা কর্ণকুহরে স্থান দাও।'

এইরূপে শ্রেষ্ঠীর শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া শাস্তা সেই ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন[৩] অতীত কথা প্রকট করিলেন, হিমগর্ভ আকাশতল হইতে যেন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইল।]

* * *

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঁচ শ গরুর গাড়ী ছিল। তিনি এই সকল গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া কখনও পূর্ব্বদেশে, কখনও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন তরুণবয়স্ক বণিক বাস করিত। এই ব্যক্তির বুদ্ধি অতি স্থূল ছিল; সে কোন অবস্থায় কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা জানিত না।[৪]

একবার বোধিসত্ত্ব অনেক মূল্যবান দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয়ের জন্য কোন দূরদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ নির্ব্বোধ বণিকও পাঁচ শ গাড়ী লইয়া ঠিক সেই দেশেই যাইবার আয়োজন করিতেছেন। তখন বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমাদের দুইজনের এক হাজার গাড়ী এক সঙ্গে এক পথে যাত্রা করিলে নানা অসুবিধা ঘটিবে। এতগুলি বোঝাই গাড়ীর চাকা লাগিয়া রাস্তা চুরমার ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, এক হাজার লোক ও দুই হাজার বলদের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। অতএব, একজন অগ্রে এবং অপরজন কিছুদিন পরে যাত্রা করিলে ভাল হয়।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি নির্ব্বোধ বণিককে ডাকাইলেন এবং সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'যখন আমাদের একসঙ্গে যাওয়া উচিত

---

[১]। দশ পারমিতা যথা—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। নৈষ্ক্রম্য = সংসারত্যাগ; অধিষ্ঠান = দৃঢ় সঙ্কল্প; উপেক্ষা = বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা।

[২]। সিংহবসার যে উপযোগিতা কি এবং লোকে কি জন্য যে ইহা এত যত্নসহকারে রক্ষা করিত, তাহা বুঝা কঠিন। তবে উপমাটীর ফলিতার্থ এই যে 'তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।'

[৩]। যাহা জীবের জন্মান্তর গ্রহণ দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ অগোচরীভূত হইয়াছে।

[৪]। মূলে 'অনুপায়কুসাল' এই পদ আছে।

নহে, তখন ভাবিয়া দেখ, তুমি অগ্রে যাইবে, কি পশ্চাতে যাইবে।' সে মনে করিল, 'অগ্রে যাওয়াই ভাল, কারণ, রাস্তা এখনও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় নাই। কাজেই গাড়ী চালাইবার সুবিধা হইবে; বলদগুলিও বাছিয়া বাছিয়া ভাল ঘাস খাইতে পারিবে; আমাদের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট ফলমূলাদির অভাব হইবে না; স্নান ও পানের জন্য নির্ম্মল জল পাওয়া যাইবে এবং আমি ইচ্ছামত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, 'মহাশয়, আমিই অগ্রে যাইব।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বেশ কথা, তুমিই প্রথমে রওনা হও।' তিনি ভাবিলেন, 'শেষে গেলেই সুবিধা; এই নির্ব্বোধ বণিকের গাড়ীর চাকায় অসমান পথ সমান হইবে; ইহার বলদগুলি পাকা ঘাস খাইয়া যাইবে, কিন্তু ঐ সকল ঘাসের কাণ্ড হইতে যে কচি পাতা বাহির হইবে, আমার বলদগুলি তাহাই খাইবে; আমরা আহারের জন্য টাটকা ফলমূল পাইব; কোথাও জলের অভাব হইলে, ইহারা যে সকল কূপ খনন করিয়া যাইবে, আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারিব; অধিকন্তু লোকের সহিত দরদস্তুর করিয়া আমাকে জ্বালাতন হইতে হইবে না; এ ব্যক্তি যে দ্রব্যের যে মূল্য স্থির করিয়া যাইবে, আমি তাহাতেই ক্রয়-বিক্রয় করিব।'

অনন্তর সেই নির্ব্বোধ বণিক পাঁচ শ গাড়ী বোঝাই করিয়া যাত্রা করিল এবং কয়েক দিন পরে লোকালয় ছাড়িয়া এক কান্তারের নিকট উপস্থিত হইল।[১] এই কান্তার অতি ভীষণ স্থান। ইহা অতিক্রম করিবার সময় ষাট যোজনের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জল পাওয়া যাইত না; অপিচ, এখানে যক্ষেরা[২] বাস করিত। বণিকের অনুচরেরা ইহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহারা যখন কান্তারের মধ্যভাগে পৌঁছিল, তখন যক্ষরাজ ভাবিল, 'এই নির্ব্বোধ বণিককে বুঝাইতে হইবে যে জল বহিয়া লইয়া যাওয়া অনাবশ্যক। তাহা হইলে এ সমস্ত জল ফেলিয়া দিবে এবং যখন মানুষ গরু সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, তখন আমরা অনায়াসে এই সকল লোকের প্রাণনাশ করিয়া মনের সাধে মাংস খাইব।'

এই দুরভিসন্ধি করিয়া যক্ষরাজ মায়াবলে এক মনোহর শকট সৃষ্টি করিল।

---

[১]। মূলে এখানে পঞ্চবিধ কান্তারের উল্লেখ আছে—চৌরকান্তার অর্থাৎ যেখানে দস্যুভয় আছে; ব্যালকান্তার অর্থাৎ যেখানে সিংহব্যাঘ্রাদির উপদ্রব আছে; নিরুদককান্তার অর্থাৎ যেখানে জল নাই; অমনুষ্যকান্তার অর্থাৎ যেখানে যক্ষরক্ষোভূতপ্রেতাদি অপদেবতার ভয় আছে; অল্পভক্ষ্যকান্তায় অর্থাৎ যেখানে খাদ্যাভাব। বণিক যে কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরুদক ও অমুনষ্য।

[২]। যক্ষেরা বৌদ্ধসাহিত্যে রাক্ষসস্থানীয়—মায়াবী ও আমমাংসাদ।

দুইটী তুষারধবল ষণ্ড উহা টানিতেছে; যক্ষরাজ বিভবশালী পুরুষের বেশে উহাতে উপবেশন করিয়া আছে। তাহার মস্তক নীল ও শ্বেত পদ্মের মালায় মণ্ডিত; কেশ ও বস্ত্র জলসিক্ত; শকটকের চক্র কর্দ্দমাক্ত। অগ্রে ও পশ্চাতে দশ বারজন যক্ষ অনুচরবেশে কার্ম্মুক, তীর, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চলিয়াছে; তাহাদেরও কেশ ও বস্ত্র আর্দ্র, মস্তকে নীলোৎপল ও শ্বেতপদ্মগুচ্ছ, মুখে মৃণালখণ্ড, চরণে কর্দ্দম।

সার্থবাহদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে চলিবার সময় যখন সম্মুখ দিক্ হইতে বায়ু বাহিতে থাকে, তখন দলপতি ধূলা এড়াইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অবস্থিত করেন, আর যখন পশ্চাৎ হইতে বায়ু চলে, তখন তিনি সকলের পশ্চাতে থাকেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বায়ু সম্মুখদিক হইতে বহিতেছিল। সুতরাং সেই নির্ব্বোধ বণিক দলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া যক্ষরাজ নিজের শকটখানি এক পার্শ্বে সরাইয়া লইল এবং অতি মধুরভাবে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, 'মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন?' বণিকও যক্ষরাজের শকটখানিকে পথ দিবার জন্য নিজের শকট এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল এবং কহিল, 'মহাশয়, আমরা বারাণসী হইতে আসিতেছি। আপনার মস্তকে ও হস্তে পদ্ম দেখিতেছি; আপনার অনুচরেরা মৃণাল চর্ব্বণ করিতেছেন; আপনাদের বস্ত্র জলসিক্ত, শকট কর্দ্দমাক্ত। পথে বৃষ্টি হইয়াছে কি এবং আপনি আসিবার সময় পদ্মবনশোভিত জলাশয় দেখিতে পাইয়াছেন কি?'

যক্ষরাজ উত্তর করিল, 'বলেন কি মহাশয়?' ঐ যে কিয়দ্দূরে নীলতরুরাজি দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থান হইতে সমস্ত বনে কেবল জল। ওখানে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছে; তড়াগাদি জলপূর্ণ রহিয়াছে; পথের দুই পার্শ্বে পদ্মপরিশোভিত শত শত সরোবর রহিয়াছে। এই বলিয়া সে শকটপরিচালকদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

'আপনারা কোথায় যাইবেন?' 'আমরা অমুক স্থানে যাইব।' 'এ গাড়ীখানিতে কি মাল আছে?' 'অমুক মাল।' 'এই যে, শেষের গাড়ীখানি খুব বোঝাই হইয়াছে বলিয়া বোধহয়, উহাতে কি আছে?' 'উহাতে জল আছে।'

'জল আনিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ এতক্ষণ জলের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন আর জল আবশ্যক হইবে না; সম্মুখে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। এখন ভাণ্ডের জল ফেলিয়া দিন; তাহা হইলে বোঝা কম হইবে; গাড়ী শীঘ্র শীঘ্র চলিতে পারিবে।'

তাহার পর যক্ষরাজ বলিল, 'আপনারা অগ্রসর হউন, আমরাও যাই; কথায় কথায় অনেক সময় গিয়াছে দেখিতেছি।' অনন্তর সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল এবং যেমন দেখিল, বণিকের দল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে, অমন যক্ষপুরে ফিরিয়া

গেল।

এদিকে নির্ব্বোধ বণিক যক্ষরাজের পরামর্শমত জলভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পানের জন্য গণ্ডূষমাত্র জল রাখিল না। এইরূপে বোঝা কমাইয়া সে পুনর্ব্বার পথ চলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু বহুদূর অগ্রসর হইয়াও কুত্রাপি জলের লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। ক্রমে সকলে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে সূর্য্যাস্তের পর গাড়ী থামাইয়া তাহারা বলদগুলি খুলিয়া, তাহাদিগকে দড়ি দিয়া চাকার সহিত বান্ধিয়া ও গাড়ীগুলি চারিদিকে সাজাইয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিল এবং নিজেরা তাহার মধ্যভাগে রহিল। কিন্তু মনুষ্য ও পশু কাহারও ভাগ্যে বিশ্রামসুখ ঘটিল না। বলদগুলি জল খাইতে পাইল না, মনুষ্যেরাও জলাভাবে ভাত রাঁধিতে পারিল না; সকলেই ক্ষুধায় ও পিপাসায় অবসন্ন হইয়া ভূতলে আশ্রয় লইল।

ইহার পর অন্ধকার হইল; যক্ষেরা নগর হইতে বাহির হইয়া মানুষ গরু সমস্ত মারিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই বণিকের বুদ্ধির দোষে তাহার দলের সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইল; তাহাদের কঙ্কালগুলি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিল। কিন্তু তাহাদের শকট বা শকটস্থ দ্রব্য যেমন ছিল, তেমনই রহিল; কেহই সেগুলিতে হাত দিল না।

বোধিসত্ত্ব নির্ব্বোধ বণিকের প্রায় দেড়মাস পরে নিজের পাঁচ শ গাড়ী লইয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে সেই কান্তারের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। তিনিই এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া প্রচুর জল তুলিয়া লইলেন এবং ভেরী বাজাইয়া অনুচরদিগকে নিজের শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'এখন আমাদিগকে যে কান্তারের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোথাও জল পাওয়া যায় না; তাহার মধ্যে নাকি অনেক বিষবৃক্ষও আছে। অতএব তোমরা কেহই আমার অনুমতি বিনা অঞ্জলিমাত্র জল ব্যবহার করিও না আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অজানা পাতা, ফুল বা ফলও মুখে দিও না।'

অনুচরদিগকে এইরূপে সাবধান করিয়া বোধিসত্ত্ব এই কান্তারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন উহার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষরাজ পূর্ব্ববৎ বেশভূষা করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, 'এ মনুষ্য নহে, যক্ষ।' তিনি ভাবিলেন, 'এ নিরুদক মরুদেশে জল কোথা হইতে আসিবে? এ ব্যক্তির চক্ষু এত রক্তবর্ণ এবং মূর্ত্তি এত উগ্র কেন? কেনই বা ভূমিতে ইহার ছায়া পড়ে না?[১] নির্ব্বোধ বণিক বেচারি নিশ্চয় ইহার কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচরগণসহ যক্ষদিগের উদরস্থ

---

[১]। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অপদেবতারা স্থূল শরীরহীন বলিয়া তাহাদের ছায়া পড়ে না।

হইয়াছে। দুরাত্মা যক্ষ জানে না, আমি কেমন বুদ্ধিমান ও উপায়কুশল।' অনন্তর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'দুর হ পাপিষ্ঠ। আমরা বণিক, আমরা স্বচক্ষে জলাশয় দেখিতে না পাইলে কখনও সঞ্চিত জল ফেলিয়া দিই না; যখন অন্য জল পাইবার উপায় দেখিব, তখন নিজের বুদ্ধিতেই বোঝা কমাইবার জন্য গাড়ীর জল ঢালিয়া ফেলিব, তোর কাছে পরামর্শ লইতে যাইব না।'

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া যক্ষরাজ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল এবং যখন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, তখন যক্ষপুরে ফিরিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, ঐ লোকটা না বলিল, অদূরে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইতেছে? দেখিলাম, উহার ও উহার সহচরদিগের মাথায় পদ্মের মালা, হাতে পদ্মের তোড়া, উহাদের চুল ও কাপড় ভিজা; উহারা মৃণাল খাইতে খাইতে যাইতেছে। এ অঞ্চলে যখন এত জল পাওয়া যায়, তখন বৃথা বহন করিয়া কষ্ট পাই কেন? অনুমতি দিন ত এখনই সমস্ত জল ঢালিয়া ফেলিয়া বোঝা হালকা করিয়া লই।'

তখন বোধিসত্ত্ব গাড়ীগুলি থামাইয়া দলের সমস্ত লোক একস্থানে সমবেত করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'এই মরুভূমিতে জলাশয় আছে এ কথা তোমরা পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছ কি?' তাহারা বলিল, 'না মহাশয়, এখানে জলাশয় নাই এবং সেই জন্য ইহার নাম নিরুদক কান্তার।'

উহারা বলিল, 'আমাদের সম্মুখে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে বৃষ্টি হইতেছে। আচ্ছা, বল ত, বৃষ্টি হইলে কত দূর হইতে জলো হাওয়া টের পাওয়া যায়?' 'এক যোজন দূরে বৃষ্টি হইলেও ঠাণ্ডা বাতাস গায় লাগে।' 'তোমরা ঠাণ্ডা বাতাস পাইয়াছ কি?' 'না মহাশয়, ঠাণ্ডা বাতাস পাই নাই।' 'যে মেঘে বৃষ্টি হয়, তাহার অগ্রভাগ কতদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়?' 'এক যোজন দূর হইতে।' 'আচ্ছা, তোমরা কেহ আজ মেঘের লেশমাত্র দেখিতে পাইয়াছ কি?' 'না, মহাশয়।' 'কত দূর হইতে বিদ্যুতের আভা দেখিতে পাওয়া যায় বলিতে পার কি?' 'চার পাঁচ যোজন দূর হইতে।' 'তোমরা কেহ আজ বিদ্যুৎ দেখিতে পাইয়াছ কি?' 'না, মহাশয়।' 'কত দূর হইতে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়?' 'দুই এক যোজন দূর হইতে।' 'তোমরা কেহ আজ মেঘগর্জ্জন শুনিয়াছ কি?' 'না, মহাশয়।'

'এখন তোমাদিগকে প্রকৃত কথা বলিতেছি। যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে জল ফেলিয়া দিতে পরামর্শ দিল, তাহারা মানুষ নহে, যক্ষ। তাহাদের অভিসন্ধি এই যে, জল ফেলিয়া দিলে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িব; তখন তাহারা অনায়াসে আমাদিগকে নিহত করিয়া পেট পুরিয়া মাংস খাইবে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের অগ্রে যে যুবক বণিক আসিয়াছিল, সে উপায়কুশল নয় বলিয়া

যক্ষদিগের কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচরদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ আজই আমরা তাহার সেই মালবোঝাই পাঁচ শ গাড়ী দেখিতে পাইব। তোমরা যত শীঘ্র পার, অগ্রসর হইতে থাক; সাবধান, বিন্দুমাত্র জলও যেন ফেলা না হয়।'

তখন সকলে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং যেখানে নির্ব্বোধ বণিকের গাড়ীগুলি পড়িয়া ছিল সেইখানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তথায় বিশ্রাম করিবার সঙ্কল্প করিয়া অনুচরদিগকে বলদগুলি খুলিয়া দিতে, গাড়ীগুলি মণ্ডালাকারে সাজাইয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিতে এবং শীঘ্র শীঘ্র আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে মনুষ্য ও গো সকলেরই ভোজন শেষ হইল, বোধিসত্ত্ব বলদগুলি স্কন্ধাবার মধ্যে রাখিয়া অনুচরদিগকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া থাকিতে বলিলেন এবং দলের কয়েকজন বাছা বাছা লোক লইয়া তরবারি-হস্তে পাহারা দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা করিলেন; বলদগুলিকে খাওয়াইলেন; নিজের যে সকল গাড়ী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি ত্যাগ করিয়া নির্ব্বোধ বণিকের ভাল ভাল গাড়ী বাছিয়া লইলেন, নিজের সঙ্গে যে সমস্ত অল্পমূল্য দ্রব্য ছিল, সেগুলিও ফেলিয়া দিয়া তদপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন; তাঁহার সঙ্গীদিগের এক প্রাণীও বিনষ্ট হইল না।

* * *

কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, পূর্ব্বে তার্কিকগণ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সত্যসেবিগণ যক্ষদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।'

এইরূপ উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত অতীত কথার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া শাস্তা ধ্রুবসত্য-শিক্ষাদানার্থ অভিসম্বুদ্ধ ভাবধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করলেন :

সত্যপথ, যাহা সর্ব্ব সুখের কারণ, করেন পণ্ডিতজন সদা প্রদর্শন।
তার্কিকের কাজ কিন্তু এর বিপরীত; কুপথে চালায়ে করে লোকের অহিত।
অতএব বিচারিয়া বুদ্ধিমান নর সত্যের শরণ লয়, সর্ব্বদুঃখহর।

ধ্রুবসত্য সম্বন্ধে এবংবিধ উপদেশ দিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,

'সত্যপথে বিচরণ করিলে যে কেবল ত্রিবিধ কুশল সম্পত্তি, ষড়বিধ কামস্বর্গ এবং ব্রহ্মালোক-সম্পত্তি[১] লাভ করা যায় তাহা নহে; তৎসঙ্গে সঙ্গে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটে। পক্ষান্তরে অসত্যমার্গ অবলম্বন করিলে চতুর্ব্বিধ অপায়[২] ভোগ করিতে হয় এবং নীচকুলে জন্ম[৩] হইয়া থাকে।' অতঃপর শাস্তা ষোড়শবিধ উপায়ে[৪] সত্যচতুষ্টয়[৫] ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত উপাসক স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন।

তখন দেবদত্ত[৬] ছিল সেই নির্ব্বোধ সার্থবাহ এবং তাহার শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ। পক্ষান্তরে তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই বুদ্ধিমান সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান সার্থবাহ।

----

[১]। নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা এই তিনটী কুশলসম্পত্তি। অব্যাপাদ—দয়া। অবিহিংসা—মৈত্রী। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ হইতে জাত। কামসর্গ—চতুর্মহারাজিক, যমলোক, ত্রয়স্ত্রিংশ, তুষিত প্রভৃতি ছয় সর্গ। ব্রহ্মালোক—ইহা দ্বিবিধ, রূপব্রহ্মালোক ও অরূপব্রহ্মালোক। রূপব্রহ্মালোক ষোল অংশে এবং অরূপব্রহ্মালোক চারি অংশে বিভক্ত। সাধুপুরুষেরা দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মফলে ইহার এক এক অংশে জন্মলাভ করেন।

[২]। নরক, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক ও অসুরলোক—এই চতুর্ব্বিধ অপায়।

[৩]। বেণ, নিষাদ, রথকার, পুক্কশ ও চণ্ডাল এই পঞ্চ নীচকুল। বেণ—ডোম, যাহারা বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। রথকার—যাহারা গাড়ি প্রস্তুত করে (সূত্রধর বিশেষ) ইহারাও নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত। পুক্কশ, পুল্কস বা পুক্কস—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মহাভারতে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়।

[৪]। ষোড়শবিধ উপায়—এই উপায়গুলি অভিধর্ম্মপিটকে ব্যাখ্যাত আছে; কিন্তু ব্যাখ্যাটী এত জটিল যে, এ পুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করিলে সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হইবে না।

[৫]। সত্যচতুষ্টয়—ইহারা আর্য্যসত্য নামে বর্ণিত। সত্যচতুষ্টয়ের নাম যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধ-মার্গ। দুঃখ-সমুদয় অর্থাৎ দুঃখের কারণ। দুঃখ-নিরোধ-মার্গ—যে উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বৌদ্ধমতে ভাবই দুঃখ, কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা—সম্মা দিট্‌ঠি, সম্মা সঙ্কপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা বায়ামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি। সম্মা = সম্যক, প্রকৃষ্ট; দিট্‌ঠি = দৃষ্টি; আজীবো = জীবিকা-নির্ব্বাহ; বায়ামো = চেষ্টা, উদ্যোগ; সতি = স্মৃতি।

[৬]। দেবদত্ত গৌতম-বুদ্ধের একজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতকের অনেক অংশে ইহার নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইহাকে দুরাচার ও দাম্ভিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২. বণ্ণুপথ-জাতক[১]

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য[২] ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিয়া তত্রত্য এক কুলপুত্রের[৩] প্রতীতি জন্মে যে, কামনাই দুঃখের নিদান। অতএব তিনি প্রব্রজ্যা[৪] গ্রহণ করিলেন, অভিসম্পদা-লাভার্থ পঞ্চবর্ষকাল জেতবনে অবস্থিতি করিয়া ক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃকাদ্বয়[৫] আয়ত্ত করিলেন, কি কি উপায়ে বিদর্শনা লাভ করা যায় তাহা শুনিলেন এবং শাস্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মস্থান[৬] গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক তাহার আভাস বা লক্ষণমাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। তখন

---

[১]। বণ্ণুপথ—বালুকামার্গ।

[২]। মূলে 'ওস্সট্‌ঠবিরিয়ম' (অবসৃষ্ঠ-বীর্য্য) এই পদ আছে। অবসৃষ্টবীর্য্য অর্থাৎ যে ধ্যানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরুৎসাহ। এ সম্বন্ধে উৎসাহশীল পুরুষেরা 'বীর্য্যবান', দৃঢ়বীর্য্য ইত্যাদি বিশেষণে কীর্তিত। বীর্য্য হিন্দুশাস্ত্রেও ঐশ্বর্য্যবিশেষ।

[৩]। কুলপুত্র—সদ্বংশজাত পুত্র, ভদ্রলোকের ছেলে।

[৪]। প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস, ভিক্ষুধর্ম্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত বয়স ১৫ বৎসর তবে বালকের ৭/৮ বৎসর বয়সেও (অর্থাৎ যখন তাহাদের কাক তাড়াইবার সামর্থ্য জন্মে) প্রব্রজ্যা লইতে থাকে। অনন্তর ভিক্ষুদিগের মধ্যে একজন আচার্য্যের ও একজন উপাধ্যায়ের আশ্রয় লইয়া নবীন ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করিতে হয়; নচেৎ তিনি উপসম্পদা অর্থাৎ পূর্ণবিদ্যা লাভ করিতে পারেন না। উপসম্পদা-প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বয়স বিশ বৎসর। প্রব্রজ্যা গ্রহণ ১৫ বৎসর বয়সে হইয়াছিল বলিয়াই এখানে এই ভিক্ষু পাঁচ বৎসর পরে উপসম্পদা পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। উপসম্পদা হইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ 'শ্রামণের' বা 'শ্রমণোদ্দেশক' নামে অভিহিত। তখন ইহারা হিন্দুদিগের ব্রহ্মচারীস্থানীয়।

[৫]। মাতৃকাদ্বয়—ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ।

[৬]। বিদর্শনা বা বিপশ্যনা = সূক্ষ্মদৃষ্টি; ইহা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়বিশেষ। কর্ম্মস্থান = ধ্যানের বিষয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এক একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রকৃতি ধ্যান করেন, এবং ক্রমশঃ একাগ্রতা বলে তাহার অনিত্যত্ব, অসারত্ব প্রভৃতি উপলব্ধ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধিমার্গে চল্লিশটী কর্ম্মস্থানের উল্লেখ দেখা যায়—দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, দশ অনুস্মৃতি, চারি ব্রহ্মবিহার, চারি আরুপ্য, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান। ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ প্রভৃতি দশবিধ কৃৎস্নের বিবরণ বেণুক জাতকের (৩৮শ) টীকায় দ্রষ্টব্য। শবের দশবিধ অবস্থা (অর্থাৎ যখন ইহা ফুলিয়া উঠিয়াছে, নীলবর্ণ হইয়াছে, কৃমি-সঙ্কুল হইয়াছে, অস্থিমাত্রসার হইয়াছে ইত্যাদি) অশুভ কর্ম্মস্থান। তান্ত্রিকদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের অশুভ কর্ম্মস্থান-চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়।
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, শীল, ত্যাগাদি দশটী বিষয়ের অনুস্মৃতিও কর্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আরুপ্য, সংজ্ঞা ও ব্যবস্থানের বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষ্যাতীত। ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়—যথা : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা (বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা)। কাহার কি কর্ম্মস্থান হইবে এবং কিরূপে উহার ধ্যান করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আচার্য্যের উপদেশ লওয়া আবশ্যক।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'শাস্তা চতুর্ব্বিধ মনুষ্যের[১] কথা বলিয়াছেন; আমি বোধহয় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। সম্ভবতঃ এজন্মে আমার ভাগ্যে মার্গপ্রাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব অরণ্যে বাস করিয়া কি লাভ? আমি শাস্তার নিকট ফিরিয়া যাই; তাঁহার অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক হইবে; মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া উক্ত ভিক্ষু জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

একদিন তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন, 'ভাই, তুমি না শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান লইয়া শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত বনে গিয়াছিলে? কিন্তু এখন দেখিতেছি বিহারে ফিরিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছ। তুমি কি প্রব্রজ্যার চরম লক্ষ্য অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিয়াছ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমি মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি দেখিলাম, আমার ভাগ্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। সেইজন্য নিরুদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।' 'তুমি যখন দৃঢ়বীর্য্য শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, তখন নিরুদ্যম হইয়া ভাল কর নাই। চল, তোমায় শাস্তার নিকট লইয়া যাই।' ইহা বলিয়া তাঁহারা ঐ নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন? এ কি করিয়াছে?' ভিক্ষুরা বলিলেন, 'ভদন্ত, ইনি এতাদৃশ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার সময় নিরুদ্যম হইয়া বিহারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।' তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে ভিক্ষু, তুমি সত্যই কি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর করিলেন, 'হাঁ ভদন্ত, আমি সত্য সত্যই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি।' 'সে কি কথা? কোথায় ঈদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া তুমি নিষ্কাম, সন্তুষ্ট, নির্জনবাসী ও দৃঢ়োৎসাহ হইবে, না তুমি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে! তুমি ত পূর্ব্বে বিলক্ষণ বীর্য্যবান ছিলে! তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে একদা মরুকান্তারে পঞ্চশত শকটের গো ও মনুষ্যগণ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তবে এখন তোমার এ দশা ঘটিল কেন?' শাস্তার এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের

---

[১]। চতুর্ব্বিধ মনুষ্য—তমস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত এবং পরজন্মেও দুর্গত হইবে), তমোজ্যোতিঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত, কিন্তু পরজন্মে দেবলোকে যাইবে), জ্যোতিস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান, কিন্তু পরজন্মে অধোগতি লাভ করিবে); জ্যোতির্জ্যোতিঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান, এবং পরজন্মেও দেবলোক লাভ করিবে)। অথবা, আত্মহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু পরহিত-প্রতিপন্ন নহে; পরহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু আত্মহিত-প্রতিপন্ন নহে; আত্মহিত-প্রতিপন্নও নয় পরহিত-প্রতিপন্নও নয়; আত্মহিত-প্রতিপন্ন, এবং পরহিত-প্রতিপন্ন—এরূপ শ্রেণীবিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়।

সঞ্চার হইল।

শাস্তার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, 'ভদন্ত, এই ভিক্ষুর বর্ত্তমান নিরুৎসাহভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে কেবল ইহারই বীর্য্যবলে মরুকান্তারে মনুষ্যদিগের পানীয়প্রাপ্তির কথা আমাদের জ্ঞানাতীত; আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাহা কেবল আপনারই পরিজ্ঞাত আছে। দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।' 'বলিতেছি শুন'; ইহা বলিয়া ভিক্ষুদিগের শ্রবণাকাঙ্ক্ষা উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবান তখন ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথার প্রকটন করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশত শকট লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠিযোজন বিস্তীর্ণ এক মরুকান্তারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানকার বালুকা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, মুষ্টি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইত। সূর্যেদয়ের পর এই বালুকারাশি প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তখন কাহার সাধ্য উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে? এই ভীষণ মরুদেশ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা রাত্রিকালে পথ চলিত, দিবাভাগে বিশ্রাম করিত। তাহারা জল, তেল, চাউল ও জ্বালাইবার কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাইত। যখন সূর্য্যোদয় হইত, তখন তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিত; গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে রাখিয়া মধ্যভাগে সামিয়ানা খাটাইত এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া ছায়ায় থাকিয়া দিনমান কাটাইত। অনন্তর যখন সূর্য্যাস্ত হইত, তখন তাহারা আবার শীঘ্র শীঘ্র আহার[১] করিয়া ভূতল শীতল হইবামাত্র পথ চলিতে আরম্ভ করিত। নাবিকেরা যেমন সমুদ্রগমনকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিগনির্ণয় করে, এই মরুভূমিতেও সেইরূপ পথিকদিগকে নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইত। তাহাদিগের সঙ্গে এক একজন 'স্থল-নিয়ামক'[২] থাকিত। উহারা নক্ষত্র দেখিয়া গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত।

বোধিসত্ত্ব যেদিন উক্ত কান্তারের ঊনষাট যোজন অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেইদিন মনে করিলেন, 'আজকার রাত্রিতেই আমরা মরুভূমির বাহিরে গিয়া

---

[১]। মূলে 'সায়মাশ' এই শব্দ আছে। এইরূপ 'প্রাতরাশ' বলিলে সকলের আহার (breakfast) বুঝায়।

[২]। নিয়ামক—পথপ্রদর্শক। স্থল-নিয়ামক—guide; জল-নিয়ামক—pilot.

পৌঁছিব।' ইহা ভাবিয়া তিনি সায়মাশের পর জল, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং এইরূপে বোঝা কমাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে চলিল, স্থল-নিয়ামক তাহাতে আসন গ্রহণ করিল এবং কোন দিকে গাড়ী চালাইতে হইবে, নক্ষত্র দেখিয়া বলিয়া দিতে লাগিল।

নিয়ামকটী দীর্ঘকাল সুনিদ্রা ভোগ করে নাই। আজ কিয়দ্দূর চলিবার পর সে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, কাজেই বলদগুলা যখন বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। গাড়ীগুলি সারারাত এইরূপে উল্টা পথে চলিল। অনন্তর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে নিয়ামকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে নক্ষত্র দেখিয়া 'গাড়ী ফিরাও,' 'গাড়ী ফিরাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত গাড়ী ফিরাইয়া পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ করিতে না করিতেই সূর্য্য দেখা দিলেন; সকলে সভয়ে দেখিল, তাহারা সায়ংকালে যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তখন 'হায়, সর্ব্বনাশ হইল; আমাদের সঙ্গে জল নাই, কাঠ নাই, আজ কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব?'— এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিয়া এবং নিতান্ত হতাশ হইয়া যে যাহার গাড়ীর তলে শুইয়া পড়িল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ইহাদের এক প্রাণীরও জীবন রক্ষা হইবে না। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।' অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে একগুচ্ছ কুশ দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ঐ স্থানের নিম্নে নিশ্চয় জল আছে; নচেৎ মরুক্ষেত্রে কখনও কুশ জন্মিতে পারে না। তখন তিনি অনুচরদিগকে কোদাল দিয়া ঐ স্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহারা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যখন ষাট হাত নিম্নেও জল পাওয়া গেল না, অপিচ পাষাণে কোদাল লাগিয়া ঠং ঠং করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আশা ছাড়িলেন না। তিনি কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া পাষাণের উপর কাণ পাতিলেন এবং নিম্নে জলপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি উপরে উঠিয়া নিজের বালক ভৃত্যকে[১] বলিলেন, তুমি নিরুদ্যম হইলে সকলেই মারা যাইবে। তুমি সাহসে ভর করিয়া এই বড় হাতুড়িটা[২] লইয়া নিচে নাম এবং পাথরে ঘা মার।

বালক ভৃত্যটী বিলক্ষণ উৎসাহবান ছিল। অন্য সকলে উদ্যমহীন হইয়াছে

---

[১]। মূলে 'চুলূপট্‌ঠাপ' এই শব্দ আছে।

[২]। মূলে 'অয়কূট' এই শব্দ আছে।

দেখিয়াও সে নিরুদ্যম হইল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিল; অমনি পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন অবরুদ্ধ জলরাশি তালাপ্রমাণ-স্তম্ভাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং সকলে মহানন্দে স্নান করিতে লাগিল। সঙ্গে যে সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত ধুরা প্রভৃতি ছিল, সেইগুলি চিরিয়া তাহারা জ্বালানি কাঠের যোগাড় করিয়া লইল এবং ভাত রান্ধিয়া খাইল। শেষে গরুগুলিকে খাওয়াইয়া এবং কূপপার্শ্বে একটা ধ্বজা তুলিয়া তাহারা সন্ধ্যার পর অভীষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে তাহারা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল এবং আয়ুঃশেষ হইলে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্য কর্ম্মে জীবন যাপন করিয়া দেহত্যাগান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে গেলেন।

* * *

[কথা শেষ হইলে সম্যকসম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধ-ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :

সুগভীর কূপ করিল খনন অক্লান্ত বণিকদল,
তাই তারা পে'ল ভীম মরুস্থলে প্রচুর শীতল জল।
সেইরূপ জে'ন, জ্ঞানীজন যত বিচরণে ভূমণ্ডলে,
হৃদয়ের শান্তি লভেন তাঁহারা অধ্যবসায়ের বলে।

অনন্তর শাস্তা আর্য্যসত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু চরম ফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

সমবধান[১]—তখন এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল বালক-ভৃত্য—যে প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া সঙ্গীদিগের পানার্থ জল উত্তোলন করিয়াছিল। তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

---

৩. সেরিবাণিজ-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সাধনা ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিলে অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা বলিলেন, 'এই মার্গফলপ্রদ শাসনে

[১]। প্রায় সমস্ত জাতকের শেষেই দেখা যায়, 'অতীত ও বর্ত্তমান কথার সম্বন্ধ দেখাইলেন এবং নিম্নলিখিত সমবধান দ্বারা জাতকের উপসংহার করিলেন।' পুনঃ পুনঃ এরূপ বলা অনাবশ্যক বলিয়া অতঃপর এই অংশ কেবল 'সমবধান' শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হইবে।

প্রবিষ্ট হইয়া যদি তুমি উৎসাহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া সেরিব বণিকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হইবে।' অনন্তর ভিক্ষুগণ শাস্তাকে সেই কথা সবিস্তর বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; শাস্তাও তাঁহাদের অবগতির জন্য ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে, বর্ত্তমান সময়ের চারিকল্প পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব, সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালার কাজ[১] করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল 'সেরিবান'। সেরিবরাজ্যে সেরিবা নামে আরও এক ব্যক্তি ঐ কারবার করিত। ইহার বড় অর্থলালসা ছিল। একদা বোধিসত্ত্ব তাহাকে সঙ্গে লইয়া তেলবাহনদের অপরপারে অন্ধপুরনগরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা কে কোন রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন। কথা হইল একজন যে রাস্তায় একবার ফেরি করিয়া গিয়াছেন, অপরজন তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন।

অন্ধপুরে পূর্ব্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠীপরিবার বাস করিত। কালে কমলার কোপে পড়িয়া তাহারা নির্ধন হয়, একে একে পুরুষেরাও মারা যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ঐ বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা সৌভাগ্যের সময় যে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, সেটী তখনও ছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং ভগ্নপাত্রাদির মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার উপর এত ময়লা জমিয়াছিল, যে সহসা উহা সোণার বাসন বলিয়া বোধ হইত না।

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা 'কলসী কিনিবে' 'কলসী কিনিবে' বলিতে বলিতে ঐ শ্রেষ্ঠীদিগের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহা শুনিয়া বালিকাটী বলিল, 'আমায় একখানা গহনা কিনিয়া দাওনা, দিদিমা।' দিদিমা বলিলেন, 'বাছা, আমরা গরিব লোক, পয়সা পাইব কোথায়?' তখন বালিকা সেই সোণার বাসনখানি আনিয়া বলিল, 'এইখানা বদল দিলে হয় না কি? ইহা ত আমাদের

[১]। মূলে 'কচ্ছপুটবাণিজ্যে' এই পদ আছে। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ যে 'বণিক্ পণ্যভাণ্ড কক্ষে লইয়া ফেরি করিয়া বেড়ায়।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, বোধিসত্ত্ব ফেরি করিবার সময় 'কলসী কিনিবে' বলিয়া হাঁকিয়াছিলেন, অথচ বালিকা তাহা শুনিয়া গহনা (সম্ভবতঃ পিত্তলের) কিনিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে একালের ফেরিওয়ালের ন্যায় তাহারও ভাণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নানারূপ দ্রব্য ছিল।

কোন কাজে লাগে না।' বৃদ্ধা ইহাতে আপত্তি না করিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া বাসনখানি দিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, ইহার বদলে আপনার এই বোনটীকে যাহা হয় একটা জিনিস দিন।'

বাসনখানি দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল, সম্ভবতঃ উহা স্বর্ণনির্ম্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে সূচী দিয়া উহার পিঠে দাগ কাটিল এবং উহা যে সোণার বাসন সে সম্বন্ধে তখন আর তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু মেয়েমানুষ দুইটাকে ঠকাইয়া ইহা বিনামূল্যে লইব, এই দূরভিসন্ধি করিয়া সে বলিল, 'ইহার আবার দাম কি? ইহা সিকি পয়সায়[১] কিনিলেও ঠকা হয়' অনন্তর সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ করিয়া বাসনখানি ভূমিতে ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার ক্ষণকাল পরেই বোধিসত্ত্ব সেই পথে ফেরি করিতে আসিলেন এবং 'কলসী কিনিবে', 'কলসী কিনিবে' বলিতে বলিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকাটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রার্থনা জানাইল। বৃদ্ধা কহিলেন, 'যে বাসন বদল দিতে গিয়াছিলে তাহার ত কোন দামই নাই শুনিলে। আমাদের আর কি আছে, বোন, যাহা দিয়া তোমার সাধ পুরাইতে পারি?'

বালিকা কহিল, 'সে ফেরিওয়ালা বড় খারাপ লোক, দিদিমা। তাহার কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। কিন্তু এ লোকটী দেখতে কত ভাল, ইহার কথাও কেমন মিষ্টি। এ বোধহয় ঐ ভাঙ্গা বাসন লইতে আপত্তি করিবে না।' তখন বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন এবং বাসনখানি তাঁহার হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখিবামাত্রই বুঝিলেন উহা সুবর্ণনির্ম্মিত। তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মা, এ বাসনের দাম লক্ষমুদ্রা। আমার নিকট এত অর্থ নাই।'

বৃদ্ধা কহিলেন, 'মহাশয়, এই মাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা আসিয়াছিল। সে বলিল, ইহার মূল্য সিকি পয়সাও নহে। বোধহয় আপনার পুণ্যবলেই বাসনখানি এখন সোণা হইয়াছে। আমরা ইহা আপনাকেই দিব; ইহার বিনিময়ে আপনি যাহা ইচ্ছা দিয়া যান।' বোধিসত্ত্বের নিকট তখন নগদ পাঁচ শ কাহণ[২] এবং ঐ মূল্যের পণ্যদ্রব্য ছিল। তিনি ইহা হইতে কেবল নগদ আট কাহণ এবং দাঁড়িপাল্লা ও থলিটী লইয়া অবশিষ্ট সমস্ত বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া বাসনখানি গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পারিলেন নদীতীরে

---

[১]। মূলে 'অর্দ্ধমাসক' এই শব্দ আছে।

[২]। সংস্কৃত কার্ষাপণ, পালি কহাপণ। ইহার অর্থ (১) এক কর্ষ (কর্ষ = ১৬ মাষা = ৮০ কিংবা ১২৮ রতি); (২) ঐ ওজনের স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রমুদ্রা। রৌপ্যকার্ষাপণ = ১২৮০ কড়া; তাম্রকার্ষাপণ ৮০ কড়া।

উপস্থিত হইলেন। সেখানে একখানি নৌকা ছিল। তিনি ইহাতে আরোহণ করিয়া মাঝির হাতে আট কাহণ দিয়া বলিলেন, 'আমাকে শীঘ্র পার করিয়া দাও।'

এদিকে লোভী বণিক শ্রেষ্ঠীদিগের গৃহে ফিরিয়া বাসনখানি আবার দেখিতে চাহিল। সে বলিল, 'ভাবিয়া দেখিলাম তোমাদিগকে ইহার বদলে একেবারে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না।' তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, 'সে কি কথা, বাপু? তুমি না বলিলে উহার দাম সিকি পয়সাও নয়! এই মাত্র একজন সাধু বণিক আসিয়াছিলেন। বোধহয় তিনি তোমার মনিব হইবেন। তিনি আমাদিগকে হাজার কাহণ দিয়া উহা কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন।'

এই কথা শুনিবামাত্র সেই লোভী বণিকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল; সঙ্গে যে সকল মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্য ছিল তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। অনন্তর উলঙ্গ হইয়া, 'হায়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দুরাত্মা ছল করিয়া আমার লক্ষ মুদ্রার সুবর্ণ পাত্র লইয়া গিয়াছে,' এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে এবং তুলাদণ্ডটী মুদ্গরের ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বোধিসত্ত্বের অনুসন্ধানে নদীতীরে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখে নৌকা তখন নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে 'নৌকা ফিরাও' 'নৌকা ফিরাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিষেধ করায় মাঝি নৌকা ফিরাইল না। বোধিসত্ত্ব অপর পারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দুষ্টবুদ্ধি বণিক, একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; অনন্তর সূর্য্যের তাপে জলহীন তড়াগের তলদেশস্থ কর্দ্দম যেমন শতধা বিদীর্ণ হয়, দারুণ যন্ত্রণায় তাহার হৃৎপিণ্ডও সেইরূপ বিদীর্ণ হইল; তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবন যাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[কথান্তে সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়া শাস্তা এই গাথা পাঠ করিলেন :

মুক্তি-মার্গ প্রদর্শক বুদ্ধের শাসন; লভিতে সুফল তাহে কর প্রাণপণ।
নিরুৎসাহ অনুতাপ ভুঞ্জে চিরদিন, বণিক সেরিবা যথা ধর্ম্মজ্ঞানহীন।

এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্বরূপ সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত[১] ছিল সেই ধূর্ত্ত বণিক, এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ বণিক]

----

৪. চুল্লকশ্রেষ্ঠী-জাতক[২]

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী জীবকাম্রবণে[৩] অবস্থান করিবার সময় স্থবির চুল্লপন্থকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজগৃহের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীকন্যা পিত্রালয়ে এক দাসের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। এ কথা প্রকাশ পাইলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া একদিন শ্রেষ্ঠীকন্যা তাহার প্রণয়ীকে বলিল, 'এখানে আর থাকা যায় না; মাতাপিতা এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা জানিতে পারিলে আমাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। চল, এখন বিদেশে আত্মীয় বন্ধুদিগের আগোচরে কোথাও গিয়া বাস করি।' অনন্তর শ্রেষ্ঠীকন্যা একদিন রাত্রিকালে ঐ দাসের সহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি হস্তে লইয়া প্রধান দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বহুদূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠীকন্যা সসত্ত্বা হইল এবং প্রসবকাল আসন্ন জানিয়া একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, 'দেখ, এরূপ নির্ব্বান্ধব স্থানে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে; অতএব ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন চল আমার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাই।' তাহার স্বামী কিন্তু আজ না কাল করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা ভাবিল, 'এই মূর্খ দণ্ডের ভয়ে যাইতে চাহিতেছে না; আমার কিন্তু মাতাপিতাই পরমবন্ধু; এ যাউক বা না যাউক, আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতেই হইবে।' অনন্তর সে একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সমস্ত গৃহসামগ্রী যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীকে 'আমি পিত্রালয়ে চলিলাম,' এই কথা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দাস গৃহে ফিরিয়া শুনিল তাহার পত্নী পিত্রালয়ে গিয়াছে। সে কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সমীপে উপনীত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রেষ্ঠীকন্যার প্রসববেদনা উপস্থিত

---

[১]। দেবদত্ত গৌতম-বুদ্ধের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[২]। চুল্ল—ছোট (সংস্কৃত 'খুল্ল' শব্দের অনুরূপ, 'খুল্ল' শব্দ আবার 'ক্ষুদ্র' শব্দেরই রূপান্তর।

[৩]। জীবক রাজগৃহের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইনি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ছিলেন। বুদ্ধদেবও দুই একবার পীড়াক্রান্ত হইয়া ইহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল ইহার আম্র কাননে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জীবক সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

হইল; সে পথিমধ্যে এক পুত্র প্রসব করিল।

প্রসবকালে পিত্রালয়ে থাকিবার জন্যই শ্রেষ্ঠীকন্যা পতিগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে যখন প্রসব হইল, তখন সে দেখিল সেখানে যাওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং তাহারা স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। পুত্রটী পথে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহার 'পন্থক' এই নাম রাখিল।

ইহার পর শ্রেষ্ঠীকন্যা আবার গর্ভধারণ করিল। প্রথমবারে যেরূপ ঘটিয়াছিল, এবারও ঠিক সেইরূপ ঘটিল এবং এবারও তাহারা নবজাত শিশুর 'পন্থক' নাম রাখিল। তদবধি লোকে প্রথম পুত্রটীকে 'মহাপন্থক' এবং দ্বিতীয় পুত্রটীকে 'চুল্লপন্থক' বলিত।

পন্থকদ্বয় শুনিত অন্য বালকেরা কেহ খুড়া-জ্যাঠার, কেহ ঠাকুর মা-ঠাকুর দাদার কথা বলে। তাহারা একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, আমাদের কি ঠাকুর মা, ঠাকুর দাদা নাই?' মাতা বলিল, 'আছেন বৈকি। তোমাদের ঠাকুর দাদা রাজগৃহের একজন বড় বণিক; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। সেখানে তোমাদের আরও কত আপন লোক আছেন।' বালকেরা বলিল, 'তবে আমরা সেখানে থাকি না কেন?' মাতা পুত্রদ্বয়কে যথাসম্ভব কারণ বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহারা প্রবোধ মানিল না; তাহারা রাজগৃহে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে শ্রেষ্ঠীকন্যা অগত্যা স্বামীকে বলিল, 'ছেলেরা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। চল, ইহাদিগকে মাতামহালয় দেখাইয়া আনি। বাপ-মা কি আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন?' 'ইহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি তোমার মা-বাপের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।' 'তা নাই দেখাইলে। কোন না কোন উপায়ে ছেলেরা তাহাদের দাদা মহাশয়কে দেখিতে পাইলেই হইল।'

অনন্তর তাহারা পুত্রদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে গমন করিল এবং নগরদ্বারে একটা বাসা লইল। পরদিন শ্রেষ্ঠীকন্যা পুত্র দুইটীকে লইয়া মাতাপিতার নিকট নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাঁহারা বলিলেন, 'সংসারী লোকের নিকট পুত্রকন্যা পরম প্রীতির পাত্র; কিন্তু আমাদের কন্যা ও তাহার স্বামী এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাদের মুখ দর্শন করিতে নাই। এই ধন লও; ইহা লইয়া তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক; তবে ছেলে দুইটীকে আমাদের কাছে রাখিয়া যাইতে পারে।' শ্রেষ্ঠীকন্যা দূতদিগের হস্ত হইতে পিতৃপ্রেরিত ধন গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগেরই সঙ্গে পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়া দিল। তদবধি এই বালক দুইটী মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

চুল্লপন্থক তখন নিতান্ত শিশু। মহাপন্থক অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বলিয়া সে মাতামহের সঙ্গে দশবলের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইত। প্রতিদিন ধর্ম্মকথা

শুনিয়া তাহার মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জন্মিল এবং একদিন সে মাতামহকে বলিল, 'দাদা মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি।' বৃদ্ধ বলিলেন, 'কি বলিলি, ভাই! সমস্ত জগৎ প্রব্রজ্যা লইলে আমার যে সুখ হইবে, তুই প্রব্রজ্যা লইলে তাহার শতগুণ সুখ হইবে। যদি পারিবি বুঝিস্, তবে স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।' ইহা বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠীন, তোমার সেই দৌহিত্রটীকে সঙ্গে আনিয়াছ ত!' 'হাঁ ভগবন, তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি। সে আপনার নিকট প্রব্রজ্যা লইতে চায়।' ইহা শুনিয়া শাস্তা একজন স্থবিরকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এই বালককে প্রব্রজ্যা দান কর।' স্থবির পঞ্চকর্ম্মস্থান আবৃত্তি করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। সে যত্নসহকারে বহু বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ক্রমশঃ অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিল।

মহাপন্থক ধ্যানসুখ ও মার্গসুখ অনুভব করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চুল্লপন্থককে ইহার আস্বাদ পাওয়াইতে হইবে।' তখন তিনি মাতামহের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'দাদা মহাশয়, অনুমতি দিন ত আমি চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করি।' দাদা মহাশয় বলিলেন, 'স্বচ্ছন্দে দান কর; আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।' ইহা শুনিয়া মহাপন্থক চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করিলেন এবং দশশীল শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু প্রব্রজ্যা লাভের পর চুল্লপন্থকের বুদ্ধির জড়তা প্রকাশ পাইল; সে ক্রমাগত চারি মাস চেষ্টা করিয়াও নিম্নলিখিত একটী মাত্র গাথা আয়ত্ত করিতে পারিল না :

> অনাঘ্রাতগন্ধ যথা প্রফুল্ল কমল
> প্রভাতে তড়াগবক্ষে করে টলমল;
> কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শোভার আকর
> বিতরে সহস্ররশ্মি দেব দিবাকর;
> সেই মত তথাগত ভবকর্ণধার;
> উজলিছে দশদিক্ প্রভায় তাঁহার।

শুনা যায় সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় এই চুল্লপন্থক প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান হইয়াছিলেন; কিন্তু একদিন কোন জড়বুদ্ধি ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্রে কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন ঐ ব্যক্তি এত লজ্জিত হইয়াছিল যে, অতঃপর সে কখনও উক্ত অংশ অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই পাপে ইহজন্মে চুল্লপন্থক নিজেই এত জড়বুদ্ধি হইয়াছিল

যে নূতন একটী পঙ্‌ক্তি শিখিতে গিয়া পূর্ব্বে যে পঙ্‌ক্তি শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইত এবং চারি মাস চেষ্টা করিয়াও একটী মাত্র গাথা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই।

চুল্লপন্থকের জড়তা দেখিয়া মহাপন্থক বলিল, 'ভাই, তুমি বুদ্ধশাসনের অধিকারী নহ; তুমি যখন চারি মাসে একটী গাথা শিখিতে পারিলে না, তখন ভিক্ষুজীবনের চরমফল লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তুমি বিহার হইতে চলিয়া যাও।' কিন্তু চুল্লপন্থক বুদ্ধশাসনে এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, এইরূপে বিদূরিত হইয়াও সে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল না।

এই সময় মহাপন্থকের উপর ভিক্ষুদিগের খাদ্যবন্টন করিবার ভার ছিল। একদিন জীবক কৌমারভৃত্য আম্রকাননে গিয়া শাস্তাকে নানাবিধ গন্ধমাল্য উপহার দিলেন, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া ও শাস্তাকে প্রণাম করিয়া মহাপন্থকের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আজ-কাল শাস্তার নিকট কতজন ভিক্ষু আছেন?' মহাপন্থক বলিলেন, 'পাঁচ শ'। আগামীকল্য বুদ্ধপ্রমুখ এই পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার গৃহে আহার করিবেন কি?' 'ইহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষু বড় জড়মতি। সে ধর্ম্মপথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতএব তাহাকে ব্যতীত অপর সকলের জন্য আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।'

ইহা শুনিয়া চুল্লপন্থক ভাবিল, 'নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় দাদা আমায় বাদ দিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতাশূন্য হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধশাসন লইয়া আমি কি করিব?' পুনর্ব্বার গৃহী হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি গিয়া।' অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে সে পুনর্ব্বার গৃহী হইবার অভিপ্রায়ে কুটীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র শাস্তা জগতের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত অবলোকন করিতেছিলেন। চুল্লপন্থকের চেষ্টিত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল এবং সে কুটীর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারদেশে পদচারণ করিতে লাগিলেন। চুল্লপন্থক বাহির হইয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'চুল্লপন্থক, তুমি এত ভোরে কোথায় যাইতেছ?' 'দাদা আমাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য যেখানে হয় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইব স্থির করিয়াছি।' 'চুল্লপন্থক, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা পাইয়াছ। তোমার দাদা যখন তোমায় তাড়াইয়া দিল, তখন তুমি আমার নিকট আসিলে না কেন?' তুমি ফিরিয়া আইস; গৃহী হইয়া কি করিবে? এখন অবধি তুমি আমার নিকট

থাকিবে।' ইহা বলিয়া শাস্তা চুল্লপন্থককে লইয়া গন্ধকুটীরের দ্বারে উপবেশন করিলেন এবং স্বীয় প্রভাববলে একখণ্ড পরিশুদ্ধ বস্ত্র সৃষ্টি করিয়া উহা চুল্লপন্থকের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'তুমি পূর্ব্বাস্যে উপবেশন কর এবং এই বস্ত্রখণ্ড হস্ত দ্বারা পরিমার্জন করিতে করিতে 'রজোহরণ', 'রজোহরণ' মন্ত্র জপ করিতে থাক।' অনন্তর শাস্তা যথাসময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া জীবক-গৃহে গমনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।

এদিকে চুল্লপন্থক সেই বস্ত্রখণ্ড পরিমার্জ্জন করিতে করিতে সূর্য্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া 'রজোহরণ', 'রজোহরণ' মন্ত্র জপ আরম্ভ করিল। সে যতই জপ করিতে লাগিল, ঐ বস্ত্রখণ্ড ততই মলিন হইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'এই মাত্র বস্ত্রখণ্ড অতি নির্ম্মল ছিল; কিন্তু আমার স্পর্শে ইহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল। ইহা এখন মলিন হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে জগতে বিমিশ্র বস্তু মাত্রেই অনিত্য।' এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাহার মনে ক্ষয় ও বিনাশের জ্ঞান জন্মিল এবং সে বিদর্শনা লাভ করিল। শাস্তা জীবকগৃহে থাকিয়াই জানিতে পারিলেন চুল্লপন্থকের বিদর্শনা-লাভ হইয়াছে; তখন দেহ হইতে নিজের একটী প্রভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া তদ্বারা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'চুল্লপন্থক, এই বস্ত্রখণ্ড যে মলসংসর্গে কলুষিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া হতাশ হইও না। তোমার হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি কত মল আছে, তুমি সেইগুলি বিদূরিত কর। অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি পাঠ করিলেন :

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়;
কামরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যেজন যতনে এই কামমল মন হতে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।
ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়;
ক্রোধরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যেজন যতনে এই ক্রোধমল মন হতে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।
ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়;
মোহরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যেজন যতনে এই মোহমল মন হতে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

এই গাথাগুলি শুনিয়া চুল্লপন্থক পিটকাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। প্রবাদ আছে তিনি কোন অতীত জন্মে রাজা ছিলেন এবং একদিন নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় এক খণ্ড পরিস্কৃত বস্ত্র দ্বারা কপালের ঘাম মুছিয়া ছিলেন। তাহাতে ঐ

বস্ত্রখণ্ড মলিন হইয়া যায় দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমার অপবিত্র দেহস্পর্শেই এই শুদ্ধ বস্ত্রখানির স্বাভাবিক শুক্লতা বিনষ্ট হইল, অতএব জগতের সমস্ত যৌগিক পদার্থই অনিত্য।' এইরূপে তাঁহার মনে অনিত্যত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞানের ফলে এখন মন হইতে অপবিত্রতা দূর করিবামাত্র তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল।

এখন দেখা যাউক জীবকের আলয়ে কি হইতেছিল। ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে জীবক দশবলকে ভোজ্য দ্রব্য উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাজল[১] আনয়ন করিলেন, কিন্তু শাস্তা হাত দিয়া ভিক্ষাপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিহারের সমস্ত ভিক্ষুই আসিয়াছে কি?' মহাপন্থক উত্তর দিলেন, 'সকলেই আসিয়াছেন; বিহারে কেহই নাই।' শাস্তা বলিলেন, 'আছে বৈ কি; বিহারে এখনও অনেক ভিক্ষু আছে।' ইহা শুনিয়া জীবক কৌমারভৃত্য[২] বলিলেন, 'কে আছিস্‌রে এখানে?' একবার দৌড়িয়া বিহারে গিয়া দ্যাখ, সেখানে কতজন ভিক্ষু আছেন।'

এদিকে চুল্লপন্থক ধ্যানবলেই বুঝিতে পারিলেন যে মহাপন্থক বলিয়াছেন বিহারে কোন ভিক্ষু নাই। এই কথা যে সত্য নহে এবং বিহারে যে তখনও ভিক্ষু আছেন, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রত্যয়বলে সমস্ত আম্রকানন ভিক্ষুপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তাঁহারা কেহ চীবর সীবন করিতেছেন, কেহ বস্ত্র রঞ্জিত করিতেছেন, কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপে সহস্র ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল—তাঁহারা এক একজন যেন এক এক কাজে ব্যস্ত এবং প্রত্যেকের আকার অপর সকলের আকার হইতে ভিন্ন। বিহারে এত ভিক্ষু দেখিয়া জীবকের ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'সমস্ত উদ্যান ভিক্ষুপূর্ণ।' প্রকৃতপক্ষে কিন্তু

একাকী পন্থক চুল্ল সহস্র বিগ্রহ ধরি / ছিলা সেই আম্রবণে আহ্বান প্রতীক্ষা করি।

শাস্তা ঐ ভৃত্যকে বলিলেন, 'তুমি আবার যাও; বল গিয়া যাঁহার নাম চুল্লপন্থক, শাস্তা তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।' ভৃত্য আম্রকাননে গিয়া এই কথা বলিল; অমনি সহস্র মুখ হইতে 'আমি চুল্লপন্থক', 'আমি চুল্লপন্থক' এই বাক্য নির্গত হইল। তখন সে পুনরায় জীবকের গৃহে গিয়া বলিল, 'ভগবন, তাঁহারা সকলেই বলিলেন, 'আমি চুল্লপন্থক।' শাস্তা বলিলেন, 'আচ্ছা, বাপু, তুমি আরও একবার যাও এবং সর্ব্বপ্রথম যে বলিবে 'আমি চুল্লপন্থক' তাহার

---

[১]। দাতা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দাতব্য বস্তু উৎসর্গ করেন। ইহাকে দক্ষিণাজল বলে।

[২]। কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্য আয়ুর্ব্বেদের একটী অংশ। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা ইহার অঙ্গ। জীবক ইহাতে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া 'কৌমারভৃত্য' উপাধি পাইয়াছিলেন।

হাত ধরিয়া ফেল। তাহা করিলেই অন্য সকলেই অন্তর্দ্ধান হইবে।' ভৃত্য আদেশ মত কার্য্য করিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই মায়া-ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হইল। স্থবির[১] চুল্লপন্থক তাহার সহিত জীবকের আলয়ে উপনীত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে শাস্তা বলিলেন, 'জীবক, তুমি চুল্লপন্থকের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কর; ইনিই অদ্য তোমার এই ভোজের অনুমোদন করিবেন।'[২] জীবক তাঁহাই করিলেন; অমনি চুল্লপন্থক সিংহনাদে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অনুমোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘসহ বিহারে প্রতিগমন করিলেন, ভিক্ষুদিগের কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গন্ধকূটীরের[৩] দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন, কাহার কি কর্ম্মস্থান তাহা স্থির করিয়া দিলেন এবং অবশেষে গন্ধকুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দিক হইতে ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, আসনস্থ ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলশাণী[৪] প্রলম্বিত করিলে তাহার যেমন শোভা বর্দ্ধিত হয়, ভিক্ষুদিগের গুণগানে শাস্তার মহিমাও যেন সেইরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, মহাপন্থক চুল্লপন্থকের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই; চুল্লপন্থক চারিমাসে একটীমাত্র গাথা অভ্যাস করিতে পারেন নাই দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ইহার বুদ্ধি অতি স্থূল। সেই জন্য তিনি ইহাকে বিহার হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধের অলৌকিক ধর্ম্মজ্ঞানপ্রভাবে এই জড়মতি ব্যক্তি এক দিনে আহারের আয়োজনে যতটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদাসহ[৫] অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। এখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-

---

[১]। পালি 'থের' (স্ত্রীং 'থেরী')। স্থবির ত্রিবিধ—জাতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা বার্দ্ধক্যহেতু স্থবিরপদবাচ্য; ধর্ম্মস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত; সম্মতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা উপসম্পদা লাভের দশ বৎসর পরে 'স্থবির' আখ্যা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। চুল্লপন্থক ধর্ম্মস্থবির হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।

[২]। অনুমোদন করা, অর্থাৎ' 'এই ভোজ অতি উত্তম হইয়াছে' এবংবিধ বাক্যদ্বারা দাতার নিকট কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ করা এবং দাতাকে আশীর্ব্বাদ করা।

[৩]। গন্ধকুটীর—বিহারের যে কক্ষে বুদ্ধদেব স্বয়ং ধ্যানাদি করিতেন, তাহাকে গন্ধকুটীর বলা হইত; সাধারণতঃ এই শব্দটী জেতবনস্থ মহাবিহারের বুদ্ধকক্ষ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত।

[৪]। শাণী শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, পর্দ্দা। 'ছানি' শব্দটী ইহারই অপভ্রংশ কি?

[৫]। বিশেষপূর্ব্বক বিচারক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ—অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভানসম্ভিদা, অর্থাৎ শব্দের অর্থশাস্ত্র, শাস্ত্রবাক্যজ্ঞান, শব্দের উৎপত্তিজ্ঞান এবং ধ্রুবজ্ঞান। এই চারি প্রকার জ্ঞান না জন্মিলে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে না।

পারদর্শী। অহো! বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি।’

ধর্ম্মশালায় যে কথোপকথন হইতেছিল ভগবান তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দেখা দিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। রক্তবর্ণ দোপাট্টার উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় কায়বন্ধ সংযোজিত হইল; সর্ব্বোপরি রক্তকম্বল-সদৃশ বুদ্ধোচিত মহাচীবর শোভা পাইতে লাগিল। যখন তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধলীলা-শোভিত গতি দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন কেশরী বা প্রমত্ত গজেন্দ্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সেই অলঙ্কৃত ধর্ম্মমণ্ডপে প্রভাময় বুদ্ধাসনে অধিরোহণ করিলেন; তাঁহার দেহনিঃসৃত ষড়বর্ণ রশ্মিজাল উদয়াচল-শিখরারূঢ়[১] বালসূর্য্যের অণববক্ষঃপ্রতিফলিত অংশুমালার ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিল। সম্যকসম্বুদ্ধকে সমাগত দেখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ তৎক্ষণাৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শাস্তা সকরুণ দৃষ্টিতে সেই সভা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, ‘এই পরিষৎ অতীব সুন্দর; কেহই অস্বাভাবিকভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করিতেছে না, হাঁচি, উৎকাসন পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। ইহারা বুদ্ধমাহাত্ম্যে এত শ্রদ্ধান্বিত এবং বুদ্ধতেজে এত অভিভূত যে আমি সমস্ত জীবন নিস্তব্ধ থাকিলেও, যতক্ষণ কথা না বলিব, ততক্ষণ অন্য কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না।’ অনন্তর তিনি সুমধুর ব্রহ্মভাষে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা সভাস্থ হইয়া কি আলোচনা করিতেছিলে এবং আমাকে দেখিয়া কি বলিতে ক্ষান্ত হইলে?’

তাঁহারা বলিলেন, ‘ভগবন আমরা এখানে বসিয়া কোন অনাবশ্যক কথা বলি নাই; আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। মহাপন্থক তাঁহার কনিষ্ঠের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই; আপনার শক্তি অলৌকিক; আমরা এই সকল কথা বলিতেছিলাম।’ তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, চুল্লপন্থক এ জন্মে আমার প্রভাবে পারত্রিক ঐশ্বর্য্যলাভ করিল, পূর্ব্ব এক জন্মেও সে আমারই প্রভাবে ঐহিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।’

ভিক্ষুরা তখন ভগবানকে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন; ভগবানও নিম্নলিখিত কথায় ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই বৃত্তান্ত প্রকট করিয়া দিলেন :

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠীপদে নিযুক্ত ‘চুল্লশ্রেষ্ঠী’ এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং

---

[১]। মূলে ‘যুগন্ধর’ শব্দ আছে। ইহা ‘উদয়াচলের’ প্রতিশব্দ।

নিমিত্ত[১] দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিতে পারিতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একটী মৃত মূষিক দেখিতে পাইলেন। তৎকালে আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্র-গণের যেরূপ সংস্থান ছিল তাহা গণনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'যদি কোন বুদ্ধিমান সদ্‌বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইদুরটা তুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যবসা করিয়া পরিবার পোষণে সমর্থ হইবে।'

ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল, 'ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মরা ইদুরটা লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কিনা।' অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক পয়সা[২] দামে ইন্দুরটা কিনিল। যুবক তখন ঐ পয়সা দিয়া গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল লইয়া, যে পথে মালাকারেরা বন হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে, সেইখানে গিয়া বসিল। অনন্তর মালাকারেরা যখন পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন যুবক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক এক ওড়ং[৩] জল খাইতে দিল। মালাকারেরা তৃপ্ত হইয়া তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পর দিন বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাগানে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সে দিন তাহাকে যাহা হইতে অর্দ্ধ পরিমাণে ফুল তোলা হইয়াছে, এমন এক গুচ্ছ গাছ দিয়া গেল। এইরূপে ফুল ও ফুলগাছ বেচিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আট কাহণ পুঁজি হইল।

অনন্তর এক দিন খুব ঝড় বৃষ্টি হইল এবং রাজার বাগানে বিস্তর শুক্‌না ও কাঁচা ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে এই আবর্জ্জনারাশি সরাইবে ইহা ভাবিতেছে, এমন সময় ঐ যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল, 'যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।' মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন যুবক, পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করিত সেইখানে গেল এবং ছেলেদিগকে একটু একটু গুড় খাইতে দিয়া বলিল, 'ভাই সকল, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, রাজার বাগানটী পরিষ্কার করিতে হইবে।' ছেলেরা গুড় পাইয়া বড় খুসি হইয়াছিল; তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তার উপর

---

[১]। নিমিত্ত—লক্ষণ, যেমন বামে শব, শিবা, কুম্ভ এবং দক্ষিণে গো, মৃগ ও দ্বিজ, ইহারা শুভফলপ্রদ।

[২]। মূলে 'তৃণহারক' এই শব্দ আছে।

[৩]। পট্টন—বন্দর (Port)

গাদা করিয়া রাখিল।

সেদিন রাজার কুম্ভকারের কাঠের অনটন হইয়াছিল। সে হাঁড়ি কলসী পোড়াইবার জন্য কাঠ কিনিতে গিয়া ডালের গাদা দেখিতে পাইল এবং নগদ ষোল কাহণ ও কয়েকটী হাঁড়ি দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কাহণ মজুত হইল। সে তখন একটা নূতন ফিকির বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচ শ ঘেসেড়া[১] ছিল। তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনিতে যাইত। যুবক নগরের বাহিরে এক স্থানে বড় বড় জালায় জল পূরিয়া রাখিল এবং উহা হইতে ঘেসেড়াদিগকে পিপাসার সময় জল দিতে লাগিল। ঘেসেড়ারা তৃপ্ত হইয়া বলিল, 'আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন; বলুন, আমরা কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি কি না।' যুবক কহিল, 'তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে তোমাদিগকে জানাইব।'

এই সময়ে যুবকের সহিত এক স্থলপথ-বণিক ও এক জলপথ-বণিকের বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন স্থলপথ-বণিক তাহাকে সংবাদ দিল, 'ভাই, কাল একজন অশ্ব-বিক্রেতা এই নগরে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া আসিবে।' এই কথা শুনিয়া যুবক ঘেসেড়াদিগকে বলিল, 'ভাই সকল, তোমরা প্রত্যেকে কাল আমায় এক আটি করিয়া ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।' ঘেসেড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল। অশ্ববণিক আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাজার কাহণ মূল্যে পাঁচশ আটি ঘাস কিনিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ-বণিকের নিকট জানিতে পারিল পট্টনে[২] একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিয়াছে। তখন সে আর একটা মতলব আঁটিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া দিন ভাড়ায়[৩] একখানি গাড়ী আনিল এবং উহাতে চড়িয়া মহাসমারোহে পট্টনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দিয়া বায়না[৪] করিল; পরে তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং অনুচরদিগকে বলিয়া দিল, 'কোন বণিক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে

---

[১]। মূলে 'তাবৎকালিক রথ' আছে। ইহার অর্থ, যাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ ঘন্টা, দিন প্রভৃতি হিসাবে ভাড়া করা যায়।

[২]। মূলে 'সত্যকার' (সত্যঙ্কার) এই শব্দ আছে।

[৩]। মূলে 'কাকিণিক' এই শব্দ আছে। ইহা তৎকাল প্রচলিত একপ্রকার তাম্রমুদ্রা = ২০ কপর্দ্দক।

[৪]। পালি 'উলুঙ্ক' (সংস্কৃতে 'উদঙ্ক')।

তাহাকে যেন একে একে তিনজন আরদালি সঙ্গে দিয়া ভিতরে আনা হয়।'

এদিকে পট্টনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণসীর প্রায় একশত বণিক উহার মাল কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল; কিন্তু যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল। সেখানে শিবিরের ঘটা এবং আরদালী, চোপদার প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহারা মনে করিল এই যুবক নিশ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাহারা এক এক করিয়া যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং মালের এক এক অংশ পাইবার জন্য এক এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে অঙ্গীকার করিল। অনন্তর যুবকের নিজের যে অংশ রহিল, তাহারও কিনিবার জন্য তাহারা আর এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইরূপে যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

যুবক দেখিল বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত কাজ করাতেই তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতএব কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে একলক্ষ মুদ্রা লইয়া বোধিসত্ত্বকে উপহার দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে?' তখন যুবক, মরা ইন্দুর তুলিয়া লওয়া অবধি কিরূপে চারি মাসের মধ্যে সে বিপুল বিভবশালী হইয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'এই বুদ্ধিমান যুবক যাহাতে অন্য কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে তাহা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার সহিত নিজের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বের অন্য কোন সন্তান ছিল না; কাজেই যুবক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইল এবং বোধিসত্ত্ব নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলে স্বয়ং বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠীপদ লাভ করিল।

* * *

[কথাবসানে সম্যকসম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :

লয়ে অল্প মূলধন প্রচুর ঐশ্বর্য্য লভে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ জন;
লইয়া স্ফুলিঙ্গমাত্র, ফুৎকারে পোষণ করি, করে লোক মহাগ্নি সৃজন।

সমবধান—তখন চুল্লপন্থক ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীর শিষ্য এবং আমি ছিলাম চুল্লমহাশ্রেষ্ঠী।]

⟹ কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

---

৫. তণ্ডুলনালী-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীর[২] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে মল্ল জাতীয় স্থবির দব্বো ভিক্ষুসংঘের ভক্তোদ্দেশক ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে যে শলাকা দিতেন[৩] তাহা দেখাইয়া স্থবির উদায়ী কোন দিন উৎকৃষ্ট, কোনদিন বা নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন। উদায়ী যে যে দিন নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন, সেই সেই দিন শলাকাগারে[৪] গণ্ডগোল করিতেন। তিনি বলিলেন, 'দব্বে ভিন্ন কি আর কেহ শলাকা বিতরণ করিতে জানে না? আমরা কি এ কাজ করিতে পারি না?' এক দিন তাঁহাকে এইরূপ গণ্ডগোল করিতে দেখিয়া, অন্য সকলে তাঁহার সম্মুখে শলাকার ঝুড়ি রাখিয়া বলিল, 'বেশ কথা, আজ আপনিই শলাকা বিতরণ করুন।' তদবধি উদায়ীই সংঘের মধ্যে শলাকা বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বন্টন করিবার সময় তিনি কোন তণ্ডুল উৎকৃষ্ট, কোন তণ্ডুল নিকৃষ্ট তাহা বুঝিতে পারিতেন না; কত দিনের ভিক্ষু হইলে উৎকৃষ্ট তণ্ডুল পায়, কত দিনের ভিক্ষুকে নিকৃষ্ট তণ্ডুল দিতে হয়, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না। শলাকাগৃহে ভিক্ষুদিগের নাম ডাকিবার সময়েও কাহাকে অগ্রে ডাকিতে হইবে, কাহাকে পশ্চাতে ডাকিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। কাজেই ভিক্ষুরা যখন শলাকাগৃহে উপবেশন করিতেন, তখন উদায়ী ভূমিতে বা ভিত্তিতে দাগ দিয়া স্থির করিয়া লইতেন এখানে অমুক দল ছিল, এখানে অমুক দল ছিল ইত্যাদি। কিন্তু পর দিন হয়ত এক দলের অল্প লোক ও অন্য দলের অধিক লোক উপস্থিত হইত। এরূপ ঘটিলে দাগ অল্প দলের জন্য নিম্নে এবং অধিক দলের জন্য উপরে পড়িবার কথা; কিন্তু উদায়ী তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি পূর্ব্বদিনের দাগ দেখিয়াই শলাকা বন্টন করিতেন। অপিচ কোন দলকে কি দিতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিতেন না।

ভিক্ষুরা বলিতেন, 'ভাই উদায়ী, দাগটা বড় উপরে উঠিয়াছে অথচ ভিক্ষুর

---

[১]। নালী—এক প্রকার পরিমাপক পাত্র (যেমন আমাদের পালি ইত্যাদি)।

[২]। লালুদায়ী—স্থূলবুদ্ধি উদায়ী। 'উদায়ী' এই ব্যক্তির নাম।

[৩]। বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে প্রতিদিন ভোজ্য বন্টন করিয়া দেওয়া ভক্তোদ্দেশকের কার্য্য। ভিক্ষুরা কোন কোন দিন উপাসকদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন; সেদিন বিহার হইতে কোন ভোজ্য দিবার প্রয়োজন হইত না। অন্যান্য দিন বিহারের ভাণ্ডার হইতে তণ্ডুলাদি বিতরণ করিতে হইত। ভিক্ষুরা প্রাতঃকালে এক একটী শলাকা পাইতেন। এই শলাকা বর্ত্তমান কালের টিকেটস্থানীয়। ইহা দেখাইয়া তাঁহারা স্ব স্ব প্রাপ্য খাদ্য লইতেন।
যাহারা বন্টন কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, নির্ভীক এবং ধীরপ্রকৃতি, ঈদৃশ ভিক্ষুরাই ভক্তোদ্দেশকের পদে বৃত হইতেন।

[৪]। যে গৃহে শলাকা বিতরণ করা হইত।

সংখ্যা কমা,' কিংবা 'দাগটা বড় নীচে আছে, অথচ ভিক্ষুর সংখ্যা বেশী' কিংবা 'এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে ভাল চাউল দিতে হইবে; এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে মন্দ চাউল দিতে হইবে' ইত্যাদি। কিন্তু উদায়ী তাঁহাদের কথায় কাণ দিতেন না। তিনি বলিতেন, 'যেখানকার দাগ সেখানেই আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব, না আমার দাগ বিশ্বাস করিব?'

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া একদিন বালক ভিক্ষু[১] ও শ্রামণেরগণ উদায়ীকে শলাকাগার হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহারা বলিল, 'ভাই লালুদায়ী, তুমি শলাকা বিতরণ করিলে ভিক্ষুরা স্ব স্ব প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। তুমি এ কাজের অনুপযুক্ত; অতএব এখান হইতে চলিয়া যাও।' ইহাতে শলাকাগারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। শাস্তা স্থবির আনন্দকে[২] জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শলাকাগারে কোলাহল হইতেছে কেন?'

আনন্দ তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া তথাগত বলিলেন, 'উদায়ী নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এখনই যে কেবল অপরের প্রাপ্যহানি করিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে ঠিক এইরূপ করিয়াছিল।'

আনন্দ বলিলেন, 'প্রভু, দয়া করিয়া ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিন।' তখন ভগবান ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্ঘকারকের[৩] কাজ করিতেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক্তা প্রভৃতি মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগের, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা চুকাইয়া দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতি অর্থলোলুপ ছিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল 'এই অর্ঘকারক যেভাবে মূল্য নিরূপণ করিতেছে, তাহাতে অচিরে আমার ভাণ্ডার শূন্য হইবে। আমি ইহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে অর্ঘকারকের কাজ দিব।' অনন্তর তিনি জানালা[৪] খুলিয়া দেখিলেন একটা পাড়াগেঁয়ে লোক উঠান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ অথচ লোভী ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদত্ত তাহা জানিতেন না; তিনি ভাবিলেন এইরূপ লোককেই অর্ঘকারক করা

১। মূলে 'দহর ভিক্ষু' এই পদ আছে। 'দহর' শব্দ সংস্কৃত 'দভ্র' শব্দের রূপান্তর; ইহার অর্থ 'অল্পবয়স্ক'। আট নয় বৎসরের বালকেরাও ভিক্ষু হইত।

২। আনন্দ—বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন, সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩। রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, অর্ঘকারক সেইগুলির মূল্য স্থির করিত।

৪। মূলে 'সিংহপঞ্জর' এই শব্দ আছে।

উচিত। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার অর্ঘকারকের কাজ করিতে পারিবে কি?' সে বলিল, 'হাঁ মহারাজ, আমি এ কাজ করিতে পারিব।' ব্রহ্মদত্ত তদ্দণ্ডেই সেই লোকটাকে নিযুক্ত করিয়া ভাণ্ডাররক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর সে, যখন যেমন খেয়াল হইত, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিত, কোন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য কত হইতে পারে তাহা একবারও ভাবিত না। কিন্তু রাজার অর্ঘকারক বলিয়া কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না; সে যে মূল্য অবধারণ করিয়া দিত, বিক্রেতাদিগকে তাহাই লইতে হইত।

একদিন উত্তরাঞ্চল হইতে এক অশ্ব-বণিক পাঁচশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইল। রাজা নূতন অর্ঘকারককে সেই সকল অশ্বের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। সে গিয়া স্থির করিল পাঁচশ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল, এবং অশ্ব-বণিককে ঐ মূল্য দিয়াই ঘোড়াগুলিকে রাজার আস্তাবলে লইয়া যাইতে হুকুম দিল। অশ্ব-বণিক হতবুদ্ধি হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং যেরূপ ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিয়া এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যাও, উহাকে কিছু ঘুষ দাও এবং বল যে, 'মহাশয়, পাঁচশ ঘোড়ার দাম যে এক পালি চাউল তাহা ত আপনি স্থির করিয়া দিলেন; কিন্তু এক পালি চাউলের কত দাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া রাজার সাক্ষাতে এই কথাটা বুঝাইয়া দিবেন কি?' যদি ইহার উত্তরে সে বলে, 'হাঁ, বুঝাইয়া দিব', তবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় যাইবে। আমিও সেখানে উপস্থিত থাকিব।'

অশ্ব-বণিক কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া এই পরামর্শ মত কাজ করিল। লোভী অর্থকারক ঘুষ পাইয়া বড় খুসী হইল এবং এক পালি চাউলের দাম কত তাহা রাজার নিকট বলিতে অঙ্গীকার করিল। অশ্ব-বণিক তখনই তাহাকে রাজসভায় লইয়া গেল। সেখানে বোধিসত্ত্ব এবং অমাত্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অশ্ব-বণিক প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহারাজ, পাঁচ শত ঘোড়ার দাম যে এক পালি চাউল এ সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিতেছি না; কিন্তু দয়া করিয়া আপনার অর্ঘকারক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন যে একপালি চাউলের দাম কত?' বণিকের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া রাজা বলিলেন, 'বলত অর্ঘকারক, পাঁচ শ ঘোড়ার দাম কত?' সে উত্তর দিল, 'মহারাজ, পাঁচ শ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল।' রাজা আবার জিজ্ঞাসিলেন, 'বেশ কথা; এখন দেখ ত পাঁচ শ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল হইলে এক পালি চাউলের দাম কত হয়?' সে উত্তর দিল,

'মহারাজ, এক পালি চাউলের দাম সমস্ত বারাণসী শহর ও সহরতলি।'[১]

এই কথা শুনিয়া অমাত্যগণ অট্টহাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে বলিলেন, 'আমরা এত কাল জানিতাম পৃথিবী ও রাজ্যের কোন মূল্য অবধারণ করা যায় না; এখন শিখিলাম বারাণসীরাজ্য ও বারাণসীর রাজা উভয়ের মূল্য এক পালি চাউল মাত্র। আহা! অর্ঘকারকের কি অদ্ভুত বুদ্ধি! কি কৌশলে যে এ অপদার্থ এতকাল এই পদ ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। অথবা রাজা যেমন, তাঁহার অর্ঘকারকও তেমন—যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ।

তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা করিলেন :

উপকণ্ঠসহ বারাণসীধাম, মূল্য তার কত হয়?
নালীকা পূরিতে যে তণ্ডুল চাই; তার বেশী কভু নয়।
আশ্চর্য্য ব্যাপার শুন আর বায়, পঞ্চশত অশ্ব-মূল্য :
তাও নাকি ঠিক সেই মত এক তণ্ডুলনালিকা তুল্য!

সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অপদস্থ হইয়া রাজা তন্মুহূর্ত্তেই সেই পাড়াগেঁয়ে লোকটীকে তল্পীতাড়া লইয়া প্রস্থান করিতে বলিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অর্ঘকারকের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব জীবনাবসানে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন স্থবির লালুদায়ী ছিল অতীতকালের সেই নির্ব্বোধ ও লোভপরায়ণ অর্ঘকারক এবং আমি ছিলাম সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্ঘকারক।]

---

৬. দেবধর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন বিভবশালী ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী পত্নী-বিয়োগের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রাজক হইবার সঙ্কল্প করিয়াই তিনি নিজের ব্যবহারার্থ একটী প্রকোষ্ঠ, একটি অগ্নিশালা, এবং একটী ভাণ্ডার-গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং যতদিন সেই ভাণ্ডার ঘৃত-তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই, ততদিন তিনি

---

[১]। পালি টীকাকার বলেন যে, অর্ঘকারক প্রথমে রাজার মনস্তুষ্টি সাধনার্থ পাঁচশ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শেষে অশ্ব-বণিকের নিকট উৎকোচ পাইয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় সমস্ত বারাণসী রাজ্য এক পালি চাউলের তুল্যমূল্য এই ব্যবস্থা দিয়াছিল। তৎকালে শুদ্ধ বারাণসী নগরীর চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর ছিল তাহার পরিমাণ নয় যোজন। উপকণ্ঠ রাজ্যের পরিধি একশত যোজনের কম ছিল না।

প্রব্রাজক হন নাই। প্রব্রাজক হইবার পরেও তিনি ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া ইচ্ছানুরূপ খাদ্য পাক করাইয়া আহার করিতেন। তাঁহার আসবারেরও[১] অভাব ছিল না। তিনি দিনের জন্য এক প্রস্থ এবং রাত্রির জন্য এক প্রস্থ পরিচ্ছদ রাখিতেন এবং বিহারের প্রত্যন্ত অংশে একাকী অবস্থান করিতেন।

একদা ঐ ব্যক্তি পরিচ্ছদ ও শয্যা বাহির করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে শুকাইতে দিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি জনপদবাসী ভিক্ষু নানা অঞ্চলের বিহার পরিদর্শন করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ ভিক্ষুর শয্যা ও পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সমস্ত কাহার?' ভিক্ষু বলিলেন, 'এ সমস্ত আমার।' 'সে কি? এই এক বহির্ব্বাস! এই এক বহির্ব্বাস! এই এক অন্তর্ব্বাস, এই এক অন্তর্ব্বাস! আর এই শয্যা—এ সমস্তই কি আপনার? 'হাঁ, এসমস্তই আমার; অন্য কাহারও নহে।' 'মহাশয়, ভগবান ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনি যে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি কেমন নিঃস্পৃহ; আর আপনি ভোগের জন্য এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। চলুন, আপনাকে দলবলের নিকট লইয়া যাই।' ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই ভিক্ষুকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এখানে আনিলে কেন?' 'ভগবন, এই ব্যক্তি বিভবশালী। ইনি পরিচ্ছদাদি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।' 'কি হে ভিক্ষু, ইহারা বলিতেছে, তুমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছ; এ কথা সত্য কি?' 'হাঁ ভগবন, এ কথা সত্য।' 'তুমি পরিচ্ছদাদি উপকরণের এত ঘটা করিয়াছ কেন? আমি কি নিয়ত নিঃস্পৃহতা, সন্তুষ্টচিত্ততা, নির্জ্জনবাস, দৃঢ়বীর্য্যতা প্রভৃতি প্রশংসা করি না?'

শাস্তার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, 'তবে আমি এইভাবে বিচরণ করিব' এবং বহির্ব্বাস ফেলিয়া দিয়া সভামধ্যে একচীবর মাত্র পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার

---

[১]। মূলে 'পরিষ্কার' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু কেবল ভিক্ষাপাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, সূচি, বাসি এবং পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট পরিষ্কার রাখিতে পারেন। ত্রিচীবর—সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তরবাসক। সংঘাটী বহির্বাস; ইহা দ্বিপুট এবং স্কন্ধ হইতে সমস্ত দেহ আবৃত করে। ভিক্ষুরা বাহিরে যাইবার সময়ে ইহা ব্যবহার করেন। উত্তরাসঙ্গ একপুট; ইহাও স্কন্ধ হইতে সর্ব্বশরীর আবৃত করে এবং বিহারের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। অন্তরবাসককে এক প্রকার লুঙ্গী বা ছোট ধুতি বলা যাইতে পারে, পরিলে কোচা অল্প থাকে কাছা থাকে না। সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তরবাসক প্রত্যেকটিই অন্তরঃ ১৫ খানি টুকরা সেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়। কায়বন্ধন অর্থাৎ কটিবন্ধ। বুদ্ধদেব নগ্ন সন্ন্যাসীদিগকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে ভিক্ষুদিগের পক্ষেও সুন্দররূপে গাত্র আবৃত রাখা আবশ্যক।

অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন, 'তুমি না পূর্ব্বে উদকরাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও লজ্জাশীলতা অর্জ্জন করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর বহু যত্ন করিয়াছিলে? তবে এখন কিরূপে গৌরবময় বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও নির্লজ্জভাবে বহির্ব্বাস পরিহারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছ?' এই কথায় উক্ত ভিক্ষুর লজ্জাশীলতা ফিরিয়া আসিল; তিনি পুনর্ব্বার বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন ভিক্ষুরা উদকরাক্ষস-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভাবান্তরপ্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিংসাসকুমার এই নাম প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্ব যখন দুই তিন বৎসর বয়সে হাঁটিতে ও ছুটাছুটি করিতে শিখিয়াছেন, তখন তাঁহার একটী সহোদর জন্মিল। রাজা এই পুত্রের নাম রাখিলেন চন্দ্রকুমার। অনন্তর চন্দ্রকুমার যখন হাঁটিতে ও ছুটিতে শিখিলেন, তখন মহিষীর প্রাণবিয়োগ হইল এবং ব্রহ্মদত্ত পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া নবীনা মহিষীকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে নবীনা মহিষীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ইঁহার নাম রাখা হইল সূর্য্যকুমার। রাজা নবকুমার লাভ করিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন এবং মহিষীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে, এই বালকের জন্য তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব।' কিন্তু মহিষী তখন কোন বর চাহিলেন না; তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিব।'

কালসহকারে সূর্য্যকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন একদিন মহিষী রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আপনি অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন ইহাকে একটী বর দিবেন। অতএব এখন ইহাকে রাজপদ দান করুন।' রাজা উত্তর করিলেন, 'আমার প্রথম দুইপুত্র প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারি না।' কিন্তু মহিষী এ কথায় নিরস্ত হইলেন না। তিনি এই প্রার্থনা পূরণের জন্য রাজাকে দিবারাত্র জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। তখন রাজার আশঙ্কা হইল পাছে মহিষী কুচক্র করিয়া সপত্নী-পুত্রদিগের কোন অনিষ্ট করেন। তিনি মহিংসাসকুমার ও চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎসগণ, যখন সূর্য্যকুমারের জন্ম হয়, তখন আমি তোমাদের বিমাতাকে একটী বর দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই বরে এখন

তিনি সূর্য্যকুমারকে রাজ্য দিতে বলিতেছেন। কিন্তু সূর্য্যকুমার রাজা হয় এ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই। তথাপি স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; আশঙ্কা হয় রাণী হয়ত তোমাদের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমরা এখন বনে গিয়া আশ্রয় লও। আমার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে এ রাজ্য তোমাদিগেরই প্রাপ্য; তোমরা তখন আসিয়া ইহা গ্রহণ করিও।' অনন্তর অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে করিতে তিনি পুত্রদ্বয়ের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইলেন।

রাজকুমারদ্বয় পিতার চরণবন্দনা করিয়া যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন, তখন সূর্য্যকুমার প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছিলেন। অগ্রজদ্বয়ের বনগমন-কারণ জানিতে পারিয়া তিনিও তাঁহাদের অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপে তিনভাই একসঙ্গে বনবাস করিতে গেলেন।

রাজকুমারেরা চলিতে চলিতে অবশেষে হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্ব একদিন এক তরুমূলে উপবেশন করিয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন, 'ভাই, ছুটিয়া একবার ঐ সরোবরে গিয়া স্নান কর ও জল খা; শেষে ফিরিবার সময় আমাদের জন্য পদ্মপাতায় কিছু জল আনিস্।'

ঐ সরোবর পূর্ব্বে কুবেরের অধিকারে ছিল। তিনি উহা এক উদক-রাক্ষসকে দান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন 'দেবধর্ম্ম-জ্ঞানহীন যে ব্যক্তি ইহার জলে অবতরণ করিবে সে তোমার ভক্ষ্য হইবে। যাহারা জলে অবতরণ করিবে না, তাহাদের উপর কিন্তু তোমার কোন অধিকার থাকিবে না।' তদবধি সেই উদক-রাক্ষস, কেহ জলে অবতরণ করিলেই, তাহাকে 'দেবধর্ম্ম কি?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং সে উত্তর দিতে না পারিলে তাহাকে খাইয়া ফেলিত। সূর্য্যকুমার এ বৃত্তান্ত জানিতেন না। তিনি নিঃশঙ্কমনে যেমন জলে নামিয়াছেন, অমনি উদক-রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে জান কি?' সূর্য্যকুমার বলিলেন, 'জানি বৈকি, লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে।' রাক্ষস বলিল, 'মিথ্যা কথা; তুমি দেবধর্ম্ম জান না।' অনন্তর সে সূর্য্যকুমারকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্যকুমারের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। রাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও ধরিয়া ফেলিল এবং সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, 'দিক্‌চতুষ্টয় দেবধর্ম্ম-বিশিষ্ট।' রাক্ষস বলিল, 'মিথ্যা কথা, তুমি দেবধর্ম্ম জান না।' সে চন্দ্রকুমারকেও টানিয়া গভীর জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

চন্দ্রকুমারও ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের আশঙ্কা হইল হয়ত দুই ভ্রাতারই কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে অনুসন্ধানে ছুটিলেন

এবং পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহারা দুই জনেই সরোবরে অবতরণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার সন্দেহ হইল ঐ সরোবরে কোন উদকরাক্ষস আছে। অতএব তরবারি খুলিয়া ও ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া তিনি রাক্ষসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদকরাক্ষস দেখিল বোধিসত্ত্ব জলে অবতরণ করিতেছেন না। তখন সে তাঁহার নিকট বানচরের বেশে আবির্ভূত হইয়া বলিল, 'ভাই, তুমি দেখিতেছি, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। জলে নামিয়া অবগাহন কর, মৃণাল ও জল খাও, পদ্মের মালা পর; তাহা হইলে শরীর শীতল হইবে, আবার পথ চলিতে পারিবে।' বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, 'তুমিই না আমার ভাই দুইটীকে ধরিয়া রাখিয়াছ?' রাক্ষস বলিল, 'হাঁ'।

'কেন ধরিলে?'

'যাহারা এই জলে নামে তাহারা আমার ভক্ষ্য।'

'সকলেই তোমার ভক্ষ্য?'

'কেবল যাহারা দেবধর্ম্ম জানে তাহারা নহে। তাহারা ব্যতীত আর সকলেই আমার ভক্ষ্য।'

'দেবধর্ম্ম কি জানিতে চাও?'

'হাঁ, জানিতে চাই।'

'তবে দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।'

'বল, দেবধর্ম্ম কি তাহা শুনিব।'

'বলিব বটে, কিন্তু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি।'

তখন রাক্ষস তাঁহাকে স্নান করাইল; খাদ্য ও পানীয় জল দিল, পদ্মফুল দিয়া সাজাইল, গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিল এবং তাঁহার শয়নের নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপের মধ্যে পর্য্যঙ্ক স্থাপিত করিল। বোধিসত্ত্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; রাক্ষস তাঁহার পাদমূলে বসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেবধর্ম্ম কি শ্রবণ কর :

নিয়ত প্রশান্তচিত্ত, সত্যপরায়ণ নির্ম্মল অন্তরে করে ধর্ম্মের ভজন,
উদিলে কলুষভাব লাজ পায় মনে; দেবধর্ম্ম বলি তুমি জানিবে সে জনে।'

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া রাক্ষস সন্তুষ্ট হইল এবং বোধিসত্ত্বকে কহিল, 'পণ্ডিতবর, আমি তোমার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। আমি তোমার একজন ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি; বল কাহাকে আনিব।'

'আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আন।'

'তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ কর না।'

‘এ কথা বলিতেছ কেন?’

‘যে বড় তাহাকে ছাড়িয়া, যে ছোট তাহাকে বাঁচাইতে চাও কেন? ইহাতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রাখা হইল কি?’

‘আমি দেবধর্ম্ম জানি, তদনুসারে কাজও করি। কনিষ্ঠটী আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহারই জন্য আমরা বনবাসী হইয়াছি। বিমাতা ইহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা তাহাতে অসম্মত হইয়া আমাকে ও আমার সহোদরকে বনে আশ্রয় লইতে বলেন। আমরা বনে আসিতেছি দেখিয়া এ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অনুগমন করিয়াছে, একদিনও গৃহে ফিরিবার কথা ভাবে নাই। অধিকন্তু, আমি যদি বলি ইহাকে রাক্ষসে খাইয়াছে, তাহা হইলে কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব লোকনিন্দার ভয়েও আমি তোমার নিকট ইহারই জীবন ভিক্ষা করিতেছি।’

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাক্ষস ‘সাধু, সাধু’ বলিয়া উঠিল। সে কহিল, ‘এখন বুঝিলাম তুমি দেবধর্ম্ম জান এবং তদনুসারে কাজও কর।’ অনন্তর সে প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বের উভয় ভ্রাতাকেই আনিয়া দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বলিলেন, ‘ভদ্র, অতীতকালে তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ তাহারই ফলে রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করিয়া এখন তোমাকে অপর প্রাণীর রক্তমাংসে দেহ ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তোমার শিক্ষা হয় নাই। তুমি এ জন্মেও পাপসঞ্চয় করিতেছ; ইহার ফলে তোমাকে চিরদিন নিরয়গমন, নীচ যোনিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব এই সময় হইতে নীচপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া সৎপথে বিচরণ কর।’

এইরূপে রাক্ষসকে ধর্ম্মপথে আনিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বনে অনুজদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইল। অনন্তর একদিন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বোধিসত্ত্ব জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃদ্বয় ও উদক-রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে উপরাজ[১] ও সূর্য্যকুমারকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উদক-রাক্ষসের জন্য তিনি এক রমণীয় স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মাল্য, খাদ্য প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য রাজ্যপালন করিয়া বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

---

[১]। আমরা যাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি (viceroy) বলি, প্রাচীন ভারতবর্ষে তাঁহাকে ‘উপরাজ’ এবং তদীয় অধিকারকে ‘ঔপরাজ্য’ বলা যাইত।

[কথা শেষ হইলে ভগবান ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই ঐশ্বর্য্যশালী ভিক্ষু ছিল পুরাকালের সেই উদক-রাক্ষস; আনন্দ[১] ছিল সূর্য্যকুমার, সারীপুত্র ছিল চন্দ্রকুমার এবং আমি ছিলাম মহিংসাসকুমার।]

☞ দেবধর্ম্ম-জাতকের প্রথমাংশের সহিত দশরথ-জাতকের (৪৬১) প্রথমাংশের এবং শেষাংশের সহিত মহাভারত-বর্ণিত বকরূপী যক্ষকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-পরীক্ষা-বৃত্তান্তের সৌসাদৃশ্য আছে।

---

৭. কাষ্ঠহারি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে বাসব ক্ষত্রিয়ার প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্বাদশ নিপাঠে ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৪) সবিস্তর বলা হইবে।[২]

প্রবাদ আছে, বাসব ক্ষত্রিয়া মহানামা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডা নামী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনোদয়ে তিনি কোশল-রাজের মহিষী হন এবং বিরূঢ়ক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। শেষে কোশলরাজ জানতে পারেন, মহিষী নীচকুলজাতা। অতএব তিনি বালক ও তাহার গর্ভধারিণী উভয়কেই প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দেন।

এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তা একদিন প্রত্যুষে পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাসব ক্ষত্রিয়া কোথায়?' তখন রাজা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন, তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রাজকুলে; তাহার বিবাহ হইয়াছে রাজার সহিত; সে প্রসব করিয়াছে রাজপুত্র। এরূপ পুত্র পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে চলিবে কেন? প্রাচীনকালে কোন রাজা এক কাষ্ঠহারিণীর গর্ভজাত পুত্রকেও রাজ্য দান করিয়াছিলেন। অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

---

[১]। আনন্দ—গৌতম-বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদিগের অন্যতম। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। সারীপুত্র (শারীপুত্র, শারিপুত্র, সারিপুত্র) গৌতম-বুদ্ধের অপর একজন প্রধান শিষ্য। ইঁহার উপাধি ছিল 'ধর্ম্মসেনাপতি।' সবিস্তর বিবরণ ৪২ পৃষ্ঠের টীকায় এবং পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[২]। উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে বিরূঢ়কের গর্ভধারিণীর নাম মল্লিকা, মালিকা বা মালিনী।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন উদ্যানবিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ফল-পুষ্পাদির আহরণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছে। ব্রহ্মদত্ত তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। রমণীকে গর্ভবতী জানিয়া রাজা তাহার হস্তে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন, 'যদি কন্যা প্রসব কর, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণ-পোষণ করিবে; আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাহাকে এই অঙ্গুরিসহ আমার নিকট লইয়া যাইবে।

রমণী যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিয়া পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে 'নিষ্পিতৃক' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কেহ বলিত 'দেখ, নিষ্পিতৃক আমাকে মারিয়া গেল', কেহ বলিত, 'নিষ্পিতৃক আমাকে ধাক্কা দিল।' ইহাতে বোধিসত্ত্বের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি একদিন জননীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'আমার বাবা কে, মা?'

রমণী বলিল, 'বাছা, তুমি রাজার ছেলে।'

'আমি যে রাজার ছেলে তাহার প্রমাণ কি, মা?'

'বাছা, রাজা যখন আমায় ছাড়িয়া যান, তখন এই অঙ্গুরি দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি কন্যা জন্মে, তবে ইহা বেচিয়া তাহার ভরণ-পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র জন্মে, তবে অঙ্গুরিসহ তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।'

'তবে তুমি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যাওনা কেন?

রমণী দেখিল, বালক পিতৃদর্শনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং সে তাহাকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। অনন্তর রাজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে সিংহাসনপার্শ্বে গিয়া প্রণিপাতপূর্বক বলিল, 'মহারাজ, এই আপনার পুত্র।'

সভার মধ্যে লজ্জা পাইতে হয় দেখিয়া, রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াও না জানার ভাণ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'সে কি কথা? এ আমার পুত্র হইবে কেন?' রমণী কহিল, 'মহারাজ, এই দেখুন আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরি। ইহা দেখিলেই বালককে জানিতে পারিবেন।' রাজা এবারও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, 'এ অঙ্গুরি ত আমার নয়।' তখন রমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, 'এখন দেখিতেছি, একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন আমার আর কোন সাক্ষী নাই। অতএব আমি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি এ বালক প্রকৃতই আপনার পুত্র হয়, তবে

যেন এ মধ্যকাশে স্থির হইয়া থাকে, আর যদি আপনার পুত্র না হয়, তবে যেন ভূতলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।' ইহা বলিয়া সে দুই হাতে বোধিসত্ত্বের দুই পা ধরিল এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধদিকে ছুড়িয়া দিল।

বোধিসত্ত্ব মধ্যাকাশে উঠিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন এবং মধুর স্বরে ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে এই গাথা পাঠ করিলেন :

আমি তব পুত্র, শুন মহারাজ, ধর্ম্মপত্নীগর্ভজাত;
পোষণের ভার লও হে আমার, এ মিনতি করি, তাত।
কত শত জন ভরণ-পোষণ লভে নৃপতির ঠাঁই;
তাঁহার তনয় যেইজন হয়, তার ত কথাই নাই।

আকাশস্থ বোধিসত্ত্বের মুখে এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা বাহুবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন, 'এস, বৎস, এস; এখন অবধি আমিই তোমার ভরণ-পোষণ করিব।' তাঁহার দেখাদেখি আরও শত শত লোকে বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু তুলিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব রাজারই বাহুযুগলের উপর অবতরণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার জননীকে মহিষী করিলেন। কালক্রমে রাজার যখন মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্ব 'মহারাজ কাষ্ঠবাহন' এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

* * *

সমবধান—তখন মহামায়া ছিলেন সেই বনবাসিনী রমণী, শুদ্ধোধন ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি হইয়াছিলাম মহারাজ কাষ্ঠবাহন।

☞ মহাভারত-বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের আংশিক সাদৃশ্য বিবেচ্য।

---

৮. গ্রামণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু একাদস নিপাঠে সম্বর-জাতকে (৪৬২) সবিস্তর বলা হইবে। উভয় জাতকের গাথাগুলি কিন্তু এক নহে।

রাজকুমার গ্রামণী তদীয় পিতার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ; তথাপি তিনি বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া রাজচ্ছত্র এবং অগ্রজদিগের আনুগত্য লাভ

করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়া নিজের যশঃসম্পত্তির কথা ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার এই সৌভাগ্য সমস্তই আচার্য্যের প্রসাদাৎ।' অনন্তর মনের আবেগে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিয়াছিলেন :

ধীর, স্থিরভাবে স্বাকর্য্যে নিরত, নহে অতি ত্বরান্বিত,
ইচ্ছামত ফল অগ্রে বা পশ্চাতে লভে সেই সুনিশ্চিত।
গুরু-উপদেশে করিয়া নির্ভর গ্রামণীর অভ্যুদয়
রাজ্য, যশ আদি বিবিধ সম্পত্তি লভিল সে সমুদয়।

গ্রামণীর রাজ্যপ্রাপ্তির সাত আট দিন পরেই তাহার সহোদরগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর গ্রামণী যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিয়াছিলেন; বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীত বস্তুর সম্বন্ধে নির্দ্দেশপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন।]

---

৯. মখাদেব জাতক

[শাস্তা মহানিষ্ক্রমণ-প্রসঙ্গে[১] জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় বসিয়া মহানিষ্ক্রমণের কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা বলিলেন, 'প্রভু, আমরা আপনারই মহানিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম।' শাস্তা বলিলেন, 'কেবল বর্ত্তমান যুগে নয়, অতীত যুগেও তথাগত এইরূপ নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তোমাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে; অতএব পূর্ব্বকথা বলিতেছি, শুন।']

* * *

পুরাকালে বিদেহের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরীতে মখাদেব নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। প্রথমে কুমার, পরে উপরাজ, শেষে মহারাজভাবে তিনি একাদিক্রমে বিরাশি হাজার বৎসর পরমসুখে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি নাপিতকে বলিলেন, 'আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখিতে পাইবে,

---

[১]। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সিদ্ধার্থ স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যান। ইহা 'মহানিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত।

তখন আমায় জানাইবে।' ইহার বহুবৎসর পরে একদিন নাপিত রাজার কজ্জল-কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে একগাছি পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, 'চুলগাছি তুলিয়া আমার হাতে দাও।' তখন নাপিত সোণার সন্না দিয়া ঐ চুলগাছি তুলিয়া রাজার হাতে দিল।

মখাদেবের তখনও চুরাশি হাজার বৎসর পরমায়ুঃ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু একগাছি মাত্রা পাকা চুল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, মৃত্যুরাজ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা তিনি দহ্যমান পর্ণশালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'মূর্খ মখাদেব! পাপবৃত্তি পরিহার করিবার পূর্ব্বেই পলিত-কেশ হইলে!' তিনি পলিত কেশের সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; রাজবেশ ও রাজাভরণ দুর্ব্বিসহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই সংসার ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।'

মখাদেব নাপিতকে এক লক্ষ মুদ্রা আয় হয়, এমন একখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমার কেশ পলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এতদিন পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যকাম্য ভোগ করিয়াছি; এখন দেবকাম্য ভোগ করিব। আমার নিষ্ক্রমণ-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি মখাদেবাম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া শ্রমণ-বৃত্তি অবলম্বন করিব।'

রাজাকে প্রব্রজ্যাবলম্বনে কৃতদ্যোগ দেখিয়া অমাত্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন কেন?' রাজা সেই পলিত কেশটী হাতে লইয়া বলিলেন :

'দেবদূত আসিয়াছে করিতে আয়ুর শেষ,
মস্তক উপরি ধরি পলিত কেশের বেশ।
আর কেন থাকি মিছা বদ্ধ হয়ে মায়াপাশে?
প্রব্রজ্যা লইব আজি মুকতি-লাভের আশে।'

অনন্তর সেইদিনেই তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং উক্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে চুরাশি হাজার বৎসর তপস্যা করিতে করিতে মখাদেব পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মিথিলার রাজরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি 'নিমি' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মকুলের সকলকে একত্র করিয়া এ জন্মেও তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং সেই আম্রকাননে বাস করিয়া ব্রহ্মবিহার[1] ধ্যান করিতে

---

[1]। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারিটী ব্রহ্মবিহার নামে বিদিত।

করিতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান।

*   *   *

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপত্তিমার্গে, কেহ সকৃদাগামীমার্গে, কেহ অনাগামীমার্গে, কেহ বা অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই নাপিত, রাহুল ছিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমি ছিলাম রাজা মখাদেব।]

---

১০. সুখবিহারি-জাতক[১]

[শাস্তা অনুপিয় নগরের[২] নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে ভদ্রিক নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। ইনি পূর্ব্বে শাক্যজাতীয় রাজা ছিলেন, পরে আনন্দ প্রভৃতি ছয় জন ক্ষত্রিয়-কুমার এবং নাপিত উপালির সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই সাত জনের মধ্যে ভদ্রিক, কিম্বিল, ভৃগু ও উপালি উত্তরকালে অর্হত্ত্ব, এবং আনন্দ স্রোতাপত্তি ফললাভ করেন। অনিরুদ্ধ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন এবং দেবদত্ত ধ্যানবলী হইয়াছিলেন। অনুপিয়াম্রকাননে সমাগম পর্য্যন্ত এই ছয় জন ক্ষত্রিয়কুমারের কথা খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) সবিস্তর বলা যাইবে।[৩]

ভদ্রিক যখন রাজা ছিলেন, তখন প্রাসাদে বাস করিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত; তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হইত; তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যাকেও কণ্টকতুল্য মনে করিতেন। কিন্তু এখন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তিনি অরণ্যে, কান্তারে যেখানে ইচ্ছা নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করেন। একদা এই অবস্থাদ্বয়ের তুলনা করিয়া তিনি 'অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!' বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভদ্রিক যে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা এখন প্রকাশ করিতেছেন।' শাস্তা বলিলেন, 'ইনি অতীত জীবনেও এইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

---

[১]। সুখবিহারি—যে আনন্দে আছে।

[২]। অনুপিয়—ইহা মল্লদেশের অন্তঃপাতী, কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে, এবং রাজগৃহ হইতে প্রায় ৪৮০ মাইল দূরে। মহানিষ্ক্রমণের পর গৌতম এখানে ছয় দিন অবস্থিতি করিয়া রাজগৃহে গিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বুদ্ধত্বলাভ করিয়া এখানেই তিনি ভদ্রিক প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়াছিলেন।

[৩]। এ বৃত্তান্ত কিন্তু খণ্ডহাল-জাতকে দেখা যায় না।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কাম দুঃখকর এবং নৈষ্ক্রম্য সুখকর, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কামপরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গমন করিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ধ্যানাদি অষ্টসমাপত্তির[১] অধিকারী হইলেন। পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব-শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরে ও জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি রাজোদ্যানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, 'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এখন হিমালয়ে ফিরিয়া যাইবেন কেন? শিষ্যদিগকে আশ্রমে পাঠাইয়া দিন এবং এখন হইতে এইখানেই অবস্থিতি করুন।'

রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বলিলেন, 'তোমার উপর এই পঞ্চশত শিষ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে যাও; আমি এখন এখানেই অবস্থিতি করি।'

বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, পরে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ধ্যান-ধারণার বলে অষ্টসমাপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তপস্বীদিগের সহিত হিমালয়ে বাস করিতে করিতে একদিন আচার্য্যকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তপস্বীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এইখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস কর; আমি একবার আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া আসি।' অনন্তর তিনি বারাণসীতে গিয়া প্রণিপাতাদি দ্বারা আচার্য্যের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটা মাদুর পাতিয়া উহাতে শয়ন করিলেন।

এদিকে ঠিক ঐ সময়ে উক্ত তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজা সেখানে উপনীত হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাজাকে উপস্থিত দেখিয়াও তপস্বী শয্যা হইতে উঠিলেন না, শয়ান থাকিয়া নিতান্ত আবেগের সহিত 'অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!' এই কথা বলিতে লাগিলেন।

রাজা মনে করিলেন তপস্বী বোধহয় তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। তিনি

---

[১]। অষ্টবিধ ধ্যানফল; যথা—চারিপ্রকার ধ্যানসমাপত্তি, (৫) আকাশের অনন্তত্ব জ্ঞান (৬) বিজ্ঞানের অনন্তত্ব জ্ঞান; (৭) অকিঞ্চন্য অর্থাৎ শূন্যত্বের উপলব্ধি (৮) নৈব-সংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা ভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় সংজ্ঞাও নাই, অসংজ্ঞাও নাই, এবং চিত্ত সর্ব্বদা সমাহিত থাকে।

একটু বিরক্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'প্রভু, এই তপস্বী বোধহয় আকণ্ঠ আহার করিয়াছেন; নচেৎ এভাবে শুইয়া থাকিয়া 'অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!' এরূপ চীৎকার করিবার কারণ কি?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, এই তপস্বী পূর্ব্বে আপনারই ন্যায় রাজপদে আসীন ছিলেন। কিন্তু ইনি এখন যে সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, রাজ্য-শ্রী-সম্পন্ন এবং প্রহরি-পরিরক্ষিত হইয়াও পূর্ব্বে সেরূপ সুখভোগ করিতে পান নাই। এখন ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানজনিত বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন; সেই জন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ওরূপ বলিতেছেন।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গাথা পাঠ করিলেন :

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়, অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়;
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর, অপার-সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

'কামাতীত পুরুষেরাই প্রকৃত সুখী; তাঁহারা কাহারও রক্ষণাপেক্ষী নহেন; কিন্তু রক্ষা করিবার জন্যও বিব্রত হন না।'

এই ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তপস্বীও আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রহিলেন এবং পূর্ণজ্ঞানে দেহত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

* * *

[সমবধান—তখন স্থবির ভদ্রিক ছিলেন পুরাকালের সেই জ্যেষ্ঠ তপস্বী এবং আমি ছিলাম তপস্বীদিগের আচার্য্য।]

---

১১. লক্ষণ-জাতক

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে[১] অবস্থিতি-কালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন, পরে ঈর্ষ্যা-বশতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিনি যে বুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধাচারী, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেবদত্ত পাঁচটী নূতন নিয়ম প্রস্তাব করেন :—(১) ভিক্ষুগণ চিরজীবন বনে থাকিবেন ও (২) তরুতলে বাস করিবেন; (৩) আশ্রমের বাহিরে গিয়া যে ভিক্ষা পাইবেন, শুদ্ধ তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অর্থাৎ আশ্রমে বসিয়া থাকিয়া উপাসকগণের নিকট হইতে কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিতে

---

[১]। বেণুবন—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী উদ্যান; এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

পারিবেন না; (৪) লোকালয়ের আবর্জ্জনা-স্তূপে যে সকল ছিন্ন বস্ত্র পাওয়া যাইবে, কেবল সেইগুলিই পরিধান করিবেন এবং (৫) কখনও মৎস্য মাংস খাইবেন না। বুদ্ধ এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিতে অসম্মতি দেখাইলে দেবদত্ত সঙ্ঘত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চশত ভিক্ষুসহ গয়শির (ব্রহ্মযোনি) পর্ব্বতে চলিয়া যান এবং সেখানে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। কিয়দ্দিন পরে শাস্তা জানিতে পারিলেন, ঐ পঞ্চশত শিষ্যের জ্ঞান এমন পরিপক্ক হইয়াছে যে, প্রকৃষ্ট উপদেশ পাইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার ত্রিরত্নের অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের শরণ লইবেন। তখন তিনি সারীপুত্রকে বলিলেন, 'তোমার যে পঞ্চশত শিষ্য দেবদত্তের সহিত বিপথে গিয়াছে, এখন তাহাদের সুমতি হইয়াছে। তুমি কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মযোনিতে যাও; তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দাও, মার্গ-চতুষ্টয় ও তাহাদের ফল ব্যাখ্যা কর এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন।'

সারীপুত্র এই আদেশ মত কার্য্য করিলেন এবং পরদিন প্রত্যুষে ঐ পঞ্চশত ব্যক্তিকে বেণুবনে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেণুবনস্থ ভিক্ষুগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'আমাদের ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! তিনি দেবদত্তের সমস্ত শিষ্য লইয়া আসিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'সারীপুত্র পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দেবদত্তও যে কেবল এই জন্মে গণ-পরিহীন হইল, তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও সে এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল।' অনন্তর শাস্তা অতীত জন্মের সেই বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি বড় হইলেন, তখন সহস্র মৃগে-পরিবৃত হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিল; তাহাদের বড়টীর নাম লক্ষণ এবং ছোটটীর নাম কালু। বোধিসত্ত্ব যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি প্রত্যেক পুত্রকে পঞ্চশত মৃগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

মগধরাজ্যে ফসলের সময় মৃগদিগের বড় বিপদ হইত। ফসল খাইত বলিয়া তাহাদিগকে মারিবার জন্য লোকে কোথাও গর্ত্ত খুঁড়িত, কোথাও শূল পুতিত, কোথাও পাথরের যন্ত্র রাখিয়া দিত,[১] কোথাও জাল পাতিত। এইরূপে বহু মৃগ বিনষ্ট হইত।

---

[১]। মূলে 'পাসাণ-যন্ত্র' আছে। ইহা ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ।

একদিন বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ফসলের সময় আসিয়াছে। তিনি পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখন মাঠে ফসল হইয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসর অনেক মৃগ মারা যায়। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, কাজেই বহুদর্শিতার গুণে কোন না কোন উপায়ে এখানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতা নাই; তোমরা আপন আপন অনুচর লইয়া পাহাড়ে যাও; যখন মাঠের ফসল উঠিয়া যাইবে, তখন ফিরিয়া আসিও। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অনুচরগণ-সহ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল।

মৃগদিগের গমন-পথে যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা জানিত, কোন সময়ে মৃগেরা পাহাড়ে উঠে, কোন সময়েই বা নামিয়া আইসে। তাহারা এই সকল সময়ে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া অনেক মৃগ মারিয়া ফেলিত।

কোন সময়ে চলিতে হয়, কোন সময়ে বিশ্রাম করিতে হয়, কালুর সে জ্ঞান ছিল না। সে অনুচরদিগকে লইয়া সকালে বিকালে, প্রত্যুষে ও সায়ংকালে, যখন ইচ্ছা লোকালয়ের নিকট দিয়াই চলিতে লাগিল, লোকেও কখনও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কখনও বা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বহু মৃগ মারিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ কালুর নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক মৃগ মারা গেল; সে যখন পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার অনুচরদিগের অতি অল্পই জীবিত রহিল।

লক্ষণ বুদ্ধিমান ও উপায়কুশল ছিল। সে লোকালয়ের ধার দিয়াও যাইত না; দিবাভাগে চলিত না, প্রত্যুষে বা সায়ংকালেও চলিত না। সে নিশীথ সময়ে পথ চলিত; কাজেই তাহার একটীমাত্র অনুচরও মারা গেল না; সে পঞ্চশত মৃগ লইয়া পাহাড়ে পৌঁছিল।

কালু ও লক্ষণ চারি মাস পাহাড়ে অতিবাহিত করিল। অনন্তর মাঠের ফসল উঠিয়া গেলে তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কালু এবারও পূর্ব্ববৎ নির্ব্বোধের মত চলিতে লাগিল; কাজেই তাহার অবশিষ্ট অনুচরেরাও নিহত হইল এবং সে একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পক্ষান্তরে লক্ষণের একটী অনুচরেরও প্রাণবিয়োগ হইল না; তাহার যে পাঁচশ, সেই পাঁচশই রহিল। বোধিসত্ত্ব পুত্রদ্বয়কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

সদাচার, সুশীল, সদয়, বিচক্ষণ, সংসারে সর্ব্বত্র হয় কল্যাণভাজন।
লক্ষণ ফিরিছে হের, জ্ঞাতিগণ সাথে হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে।
কালু কিন্তু অর্ব্বাচীন, অতি দুরাচার, নাহিক একটী সঙ্গী জীবিত তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই বলিয়া লক্ষণকে অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি পরিণত বয়সে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

*   *   *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কালু; তাহার শিষ্যগণ ছিল কালুর অনুচর; সারীপুত্র ছিল লক্ষণ; তাহার অনুচরগণ ছিল আমার শিষ্য; রাহুলের মাতা ছিলেন কালুর ও লক্ষণের গর্ভধারিণী আর আমি ছিলাম তাহাদের জনক।]

---

১২. ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্যপের জননী সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কুমার কাশ্যপের জননী রাজগৃহ নগরের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। এই রমণী শৈশব হইতেই অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; কোনরূপ সুখভোগে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মাতা-পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠীদম্পতীর অন্য কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিলেন; ভাবিলেন, 'এখন হইতে ইহার সংসারে আসক্তি জন্মিবে।'

শ্রেষ্ঠীকন্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তাঁহার রূপে গুণে পতিকুলের সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না। একবার কোনো পর্ব্বাহে নগরবাসী সকলে নানারূপ বেশ ভূষা করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্যান্য দিনের ন্যায় সামান্য বেশেই রহিলেন। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আর্য্যপুত্র, এই শরীর দ্বাত্রিংসৎ শবোপাদানে পূর্ণ। ইহাকে সাজাইলে কি হইবে? ইহা দেবনির্ম্মিত নহে, ব্রহ্মনির্ম্মিত নহে; স্বর্ণ, মাণিক্য কিংবা হরিচন্দন দ্বারাও গঠিন হয় নাই। ইহা পদ্মযোনি নহে, অমৃতগর্ভও নহে। ইহা পাপপুষ্ট, মরণশীল জনকজননী হইতে উৎপন্ন। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, উৎসাদ, পরিমর্দ্দন, ক্ষয় ও বিনাশই ইহার স্বভাব। ইহা কদাচারনিরত, দুঃখের আকর, পরিবেদনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কর্ম্মের ক্ষেত্র, কৃমির আলয়। শ্মশান-ভস্মের পরিমাণবৃদ্ধিই ইহার কার্য্য। ইহা মলপূর্ণ, নবদ্বার দিয়া সেই মল নিয়ত বাহিরে আসিতেছে। মরণান্তে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলেই ইহার প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

বীভৎস জীবের দেহ অস্থিস্নায়ুময়,
ত্বক্ মাংসে আচ্ছাদিত কিন্তু সমুদয়।
ভিতরে ঘৃণার্ত যাহা, চর্ম্ম-আবরণে
ঢাকা থাকি বলি' দৃষ্ট না হয় নয়নে।
দেহের ভিতরে দ্রব্য রয়েছে যতেক,
দেখিলে নয়নে হয় ঘৃণার উদ্রেক।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক[১] প্লীহা ও যকৃৎ
কফ, লালা, স্বেদ, মেদ, লসীকা,[২] শোণিত,
পিত্ত, বসা আদি যত দেহমধ্যে রয়,
ভাবিলে সে সব হয় ঘৃণার উদয়।
নবদ্বারে সদা হয় মলের নিঃসার,
চক্ষুতে পিচুটি, কর্ণে কর্ণমল আর,
নাসিকায় কফ, মুখে, কখন কখন,
হয় ভুক্ত, পিত্ত কিংবা শ্লেষ্মার বমন,
লোমকূপে স্বেদজল বাহিরায় ছুটি,
মস্তিষ্কে রয়েছে পূর্ণ সচ্ছিদ্র করোটি।
অবিদ্যা-প্রভাবে মূর্খ হেন কলেবরে
মঙ্গল-আলয় বলি আস্ফালন করে।
বিষবৃক্ষ-সমুপম জীব-কলেবর,
দুঃসহ ক্লেশের ইহা অনন্ত আকর,
সকল ব্যাধির ইহা প্রিয় নিকেতন,
পুঞ্জীকৃত দুঃখ ইহা বলে সাধুজন।
দেহ অভ্যন্তর ভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে
থাকিত সুবিধা যদি বাহির হইতে,
কাক-কুক্কুরাদি জীব করিতে তাড়ন
দণ্ডহস্তে থাকা হত প্রয়োজন।
দুর্গন্ধ, অশুচি দেহ, শবের মতন,
কিংবা বিষ্ঠাতুল্য অতি ঘৃণার ভাজন।
নিন্দে এরে অনুক্ষণ চক্ষু যার আছে;
আদরের বস্তু ইহা মূর্খদের কাছে।

'ভাবিয়া দেখুন ত আর্য্যপুত্র, এরূপ দেহ সুসজ্জিত করিলে কি লাভ! ইহা সুসজ্জিত করা যে কথা, মলভাণ্ডকে বাহিরে চিত্রিত করিয়া রাখাও সে কথা।'

ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামী বলিলেন, 'প্রিয়ে, যদি দেহকে এত দোষযুক্ত মনে কর, তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন?'

---

[১]। বৃক্ক—Kidneys; অর্থাৎ বস্তিমধ্যস্থ আম্রফলাকার মূত্রযন্ত্রদ্বয়। অনেক ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধানে Kidney-কে 'মূত্রাশয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু মূত্রাশয় শব্দটী ইংরাজী bladder শব্দের প্রতিশব্দ।

[২]। লসীকা—শরীরস্থ রস।

'স্বামিন! প্রব্রজ্যা পাইলে আজই গ্রহণ করিতে পারি।'

'আচ্ছা, আমি এখনই তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপায় করিয়া দিতেছি।'

ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি বহুবিধ উপহারসহ ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবদত্ত-প্রতিষ্ঠিত উপাশ্রয়ে[১] উপনীত হইলেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা এই সময়ে সসত্ত্বা ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে বা তাঁহার পতি কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

এতকালে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ভাবিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা অতীব আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যখন গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন তাঁহার বড় অশান্তির কারণ হইল। শেষে এ কথা দেবদত্তের কর্ণগোচর হইল। দেবদত্তের হৃদয়ে দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের অভাব ছিল; তিনি বুদ্ধের ন্যায় সর্বজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'লোকে মনে করিতে পারে যে, শ্রেষ্ঠীকন্যা উপাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার পরেই গর্ভধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আশ্রয় দিলে আমার কলঙ্ক রটিবে।' সুতরাং কোন অনুসন্ধান না করিয়াই তিনি ঐ গর্ভবতী রমণীকে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

শ্রেষ্ঠীকন্যার ইচ্ছা ছিল যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইবেন; কিন্তু পতি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তখন কোন আপত্তি করেন নাই। এখন দেবদত্তের আদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের বলিলেন, 'আপনারা দয়া করিয়া আমাকে জেতবনে ভগবানের নিকট লইয়া যান; তিনি সর্ব্বজ্ঞ; আমি দোষী, কি নির্দ্দোষ তাহা তাঁহার অগোচর থাকিবে না।' ভিক্ষুণীরা তাহাই করিলেন। রাজগৃহ হইতে জেতবন পঁয়তাল্লিশ যোজন। শ্রেষ্ঠীকন্যা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে এই সুদীর্ঘ পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন।

তথাগত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে করিলেন, 'এই রমণী ভিক্ষুণী হইবার পূর্ব্বেই গর্ভিণী হইয়াছেন সন্দেহ নাই; তথাপি দেবদত্ত যখন ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন হঠাৎ ইঁহাকে আশ্রমে স্থান দিলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা আমার নিন্দা করিবে। অতএব এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের ভার রাজার উপর সমর্পণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া ভগবান পর দিবস রাজা প্রসেনজিৎ, মহা অনাথপিণ্ডদ, চুল্ল অনাথপিণ্ডদ, মহোপসিকা বিশাখা[২] প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্য ও শিষ্যাকে জেতবনে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হইল। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা,

---

[১]। ভিক্ষুণীদিগের থাকিবার স্থান—nunnery.

[২]। বিশাখা—মগধদেশীয় প্রসিদ্ধ ধনী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং শ্রাবস্তীবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। বৌদ্ধ সাহিত্যে উপাসকদিগের মধ্যে যেমন অনাথপিণ্ডদের, উপাসিকাদিগের মধ্যে বিশাখার ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এই চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ পরিষদ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান স্থবির উপালিকে[১] বলিলেন, 'তুমি ইঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠীকন্যার ইতিবৃত্ত বল এবং তাঁহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর।' উপালি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উপাসিকা বিশাখাকে শ্রেষ্ঠীদুহিতার দেহ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা যবনিকার অন্তরালে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠীকন্যাকে নিষ্পাপ বলিয়া মত দিলেন।

শ্রেষ্ঠীকন্যা অতঃপর বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান পালন করিতে হইলে ভিক্ষুণীদিগের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া প্রসেনজিৎ এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং রাণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা অপত্য-নির্ব্বিশেষে ইহার লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং 'কাশ্যপ' এই নাম রাখিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে কুমার কাশ্যপও বলিত।

কুমার কাশ্যপ সপ্তম বর্ষ বয়সেই ভগবানের আদেশে প্রব্রজ্যা লাভ করেন; এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হন। ইনি ধর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শাস্তা বলিতেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা বাক্‌পটু। উত্তরকালে কুমার কাশ্যপ বল্মীকসূত্র শুনিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন[২] এবং গগনতলস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৌদ্ধশাসনে প্রকটিত হন। তাঁহার জননীও বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদিন সায়ংকালে জেতবনস্থ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেবদত্ত বুদ্ধ নহেন; তাঁহার দয়ামায়াও নাই; সেইজন্যই তিনি স্থবির কুমার কশ্যপ ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরু ধর্ম্মরাজ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক; তাই তিনি ইঁহাদের উভয়ের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।' এই সময়ে শাস্তা গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া সেখানে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ তোমরা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। আপনি কুমার কাশ্যপের জননী সম্বন্ধে যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতেছি।' শাস্তা কহিলেন, 'আমি অতীত জন্মেও এই দুইজনের উদ্ধার করিয়াছিলাম। দেবদত্ত তখনও ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে

---

[১]। উপালি—গৌতমবুদ্ধের এক প্রধান শিষ্য; এবং বিনয়পিটকের সংগ্রাহক বলিয়া 'বিনয়ধর' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[২]। মধ্যমনিকায়ের ২৩শ সূত্র।

উদ্যত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অবগতির জন্য সেই পূর্ব্ব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেন লাক্ষাসংযোগে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরীপুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবক-প্রমাণ। তিনি 'ন্যগ্রোধমৃগরাজ' নাম গ্রহণ করায় পঞ্চশত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অতিদূরে তাঁহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল। তাহার নাম ছিল 'শাখামৃগ।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন; মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাস ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্ম্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, 'চল ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পূরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।'

ইহা স্থির করিয়া তাহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ, পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্‌গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল; ন্যগ্যোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্‌গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্ব্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। উদ্যানের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বহুমৃগ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহারা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্য্যহানি করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম! এখন হইতে ঐ সকল বধ

করিয়া ভোজন করুন।'

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মৃগ রহিয়াছে। তিনি হেমবর্ণ মৃগ দুইটী দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাদিগকে অভয় দিলাম; তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর।' ইহার পর কোনদিন তিনি নিজে, কোন দিন বা তাঁহার পাচক উদ্যানে গিয়া এক একটী মৃগ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শুনিবামাত্র মৃগগণ প্রাণভয়ে এরূপ ছুটাছুটি করিত, যে প্রতিদিনই একটীর স্থলে বহুমৃগ শরাহত হইত।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, অনেক মৃগ নিরর্থক নিহত হইতেছে এবং সকলকেই নিয়ত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত একদিন তিনি শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহাদের দুই দল হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন এক একটী মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে ধর্ম্মগণ্ডিকার[১] উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়া উহার শিরশ্ছেদ করিবে। তাহা হইলে যেদিন যে মৃগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই প্রাণ যাইবে; অপর কেহ আহত বা উদ্বিগ্ন হইবে না। তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে লাগিল; যে মৃগ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থাকিত, রাজপাচক তাহারই প্রাণ সংহার করিত, অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না।

অনন্তর একদিন শাখামৃগের দলভুক্ত এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে শাখামৃগের নিকট গিয়া বলিল, 'প্রভু, আমি এখন সসত্ত্বা; প্রসবের পর আমরা একজনের জায়গায় দুইজন হইব; পালামত দুই জনেই প্রাণ দিতে পারিব। অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করুন।' শাখামৃগ উত্তর দিল, 'তাহা হইতে পারে না; তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আমি অন্য কাহারও স্কন্ধে তোমার পালা চাপাইতে পারিব না।' তখন হরিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি দলে ফিরিয়া যাও; যাহাতে এবার তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।' অতঃপর তিনি নিজেই পশু-বধক্ষেত্রে গিয়া গণ্ডিকার উপর মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শুইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে পাচক গণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। সে দৌড়াইয়া রাজাকে বলিতে গেল, রাজা শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সখে মৃগরাজ! আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি। তবে তুমি কেন গণ্ডিকার উপর মাথা রাখিয়াছ?'

---

[১]। ধর্ম্মদণ্ডিকা—যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর হন্তব্য প্রাণীর গ্রীবা রাখিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, 'মহারাজ, আজ যে মৃগীর বার হইয়াছিল সে সসত্ত্বা; সে যখন আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রক্ষার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি না। কাজেই ভাবিলাম, নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইব—তাহার পরিবর্ত্তে আমিই মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ।'

'মৃগরাজ, আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন; আমি প্রসন্নমনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।'

'দুইটীমাত্র মৃগ অভয় পাইল, নরনাথ? অবশিষ্ট মৃগদিগের ভাগ্যে কি হইবে?'

'অবশিষ্ট মৃগদিগকেও অভয় দিলাম।'

'আপনার উদ্যানস্থিত সমস্ত মৃগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্তু অপর মৃগদিগের কি দশা হইবে?'

'তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।'

'মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু অপর চতুষ্পদদিগের ভাগ্যে কি ঘটিবে?'

'তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।'

'চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রের ভয় রহিল না বটে, কিন্তু বিহঙ্গগণের কি গতি হইবে?'

'বিহঙ্গদিগকেও অভয় দিলাম।'

'বিহঙ্গেরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদিগের কি হইবে?'

'মৎস্যাদি জলচরদিগকেও অভয় দিলাম।'

এইরূপে রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্য অভয় পাইয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মগণ্ডিকা হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, ধর্ম্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী সন্ন্যাসী, পৌর জনপদ, সকলের সহিত যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করুন, তাহা হইলে যখন দেহত্যাগ করিবেন, তখন দেবলোকে যাইতে পারিবেন।' এইরূপে বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্যের সহিত রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ঐ উদ্যানে আরও কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া সেই হরিণী যথাকালে পদ্মকোরকসদৃশ এক পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল। শাবকটী ক্রমে বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একদিন হরিণী তাহাকে বলিল, 'বাছা, শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না; তুমি এখন অবধি ন্যগ্রোধমৃগের দলের সহিত মিশিবে।' অনন্তর সে এই গাথা পাঠ করিল :

ন্যগ্রোধ-মৃগের সঙ্গে কর বিচরণ
শাখামৃগ-সংস্রবে না রহিবে কখন।
ঘটে যদি মৃত্যু, থাকি ন্যগ্রোধের সাথে,
খেদের কারণ কিছু দেখি না তাহাতে।
শাখামৃগ দেয় যদি অনন্ত জীবন,
তথাপি তাহারে সদা করিবে বৰ্জ্জন।

এদিকে রাজদত্ত অভয় পাইয়া মৃগেরা লোকের বড় অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা শস্য খাইয়া বেড়াইত; রাজার ভয়ে কেহই তাহাদিগকে মারিতে বা তাড়াইতে পারিত না। অনন্তর প্রজারা একদিন সমবেত হইয়া রাজাকে আপনাদের দুঃখের কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, 'আমি প্রসন্ন হইয়া ন্যগ্রোধমৃগকে বর দিয়াছি। আমার রাজ্য যায় যাউক, তথাপি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিব না। তোমরা চলিয়া যাও; আমার রাজ্য মধ্যে কেহই মৃগদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।'

কিন্তু এই কথা যখন বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'অদ্য হইতে তোমরা লোকের শস্য খাইতে পারিবে না।' অনন্তর তিনি লোকালয়ে সংবাদ পাঠাইলেন, 'কৃষকগণ তোমরা এখন হইতে ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিও না, কেবল পাতার মালা দিয়া ঘিরিয়া কাহার কোন ক্ষেত ঠিক করিয়া রাখিও।' প্রবাদ আছে যে পাতার মালা দিয়া ক্ষেত ঘিরিবার প্রথা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন মৃগ কখনও শস্যের লোভে ঐ মালার বেষ্টনী অতিক্রম করে না, কারণ বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব অনুচরদিগকে বহুদিন সদাচার শিক্ষা দিয়া অবশেষে কৰ্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; রাজা ব্রহ্মদত্তও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন যাপনপূর্ব্বক কৰ্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

* * *

[অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সত্যচতুষ্টয় শিক্ষা দিয়া এইরূপে কথার সমবধান করিলেন—তখন দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ; তাহার শিষ্যগণ ছিল শাখামৃগের অনুচরবর্গ; তখন এই ভিক্ষুণী ছিল সেই হরিণী; কুমার কশ্যপ ছিল তাহার শাবক; তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধমৃগ।]

---

১৩. কণ্ডিন-মৃগ-জাতক[১]

[কোন কোন ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও কান্তাবিরহ-যন্ত্রণায় অভিভূত হইতেন। এতৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ইন্দ্রিয়-জাতকে (৪২৩) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা এইরূপ একজন ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই রমণীর জন্য পূর্ব্বজন্মেও নিহত হইয়াছিলে এবং লোকে অঙ্গারে দগ্ধ করিয়া তোমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবানকে উক্ত বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ভগবান, ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন, সেই কথা প্রকট করিলেন। (অতঃপর ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিবার জন্য ভিক্ষুদিগের প্রার্থনা এই অংশ আর লেখা হইবে না; তৎপরিবর্ত্তে কেবল 'সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন' এই বাক্য থাকিবে। ইহা দেখিয়াই 'মেঘ হইতে চন্দ্রের মুক্তি' প্রভৃতি উপমা এবং 'ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিলেন' ইত্যাদি উহ্য আছে মনে করিতে হইবে।)]

* * *

পূর্ব্বে মগধের অধিপতিরা রাজগৃহনগরে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। তখন ফসলের সময় মগধবাসী মৃগদিগের বড় বিপত্তির আশঙ্কা ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা মাঠে ফসল জন্মিলে পাহাড়ে উঠিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইত।[২] একবার একটী পার্ব্বত্য মৃগ এক সমতলবাসিনী মৃগীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। যখন সমতলবাসী মৃগেরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার আয়োজন করিল, তখন সেই পার্ব্বত্য মৃগও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। কিন্তু মৃগী ইহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল, 'গ্রামের নিকটে আমাদের নানারূপ বিপদের আশঙ্কা। পাহাড়ে থাক বলিয়া তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই বলিলেই হয়; সুতরাং আমার সঙ্গে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে।' কিন্তু প্রণয়াবদ্ধ পার্ব্বত্য মৃগ কিছুতেই নিরস্ত হইল না।

মগধবাসীরা যখন দেখিল মৃগদিগের পাহাড় হইতে নামিবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা ইহাদিগকে মারিবার জন্য নানা স্থানে প্রতিচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যে পথ দিয়া পার্ব্বত্য মৃগ ও তাহার প্রণয়িণী আসিতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক ব্যাধ লুক্কায়িত ছিল। মৃগী মনুষ্যগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিল তাহাদের প্রাণসংহারের জন্য নিকটে কেহ লুকাইয়া আছে। তখন সে পার্ব্বত্য মৃগকে অগ্রে যাইতে দিয়া নিজে কিছু দূরে দূরে রহিল।

১। কাণ্ড (=তীর) শব্দজ।

২। লক্ষণ-জাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

পার্ব্বত্য মৃগ যেমন নিকটে আসিয়াছে, অমনি ব্যাধ একটিমাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। তাহা দেখিয়া মৃগী বায়ুবেগে পলাইয়া গেল। অনন্তর ব্যাধ মৃগের ধড় হইতে চামড়া খুলিয়া ফেলিল, আগুন জ্বালিয়া উহার মধুর মাংসের কিয়দংশ নিজে পাক করিয়া খাইল এবং অবশিষ্ট পুত্রকন্যাদিগের জন্য গৃহে লইয়া গেল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া উক্ত স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি, যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত দেখিয়া ভাবিলেন, 'হায়! এই নির্ব্বোধ মৃগ কামান্ধ হইয়া মারা গেল। কামের প্রারম্ভ সুখকর হইলেও পরিণামে ইহা হইতে বন্ধনাদি নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। এ সংসারে পরের প্রাণসংহার নিন্দনীয়; যে দেশ রমণীদিগের আধিপত্য সে দেশ নিন্দনীয়; যে সকল ব্যক্তি রমণীদিগের বশীভূত তাহারাও নিন্দনীয়।' এই কথাগুলি শুনিয়া বনবাসী অন্যান্য দেবতারা 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন, তিনিও মধুরস্বরে বনস্থলী নিনাদিত করিয়া গাইতে লাগিলেন

অতি ক্লেশ কর, মদনের শর; ধিক্, তারে শতবার;
রমণী যে দেশে শাসে রাজবেশে, ধিক্ সেই দেশে আর;
স্ত্রীবশে যেজন, থাকে অনুক্ষণ, ধিক্ ধিক্ ধিক্ তারে;
মানবসমাজে, পুরুষের সাজে, মুখ দেখাইতে নারে।

* * *

[কথা শেষ হইলে ভগবান ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অতঃপর ভগবান এইরূপে কথার সমবধান করিলেন—তখন এই বনিতাবিরহবিধুর ভিক্ষু ছিল সেই পার্ব্বত্য মৃগ; ইহার পত্নী ছিল সেই মৃগী এবং আমি ছিলাম বনদেবতা।]

---

১৪. বাতমৃগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে 'চুল্লপিণ্ডপাতিক' স্থবির তিষ্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে শাস্তা যখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর তিষ্যকুমার নামক পুত্র তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ করেন, কিন্তু মাতাপিতার অসম্মতি-নিবন্ধন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর

তিনি রাষ্ট্রপালের[১] পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করেন এবং প্রব্রজ্যা প্রাপ্ত হন।

তিষ্যকে প্রব্রজ্যা দিবার মাসার্দ্ধ পরে শাস্তা জেতবনে চলিয়া যান; তিষ্যও তাঁহার অনুগমন করেন। সেখানে তিনি ত্রয়োদশ প্রকার ধূতাঙ্গ[২] অবলম্বন করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেন। এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে 'চুল্লপিণ্ডপাতিক' এই আখ্যা দিয়াছিল। তখন তিনি নিষ্ঠাবলে বৌদ্ধশাসনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন।

এদিকে রাজগৃহ নগরে তিষ্যের মাতাপিতা পুত্রের বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন। একদা কোন পর্ব্বের দিন তাঁহারা তিষ্যের পরিত্যক্ত অলঙ্কারপূর্ণ রৌপ্যের কৌটাটী বুকের উপর রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'বাছা আমাদের পর্ব্বের সময় এই সকল অলঙ্কার পরিতে কত ভালবাসিত! সে আমাদের একমাত্র পুত্র। গৌতম তাহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে

---

[১]। রাষ্ট্রপাল—কুরুরাজ্যের অন্তঃপাতী স্থূলকোর্ট্‌ঠিতম্ নামক নগরবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। ইনি মাতাপিতার অগোচরে বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা করিলে ভগবান তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, তুমি মাতাপিতার অনুমতি লইয়া আইস। কিন্তু রাষ্ট্রপালের মাতাপিতা অনুমতি দিতে আপত্তি করেন। তখন রাষ্ট্রপাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হন। কাজেই তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে রাষ্ট্রপাল অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যম নিকায়, মহারাষ্ট্রপাল সূত্র (৮৩) এবং বিনয় পিটক (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

[২]। ধূতাঙ্গ—রিপুদমনের নানাবিধ উপায়। ইহা ত্রয়োদশ প্রকার—পাংশুকূলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পিণ্ডপাতিকাঙ্গ, সপদানচারিকাঙ্গ, ঐকাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, অভ্রাকাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তুতিকাঙ্গ, নৈষঙ্গিকাঙ্গ। পাংশুকুলিক আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মাত্র পরিধান করেন; ত্রৈচীবরিক কদাচ ত্রিচীবরের অতিরিক্ত বস্ত্র রাখেন না; পিণ্ডপাতিক ভিক্ষার্থ উপাসকদিগের দ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু কদাচ ভিক্ষা চাহেন না, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয় তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করেন; সপদানচারিক প্রতিদিন যথানিয়মে ভিক্ষা করেন, কোন গৃহ বাদ দেন না; একাসনিক এক আসনে বসিয়া আহার শেষ করেন, আহার করিতে করিতে এক আসন ত্যাগ করিয়া আসনান্তর গ্রহণ করেন না; পাত্রপিণ্ডিক একমাত্র পাত্রে ভোজন শেষ করেন; খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য ভোজন করেন না; যাহা অকল্প্য অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের অখাদ্য তাহা দেখিবার পরও অন্য খাদ্য উদরস্থ করেন না; আরণ্যক বনে থাকেন; বৃক্ষমূলিক তরুমূলে থাকেন; আভ্যাকাশিক উন্মুক্ত স্থানে থাকেন, শ্মাশানিক শ্মশানে থাকিয়া দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন; যথাসংস্কৃতিক যখন যে আসন পান তাহাতেই উপবেশন করেন; নিষঙ্গিক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শুইতে পারেন না, ঘুমাইতে হইলে তাঁহাকে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে হয়। দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণকে বৈষ্ণবেরা 'মাধুকরী বৃত্তি' বলেন। নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা লইয়া জীবন ধারণ করেন; একগৃহ হইতে অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; অথবা এক দিনের ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না।

এখন কোথায় আছে কে বলিবে?'

শ্রেষ্ঠীদম্পতী এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময় এক দাসীকন্যা তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাদের বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের ছেলে কোন কোন গহনাগুলি খুব ভালবাসিতেন।' শ্রেষ্ঠীগৃহিণী সেগুলি দেখাইলেন। তখন দাসীকন্যা বলিল, 'আপনারা যদি আমার হাতে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের ছেলে ফিরাইয়া আনিতে পারি।' তিষ্যের জননী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দাসীকন্যাকে প্রচুর পাথেয় ও অনেক দাসদাসী সঙ্গে দিয়া শ্রাবস্তীতে পাঠাইলেন।

দাসীকন্যা শিবিকারোহণে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইল এবং যে পথে তিষ্য ভিক্ষা করিতে যাইবেন তাহার পার্শ্বে বাসা লইল। সেখানে সে নূতন নূতন ভৃত্য ব্যবস্থা করিল; তিষ্যের পৈতৃক ভৃত্যদিগের একজনও যাহাতে তাঁহার নয়নগোচর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিল এবং এইরূপে সাবধান হইয়া তিষ্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর তিষ্য যখন তাহার বাসায় ভিক্ষা করিতে গেলেন, তখন সে তাঁহার পাত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া তিষ্য লালসাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেখানে উপবেশন করিতে লাগিলেন।[১]

দাসীকন্যা যখন দেখিল তিষ্য ভোজ্য পানীয়ের লোভে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্ত হইয়াছেন, তখন একদিন পীড়ার ভাণ করিয়া সে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিল। তিষ্য যথাসময়ে তাহার আলয়ে উপনীত হইলেন; ভৃত্যেরা সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নামাইয়া রাখিল এবং তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিল। তিনি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ উপাসিকা কোথায়?' তাহারা কহিল, 'তাঁহার অসুখ করিয়াছে; আপনি তাঁহাকে একবার দেখিয়া গেলে ভাল হয়।' এই কথায় সেই লোভান্ধ স্থবির ব্রতভঙ্গ করিয়া দাসীকন্যার শয্যাপার্শ্বে গেলেন। তখন দাসীকন্যা কি জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়াছে তাঁহাকে তাহা খুলিয়া বলিল; এবং প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে এমন বশীভূত করিল যে তিনি বুদ্ধশাসন ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সে তাঁহাকে শিবিরে তুলিয়া রাজগৃহ নগরে প্রতিগমন করিল।

এই ব্যাপার রাষ্ট্র হইলে ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'শুনিতেছি এক দাসীকন্যা না কি স্থবির তিষ্যকে রসতৃষ্ণায় আবদ্ধ করিয়া পুনরায় গৃহী করিয়াছে। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'স্থবির তিষ্য পূর্ব্ব জন্মেও

---

[১]। ভিক্ষা করিবার সময় কোন গৃহস্থালয়ে উপবেশন করা নিষিদ্ধ ছিল; ভিক্ষুরা দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন মাত্র; 'ভিক্ষা দাও' এ কথাও বলিতে পারিতেন না।

এই দাসীকন্যারই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঞ্জয় নামে এক উদ্যানপালক ছিল। একদিন এক বাতমৃগ চরিতে চরিতে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। সঞ্জয় তাহাকে তাড়া করিল না, তথাপি সেদিন তাহাকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু তাড়া না পাইয়া ক্রমে মৃগের সাহস বাড়িল; সে তদবধি পুনঃ পুনঃ উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সঞ্জয় প্রতিদিন নানা প্রকার ফল ও পুষ্প চয়ন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইত। একদিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্র, উদ্যানে কখনও বিস্ময়কর কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি?' সে কহিল, 'মহারাজ, বিস্ময়কর কিছু দেখি নাই; তবে কয়েকদিন হইল, একটী বাতমৃগ বাগানে চরিতে আসিতেছে।'

'ঐ মৃগটাকে ধরিতে পারিবে?'

'যদি কিছু মধু পাই, তাহা হইলে বোধহয় উহাকে ধরিয়া আনিতে পারি।'

রাজা উদ্যানপালককে এক কলসী মধু দিলেন। সে উহা লইয়া বাগানে গেল; এবং যেখানে বাতমৃগ চরিতে আসিত, সেখানে ঘাসে মধু মাখাইয়া নিজে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। মৃগ আসিয়া ঐ মধুমাখা ঘাস খাইল এবং উহার আস্বাদে এত প্রলুব্ধ হইল যে অতঃপর আর কোনও স্থানে না গিয়া প্রতিদিন সেই উদ্যানেই চরিতে আরম্ভ করিল। ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে মৃগের আশে পাশে দেখা দিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মৃগ তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিত; কিন্তু ক্রমে তাহার ভয় ভাঙ্গিল এবং শেষে সে সঞ্জয়ের হাত হইতেই মধুমাখা ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মৃগের বিশ্বাস জন্মাইয়া একদিন সঞ্জয় সমস্ত পথের উপর ছোট ছোট ডালপালা ভাঙ্গিয়া গালিচার মত সাজাইয়া রাখিল; একটা তুম্বপূর্ণ মধু লইয়া নিজের গলদেশে ঝুলাইল, কোছড়ে ঘাস লইয়া এক এক গুচ্ছে মধু মাখাইয়া মৃগকে দিতে দিতে চলিল, এবং মৃগও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে রাজভবনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। তখন রাজভৃত্যেরা দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিল, মৃগ প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু পলাইবার পথ পাইল না।

রাজা এই সময়ে দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে ছিলেন। তিনি নামিয়া আসিয়া বাতমৃগকে কাঁপিতে দেখিয়া বলিলেন, 'জগতে রসতৃষ্ণার ন্যায় অনিষ্টকর রিপু দ্বিতীয় নাই। বাতমৃগ স্বভাবতঃ এমন ভীরু যে কোথাও মানুষ দেখিলে সপ্তাহের

মধ্যে সে দিকে যায় না, কোথাও ভয় পাইলে যাবজ্জীবন তাহার ত্রিসীমানায় পা দেয় না। কিন্তু জিহ্বার এমনই লালসা যে এই নিভৃতবনবাসী প্রাণীও রাজবাড়ীর ভিতর প্রবেশ কয়িয়াছে।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন :

গৃহে কিংবা বন্ধুমাঝে প্রলোভিত মন জিহ্বার লালসা সম পাপ নাহি আর;
ভীরু বাতমৃগ ছাড়ি গহন কানন মধুলোভে বন্দী এবে প্রাসাদ মাঝার।

অনন্তর তিনি মৃগটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; সে মুক্তি লাভ করিয়া বনে চলিয়া গেল।

* * *

[সমবধান—তখন এই দাসীকন্যা ছিল সঞ্জয়; চুল্ল-পিণ্ডিপাতিক ছিল বাতমৃগ এবং আমি ছিলাম বারাণসীর রাজা।]

---

১৫. খরাদিয়া-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলেন। সেই ভিক্ষু নাকি অতি অবাধ্য ছিলেন; তিনি কোনরূপ উপদেশ শুনিতেন না। একদিন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তুমি না কি বড় অবাধ্য এবং কোনরূপ উপদেশ শুনিতে চাও না?' সে বলিল, 'হাঁ ভগবন।' শাস্তা বলিলেন, 'তুমি পূর্ব্বজন্মেও বড় অবাধ্য ছিলে এবং পণ্ডিতজনের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া পাশবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক এক মৃগযুথের অধিপতি হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। একদিন তাঁহার ভগিনী স্বীয় পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'ভাই, এটী তোমার ভাগিনেয়। ইহাকে মৃগমায়া সমস্ত[১] শিক্ষা দাও। বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়কে বলিলেন, 'বৎস, তুমি অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে মৃগমায়া শিখাইব।' কিন্তু মৃগপোতক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইত না; সে একদিন নয়, দুই দিন নয়, সাত দিন পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্বের নিকটেও গেল না; কাজেই সে কিছুই

---

[১]। মৃগেরা যে কৌশল দ্বারা ব্যাধ প্রভৃতি শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করে। পরবর্ত্তী জাতকে এই সকল কৌশল সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

শিখিতে পাইল না।

অনন্তর একদিন চরিতে গিয়া সেই মৃগপোতক পাশে আবদ্ধ হইল। তাহা শুনিয়া তাহার গর্ভধারিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে কি মৃগমায়া শিখাও নাই?' ভাগিনেয়ের ব্যবহারে বোধিসত্ত্ব এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে এই ভয়ানক বিপদের সময়েও তাহাকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

আটখানি খুর আছে চারি পায়ে, রয়েছে মস্তক'পর
বক্র, অতি বক্র, অতীব কঠিন শৃঙ্গদ্বয় ভয়ঙ্কর;[1]
থাকিতে সুবিধা এইরূপ সব, মৃগের কি আছে ভয়,
গুরু উপদেশ শুনিয়া যতনে, যদি সে চালিত হয়?
সপ্ত মৃগমায়া, যদি খরাদিয়া,[2] শিখিত তনয় তোর,
তবে কি এখন হইত তাহার এ দুর্দ্দশা অতিঘোর?
অবাধ্য যে জন, সেই পাষণ্ডের বৃথা উপদেশ-দান;
গুরুর বচন অবহেলা করি হারায় সে নিজ প্রাণ।

এ দিকে যে ব্যাধ জাল পাতিয়াছিল সে ঐ অবাধ্য মৃগপোতকের প্রাণনাশ করিয়া তাহার মাংস লইয়া চলিয়া গেল।

* * *

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই মৃগপোতক; উৎপলবর্ণা[3] ছিলেন খরাদিয়া এবং আমি ছিলাম বৌদ্ধদিগের উপদেষ্টা।

---

[1]। মৃগের খুর খণ্ডিত; সুতরাং প্রতিপদে দুই খানি করিয়া আট খানি খুর। তাহাতে ভর দিয়া তাহারা বায়ুবেগে পলায়ন করিতে পারে; সুদৃঢ় শৃঙ্গদ্বারাও তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। কিন্তু তোমার তনয় এত সুবিধা থাকিতেও প্রাণ হারাইল, কারণ সে আমার উপদেশে কর্ণপাত করে নাই।

[2]। খরাদিয়া সেই মৃগীর নাম।

[3]। উৎপলবর্ণা—শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৬. ত্রিপর্য্যস্ত মগৃ-জাতক

[শাস্তা কৌশাম্বী[১] নগরস্থ বদরিকারামে অবস্থিতিকালে স্থবির রাহুল সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাহুল ইহার অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত সঙ্ঘের নিয়মাবলী শিক্ষা করিতেছিলেন।

শাস্তা যখন আলবী নগরের নিকটবর্ত্তী অগ্গালব চৈত্যে বাস করিতেছিলেন, তখন প্রথম প্রথম দিবাভাগে বহু উপাসিকা ও ভিক্ষুণী ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সেখানে সমবেত হইতেন। কিয়ৎকাল পরে উপাসিকা ও ভিক্ষুণীরা আর আসিতেন না, কেবল উপাসক ও ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইতেন। তদবধি সন্ধ্যার পর ধর্ম্মকথা হইত; উহা শেষ হইলে স্থবির ভিক্ষুরা স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতেন, দহর ভিক্ষুরা এবং উপাসকেরা উপস্থানশালায়[২] শুইয়া থাকিতেন। নিদ্রিত হইবার পর তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাকের ঘড় ঘড়ানি ও দাঁতের কিড়মিড়িতে সেই গৃহে বিকট শব্দ হইত; ইহাতে অনেকের মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ইঁহারা একদিন ভগবানের নিকট আপনাদের অসুবিধার কথা জানাইলেন। তখন ভগবান ব্যবস্থা করিলেন যে ভিক্ষুরা অনুপসম্পন্নদিগের[৩] সহিত একশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহার পর ভগবান শিষ্যগণসহ কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন।

সেখানে একদিন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান রাহুলকে বলিলেন, 'ভগবান যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এখন হইতে আপনাকে নিজের বাসস্থান দেখিয়া লইতে হইবে।' রাহুল অতি যত্নের সহিত সঙ্ঘের নিয়ম অভ্যাস করিতেন; বিশেষতঃ তিনি বুদ্ধের পুত্র; এই নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার মনে হইত যেন তিনি নিজের গৃহেই আছেন। তাঁহারা তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিতেন এবং তাঁহার উপধানের জন্য একখণ্ড বস্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে নিয়মভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় সেদিন তাঁহারা রাহুলকে শয়নস্থান পর্য্যন্ত দিলেন না। রাহুল অতি সুশীল ছিলেন। স্বয়ং দশবল তাঁহার পিতা; ধর্ম্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাঁহার উপাধ্যায়; মহামৌদ্‌গল্যায়ন তাঁহার আচার্য্য[৪]; স্থবির আনন্দ তাঁর খুল্লতাত; কিন্তু তিনি কাহারও নিকট না

---

[১]। কৌশাম্বী এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রাচীন নগর। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কোশম নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

[২]। বিহারের যে গৃহে বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহার নাম উপস্থানশালা।

[৩]। অর্থাৎ যাহারা ২০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বলিয়া উপসম্পন্ন হয় নাই।

[৪]। সারীপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের দুই জন প্রধান শিষ্য। সারীপুত্রের প্রকৃত নাম উপতিষ্য; ইনি 'ধর্ম্মসেনাপতি' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভধারিণী 'সারীর' নামানুসারে

গিয়া সেই রাত্রিতে দশবলের বর্চ্চঃকুটীরে[১] শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তির আধিক্যবশত ঐ স্থানই তাঁহার নিকট স্বর্গবৎ সুখকর বোধ হইল। ঐ বর্চ্চঃকুটীরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত, উহার কুট্টিম সুগন্ধ মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত; উহার পথের দুইধারে পুষ্প ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং উহার মধ্যে সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত। কিন্তু এই সকল সুখের সামগ্রী ছিল বলিয়া যে রাহুল সেখানে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভিক্ষুরা তাঁহাকে নিজের শয়নস্থান ঠিক করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন; তিনি নিজেও সঙ্ঘের নিয়ম প্রতিপালন করিতেন এবং সর্ব্বদা উপদেশলাভার্থ ব্যগ্র ছিলেন। এই জন্যই অন্য কোথাও স্থানের সুবিধা না দেখিয়া তিনি বর্চ্চঃকুটীরেই রহিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও ভিক্ষুরা রাহুলের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য, যাহাতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সময়ে সময়ে এমন কাজ করিতেন। দূর হইতে, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া, কেহ হয়ত সম্মার্জনী, কেহ বা আবর্জ্জনা পথে ফেলিয়া রাখিতেন এবং রাহুল আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এ সব ওখানে কে ফেলিয়া দিয়াছে?' তখন আর একজন বলিতেন, 'রাহুল ত ঐ পথে আসিলেন; [উনি ছাড়া আর কে ফেলিবে?]। রাহুল সঙ্ঘের নিয়মাবলী এত শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন যে তিনি কখনও 'আমি ফেলি নাই', বা 'আমি ইহার কিছুই জানি না' এরূপ বলিতেন না; অপিচ স্বহস্তে সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ক্ষমা করিলেন ইহা নিশ্চিত জানিতে না পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেন না। ফলতঃ সঙ্ঘের নিয়ম সম্বন্ধে অচলা শ্রদ্ধাবশতই তিনি সেই রাত্রিতে বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়াছিলেন।

এদিকে শাস্তা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বর্চ্চঃকুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গলা খেঁকারি দিলেন; তাহা শুনিয়া রাহুলও ভিতর হইতে গলা খেঁকারি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ওখানে'? রাহুল উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, আমি রাহুল,' এবং তখন বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করলেন। 'তুমি এখানে শুইয়াছিলে

লোকে ইঁহাকে সারীপুত্রও বলিত। মৌদ্গল্যায়ন গোত্রনাম; ইঁহার প্রকৃত নাম কোলিত। উভয়ের সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪০/১৪১ শ্লোকে আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে যিনি শিষ্যের উপনয়ন দিয়া তাঁহাকে বেদ অধ্যয়ন করান তিনি 'চার্য্য'; আর যিনি উপজীবিকার জন্য বেদ কিংবা ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায়। এই লক্ষণ ধরিলে বৌদ্ধ মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা তাঁহাকে 'আচার্য্য' এবং যিনি অন্যান্য শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায় পদবাচ্য। Childers কিন্তু ইহাদের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন।

[১]। পায়খানা।

কেন, রাহুল?' 'থাকিবার স্থান পাই নাই বলিয়া। এতদিন ভিক্ষুরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেন; কিন্তু এখন, পাছে সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, তাঁহারা আর স্থান দিতে চান না। বর্চ্চঃকুটীরে কাহারও সংসর্গের সম্ভাবনা নাই; এই ভাবিয়া এখানেই রাত্রিযাপন করিয়াছি।'

তখন শাস্তা ভাবিতে লাগিলেন, 'ভিক্ষুরা যদি রাহুলেরই সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, তাহা হইলে অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে না জানি, কতই অসুবিধাতে পড়িতে হইবে।' অনন্তর ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারীপুত্র, আর কেহ না জানুক, অন্ততঃ তুমি বোধহয় জান যে রাহুল এখন কোথায় বাসা পাইয়াছে?' সারীপুত্র উত্তর দিলেন, 'না, ভগবন, আমি তাহা জানি না।' 'রাহুল আজ বর্চ্চঃকুটীরে শুইয়াছিল। দেখ, তুমি যদি রাহুলেরই সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, তবে না জানি অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে কি অসুবিধাতেই ফেলিবে! এরূপ করিলে যাহারা এই শাসনে প্রব্রজ্যা লইবে, তাহারা তিষ্ঠিতে পারিবে না। অদ্যাবধি তুমি অনুপসম্পন্নদিগকে এক দিন বা দুই দিন নিজের বাসায় রাখিবে; তৃতীয় দিবসে তাহারা বাসা ঠিক করিয়া লইবে; কিন্তু কে কোথায় বাসা লইল, তাহা তোমাকে জানিতে হইবে।' শাস্তা এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে একটী অতিরিক্ত বিধি যোগ করিয়া দিলেন।

তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ, রাহুল সঙ্ঘের নিয়মশিক্ষায় কেমন যত্নশীল। যখন তাঁহাকে বাসা খুঁজিয়া লইতে বলা হইল, তখন তিনি বলিতে পারিতেন, 'আমি দশবলের পুত্র, আমার বাসা লইয়া তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।' কিন্তু তিনি সেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন না, একটী ভিক্ষুকেও তাঁহার বাসা হইতে বাহির করিয়া দিলেন না, নিজে গিয়া বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়া রহিলেন!' ভিক্ষুরা এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত আসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছ?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভগবান, রাহুল নিয়মশিক্ষা সম্বন্ধে কেমন যত্নশীল, আমরা তাহাই বলিতেছিলাম। আর কিছুর সম্বন্ধে নহে।' তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'রাহুল যে কেবল এ জন্মেই নিয়মশিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বে যখন সে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন এইরূপ একাগ্রতার সহিত নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

মগধের রাজারা যখন রাজগৃহে থাকিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মৃগযূথের অধিনায়ক হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। একদিন তাঁহার ভগিনী নিজের পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে মৃগমায়াগুলি শিক্ষা দাও।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'নিশ্চয় শিকাইব; যাও বাবাজি, এখন খেলা করা গিয়া; অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিয়া উপদেশ লইবে।' মাতুল যেরূপ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ভাগিনেয় ঠিক সেইমত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃগমায়া শিখিতে লাগিল।

একদিন মৃগপোতক বনভূমিতে বিচরণ করিবার সময় পাশবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহার জননীকে সংবাদ দিল। তখন সেই মৃগী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল, 'ভাই, তুমি আমার ছেলেকে সমস্ত মৃগমায়া শিখাইয়াছ কি? বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভগিনি, তোমার পুত্রের কোনরূপ অনিষ্টাশঙ্কা করিও না। সে সমস্ত মৃগমায়া সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; সে এখনই ফিরিয়া আসিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিলেন :

ষড়বিধ মৃগমায়া জানে ভাগিনেয়
বঞ্চিতে ব্যাধেরে; উভ পার্শ্বে কিংবা পৃষ্ঠে
দিয়া ভর মৃতবৎ বিস্তারি শরীর
পারে সে শুইতে; খুর আটখানি তার
জানে প্রয়োজনমত করিতে প্রয়োগ;
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, তবু নাহি করে
মধ্যরাত্রি বিনা অন্য কালে জলপান;
উর্দ্ধ অর্দ্ধনাসারন্ধ্রে বায়ু নিরোধিয়া
শ্বাসক্রিয়া করে শুধু নিম্ন অর্দ্ধ দিয়া।[১]

ভাগিনেয় মৃগমায়ায় সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছে ইহা বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব উক্তরূপে ভগিনীকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। এদিকে সেই পাশবদ্ধ মৃগপোতক একপার্শ্বে ভর দিয়া দেহবিস্তারপূর্ব্বক ভূমিতে শুইয়া পড়িল, পা গুলি বিস্তার করিল, পায়ের নিকট যে স্থান ছিল খুরের আঘাতে তাহা হইতে ঘাস ও ধুলি খুঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিল, মলমূত্র ত্যাগ করিল, মাথাটা এমনভাবে রাখিল যেন ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; জিহ্বা বাহির করিল; সর্ব্বশরীর লালায় প্লাবিত করিল; চক্ষু উল্টাইয়া রাখিল; নাসারন্ধ্রের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বাতরোধপূর্ব্বক কেবল নিম্নার্দ্ধদ্বারা

[১]। অর্থাৎ এই সময়ে তাহাকে সম্পূর্ণ মৃত বলিয়া মনে হয়।

শ্বাসক্রিয়া চালাইতে লাগিল; বায়ুদ্বারা উদর স্ফীত করিয়া রাখিল;—ফলতঃ সে এমন স্তব্ধভাবে রহিল যে দেখিলেই বোধ হইল যেন মরিয়া গিয়াছে। নীল মক্ষিকারা আসিয়া তাহার গা ছাইয়া ফেলিল, কোন কোন অঙ্গে দুই একটা কাকও আসিয়া বসিল।

মৃগপোতক এইভাবে পড়িয়া আছে এমন সময়ে ব্যাধ আসিল। সে উহার পেটের উপর দুই একটা চাপড় দিয়া ভাবিল, 'বোধহয় ভোর বেলা ফাঁদে পড়িয়াছে; মাংস হয় ত পচিতে আরম্ভ করিয়াছে।' তখন সে বন্ধন খুলিয়া দিল এবং 'এখনই ইহাকে কাটিয়া মাংস (খাইব ও) লইয়া যাইব' মনে করিয়া (আগুন জ্বালাইবার জন্য) নিঃসন্দেহচিত্তে কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মৃগপোতক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, গা ঝাড়া দিল এবং গ্রীবা বিস্তারপূর্ব্বক বাতবিতাড়িত মেঘমণ্ডবৎ অতিবেগে মায়ের কোলে ফিরিয়া গেল।

* * *

[সমবধান—তখন রাহুল ছিল সেই মৃগ-শাবক; উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার গর্ভধারিণী, এবং আমি ছিলাম সেই মৃগপোতকের মাতুল।]

☞ এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত, মৃগ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিনামা শৃগালের কথার সাদৃশ্য আছে।

---

১৭. মারুত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইঁহারা নাকি পূর্ব্বে কোশলরাজ্যের এক অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল কাল স্থবির; অপর জনের নাম ছিল জ্যোৎস্না স্থবির। একদিন কাল জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মহাশয়, শীত কখন হয়?' জ্যোৎস্না বলিলেন, 'শুক্লপক্ষে।' তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, শীত কোন সময় হয়?' তাঁহাদের যাঁহার যে বক্তব্য ছিল সমস্ত শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'আমি অতীত কালেও তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে কোন পর্ব্বতের পাদদেশে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র বন্ধুভাবে একই গুহায় বাস করিত; বোধিসত্ত্বও তখন ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একদিন ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে শীত কখন হয় ইহা লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। ব্যাঘ্র বলিয়াছিল কৃষ্ণপক্ষে শীত পড়ে; সিংহ বলিয়াছিল শুক্লপক্ষে শীত পড়ে। তখন তাহারা সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিলেন :

শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষে, যখনি বাতাস বয়,
তখনি কাঁপায়ে হাড় শীত অনুভূত হয়।
বায়ু হ'তে জন্মে শীত, তাই মোর মনে লয়
এ বিবাদে উভয়েরি হয়নিক পরাজয়।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

* * *

অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উভয় ভিক্ষুই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

[সমবধান—'তখন কাল স্থবির সেই ব্যাঘ্র; জ্যোৎস্না স্থবির ছিল সেই সিংহ; এবং আমি ছিলাম তাহাদের প্রশ্নের উত্তর-দাতা।]

---

১৮. মৃতকভক্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে মৃতকভক্ত[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন লোকে বিস্তর ছাগ-মেষ প্রভৃতি পশুবধ করিয়া পরলোকগত জ্ঞাতিবন্ধুদিগের উদ্দেশে মৃতকভক্ত দিত। তাহা দেখিয়া একদিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, এই যে লোকে বহুপ্রাণী বধ করিয়া মৃতকভক্ত দেয়, ইহাতে কোন সুফল হয় কি?' শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মৃতকভক্তে কোন সুফল নাই, ইহার জন্য প্রাণিবধ করিলেও কোন সুফল নাই। পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা আকাশে উপবেশন করিয়া এই কুপ্রথার দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক ইহা সমস্ত জম্বুদ্বীপ হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া লোকের অতীতস্মৃতি লোপ পাইয়াছে;

---

[১]। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ যে অন্নাদি উৎসর্গ করা যায়। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কাজেই ইহা পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কোন লোকবিখ্যাত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মৃতকভক্ত দিবার অভিপ্রায়ে একটি ছাগ আনয়ন করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ, ইহাকে লইয়া নদীতে স্নান করাও এবং গলায় মালা পরাইয়া পঞ্চাঙ্গুলিক[১] দিয়া ও সাজাইয়া লইয়া আইস। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ছাগ লইয়া নদীতে গেল এই উহাকে স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া তীরে রাখিয়া দিল। তখন অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত ছাগের মনে পড়িল এবং 'আজই আমার দুঃখের অবসান হইবে' ভাবিয়া সে অতীব হর্ষের সহিত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই 'আহা, আমি এতদিন যে দুঃখভোগ করিলাম, আমার প্রাণবধ করিয়া এই ব্রাহ্মণও অতঃপর সেই দুঃখ ভোগ করিবে' ইহা ভাবিয়া সে করুণা-পরবশ হইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই ছাগ, তুমি হাসিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে, কান্দিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে 'বল ত, তুমি হাসিলেই বা কেন, কান্দিলেই বা কেন?' ছাগ বলিল, 'তোমাদের অধ্যাপকের নিকট গিয়া আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও।'

শিষ্যেরা ছাগ লইয়া অধ্যাপকের নিকট ফিরিয়া গেল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজেই ছাগকে হাসিবার ও কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাগ তখন জাতিস্মর হইয়াছিল। সে বলিল, 'দ্বিজবর, এক সময়ে আমিও আপনার মত ত্রিবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলাম; কিন্তু একবার একটা ছাগ বধ করিয়া মৃতকভক্ত দিয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে চারি শত নিরনব্বই বার ছাগজন্ম গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এই আমার পঞ্চশততম ও শেষ জন্ম। এখনই চিরকালের মত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব ভাবিয়া আমি হাসিয়াছি। আবার দেখিলাম, আমি ত পাঁচশতবার শিরশ্ছেদ ভোগ করিয়া মুক্ত হইতে চলিলাম; কিন্তু

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদক 'পঞ্চাঙ্গুলিক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'একমুষ্টি শস্য'। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। লোকে সিন্দুর, চন্দন বা তদ্রূপ কোন রঞ্জনদ্রব্য হাতে মাখাইয়া গবাদি পশুর অঙ্গ-সৌষ্ঠবার্থ তাহাদের গায়ে ছাপ দিত। বোধহয় ইহাকেই পঞ্চাঙ্গুলিক বলা হইত। যে পশু বলি দেওয়া যায়, সম্ভবত তাহাকেও এইরূপ সজ্জিত করিবার প্রথাই ছিল। কখনও দেখা যায়, বলি দিবার পূর্ব্বে ছাগের কপালে সিন্দুরের দাগ দেওয়া হইয়া থাকে। নন্দীবিলাস-জাতকে (২৮) 'গন্ধেন পঞ্চাঙ্গুলিম্ দত্ত্বা' এই ব্যাখ্যারই সমর্থন করে।

আপনাকে আমার প্রাণবধজনিত পাপে ঠিক এইরূপে পাঁচশতবার শিরশ্ছেদ-দণ্ড পাইতে হইবে। কাজেই আপনার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া কান্দিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার কোন ভয় নাই; আমি তোমার প্রাণনাশ করিব না।'

'আপনি মারুন, আর নাই মারুন, আজ আমার নিস্তার নাই।'

'কোন চিন্তা নাই; আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় রক্ষা করিব।'

'দ্বিজবর, আপনি যে রক্ষার চেষ্টা করিবেন তাহা দুর্ব্বলা, আর আমার কৃতপাপের শক্তি প্রবলা।'

এইরূপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ ছাগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং 'দেখিব, কে এই ছাগকে মারে' এই সঙ্কল্প করিয়া শিষ্যগণের সহিত উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। ছাগ বন্ধনমুক্ত হইবা মাত্র এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আরোহণপূর্ব্বক গ্রীবা প্রসারিত করিয়া গুল্মপত্র খাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে পাষাণের উপর বজ্রপাত হইল। তাহার আঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং উহার এক খণ্ড এমন বেগে ছাগের প্রসারিত গ্রীবায় লাগিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ দেবতা হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি আকাশে বীরাসনে উপবেশন করিলেন; সকলে সবিস্ময়ে তাহা দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আহা, এই হতভাগ্যেরা যদি দুষ্ক্রিয়ার ফল জানিতে পারে, তাহা হইলে বোধহয় কখনও প্রাণিহিংসা করে না।' অনন্তর তিনি অতি মধুর স্বরে এই সত্য শিক্ষা দিলেন :

জানে যদি জীব, কি কঠোর দণ্ড জন্মে জন্মে ভোগ করে
হিংসার কারণ, তবে কি সে কভু জীবের জীবন হরে?

এইরূপে সেই মহাসত্ত্ব শ্রোতাদিগের মনে নরকভয় জন্মাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এত ভীত হইল যে তদবধি তাহারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিল এবং বোধিসত্ত্বের শিক্ষাবলে সকলে দশবিধশীলসম্পন্ন হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; সেই সকল লোকও আমরণ দানধর্ম্মাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিল।

* * *

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

---

১৯. আয়াচিত-ভক্ত জাতক[১]

[লোকে বাণিজ্যার্থ দূরদেশে যাইবার সময় দেবতাদিগকে পশুবলি দিত এবং 'যদি লাভ করিয়া ফিরিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে আবার পশুবলি দিয়া পূজা করিব' দেবতার নিকট এইরূপ মানত করিয়া যাত্রা করিত। অনন্তর যদি তাহারা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিত, তাহা হইলে দেবতাদিগের অনুগ্রহেই এই সুবিধা ঘটিয়াছে ভাবিয়া অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ আবার অনেক প্রাণী বধ করিত।

একদিন জেতবনস্থ ভিক্ষুরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, দেবতাদিগকে পশুবলি দিলে কি কোন উপকার হয়?' তদুত্তরে শাস্তা এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :—]

* * *

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন পল্লীভূ-স্বামী গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষবাসী দেবতাকে পশুবলি দিবার মানত করিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর বহুপ্রাণিবধ দ্বারা মানত শোধ দিবার জন্য সেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :

মুক্তি যদি চাও, জীব, পরলোক-কথা যেন থাকে তব মনে অনুক্ষণ;
এ মুক্তি তোমার শুধু, শুন ওহে মূঢ়মতি, দৃঢ়তর বন্ধনকারণ।
জ্ঞানী, ধর্ম্মপরায়ণ, এহেন মানবগণ, আত্মমুক্তি লভে সযতনে,
অজ্ঞান, পাষণ্ড যারা, হিংসি জীবে অহরহ, মুক্তিভ্রমে লভিছে বন্ধনে।'

তদবধি লোকে এইরূপ প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণপূর্ব্বক দেবলোকের অধিবাসীসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

* * *

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

---

[১]। আয়াচন—প্রার্থনা বা মানত।

২০. নলপান-জাতক

[শাস্তা কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিবার সময় 'নলকপান' গ্রামে উপনীত হইয়া 'নলকপান' সরোবরের নিকটবর্ত্তী কেতকবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একচ্ছিদ্র নলসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা নলকপান সরোবরে অবগাহন করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে নল কাটিয়া আন; সূচী রাখিবার আধার প্রস্তুত করিতে হইবে।' তাহারা কতকগুলি নল কাটিয়া আনিলে দেখা গেল, উহাদের আগাগোড়া ফাঁপা, কোথাও গাঁট নাই। তাঁহারা শাস্তার নিকট এই বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, 'পুরাকালে এখানকার নলসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে এক নিবিড় অরণ্য ছিল এবং এই পুষ্করিণীতে এক উদকরাক্ষস বাস করিত। তখন বোধিসত্ত্ব কপিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহ রক্তবর্ণ মৃগপোতকের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তিনি আশি হাজার বানর সঙ্গে লইয়া এই অরণ্যে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব বানরদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'বাপ সকল, এই বনে বিষবৃক্ষ আছে, এমন অনেক সরোবরও আছে, যাহার জলে উদকরাক্ষস থাকে। সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অজানা ফল খাইও না, পূর্ব্বে যেখানকার জল পান কর নাই, এমন জলাশয়ের জলও মুখে দিও না। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে চলিতে অঙ্গীকার করিল।

একদিন বানরেরা ঐ অরণ্যের এমন একস্থানে গিয়া পৌঁছিল, যাহা তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সারাদিন চলিবার পর জল খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল; কিন্তু বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় জলপান না করিয়া তীরে বসিয়া রহিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা জল খাইতেছ না কেন?' তাহারা বলিল, 'আপনার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বেশ করিয়াছ।'

ইহার পর বোধিসত্ত্ব এই সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া পদচিহ্ন দর্শনে বুঝিলেন, প্রাণিগণ জল পানার্থ উহাতে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই উহা হইতে উত্তরণ করে নাই। অতএব ঐ সরোবর যে রাক্ষস-সেবিত, তৎসম্বন্ধে নিঃশংসয় হইয়া তিনি বলিলেন, 'বাপ সকল, তোমরা জলে না নামিয়া ভালই করিয়াছ, কারণ ইহার ভিতর রাক্ষস বাস করে।'

উদকরাক্ষস দেখিল বানরদিগের কেহই অবতরণ করিতেছে না। তখন সে

ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জলরাশি ভেদ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার উদর নীলবর্ণ, মুখ পাণ্ডুরবর্ণ, হস্তপাদ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। সে বলিল, 'তোমরা যে এখানে বসিয়া আছ? নামিয়া জল খাওনা?' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই পুষ্করিণীবাসী রাক্ষস নও কি?' সে বলিল 'হাঁ'।

'যাহারা এই জলে নামে সকলেই তোমার খাদ্য?'

'হ্যাঁ, যাহারা জলে নামে সকলেই আমার খাদ্য; ছোট ছোট পাখী হইতে বড় বড় চতুষ্পদ পর্য্যন্ত কেহই এই জলে নামিলে আমার কবল হইতে নিস্তার পায় না। তোমাদিগকেও আমার উদরস্থ হইতে হইবে।'

'আমরা তোমার উদরস্থ হইতেছি না।'

'এক বার জল পান করিয়া দেখ, হও কি না,'

'আমরা জলও পান করিব, অথচ তোমার আয়ত্ত হইব না।'

'আচ্ছা দেখি, তোমরা কেমন করিয়া জল পান কর।'

'বটে, তুমি ভাবিয়াছ আমরা জল পান করিবার জন্য সরোবরে নামিব! কিন্তু আমরা আদৌ নামিব না, অথচ আমাদের এই আশিহাজার বানরের সকলেই এক একটী নল লইয়া তাহা দ্বারা জল পান করিবে। লোকে যেমন পদ্মনাল দ্বারা জল চুষিয়া লয়, আমরাও সেইরূপ এই নলদ্বারা জল চুষিব। কাজেই তুমি আমাদিগকে ছুঁইতে পারিবে না।'

এই কথা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ পাঠ করিলেন :

বুঝিলাম পদচিহ্নে, কত প্রাণী, হায়, হায়, পশিয়াছে বনের ভিতর;
বুঝিলাম পদচিহ্নে, একটী তাহার কিন্তু যাই নাই ফিরি নিজ ঘর।
[আমরা বানর সব নামিব না কিছুতেই জলমাঝে জলপান তরে;
নলের সাহায্যে মোরা চুষিয়া লইব বারি থাকি এই তীর-ভূমি'পরে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটা নল আনাইলেন এবং 'আমি যদি দশ-পারমিতা লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই নল গ্রন্থিরহিত এবং সর্ব্বত্র একচ্ছিদ্র হউক' এই শপথ[১] করিয়া উহাতে ফুঁ দিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই ঐ নল গ্রন্থিশূন্য এবং সর্ব্বত্র সচ্ছিদ্র হইল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব আরও কয়েকটী নল একচ্ছিদ্র করিলেন। (কিন্তু এরূপে একটী একটী করিয়া আশি হাজার নল একচ্ছিদ্র করা বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়া অতঃপর) তিনি এই পুষ্করিণী প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন

[১]। মূলে 'সত্যক্রিয়া' এই শব্দ আছে। কেহ ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-সমূহ উল্লেখ করিয়া বলে, 'আমি যদি এইরূপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এইরূপ হউক'; এবং সে যদি প্রকৃতিই সুকৃতিমান হয়, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্খিত বিষয় যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ সুসাধ্য হয়।

'এইস্থানে যত নল জন্মে সমস্তই গ্রন্থিশূন্য ও একচ্ছিদ্র হউক।' বোধিসত্ত্বদিগের পরহিতব্রতের এমনই মাহাত্ম্য, যে তাঁহাদের আদেশ কখনও নিষ্ফল হয় না। কাজেই তদবধি এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্তই অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত একচ্ছিদ্র হয়।[১]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটী নল হাতে সরোবরের তীরে বসিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সেইরূপ করিল, এবং তাঁহার দেখাদেখি নলদ্বারা জল পান করিতে লাগিল, কাহাকেও জলে নামিতে হইল না। কাজেই রাক্ষস তাহাদের একটা প্রাণীকেও স্পর্শ করিতে না পারিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল; বোধিসত্ত্বও নিজের দলবল লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই উদকরাক্ষস; আমার শিষ্যেরা ছিল সেই আশি হাজার বানর; এবং আমি ছিলাম সেই উপায়-কুশল বানররাজ।]

---

[১]। বৌদ্ধেরা বলেন চারিটী প্রাতিহার্য্য অর্থাৎ লোকোত্তর বিষয় (miracle) বর্ত্তমান কল্পের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে :—(১) চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্ন; (২) বর্ত্তকজাতকে (৩৫ সংখ্যক) যে স্থানে অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানের চিরকাল অগ্নিস্পর্শশূন্য থাকা; (৩) যেখানে ঘটীকারের গৃহ ছিল, সেখানে কখনও বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং (৪) নলকপান-পুষ্করিণীর তীরজাত নলগুলির একচ্ছিদ্র হওয়া।

চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্নের বৃত্তান্ত শশকজাতকে (৩১৬) দ্রষ্টব্য। ঘটীকারের বৃত্তান্ত মধ্যম নিকায়ে ৮১ সূত্রে বর্ণিত আছে। ইনি জাতিতে কুম্ভকার, কোশলরাজ্যের অন্তঃপাতী বেভলিঙ্গম্ নামক গণ্ডগ্রামের অধিবাসী এবং শীলগুণে সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের অগ্রোপস্থায়ক ছিলেন। একবার বর্ষাকালে কাশ্যপের কুটীরে জল পড়িয়াছিল; কাশ্যপ তখন ভিক্ষুদিগকে ঘটীকারের বাড়ী হইতে খড় আনিতে বলেন; কিন্তু ভিক্ষুরা তাঁহাকে গিয়া জানান 'ঘটীকারের বাড়ীতে উদ্বৃত্ত খড় নাই; তবে তাঁহার চালে খড় আছে বটে।' ইহা শুনিয়া কাশ্যপ আদেশ দেন, 'বেশ, তাহার চাল হইতেই খড় লইয়া আইস।' ভিক্ষুরা তাহাই করেন এবং ঘটীকার উহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ন হওয়া দূরে থাকুক, পরম আহ্লাদের সহিত বলেন, 'আমি ধন্য যে আমার এই খড় সম্যকসম্বুদ্ধের প্রয়োজনে লাগিল।' ইহার পর কাশ্যপের বরে ঘটীকারের কুটীরের উপর বর্ষার তিন মাস বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ে নাই; এখনও, যেখানে কুটির ছিল, সেখানে কোন সময়েই বৃষ্টিপাত হয় না।

২১. কুরঙ্গমৃগ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে থাকিবার সময় দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণবধ করিবার জন্য অনেক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একদিন এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; আর একবার ধনপালক নামক এক মত্ত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন।[১] একদা ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের এই সকল গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত ছিল তাহাতে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভগবন, দেবদত্ত আপনার জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই জন্য আমরা তাঁহার অগুণ কীর্ত্তন করিতেছি।' তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, 'দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগ জন্মগ্রহণ করিয়া বনে বনে ফল খাইয়া বেড়াইতেন। তিনি একবার সপ্তপর্ণী-ফল খাইবার জন্য একটা সপ্তপর্ণী বৃক্ষের মূলে যাইতে লাগিলেন। তখন নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক ব্যাধ বাস করিত; সে পদচিহ্ন দেখিয়া মৃগদিগের গমনাগমন-পথ বুঝিত এবং তাহারা যখন যে বৃক্ষের ফল খাইতে যাইত, তাহার উপর মাচা বান্ধিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। মৃগেরা না জানিয়া তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই সে শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত। এইরূপে যে মাংস পাওয়া যাইত, তাহা বিক্রয়-দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

ব্যাধ উক্ত সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূলে বোধিসত্ত্বের পদচিহ্ন দেখিয়া উহার শাখার অন্তরালে মাচা বান্ধিল এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া শক্তিহস্তে সেখানে বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সপ্তপর্ণী ফল খাইবার জন্য প্রাতঃকালে আবাসস্থান হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু হঠাৎ বৃক্ষমূলে না গিয়া একটু দূরে দূরে রহিলেন— ভাবিলেন, 'সময়ে সময়ে ব্যাধেরা গাছের উপর মাচা বান্ধিয়া বসিয়া থাকে; এখানে সেরূপ কিছু ঘটিল কি না দেখা আবশ্যক।' অনন্তর তিনি কিছু দূরে থাকিয়া কোন আশঙ্কার কারণ আছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

---

[১]। এই সকল বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে দেবদত্ত-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ব্যাধ দেখিল বোধিসত্ত্ব তরুমূলে আসিতেছেন না। সে সপ্তপর্ণী-ফল ছিঁড়িয়া তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। তখন বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'এই ফলগুলি আমার কাছে আসিয়া পড়িতেছে; ইহাতে বোধ হইতেছে যে, গাছে ব্যাধ আছে।' অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া শাখার মধ্যে ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, 'ওহে বৃক্ষ, এতকাল ত তুমি ফলগুলি সোজাভাবে ফেলিয়া দিতে, ছুঁড়িয়া ফেলিতে না; কিন্তু আজ তুমি বৃক্ষের মত আচরণ করিতেছ না কেন? বেশ, তুমি যখন বৃক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও অন্য কোন বৃক্ষতলে গিয়া আহারের উপায় দেখিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :

ফেলিছ যে ফল আজি, ওহে সপ্তপর্ণী ভাই,
কুরঙ্গ-মৃগের কাছে তাহা অবিদিত নাই।
চলিলাম সেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণী-তলে;
কিছু মাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।

তখন, 'দূর হ, আজ আমার হাত এড়াইলি' বলিয়া সেই ব্যাধ মাচা হইতে শক্তি নিক্ষেপ করিল; বোধিসত্ত্বও মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার হাত এড়াইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত তোমার কর্ম্মফল এড়াইতে পারিবে না; তোমাকে ত অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে[১] থাকিতে হইবে, তুমি ত পঞ্চবিধ বন্ধনযাতনা[২] ভোগ করিবে!' অনন্তর বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন, ব্যাধও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গমৃগ।]

---

[১]। অষ্ট মহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। বৌদ্ধমতে আরও বহু নরক আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি 'লোকান্তরিক' কতকগুলি 'উৎসাদ' নামে অভিহিত।

[২]। পঞ্চবন্ধন বা পঞ্চক্লেশ, যথা—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান এবং ঔদ্ধত্য। দোষ—ক্রোধ বা ঘৃণা।

২২. কুক্কুর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জ্ঞাতিজনের হিতানুষ্ঠান সম্বন্ধে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৫ সংখ্যক) দ্রষ্টব্য। সেই উপদেশ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি নিম্নলিখিত অতীত কথা বলিয়াছিলেন।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব প্রাক্তন কর্ম্মফলে কুক্কুরজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শত কুক্কুরপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানে বাস করিতেন।

একদিন রাজা সিন্ধুদেশজাত শ্বেতঘোটকযুক্ত এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত রথে আরোহণ করিয়া উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে সমস্ত দিন বিহার করিয়া তিনি সূর্য্যাস্তের পর নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রথের যে চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা ছিল, তাহা আর সে রাত্রিতে কেহ খুলিয়া লইল না; সাজসুদ্ধ রথ প্রাঙ্গণেই রহিল। তাহার পর বৃষ্টি হইল। সাজগুলি ভিজিয়া গেল এবং রাজার[১] কুক্কুরেরা দোতালা হইতে নামিয়া সমস্ত চামড়া খাইয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্যেরা রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ, নর্দ্দামার মুখ দিয়া কুকুর আসিয়া গাড়ীর সাজ খাইয়া ফেলিয়াছে।' ইহাতে রাজা কুক্কুরদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, 'যেখানে কুক্কুর দেখিতে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে।' তখন ভয়ানক কুক্কুর-হত্যা আরম্ভ হইল। যেখানে যায়, সেখানেই নিহত হয় দেখিয়া শেষে হতাবশিষ্ট কুক্কুরেরা শ্মশানে বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এতগুলি এক সঙ্গে আসিলে কেন?' তাহারা কহিল, 'কুক্কুরেরা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথের সাজ খাইয়াছে। তাহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাতে শত শত কুক্কুর মারা যাইতেছে; আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।'

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজভবন যেমন সুরক্ষিত, তাহাতে বাহিরের কোন কুক্কুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পুরীর মধ্যে যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আছে, এ তাহাদেরই কার্য্য। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা নির্ভয়ে আছে; আর যাহারা নিরপরাধ, তাহারা মারা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজাকে প্রকৃত অপরাধী দেখাইয়া দিয়া জ্ঞাতিবন্ধুজনের প্রাণরক্ষা করি না কেন?' অনন্তর তিনি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোমাদের ভয় নাই; আমি

---

[১]। মূলে 'কৌলেয়' এই বিশেষণ আছে। কৌলেয় কুক্কুর অর্থাৎ সৎকুলজাত কুক্কুর—ইংরাজীতে যাহাকে 'Pedigree dog' বা 'thoroughbred dog' বলা যায়, সেই অর্থে ব্যবহৃত।

তোমাদের রক্ষার উপায় করিতেছি। যতক্ষণ আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা কর।'

অনন্তর বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাব-প্রণোদিত হইয়া দানাদি দশ পারমিতা স্মরণপূর্ব্বক 'পথে যেন আমার উপর কেহ ঢিল বা লাঠি না মারে' এই ইচ্ছা করিয়া একাকী রাজভবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নিমিত্ত কেহই তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করিল না।

রাজা কুক্কুরবধাজ্ঞা দিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সেখানেই উপস্থিত হইয়া এক লম্ফে রাজাসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। রাজার ভৃত্যেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া বাহির করিতে গেল; কিন্তু রাজা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বোধিসত্ত্ব একটু ভরসা পাইয়া আসনের অধোভাগ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনিই কি কুক্কুরদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?' 'হ্যাঁ, আমিই এই আদেশ দিয়াছি।' 'কুক্কুরদিগের অপরাধ কি মহারাজ?' 'তাহারা আমার রথের আচ্ছাদন-চর্ম্ম ও অন্যান্য চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা খাইয়া ফেলিয়াছে।' 'কোন কুক্কুরে খাইয়াছে, তাহা জানিয়াছেন কি?' 'না, তাহা আমি জানি নাই।' 'মহারাজ, যদি প্রকৃত অপরাধী কে তাহা না জানেন, তবে কুকুর দেখিলেই মারিতে হইবে এরূপ আদেশ দেওয়া উচিত হয় নাই।' 'কুক্কুরে রথের চর্ম্ম খাইয়াছে, কাজেই সব কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছি।' আপনার লোকে সব কুক্কুরই মারিতেছে, না কোন কোন কুক্কুর না মারিবারও ব্যবস্থা আছে?' 'আমার গৃহে কৌলেয় কুক্কুর আছে; তাহাদিগকে মারা হইতেছে না। 'মহারাজ, এই মাত্র বলিলেন, আপনার রথের চর্ম্ম খাইয়াছে বলিয়া সব কুক্কুরই মারিবার আদেশ দিয়াছেন; এখন বলিতেছেন, কৌলেয় কুক্কুরদিগকে মারা হইবে না। ইহা আপনার পক্ষে অগতিপ্রাপ্তির[১] কারণ হইয়াছে। অগতিপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে, রাজোচিতও নহে। বিচারকার্য্যে রাজাদিগকে তুলাসদৃশ নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। উপস্থিত ব্যাপারে কৌলের কুক্কুরেরা নিরুদ্বেগে আছে, কিন্তু দুর্ব্বল কুক্কুরেরা নিহত হইতেছে। অতএব ইহাকে সর্ব্বকুক্কুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দণ্ড বলা যায় না, ইহা দুর্ব্বলকুক্কুর-ধ্বংস-ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহারাজ, আপনি যাহা করিতেছেন তাহা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন :

রাজার ভবনে আদরে যতনে পালিত কুক্কুর যারা
অতি পুষ্টকায়, বিচিত্র রোমশ—অভয় পাইল তারা!

---

[১]। ছন্দ (লোভ), দোষ (ঘৃণা), মোহ (অজ্ঞান) এবং ভয়।

আমরা দুর্গত, বধ্য অতএব; এ কেমন রাজনীতি?
এ নহে ধরম; অত্যাচার ইহা শুধু দুর্ব্বলের প্রতি।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'কুক্কুরবর, কোন কুক্কুরে রথচর্ম্ম খাইয়াছে, আপনি তাহা জানেন কি?' 'জানি মহারাজ।' 'কাহারা খাইয়াছে?' 'যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আপনার প্রাসাদে বাস করে, তাহারাই খাইয়াছে।' 'তাহারাই যে খাইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিব?' 'আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি।' 'দিন্ দেখি।' 'আপনি কুকুরগুলা আনিতে পাঠান এবং একটু ঘোল ও কিছু কুশ আনিতে বলুন।' রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন।

ইহার পর মহাসত্ত্ব ঐ কুশ তক্রের সহিত মর্দ্দন করাইয়া কুক্কুরদিগকে খাওয়াইতে বলিলেন; রাজা তাহাই করাইলেন। তখন কুক্কুরেরা চর্ম্মখণ্ডনসমূহ বমন করিয়া ফেলিল। ইহাতে রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'এ দেখিতেছি সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধোচিত ব্যবস্থা!' এবং তিনি স্বকীয় শ্বেতচ্ছত্র[১] উপহার দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব 'ধর্ম্মং চর মহারাজ মাতাপিতৃষু ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি দশটী গাথা[২] পাঠ করিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া, 'মহারাজ, এখন হইতে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন' এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শ্বেতচ্ছত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

মহাসত্ত্বের[৩] ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া রাজা সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন, বোধিসত্ত্বাদি সমস্ত কুক্কুরের জন্য প্রতিদিন রাজভোগ দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবনযাপনপূর্ব্বক দেহান্তে দেবলোকে পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। কুক্কুররূপী বোধিসত্ত্বের উপদেশ দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বোধিসত্ত্বও পরিণতবয়সে কুক্কুরলীলা সংবরণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন 'ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ কেবল এজন্মে জ্ঞাতিগণের উপকার করিতেছেন তাহা নহে; পূর্ব্ব জন্মেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সামান্য কুক্কুরসমূহ এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী কুক্কুররাজ।

---

[১]। শ্বেতচ্ছত্র রাজচিহ্ন।

[২]। ত্রিশকুন-জাতক (৫১২) দ্রষ্টব্য।

[৩]। বোধিসত্ত্বগণ অনেক স্থলে 'মহাসত্ত্ব' নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

২৩. ভোজাজানেয়-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থান করিবার সময় কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পণ্ডিতেরা নানারূপ বিপদের মধ্যেও নিরুৎসাহ হন নাই, আহত হইয়াও বীর্য্য দেখাইয়াছেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি উৎকৃষ্টজাতীয় সিন্ধু দেশীয় ঘোটকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীরাজের মঙ্গলাশ্ব[২] হইয়াছিলেন। তাঁহার আদরযত্নের সীমা পরিসীমা ছিল না; তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক[৩] তণ্ডুল আহার করিতেন; তাঁহার মন্দুরার ভূমি চতুর্ব্বিধ গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত হইত। উহার চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলের পর্দ্দা ও উপরে সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপ ঝুলিত। উহার দেয়ালে সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং অভ্যন্তরে নিয়ত গন্ধ-তৈলের প্রদীপ জ্বলিত।

বারাণসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজারা ঐ রাজ্যের প্রতি বড় লোভ করিতেন। একবার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া বারাণসী অবরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে পত্র লিখিলেন, 'হয় আমাদিগকে রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।' ব্রহ্মদত্ত অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগকে এই কথা জানাইলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে লাগিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, প্রথমেই আপনি নিজে যুদ্ধে যাইবেন না। আপনি অমুক অশ্বারোহীকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করুন; তিনি যদি পরাস্ত হন, তবে যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করা যাইবে।'

ব্রহ্মদত্ত সেই অশ্বারোহীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তুমি কি এই সাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে?' অশ্বারোহী বলিলেন, 'দেব, যদি আজানেয় ঘোটকটী পাই, তাহা হইলে সাত রাজা দূরে থাকুক, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা একত্র হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। রাজা কহিলেন, 'বাবা,

---

[১]। আজানেয়—উৎকৃষ্ট বংশজাত (অশ্বসম্বন্ধে)—ইংরাজী 'thoroughbred' or 'good breed' এই অর্থে ব্যবহৃত।

[২]। সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব (যাহা পুষিলে অশ্বস্বামীর মঙ্গল হয়)। সচরাচর রাজার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নামের পূর্ব্বে 'মঙ্গল' শব্দ ব্যবহৃত হইত, যেমন মঙ্গলহস্তী, মঙ্গলাসন ইত্যাদি।

[৩]। তিন বৎসরের পুরাতন চাউল।

আজানেয় ঘোটক বা অন্য যে ঘোটক ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ করিতে যাও।' অশ্বারোহী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বোধিসত্ত্বকে বাহিরে আনিয়া তাঁহাকে বর্ম্ম পরাইলেন, নিজে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বিদ্যুদ্‌বেগে প্রথম বলকোষ্ঠক ভেদ করিয়া একজন রাজাকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি আবার গিয়া দ্বিতীয় বলকোষ্ঠক ভেদপূর্ব্বক অপর এক রাজাকে ধরিয়া আনিলেন। এইরূপে একে একে অশ্বারোহী পাঁচজন রাজাকে বন্দী করিলেন; কিন্তু ষষ্ঠ বলপ্রকোষ্ঠ ভেদপূর্ব্বক ষষ্ঠ রাজাকে বন্দী করিবার সময় বোধিসত্ত্ব আহত হইলেন। তখন অশ্বারোহী আহত অশ্বকে রাজদ্বারে রাখিয়া সাজ খুলিয়া লইলেন এবং অপর একটী অশ্বকে উহা পরাইতে লাগিলেন। অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব এক পার্শ্বে ভর দিয়া সমস্ত দেহ বিস্তারপূর্ব্বক ভূতলে পড়িয়াছিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যোদ্ধৃবর কি করিতেছন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই যোদ্ধা অপর একটী অশ্ব সজ্জিত করিতেছেন বটে, কিন্তু এই অশ্ব কখনও সপ্তম ব্যূহ ভেদ করিয়া সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে পারিবে না। কাজেই আমি এতক্ষণ যাহা করিলাম তাহা পণ্ড হইবে, এই অদ্বিতীয় যোদ্ধা নিহত হইবেন, রাজাও শত্রুহস্তে পড়িবেন। আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম ব্যূহভেদ করিতে ও সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে সমর্থ নহে।' অনন্তর তিনি শুইয়া শুইয়াই যোদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যোদ্ধৃবর, আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদপূর্ব্বক সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে সমর্থ নহে; আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা পণ্ড হইতে দিব না। আমাকে উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া দিন এবং পুনর্ব্বার সজ্জিত করুন।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :

রয়েছি আহত হ'য়ে ভূতলে শুইয়া;
শরসব শল্লকীর কণ্টক সদৃশ
বিদ্ধ আছে দেহে মোর; তথাপি হে বীর,
সামান্য ঘোটক হ'তে শ্রেষ্ঠ আজানেয়
জানিবে নিশ্চয়; তুমি সাজাও আবার মোরে;
অন্য অশ্বে তব নাহি প্রয়োজন।

ইহা শুনিয়া সেই অশ্বারোহী বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাঁহার আহতস্থান বন্ধন করিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাকে সুসজ্জিত করিলেন এবং তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তম রাজাকে বন্দী করিয়া স্বীয় সৈন্যের হস্তে সমর্পণ

করিলেন। বোধিসত্ত্বও রাজদ্বারে নীত হইলেন এবং রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, রাজা সাতজনের প্রাণবধ করিবেন না; তাঁহাদিগকে শপথ করাইয়া ছাড়িয়া দিন; আমার এবং এই অশ্বারোহীর, উভয়ের প্রাপ্য পুরস্কার এই অশ্বারোহীকেই দান করুন, কারণ যিনি সাত জন রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন তাঁহার মর্য্যাদার ক্রটি হওয়া অসঙ্গত। আপনি নিজেও দানাদি পূণ্যকর্ম্ম করিবেন, এবং যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে রাজ্য শাসন করিবেন।' বোধিসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সাজ খুলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যখন তাহারা এক একটী করিয়া সাজগুলি খুলিতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব প্রাণত্যাগ করিলেন।

বোধিসত্ত্বের শরীরকৃত্য সম্পাদনান্তর রাজা অশ্বারোহীকে নানা সম্মানে ভূষিত করিলেন, এবং রাজাদিগের নিকট অদ্রোহ-শপথ[১] গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি যথাশাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে রাজ্যশাসনপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, অতীতকালে পণ্ডিতেরা বিপদে পড়িয়া, আহত হইয়াও বীর্য্যহীন হন নাই; আর তোমরা এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের আশ্রয়ে থাকিয়াও নিরুৎসাহ হইবে!' অনন্তর তিনি চতুর্ব্বিধ সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল বারাণসীরাজ; সারীপুত্র ছিল সেই অশ্বারোহী এবং আমি ছিলাম সেই আজানেয় ঘোটক।]

---

২৪. আজন্ন-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। শাস্তা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা আহত হইয়াও বীর্য্য ত্যাগ করেন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

---

[১]। অদ্রোহ শপথ—অর্থাৎ তাঁহারা আর কখনও শত্রুতা করিবেন না এইরূপ শপথ।

[২]। আজন্ন (আজানীয়)—আজানেয়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় একবার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া তাঁহার রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের একজন রথী নিজের রথে একই অশ্বীর গর্ভজাত দুইটী সৈন্ধব ঘোটক সংযোজিত করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক একে একে বিপক্ষদিগের ছয়টী বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করেন এবং ছয়জন রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন। ঠিক সেই সময়ে জ্যেষ্ঠ ঘোটকটী আহত হয়। তখন রথী রাজদ্বারে প্রতিগমনপূর্ব্বক তাহাকে রথ হইতে খুলিয়া দেন এবং সে এক পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলে তাহার শরীর হইতে বর্ম্মাদি উন্মোচনপূর্ব্বক অপর একটী অশ্বকে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে আহত অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব, ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ চিন্তা করিয়া রথীকে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :

> যেথা সেথা সর্ব্বস্থানে, যখন তখন
> আজানেয় করে নিজে বীর্য্যপ্রদর্শন।
> ইতর ঘোটক যারা, কি সাধ্য তাদের
> বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে তিষ্ঠিতে রণের?

এই কথা শুনিয়া রথী বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার রথে সংযোজনপূর্ব্বক সপ্তক বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করিলেন, সপ্তম রাজাকে বন্দী করিয়া রাজদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেখানে বোধিসত্ত্বকে বন্ধনমুক্ত করাইয়া দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একপার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলেন এবং ভোজাজানেয় জাতক যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইভাবে রাজাকে উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক রথীকে নানা সম্মানে ভূষিত করিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা সত্যব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন স্থবির আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠ অশ্ব।]

---

২৫. তীর্থ-জাতক

[এক ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বর্ণকারের ব্যবসায় করিত; পরে প্রব্রজ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক[১]ভাবে বাস করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

পরের চিত্ত, পরের মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা কেবল বুদ্ধদিগের পক্ষেই সম্ভব। ধর্ম্মসেনাপতির এ ক্ষমতা ছিল না; তিনি সার্দ্ধবিহারিকের চিত্ত জানিতে পারেন নাই; কাজেই তাহাকে ধ্যানশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রথম 'অশুভ' অর্থাৎ দেহের অপবিত্রতা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।[২] কিন্তু ইহাতে ঐ ভিক্ষুর কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ, সে নাকি একাদিক্রমে পাঁচ শতবার স্বর্ণকারই হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কাজেই এত দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ-সুবর্ণদর্শনের সঞ্চিত-ফলে তাহার পক্ষে 'অশুভ' চিন্তা কার্য্যকরী হইল না। সে চারিমাসকাল 'অশুভ' চিন্তা করিয়াও ইহার কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। নিজের সার্দ্ধবিহারিকের অর্হত্ত্ব-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মসেনাপতি ভাবিতে লাগিলেন, 'এরূপ লোক, দেখিতেছি বুদ্ধ ব্যতীত আর কাহারও নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে না। অতএব আমি ইহাকে বুদ্ধের নিকটই লইয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন প্রত্যুষে সেই ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার সকাশে উপনীত হইলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে সারীপুত্র! তুমি এই ভিক্ষুকে লইয়া আসিলে কেন?' সারীপুত্র বলিলেন, 'প্রভু, আমি এই ব্যক্তিকে একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু চারিমাস কাল চেষ্টা করিয়াও এ তাহার কিছুমাত্র মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিল না। তাই ইহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিলাম, কারণ, বুদ্ধ ব্যতীত আর কেহই ইহার শিক্ষাবিধানে সমর্থ নহে। 'ইহাকে তুমি কি কর্ম্মস্থান দিয়াছিলে, সারীপুত্র?' 'আমি ইহাকে 'অশুভ' ভাবিতে বলিয়াছিলাম।' 'সারীপুত্র! অপরের চিত্ত জানিতে ও মনোভাব বুঝিতে তোমার সাধ্য নাই। তুমি একাকী ফিরিয়া যাও; সন্ধ্যার সময় আসিয়া তোমার সার্দ্ধবিহারিককে লইয়া যাইও।'

সারীপুত্রকে এইরূপে বিদায় দিয়া শাস্তা সেই ভিক্ষুকে মনোজ্ঞ বিশ্রামস্থান দিলেন, চীবর পরাইলেন, ভিক্ষাচর্য্যার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য দেওয়াইলেন। অনন্তর শিষ্যপরিবৃত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক

---

[১]। সার্দ্ধবিহারিক—যে এক সঙ্গে একই বিহারে বাস করে। স্থবিরদিগের শিষ্যগণ এই নামে অভিহিত হইত।

[২]। দশবিধ 'অশুভ' সম্বন্ধে ৮ম পৃষ্ঠের টীকায় 'কর্ম্মস্থান' দ্রষ্টব্য।

তিনি দিবাভাগ গন্ধকুটীরে অতিবাহিত করিলেন এবং সায়ংকালে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে বিহারে বিচরণ করিবার সময় স্বীয় প্রভাববলে আম্রবনে এক পুষ্করিণীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। ঐ পুষ্করিণীর একাংশে পদ্মগুচ্ছ এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ পদ্ম বিরাজ করিতেছিল। 'তুমি এখানে বসিয়া এই পদ্ম অবলোকন করিতে থাক'— ভিক্ষুকে এই কথা বলিয়া শাস্তা নিজে গন্ধকুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষু একদৃষ্টিতে পদ্ম অবলোকন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান ঐ পদ্মের বিনাশ আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষু দেখিতে পাইল, উহা ক্রমে বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে পত্রগুলি ঝরিতে লাগিল, শেষে কেশরগুলিও বিচ্যুত হইল; কেবল কর্ণিকটী অবশিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া ভিক্ষু ভাবিতে লাগিল, 'এই মাত্র এই পদ্ম-পুষ্পটী কেমন নয়নাভিরাম ছিল; কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহা বিবর্ণ হইয়া গেল; ইহার না আছে এখন পত্র, না আছে কেশর, অবশিষ্ট রহিয়াছে কেবল কর্ণিকটী। ইহার যেরূপ বিনাশ হইল; আমার শরীরেরই বা সেরূপ হইবে না কেন? জগতে সমস্ত মিশ্রবস্তুই অনিত্য।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি[১] লাভ করিল।

এই ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই নিজের দেহ হইতে এক আভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিনির্গত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিলেন :

> শরতের শতদল, জলে কর টলমল,
> চয়ন তাহারে কর বৃন্ত হতে ছিঁড়িয়া।
> সেইরূপ সযতনে, ওহে জীব, একমনে,
> আত্মস্নেহ ফেল দূরে মনে হ'তে টানিয়া।
> শান্তিমার্গ এই সার, ইহা ভিন্ন নাহি আর,
> এই পথে যাবে সদা, অন্য পথে যেও না;
> নির্ব্বাণ-লাভের হেতু, এই একমাত্র সেতু,
> দেখা যার নাহি মিলে, বিনা বুদ্ধ-করুণা।

এই গাথা শুনিয়া উক্ত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন 'আমি মুক্ত হইলাম, আর জন্মগ্রহণ-রূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না,' এই বিশ্বাসে তিনি অতিমাত্র আহ্লাদে মন খুলিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :

> জীবনের অবসানে নির্ম্মল-হৃদয়,
> পরিক্ষীণ হয় যার কুপ্রবৃত্তিচয়,
> আর না জন্মিবে যেবা সংসার-মাঝারে,

---

[১]। মূলে 'বিপস্‌সনম্‌' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'বিদর্শন' শব্দের অনুরূপ।

জরাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিবারে।
শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় সেই নরবর,
শোভে যথা রাহুমুক্ত পূর্ণ শশধর।
ভীষণ পাপের পঙ্কে হইয়া মগন,
মোহ-অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এই মন;
ভেদি সে অবিদ্যা-জাল জ্ঞানপ্রভাকর
আলোকিত করে মম মানস-অন্তর।

হর্ষভরে এইরূপ গাথা পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন।

অতঃপর স্থবির সারীপুত্রও সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন এবং শিষ্যকে লইয়া স্বীয় আগারে চলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ, লোকের চিত্ত ও প্রবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা না থাকায় সারীপুত্র তাঁহার শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু শাস্তার কি মহীয়সী ক্ষমতা! তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই; তাই তিনি ইহাকে এক দিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও অর্হত্ত্ব দান করিলেন।'

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'ভিক্ষুগণ! আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে এই ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বকালেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্য ছিলেন। তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রণা দিতেন।

একদিন রাজার অশ্বপালকেরা মঙ্গলাশ্বের স্নান করিবার ঘাটে একটা সামান্য অশ্বকে স্নান করাইয়াছিল। তাহার পর যখন মঙ্গলাশ্বপালক নিজের ঘোটককে সেই জলের নিকট লইয়া গেল, তখন সে নিতান্ত ঘৃণার চিহ্ন দেখাইয়া কিছুতেই অবতরণ করিল না। তখন অশ্বপালক রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব স্নান করিতে চাহিতেছে না।' রাজা বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন ত, কেন ইহারা চেষ্টা করিয়াও মঙ্গলাশ্বকে জলে নামাইতে পারিতেছে না। বোধিসত্ত্ব 'যে আজ্ঞা, মহারাজ' বলিয়া নদীতীরে গমন করিলেন এবং যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন মঙ্গলাশ্বের

কোন পীড়া হয় নাই, তখন কেন সে জলে অবতরণ করিতেছে না, তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'নিশ্চিত লোকে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই মঙ্গলাশ্ব ঘৃণাপরবশ হইয়া জলে অবতরণ করিতে চাহিতেছে না।' ইহা ভাবিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছ কি?' তাহারা বলিল, 'হাঁ মহাশয়, একটা সামান্য ঘোটককে স্নান করাইয়াছি।' ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই এত ঘৃণার বশ হইয়া এখানে স্নান করিতে চাহিতেছে না। ইহাকে অন্য কোন ঘাটে স্নান করাইলেই ভাল হয়।' এইরূপে মঙ্গলাশ্বের অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে বলিলেন, 'দেখ ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত পায়সও প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে অরুচি জন্মে। এই অশ্ব বহুবার এ ঘাটে স্নান করিয়াছে। আজ তোমরা ইহাকে অন্য ঘাটে লইয়া স্নান করাও ও জল খাওয়াও।' এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

নিত্য নব তীর্থে এরে করাইবে জলপান;
তা' হলে স্ফূর্ত্তিতে সদা থাকিবে ইহার প্রাণ।
মধুর পায়স অন্ন, তাও খেলে বার বার
বৈচিত্র-বিহনে ক্লেশ হয় শুধু রসনার।

অশ্বপালেরা এই উপদেশানুসারে মঙ্গলাশ্বকে অন্য ঘাটে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাকে স্নান ও পান করাইল। জলপানান্তে যখন তাহারা অশ্বের গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিল, তখন বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'মঙ্গলাশ্ব স্নান ও জলপান করিয়াছে ত?' 'হাঁ মহারাজ!' 'সে প্রথমে অনিচ্ছা দেখাইয়াছিল কেন?' বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহার অনিচ্ছার কারণ বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'অহো, ইঁহার কি পাণ্ডিত্য! ইনি ইতর প্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি বুঝিতে পারেন।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের বহু সম্মান করিলেন।

ইহার পর রাজা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই মঙ্গলাশ্ব; সারীপুত্র ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার বিচক্ষণ অমাত্য।]

---

২৬. মহিলামুখ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর মনস্তুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহার জন্য গয়শিরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার ব্যবহারার্থ পঞ্চশত স্থালীপূর্ণ নানামধুর রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন প্রেরণ করিতেন। এই সমস্ত উপহার ও সম্মানের মাহাত্মে্য দেবদত্তের বহু শিষ্য হইল; তিনি ইহাদিগকে লইয়া নিয়ত বিহারের অভ্যন্তরেই থাকিতেন, কদাচ বাহিরে যাইতেন না।

এই সময় রাজগৃহবাসী দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শাস্তার নিকট এবং অপরজন দেবদত্তের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা কখনও বাহিরে, কখনও বা বিহারে গিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিত। একদিন দেবদত্তের শিষ্য শাস্তার শিষ্যকে বলিল, 'ভাই, তুমি প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন? দেখ ত দেবদত্ত কেমন গয়শিরে বসিয়া থাকিয়াই নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন। ইহার চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে? নিজের দুঃখ বাড়াও কেন? প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গয়শিরে আসিয়া আহার করিলে ভাল হয় না কি? সেখানে যাগু[১] পান করিবে; তাহার যে কি স্বাদ তাহা বলিবার নয়। অনন্তর অষ্টাদশ প্রকার শুষ্কখাদ্য এবং মধুর রসযুক্ত কোমল খাদ্য দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে।'[২]

পুনঃপুন এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তার শিষ্য শেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিল এবং তদবধি গয়শিরে যাইতে লাগিল। সেখানে সে আকণ্ঠ আহার করিত; কিন্তু যথাসময়ে বেণুবনে প্রতিগমন করিতে ভুলিত না। কিন্তু ব্যাপারটা চিরদিন গোপন থাকিল না; কিয়ৎকাল পরেই প্রকাশ পাইল যে সে গয়শিরে গিয়া দেবদত্তের অন্নে উদর পূর্ণ করে। একদিন তাহার সতীর্থগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি না কি দেবদত্তের জন্য যে খাদ্য প্রেরিত হয় তাহা ভোজন করিয়া থাক? এ কথা সত্য কি?' 'এ কথা কে বলে?' 'অমুকে অমুকে বলে?' 'হাঁ, এ কথা মিথ্যা নহে। আমি গয়শিরে গিয়া আহার করি; কিন্তু দেবদত্ত আমায় খাইতে দেন না, অন্যে দেয়।' 'দেখ, দেবদত্ত বৌদ্ধদিগের শত্রু। সেই দুরাত্মা অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া অধর্ম্মবলে সম্মান ও সৎকার লাভ

---

[১]। যাগু—সংস্কৃত 'যবাগূ'; বাঙ্গালা 'যাউ'।

[২]। খজ্জ—খাদ্য। এই শব্দটী সাধারণত খাজা, গজা ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত। কোমল খাদ্য যথা : (অন্ন, পায়স ইত্যাদি) সুভোজন নামে অভিহিত। খজ্জ শব্দটী হইতেই বোধহয় 'খাজা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

করিয়াছে। ছি! তুমি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিতেছ! চল, তোমাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাই।' এই বলিয়া ভিক্ষুগণ ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মসভায় উপনীত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিয়াছ কি?' 'হাঁ প্রভু। এই ব্যক্তি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ করে।' 'কি হে, তুমি দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ কর, এ কথা সত্য কি?' 'মহাশয়, আমি যে অন্ন আহার করি, তাহা দেবদত্ত দেন না, অপরে দেয়।' 'দেখ ভিক্ষু, ওসব হেঁয়ালির কথা ছাড়িয়া দাও। দেবদত্ত অনাচার ও দুঃশীল; তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, আমার শাসনে বাস করিতেছ; অথচ এরূপ লোকের অন্ন খাইতেছ! কেবল এ জন্মে নয়, চিরদিনই তুমি বিপথগামী হইয়াছ এবং যখন যাহাকে দেখিতে পাইয়াছ, তখনই তাহার অনুসরণ করিয়াছ।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। রাজার মহিলামুখ নামে এক শীলবান ও আচারসম্পন্ন মঙ্গলহস্তী ছিল। সে কখনও কাহার শরীরে আঘাত করিত না।

একদা রাত্রিকালে কয়েকজন চোর আসিয়া হস্তিশালার নিকট উপবেশন করিল এবং মন্ত্রণা করিতে লাগিল—'এই স্থানে সিঁদ[১] কাটিতে হইবে, প্রাচীরের এই অংশ ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে; অপহৃত দ্রব্যসমূহ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে সিঁদ ও ফাঁক রাজপথ বা নদীতীর্থের ন্যায় পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করিতে হইবে। চুরি করিবার সময় প্রয়োজন হইলে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। যে চোর, সে শীলাচারসম্পন্ন হইলে চলিবে না; তাহাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইতে হইবে।' চোরেরা পরস্পরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সে রাত্রির মত প্রস্থান করিল। পররাত্রিতেও তাহারা তথায় আসিয়া ঐরূপ পরামর্শ করিল এবং তাহার পর ক্রমাগত আরও কয়েক রাত্রি যাতায়াত করিল।

প্রতি রজনীতে তাহাদের এই পরামর্শ শুনিয়া হস্তী স্থির করিল, 'ইহারা আমাকেই উপদেশ দিতেছে; অতএব আমাকেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইতে হইবে।' তখন সে ঐরূপ প্রকৃতিই অবলম্বন করিল এবং পরদিন

---

[১]। মূলে 'উন্মার্গ' এই শব্দ আছে।

প্রাতঃকালে মাহুত আসিবামাত্র শুণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে এক একটী করিয়া যে তাহার নিকটে আসিল, সে তাহারই প্রাণসংহার করিল।

ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল যে মহিলামুখ উন্মত্ত হইয়া যাহাকে দেখিতেছে নিহত করিতেছে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন সে কি কারণে এরূপে দুষ্ট হইয়াছে।'

বোধিসত্ত্ব গিয়া দেখিলেন হাতীর শরীরে কোন রোগ নাই। অথচ কেন তাহার এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিল ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'নিশ্চয় দুষ্ট লোক ইহার নিকটে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে; তাহা শুনিয়া এ ভাবিয়াছে ইহারা আমাকেই উপদেশ দিয়াছে; কাজেই ইহার এইরূপ বিকার ঘটিয়াছে।' অনন্তর তিনি একজন হস্তিপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইতিপূর্ব্বে কেহ হস্তিশালার সমীপে কোন কথাবার্ত্তা বলিয়াছে কি?' সে বলিল, 'হাঁ প্রভু, কয়েকজন চোর আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছে বটে।' তখন বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, হস্তীর শরীরের কোন বিকার হয় নাই; চোরদিগের কথা শুনিয়া তাহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে।' 'যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে এখন কর্ত্তব্য কি?' 'শীলবান ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আনাইয়া হস্তিশালায় বসাইয়া দিন এবং তাঁহাদিগকে শীলব্রতের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে বলুন।' রাজা বলিলেন, 'আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।' বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তিনি শীলবান শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক হস্তিশালায় বসাইলেন এবং বলিলেন 'আপনারা শীলকথা বলুন।' তখন তাঁহারা হস্তীর নিকট বসিয়া 'কাহারও পীড়ন করিও না, শীলাচারসম্পন্ন হও, ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণোপেত হও' এইরূপ সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া হস্তী ভাবিল, ইহারা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব এখন হইতে আমাকে শীলবান হইয়া চলিতে হইবে।' অনন্তর সে পুনর্ব্বার শীলবান হইল। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হস্তীটা পুনর্ব্বার শীলবান হইয়াছে কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'হাঁ মহারাজ, এই সকল মহাত্মাদিগের মুখে সদুপদেশ শুনিয়া দুষ্ট হস্তী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।'

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

> শুনি নিত্য চৌর-বাণী মহিলামুখের
> প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল পরপীড়নের।
> কিন্তু পরে জ্ঞানিবাক্যে করি কর্ণদান
> দুষ্প্রবৃত্তি যত সব হ'ল অন্তর্দ্ধান।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! ইনি, দেখিতেছি,

ইতরপ্রাণীদিগেরও মনোভাব বুঝিতে পারেন!’ তখন তিনি বোধিসত্ত্বের বহু সম্মান করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে তিনি ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই কর্ম্মানুরূপ ফলভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই বিশ্বাসঘাতক ভিক্ষু ছিল মহিলামুখ, আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি ছিলাম তাঁহার অমাত্য।]

---

২৭. অভীক্ষ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উপাসক এবং জনৈক বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। শ্রাবস্তী নগরে দুই বন্ধুর মধ্যে একজন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন অপরের গৃহে গমন করিতেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে ভিক্ষা দিত, আহারান্তে তাঁহার সহিত বিহারে আসিত, সমস্ত দিন বসিয়া গল্প-সল্প করিত এবং সূর্য্যাস্ত হইলে নগরে ফিরিয়া যাইত। ভিক্ষুটী নগরদ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিতেন।

এই দুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতার কথা অপর ভিক্ষুদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় বসিয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘পূর্ব্বজন্মেও এই দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেনঃ– ।]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। একটা কুকুর রাজার হস্তিশালায় গিয়া মঙ্গলহস্তীর ভোজনস্থানে যে সকল অন্নপিণ্ড পড়িয়া থাকিত সেইগুলি খাইত। এইরূপে খাদ্যান্বেষণে সেখানে অবিরত গমন করিতে করিতে সে ক্রমে মঙ্গলহস্তীর নিতান্ত প্রীতিভাজন হইল; এবং তাহারই সহিত দৈনিক ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহাদের এক প্রাণী অপর প্রাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কুকুরটা হাতীর শুঁড়ের উপর উঠিয়া দোল খাইত।

একদিন কোন গ্রামবাসী এক ব্যক্তি মাহুতকে মূল্য দিয়া ঐ কুকুর ক্রয়

---

[১]। অভীক্ষ—পুনঃপুন।

করিয়া নিজের গ্রামে লইয়া গেল। তদবধি মঙ্গলহস্তী কুকুরকে দেখিতে না পাইয়া স্নান, পান ও ভোজন ত্যাগ করিল। এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন হাতীটা এরূপ করিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব হস্তিশালায় গিয়া দেখিলেন হস্তী অতি বিমর্ষভাবে আছে, অথচ ইহার শরীরে কোন রোগ নাই। তখন তিনি ভাবিলেন, 'বোধহয় ইহার সহিত কাহারও বন্ধুত্ব আছে; তাহাকে না দেখিয়া এ শোকাভিভূত হইয়াছে।' অনন্তর তিনি মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই হস্তীর সঙ্গে আর কোন প্রাণী থাকিত কি?' মাহুত বলিল, 'হাঁ মহাশয়, একটা কুকুরের সহিত ইহার খুব ভাব ছিল।' 'সে কুকুর এখন কোথায়?' 'একজন লোকে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।' 'সে লোক কোথায় থাকে জান কি?' 'না মহাশয়, সে কোথায় থাকে জানি না।' বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার হস্তীর কোন পীড়া হয় নাই। একটা কুকুরের সহিত ইহার গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; এখন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এ আহারাদি ত্যাগ করিয়াছে।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :

কবল, তণ্ডুলপিণ্ড, তৃণগুচ্ছ আর,
কিছুতেই কোন রুচি দেখি না ইহার।
না লভে স্নানেতে তৃপ্তি পূর্ব্বের মতন,
সর্ব্বদা মঙ্গলহস্তী বিষণ্নবদন।
কারণ ইহার এই মোর মনে লয়,
কুকুরের প্রতি এর মমতা নিশ্চয়।
পুনঃপুন দেখি তারে স্নেহ করেছিল;
এবে অদর্শনে তার বিষণ্ন হইল।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, 'পণ্ডিতবর, এখন তবে কর্ত্তব্য কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ভেরী বাজাইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিন, 'আমাদের মঙ্গলহস্তীর সহিত একটী কুকুরের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল; শুনা যাইতেছে কোন এক ব্যক্তি না কি সেই কুকুর লইয়া গিয়াছে। অতএব যাহার ঘরে ঐ কুকুর পাওয়া যাইবে, তাহার এইরূপ এইরূপ দণ্ড হইবে।' রাজা তাহাই করিলেন। যে লোকটা কুকুর লইয়া গিয়াছিল সে এই ঘোষণা শুনিয়া তখনই উহাকে ছাড়িয়া দিল; কুকুরও ছুটিয়া গিয়া হস্তীর নিকট উপস্থিত হইল। হস্তী উহাকে দেখিবামাত্র শুণ্ডদ্বারা উহাকে মস্তক হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, এবং উহার আহার শেষ হইলে নিজে আহার করিল।

রাজা দেখিলেন বোধিসত্ত্ব ইতরপ্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনের ভাব বুঝিতে পারেন। অতএব তিনি তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসক ছিল উক্ত কুকুর; এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের বিজ্ঞ অমাত্য।]

---

২৮. নন্দিবিলাস-জাতক

[জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে ছয়জন সাতিশয় রূঢ়ভাষী ও কলহপ্রিয় ছিল।[১] তাহারা সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করিত, শ্রদ্ধাস্পদ ভিক্ষুদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলে তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিত, বিদ্রূপ করিত, উপহাস করিত এবং দশবিধ উপদ্রবে[২] বিব্রত করিত। ভিক্ষুগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা উক্ত ছয়জন ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তোমাদের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সত্য কি?' তাহারা আত্মদোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'দেখ, পরুষবাক্যে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত মনঃকষ্ট পায়; অতীত যুগে একটা ইতর প্রাণীর মন পরুষবাক্যে এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সে পরুষভাষীর এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড করাইয়াছিল।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত যুগের কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে গান্ধাররাজগণ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব গোজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন অতি তরুণবয়স্ক বৎস ছিলেন, সেই সময়েই জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কোন গোদক্ষিণাদাতার নিকট হইতে

---

[১]। বিনয়পিটকানুসারে ইহাদের নাম অশ্বজিৎ, পুনর্ব্বসু, মৈত্রেয়, ভূমিজক, পাণ্ডুক ও লোহিতক। সূত্রপিটকে কিন্তু ইহাদের নাম অশ্বক, পুনর্ব্বসু, নন্দ, উপনন্দ, চন্দ্র ও উদায়ী বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বোধহয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই অবাধ্য ভিক্ষুদিগের নেতা হইয়াছিল। ইঁহারা বৌদ্ধসাহিত্যে 'ষড়বর্গীয়' বা 'ষড়বর্গিক' নামে অভিহিত।

[২]। (১) জাতি, (২) নাম, (৩) গোত্র, (৪) কর্ম্ম, (৫) শিল্প (অর্থাৎ ব্যবসায়), (৬) আবাধ (অর্থাৎ শারীরিক পীড়া), (৭) লিঙ্গ (অর্থাৎ শারীরিক চিহ্ন, যথা খর্ব্বতা), (৮) ক্লেশ (অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মান, মোহ প্রভৃতি মানসিক পাপ), (৯) আপত্তি (অর্থাৎ নিয়ম লঙ্ঘনজনিত দোষ), এবং (১০) হীনতা সূচক অপবাদ উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া বা বিদ্রুপ করা। সূত্রপিটকে শেষোক্ত অপবাদেরও দশটী বিভাগ করা হইয়াছে। তুই চোর, তুই মূর্খ, তুই মূঢ়, তোর আকার উষ্ট্রের ন্যায়, তুই গরু, তুই গাধা, তুই নারকী, তুই তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইবি, তোর কখনও সুগতি হইবে না, তোর যেন দুর্গতি হয়, এই দশ প্রকারে লোককে হীনাপবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের 'নন্দিবিলাস' এই নাম রাখিলেন এবং যাগু, অন্ন প্রভৃতি খাদ্য দিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আমায় পালন করিয়াছেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন গো নাই, যে আমার মত ভার টানিতে পারে। অতএব বলের পরিচয় দিয়া ইঁহাকে আমার লালনপালনের কিছু প্রতিদান করা যাউক না কেন।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর, যাঁহার অনেক গরু আছে এমন কোন শ্রেষ্ঠীর[১] নিকট গিয়া এক হাজার মুদ্রা পণ রাখিয়া বলুন 'আমার বলদ একসঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে।"

এই কথামত ব্রাহ্মণ এক শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া নগরের কাহার গরু বেশ বলবান এই কথা উত্থাপিত করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, 'অমুকের, অমুকের; কিন্তু তাহাদের কোনটাই আমার গরু অপেক্ষা বলবান নহে।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমার একটা গরু আছে; সে এক সঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে।' শ্রেষ্ঠী হাসিয়া বলিলেন, 'এরূপ গরু কোথায় থাকে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমারই বাড়ীতে থাকে।' 'আচ্ছা, তবে বাজি ফেলুন।' 'বেশ, তাহাই হউক,' বলিয়া ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা পণ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ বালি, কাঁকর ও পাথর দিয়া এক শ গাড়ি বোঝাই করিলেন, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যোত দিয়া এক সঙ্গে বান্ধিলেন, নন্দিবিলাসকে স্নান করাইলেন, মালা পরাইলেন ও গন্ধদ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি দিলেন, এবং শুদ্ধ তাহাকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া এবং নিজের ধুরার উপর বসিয়া প্রতোদ আস্ফালনপূর্ব্বক 'ওরে বদমাইস্ জোরে টান, বদমাইস' বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি বদমাইস নহি, তবু ইনি আমাকে বদমাইস বলিতেছেন।' তখন তিনি পা চারিখানি স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

শ্রেষ্ঠী সেই দণ্ডেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পণের সহস্র মুদ্রা আদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়া নন্দিবিলাসকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। নন্দিবিলাস চরিয়া আসিবার পর ব্রাহ্মণকে তদবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি নিদ্রা যাইতেছেন?' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যাহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইল, সে কি আর ঘুমাইতে পারে?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ঠাকুর, আমি দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি; ইহার মধ্যে কি কখনও আপনার কোন দ্রব্যের অপচয় করিয়াছি,

---

[১]। মূলে 'গোবিত্তক' এই পদ আছে।

না একটাও ভাণ্ড পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছি, না কাহাকেও আঘাত করিয়াছি, না অস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, বৎস, তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।' 'তবে আপনি আমায় বদমাইস বলিলেন কেন? অতএব আপনার যে ক্ষতি হইল তাহা আপনার দোষেই ঘটিয়াছে, আমার দোষে নহে। আপনি আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করুন এবং এবার দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখুন। কিন্তু, সাবধান, আমায় আর কখনও বদমাইস বলিবেন না।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখিলেন। অনন্তর তিনি এবারও পূর্ব্বের ন্যায় শকটগুলি বোঝাই করিয়া ও পরস্পর দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া সালঙ্কৃত নন্দিবিলাসকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া লইলেন। কিরূপে যুতিলেন শুন। প্রথমত তিনি যুগের সহিত ধুরা বান্ধিলেন; অনন্তর যুগের এক প্রান্তে নন্দিবিলাসকে যুতিলেন এবং এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া উহার এক দিক যুগের অপর প্রান্তের সহিত ও অন্য দিক অক্ষের সহিত এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন যে যুগ আর কোনদিকে নড় চড় হইতে পারিল না, গাড়িখানি একটী মাত্র বলীবর্দ্দেরই বহনোপযোগী হইল। এইরূপ আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণ ধুরার উপর চড়িলেন এবং নন্দিবিলাসের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে 'সোণা আমার, যাদু আমার, একবার টান ত, বাপ' এইরূপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক টানেই সেই একশ বোঝাই গাড়ি লইয়া চলিলেন; মুহূর্ত্তে মধ্যে যেখানে প্রথম গাড়িখানি ছিল, সেইখানে শেষ গাড়িখানি আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বাজি হারিয়া সেই গোবিত্তক শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণকে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন; অন্যান্য লোকেও বোধিসত্ত্বকে বহু ধন দান করিল এবং তৎসমস্ত ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন।

* * *

[ষড়বর্গীয়দিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা দেখাইলেন যে, রূঢ়বাক্য কাহারও প্রীতিকর নহে। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

হও মিষ্টভাষী,—তুষ্ট হবে সর্ব্বজন,
রূঢ়ভাবে রুষ্ট কারও করিও না মন।
বলীবর্দ্দ মিষ্টবাক্যে হয় হৃষ্ট-চিত
করেছিল পুরাকালে ব্রাহ্মণের হিত।
অতি গুরুভার সেই করিল বহন,
লভিল বিভব বিপ্র তাহারি কারণ।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম নন্দিবিলাস।

২৯. কৃষ্ণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে যমক-প্রাতিহার্য্য[১] সম্বন্ধে এই কথা বলেন। যমক-প্রাতিহার্য্য ও দেবলোক হইতে অবরোহণ সংক্রান্ত সবিস্তর বিবরণ শরভঙ্গমৃগজাতক (৪৮৩) দ্রষ্টব্য।

সম্যক সম্বুদ্ধ যমক-প্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কিয়দ্দিন দেবলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন; অনন্তর মহাপ্রবারণের[২] দিন তিনি সাঙ্কাশ্যানগরে[৩] অবতরণপূর্ব্বক বহু সংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া জেতবনে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'তথাগত অতুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী; তিনি যে ভার বহন করেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। দেখ, আচার্য ছয় জন[৪] 'আমরা প্রাতিহার্য্য করিব', 'আমরা প্রাতিহার্য্য করিব' বলিয়া কত আস্ফালন করিলেন; কিন্তু একটি মাত্র প্রাহিতার্য্যও সম্পাদিত করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু শাস্তার কি অসাধারণ ক্ষমতা!' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভগবন, আমরা আপনারই গুণবর্ণন করিতেছি।' তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি ইদানীং যেরূপ ভার বহন করিতেছি, অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা বহন করিতে পারে। পূর্ব্বকালে তির্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি ভারবাহী পশুদিগের অগ্রণী ছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গো-যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন অতি অল্প, সেই সময়েই তাঁহার অধিস্বামিগণ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস করিয়া ভাড়ার[৫] পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা

---

[১]। প্রাতিহার্য্য—অলৌকিক কার্য্য, miracle; প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রাতিহার' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রজালিক'; কিন্তু ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাতিহার্য্য শব্দ miracle অর্থে ব্যবহৃত।

[২]। বৌদ্ধপর্ব্ববিশেষ; এই উৎসব বর্ষাবসানে সম্পাদিত হয়। উপাসকগণ এই সময়ে ভিক্ষুদিগকে নানাবিধ উপহার প্রদান করেন।

[৩]। বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। ফারুক্কাবাদ জেলায় কালীনদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে সাঙ্কাশ্যা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজধানী ছিল।

[৪]। পুরাণকাশ্যপ প্রভৃতি। ১ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৫]। মূলে 'নিবাসবেতন' এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ 'ঘরভাড়া'।

তাঁহাকে অপত্যবৎ পালন করিত; তাঁহাকে ফেন, ভাত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতে দিত। লোকে তাঁহাকে আর্য্যকা কালক[১] এই নামে ডাকিত।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বের শরীর কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। তিনি গ্রামস্থ অন্যান্য গরুর সহিত চরিয়া বেড়াইতেন এবং শীলব্রত পালন করিতেন। গ্রামবাসী বালকেরা কেহ তাঁহার শিং ধরিয়া, কেহ তাঁহার কাণ ধরিয়া, কেহ তাঁহার গলকম্বল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিত; কেহ বা খেলিতে খেলিতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিত, কেহ কেহ পিঠেও চড়িত।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মাতা দুঃখিনী; অতি কষ্টে আমাকে নিজের পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছেন; আমি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইঁহার দুঃখমোচন করি না কেন?' তদবধি তিনি কোন কাজের অনুসন্ধানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে কোন সার্থবাহ-পুত্র পাঁচ শ গাড়ী লইয়া নদীর গোপ্রতার স্থানে উপনীত হইলেন। ঐ পথের তলদেশ এমন বন্ধুর ছিল গরুগুলি কিছুতেই গাড়ী টানিয়া অপর পারে লইয়া যাইতে পারিল না। শেষে সেই হাজার গরু একত্র যুতিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তাহারা সকলে একসঙ্গে টানিয়াও একখানি মাত্র গাড়ী নদী পার করিতে সমর্থ হইল না। বোধিসত্ত্ব এই স্থানের অনতিদূরে অন্যান্য গরুর সহিত চরিতেছিলেন। সার্থবাহ-পুত্র গরু দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কোনটা উৎকৃষ্টজাতীয়, কোনটা নিকৃষ্টজাতীয়। তাঁহার গাড়ী টানিতে পারে এমন কোন উৎকৃষ্টজাতীয় গরু ঐ পালে আছে কি না জানিবার নিমিত্ত তিনি উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন ইহা দ্বারাই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তখন তিনি রাখালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ গরুটী কাহার? আমি ইহাকে যুতিয়া গাড়ীগুলি পার করিতে পারিলে তাহাকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে সম্মত আছি।' তাহারা বলিল 'আপনি ইহাকে যুতিয়া দিন; এখানে ইহার কোন মালিক নাই।'

কিন্তু সার্থবাহ-পুত্র যখন বোধিসত্ত্বের নাকে দড়ি পরাইয়া টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি এক পাও নড়িলেন না। 'আগে ভাড়া ঠিক না করিলে যাইব না' তিনি না কি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সার্থবাহ-পুত্র বলিলেন, স্বামিন, 'আপনি যদি এই পাঁচ শ গাড়ী পার করিয়া দেন তাহা হইলে আমি গাড়ী প্রতি দুই মুদ্রা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ এক সহস্র মুদ্রা দিব।' তখন আর বোধিসত্ত্বকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে হইল না; তিনি নিজেই শকটগুলির দিকে গেলেন। সার্থবাহের অনুচরেরা তাঁহাকে এক একখানি

---

[১]। আর্য্যকা—ঠাকুরমা (পিতামহী বা মাতামহী)। এই শব্দ হইতে বোধহয় বাঙ্গালা 'আই' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

গাড়ীর সঙ্গে যুতিয়া দিতে লাগিল; তিনি এক এক টানে ঐগুলি পর পারে লইয়া শুষ্কভূমিতে রাখিতে লাগিলেন। এইরূপ বোধিসত্ত্ব এক এক করিয়া বণিকের পাঁচ শত শকটই পার করিয়া দিলেন।

অনন্তর সার্থবাহ-পুত্র প্রতি শকটে এক মুদ্রা হারে পাঁচ শত মুদ্রা একটী থলিতে পুরিয়া বোধিসত্ত্বের গলদেশে বান্ধিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি, যেরূপ চুক্তি করিয়াছে, সেরূপ পারিশ্রমিক দিতেছে না; অতএব ইহাকে যাইতে দিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পুরোবর্ত্তী শকটের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; বণিকের অনুচরেরা কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাঁহাকে সরাইতে পারিল না। তখন বণিক মনে করিলেন, 'আমি যে ইঁহাকে অঙ্গীকৃত পারিতোষিক অপেক্ষা অল্প দিয়াছি তাহা বোধহয় এ বুঝিতে পারিয়াছে। অনন্তর তিনি একটী থলিতে সহস্র মুদ্রা রাখিয়া উহা বোধিসত্ত্বের গলদেশে বান্ধিয়া দিলেন, 'এই লউন, আপনার সমস্ত পারিতোষিক বুঝিয়া দিলাম।' বোধিসত্ত্ব তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার 'মাতার' নিকট চলিয়া গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামের বালকেরা, 'বুড়ীর কালক গলায় কি লইয়া যাইতেছে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে তাড়া করিয়া দূর করিয়া দিলেন এবং মাতৃসমীপে উপনীত হইলেন। পাঁচ শ গাড়ী টানিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারই চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়াছিল। দয়াবতী বৃদ্ধা তাঁহার গলদেশবদ্ধ সহস্র মুদ্রা পাইয়া বলিল, 'বাছা, একি, ইহা কোথায় পাইলি?' তখন রাখালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বৃদ্ধা বলিল, 'আমি কি কখনও তোর উপার্জ্জনে জীবনধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি বাপ! তুই কিসের জন্য এত কষ্ট পাইতে গেলি বল।' তাহার পর সে বোধিসত্ত্বকে গরমজলে স্নান করাইল, তাঁহার সর্ব্বশরীরে তৈল মাখাইল এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় দিল।

কালক্রমে বৃদ্ধা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই আয়ু শেষে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[শাস্তা বলিলেন, 'অতএব তোমরা দেখিলে তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, অতীত কালেও ধুরন্ধরদিগের অগ্রণী ছিলেন। অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

যুতিবে কালুরে সদা গুরুভার করিতে বহন
অতি অসমান পথে, গর্ত্ত যাতে আছে অগণন।

কালু নিজ বীর্য্যবলে অবহেলে নদী পার করি
পঞ্চশত গো-শকট রাখি দিবে তটের উপরি।

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা[১] ছিলেন সেই বৃদ্ধা এবং আমি ছিলাম আর্য্যকা-কালক]

---

৩০. মুণিক-জাতক

[এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত ভিক্ষুর সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ত্রয়োদশ নিপাঠে চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সত্য সত্যই প্রণয়াসক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হাঁ প্রভু এ কথা মিথ্যা নয়।' 'কাহার প্রণয়ে পড়িলে?' 'প্রভু, অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়ে।' 'দেখ, সে তোমার বড় অনিষ্টকারিণী। সে অতীত জন্মেও তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, কারণ তাহারই বিবাহের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উদয়পূর্ত্তির জন্য লোকে তোমার প্রাণবধ করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গো-জন্ম ধারণপূর্ব্বক এক গ্রাম্য ভূ-স্বামীর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। ঐ গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চুল্ললোহিতও বাস করিত।

উক্ত ভূ-স্বামীর এক কুমারী কন্যা ছিল। নগরবাসী এক ভদ্রলোক নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের আহারের আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয় এই জন্য কন্যার মাতা মুণিক নামক এক শূকরকে ভাত খাওয়াইয়া পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, 'দেখ দাদা, আমরা উভয়ে এক গৃহস্থের সমস্ত বোঝা বহিয়া মরি; কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও সামান্য ঘাস, বিচালি মাত্র খাইতে পাই; আর এই শূকরের জন্য ভাতের ব্যবস্থা! ইহাকে এমন উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার কারণ কি, দাদা?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, এই শূকরের খাদ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না, কারণ এ এখন মরণ-খাদ্য খাইতেছে। গৃহস্বামীর কন্যার বিবাহে যে সকল

---

[১]। শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

লোক নিমন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাকে এত যত্নসহকারে আহার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই চারি দিন অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন গৃহস্থের লোকজন ইহার চারি পা ধরিয়া টানিতে টানিতে মঞ্চের নিম্নভাগ[১] হইতে লইয়া যাইবে, এবং ইহাকে কাটিয়া কুটিয়া সূপ-ব্যঞ্জনে পরিণত করিবে। অতএব হতভাগ্য মুণিকের আশু সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইও না।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

মুণিকের সুখ দেখি করিও না ঈর্ষ্যা মনে,
আতুরান্ন সেবা সেই করিতেছে এইক্ষণে।
ভুসি[২] যাহা পাও তুমি খাও তাই তৃপ্ত হয়ে;
আয়ুর্বৃদ্ধিকর ইহা বলিলাম নিঃসংশয়ে।

ইহার অল্পদিন পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইল এবং কন্যাপক্ষের লোক মুণিককে নিহত করিয়া তাহার মাংসে সূপ-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। তখন বোধিসত্ত্ব চুল্ললোহিতকে বলিলেন, 'দেখিলে ত মুণিকের দশা! তাহার ভূরিভোজনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিলে ত? আমরা ঘাস, বিচালি ও ভুসি খাই বটে, কিন্তু ইহা মুণিকের খাদ্য অপেক্ষা শত, সহস্র গুণে উত্তম; ইহাতে আমাদের ক্ষতি হয় না, বরং আয়ুবৃদ্ধি হয়।'

* * *

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মদনপীড়িত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই কামুক ভিক্ষু ছিল মুণিক; এই কুমারী ছিল সেই ভূ-স্বামীর কন্যা; আনন্দ ছিল চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

☞ ঈষপের গল্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও এই জাতকের অনুরূপ আখ্যায়িকা দেখা যায়। শালুক-জাতকের (২৮৬) আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের প্রভেদ অতি অল্প।

---

[১]। মূলে 'হেট্‌ঠামঞ্চতো' এই পদে আছে। ইহার অর্থ 'মঞ্চের অধোদেশ হইতে।' শূকর পালকেরা সচরাচর মাচা বান্ধিয়া নিজেরা তাহার উপর শোয়, শূকরগুলি মঞ্চের নীচে থাকে।
[২]। মূলে 'ভুস' এই পদ আছে; ইহা সংস্কৃত 'বুস' শব্দজাত।

৩১. কুলায়ক-জাতক

[শ্রাবস্তীর দুই দহর[১] ভিক্ষু কোশলের অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা সম্যকসম্বুদ্ধের দর্শনাশায় জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাছে কোন প্রাণী উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ভিক্ষুদিগকে জলপান করিবার কালে উহা ছাঁকিয়া লইতে হইত এবং তজ্জন্য তাঁহারা এক একখানা ছাঁকনি[২] সঙ্গে রাখিতেন। দহর ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেবল একজনের নিকট ছাঁকনি ছিল; তাঁহারা উভয়েই উহা দ্বারা রাস্তায় জল ছাঁকিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন যাঁহার ছাঁকনি ছিল, তিনি অপরকে তাহা ব্যবহার করিতে দিলেন না। কাজেই সেই ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল, তখন না ছাঁকিয়াই জল খাইল।

ভিক্ষুদ্বয় যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'কেমন হে, পথে ত তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ হয় নাই।' তখন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। অনন্তর শাস্তা, যে ভিক্ষু না ছাঁকিয়া জল খাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ছি, তুমি জানিয়া শুনিয়া বড় গর্হিত কাজ করিয়াছ। পুরাকালে যখন দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সুপর্ণপোতকদিগের[৩] প্রাণহানি হয় দেখিয়া তাঁহারা রথের গতি ফিরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা প্রাণিহত্যা হয় বলিয়া আপনাদের অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

বহুযুগের কথা—তখন মগধরাজেরা রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মগধের অন্তঃপাতী মচল নামক গ্রামে এই উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ সময়ে তাঁহার নাম হইয়াছিল মঘকুমার; কিন্তু যখন তিনি বড় হইলেন, তখন লোকে তাঁহাকে 'মঘমাণবক'[৪] নামে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার মাতা-পিতা এক কুলকন্যাসংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইয়া দানাদি সৎকার্য্যে এবং পঞ্চশীল-

---

[১]। দহর—দভ্র অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বা ছোট।

[২]। ছাঁকা জলকে 'পরিস্রুত জল' এবং ছাঁকনিকে 'পরিস্রাবণ' বলা যাইত।

[৩]। 'সুপর্ণ' দেবলোকের পক্ষিবিশেষ; ইহা গরুড়েরও একটী নাম।

[৪]। 'মাণবক' শব্দটী ছেলে মানুষ, ছোকরা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত; ব্রাহ্মণ বালকেরাও এই নামে অভিহিত হইত। এই অর্থে ইহার সহিত 'বটু' শব্দের কোন প্রভেদ নাই।

পালনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

মচল গ্রামে কেবল ত্রিশঘর লোক বাস করিত। একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন গ্রাম্যকর্ম্ম সমাধানার্থ একস্থানে সমবেত হইল। বোধিসত্ত্ব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি পা দিয়া তথাকার ধুলি সরাইয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া আর একটী স্থান ঐরূপে পরিষ্কার করিলেন। এবারও আর এক ব্যক্তি তাঁহার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেরই সুবিধার জন্য তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

আর একবার বোধিসত্ত্ব লোকের সুবিধার জন্য প্রথমে একটী মণ্ডপ এবং শেষে উহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে লোকের বসিবার জন্য আসন এবং পানার্থ জলপূর্ণ ভাণ্ড থাকিত। অতঃপর বোধিসত্ত্বের প্রযত্নে ঐ গ্রামবাসী সমস্ত পুরুষ তাঁহারই ন্যায় পরোপকার-পরায়ণ হইল; তাহারা পঞ্চশীল-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সঙ্গে সৎকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, বাসী, কুঠার, মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহির হইত, রাস্তায় যে সকল ইট পাটকেল দেখিতে পাইত সেগুলি দূরে সরাইয়া ফেলিত, রাস্তার ধারে কোন গাছে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা কাটিয়া দিত, অসমান স্থান সমান করিত, সেতু প্রস্তুত করিত, পুষ্করিণী খনন করিত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিত, এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে শীলব্রত পালন করিত।

একদিন গ্রামের মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল, 'যখন এই সকল লোকে মদ খাইয়া মারামারি কাটাকাটি করিত, তখন মদের শুল্কে এবং লোকের যে অর্থ দণ্ড হইত তদ্বারা আমার বেশ আয় হইত। কিন্তু এখন এই মঘ মাণবক ইহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ উঠিয়া গিয়াছে।' এই ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি।'

অনন্তর ঐ মণ্ডল রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে; তাহারা লুঠপাঠ ও অন্যান্য উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে।' রাজা বলিলেন, 'তাহাদিগকে ধরিয়া আন।' তখন সে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট উপনীত হইল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া আদেশ দিলেন, 'ইহাদিগকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত কর।'

রাজভৃত্যেরা বন্দীদিগকে প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাদের হাত পা বান্ধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। অন্তর তাহারা হাতী

আনিতে পাঠাইল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথা ভুলিও না; পিশুনকারক,[১] রাজা ও হস্তী সকলেই আমাদের নিকট আত্মবৎ প্রীতির পাত্র এই কথা মনে রাখিও।'

এ দিকে তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য হস্তী আনীত হইল; কিন্তু মাহুত পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পারিল না; হস্তী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট রব করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাহার পর একটা একটা করিয়া আরও হাতী আনা হইল, কিন্তু তাহারাও পলাইয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, বন্দীদিগের নিকট হয়ত এমন কোন ঔষধ আছে, যাহার গন্ধে হাতীগুলা উহাদের কাছে যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট কোন ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হইল, সম্ভবত ইহারা কোন মন্ত্র জানে; তিনি ভৃত্যদিগকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর ত, ইহারা কোন মন্ত্র জানে কি না। ভৃত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা মন্ত্র জানি বটে।' ভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, 'কি মন্ত্র জান বল।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, মহারাজ, আমরা প্রাণিহত্যা করি না; কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা গ্রহণ করি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, সুরা পান করি না; আমরা সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন করি, অসমান পথ সমান করিয়া দিই, পুষ্করিণী খনন করি, এবং ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করি। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আমাদের কবচ, ইহাই আমাদের বল।

এই কথা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ঐ পিশুনকারকের সমস্ত সম্পত্তি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে দান করিলেন এবং উহাকে তাঁহাদের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য প্রথম যে হস্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহাও রাজার আদেশে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।

তদবধি এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছামত পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সূত্রধর[২] ডাকাইয়া চৌমাথার নিকট একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি বিরাগবশত তাঁহারা এই সকল পুণ্যানুষ্ঠানে গ্রামবাসিনী রমণীদিগকে সঙ্গিনী করিলেন না।

বোধিসত্ত্বের গৃহে চারিজন রমণী ছিলেন—একজনের নাম সুধর্ম্মা, একজনের নাম চিত্রা, একজনের নাম নন্দা এবং একজনের নাম সুজাতা। একদিন সুধর্ম্মা সূত্রধরকে নিভৃতে পাইয়া তাহাকে মিঠাই খাইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া

---

[১]। যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কাহারও নিন্দা করে বা কাহারও নামে অভিযোগ করে।

[২]। মূলে 'বর্দ্ধক' শব্দ আছে। 'ইষ্টক-বর্দ্ধক' বলিলে রাজমিস্ত্রী বুঝায়।

বলিলেন, 'ভাই, যাহাতে আমি এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারি, তোমাকে এমন কোন উপায় করিতে হইবে।'

সূত্রধর বলিল, 'এর জন্য ভাবনা কি?' সে ঐ ধর্ম্মশালার অন্য কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে একখানা কাঠ কাটিয়া, শুকাইয়া, চাঁচিয়া ছুলিয়া ও ছেঁদা করিয়া একটী সুন্দর চূড়া প্রস্তুত করিল এবং বস্ত্রে আবৃত করিয়া উহা সুধর্ম্মার গৃহে রাখিয়া দিল। অনন্তর যখন ধর্ম্মশালার অন্যান্য কাজ শেষ হইল এবং চূড়া বসাইবার সময় আসিল, তখন সে বলিল, 'তাইত, এখনও যে একটা কাজ বাকী আছে।' গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কাজ?' 'আর কি কাজ? চূড়াই যে হয় নাই; চূড়া বিনা কি ধর্ম্মশালা হয়!' 'একটা চূড়া গড় না কেন?' 'চূড়া ত কাঁচা কাঠে হইবে না। আগেই কাঠ কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক ঠাক করা উচিত ছিল।' 'এখন তবে কি করিতে চাও?' 'খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈয়ারী চূড়া কিনিতে পাওয়া যায় কি না।'

তখন সকলেই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং সুধর্ম্মার ঘরে সেই চূড়া দেখিতে পাইলেন। সুধর্ম্মা কিন্তু কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় করিতে চাহিলেন না; তিনি বলিলেন যদি তোমরা আমাকে পুণ্যের ভাগিনী কর তবে বিনামূল্যেই তোমাদিগকে এই চূড়া দিব।' তাঁহারা বলিলেন, 'সেও কি কখন হয়! আমরা স্ত্রীলোককে পুণ্যের ভাগ দিই না।' ইহা শুনিয়া সূত্রধর বলিল, 'আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ব্রহ্মলোক বিনা আর কোথাও কি স্ত্রীজাতি-রহিত স্থান আছে? আসুন, আমরা এই চূড়া লইয়াই কাজ শেষ করি।' তখন গ্রামবাসীরা অগত্যা এই চূড়া গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণ শেষ করিলেন। তাঁহারা উহার ভিতর ফলকাসন[১] এবং জলপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিলেন এবং যাহাতে সর্ব্বদাই অতিথিরা অন্ন পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ধর্ম্মশালার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইল; উহার এক পার্শ্বে একটী দ্বার রহিল; প্রাচীরের ভিতরে সমস্ত ভূমি বালুকাকীর্ণ করা হইল; বাহিরে একসারি তালবৃক্ষ রোপিত হইল। চিত্রা সেখানে একটী উদ্যান-রচনা করাইয়া দিলেন, তাহাতে যাবতীয় পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপিত হইল। নন্দাও একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন; উহা পঞ্চবর্ণের পদ্মে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কেবল সুজাতা কিছু করিলেন না।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সপ্তবিধ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি মাতা-পিতার সেবা করিতেন, কুলজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিতেন, সত্যকথা কহিতেন, কদাচ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, পর-পরীবাদ করিতেন না ও মাৎসর্য্য

---

[১]। ফলকাসন—বেঞ্চ।

দেখাইতেন না।

জনক জননী সদা সেবে কায়মনে,
ভক্তি শ্রদ্ধা করে যত কুলজ্যেষ্ঠ জনে,
সভ্যভাষী, মিষ্টভাষী, জিতক্রোধ আর,
পর-পরীবাদে রত রসনা না যার;
এহেন নির্ম্মলচেতা সাধু সদাশয়
ত্রিদশনন্দন, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া বোধিসত্ত্ব যথাকালে দেহত্যাগপূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণও ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিলেন।

তখন ত্রিদশালয়ে অসুরেরা বাস করিত। একদিন দেবরাজ ভাবিলেন, যে রাজ্য অনন্যশাসন নহে তাহা বিফল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেবসুরা পান করাইলেন এবং যখন তাহারা প্রমত্ত হইল তখন এক এক জনের পা ধরিয়া সুমেরুপর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা অসুর লোকে গিয়া পড়িল। উহা সুমেরুর নিম্নতম অংশে অবস্থিত এবং আয়তেন ত্রিদশালয়ের তুল্য। দেবলোকে যেমন পারিজাত বৃক্ষ,[১] অসুর লোকে সেইরূপ কল্পস্থায়ী চিত্রপাটলি বৃক্ষ আছে। অসুরেরা চিত্রপাটলির পুষ্প দেখিয়া বুঝিল তাহারা দেবলোকে নাই, কারণ দেবলোকে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদিগকে মাতাল করিয়া রসাতলে ফেলিয়া দিয়াছে, আর নিজে দেবলোক অধিকার করিয়াছে। চল, আমরা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আবার দেবনগর অধিকার করিয়া লই।' অনন্তর পিপীলিকা যেমন স্তম্ভে আরোহণ করে, অসুরগণ সেইরূপ সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল।

অসুরেরা দেবনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া ইন্দ্র রসাতলেই গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তাঁহার সার্দ্ধশতযোজন দীর্ঘ বৈজয়ন্তরথ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের মস্তকোপরি প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর চলিতে চলিতে শেষে দেবতারা শাল্মলিবন দেখিতে পাইলেন। শাল্মলি তরুগুলি রথবেগে উন্মূলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পড়িতে লাগিল, সুপর্ণশাবকেরা সমুদ্রে পড়িয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, 'সখে মাতলে! ও কিসের শব্দ! উহা যে অতিকরুণ বোধ হইতেছে!' মাতলি কহিলেন, 'দেবরাজ, আপনার রথবেগে শাল্মলি বৃক্ষগুলি উন্মূলিত হইতেছে; সেই জন্য সুপর্ণপোতকেরা

---

[১]। মূলে 'পারিচ্ছত্রক' শব্দ আছে Childer সাহেব ইহার 'প্রবাল বৃক্ষ' এই নামান্তর দিয়াছেন। কিন্তু 'পারিজাত' নামই বোধহয় সমীচীন।

প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে।’ ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ইন্দ্র বলিলেন, ‘মাতলে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য এই সকল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; আমাকে যেন ঐশ্বর্য্যের লোভে জীবহিংসা করিতে না হয়। ইহাদের জন্য অসুরহস্তে আমার জীবননাশ হয়, সেও ভাল। তুমি রথ ফিরাও।’ ইহা বলিয়া দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

যাহাতে শাল্মলি-বাসী সূপর্ণ-পোতকগুলি,
না পলায় রথবেগে কর তাহা হে মাতলি!
অসুরের হাতে যদি যায় আজ এ জীবন,
তবু যেন নাহি করি ইহাদের উৎপীড়ন।

সারথি মাতলি তখন রথ ফিরাইয়া অন্যপথে দেবনগরাভিমুখে চলিলেন। অসুরেরা রথ ফিরিতে দেখিয়া মনে করিল, ‘অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরও ইন্দ্র আসিয়া ত্রিদশ-পতির বলবৃদ্ধি করিয়াছেন; সেইজন্যই তিনি রথ ফিরাইয়াছেন।’ ইহা ভাবিয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অসুরলোকে আশ্রয় লইল। ইন্দ্রও দেবনগরে প্রবেশ করিলেন; সেখানে দেবলোকের ও ব্রহ্মলোকের অধিবাসীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে পৃথিবী ভেদ করিয়া সহস্রযোজন উচ্চ এক প্রাসাদ উত্থিত হইল। বিজয়-সময়ে আবির্ভূত হইল বলিয়া ইহার নাম হইল ‘বৈজয়ন্ত’। অনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের আক্রমণ নিরোধার্থ সুমেরুর পঞ্চস্থানে বল বিন্যাস করিলেন। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে :

এক দিকে দেবপুরী; বিপরীত দিকে
বিরাজে অসুরপুরী—অজেয় নগর
দুটী। রোধিবার তরে দ্বন্দ্ব ইহাদের
মধ্যভাগে সন্নিবিষ্ট পঞ্চ মহাবল :
সর্ব্বনিম্নে নাগগণ; তদুর্দ্ধে সুপর্ণ;
ততঃপর কুম্মাণ্ড[১] ভীষণ-দরশন;
চতুর্থ অলিন্দে থাকে যক্ষ অগণন;
সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত চতুর্মহারাজ[২]
পঞ্চম অলিন্দ রক্ষা করেন যাঁহারা।

ইন্দ্র যখন এইরূপে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন সুধর্ম্মা মানবী-দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারই পাদচারিকা হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন।

---

[১]। কুম্মাণ্ড বা কুম্ভাণ্ড—দেবযোনি বিশেষ।

[২]। চতুর্মহারাজ—ইঁহারা পুরাণবর্ণিত দিক্‌পালদিগের স্থানীয়। ইঁহাদের নাম ধতরাষ্ট্র, বিরুধ, বিরূপাক্ষ এবং বৈশ্রবণ।

তিনি ধর্ম্মশালার চূড়া দান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার বলে তদীয় বাসার্থ পঞ্চশত যোজন উচ্চ সুধর্ম্মানামক দিব্যমণিময় এক অপূর্ব্ব সভাগৃহ সমুত্থিত হইল। সেখানে কাঞ্চনপর্য্যঙ্কে দিব্যশ্বেতচ্ছত্রতলে উপবেশন করিয়া ইন্দ্র দেবলোকের ও নরলোকের শাসন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে চিত্রা ইহলোকত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের পাদচারিকারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাসার্থ চিত্রলতাবন নামে এক পরম রমণীয় উদ্যানের উৎপত্তি হইল। সর্ব্বশেষে নন্দাও মৃত্যুর পর ইন্দ্রের পাদচারিকা হইলেন এবং পুষ্করিণী-দানরূপ পুণ্যফলে ত্রিদশালয়ে নন্দা নামক এক মনোহর সরোবর লাভ করিলেন।

সুজাতা কোনরূপ কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর তিনি বকরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কোন বনকন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র চিন্তা করিলেন। 'সুজাতা কোথায়, কিভাবে জন্মলাভ করিল জানি না; একবার তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।' অনন্তর বকরূপিণী সুজাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে গেলেন এবং দেবপুরীর রমণীয় শোভা, সুধর্ম্মা-সভা, চিত্রলতাবন, নন্দা সরোবর প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ, সুধর্ম্মা, চিত্রা ও নন্দা কুশলকর্ম্ম-সম্পাদন হেতু এখন আমার পাদচারিকা হইয়াছে, আর কুশল কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তুমি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছ। এখন হইতে ভূলোকে গিয়া শীলব্রত পালন কর।' অনন্তর তিনি সুজাতাকে সেই অরণ্যে রাখিয়া গেলেন।

সুজাতা তদবধি শীলব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র একদিন মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। মৎস্যটীকে মৃত বিবেচনা করিয়া সুজাতা চঞ্চুদ্বারা উহার মস্তক ধরিল, কিন্তু সেই সময়ে উহা পুচ্ছ সঞ্চারণ করিল। তখন সুজাতা উহাকে জীবিত জানিয়া ছাড়িয়া দিল; ইন্দ্রও 'সাধু সুজাতে! তুমি শীলব্রত পালন করিতে পারিবে' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বক জন্মের পর সুজাতা বারাণসীনগরে এক কুম্ভকারগৃহে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র আর একবার তাঁহার কথা মনে করিলেন এবং তিনি বারাণসীতে সেই কুম্ভকার গৃহে আছেন জানিতে পারিয়া এক গাড়ী সোণার শশা লইয়া বৃদ্ধ শকটচালকের বেশ ধারণপূর্ব্বক 'শশা কিনিবে, শশা কিনিবে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঐ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। লোকে কিনিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এ শশা যাকে তাকে দিই না; যে শীলব্রত পালন করে সেই ইহা পায়। তোমরা শীলব্রত পালন কর কি?' তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার শীলব্রত ট্রত বুঝি না; পয়সা দিব, শশা কিনিব, এই জানি।' 'আমি

পয়সা লইয়া শশা বেচি না; যে শীলব্রত পালন করে তাহাকে অমনিই দিই।' এই কথা শুনিয়া 'কোথাকার বিট্‌কিলে বুড়ো' বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। এই কথা সুজাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি মনে করিলেন, 'হয়ত শশাগুলি আমার জন্যই আসিয়া থাকিবে।' তখন তিনি শকটচালকের নিকট গিয়া কয়েকটা শশা চাহিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তুমি শীলব্রত পালন কর কি!' সুজাতা বলিলেন, 'হাঁ, করি।' 'তবে এই শসাগুলি তোমারই জন্য আনিয়াছি,' বলিয়া ইন্দ্র গাড়ীসুদ্ধ সমস্ত শসা তাহার দরজায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বিপুলসম্পত্তি লাভ করিয়া সুজাতা দীর্ঘকাল শীলব্রত পালন করিলেন, এবং দেহান্তে অসুররাজ বিপ্রচিত্তের কন্যারূপে জন্মলাভ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে এবার তিনি অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন অসুররাজ স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া অসুরদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন সুজাতা অসুররাজের কন্যা হইয়াছেন। তিনি অসুর-বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন, ভাবিলেন, 'সুজাতা যদি মনোমত পতিবরণ করে, তাহা হইলে আমারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিবে।'

যথাসময়ে সালঙ্কৃতা সুজাতা সভামণ্ডপে আনীত হইলেন; গুরুজনেরা বলিলেন, 'বৎসে তুমি ইচ্ছামত পতিবরণ কর।' তিনি ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবান্তর-জাত স্নেহবশত 'ইনিই আমার পতি হউন' বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে সার্দ্ধদ্বিকোটি নর্ত্তকীর অধীনেত্রীপদে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ জন্মান্তর লাভ করিলেন।

* * *

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'দেখিলে, দেবতারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন; আর তুমি পরম পবিত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অপরিস্রুত প্রাণিসঙ্কুল পানীয় উদরস্থ করিলে!'

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সারথি মাতলি এবং আমি ছিলাম ইন্দ্র।]

---

৩২. নৃত্য-জাতক

[এই কথার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে দেবধর্ম্ম-জাতক (৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা জনৈক বহুভাণ্ডিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এত গৃহসামগ্রী রাখ কেন?' এই কথাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং শাস্তার সম্মুখেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া বলিল, 'এখন হইতে এই বেশে রহিব।' তদ্দর্শনে সকলে ধিক্, ধিক্ করিয়া উঠিল। সে লোকটা বুদ্ধশাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় সমবেত হইয়া উহার নির্লজ্জতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন; তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই ব্যক্তি নির্লজ্জতাহেতু আজ যেমন ত্রিরত্ন হারাইল, সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মেও একবার স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিল।' অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

* * *

পৃথিবীর প্রথম কল্পে চতুষ্পদগণ সিংহকে, মৎস্যগণ আনন্দনামক মহামৎস্যকে এবং পক্ষিগণ সুবর্ণহংসকে স্ব স্ব রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। সুবর্ণহংসের এক পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল; তিনি তাহাকে বলিলেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর; আমি তাহা পূরণ করিব।' কন্যা বলিল, 'আমাকে মনোমত পতি বরণ করিয়া লইবার অনুমতি দিন।' তদনুসারে হংসরাজ হংস-ময়ূরাদি যাবতীয় পক্ষী নিমন্ত্রণ করিয়া হিমালয়ে আনয়ন করিলেন; তাহারা সমবেত হইয়া এক বিশাল পাষাণতলে উপবেশন করিল। তখন হংসরাজ কন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎসে, তুমি ইঁহাদের মধ্য হইতে যথারুচি পতি গ্রহণ কর।'

হংসরাজকন্যা চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিল এবং রত্নোজ্জ্বলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরকে দেখিতে পাইয়া 'ইনিই আমার পতি হউন' এই কথা বলিল। অপর পক্ষীরা এই শুভ সমাচার দিবার নিমিত্ত ময়ূরের নিকট গিয়া বলিল, 'ভাই, রাজদুহিতা এত পক্ষীর মধ্যে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।' এই কথা শুনিয়া ময়ূর আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিল, তবু ত তোমরা এখনও আমার বলের পরিচয় পাও নাই'; এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জার মাথা খাইয়া সর্ব্বসমক্ষে পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাতে তাহার নগ্নশরীর দেখা যাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া হংসরাজ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, 'কি আপদ্! ইহার দেখিতেছি ভিতরে বাহিরে এক; ইহার না আছে লজ্জাভয়, না আছে শিষ্টাচার। এরূপ নির্লজ্জ ও অশিষ্ট পাত্রে আমি কখনই কন্যা সম্প্রদান করিব না।' অনন্তর তিনি বিহঙ্গমসভায় গাথা পাঠ করিলেন :

সুমধুর কেকারব, পৃষ্ঠ দেশ মনোহর,
গ্রীবার বৈদুর্য্যচ্ছটা নয়নের তৃপ্তিকর,
ব্যামপরিমিত পক্ষ শোভে তব অনুপম,
একমাত্র নৃত্যদোষে পাইলে না কন্যা মম।

ইহা বলিয়া হংসরাজ সেই স্বয়ংবরসভাতেই নিজের ভাগিনেয়কে কন্যাদান করিলেন; ময়ূর নিরাশ হইয়া লজ্জাবনতমুখে পলায়ন করিল; হংসরাজও স্বকীয় বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই বহুভাণ্ডিক ছিল সেই নির্লজ্জ ময়ূর এবং আমি ছিলাম সুবর্ণহংসরাজ।]

---

৩৩. সম্মোদমান-জাতক

[চুম্বটক, অর্থাৎ মুটেরা যে বিড়া ব্যবহার করে তাহা লইয়া কপিলবাস্তুতে একবার বিবাদ হইয়াছিল। ইহার সবিস্তর বিবরণ কুণাল-জাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা তখন নগরোপকণ্ঠে ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজগণ, জ্ঞাতিবিরোধ নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বে ইতর প্রাণীরাও যতদিন মিলিয়া মিশিয়া ছিল, ততদিন তাহারা শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল, তখনই তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল।' অনন্তর জ্ঞাতিগণের অনুরোধে তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু সহস্র বর্ত্তক-পরিবৃত হইয়া বনে বাস করিতেন। একদা এক শাকুনিক সেইবনে উপস্থিত হইল; বর্ত্তক ধরাই তাহার ব্যবসায় ছিল। সে বর্ত্তকদিগের স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিত এবং যখন দেখিত ঐ ডাক শুনিয়া অনেক বর্ত্তক একস্থানে সমবেত হইয়াছে, তখন জাল ফেলিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিত। তাহার পর সে জালের চারিদিকে ঘা দিতে দিতে সবগুলিকে মাঝখানে জড় করিত এবং ঝুড়িতে পুরিয়া বেচিয়া লইয়া যাইত। এই রূপে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একদিন বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকদিগকে বলিলেন, 'দেখ, এই শাকুনিক আমাদের

জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে নির্মূল করিতে বসিয়াছে। আমি একটা উপায় জানি; তাহা অবলম্বন করিলে সে আমাদিগকে ধরিতে পারিবে না। এখন হইতে তোমাদের উপর জাল ফেলিবা মাত্র তোমরা প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়া মুখ বাহির করিবে এবং সকলে মিলিয়া জাল শুদ্ধ উড়িয়া গিয়া ইচ্ছামত স্থানে কণ্টকগুল্মের উপর অবতরণ করিবে।' এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া সকলেই তদনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইল।

পরদিন শাকুনিক জাল ফেলিল; কিন্তু বর্ত্তকেরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে জাল লইয়া উড়িয়া গেল এবং উহা এক কণ্টকগুল্মে আবদ্ধ করিয়া নিজেরা নিম্নদেশ হইতে পলাইয়া গেল। ঐ গুল্ম হইতে জাল উদ্ধার করিতে শাকুনিকের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিল। ইহার পর প্রতিদিনই বর্ত্তকেরা এইরূপ করিতে লাগিল; শাকুনিকও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জাল-মোচন ব্যাপারে নিরত থাকিয়া সায়ংকালে রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিতে লাগিল। ইহাতে শাকুনিকের ভার্য্যা কুপিত হইয়া বলিল, 'তুমি রোজই খালি হাতে ফের; অন্য কোথাও বুঝি তোমার পোষ্য কোন লোক আছে?' শাকুনিক বলিল, 'ভদ্রে, আমার অন্য কোথাও পোষ্য নাই; ব্যাপারটা কি শুন। বর্ত্তকেরা এখন এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে; আমি যেমন উহাদের উপর জাল ফেলি, অমনি উহারা তাহা লইয়া কণ্টকগুল্মের উপর উড়িয়া পড়ে ও সেখানে জাল আটকাইয়া নিজেরা পলাইয়া যায়। তবে ভরসার মধ্যে এই যে চিরদিন কিছু উহাদের মধ্যে এমন একতা থাকিবে না; উহারা যখনই কলহ আরম্ভ করিবে তখনই সবগুলোকে ধরিয়া আনিয়া আবার তোমার মুখে হাসি দেখিতে পাইব।' ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা বলিল :

> থাকিয়া সম্প্রীত ভাবে বিহঙ্গমগণ,
> জাল তুমি অনায়াসে করয়ে গমন।
> কলহ-নিরত কিন্তু হবে যে সময়,
> তখন আমার বশে আসিবে নিশ্চয়।

ইহার পর একদিন বিচরণ-স্থানে অবতরণ করিবার সময় একটা বর্ত্তক না দেখিয়া হঠাৎ আর একটা বর্ত্তকের মাথার উপর পড়িল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শেষোক্ত বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আমার মাথায় পা দিল রে?' প্রথম বর্ত্তক কহিল, 'ভাই, হঠাৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি; তুমি রাগ করিও না।' কিন্তু এই উত্তর শুনিয়াও দ্বিতীয় বর্ত্তকের ক্রোধোপশম হইল না। কাজেই দুইজনে কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল এবং 'বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি! বোধহয় তুমি একাই জাল লইয়া উড়িয়া যাইবে!' এই বলিয়া পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যে কলহপ্রিয়, তাহার সঙ্গে

থাকিলে ভদ্রস্থতা নাই; দেখিতেছি এখন হইতে আর ইহারা জাল লইয়া উড়িবে না, কাজেই শাকুনিক অবকাশ পাইবে, ইহাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিজ পরিজনবর্গসহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিকই তাহাই ঘটিল; শাকুনিক কয়েক দিন পরে আবার সেখানে উপস্থিত হইল, বর্ত্তকদিগের রবের অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে একস্থানে সমবেত করিল এবং পরে তাহাদের উপর জাল ফেরিয়া দিল। তখন একটা বর্ত্তক আর একটাকে বলিল, 'শুনি নাকি জাল তুলিতে তুলিতে তোমার মাথার লোম উঠিয়া গিয়াছে; এখন একবার ক্ষমতার পরিচয় দাও না।' দ্বিতীয় বর্ত্তক উত্তর দিল, 'আমি ত শুনিতে পাই জাল লইয়া যাইতে যাইতে তোমার পক্ষ দুইখানি পালকশূন্য হইয়াছে; এখন তবে তুমিই জাল তুলিয়া লইয়া যাও না।'

এইরূপে যখন বর্ত্তকেরা পরস্পরকে জাল তুলিবার জন্য বলিতে লাগিল, তখন শাকুনিক নিজেই উহা তুলিতে আরম্ভ করিল এবং আবদ্ধ বর্ত্তকদিগকে একত্র করিয়া ঝুড়িতে পুরিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তাহার ভার্য্যার মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

*　　*　　*

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই নির্ব্বোধ ও কলহপরায়ণ বর্ত্তক এবং আমি ছিলাম সেই উপায়কুশল ও পরিণামদর্শী বর্ত্তক।]

☞ এই জাতকের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত কপোতরাজ চিত্রগ্রীবের কথার সাদৃশ্য বিবেচ্য।

---

৩৪. মৎস্য-জাতক

[জনৈক ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও পত্নীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। শাস্তা যখন জেতবনে ছিলেন, তখন তিনি এই কথা শুনিয়া পাইয়া বলিলেন, 'দেখ, এই নারীর জন্য তুমি পূর্ব্ব জন্মেও প্রাণ হারাইয়াছিলে; তখন আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :

*　　*　　*

পূর্ব্বকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ছিলেন। সেই সময়ে একদিন কৈবর্ত্তেরা নদীতে জাল ফেলিয়াছিল। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহার

পত্নীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। মৎসী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, সে জালের গন্ধ পাইয়া পাশ কটিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার কামান্ধ ভর্ত্তা জালের ঠিক মাঝখানে গিয়া পড়িল। কৈবর্ত্তেরা টান অনুভব করিয়া বুঝিল, জালে মাছ পড়িয়াছে। কাজেই তাহারা জাল তুলিয়া মৎস্যকে বাহির করিয়া লইল, কিন্তু উহাকে তখনই না মারিয়া সৈকত ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। তাহারা স্থির করিল। মাছটাকে অঙ্গারে পাক করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব তাহারা কাটিয়া কুটিয়া শূল ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে সেই মৎস্য পরিদেবন করিতে লাগিল, 'অগ্নির জ্বালা, শূলবেধের যন্ত্রণা বা অন্যবিধ কষ্টের আশঙ্কায় আমার মত দুঃখ হইতেছে না; কিন্তু পাছে আমার পত্নী মনে করে আমি কোন মৎসীর সহিত চলিয়া গিয়াছি, এই চিন্তায় বড় ব্যাকুল হইয়াছি।' এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে নির্ব্বোধ মৎস্য নিম্নলিখিত গাথা বলিল :

> শীতে কষ্ট পাই, কিংবা অগ্নিদগ্ধ হই,
> তাহাতে দুঃখিত আমি কিছুমাত্র নই।
> যে যন্ত্রণা ভুগিতেছি জালের বন্ধনে,
> সেও অতি তুচ্ছ বলি ভাবি আমি মনে।
> অপর মৎসীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া
> ছাড়িয়াছি তারে, পাছে ভাবে ইহা প্রিয়া—
> এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
> এর কাছে অন্য সব দুঃখ কিবা ছার।

ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ভৃত্যপরিবৃত হইয়া নদীর উল্লিখিত স্থানে স্নান করিতে গেলেন। তিনি সমস্ত ইতর প্রাণীর ভাষা জানিতেন। কাজেই মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই মৎস্য কামের কান্না কান্দিতেছে; যদি মনের এইরূপ অপবিত্র ভাব লইয়া ইহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহাকে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমি ইহার উদ্ধার করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৈবর্ত্তদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বাপু সকল, তোমরা কি আমাকে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য একদিনও একটা মাছ দিবে না?' তাহারা বলিল, 'সে কি মহাশয়, আপনার যেটা ইচ্ছা লইয়া যান।' তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃহৎ মৎস্যটা দেখাইয়া বলিলেন, 'এইটা ছাড়া অন্য কোন মাছ চাই না। আমাকে এটা দাও না কেন?' 'এটা আপনারই জানিবেন।'

তখন দুই হাতে ঐ মৎস্য ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, 'ভাই মৎস্য, আজ আমি যদি তোমায় দেখিতে না

পাইতাম, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয় মরণ হইত। অতঃপর কামপ্রবৃত্তি পরিহার কর।' এই উপদেশ দিয়া তিনি মৎস্যটাকে নদীতে ছাড়িয়া দিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

* * *

[সমবধান—হে কামমোহিত ভিক্ষু, তখন তোমার পত্নী ছিলেন সেই মৎসী, তুমি ছিলে সেই মৎস্য এবং আমি ছিলাম রাজপুরোহিত।]

---

৩৫. বর্ত্তক-জাতক

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় দাবাগ্নিনির্ব্বাণ উপলক্ষে এই কথা বলেন।

মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় একদিন প্রাতঃকালে শাস্তা কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার পর আহারান্তে তিনি পুনর্ব্বার ভিক্ষুগণ-পরিবৃত হইয়া পথে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি উত্থিত হইল। শাস্তার অগ্রে ও পশ্চাতে বহু ভিক্ষু ছিলেন। দাবানল চতুর্দ্দিকে ভীষণ ধূমজ্বালা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কতিপয় পৃথগ্জন ভিক্ষু[১] প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, 'এস আমরা প্রত্যগ্নি দ্বারা কতক স্থান দগ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে দাবানল সেখানে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না।' অনন্তর এই উদ্দেশ্যে তাহারা অরণি দ্বারা[২] অগ্নি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহা দেখিয়া অপর ভিক্ষুরা কহিলেন, 'তোমরা কি করিতেছ? যাহারা গগনমধ্যস্থ চন্দ্র দেখিতে পায় না, পূর্ব্বমুখে থাকিয়াও উদীয়মান সহস্ররশ্মিকে দেখিতে পায় না, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়াও সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিংবা সুমেরুর নিকটে অবস্থিত হইয়াও সুমেরু দেখিতে পায় না, তাহাদের যে দশা, তোমাদেরও দেখিতেছি সেই দশা; নচেৎ যিনি দেব ও মানবের মধ্যে অগ্রগণ্য এমন সম্যকসম্বুদ্ধের সঙ্গে বিচরণ করিবার সময়েও 'প্রত্যগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর' বলিবে কেন? তোমরা নিশ্চয় বুদ্ধের শক্তি জান না। চল, সকলে তাঁহার নিকট

---

[১]। যাহাদের কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, এবংবিধ ভিক্ষুরাও 'পৃথগ্জন' নামে অভিহিত হইত।

[২]। যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই উদ্দেশ্যে অশ্বত্থ বা গণিয়ারি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। ইহার এক খণ্ডকে অধরারণি ও অপর খণ্ডকে উত্তরারণি বলে।

যাই।' তখন অগ্র ও পশ্চাতের সমস্ত ভিক্ষু একত্র হইয়া দশবলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিক্ষুদিগকে সমবেত দেখিয়া শাস্তা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন সেই দাবানল ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার ষোল করীস[১] নিকটে আসিবামাত্র উহা থামিল এবং তৃণোল্কা জ্বালাইয়া উহা যেমন জলে ডুবাইল তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়, ঐ অগ্নিও সেইরূপ নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল; তথাগতের চতুষ্পার্শ্বস্থ বত্রিশ করীস পরিমিত ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হইল না।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'অহো, বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি; অচেতন অগ্নি পর্য্যন্ত ইঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিল না। জলনিমগ্ন তৃণোল্কার দাবাগ্নির নির্ব্বাণ হইল, তাহা আমার বর্ত্তমান ক্ষমতাজনিত নহে। ইহা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সত্যবলের ফল। বর্ত্তমান কল্পে এই স্থান কখনও অগ্নিদগ্ধ হইবে না; ইহা একটী কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য।'[২]

এই কথা শুনিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সংঘাটী চারি ভাঁজ করিয়া শাস্তার জন্য সেই স্থানে আসন করিয়া দিলেন; শাস্তা তদুপরি পর্য্যঙ্কবন্ধে উপবেশন করিলেন; ভিক্ষুরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং 'দয়া করিয়া আমাদের অবগতির জন্য এই বৃত্তান্ত বলুন' এই প্রার্থনা করিলেন। তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে মগধরাজ্যের ঠিক এই স্থানেই বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইবামাত্রই তাঁহার দেহ বৃহৎকন্দুকপ্রমাণ হইয়াছিল। তাঁহাকে কুলায়ে রাখিয়া তদীয় জনকজননী চরিতে যাইত এবং চঞ্চু দ্বারা খাদ্য আনয়ন করিয়া তাঁহাকে আহার করাইত। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আকাশে উড়িবার বা পাদবিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতলে চলিবার শক্তি জন্মে নাই।

এই স্থান তখন প্রতিবৎসরে দাবানলে দগ্ধ হইত। বোধিসত্ত্বের যখন উক্তরূপ অসহায় অবস্থা, তখন একদিন দাবানল আবির্ভূত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে

---

[১]। ধান্যাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্র; (এখানে) ঐ পরিমাণে ধান্য যতটা ভূমিতে বপন করা যায়। ৪ অম্মণে এক করীস; এক অম্মণ ধান প্রায় ৩ মণ হইবে।

[২]। নলপান-জাতক (২০) দ্রষ্টব্য। চরিয়া পিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

করিতে তাঁহার কুলায়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিহঙ্গগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল; বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতাও মরণ ভয়ে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়াই পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব কুলায় হইতে গ্রীবা বাহির করিয়া দেখিলেন অগ্নি শীঘ্র বিস্তারিত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'যদি আমি পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে এখনই অন্যত্র গিয়া পরিত্রাণ পাইতাম; যদি পাদক্ষেপ করিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলেও হাঁটিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম। মাতা-পিতা স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমাকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিলেন; এখন আমি সম্পূর্ণ অসহায়; আমাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই; এখন আমি করি কি?'

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আবার ভাবিলেন, 'ইহলোকে শীলব্রত পালনের ফল আছে, সত্যব্রত পালনের ফল আছে। অতীতকালে পারমিতা লাভ করিয়া বোধিদ্রুমতলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। তাঁহারা শীলবলে, সমাধিবলে এবং প্রজ্ঞাবলে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সত্যকারুণ্যসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবযুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নামে অভিহিত। তাঁহারা যে বিভূতি লাভ করিয়াছেন তাহা কদাচ নিষ্ফল নহে। আমিও একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছি, কারণ সত্যই স্বভাবজ ধর্ম্ম। অতএব অতীত বুদ্ধদিগকে স্মরণ করি; তাঁহাদের গুণের এবং নিজের স্বভাবজ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া সত্যক্রিয়া দ্বারা অগ্নিকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাউক। তাহা হইলে আমার নিজের এবং অপর পক্ষীদিগের জীবন রক্ষা হইবে।' সেইজন্যই কথিত আছে :

জগতে শীলের গুণ সর্ব্বত্র বিদিত;
সত্য, শুচি, দয়া সর্ব্বজন-সমাদৃত;
শীল, সত্য, দয়া, শুচি করিয়া স্মরণ
অমোঘ ধ্রুবফল সত্যক্রিয়া আমি করিব এখন।
ধর্ম্মের অসীমবল স্মরণ করিয়া,
ভূতপূর্ব্ব জিনগণ-চরণে নমিয়া,
সর্ব্বাংশে নির্ভর করি সত্যের উপরে,
সত্যক্রিয়া করি আমি অগ্নি রোধিবারে।

তখন বোধিসত্ত্ব অতীত বুদ্ধদিগের গুণগ্রাম স্মরণ করিলেন এবং নিজের হৃদয়ে যে সত্যজ্ঞান নিহিত ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া সত্যক্রিয়া দ্বারা এই গাথা বলিলেন :

পক্ষ আছে কিন্তু তাহা উড়িতে না পারে;
পাদদ্বয় পারে না ক বহিতে আমারে;

মাতাপিতা ফেলি গেল মোরে অসহায়;
তুমি না রক্ষিলে বল কে রক্ষে আমায়?
ভাবিয়া এ সব, তাই, ওহে হুতাশন,
কর তুমি এ স্থান হইতে নিবর্ত্তন।

এই শপথের পর অগ্নি তৎক্ষণাৎ ষোল ব্যাম হঠিয়া গেল; নবভূমিতে আর ব্যাপ্ত হইল না; উল্কা জলে ডুবাইলে উহার শিখা যেমন নির্ব্বাপিত হয়, দাবানল-শিখাও সেইরূপ নির্ব্বাপিত হইল। এই জন্যই কথিত আছে :

করিনু সত্যক্রিয়া আমি, শুনি মোর বাণী,
প্রজ্বলিত হতাশন থামিল অমনি।
ষোল ব্যাম স্থান র'ল অদগ্ধ পড়িয়া;
জলে যেন অগ্নি কেহ দিল নিবাইয়া।

তদবধি এই স্থান বর্ত্তমান কল্পে আর কখনও অগ্নি-দগ্ধ হইবে না এই নিয়ম হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য নামে অভিহিত।

* * *

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তিফল, কেহ সকৃদাগামীফল, কেহ অনাগামীফল, কেহ বা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক-পোতক এবং আমার মাতাপিতা ছিলেন উহার মাতাপিতা।]

---

৩৬. শকুন-জাতক

[এক ভিক্ষুর পর্ণশালা দগ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

ঐ ভিক্ষু শাস্তার নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশলরাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রামের[১] সন্নিকটস্থ অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই তাঁহার পর্ণশালা দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, 'দেখ আমার কুটীর দগ্ধ হইয়া গেল; বাসের পক্ষে বড় অসুবিধা হইতেছে।' তাহারা বলিল, 'বৃষ্টির অভাবে আমাদের ক্ষেত শুকাইয়া গিয়াছে; জল সেচনের পর আমরা আপনার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিব।' কিন্তু যখন জল-সেচন হইল, তখন তাহারা

---

[১]। প্রত্যন্ত—অর্থাৎ দূরবর্ত্তী বা সীমা-সন্নিহিত।

বীজ বুনিবার কথা তুলিল; পরে বীজ বুনা হইল 'বেড়া' দেওয়া, বেড়া দেওয়া হইলে নিড়ান, নিড়ান হইলে ফসল কাটা, ফলস কাটা হইলে মলন,[১] এইরূপ একটা না একটা ওজর দেখাইয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে তিন মাস কাটাইয়া দিল।

অনাবৃত স্থানে অতি কষ্টে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ঐ ভিক্ষু কর্ম্মস্থানে লব্ধপ্রবেশ হইলেন বটে, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অনন্তর প্রবারণ পর্ব্ব শেষ হইলে তিনি শাস্তার নিকট প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা স্বাগত-সম্ভাষণের পর জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন হে, বর্ষায় ত কোন কষ্ট পাও নাই, কর্ম্মস্থানে ত সিদ্ধি লাভ করিয়াছ?'

ভিক্ষু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, 'উপযুক্ত স্থানাভাবে কর্ম্মস্থানসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই।' শাস্তা কহিলেন, 'কি আশ্চর্য্য, প্রাচীনকালে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত কোন স্থান বাসের যোগ্য বা অযোগ্য তাহা বুঝিতে পারিত; আর তুমি বুঝিতে পারিলে না!' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পক্ষি-পরিবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ শাখা-প্রশাখা-সম্পন্ন এক মহাবৃক্ষে বাস করিতেন। একদিন ঐ বৃক্ষের শাখার সহিত অন্য শাখার ঘর্ষণ দ্বারা প্রথমে ধুলির মত সূক্ষ্মকণা পতিত হইল, পরে ধূম উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, 'ঐ শাখাদ্বয় যদি অধিক্ষণ পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকে তাহা হইলে অগ্নির উৎপত্তি হইবে এবং সেই অগ্নি যদি পুরাতন পত্রের উপর পতিত হয় তাহা হইলে এই বৃক্ষও ভস্মীভূত হইবে। অতএব এ বৃক্ষে আর বাস করা কর্ত্তব্য নহে; এখান হইতে পলায়ন করিয়া যত শীঘ্র পারি অন্যত্র যাইতে হইবে।' তখন তিনি পক্ষীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :

এই মহীরুহ, যাহা আমা সবাকার
ছিল এত দিন বড় সুখের আগার,
করিতেছে অগ্নিকণা আজি বরষণ;
চল যাই পলাইয়া, হে বিহগগণ।
যাহার শরণ লয়ে ছিনু এত কাল,
সেই হ'য়ে ভয়স্থান ঘটাল জঞ্জাল।

যে সকল পক্ষীর বুদ্ধি ছিল তাহারা বোধিসত্ত্বের পরামর্শমত কার্য্য করিল এবং তাঁহার সঙ্গে তখনই আকাশে উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু

[১]। 'মর্দ্দন' শব্দের অপভ্রংশ।

নির্ব্বোধ পক্ষীরা বলিল, ‘উহার স্বভাবই এই রকম; ও বিন্দুমাত্র জলেও কুম্ভীর দেখে।’ তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই বৃক্ষেই রহিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অচিরে তাহাই ঘটিল, পুরাতন পত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সেই বৃক্ষ দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন অগ্নিশিখা নির্গত হইল, তখন পক্ষীরা ধূমান্ধ হইয়া আর পলায়ন করিতে পারিল না, অগ্নিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হইল।

* * *

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আমার শিষ্যেরা ছিল বোধিসত্ত্বের অনুগামী সেই বিহঙ্গগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী বিহঙ্গ।]

---

৩৭. তিত্তির-জাতক

[শ্রাবস্তীতে যাইবার কালে স্থবির সারীপুত্র একদা বাসস্থানাভাবে সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে শাস্তা এই কথা বলেন।

অনাথপিণ্ডিক, বিহার নির্ম্মাণ হইয়াছে এই সংবাদ, দূতমুখে প্রেরণ করিলে শাস্তা রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে বৈশালীতে গমন করিলেন এবং সেখানে কিয়দ্দিন যাপন করিয়া শ্রাবস্তী নগরাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে ষড়বর্গীয়দিগের শিষ্যগণ[১] অগ্রে গিয়া স্থবিরদিগের বাসোপযোগী সমস্ত গৃহ অধিকারপূর্ব্বক ‘এখানে আমাদের উপাধ্যায়েরা থাকিবেন, এখানে আমাদের আচার্য্যেরা থাকিবেন, এখানে আমরা থাকিব’ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। কাজেই পরে যখন স্থবিরেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা রাত্রিযাপনের জন্য কোন আশ্রয় পাইলেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক সারীপুত্রের শিষ্যেরা পর্য্যন্ত বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার জন্য কোন স্থান লাভ করিতে পারিলেন না। সারীপুত্র আশ্রয়াভাবে শাস্তার বাসগৃহের অনতিদূরে একটা বৃক্ষের মূলে, কখনও ইতস্তত পাদচারণ করিয়া, কখনও বসিয়া থাকিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

অতি প্রত্যুষে শাস্তা বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া গলা খেঁকারি দিলেন; সারীপুত্রও খেঁকারি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন ‘কে ও’। সারীপুত্র বলিলেন,

---

[১]। ১৬৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

'আজ্ঞা, আমি সারীপুত্র।' 'তুমি এত ভোরে এখানে কেন?' সারীপুত্র সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা ভাবিলেন, 'আমি জীবিত থাকিতেই ভিক্ষুরা পরস্পরের গৌরব রক্ষা করিয়া ও মর্য্যাদা বুঝিয়া চলে না; আমার পরিনির্ব্বাণের পর না জানি কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে।' তখন ধর্ম্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার বড় উদ্বেগ হইল। তিনি প্রভাত হইবামাত্র ভিক্ষুসংঘ সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনিতেছি, ষড়বর্গীয়গণ অগ্রে আসিয়া স্থবিরদিগের বাসোপযোগী সমস্ত স্থান আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল; এ কথা সত্য কি?' তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ' ভগবন, এ কথা সত্য! তখন শাস্তা ষড়বর্গীয়দিগকে ভর্ৎসনা করিয়া সকলকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলত, কে সর্ব্বাগ্রে বাসস্থান, ভোজ্য ও পানীয় পাইবার অধিকারী?'

ইহার উত্তরে যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'যিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন'; কেহ বলিল 'যিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন'; কেহ বলিল, 'যিনি বিভবশালী কুলে জাত' ইত্যাদি আবার কেহ বলিল 'যিনি বিনয়ধর,[১] কেহ বলিল, 'যিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পটু'; কেহ বলিল, 'যিনি ধ্যানের প্রথম সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন'; কেহ বলিল 'যিনি ধ্যানের দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন' ইত্যাদি। পুনশ্চ কেহ বলিল 'যিনি স্রোতাপন্ন'; কেহ বলিল 'যিনি সকৃদাগামী'; কেহ বলিল 'যিনি অনাগামী'; কেহ বলিল 'যিনি অর্হৎ'; কেহ বলিল 'যিনি ত্রৈবিদ্য'[২]; কেহ বলিল যিনি ষড়ভিজ্ঞ।'

তখন শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্ম, বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্মে পারদর্শিতা, প্রথমাদি ধ্যানফল প্রাপ্ত, স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গলাভ ইহার কোনটীই মৎপ্রবর্ত্তিত শাসনে অগ্রাসনাদি পাইবার কারণ নহে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে হইবে, প্রত্যুত্থান করিতে হইবে, কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারাই অগ্রাসন, অগ্রোদক ও অগ্রভক্ষ্য পাইবার অধিকারী। ইহাই আমার নিয়ম এবং এই নিয়মানুসারে সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধভিক্ষুদিগের সুবিধা দেখিতে হইবে। কিন্তু যিনি অনুধর্ম্মচক্রের[৩] প্রবর্ত্তক, আমার পরেই যিনি আসনাদি পাইবার উপযুক্ত, আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য

---

[১]। অর্থাৎ 'বিনয়' নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

[২]। ত্রৈবিদ্য অর্থাৎ ত্রিবিদ্যায় (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিবিধ জ্ঞানে) ভূষিত। ষড়ভিজ্ঞ অর্থাৎ যাঁহার দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্তবিজ্ঞান প্রভৃতি ষড়বিধ অভিজ্ঞা আছে। ধ্যানের অষ্টবিধ ফল সম্বন্ধে ২৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]। ধুতাঙ্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজধর্ম্ম অনুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এইগুলি অভ্যাস করিলে শেষে লোকোত্তর ধর্ম্মে অধিকার জন্মে। বুদ্ধ লোকোত্তর ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক।

সেই সারীপুত্র নিরাশ্রয়ে বৃক্ষমূলে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। যদি তোমরা এখনই এমন লঘুগুরুজ্ঞানহীন হও, তাহা হইলে শেষে না জানি কতই দুরাচার হইবে! দেখ, প্রাচীনকালে ইতর জন্তুরা পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছিল যে পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বাস করা অবিধেয়। এই জন্য তাহারা আপনাদের মধ্যে কে প্রাচীন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিত। সেই পুণ্যের ফলে তাহারা দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিল।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে হিমালয়ের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে এক তিত্তির, এক মর্কট ও এক হস্তী বন্ধুভাবে বাস করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন লঘুগুরু পর্য্যায় না থাকায় পরস্পরের প্রতি কে কিরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবে তাহা অবধারিত ছিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল, এরূপভাবে বিচরণ করা অন্যায়। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ তাহা স্থির করিয়া তাহার প্রতি অভিবাদনাদি সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিবার সঙ্কল্প করিল।

আপনাদের মধ্যে কে বয়সে বড় ইহা ভাবিতে ভাবিতে একদিন তাহারা ইহা নির্ণয় করিবার এক উপায় বাহির করিল। তাহারা ন্যগ্রোধ তরুর মূলে উপবেশন করিয়া আছে। এমন সময় তিত্তির ও মর্কট হস্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই হস্তী, এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ যখন তুমি প্রথম দেখিয়াছ, মনে হয়, তখন ইহা কত বড় ছিল? হস্তী বলিল, 'আমার শৈশব সময়ে এই গাছ এত ছোট ছিল যে আমি ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতাম, ইহাকে পেটের নীচে রাখিয়া দাঁড়াইলে ইহার অগ্রশাখা আমার নাভিদেশ স্পর্শ করিত।'

ইহার পর বর্ত্তক ও হস্তী মর্কটকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কহিল, 'আমি ছেলে বেলা মাটিতে বসিয়া গলা বাড়াইয়া ইহার আগডালের কচি পাতা খাইয়াছি বলিয়া মনে হয়।'

শেষে মর্কট ও হস্তী তিত্তিরকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিত্তির বলিল, 'পূর্ব্বে অমুক স্থানে একটা প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। আমি তাহার ফল খাইয়া এই স্থানে মলত্যাগ করিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কাজেই ইহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ইহাকে জানিয়াছি এ কথা বলিলেও দোষ হয় না। অতএব আমি বয়সে তোমাদের অনেক বড়।'

তখন মর্কট ও হস্তী সেই প্রবীণ তিত্তিরকে বলিল, 'আপনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড়। বয়োবৃদ্ধের প্রতি যেরূপ সৎকার, সম্মান ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে হয় এখন হইতে আপনার প্রতি আমরা সেইরূপ দেখাইব। আমরা

আপনাকে অভিবাদনাদি করিব এবং আপনার উপদেশানুসারে চলিব। আপনিও দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রয়োজনমত সদুপদেশ দিবেন।'

তদবধি তিত্তির তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিল, নিজেও শীলব্রত পালন করিতে লাগিল। এইরূপ পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়া সেই প্রাণিত্রয় পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক যথোচিত-রূপে জীবনযাপন করিয়া দেহান্তে দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

[এই প্রাণিত্রয়ের কার্য্য 'তিত্তির ব্রহ্মচর্য্য' নামে বিদিত। ইহারা যখন লঘুগুরু-ভেদ মানিয়া চলিতে পারিয়াছিল, তখন তোমরা ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা করিয়া কেন পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না? আমি আদেশ দিতেছি এখন হইতে তোমরা বয়োবৃদ্ধ দেখিলে তাঁহার অভিবাদন করিবে, প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। বয়োবৃদ্ধগণই অগ্রাসনাদি পাইবেন। প্রবীণদিগকে বাহিরে রাখিয়া নবীনেরা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে পারিবে না; যদি কেহ এইরূপ করে তবে সে প্রত্যবায়ভাগী হইবে :

প্রবীণের রাখে মান ধর্ম্মজ্ঞ যে জন;
ইহামুত্র হয় সেই সুখের ভাজন।]

*　　*　　*

[সমবধান—তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল সেই হস্তী, সারীপুত্র ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি তিত্তির।]

---

৩৮. বক-জাতক

[জেতবনের জনৈক ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। কিরূপে কাপড় কাটিয়া জোড়া দিতে হয়, কোথায় কিরূপ সাজাইতে হয়, কিরূপে সেলাই করিতে হয়, ইত্যাদি কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। এই নৈপুণ্যবশত সে অনেকেরই চীবর প্রস্তুত করিয়া দিত এবং লোকে তাহাকে 'চীবর-বর্দ্ধক' বলিত। সে জীর্ণবস্ত্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তকৌশলে তদ্দারা ও সুখস্পর্শ চীবর প্রস্তুত করিত; ঐ চীবর প্রথমত রঞ্জিত করিত; পরে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ পিষ্টমিশ্রিত জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইত এবং শঙ্খ দ্বারা ঘষিত। ইহাতে চীবরগুলি অতি উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইত। যে সকল ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে

জানিতেন না তাঁহারা নূতন বস্ত্র[১] লইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট যাইতেন এবং বলিতেন, 'আমরা চীবর প্রস্তুত করিতে পারি না, আপনি আমাদিগকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিন।' সে বলিত, 'ভাইসকল, চীবর প্রস্তুত করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই একটী চীবর প্রস্তুত আছে; যদি ইচ্ছা হয় তবে শাটক বদল দিয়া একটী লইতে পার'। ইহা বলিয়া সে ঐ চীবর বাহির করিয়া দেখাইত। ভিক্ষুরা বাহিরের চটক দেখিয়া ভুলিয়া যাইতেন, ভিতরে কি আছে তাহা জানিতেন না, তাঁহারা চীবর-বর্দ্ধককে আপনাদের নূতন বস্ত্র দিয়া তাহার বিনিময়ে সেই জীর্ণবস্ত্র নির্ম্মিত চীবরই লইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন উহা ময়লা হইয়া যাইত এবং ভিক্ষুরা উহা গরম জলে ধুইতে যাইতেন, তখন উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইত;—তখন এখানে ওখানে ছেঁড়া, ফাটা, জোড়া, তালি বাহির হইয়া পড়িত। তখন তাঁহারা দেখিতেন, নববস্ত্রের বিনিময়ে এইরূপ চীবর লইয়া তাঁহারা নিতান্ত প্রতারিত হইয়াছেন। ক্রমে সর্ব্বদাই প্রচারিত হইল, চীবর-বর্দ্ধক জীর্ণবস্ত্র দ্বারা চীবর প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে।

ঐ সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেও এক সুনিপুণ চীবর-বর্দ্ধক ভিক্ষু বাস করিত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর ন্যায় সেও গ্রামবাসীদিগকে প্রতারিত করিত। জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে এই ব্যক্তির কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা একদিন তাহাকে বলিলেন, 'লোকে বলে জেতবনে একজন চীবর-বর্দ্ধক আছে, সেও তোমার ন্যায় সকলকে ঠকাইয়া থাকে।' তাহা শুনিয়া গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ভাবিল, 'আচ্ছা, আমি সেই নগরবাসীকেই প্রতারিত করিব।' অনন্তর সে অতি জীর্ণবস্ত্রখণ্ড-সমূহ লইয়া একটী সুন্দর চীবর প্রস্তুত করিল এবং উহা উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধানপূর্ব্বক জেতবনে উপস্থিত হইল। জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক উহা দেখিবামাত্র লোভপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই চীবর কি আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন?' 'হ্যাঁ মহাশয়, আমিই ইহা প্রস্তুত করিয়াছি।' 'এই চীবরটী আমায় দিন না। আমি আপনাকে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিতেছি।' 'আমরা গ্রামবাসী ভিক্ষু। গ্রামে ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য বস্তু সহজে মিলে না। আপনাকে এই চীবর দিলে আমি কি পরিব?' 'আমার নিকট নূতন বস্ত্র আছে, আপনি তাহা লইয়া আর একটী চীবর প্রস্তুত করিয়া লইবেন।' 'মহাশয়, ইহাতে আমি নিজের হস্তকৌশলের পরিচয় দিয়াছি; কিন্তু আপনি যখন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন আমি আর কি বলিতে পারি? আপনি এই চীবর গ্রহণ করুন।' এইরূপে গ্রাম্য ভিক্ষু নগরবাসী ভিক্ষুকে প্রতারিত করিয়া জীর্ণবস্ত্র-নির্ম্মিত চীবরের বিনিময়ে নববস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

---

[১]। মূলে 'শাটক' এই শব্দ আছে। শাট বা শাটক 'বস্ত্রখণ্ড' 'থান' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে 'শাড়ী' হইয়াছে।

জেতবনের ভিক্ষু ঐ চীবর কিয়ৎকাল ব্যবহার করিবার পর একদিন গরম জলে ধুইতে গেল এবং উহা জীর্ণবস্ত্র-নির্ম্মিত বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইল। গ্রামবাসী চীবর-বর্দ্ধক নগরবাসী চীবরবর্দ্ধককে প্রতারিত করিয়াছে এই সংবাদ অচিরে সংঘমধ্যেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা করিতেছেন, এমনসময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, 'জেতবনবাসী ভিক্ষু পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ প্রতারণা করিত, এবং এবার যেমন নিজে প্রতারিত হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ প্রতারিত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোন বনমধ্যবর্ত্তী পদ্মসরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন একটী অনতি-বৃহৎ পুষ্করিণীতে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে জল বড় কমিয়া যাইত। এই পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকিত। একদিন এক বক মৎস্যদিগকে দেখিয়া মনে করিল, 'ইহাদিগকে কোনরূপে প্রতারিত করিয়া খাইবার উপায় করিতে হইবে।' অনন্তর সে যেন নিতান্ত চিন্তাবিষ্ট হইয়াছে এইভাবে জলের ধারে বসিয়া রহিল।

মৎস্যেরা বককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আর্য্য, আপনি এত চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন কেন?' বক কহিল, 'আমি তোমাদের কথাই চিন্তা করিতেছি।' 'আমাদের জন্য কিসের চিন্তা, আর্য্য?' 'এই পুষ্করিণীর জল কমিয়া নীচে নামিয়াছে, খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, ভয়ানক গরমও পড়িয়াছে; তাই বসিয়া ভাবিতেছি, মাছ বেচারারা এখন কি করিবে।' 'বলুন ত আর্য্য, এখন তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?' 'তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে এক কাজ করা যাইতে পারে। কিছু দূরে একটী সরোবর আছে, তাহাতে পঞ্চ বর্ণের পদ্ম জন্মে। আমি তোমাদিগকে এক একটীকে চঞ্চু দ্বারা ধরিয়া তাহার জলে ছাড়িয়া দিতে পারি।' 'আর্য্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন বক মৎস্যদিগের ভাবনা ভাবে নাই। বলুন দেখি, আপনি আমাদিগকে এক একটি করিয়া উদরস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন কি না?' 'না, না; তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তবে তোমাদিগকে কখনও খাইব না। আমি যে সরোবরের কথা বলিলাম, তাহা আদৌ আছে কি না যদি তোমাদের এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বরং তোমাদের একটী মৎস্যকে আমার সঙ্গে দাও; সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসুক।' মৎস্যেরা বকের কথামত এক প্রকাণ্ড কাণা মাছকে আনিয়া বলিল 'ইহাকে লইয়া যান।' তাহারা ভাবিল, 'বক জলে স্থলে কোথাও এই কাণা

মাছকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।'

বক কাণা মাছকে লইয়া সেই বৃহৎ সরোবরের জলে ছাড়িয়া দিল এবং তাহাকে উহার বিশাল আয়তন দেখাইয়া পুনর্ব্বার মৎস্যদিগের নিকট আনয়ন করিল। কাণা মাছ জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে নূতন সরোবরের শোভা সম্পত্তির কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া সমস্ত মৎস্যই সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল এবং বককে বলিল, 'আর্য্য, আপনি অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। আমাদিগকে সেই বৃহৎ সরোবরে লইয়া চলুন।'

তখন বক প্রথমেই সেই কাণা মাছকে লইয়া যাত্রা করিল এবং তাহাকে সরোবরের তীরে লইয়া প্রথমে জল দেখাইল, পরে তীরদেশস্থ এক বরুণ বৃক্ষের উপর অবতরণ করিয়া তাহাকে শাখান্তরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চঞ্চুর আঘাতে মারিয়া ফেলিল এবং মাংস খাইয়া কাঁটাগুলি বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে পুনর্ব্বার সেই পুষ্করিণীতে গিয়া বলিল, 'তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম; এখন তোমরা আর কে যাবে চল।' এইরূপে বক এক একটী মৎস্য লইয়া খাইতে লাগিল, পুষ্করিণী ক্রমে মৎস্যশূন্য হইল। শেষে থাকার মধ্যে সেখানে কেবল একটা কর্কট রহিল। বক তাহাকেও খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, 'ওহে কর্কট, আমি সমস্ত মৎস্য লইয়া পদ্মসম্পন্ন সরোবরে রাখিয়া আসিলাম। চল এবার তোমাকেও সেখানে লইয়া যাই।' কর্কট জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কিরূপে লইয়া যাইবে?' 'কেন, ঠোঁটে ধরিয়া লইয়া যাইব।' 'না, তাহা হইতে পারে না। তুমি হয় ত আমায় পথে ফেলিয়া দিবে; তাহা হইলে আমার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' 'ভয় নাই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিব।' কর্কট ভাবিল, 'ধূর্ত্ত বক হয় ত মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া দেয় নাই; দেখা যাউক আমাকে লইয়া কি করে। যদি আমাকে সত্য সত্যই জলে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উত্তম। আর যদি তাহা না করে, নাই করুক, আমি উহার গলা কাটিয়া ফেলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বককে বলিল, 'দেখ মামা, তুমি আমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্তু আমরা কর্কট, আমরা খুব শক্ত করিয়া ধরিতে পারি। আমায় যদি শিঙ্ দিয়া তোমার গলা ধরিতে দাও তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।'

কর্কটের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন কামার যেমন সাঁড়াশি[১] দিয়া ধরে, কর্কটও সেইরূপ নিজের শিঙ্ দিয়া বকের গলা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, 'এখন আমরা রওনা হইতে পারি।' বক

---

[১]। সন্দংশ, সাঁড়াশি; ইহা হইতে 'সন্না' শব্দ হইয়াছে।

তাহাকে লইয়া প্রথমে সেই সরোবর দেখাইল, তাহার পর গাছের দিকে চলিল।

কর্কট কহিল, 'একি মামা! সরোবর রহিল এদিকে, আর তুমি আমায় লইয়া চলিলে উল্টা দিকে!' 'বেটা কি সাধের মামা পাইয়াছে রে! বেটা যেন আমার প্রাণের ভাগিনেয়! আমি কি তোর বাবার কালের গোলাম যে তোকে ঘাড়ে করিয়া বেড়াইব? বরুণ গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখিতে পাইতেছিস না? মাছগুলিকে যেমন খাইয়াছি, তোকেও তেমনি খাইব।' ইহা শুনিয়া কর্কট বলিল, 'মাছগুলা বোকা, তাই তোমার উদরস্থ হইয়াছে; আমায় কিন্তু কিছুতেই খাইতে পারিতেছ না। আমাকে খাওয়া ত দূরের কথা, আজ তুমি নিজেই মরিবে। মূর্খ, আমি যে তোমায় প্রতারিত করিয়াছি, তাহা ত তুমি বুঝিতে পার নাই। যদি মরিতে হয়, দু'জনেই মরিব। আমি তোমার গলা কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিব।' এই কথা বলিয়া সে সন্দংশের ন্যায় শক্তিশালী শৃঙ্গ দ্বারা বকের গ্রীবা নিপীড়ন করিতে লাগিল। বক যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদান করিল; তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে প্রাণভয়ে বলিল, 'প্রভু! আমি আপনাকেই খাইব না, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় প্রাণে মারিবেন না।'

কর্কট বলিল, 'বেশ কথা, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে সরোবরের তীরে চল এবং আমাকে জলে ছাড়িয়া দাও।' তখন বক সরোবরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং কর্কটের আদেশমত তাহাকে জলের ধারে কর্দ্দমমধ্যে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কর্কট জলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন কাটারি দিয়া কুমুদনল কাটে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বকের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

বরুণবৃক্ষের অধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সাধু! সাধু! বলিয়া উঠিলেন এবং মধুরস্বরে নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

প্রবঞ্চনাপরায়ণ সতত যে জন,
অবিচ্ছিন্ন সুখ তার না হয় কখন।
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রবঞ্চক
কর্কট-দংশনে মরি লভিল নরক।

*   *   *

[সমবধান—তখন জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই বক, গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই কর্কট, এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

☞ এই জাতক পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বককুলীরকের কথার বীজ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

---

৩৯. নন্দ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে সারীপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, এই ভিক্ষু প্রথমে বেশ মিষ্টভাষী ও আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অতি উৎসাহের সহিত স্থবিরের পরিচর্য্যা করিত। অনন্তর স্থবির একবার শাস্তার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যার নিমিত্ত দক্ষিণগিরি জনপদে[১] গমন করিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ ইহার এরূপ ঔদ্ধত্য জন্মে যে স্থবিরের কোন আদেশ পালন করিত না। এমন কি যদি তাহাকে কেহ বলিত 'এটী কর', তাহা হইলেই সে স্থবিরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিত। কেন যে সে এরূপ করিত স্থবির তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

স্থবির ভিক্ষাচর্য্যাবসানে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন; সেখানে আসিবামাত্র কিন্তু সেই ভিক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত শিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া স্থবির একদিন শাস্তাকে বলিলেন, 'ভগবন, 'আমার এক সার্দ্ধবিহারিক এক স্থানে এমন বিনীতভাবে চলে যে, মনে হয় যেন তাহাকে শত মুদ্রায় ক্রয় করা হইয়াছে;[২] কিন্তু অন্য স্থানে এরূপ উদ্ধত হয় যে, কিছু করিতে বলিলেই বিবাদ আরম্ভ করে।'

শাস্তা বলিলেন, 'সারীপুত্র, এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মেও কোথাও অতি বিনীত এবং কোথাও অতি উদ্ধতভাবে চলিত।' অনন্তর স্থবিরের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূম্যধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মীয় অপর এক বৃদ্ধ ভূমধ্যধিকারী এক তরুণী ভার্য্যা ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে বৃদ্ধের এক পুত্র জন্মে। বৃদ্ধ একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার স্ত্রী যুবতী; আমার মৃত্যু হইলে না জানি অন্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করিবে। তাহা হইলে সে সমস্ত ধন আমার পুত্রকে না দিয়া নিজেই ব্যয় করিয়া ফেলিবে। অতএব এখনই এই ধন পৃথিবীগর্ভে কোথাও নিহিত করিয়া রাখা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সেই বৃদ্ধ নন্দ নামক এক দাসকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলেন এবং তথায় এক স্থানে সমস্ত ধন প্রোথিত করিয়া বলিলেন, 'বাবা

[১]। মগধের দক্ষিণাংশ।

[২]। পূর্ব্বে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা ছিল। যে দাসকে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হইত তাহার পক্ষে প্রভুর সমধিক আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবার কথা।

নন্দ, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার পুত্রকে এই ধন দেখাইয়া দিবে। দেখিবে ধন তাহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে যেন কেহ এই জঙ্গল বিক্রয় না করে।'

ইহার পর বৃদ্ধ দেহত্যাগ করিলেন; যথাকালে তাঁহার পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তখন একদিন তাহার গর্ভধারিণী বলিলেন, 'বাছা, তোমার পিতা নন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমস্ত ধন বনমধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহা তুলিয়া লইয়া আইস এবং কুলসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে মন দাও। এই কথা শুনিয়া বিধবার পুত্র নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নন্দমামা, বাবা কি কোথাও ধন পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?' নন্দ কহিল, 'হাঁ প্রভু।' 'কোথায় পোতা আছে?' 'জঙ্গলের মধ্যে'। 'চল না, আমরা সেখানে গিয়া ধন লইয়া আসি।' ইহা বলিয়া সে কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া নন্দের সঙ্গে বনে প্রবেশ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ধন আছে, মামা?' নন্দ যেখানে ধন প্রোথিত ছিল ঠিক সেখানে গিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তখন হঠাৎ তাহার মনে এমন গর্ব্ব জন্মিল যে, সে প্রভুকে, 'দাসীপুত্র, এখানে ধন পাইবি কোথায়?' ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। কুমার এই সকল পরুষবাক্য শুনিয়াও যেন শুনিল না। সে কেবল বলিল, 'তবে আর এখানে থাকিয়া কি লাভ? চল আমরা ফিরিয়া যাই।' ইহার দুই দিন পরে সে আবার নন্দকে লইয়া বনে গেল, কিন্তু এবারও নন্দ তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্য বলিল। কুমার তখনও কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া গৃহে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই দাস যাইবার সময় বলে ধন দেখাইয়া দিব; কিন্তু বনমধ্যে গিয়া পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। ইহার কারণ ত কিছুই স্থির করিতে পারি না। গ্রামের ভূম্যধিকারী মহাশয় বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ব্যাপারখানা কি।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ইহার কারণ বলিতে পারেন কি?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বনের যে স্থানে দাঁড়াইয়া নন্দ তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে সেই স্থানেই তোমার পিতৃধন নিহিত আছে। অতএব আবার যখন সে তোমায় গালি দিবে, তখন 'তবে রে দাস, তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা' বলিয়া তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া ফেলিবে, কোদাল লইয়া ঐ জায়গা খুঁড়িবে এবং পৈতৃক ধন তুলিয়া উহা তাহারই কাঁধে চাপাইয়া গৃহে ফিরিবে। ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

নন্দ দাস গর্জ্জে কথা পরুষ বচনে
সেখানেই ধন আছে এই লয় মনে।
পাইবে তথায় তুমি করিলে খনন
সুবর্ণমাণিক্য আদি পৈতৃক যে ধন।

কুমার বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল, নন্দকে সঙ্গে লইয়া

যে স্থানে ধন নিহিত ছিল, পুনরায় সেখানে গেল, বোধিসত্ত্ব যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তদনুসারে চলিয়া পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইল এবং কুলসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। তদবধি সে বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল লাভ করিল।

* * *

সমবধান—তখন সারীপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক ছিল নন্দ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান ভূম্যধিকারী।

---

৪০. খদিরাঙ্গার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন :

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধশাসনের হিতকল্পে কেবল জেতবন বিহারনির্ম্মাণের জন্যই মুক্তহস্তে চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিরত্ন ভিন্ন অন্য কোন রত্নকে রত্ন বলিয়াই মনে করিতেন না। শাস্তা যখন জেতবনে বাস করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন মহা উপস্থানের[১] সময় উপস্থিত থাকিতেন—একবার প্রাতঃকালে, একবার প্রাতরাশের পর এবং একবার সায়ংকালে। তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তরূপস্থানেও যাইতেন। কিন্তু অনাথপিণ্ডদ কখনও রিক্তহস্তে বিহারে যাইতেন না, কারণ তিনি উপস্থিত হইলে শ্রামণেরা ও দহরেরা তিনি কি আনিয়াছেন দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। তিনি প্রাতঃকালে যাগু লইয়া যাইতেন, প্রাতরাশের পর ঘৃত, নবনীত, মধু ও গুড় লইয়া যাইতেন, সায়ংকালে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র লইয়া যাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন তাঁহার যে কত ব্যয় হইত তাহার সীমা পরিসীমা ছিল না। ইহার উপর আবার অন্য কতিপয় কারণেও তাঁহার অর্থহানি হইয়াছিল। অনেক বণিক সময়ে সময়ে পর্ণ[২] দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ ঋণ লইয়াছিল; কিন্তু মহাশ্রেষ্ঠী কখনও তাহাদিগকে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বলেন নাই। তিনি পিগুন পাত্রে পূর্ণ করিয়া পৈতৃক ধনের অষ্টাদশ কোটি নদীতীরে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রবল

---

[১]। কাহারও নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যার নাম উপস্থান বা পূজা। ভিক্ষুরা সকলে সমবেত হইয়া প্রতিদিন তিনবার তথাগতের পরিচর্য্যা করিতেন ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন। এই পরিচর্য্যার নাম ছিল মহা উপস্থান। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে আরও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হইত; সেগুলিকে অন্তরুপস্থান বলা হইত।

[২]। পর্ণ-খত। মনুসংহিতায় 'করণ' শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পত্র' (চিঠি) এই অর্থেও 'পর্ণ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ঝটিকায় তটদেশ বিধ্বস্ত হওয়ায় ঐ পাত্রগুলি নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিল। সেগুলির মুখের বন্ধন ও মুদ্রা যেমন, তেমনই ছিল; তাহারা সেই অবস্থায় স্রোতোবেগে গড়াইতে গড়াইতে শেষে অর্ণবকুক্ষিগত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহেও নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর উপযোগী অন্ন প্রস্তুত থাকিত। চতুর্মহাপথসঙ্গমে পুষ্করিণী খনন করিলে উহা যেমন শত শত পথিকের তৃষ্ণানিবারণ করে, অনাথপিণ্ডদের গৃহও সেইরূপ ভিক্ষুসংঘের অভাব মোচন করিত—তিনি ভিক্ষুদিগের মাতৃপিতৃস্থানীয় ছিলেন। এই নিমিত্তই স্বয়ং সম্যকসম্বুদ্ধ এবং অশীতি মহাস্থবির[১] পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে যাইতেন; অন্য যে সকল ভিক্ষু যাতায়াত করিত তাহাদের ত সংখ্যাই ছিল না।

অনাথপিণ্ডদের বাসভবন সপ্তভূমিক[২] এবং সপ্ত-দ্বার কোষ্ঠপরিশোভিত ছিল। ইহার চতুর্থ-দ্বারকোষ্ঠে এক মিথ্যাদৃষ্টিক[৩] দেবতা বাস করিতেন। যখন সম্যকসম্বুদ্ধ ঐ ভবনে প্রবেশ করিতেন, তখন উক্ত দেবতা স্বকীয় উর্দ্ধস্থ বাসস্থানে তিষ্ঠিতে পারিতেন না; তাঁহাকে পুত্রকন্যাসহ ভূতলে অবতরণ করিতে হইত। অশীতি মহাস্থবির বা অন্য কোন স্থবির উপস্থিত হইলেও তিনি এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন; কাজেই জ্বালাতন হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যতদিন শ্রমণ গৌতম ও শ্রাবকেরা এখানে আসিবে, ততদিন আমার শান্তি নাই। চিরকাল একবার উপরে যাওয়া, একবার নীচে নামিয়া আসা, এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। অতএব যাহাতে তাহারা আর এ মুখো না হতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া ঐ দেবতা একদিন যখন শ্রেষ্ঠীর প্রধান কর্ম্মচারী শয়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখা দিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' দেবতা কহিলেন, 'আমি দেবতা, এই প্রাসাদের চতুর্থ-দ্বারকোষ্ঠে বাস করি।' 'আপনার অনুমতি কি?' 'শ্রেষ্ঠী কি করিতেছেন তাহা আপনি একবারও দেখিতেছেন না। তিনি পরিণাম চিন্তা না করিয়া সঞ্চিত ধনের অপচয় করিতেছেন; তাহাতে কেবল শ্রমণ গৌতমেরই ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইতেছে; শ্রেষ্ঠী ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, বিষয়কার্য্য দেখেন না। আপনি তাঁহাকে নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতে বলুন এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতম ও তাহার শিষ্যগণ আর কখনও এ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় করুন।'

ইহা শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন, 'অয়ি নির্ব্বোধ দেবতে! শ্রেষ্ঠী তাঁহার

---

[১]। অশীতি মহাস্থবির, বুদ্ধদেবের মৌদ্গলায়ন প্রভৃতি আশিজন প্রধান শিষ্য। প্রথম সঙ্গীতিতে যে পঞ্চশত স্থবির সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা 'মহাস্থবির' নামে অভিহিত।

[২]। সপ্তভূমিক, সাততালা।

[৩]। মিথ্যাদৃষ্টিকা অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহার সংস্কার ভ্রমদূষিত।

অর্থ ব্যয় করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনের উন্নতিবিধানার্থ। শ্রেষ্ঠী যদি আমাকে চুল ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপেও বিক্রয় করেন, তথাপি আমি তাঁহাকে এরূপ কোন কথা বলিতে পারিব না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হইয়া যাও।'

আর একদিন ঐ দেবতা শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকেও উক্তরূপ পরামর্শ দিলেন এবং সেখানেও ঐরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেন। স্বয়ং শ্রেষ্ঠীকে কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

এদিকে নিরন্তর দান এবং বিষয় কর্ম্মের পরিহার এই উভয় কারণে দিন দিন শ্রেষ্ঠীর আয় হ্রাস হইতে লাগিল; তাঁহার সম্পত্তিও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। শেষে তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত হইলেন; তাঁহার অশন, বসন ও শয়ন আর পূর্ব্ববৎ রহিল না। কিন্তু এরূপ দীনদশাপন্ন হইয়াও তিনি ভিক্ষুসংঘকে দান করিতে বিরত হইলেন না; তবে পূর্ব্বের মত চর্ব্ব্যচুষ্যাদি রসনা-তৃপ্তির খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

একদিন অনাথপিণ্ডদ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'গৃহপতি, তোমার গৃহে ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে ত?' 'দেওয়া হইতেছে বটে, প্রভু, কিন্তু (তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর); পূর্ব্বদিন যে কাঞ্জিক[১] প্রস্তুত হয়, পরদিন তাহারই অবশেষ মাত্র দিয়া থাকি।' 'গৃহপতি, তুমি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য দিতে পারিতেছ না বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিও না; যদি চিত্তের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক-বুদ্ধ[২] এবং শ্রাবকদিগকে যে খাদ্য প্রদত্ত হয় তাহা কখনও অরুচিকর হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, এরূপ দানের মহাফল। যে নিজের চিত্তকে গ্রহণযোগ্য করিতে পারে তাহার দানও গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করে যাহা দান
বুদ্ধে কিংবা সঙেঘ, তাহা তুচ্ছ কভু নয়;
বুদ্ধ-পরিচর্য্যা বহু কল্যাণ-নিদান,
নহে কভু তুচ্ছ তাহা জানিবে নিশ্চয়।
লভিল অপূর্ব্ব ফল ভক্ত একজন
বিতরি কুল্মাষপিণ্ড[৩] শুষ্ক, অলবণ।

গৃহপতি, তুমি যে খাদ্য বিতরণ করিতেছ তাহা সামান্য হইলেও অষ্টবিধ[১]

---

[১]। কাঁজি অর্থাৎ আমানি। ইহা কোন কোন অঞ্চলে লোকের অতি প্রিয় পানীয়।

[২]। প্রত্যেক বুদ্ধ, যিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে নির্ব্বাণোপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং সম্যকসম্বুদ্ধ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধস্তন।

[৩]। কুল্মাষ, যে অন্ন অনেকক্ষণ থাকিয়া অম্লরসযুক্ত হইয়াছে।

সাধুপুরুষদিগের সেবায় নিয়োজিত হইতেছে। আমি যখন বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে[২] অভিহিত হইয়াছিলাম, তখন এরূপ অকাতরে সপ্তরত্ন[৩] দান করিয়াছিলাম যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে হলকর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না[৪]। পঞ্চ মহানদীর[৫] জলপ্রবাহ এক সঙ্গে মিশিলে যেমন প্রবল স্রোতের উৎপত্তি হয়, আমার দানস্রোতও সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। তথাপি আমি এমন কোন দানের পাত্র পাই নাই, যিনি ত্রিশরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা পঞ্চশীল রক্ষা করিয়া চলিতেন। না পাইবারই কথা, কারণ, দানের উপযুক্ত সৎপাত্র অতি-দুর্লভ। অতএব, তুমি যে ভক্ষ্য বিতরণ করিতেছ তাহা রসনার রুচিকর নয় বলিয়া ক্ষোভ করিও না।' ইহা বলিয়া শাস্তা বেলামক সূত্র বলিলেন।

অনাথপিণ্ডদের ঐশ্বর্য্যের সময়ে মিথ্যাদৃষ্টিকা দেবতা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে দৈন্যগ্রস্ত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, 'শ্রেষ্ঠী এখন আমার উপদেশমত কাজ করিবেন।' ইহা ভাবিয়া তিনি একদা নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখা দিলেন। অনাথপিণ্ডদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?' 'আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি।' 'কি উপদেশ দিবেন বলুন' 'শ্রেষ্ঠীবর, আপনি পরিণাম চিন্তা করেন না, পুত্র কন্যার মুখপানে চান না; আপনি শ্রমণ গৌতমের শাসনের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, অথচ বিত্তোপার্জ্জনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজেই শ্রমণ গৌতমই আপনার

---

[১]। যাঁহারা চতুর্মার্গে উপনীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ সকল মার্গেরফল লাভ করিয়াছেন, এই অষ্টবিধ সাধু।

[২]। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মদত্তের সহিত তক্ষশিলায় গিয়া একই গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং এরূপ প্রতিভার পরিচয় দেন যে, গুরু তাঁহাকে নিজের সহকারিরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে জম্বুদ্বীপের প্রায় সময় সমস্ত রাজপুত্রই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত হইয়াছিলেন। বেলামের প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তিনি ব্রহ্মদত্তের অনুমতি লইয়া উহা দীন দুঃখীকে দান করেন। সাত বৎসর সাত মাস কাল অকাতরে এই দান চলিয়াছিল। ধর্ম্মপদার্থকথা ও সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বেলামক সূত্র দেখা যায়। ইহার উদ্দেশ্য দানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জম্বুদ্বীপ' শব্দে ভারতবর্ষ বুঝায়।

[৩]। সপ্তরত্ন যথা—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মুণি (মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতি), বৈদুর্য্য, বজ্র (হীরক) এবং প্রবাল।

[৪]। মূলে 'উন্নঙ্গলম্ কত্বা' এইরূপ আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন Stirred up. এই অর্থ কিন্তু সমীচীন নহে।

[৫]। পঞ্চ মহানদী বলিলে পালি সাহিত্যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ ও মাহী এই পাঁচটীকে বুঝায়। কালকর্ণী—লক্ষ্মীছাড়া, অলক্ষ্মী।

বর্ত্তমান দীনদশার কারণ। অথচ আপনি তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিতেছেন না। অদ্যাপি শ্রমণেরা পূর্ব্ববৎ আপনার গৃহে আসিতেছে। তাহারা যাহা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবেন না সত্য; কিন্তু এখন হইতে আপনি আর গৌতমের নিকট যাইবেন না, শ্রমণদিগকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, গৌতমের দিকে কখনও মুখ ফিরাইয়াও তাকাইবেন না। আপনি নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন দিন; কুলসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের পথ দেখুন।'

ইহা শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ কহিলেন, 'তুমি কি আমাকে এই উপদেশ দিতে আসিয়াছ?' 'হাঁ, আমি এই উপদেশ দিব বলিয়াই আসিয়াছি।' 'দশবল আমাকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন যে, তোমার ন্যায় শত সহস্র দেবতাও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আমার শ্রদ্ধা সুমেরুর ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত। যে রত্নশাসনে নির্ব্বাণ লাভ হয় আমি তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছি। হে দুঃশীল, হে কালকর্ণিকে! তোমার বাক্য সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ; বুদ্ধশাসনের অনিষ্টসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অতঃপর তোমার সঙ্গে আর এক গৃহে বাস করা অসম্ভব; অতএব তুমি এখনই আমার বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও।'

অনাথপিণ্ডদ স্রোতাপন্ন ও আর্য্যশ্রাবক; কাজেই ঐ দেবতা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; তিনি বাসস্থানে গিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন, 'যদি অন্যত্র বাসের সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া এখানেই ফিরিয়া আসিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুরদেবতা জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি মনে করিয়া আসিলে?' বিতাড়িত দেবতা কহিলেন, 'প্রভু, আমি না বুঝিয়া অনাথপিণ্ডদকে একটা কথা বলিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। আপনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন এবং যাহাতে তিনি আমায় ক্ষমা করেন ও পূর্ব্ববৎ তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দেন তাহার উপায় করুন।' 'তুমি শ্রেষ্ঠীকে এমন কি কথা বলিয়াছ যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?' 'আমি বলিয়াছি যে ভবিষ্যতে গৌতম বা তাঁহার সংঘের সেবা করিবেন না এবং শ্রমণ গৌতমকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইহা ছাড়া আমি আর কিছু বলি নাই, প্রভু।' 'এ কথা বলা নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কেবল বুদ্ধ-শাসনের অনিষ্ট করা। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠীর নিকট লইয়া যাইতে পারিব না।'

পুরদেবতার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া সেই মিথ্যাদৃষ্টিকা দেবতা মহারাজ-

চতুষ্টয়ের[১] নিকট গমন করিলেন; কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন এবং আত্ম-কাহিনী বর্ণনপূর্ব্বক অতি কাতরভাবে বলিলেন, 'দেখুন, আমি নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; দয়া করিয়া আমাকে বাসোপযোগী একটু স্থান দিন।'

শক্র বলিলেন, 'তোমার কাজ অতি গর্হিত হইয়াছে, কারণ ইহা জিনশাসনের[২] অনিষ্টকর। আমি তোমার হইয়া শ্রেষ্ঠীকে কিছু বলিতে পারিব না; তবে তোমায় একটা উপায় বলিয়া দিতেছি; তাহা অবলম্বন করিলে তুমি ক্ষমা পাইবে।'

দেবতা বলিলেন, 'দয়া করিয়া তাহাই বলুন।'

'লোকে মহাশ্রেষ্ঠীর নিকট পর্ণ দিয়া অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ ঋণ লইয়াছে। তুমি তাঁহার কর্ম্মচারী (আয়ুক্তকের) বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতভাবে যক্ষবালক-পরিবৃত হইয়া ঐ সকল পর্ণসহ তাহাদের গৃহে গমন কর। এক হাতে পর্ণ ও একহাতে লেখন[৩] লইবে এবং গৃহের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া যক্ষোচিত প্রভাবের সহিত ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিবে, 'এই তোমাদের ঋণ-পর্ণ; শ্রেষ্ঠী ঐশ্বর্য্যের সময় তোমাদিগকে কিছু বলেন নাই; এখন তাঁহার দীনদশা; অতএব তোমাদিগকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।' এইরূপে যক্ষ-প্রভাব প্রদর্শন করিয়া তুমি উক্ত অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠীর শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে। শ্রেষ্ঠী অচিরবতী নদীর তীরে ধন নিহিত করিয়াছিলেন; তীরভূমি বিধ্বস্ত হওয়াতে উহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। তুমি গিয়া দৈবপ্রভাব বলে উহাও উদ্ধার কর এবং শ্রেষ্ঠীর ধনাগারে রাখিয়া দাও। অপিচ, অমুক স্থানে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আছে; তাহা অস্বামিক, অর্থাৎ ন্যায়ত এখন কেহই তাহার অধিকারী নহে। তুমি উহাও আহরণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডারে রক্ষা কর। এইরূপে চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ সংগ্রহ করিলে তোমার দণ্ডকর্ম্ম[৪] সম্পন্ন হইবে; তখন তুমি বলিবে 'মহাশ্রেষ্ঠীন, আমায় ক্ষমা করুন।'

দেবতা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং শক্র যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সেই মত কাজ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ধন সংগৃহীত হইলে তিনি নিশীথকালে শ্রেষ্ঠীর শয়নকক্ষে গিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশাসীন হইয়া দেখা দিলেন।

শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' দেবতা কহিলেন, 'মহা-শ্রেষ্ঠীন, আমি

---

[১]। ইঁহারা সর্ব্বনিম্নস্থ দেবলোকের শাসনে নিয়োজিত। ১৮১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। জিন, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ; এ অর্থে ইহা বুদ্ধাদি মহাপুরুষ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

[৩]। লেখন, রসিদ।

[৪]। শাস্তি।

আপনার চতুর্থ-দ্বারকোঠস্থ সেই অল্পবুদ্ধি দেবতা। আমি মহামোহবশত বুদ্ধের গুণ জানিতে না পারিয়া সেদিন আপনাকে অন্যায় পরামর্শ দিয়াছিলাম; এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। দেবরাজ শক্রের পরামর্শ মতে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—আপনার খাদকদিগের নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আদায় করিয়াছি; সমুদ্রগর্ভ হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণের উদ্ধার করিয়াছি এবং অমুক স্থান হইতে অষ্টাদশ কোটি অস্বামিক ধন আনিয়াছি; সমুদায়ে চুয়ান্ন কোটি ধন এখন আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাসস্থানের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি অজ্ঞতাবশত যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মনে করিবেন না; আমায় ক্ষমা করুন?'

এই কথা শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, 'এ দেবতা কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বলিতেছে; নিজের দোষও স্বীকার করিতেছে। শাস্তা ইহার বিচার করিবেন এবং ইহার নিকট নিজের গুণেরও পরিচয় দিবেন। অতএব আমি ইহাকে সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, 'দেবি! যদি ক্ষমা করিতে বল, তবে শাস্তার সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।' দেবতা বলিলেন, 'উত্তম কথা, তাহাই করিব, আমাকে শাস্তার নিকট লইয়া চলুন।' 'বেশ, তাহাই হইবে।'

অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রেষ্ঠী দেবতাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, তুমি দেখিতে পাইলে যে যতদিন পাপের পরিণাম উপস্থিত না হয়, ততদিন পাপিষ্ঠরা পাপকে পুণ্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু যখন পরিণতি জন্মে, তখন তাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ, যতদিন সৎক্রিয়ার পরিণাম দেখা না যায়, ততদিন সৎক্রিয়াশীল লোকে সৎক্রিয়াকেও পাপ বলিয়া মনে করে; কিন্তু পরিণাম দেখিতে পাইলে উহা পুণ্য বলিয়া জানে।'

অনন্তর তিনি ধর্ম্মপদের এই দুইটী গাথা বলিলেন :

যতদিন পাপের না পরিণতি হয়,
পুণ্যজ্ঞানে পাপ করে পাপী অতিশয়;
কিন্তু পাপ-পরিণাম দিলে দরশন,
বুঝে তারা কত পাপে ছিল নিগমন।
পুণ্যাত্মার মনে এই শঙ্কা অবিরত,
পুণ্যজ্ঞানে পাপ বুঝি করিতেছি কত;
কিন্তু যবে পুণ্য ফল দেখা দেয় আসি,
নিঃসংশয় হন তাঁরা আনন্দেতে ভাসি।

এই উপদেশে উক্ত দেবতা স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন এবং শাস্তার

চক্রলাঞ্ছিত পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, 'আমি রিপুপরতন্ত্র, পাপাসক্ত, মোহাচ্ছন্ন এবং অবিদ্যান্ধ; এই জন্য আপনার গুণ জানিতে পারি নাই, আপনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠীকেও কুপরামর্শ দিয়াছিলাম। এখন আমায় ক্ষমা করুন।' তখন শাস্তা ও শ্রেষ্ঠী উভয়েই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ শাস্তার সমক্ষে নিজেই নিজের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভগবন, এই দেবতা আমাকে 'বুদ্ধের সেবা করিও না' বলিয়া কত বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই আমার মতি ফিরাইতে পারেন নাই; 'দান করিও না' বলিয়াছেন, তথাপি আমি দান হইতে বিরত হই নাই। ইহা কি আমার পক্ষে গুণের পরিচায়ক নহে?'

শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, তুমি স্রোতাপন্ন ও আর্য্য শ্রাবক; তোমার শ্রদ্ধা অচলা, তোমার জ্ঞান বিশুদ্ধ। অতএব এই অল্পশক্তিসম্পন্ন দেবতা যে তোমাকে বিপথে লইতে পারেন নাই ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, যখন জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, সেই অতীত কালেও পণ্ডিতেরা যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। তখন কামলোকেশ্বর মার[১] মধ্যাকাশে অবস্থিত হইয়া অশীতি হস্ত পরিমিত জ্বলদঙ্গারপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'সাবধান, যদি দান কর, তবে এই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।' কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা ভীত হন নাই।' অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাজপুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীপদে নিয়োজিত হইলেন এবং নগরে একটী দানশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটী নগরের দ্বার-চতুষ্টয়ের

---

[১]। মার বা বশবর্ত্তী মার বৌদ্ধ মতে সর্ব্ববিধ পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজক। বৌদ্ধেরা তিনজন প্রধান দেবতার কথা বলেন—শক্র, মহাব্রহ্মা এবং মার। ইঁহাদের মধ্যে শক্র ও মার কামদেবলোকের অধিপতি। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দান ধর্ম্মের ফলে এই উচ্চপদ লাভ করিয়াও মার মনুষ্যকে পাপ পথে লইতেই আনন্দ বোধ করে। ইহার তিন কন্যা—তৃষ্ণা, রতি ও অরতি অর্থাৎ ক্রোধ। ইহাদের অত্যাচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিব্রত। সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখন মার তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভিক্ষুরা গ্রামে প্রবেশ করিলে মার গ্রামবাসীদিগের হৃদয় কঠোর করিয়া তুলে; তাহারা ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ফলত খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের পক্ষে যেমন শয়তান, বৌদ্ধদিগের পক্ষে সেইরূপ মার। সংস্কৃত ভাষায় মদনদেবের নামান্তর 'মার'।

নিকট, একটী নগরের মধ্যভাগে এবং একটী তাঁহার নিজ বাসভবনের পার্শ্বে নির্ম্মিত হইল। তিনি এই সকল স্থানে প্রচুর দান করিতেন এবং শীলসমূহের পালন ও যথাশাস্ত্র প্রাতিমোক্ষ[১] শ্রবণ করিয়া চলিতেন।

একদিন এক প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহস্থায়ি-সমাধিভঙ্গের পর ভিক্ষাচর্য্যাবেলা সমাগত দেখিয়া ভাবিলেন, আজ বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষা করা যাউক। তখন তিনি তাম্বুল-লতাখণ্ড দ্বারা দন্তধাবন করিলেন, অনবতপ্তদ্রুহে[২] মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মনঃশিলাতলে দণ্ডায়মান হইলেন, কটিবন্ধ গ্রহণ করিলেন, চীবর পরিধান করিলেন এবং যোগবলে মৃন্ময়পত্র আহরণপূর্ব্বক, যখন বোধিসত্ত্বের প্রাতরাশের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ও মুখরুচিকর খাদ্য আনীত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আকাশপথে তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ভৃত্য কহিল, 'আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আর্য্যের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস।'

তন্মুহূর্ত্তেই পাপিষ্ট মার নিতান্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'এই প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহকাল কিছুই ভক্ষণ করে নাই; আজ যদি অনাহারে থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত মারা যাইবে। অতএব শ্রেষ্ঠী যাহাতে ইহাকে খাদ্য দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা তখনই মায়াবলে বোধিসত্ত্বের গৃহে অশীতি হস্ত বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড কূপ আবির্ভাবিত করিয়া উহা প্রজ্জ্বলিত খদিরাঙ্গারে পূর্ণ করিয়া রাখিল। উহা হইতে এমন ভীষণ জ্বালার উৎপত্তি হইল যে, বোধ হইল সেখানে অবীচির আবির্ভাব হইয়াছে। এই কূপ সমাপ্ত হইলে মার আকাশে বসিয়া রহিল।

এ দিকে যে ভৃত্য প্রত্যেক-বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র আনিতে যাইতেছিলেন সে ঐ কূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ফিরিলে কেন, বাপু?' সে কহিল, 'প্রভু, পথে এক ভয়ঙ্কর জ্বলদঙ্গারপূর্ণ কূপের আবির্ভাব হইয়াছে; তাহার এমন ভীষণ জ্বালা যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।' তাহার পর অন্যান্য ভৃত্যেরাও যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া এত ভয় পাইল যে তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিল।

---

[১]। প্রাতিমোক্ষ, বিনয়পিটকের অংশবিশেষ ভিক্ষুদিগের অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মসমষ্টি। ইহা প্রতি উপোসথ দিনে পঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নিয়ম পাঠ করা হইলে ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহারা কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি না।

[২]। অনবতপ্তদ্রুহ—হিমালয়স্থ হ্রদবিশেষ; ইহার জলের বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক উল্লেখ দেখা যায়।'দ্রুহ' কাছ হইতে বাঙ্গালা 'দহ' হইয়াছে।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, 'আজ কূটকর্ম্মা মার আমার দানের অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, শত, সহস্র মারেও আমাকে কিরূপে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে। দেখিতে হইবে কাহার ক্ষমতা অধিক, আমার না মারের।' অনন্তর পার্শ্বে যে অন্নপাত্র ছিল তাহাই হাতে লইয়া তিনি নিজে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপনীত হইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে হে তুমি?' 'আমি মার।' 'তুমিই কি এই প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছ?' 'হাঁ, আমিই করিয়াছি।' 'কেন করিলে?' 'তোমার দানে বাধা দিবার জন্য এবং এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবননাশের জন্য।' 'আমি তোমাকে দানে বাধা দিতে দিব না, এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবনও নাশ করিতে দিব না। আজ দেখিতে হইবে আমার মধ্যে কাহার প্রভাব অধিক, তোমার না আমার।'

অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুণ্ডের ধারেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'ভগবন প্রত্যেক-বুদ্ধ, এই কুণ্ডের মধ্যে অধঃশিরে পড়িতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি আমি ফিরিয়া যাইব না। আমার কেবল এই প্রার্থনা আপনার জন্য যে ভোজ্য আনিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন।'

অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন—
সেও ভাল; মন যেন তবু নাহি ধায়
কখন (ও) অনার্য্যপথে, ত্যজি দানব্রত।
অতএব দয়া করি লও প্রভু, তুমি
এই ভক্ষ্য ভোজ্য, যাহা এনেছি যতনে।
হউক সার্থক আজি দাসের জীবন।

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্নভাণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সেই অঙ্গারের উপর পাদ-বিক্ষেপ করিলেন, অমনি অশীতিহস্ত পরিমিত কুণ্ডের তল হইতে এক অপূর্ব্ব মহাপদ্ম উত্থিত হইল। উহার রেণুরাশি তাঁহার মস্তকোপরি প্রক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তিনি (সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর) দাঁড়াইয়া প্রত্যেক-বুদ্ধের ভাণ্ডে ভোজ্য ঢালিয়া দিলেন।

প্রত্যেক-বুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভাণ্ডটী আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে স্বয়ং আকাশমার্গে হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমন-পথটী নানা আকারযুক্ত মেঘপঙ্‌ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মারও পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্নমনে স্বস্থানে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব সেই পদ্মোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সমবেত জনসমূহকে শীলাদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন

এবং শেষে সকলকে সঙ্গে লইয়া বাসগৃহে প্রতিমগন করিলেন। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকান্তর প্রস্থান করেন।

* * *

[কথাবসানে শাস্তা বলিলেন, 'তবেই দেখিতেছ তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে দেবতার কথায় কর্ণপাত করে নাই, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীত যুগের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পুরুষদিগের কার্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর।'

সমবধান—ঐ প্রত্যেক-বুদ্ধ দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, কাজেই তাঁহার আর জন্ম হয় নাই। তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

---

৪১. লোশক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে লোশক তিষ্য নামক জনৈক স্থবির সম্বন্ধে এই কথা বলেন। লোশক তিষ্য কোশলদেশস্থ কোন কৈবর্ত্তের কুলক্ষয়কর পুত্র। তিনি এমনই দুরদৃষ্ট ছিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরেও তাঁহার ভাগ্যে ভিক্ষা মিলিত না। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে হাজার ঘর কৈবর্ত্তের বাস ছিল; তাহারা প্রতিদিন জাল লইয়া সরিত্তড়াগাদিতে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু যেদিন লোশক জননী-জঠরে প্রবেশ করিল, সেদিন কাহারও ভাগ্যে চুণাপুঁটিটা পর্য্যন্ত জালে পড়ে নাই। তদবধি তাহাদের মুহুর্মুহু বিপদ ঘটিতে লাগিল; লোশক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গ্রামখানি সাত বার অগ্নিদগ্ধ হইল, সাত বার রাজার কোপে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিল। কাজেই অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল, 'পূর্ব্বে ত আমরা বেশ ছিলাম; এখন আমাদের এরূপ দুর্গতি হইল কেন? নিশ্চিত আমাদের মধ্যে কোন কালকর্ণী প্রবেশ করিয়াছে। এস, আমরা দুই দলে ভাগ হইয়া দেখি, কোন দলে সে অধিষ্ঠান করে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইল; প্রত্যেক দলে রহিল পঞ্চশত কৈবর্ত্ত-পরিবার। অতঃপর যে দলে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণী থাকিল, তাহাদেরই বিপত্তি ঘটিল। তখন সেই দুর্দ্দশাপন্ন পাঁচ শ ঘর আবার দুই দলে বিভক্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ভাগ করিতে করিতে তাহারা অবশেষে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণীকে অপর সকল পরিবার হইতে পৃথক করিল এবং বুঝিতে পারিল তাহাদেরই ঘরে কালকর্ণীর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তাহারা ঐ কৈবর্ত্তদম্পতীকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিল।

লোশকের গর্ভধারিণী অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল এবং যথাকালে লোশককে প্রসব করিল। যাঁহারা কর্ম্মফল-ভোগার্থ চরম জন্ম লাভ করেন, তাঁহাদের অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণনাশ অসম্ভব, কারণ কলসীর গর্ভে প্রদীপ রাখিলে যেমন উহা বাহির হইতে লক্ষ্য না হইলেও ভিতরে দীপ্তমান থাকে, তাঁহাদের মনেও সেইরূপ অর্হত্ত্বলাভের বাসনা বলবতী থাকে, কিন্তু কেহ তাহা বাহির হইতে উপলব্ধি করিতে পারে না। লোশকের জননী পুত্রের লালনপালন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যখন বড় হইয়া ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন, তখন একদিন তাঁহার হাতে একখানা খাপরা দিয়া 'ঐ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যা' বলিয়া তাঁহাকে এক গৃহস্থের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে সেই অবসরে পলাইয়া গেল। এইরূপে লোশক সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন; তিনি উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া ক্ষুধা শান্তি করিতেন, যখন যেখানে পারিতেন নিদ্রা যাইতেন; তাঁহার স্নান ছিল না, শরীর মলে আচ্ছন্ন থাকিত। ফলত তিনি পাংশুপিশাচের[১] ন্যায় অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেন। লোকে হাঁড়ি ধুইয়া গৃহের বাহিরে জল ফেলিত; উহার সঙ্গে যে দুই একটা ভাত থাকিত, তাহাই তিনি কাকের ন্যায় একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইতেন।

এইরূপে ক্রমে লোশকের সাত বৎসর বয়স হইল। একদিন ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'অহো, এই হতভাগ্যের বাড়ী কোথায়?' এবং করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, 'এস বৎস, আমার নিকট এস।' লোশক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ধর্ম্ম-সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমার মাতা-পিতা কে, বাড়ী কোথায়?' 'মহাশয়, আমি নিতান্ত অসহায়। মা বাপ আমাকে লইয়া জ্বালাতন হইয়াছিলেন; তাঁহারা আমায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।' 'তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাও?' 'চাইব না কেন? কিন্তু আমার মত হতভাগ্যকে কে প্রব্রজ্যা দিবে?' 'আমি দিব।' 'তবে দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন।' তখন সারীপুত্র লোশককে খাওয়াইলেন, সঙ্গে করিয়া বিহারে ফিরিলেন, স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিলেন এবং প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে যথাকালে উপসম্পদা দান করিলেন।

বৃদ্ধবয়সে এই বালক 'স্থবির লোশক তিষ্য' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার এমনই দোষ ছিল যে, তিনি কখনও পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা পাইতেন না। যেস্থানে প্রভূত দানের ঘটা হইত, সেখানেও তাঁহার পেট পুরিয়া আহার জুটিত না; যাহা না হলে দেহরক্ষা অসম্ভব, তিনি কেবল তাহাই পাইতেন। তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে

---

[১]। পুরীষাশী প্রেত। ইহাদের জঠর গুহার ন্যায়, অথচ মুখবিবর সূচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

এক হাতা যাগু দিলেই বোধ হইত যেন উহা পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই উহাতে আর ধরিবে না বলিয়া লোকে অবশিষ্ট যাগু তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর ভিক্ষুকে দান করিত। এরূপও শুনা যায়, তাঁহাকে যাগু দিবার সময় পরিবেষণকারীর পাত্র হইতে সহসা অবশিষ্ট যাগু অন্তর্হিত হইত। লুচি, কচুরি প্রভৃতি চর্ব্ব্য খাদ্য বন্টন করিবার সময়ও ঠিক এইরূপ ঘটিত। লোশক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশ তত্ত্বদর্শী হইলেন, অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু ভিক্ষা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার অদৃষ্ট-দোষ খণ্ডিল না।

অবশেষে লোশকের কাল পূর্ণ হইল, যে কর্ম্মফলে তিনি এত কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার পর্য্যবসান হইল, তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত হইল। ধর্ম্ম-সেনাপতি ধ্যানযোগে বুঝিতে পারিলেন, লোশক সেইদিনই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'আজ ইঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করাইতে হইবে।' তিনি লোশককে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং সারীপুত্র ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই বহু-জনাকীর্ণ নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লোশক সঙ্গে ছিলেন বলিয়া সেদিন ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার অভিবাদন পর্য্যন্ত করিল না। তখন সারীপুত্র লোশককে বলিলেন, 'আপনি বিহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক আসনশালায় অবস্থিতি করুন,[১] আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিব।' লোশক বিহারে ফিরিয়া গেলেন, সারীপুত্র আবার ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন, এবং যাহা পাইলেন তাহা 'লোশককেও দিও' বলিয়া বিহারে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু যাহারা ঐ খাদ্য লইয়া গেল, তাহারা লোশকের কথা ভুলিয়া গেল এবং নিজেরাই সমস্ত খাইয়া ফেলিল।

এদিকে সারীপুত্র বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লোশকের নিকট গমন করিলেন। লোশক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে সারীপুত্র জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনার জন্য যে ভোজ্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছেন কি?' লোশক বলিলেন, 'যথাসময়ে পাইব বৈ কি।' ইহা শুনিয়া সারীপুত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং বেলা কত হইয়াছে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল; সারীপুত্র লোশককে আসনশালাতেই অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া কোশলরাজের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা পরিচারকদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইতে আদেশ দিলেন এবং মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং অন্ন আহার করিবার সময় নাই দেখিয়া উহা মধু, ঘৃত, নবনীত ও শর্করা

---

[১]। অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের উপবেশন করিবার ঘর।

দ্বারা পূর্ণ করাইয়া দিলেন।[১] সারীপুত্র তাহা লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন এবং 'আসুন মহাশয়, এই চতুর্মধুর[২] ভোজন করুন' বলিয়া লোশকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভক্তিভাজন সারীপুত্র তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এই চিন্তায় লোশকের বড় লজ্জা হইল, তিনি খাইতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সারীপুত্র বলিলেন, 'আসুন, বিলম্ব করিবেন না, আমাকে এই পাত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; আপনি উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হউন; আমার হাত ছাড়া হইলে পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইবে।'

তখন মহাত্মা ধর্ম্ম-সেনাপতি পাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্থবির তিষ্য তাহা হইতে আহার আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম-সেনাপতির পুণ্যবলে সেদিন পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইতে পারিল না, স্থবির তিষ্য জন্মের মধ্যে একবার তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই দিনই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার চিতাভস্ম সংগ্রহপূর্ব্বক তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন।

তদনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, লোশকের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় দেখা যায় না। তিনি একদিনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু এত মন্দভাগ্য হইয়াও তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'লোশক নিজ কর্ম্মফলেই পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা লাভ করেন নাই, আবার নিজ কর্ম্মফলেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত জন্মে তিনি অন্যের প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন; সেই পাপে তিনি এ জন্মে এত অল্প পাইয়াছেন; কিন্তু অতীত জন্মে তিনি সংসার দুঃখময় এবং অনিত্য, কোন পদার্থের স্থায়িভাব নাই ইত্যাদি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন; এই পুণ্যবলে এ জন্মের অবসানে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

[১]। মধ্যাহ্নের পর বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে অন্ন বা তৎসদৃশ সজল খাদ্য নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ভিক্ষুগণ ভূতলে লম্বভাবে দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়া দর্শনে সময় নিরূপণ করিতেন।

[২]। মধু, ঘৃত, নবনীত এবং শর্করা এই চারি দ্রব্যকে চতুর্মধুর বলে। ইহার সহিত 'পঞ্চামৃত' শব্দটীর তুলনা করা যাইতে পারে।

পুরাকালে সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের[১] সময়ে কোন গ্রামে এক শীলবান, ধর্ম্মপরায়ণ ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী স্থবির বাস করিতেন। ঐ গ্রামের ভূ-স্বামী তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্যত্র একজন অর্হৎ ছিলেন; তিনি সজ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সহিত সমভাবে বাস করিতেন, 'আমি প্রধান' কখনও এরূপ ভাবিতেন না। একদিন এই মহাত্মা উল্লিখিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ভূস্বামীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি ঐ গ্রামে পদার্পণ করেন নাই; তথাপি তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়াই ভূস্বামী এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে সসম্মানে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আহারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখে কিয়ৎক্ষণ মাত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ভূস্বামী বলিলেন, 'প্রভু, দয়া করিয়া অদূরে আমাদের যে বিহার আছে সেখানে গিয়া বিশ্রাম করুন; আমি অপরাহ্নে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।' অর্হৎ তাহাই করিলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতি শিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। স্থবিরও পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসিলেন। অর্হৎ বলিলেন, 'হাঁ, আহার হইয়াছে।' 'কোথায় আহার করিলেন?' 'এই গ্রামেই; ভূস্বামীর গৃহে।' অনন্তর আগন্তুক কোথায় অবস্থিতি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন; নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও চীবর ত্যাগ করিলেন এবং আসনগ্রহণান্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গ-ফলপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বেলাবসানে ভূস্বামী ভৃত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও সতৈল প্রদীপ লইয়া বিহারে উপনীত হইলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ এখানে এক অর্হনের অতিথি হইবার কথা ছিল; তিনি আসিয়াছেন কি?' স্থবির বলিলেন, 'হাঁ, তিনি আসিয়াছেন।' 'তিনি কোথায়?' 'অমুক প্রকোষ্ঠে।' তাহা শুনিয়া ভূস্বামী অর্হনের নিকট গেলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে

---

[১]। ইনি গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। 'বুদ্ধ' বলিলে অসীম ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। তিনি সংসারার্ণবের কাণ্ডারী এবং নির্ব্বাণদাতা। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কোটিকল্পকাল জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া শীলাদি রক্ষাপূর্ব্বক চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। শেষে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন; জনসাধারণ তাঁহার শাসনানুসারে পরিচালিত হয়। মৃত্যুর পর বুদ্ধের আর অস্তিত্ব থাকে না; তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; কালসহকারে লোকে তাঁহার শাসনও ভুলিয়া যায়। তখন আবার নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে যুগে যুগে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে এবং হইবে। বৌদ্ধ মতে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম এই : দীপঙ্কর, কৌণ্ডিণ্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনবদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধা, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিপস্সী (বিদর্শী), শিখী, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশ্যপ। অতঃপর যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, তাঁহার নাম মৈত্রেয়।

উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মকথা শুনিলেন। শেষে সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা হইল, তখন তিনি চৈত্যে ও বোধিদ্রুমে পূজা দিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন এবং অর্হৎ ও স্থবির উভয়কেই পরদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিহারবাসী স্থবির ভাবিলেন, 'ভূস্বামী দেখিতেছি আমার হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছেন। যদি এই অর্হৎ এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আমার কোন প্রতিপত্তি থাকিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে আগন্তুক ঐ বিহারে চিরদিন বাস করিবার সঙ্কল্প না করেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। উপস্থান-সময়ে অর্হৎ যখন তাঁহাকে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন স্থবির তাঁহার বাক্যলাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। আগন্তুক তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই স্থবির বুঝিতে পারিতেছেন না যে ভূস্বামীর নিকটে বা ভিক্ষুসঙ্ঘে ইঁহার যে প্রতিপত্তি আছে, আমি কখনই তাহার অন্তরায় হইব না।' অনন্তর তিনি প্রকোষ্ঠে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গ-ফলপ্রাপ্তিজনিত সুখসুধা পান করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে বিহারবাসী স্থবির আস্তে আস্তে কাঁসরে ঘা দিয়া এবং নখপৃষ্ঠ দ্বারা দ্বারে আঘাত করিয়া একাকী ভূস্বামী-গৃহে চলিয়া গেলেন।[১] ভূস্বামী তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, 'আগন্তুক কোথায়?' স্থবির বলিলেন, 'আমি আপনার বন্ধুর কোন সংবাদ রাখি না। আমি কাঁসর বাজাইলাম, দরজায় ঘা দিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে জাগাইতে পারিলাম না। বোধ হইতেছে কল্য তিনি এখানে যে সমস্ত চর্ব্ব্যচূষ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জীর্ণ করিতে পারেন নাই; কাজেই এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাক্রান্ত রহিয়াছেন। এরূপ লোকের প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই, দেখিতেছি, আপনি নিজেও প্রীতিলাভ করেন।'

এদিকে সেই অর্হৎ ভিক্ষাচর্য্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র ও চীবরসহ আকাশপথে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভূস্বামী বিহারবাসী স্থবিরকে ঘৃত, মধু, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ভোজন করাইলেন এবং সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা তাঁহার পাত্র পরিষ্কারপূর্ব্বক পুনরায় উহা পায়স পূর্ণ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, বোধহয় অর্হৎ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন;

---

[১]। বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্তে কাঁসর বাজাইবার ও দ্বারে আঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমবাসী স্থবিরের ইচ্ছা নয় যে, অর্হৎ জাগরিত হন; অথচ বিহারের নিয়ম পালন না করিলেও চলে না। এই জন্য তিনি যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাঁসর বাজাইয়া ও দ্বারে আঘাত করিয়া দুই দিক্ই রক্ষা করিলেন।

আপনি তাঁহার জন্য এই পায়স লইয়া যান।' স্থবির কোন আপত্তি না করিয়া উহা হাতে লইলেন এবং চলিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, 'এই অর্হৎ যদি একবার এরূপ পরমান্নের আস্বাদ পান, তাহা হইলে গলাধাক্কা বা লাথি ঝাঁটা খাইলেও এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কি করিয়াই বা ইঁহাকে তাড়াইতে পারা যায়? এই পায়স যদি অপর কাহাকেও খাইতে দি, তাহা হইলে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; জলে ঢালিয়া ফেলিলে উপরে ঘি ভাসিয়া উঠিবে; ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে দেশসুদ্ধ কাক আসিয়া জুটিবে।' মনে মনে এইরূপ তোলাপাড়া করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক দগ্ধক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি উহার এক প্রান্তে অঙ্গার রাশীকৃত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পায়স ঢালিয়া দিলেন এবং তদুপরি আরও অঙ্গার চাপা দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে অর্হৎকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ঐ মহাত্মা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়াই আপনা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

তখন, 'হায়, উদরের জন্য কি পাপ করিলাম!' বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ অনুতাপ জন্মিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রেতবৎ অস্থিচর্ম্মসার হইলেন এবং মৃত্যুর পর নিরয়গমনপূর্ব্বক শতসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। অনন্তর সেই পরিপক্ক পাপফলে তিনি পঞ্চশতবার উপর্য্যুপরি যক্ষযোনি লাভ করিলেন। ঐ সকল জন্মে তিনি কেবল এক এক বার উদর পূর্ণ করিয়া গর্ভমল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কালে কোন দিনই তাঁহার ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত আহার জুটে নাই। ইহার পর তাঁহাকে আবার পঞ্চশতবার কুক্কুররূপে জন্মিতে হইয়াছিল। কুক্কুর জন্মেও তিনি একদিন মাত্র বমিত অন্নে উদরপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুক্কুরলীলাবসানে তিনি পুনর্ব্বার নরত্ব লাভ করিয়া কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মিত্রবিন্দক' এই নামে অভিহিত হন। মিত্রবিন্দকের অদৃষ্টদোষে সেই দুর্গত পরিবারের দুর্গতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; কাজেই দেহধারণের জন্য তাঁহার ভাগ্যে কাঞ্জিক ভিন্ন আর কিছু জুটিত না; তাহাও এত অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইত, যে কোন দিনই উদরস্থ খাদ্য নাভির উপরে উঠিত না। তাঁহার মাতাপিতা আর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তাঁহাকে 'দূর হ, কালকর্ণী' বলিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসী-বাসীদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। পিতৃপরিত্যক্ত মিত্রবিন্দক যখন ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি এই প্রথার মাহাত্ম্যে বোধিসত্ত্বের

পুণ্যশিষ্যরূপে[১] বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিত্রবিন্দকের প্রকৃতি অতি পরুষ ও দুর্দ্দান্ত ছিল; তিনি সর্ব্বদা সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মারামারি করিতেন, দণ্ডভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এরূপ ছাত্র থাকায় বোধিসত্ত্বের পাঠশালার নিন্দা হইল, তাঁহার আয়ও কমিল। এদিকে মিত্রবিন্দক বালকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া এবং গুরুপদেশ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শেষে একদিন পলায়ন করিলেন এবং নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে[২] উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি মজুর খাটিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এক অতি দরিদ্রা নারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মিল।

অতঃপর গ্রামবাসীরা সুশাসন কাহাকে বলে,[৩] দুঃশাসন কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তাহারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করিল এবং বাসের জন্য গ্রামদ্বারে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু মিত্রবিন্দক সেখানে বাস করিতেছেন, এই একমাত্র কারণে গ্রামবাসীরা অচিরে রাজার কোপভাজন হইল এবং একবার নয়, দুইবার নয়, সাতবার দণ্ডভোগ করিল। তাহাদের গৃহগুলিও সাতবার ভস্মীভূত হইল এবং জলাশয়গুলি সাতবার শুকাইয়া গেল।

তখন তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, 'মিত্রবিন্দকের আগমনের পূর্ব্বে ত আমরা বেশ সুখে ছিলাম; কিন্তু তিনি আসিয়াছেন অবধি আমাদের নিত্য নূতন বিপদ ঘটিতেছে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা মিত্রবিন্দককে লগুড়প্রহারে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। মিত্রবিন্দক সপরিবারে বিচরণ করিতে করিতে এক রাক্ষসসেবিত বনে উপনীত হইলেন। সেখানে রাক্ষসেরা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে মারিয়া খাইল; তিনি নিজে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন এবং বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সাগরতীরবর্ত্তী গম্ভীরা নামক পট্টনে উপনীত হইলেন। সেদিন ঐ পট্টন হইতে একখানি অর্ণবপোত ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক ইহার একজন কর্মচারী হইয়া পোতে আরোহণ করিলেন। পোতখানি পট্টন ছাড়িবার পর সপ্তাহকাল বেশ চলিল; কিন্তু তাহার পর সাগরবক্ষে এমন নিশ্চল হইয়া রহিল যে, বোধ হইল যেন উহা কোন মগ্ন শৈলে সংলগ্ন হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে। কোন কালকর্ণীর অদৃষ্ট দোষে এরূপ দুর্দ্দৈব সংঘটন হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, পোতারোহিগণ সেই কালকর্ণী কে, তাহা জানিবার জন্য

---

[১]। ইংরাজীতে যাহাকে charity scholar বলা যায়। এরূপ ছাত্রের ব্যয়ভার তাহার আত্মীয় স্বজন বহন করে না; দান ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। মিত্রবিন্দকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনাথাশ্রম অবিদিত ছিল না।

[২]। রাজ্যের সীমাসন্নিহিত গ্রাম (frontier village)।

[৩]। শাসন অর্থাৎ ধর্ম্ম।

গুটিকাপাত[১] করিল। এই গুটিকাপাতে সাতবারই মিত্রবিন্দকের নাম উঠিল। তখন তাহারা একখানি বাঁশের ভেলার সহিত মিত্রবিন্দককে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল; পর মুহূর্ত্তেই পোতখানি নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

মিত্রবিন্দক অতিকষ্টে ভেলায় চড়িয়া বসিলেন এবং তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় শীলাদিপালন করিয়া তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রভাবে তিনি সমুদ্রবক্ষে এক স্ফটিক-বিমানে[২] চারি জন দেবকন্যা দেখিতে পাইয়া তাহাদের সহিত এক সপ্তাহ সুখে বাস করিলেন। বিমানবাসী প্রেতেরা পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহ কাল সুখ ও সপ্তাহ কাল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কাজেই সপ্তাহান্তে তাহাদিগকে দুঃখ ভোগার্থ অন্যত্র গমন করিতে হইল। তাহারা মিত্রবিন্দককে বলিয়া গেল, 'আমরা প্রতিগমন না করা পর্য্যন্ত তুমি এইখানে অবস্থিতি কর।' কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিবামাত্রই মিত্রবৃন্দক ভেলায় চড়িয়া এক রজত বিমানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আট জন দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেখান হইতেও যাত্রা করিয়া অগ্রে মণিময় বিমানে ষোল জন এবং পরে কাঞ্চনময় বিমানে চব্বিশ জন দেবকন্যা নয়নগোচর করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভেলা চালাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে দ্বীপপুঞ্জমধ্যস্থ এক যক্ষপুরীতে উপনীত হইলেন। সেখানে এক যক্ষিণী ছাগীর দেহধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক তাহাকে যক্ষিণী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, ছাগী ভাবিয়া মাংসলোভে মারিবার আশায় তাহার পা ধরিয়া ফেলিলেন। সে যক্ষিণী-সুলভ প্রভাববলে তাঁহাকে এমন বেগে উৎক্ষেপণ করিল যে, তিনি আকাশমার্গে সমুদ্র পার হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসী নগরের কণ্টকসমাকীর্ণ এক পরিখাপৃষ্ঠের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে গিয়া থামিলেন।

ঐ পরিখার নিকট রাজার ছাগল চরিত। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তস্করেরা সুবিধা পাইলেই উহাদিগকে দুই একটী অপহরণ করিত। কাজেই ছাগপালকেরা চোর ধরিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিত।

মিত্রবিন্দক দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন 'সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপে একটা ছাগের পা ধরিয়াছিলাম বলিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; হয় ত ইহাদের একটার পা ধরিলে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই

---

[১]। ঠিক গুটিকাপাত নহে; ইহা এক প্রকার কাষ্ঠশলাকা দ্বারা সম্পাদিত হইত।

[২]। বিমান বলিলে দেবরথ এবং সপ্তভূমিক দেবনিকেতন, উভয়ই বুঝায়। ইহা স্বয়ংগতি। রাবণের বিমান পুষ্পকনামে প্রসিদ্ধ। এখানে যে দেবকন্যাদিগের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা প্রেতভাবাপন্না মায়াবিনী বিশেষ।

বিমানবাসিনী দেবকন্যাদিগের নিকট গিয়া পড়িব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে একটা ছাগের পা ধরিলেন; ছাগটা ভ্যা ভ্যা করিয়া উঠিল; অমনি চারিদিক হইতে ছাগপালকেরা ছুটিয়া আসিল এবং 'ব্যাটা, এতকাল চুরি করিয়া রাজার ছাগল খাইয়াছ' বলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও মারিতে মারিতে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

এমন সময় বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ব্রাহ্মণশিষ্য পরিবৃত হইয়া স্নানার্থ বাহির হইতে ছিলেন। তিনি দেখিবামাত্রই মিত্রবিন্দককে চিনিতে পারিলেন এবং ছাগপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে বাপু সকল, এ ব্যক্তি যে আমার শিষ্য; তোমরা ইহাকে ধরিয়াছ কেন?' তাহারা বলিল, 'ঠাকুর, এ ব্যাটা চোর, একটা ছাগলের পা ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ধরা পড়িয়াছে। 'আচ্ছা, ইহাকে আমায় দাও না কেন? এ আমার দাস হইয়া থাকিবে।' 'বেশ কথা, তাহাতে আপত্তি কি?' বলিয়া, তাহারা মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিত্রবিন্দক, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?' মিত্রবিন্দক তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'হিতৈষীদিগের উপদেশ না শুনিয়াই এ হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

হিতকাম সুহৃদের মধুর বচন
তুচ্ছ করি উড়াইয়া দেয় যেইজন,
নিশ্চয় সে মূঢ় হয় লাঞ্ছনা-ভাজন,
অজপদ ধরি, দেখ, মিত্রক যেমন।'

অতঃপর অধ্যাপক ও মিত্রবিন্দক উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন স্থবির তিষ্য ছিলেন মিত্রবিন্দক ও আমি ছিলাম সেই লোকবিখ্যাত অধ্যাপক।]

☞ মিত্রবিন্দকের ভ্রমণবৃত্তান্তের সহিত হোমার-বর্ণিত ওডিসিয়ূসের এবং আবরদেশীয় নৈশ উপাখ্যানবলী বর্ণিত সিন্দবাদের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিত্রবিন্দকের কথাই উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের বীজস্বরূপ; তৎপরিদৃষ্ট দেবকন্যাগণ হোমার বর্ণিত সাসি, সাইরেণ, কালিপ্সো প্রভৃতি মায়াবিনীদিগের আদিপ্রকৃতি। সিন্দবাদ যেরূপে বহুবার সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এক একবার এক এক রূপ বিপদে

পতিত হইয়াছিলেন মিত্রবিন্দকের সম্বন্ধেও সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায় (৮২, ১০৪, ৩৬৯ ও ৪৩৯ সংখ্যক জাতক দ্রষ্টব্য)।

---

৪২. কপোত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা একদিন শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভগবন, এই ভিক্ষু বড় লোভী।' শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন হে, এ কথা সত্য না কি?' সে বলিল, 'হাঁ প্রভু।' 'তুমি অতীতকালেও লোভহেতু প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমার দোষে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাহারাও স্বকীয় আবাস স্থান হইতে নিষ্কাষিত হইয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীবাসীরা পুণ্যকামনায় পক্ষীদিগের সুবিধা ও আশ্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে খড় দিয়া ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রন্ধনশালায় এইরূপ একটী ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়িতে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আহারান্বেষণে চলিয়া যাইতেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া ঝুড়ির ভিতর শুইয়া থাকিতেন।

একদিন এক কাক ঐ রন্ধনশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় অম্লযুক্ত ও নিরম্ল মৎস্যমাংসের গন্ধ পাইয়া উহা খাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিরূপে অভিলাষ পূরণ করিবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে অদূরে বসিয়া রহিল। অনন্তর সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে স্থির করিল, এই পারবতকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে।

পরদিন কাক প্রাতঃকালেই সেই রন্ধনশালার নিকট উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্ব বাহির হইয়া আহারসংগ্রহার্থ যাত্রা করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্র, তুমি আমার সঙ্গে চরিতেছ কেন?' কাক বলিল, 'স্বামিন, আপনার চালচলন আমার বড় ভাল লাগিয়াছে; আমি এখন হইতে আপনার অনুচর হইয়া থাকিব।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'সৌম্য, আমার খাদ্য এক রূপ, তোমার খাদ্য এক রূপ; আমার অনুচর হইলে তোমায় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।' 'স্বামিন্, আপনি যখন আপনার আহার অন্বেষণ

করিবেন, আমি তখন আমার আহার সংগ্রহ করিব এবং নিয়ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।' 'বেশ তাহাই হউক, কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।'

এইরূপে কাককে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব বিচরণ করিতে করিতে তৃণবীজাদি খাইতে লাগিলেন; কাকও সেই সময়ে গোময়পিণ্ডসমূহ উল্টাইয়া কীটাদি ক্ষুদ্র প্রাণী খাইতে খাইতে উদর পূর্ণ করিল এবং তাহার পর বোধিসত্ত্বের নিকট আসিয়া বলিল, 'স্বামিন্ আপনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ভোজন করেন; অতিভোজন করা ভাল নয়।' অতঃপর বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তিনি যখন সন্ধ্যার সময় বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন, তখন কাকও তাঁহার অনুগামী হইল এবং শেষে এই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। পাচক ভাবিল, 'কপোত আর একটী পক্ষী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে'; সুতরাং সে উহারও জন্য একটা ঝুড়ি ঝুলাইয়া দিল। তদবধি ঐ পক্ষিদ্বয় রন্ধনশালায় একত্র বাস করিতে লাগিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠী প্রচুর মৎস্য ও মাংস আনয়ন করিলেন; পাচক সেগুলি রন্ধনশালায় নানাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল; সে স্থির করিল, কাল চরায় না গিয়া দিনমানে এখানেই থাকিতে হইবে, এবং এই মৎস্যমাংস খাইতে হইবে। অনন্তর সে সমস্ত রাত্রি (পীড়ার ভাণ করিয়া) আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কাটাইল। প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'চল, বন্ধু, চরায় যাই।' কাক বলিল, 'আজ আপনি একাই যান; আমার কুক্ষিতে বড় ব্যথা হইয়াছে।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'সৌম্য, কাকের যে কুক্ষিরোগ হয় ইহা ত কখনও শোনা যায় নাই। তাহারা রাত্রিকালে প্রতি প্রহরে নাকি এক একবার (ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু দীপবর্ত্তিকা খাইয়া সেই সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তুমি নিশ্চিত এই রন্ধনশালার মৎস্যমাংস খাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছ। তুমি আমার সঙ্গে চল; মনুষ্যের খাদ্য তোমার পক্ষে দুষ্পাচ্য। এরূপ লোভের বশীভূত হইও না; আমার সঙ্গে গিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিয়া লইবে, এস।' কাক বলিল, 'না প্রভু, আমার চলিবার সাধ্য নাই।' 'বেশ, তোমার ব্যবহারেই উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে সাবধান, যেন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করিও না।' কাককে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আহার সংগ্রহার্থ চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাচক মৎস্যমাংস লইয়া তাহা নানা প্রকারে পাক করিতে আরম্ভ করিল এবং রন্ধন-পাত্রগুলি হইতে বাষ্পনির্গমনার্থ উহাদের মুখ একটু খুলিয়া দিয়া এবং একটা পাত্রের উপর ঝাঁঝরি[১] রাখিয়া বাইরে গিয়া ঘাম মুছিতে

---

[১]। মূলে 'পরিস্‌সাবনকরোটি' এই শব্দ আছে। ইহা ঝোল প্রভৃতি ছাঁকিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার বৃহৎপাত্র।

লাগিল। কাকও ঠিক সেই সময়ে ঝুড়ি হইতে নিজের মাথা বাড়াইয়া দিল এবং দেখিতে পাইল পাচক বাহিরে গিয়াছে। তখন সে ভাবিল, মাংস খাইয়া মনোরথ পূর্ণ করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তবে একটা বড় মাংসপিণ্ড খাই, বা চূর্ণমাংস খাই তাহা বিবেচনার বিষয়। চূর্ণ-মাংস দ্বারা শীঘ্র উদরপূর্ণ করা অসম্ভব; অতএব একটা বড় পিণ্ড লইয়া ঝুড়ির ভিতর বসিয়া খাওয়াই সঙ্গত।' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে উড়িয়া গিয়া ঝাঁঝরির উপর পড়িল; অমনি ঝাঁঝরিখানি ঝনাৎ করিয়া উঠিল। পাচক ঐ শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'বটে, এই ধূর্ত্ত কাক প্রভুর জন্য যে মাংস রান্ধিয়াছি তাহা খাইতে আসিয়াছে! আমি প্রভুরই চাকর, এ ধূর্ত্তের চাকর নহি। ইহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?' অনন্তর পাচক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাককে ধরিল, তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে পালকগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, আদার সঙ্গে লবণ ও জীরা বাটিয়া এবং উহা টক ঘোলের সহিত মিশাইয়া তাহার গায়ে মাখাইল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সে অতিমাত্র বেদনায় অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, 'লোভী কাক আমার কথা না শুনিয়া মহা দুঃখ পাইয়াছে।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
বিপত্তি তাহার, জেনো দুর্নিবার;
এই দেখ কাক প্রমাণ তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, 'অতঃপর আমিও এখানে থাকিতে পারি না।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন; কাক সেখানেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাচক তাহাকে ঝুড়িসুদ্ধ আবর্জ্জনারাশির উপর ফেলিয়া দিল।

* * *

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় প্রকটিত করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামীফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

---

৪৩. বেণুক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকে বলে তুমি অবাধ্য; এ কথা সত্য কি?' ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'তুমি অতীত কালেও এইরূপ অবাধ্য ছিলে এবং তন্নিবন্ধন পণ্ডিতদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন মহাবিভবশালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কামনাতেই দুঃখ এবং নৈষ্ক্রাম্যে প্রকৃত সুখ। অতএব তিনি কামনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া[১] ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যানবলে[২] পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি[৩] প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধ্যানসুখে থাকিতেন বলিয়া ক্রমে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন। তিনি এই সকল শিষ্য-পরিবৃত হইয়া

---

[১]। মূলে 'হিমবন্ত' এই শব্দ আছে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটী জাতকে 'হিমবন্ত' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। হিমবন্ত বলিলে পালি সাহিত্যে কেবল 'হিমালয়' বুঝায় না। কৈলাস, গন্ধমাদন, চিত্রকূট, সুদর্শন ও কালকূট পর্ব্বত ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইহাতে সাতটী মহাসরোবর আছে; তাহা হইতে পঞ্চ মহানদীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক-বুদ্ধ, অর্হৎ, দেবতা, ঋষি, যক্ষ-প্রভৃতি এখানে অবস্থিতি করেন।

[২]। মূলে 'কাসিণপরিকম্মং কত্বা' এইরূপ আছে। কৃৎস্ন বলিলে ধ্যানাভ্যাস করিবার উপায়বিশেষ বুঝায়। বৌদ্ধগ্রন্থে দশবিধ কৃৎস্নের উল্লেখ দেখা যায়—ক্ষিতি কৃৎস্ন, তেজঃ কৃৎস্ন, পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্ন ইত্যাদি। ধ্যানশিক্ষার্থী ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক ও পরিচ্ছিন্নাকাশ ইহার যে কোন একটী পদার্থ লইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার পরিদর্শন ও প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। ক্ষিতিকৃৎস্ন পরিকর্ম্মে একটী মৃগ্‌গোল সম্মুখে রাখিয়া ক্ষিতিরূপ ভূতের প্রকৃতি ভাবিতে হইবে, ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আবৃত্তি করিতে হইবে, ইহা যে নিজের দেহের একটী প্রধান উপাদান তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার ফলে শেষে 'নিমিত্ত' জন্মিবে, অর্থাৎ তখন বস্তু নয়নগোচর না করিলেও তাহার স্বরূপ মানস-পটে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে। পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্নে কুটীরের কোন ছিদ্র দিয়া আকাশখণ্ড অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য কৃৎস্নেও এক একটী নিয়মানুসারে ধ্যানাভ্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে।

[৩]। অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা; বিভূতি। পঞ্চ অভিজ্ঞা যথা—ঋদ্ধি (আকাশমার্গে) বিচরণাদি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা), দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, দিব্যচক্ষু। সমাপত্তি সম্বন্ধে ১১৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

একদিন এক বিষধর সর্প-শাবক স্বধর্ম্মানুসারে বিচরণ করিতে করিতে ইঁহাদের জনৈক তপস্বীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ সর্প-শাবক উক্ত তপস্বীর পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; তিনি উহাকে একটী বেণুপর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া দিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেণুপর্ব্বে শুইয়া থাকিত বলিয়া লোকে ঐ সর্পকে 'বেণুক' এবং উহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন বলিয়া ঐ তপস্বীকে 'বেণুক-পিতা' বলিত।

তপস্বীদিগের মধ্যে একজন সর্প পোষণ করিতেছেন শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সর্প পুষিতেছ এ কথা সত্য কি?' তপস্বী বলিলেন, 'হাঁ গুরুদেব।' 'সর্পকে বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি উহাকে আর রাখিও না।' 'শিষ্য যেমন আচার্য্যের, এই সর্পও সেইরূপ আমার স্নেহভাজন। আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।' তবে দেখিতেছি এই সর্পেরই দংশনে তোমার জীবনান্ত হইবে।' তপস্বী কিন্তু বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সর্পটাকেও ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না।

ইহার কিয়দ্দিন পর সেই আশ্রমবাসী সমস্ত তপস্বী বন্যফল আহরণার্থ যাত্রা করিলেন এবং এক স্থানে প্রচুর ফল পাওয়া যায় দেখিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থান করিলেন। বেণুকের পিতাও বেণুককে বেণুপর্ব্বে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্য তপস্বীদিগের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পরে আশ্রমে ফিরিয়া তিনি বেণুককে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু যেমন পর্ব্বের মুখ খুলিয়া 'এস, বৎস, তোমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, অমনি উপবাসক্রুদ্ধ আশীবিষ উহাতে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিল।

বেণুক-পিতাকে বিগতপ্রাণ দেখিয়া তপস্বীরা বোধিসত্ত্বকে সংবাদ দিলেন। তিনি শবদাহ করিবার আদেশ দিলেন এবং দাহান্তে ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া আসনগ্রহণ-পুরঃসর তাঁহাদের উপদেশার্থ এই গাথা বলিলেন :

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
জানিবে তাহার নিধন নিশ্চয়;
বেণুকের পিতা তার সাক্ষী হয়।

বোধিসত্ত্ব ঋষিগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ক্রমে তিনি ব্রহ্মবিহার[১] লাভ করিলেন এবং আয়ুশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

---

[১]। ১১৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিলেন বেণুক-পিতা; আমার শিষ্যেরা ছিলেন সেই তপস্বিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতক এবং ১৬১ সংখ্যক জাতক প্রায় একই রূপ।

----

৪৪. মশক-জাতক

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় কোন পল্লীগ্রামবাসী কতিপয় মূর্খ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে তথাগত একবার শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোন গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল। তাহারা একদিন সমবেত হইয়া এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিল—'দেখ, বনে গিয়া কাজ করিবার সময় আমাদিগকে মশায় খায়। তাহাতে আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব চল, ধনুক ও অস্ত্র লইয়া মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করি, এবং তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করিয়া ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিনাশ করি।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা বনে গিয়াছিল, 'মশা মার, মশা মার' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিয়াছিল, এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, কেহ গ্রামদ্বারে, কেহবা গ্রামমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত শাস্তা ভিক্ষার্থ এই গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভগবানকে দেখিয়া গ্রামদ্বারে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচুর উপহার দান করিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে আহত লোক দেখিয়া শাস্তা উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে বহু আহত লোক দেখিতেছি। ইহাদের কি হইয়াছে?' উপাসকেরা বলিলেন, 'ইহারা মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া বনে গিয়াছিল; কিন্তু পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিয়া নিজেরাই আহত হইয়াছে।' শাস্তা বলিলেন, 'মূর্খেরা এজন্মে মশক মারিতে গিয়া কেবল নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে; অতীত কালে লোকে মশা মারিতে গিয়া মানুষই মারিয়াছে।' অনন্তর গ্রামবাসিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন কাশীরাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রামে অনেক সূত্রধর বাস

করিত। সেখানে এক পলিতকেশ সূত্রধর একদিন একখণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া চৌরস করিতেছিল এমন সময় একটা মশক তাহার তাম্রস্থালীর ন্যায় উজ্জ্বল মস্তকোপরি উপবিষ্ট হইয়া শল্যসদৃশ তুণ্ড বিদ্ধ করিয়া দিল। সূত্রধরের পুত্র নিকটে বসিয়াছিল। সে পুত্রকে বলিল, 'বৎস, আমার মস্তকে মশক বসিয়া শল্যসম হুল ফুটাইয়া দিয়াছে; তুমি তাড়াইয়া দাও ত।' পুত্র বলিল, 'বাবা আপনি স্থির হইয়া থাকুন; আমি এক আঘাতেই মশক মারিতেছি।' এই সময়ে বোধিসত্ত্ব নিজের পণ্যভাণ্ড লইয়া উক্ত গ্রামে গমনপূর্ব্বক সেই সূত্রধরের আলয়ে উপবেশন করিলেন। (তিনি উপবেশন করিলে) সূত্রধর আবার বলিল, 'বৎস, মশাটা তাড়াইয়া দাও।' তখন তাহার পুত্র 'তাড়াইতেছি' বলিয়া এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার কুঠার উত্তোলন করিল এবং পিতার পৃষ্ঠদিকে অবস্থান করিয়া 'মশা মারি', 'মশা মারি' বলিতে বলিতে এক আঘাতে বৃদ্ধের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। বৃদ্ধের তখনই প্রাণবিয়োগ হইল।

বোধিসত্ত্ব এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এরূপ বন্ধু অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুও ভাল, কারণ যে বুদ্ধিমান সে অন্তত দণ্ডভয়েও নরহত্যা হইতে বিরত হয়।' অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :

বুদ্ধিমান, শত্রু সেও মোর ভাল;
নির্ব্বোধ মিত্রে কি কাজ?
মশক মারিতে বধিল পিতারে
মহামূর্খ পুত্র আজ।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে অন্য যেখানে তাহার কাজ ছিল সেখানে চলিয়া গেলেন, সূত্রধরের জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাহার মৃতদেহের সৎকার করিল।

* * *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান বণিক, যিনি গাথা পাঠ করিয়া সূত্রধরের গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।]

---

৪৫. রোহিণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের রোহিণী নাম্নী এক দাসী ছিল। সে একদিন ধান ভাঙ্গিতেছিল, এমন সময় তাহার বৃদ্ধা মাতা সেখানে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি পড়িয়া বৃদ্ধার গায়ে সূচীর মত হুল ফুটাইতে লাগিল। তখন সে

কন্যাকে বলিল, 'বাছা, আমাকে মাছিতে খাইয়া ফেলিল; মাছিগুলা তাড়াইয়া দে না।' রোহিণী তাড়াইতেছি বলিয়া মুষল উত্তোলন করিল এবং 'মাছি মারি', 'মাছি মারি' বলিতে বলিতে বৃদ্ধার শরীরে এমন আঘাত করিল যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল রোহিণী 'কি করিলাম' ভাবিয়া 'মা মা' বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

অবিলম্বে এই ঘটনা অনাথপিণ্ডদের কর্ণগোচর হইল। তিনি বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, রোহিণী অতীত জন্মেও মক্ষিকা বিনষ্ট করিতে গিয়া জননীর জীবন ক্ষয় করিয়াছিল।' অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পিতৃবিয়োগের পর শ্রেষ্ঠীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রোহিণীনাম্নী এক দাসী ছিল; সেই রোহিণীর জননীও ধান ভাঙ্গিবার স্থানে শুইয়া কন্যাকে বলিয়াছিল, 'বাছা, মাছিগুলা তাড়াইয়া দে', এবং সেই রোহিণীও এইরূপ মুষলাঘাত দ্বারা জননীর প্রাণসংহারপূর্ব্বক 'মা মা' বলিয়া কান্দিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীতে পণ্ডিত শত্রুও ভাল।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিয়াছিলেন :

হিতে করে বিপরীত, মূর্খ যদি মিত্র হয়;
সুবুদ্ধি যে শত্রু, তারে করি না ক তত ভয়।
তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ রোহিণী দাসী
করে শিরে করাঘাত মায়ের জীবন নাশি।

এই গাথাদ্বারা পণ্ডিতজনের প্রশংসা করিয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধা ছিল সেই বৃদ্ধা, এই রোহিণী ছিল সেই রোহিণী, এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

---

৪৬. আরামদূষক-জাতক

[কোশলরাজ্যের এক বালক একটী উদ্যানের কিয়দংশ নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা একদিন ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোশলরাজ্যের এক গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে গ্রাম্য ভূস্বামী তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া

নিজের উদ্যানে লইয়া যান এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে উপহার প্রদান-পুরঃসর বলেন, 'মহাশয়েরা যথারুচি এই উদ্যানে বিচরণ করুন।' তখন ভিক্ষুরা আসনত্যাগপূর্ব্বক উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং একস্থানে কিয়দংশ বৃক্ষশূন্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক, এই উদ্যানের অন্যান্য অংশ নিবিড়চ্ছায়া-যুক্ত, কিন্তু এ অংশ তরুগুল্মশূন্য; ইহার কারণ কি? উদ্যানপাল বলিল, 'এই উদ্যানরোপন-কালে (এ অংশে) জলসেচন করিবার জন্য এক পল্লিগ্রামবাসী বালককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এখানে যে সকল চারাগাছ বসান হইয়াছিল ঐ বালক সেগুলি উপড়াইয়া দেখিয়াছিল, কোনটার শিকড় কত বড় এবং তাহা দেখিয়া কোনটায় কত জল দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়াছিল। সেই কারণে চারা গাছগুলি সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল।'

ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'ঐ পল্লিগ্রামবাসী বালক অতীত-জন্মেও একবার ঠিক এইরূপে একটা উদ্যান নষ্ট করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র সমস্ত নগরবাসী উৎসবে যোগ দিবার জন্য ধাবিত হইল।

তখন রাজার উদ্যানে অনেক মর্কট বাস করিত। উদ্যানপাল ভাবিল, 'নগরে পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ হইতেছে; আমি এই মর্কটদিগের উপর জলসেচনের ভার দিয়া একটু আমোদ করিয়া আসি।' অনন্তর সে মর্কটদলপতির নিকট গিয়া বলিল, 'মর্কটরাজ, এই উদ্যানে তোমরা নানারূপ সুবিধা ভোগ করিতেছ—ইহার পুষ্প, ফল ও পল্লব খাইতেছ। আজ নগরে আমোদ আহ্লাদ হইবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে; আমি তাহা দেখিতে যাইব। যতক্ষণ আমি না ফিরিব, তোমরা চারাগাছগুলিতে জল দিতে পারিবে ত?' মর্কট বলিল, 'তা পারিব বৈকি।' 'দেখিও, যেন ভুল না হয়।'

অনন্তর উদ্যানপাল জলসেচনার্থ মর্কটদিগকে চর্ম্মনির্ম্মিত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র দিয়া গেল; মর্কটেরা সেইগুলি লইয়া চারা গাছগুলিতে জল দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মর্কটরাজ বলিল, 'দেখ, জলের অপচয় করা হইবে না; জল ঢালিবার আগে গাছগুলি উপড়াইয়া দেখ কোনটার শিকড় কত বড়। যেগুলির শিকড় গভীর সেগুলিতে বেশী করিয়া, এবং যেগুলির শিকড় অগভীর সেগুলিতে কম করিয়া জল দাও। যে জল আছে তাহা ফুরাইলে অন্য জল পাওয়া কঠিন হইবে,' 'এ অতি উত্তম পরামর্শ' এই বলিয়া অপর মর্কটেরা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময়ে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজ্যোদ্যানে মর্কটদিগের এই কার্য্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এক একটা গাছ তুলিয়া তাহার মূলে শিকড়ের পরিমাণ মত জল দিতেছ কেন?' তাহারা বলিল, 'আমাদের দলপতি এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।' এই উত্তর শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'যাহারা মূর্খ তাহারা ভাল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শেষে মন্দ করিয়া ফেলে।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

হিত চেষ্টা করি মূর্খ, অনর্থ ঘটায় তবু;
করিও না মূর্খেরে বিশ্বাস;
নির্ব্বোধ মর্কটগণ, জলসেক-ভার লয়ে,
উদ্যানের করিছে বিনাশ।

পণ্ডিতপুরুষ এইরূপ মর্কটরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া অনুচরদিগের সহিত উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই আরামদূষক পল্লীবালক ছিল এই মর্কটরাজ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতপুরুষ।]

---

৪৭. বারুণি-জাতক

[এক ব্যক্তি জল মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধু মদ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সুবর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ বারুণি[১] বিক্রয় করিতেন। তাঁহার দোকানে বহু সুরাপায়ীর সমাগম হইত। তিনি একদিন স্নানে যাইবার সময় চেলাকে[২] বলিয়া গেলেন, 'তুমি সুরা বিক্রয় কর; মূল্য না লইয়া কাহাকেও সুরা দিও না।' চেলা বিক্রয় করিবার, সময় দেখিল, সুরাপায়ীরা মধ্যে মধ্যে লবণ ও গুড় খাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমাদের মদে ত লবণ নাই; (ইহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া দিই; তাহা হইলে বেশী কাট্‌তি হইবে)। ইহা স্থির করিয়া সে সুরাভাণ্ডে এক নালি লবণ

১। উগ্রবীর্য্য সুরা।

২। মূলে 'অন্তেবাসিক' এই শব্দ আছে এবং বিপণিস্বামীকে 'আচার্য্য' বলা হইয়াছে। ইহাতে মদ্যবিক্রয়ের সম্বন্ধে যে মৃদু শ্লেষের আভাস আছে, তাহা যথাক্রমে 'চেলা' ও 'গুরু' শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইতে পারে।

ঢালিয়া দিয়া তাহা হইতে সুরা বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রেতারা এক এক চুমুক মুখে লইয়া তৎক্ষণাৎ 'থু' 'থু' করিয়া ফেলিয়া দিল এবং 'করিয়াছ কি?' জিজ্ঞাসা করিল। চেলা কহিল, 'তোমরা মদ খাইবার সময় লবণ আনাইতেছিলে দেখিয়া আমি নিজেই লবণ মিশাইয়া দিয়াছি।' 'ওরে মূর্খ, তাই তুই এমন ভাল মদ নষ্ট করিয়াছিস'। এই বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা দোকান হইতে চলিয়া গেল।

গুরু দোকানে ফিরিয়া দেখিলেন সেখানে ক্রেতাদিগের জনপ্রাণী নাই। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চেলা যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত জানাইল। গুরুও চেলাকে গালি দিলেন এবং অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে উহার নির্বুদ্ধিতার কথা জানাইলেন। অনাথপিণ্ডদ দেখিলেন কাণ্ডটা বিচিত্র বটে; তিনি জেতবনে গিয়া শাস্তাকে এই কথা শুনাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ঠিক এই এইরূপ মদ্য নষ্ট করিয়াছিল।' অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এক সুরাবিক্রেতা তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। এই ব্যক্তিও তীক্ষ্ণ সুরা বিক্রয় করিত। একদিন সে স্নানে যাইবার সময় কৌণ্ডিন্য নামক এক চেলার উপর সুরা বিক্রয়ের ভার দিয়া গিয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তি ঠিক এইরূপেই লবণ মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর গুরু আসিয়া ঐ ব্যাপার জানিতে পারিল এবং সেইদিনই বোধিসত্ত্বকে উহা শুনাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহারা হিত করিতে গিয়াও অহিত সম্পাদন করে।

হিতাকাঙ্খী মূর্খ করে অহিত সাধন;
কৌণ্ডিন্য নাশিল সুরা মিশায়ে লবণ।'

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথা দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই বারুণি-দূষক ছিল কৌণ্ডিন্য এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

---

৪৮. বেদব্ভ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, 'কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও তুমি এইরূপ অবাধ্য ছিলে; পণ্ডিতদিগের পরামর্শ শুনিতে না এবং সেই জন্য তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। তোমারই বুদ্ধিদোষে আরও এক সহস্র লোকের প্রাণবিনাশ হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'-মন্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই মন্ত্রের নাকি এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। নক্ষত্রযোগবিশেষে ইহা পাঠ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশ হইতে সপ্তরত্নবৃষ্টি হইত। বোধিসত্ত্ব বিদ্যাশিক্ষার্থ এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া চেতিয়রাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল, সেখানে 'প্রেষণক' নামক পঞ্চশত দস্যুর উপদ্রবে পথিকেরা প্রায় সর্ব্বদাই বিপন্ন হইত। ইহাদিগকে 'প্রেষণক' নামক হইবার কারণ এই—ইহারা দুই জন পথিক ধরিলে এক জনকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রেষণ অর্থাৎ প্রেরণ করিত। পিতা ও পুত্রকে ধরিলে পিতাকে বলিত, 'তুমি গিয়া ধন আহরণপূর্ব্বক পুত্রের মুক্তি-সম্পাদন কর'; এইরূপ মাতা ও কন্যাকে ধরিলে মাতাকে পাঠাইয়া দিত; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরকে ধরিলে জ্যে'কে পাঠাইয়া দিত; আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিলে শিষ্যকে পাঠাইয়া দিত।

প্রেরণকেরা ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া ফেলিল এবং সম্প্রদায়ের প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আমি দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব। আমি যেরূপ বলিতেছি, যদি সেইরূপে চলেন, তাহা হইলে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। অদ্য রত্ন-বর্ষণের যোগ আছে; সাবধান! বিপদে অভিভূত হইয়া যেন মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক রত্নবর্ষণ না ঘটান। রত্নবর্ষণ করাইলে আপনার এবং এই পঞ্চশত দস্যুর বিনাশ হইবে।' আচার্য্যকে এইরূপে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রয় সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাকালে দস্যুরা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এ দিকে ক্ষিতিজের প্রাচীমূলে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র দেখিয়া বুঝিলেন,

মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, ‘বৃথা এত বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক রত্নবর্ষণ করাইয়া দস্যুদিগকে নিষ্ক্রয় দান করা যাউক; তাহা হইলে, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমরা আমায় আবদ্ধ করিয়াছ কেন হে?’ তাহারা বলিল, ‘মহাশয়, আমরা ধন পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছি।’ ‘যদি ধনলাভই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এখনই বন্ধন খুলিয়া আমাকে স্নান করাও এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া, গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও পুষ্পদ্বারা ভূষিত করিয়া একাকী অবস্থান করিতে দাও।’ দস্যুরা এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্রযোগ সমাগত জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আকাশের দিকে তাকাইলেন, অমনি রাশি রাশি রত্নবৃষ্টি হইল। দস্যুরা তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় উত্তরীয়-বস্ত্রে পুটুলি বাঁধিয়া যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের কি বিচিত্র খেলা! কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য পঞ্চশত দস্যু আসিয়া প্রেষণকদিগকে ধরিয়া ফেলিল। প্রেষণকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমরা আমাদিগকে আবদ্ধ করিলে কেন?’ তাহারা বলিল, ‘ধন পাইবার জন্য।’ ‘যদি ধন পাইতে চাও, তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ইনি আকাশের দিকে তাহাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমাদের নিকট যে ধন আছে, তাহা ইনিই দিয়াছেন।’ ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় দস্যুদল প্রেষণকদিগকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং বলিল, ‘আমাদিগকে ধন দাও।’ ব্রাহ্মণ বলিলেন, ‘ভদ্রগণ, তোমাদিগকে ধন দিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু যে যোগে রত্নবর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা ফিরিতে এক বৎসর লাগিবে। যদি তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদেরও জন্য রত্নবর্ষণ করাইব।

ইহা শুনিয়া দস্যুরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ‘তুমি বড় ধূর্ত্ত! তুমি এইমাত্র প্রেষণকদিগকে ধন দিলে, আর আমাদিগকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিতেছ!’ অনন্তর তাহারা তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ব্রাহ্মণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গেল এবং ত্বরিতবেগে প্রেষণকদিগকে অনুধাবন করিল। যুদ্ধে দ্বিতীয় দলের জয় হইল; তাহারা প্রেষণকদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল এবং ক্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর হতাবশিষ্টেরা আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কাটাকাটি করিতে করিতে শেষে তাহাদের দুই জন মাত্র জীবিত রহিল। সহস্র দস্যুর মধ্যে অপর সকলেই জীবলীলা সংবরণ করিল।

হতাবশিষ্ট দস্যুদ্বয় তখন সমস্ত ধন লইয়া কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে

লুকাইয়া রহিল। অনন্তর একজন উহা রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে বসিয়া রহিল এবং অপরজন তণ্ডুল ক্রয় করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে প্রবেশ করিল।

লোভই বিনাশের মূল। যে ব্যক্তি ধন রক্ষা করিবার জন্য বসিয়াছিল, সে ভাবিল, 'আমার সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া এই ধনের অর্দ্ধেক লইবে। তাহা না দিয়া সে আসিবামাত্র তাহাকে এই তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলি না কেন?' ইহা স্থির করিয়া সে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সঙ্গীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিত লাগিল। এ দিকে যে অন্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল, 'সে ভাবিল অর্দ্ধেক ধন ত দেখিতেছি, আমার সঙ্গী লইবে। কিন্তু ভাতে যদি বিষ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে সে খাইবামাত্র মরিয়া যাইবে, আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নিজের অংশ আহার করিল এবং অবশিষ্ট অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া সঙ্গীর নিকট প্রতিগমন করিল। সে হাত হইতে অন্নপাত্র নামাইবামাত্রই অপর দস্যু তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং উহা কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিল; কিন্তু অতঃপর সেই বিষাক্ত অন্ন আহার করিয়া সে নিজেও প্রাণ ত্যাগ করিল। এইরূপে ধনের জন্য একা ব্রাহ্মণ নয়, সহস্র দস্যুও বিনষ্ট হইল।

বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকারমত দুই চারি দিন পরে ধন সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, আচার্য্য সেখানে নাই, চারিদিকে রত্ন বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা হইল, আচার্য্য সম্ভবত তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া রত্নবর্ষণ করাইয়াছেন এবং তাহাতেই সকলের বিনাশ হইয়াছে। তিনি রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যের দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। তখন 'হায়, আমার কথা অবহেলা করিয়া ইনি জীবন হারাইলেন', এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে আচার্য্যের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদনানন্তর বনফুল দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন। অনন্তর অগ্রসর হইয়া তিনি ক্রমে প্রেষণকদিগের পঞ্চশত শব, অপর দস্যুদলের সার্দ্ধ দ্বিশত শব প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে অবশেষে যেখানে দুই জনের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, তাহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সহস্র লোকের মধ্যে দেখিতেছি, দুইজন ব্যতীত আর সকলেই মারা গিয়াছে। তাহারাও যে পরস্পর বিবাদ না করিয়াছে, এমন নয়; দেখা যাউক, তাহারা কোথায় গেল।' এই চিন্তা করিয়া তিনি কিয়দ্দূর চলিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজপথ হইতে আর একটী পথ বাহির হইয়া গ্রামসন্নিহিত জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে রাশি রাশি রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে—অদূরে

একজন দস্যুর মৃতদেহ এবং তাহার পার্শ্বে একটী বিপর্য্যস্ত অন্নপাত্র। দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব-সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই নিভৃতস্থানে তাহারও দ্বিখণ্ডীকৃত শব দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'তবেই দেখিতেছি, আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া আচার্য্য নিজেও মারা গিয়াছেন, আর এক সহস্র দস্যুরও প্রাণহানি ঘটাইয়াছেন। যাহারা অনুপায় দ্বারা আপনাদের সুবিধা করিতে চায়, তাহারা এইরূপেই নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

অনুপায়-বলে ইষ্টসাধনে প্রয়াস
করিলে তাহাতে শুদ্ধ ঘটে সর্ব্বনাশ।
চেতিয়ের দস্যুগণ বেদব্ভে মারিল;
কিন্তু শেষে নিজেরাও বিনষ্ট হইল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন—'আমার আচার্য্য যেরূপ আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনার্থ ধনবর্ষণ ঘটাইয়া নিজের প্রাণ হারাইলেন এবং অপর বহুলোকেরও বিনাশের কারণ হইলেন, সেইরূপ অন্য লোকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুপায় প্রয়োগ করিলে নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে।' বোধিসত্ত্বের এই বাক্যে বনভূমি নিনাদিত হইল। উল্লিখিত গাথা দ্বারা তিনি যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তখন বনদেবতারা সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সমস্ত রত্ন নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে জীবনযাপন-পূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

* * *

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বেদব্ভমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণের শিষ্য।]

☞ এই জাতক রূপান্তরিত হইয়া ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন কবি চসার (Chaucer) প্রণীত Pardoner's Tale নামক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে।

---

৪৯. নক্ষত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক আজীবক[১] সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কিংবদন্তী এই যে কোন জনপদবাসী ভদ্রলোক শ্রাবস্তীবাসিনী এক সদ্বংশজাতা কুমারীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া 'অমুক দিনে আসিয়া বিবাহ দিব' বলিয়া

---

[১]। আজীবক বা আজীবিক = মক্খলিপুত্র গোশাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়।

দিন স্থির করেন। এক আজীবক তাঁহার কুলগুরু ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইলে তিনি গুরুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু, অদ্য আমার পুত্রের বিবাহ; অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন শুভলগ্ন আছে কি না।' 'ইনি যখন বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, এখন যেন শিষ্টতার অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া আজীবক বড় বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন এ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইবে। অনন্তর তিনি বলিলেন, 'অদ্য অতি অশুভ লগ্ন; এ লগ্নে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নিষিদ্ধ; ইহাতে বিবাহ দিলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।' বরকর্ত্তা আজীবককে শ্রদ্ধা করিতেন; কাজেই সে দিন কন্যা আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন না।

এদিকে শ্রাবস্তী নগরে কন্যাপক্ষের লোকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ কেমন ভদ্রতা! তাহারা নিজেরাই দিন স্থির করিল, এখন আসিল না! নিরর্থক আমাদের এত ব্যয় হইল! এস আমরা অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি।' অনন্তর তাহারা সেই দিনই অন্য পাত্র স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ দিল। পর দিন সেই জনপদবাসী বরপক্ষ কন্যাকর্ত্তার আলয়ে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রাবস্তীবাসীরা এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিল—'পাঁড়াগেঁয়ে লোক বড় অসভ্য; তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিয়াছিলে; কিন্তু শেষে না আসিয়া আমাদের অপমান করিলে। আমরা অপর পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি। তোমরা ভালয় ভালয় যেপথে আসিয়াছ সেইপথে ফিরিয়া যাও।' ইহা শুনিয়া জনপদবাসীরা কলহ আরম্ভ করিল; কিন্তু শেষে নিরুপায় হইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই প্রতিগমন করিল!

আজীবক বিবাহবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন এই কথা ক্রমে ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইল এবং তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ক্রোধবশে একটা বিবাহ পণ্ড করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কতিপয় নগরবাসী কোন জনপদবাসিনী কন্যার সহিত আপনাদের এক পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দিন স্থির করিয়াছিল; এবং বিবাহের দিনে আপনাদের কুলগুরু এক আজীবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রভু, আজ অমুকের বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছি,

দেখুন ত শুভলগ্ন আছে কি না।’ ইহারা আপন ইচ্ছায় দিন স্থির করিয়া এখন আমায় লগ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে’ এই ভাবিয়া আজীবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন ‘অদ্যকার আয়োজন পণ্ড করিব।’ অনন্তর তিনি বলিলেন, ‘আজ অতি অশুভলগ্ন; ইহাতে বিবাহ হইলে মহা বিপদ ঘটিবে।’ বরপক্ষের লোকে আজীবকের কথা বিশ্বাস করিয়া সে দিন কন্যালয়ে গেল না। এদিকে জনপদবাসীরা বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, ‘এরা কিরূপ লোক? নিজেরাই স্থির করিল আজ বিবাহ হইবে, অথচ আসিল না।’ অনন্তর তাহারা সেইদিন অপর একটী পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল।

পরদিন নগরবাসীরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহা শুনিয়া জনপদবাসীরা বলিল, ‘নগরবাসী লোকগুলা দেখিতেছি অতি নির্লজ্জ! তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিলে, অথচ যথাসময়ে আসিলে না! কাজেই আমরা অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি।’ ‘আমরা আজীবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কাল শুভলগ্ন ছিল না; সেই জন্যই আসি নাই; আজ পাত্র লইয়া আসিয়াছি; কন্যা সম্প্রদান করুন।’ ‘তোমরা আসিলে না দেখিয়া আমরা অন্য পাত্রে কন্যা দান করিয়াছি। এখন দত্তা কন্যাকে আবার কিরূপে দান করিব?’ দুই পক্ষে যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছে, তখন নগরবাসী এক পণ্ডিত কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই জনপদে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কুলগুরুর উপদেশানুসারে অশুভনক্ষত্রহেতু যথাসময়ে পাত্রীর আলয়ে উপনীত হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘নক্ষত্রের ভালমন্দে কি আসে যায়? কন্যালাভ করা কি শুভগ্রহের ফল নহে?’

মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
আকাশের তারা—তার শক্তি কোন ছার?’

নগরবাসীদের বিবাদ করাই সার হইল; তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

* * *

[সমবধান—তখন এই আজীবক ছিল সেই কুলগুরু আজীবক; এই বরপক্ষ ছিল সেই বরপক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

---

৫০. দুর্ম্মেধা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে লোকহিতকর ব্রত সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দ্বাদশ নিপাঠে মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) বর্ণিত হইবে।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্তকুমার। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া বেদত্রয় এবং অষ্টাদশ কলায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে বারাণসীবাসীরা পর্ব্বাহে মহা ঘটায় দেবদেবীর পূজা করিত। তাহারা শত শত ছাগ-মেষ-কুক্কুট-শূকরাদি প্রাণী বধ করিত এবং গন্ধ পুষ্পের সহিত এই সকল নিহত পশুর রক্তমাংস বলি দিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইদানীং লোকে দেবার্চ্চনা করিতে গিয়া বহু প্রাণী বধ করিতেছে; অধিকাংশ লোকেই অধর্ম্ম-পথে চলিতেছে; পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিলে আমি এমন কোন উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠিয়া যাইবে, অথচ লোকেও কোন ক্ষতি বোধ করিবে না।' হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া একদিন কুমার রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন। তিনি পথে দেখিতে পাইলেন একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকট বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এই বিশ্বাসে তাহারা সেখানে কেহ পুত্র, কন্যা, কেহ যশ, ধন, যাহার যেরূপ ইচ্ছা কামনা করিতেছে। বোধিসত্ত্ব রথ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ বৃক্ষের নিকট গেলেন, গন্ধপুষ্প দ্বারা উহার পূজা করিলেন, উহার মূলে জলসেচন করিলেন, এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিলেন। তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ বৃক্ষের নিকট যাইতেন এবং প্রকৃত দেবভক্তের ন্যায় উক্ত নিয়মে উহার পূজা করিতেন।

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া এবং দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিয়া[১] যথাশাস্ত্র রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার একটী অভিলাষ পূর্ণ হইল—আমি রাজপদ লাভ করিলাম; এখন অপর

[১]। দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব (মৃদুতা), তপ, অবিরোধনা এই দশবিধ গুণ।

অভিলাষটী পূর্ণ করিতে হইবে।’ তখন তিনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে[১] সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনারা জানেন কি আমি কি কারণে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছি?’ তাহারা বলিলেন, ‘না মহারাজ, আমরা তাহা জানি না।’ ‘আমি যে অমুক বটবৃক্ষকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিতাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতাম তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?’ ‘হাঁ মহারাজ, তাহা আমরা দেখিয়াছি।’ ‘তখন আমি প্রার্থনা করিতাম, যদি কখনও রাজপদ পাই তাহা হইলে দেবতার পূজা দিব। সেই দেবতার কৃপাতেই এখন আমি রাজা হইয়াছি। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে। আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পারেন, পূজার আয়োজন করুন।’ ‘কি আয়োজন করিতে হইবে, মহারাজ?’ ‘আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমার রাজ্যে যাহারা জীবসংহার প্রভৃতি পঞ্চ-দুঃশীলকর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশলধর্ম্মে[২] আসক্ত, তাহাদিগের হৃৎপিণ্ড, মাংস ও রক্ত প্রভৃতি দিয়া দেবতার পূজা করিব। আপনারা এখন ভেরী বাজাইয়া এরূপ ঘোষণা করুন—‘আমাদের রাজা যখন ঔপরাজ ছিলেন তখন দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃশীল প্রজাকে বলি দিবেন। এখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহারা প্রাণাতিপাতাদি পঞ্চবিধ দুঃশীল কর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশল কর্ম্মে নিরত, তাহাদের মধ্য হইতে সহস্র ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ও মাংসাদি দ্বারা দেবতার তৃপ্তিসাধন করিবেন। অতএব নগরবাসীদিগকে জানাইতেছি যে অতঃপর যাহারা এইরূপ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইবে, রাজা সেইরূপ দুর্মেধা ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে সহস্র লোকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবেন।’ অনন্তর তাঁহার উদ্দেশ্য সুব্যক্ত করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

ছিনু যবে উপরাজ, করিনু মানত আমি ভক্তিভরে দেবতার ঠাঁই,

---

[১]। জাতকের অনেক স্থানে ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘গৃতপতি’ এই দুই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গৃহপতি বলিলে যিনি পরিজন লইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহা ইংরাজী householder শব্দের তুল্য। এ অর্থে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকেই গৃহপতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব এরূপ স্থানে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দ দ্বারা ‘বেদজ্ঞ, অধ্যাপন-নিরত ব্রাহ্মণ’ বুঝিতে হইবে, যাহারা ব্রাহ্মণকুলজাত এবং শুদ্ধ গৃহধর্ম্মপরায়ণ তাহাদিগকে বুঝাইবে না। এইরূপ ‘ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি’ প্রয়োগ ‘ক্ষত্রিয়’ শব্দ দ্বারাও ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ অর্থাৎ রাজ্যশাসনে বা যুদ্ধাদিতে রত ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ক্ষত্রিয়কুলজাত গৃহস্থমাত্রকে বুঝাইবে না।

[২]। শীলের বিপরীতাচার দুঃশীলকর্ম্ম, যথা প্রাণাতিপাত ইত্যাদি। দশ অকুশলধর্ম্ম যথা—ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম (প্রাণঘাত, অদত্তাদান, কাম-মিথ্যাচার); চতুর্ব্বিধ বাক্‌কর্ম্ম (মৃষাবাদ, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্‌ফপ্পলাপ অর্থাৎ বাচালতা); ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম (অভিধ্যা অর্থাৎ তৃষ্ণা বা লোভ, ব্যাপাদ অর্থাৎ ক্রোধ, মিথ্যাদৃষ্টি)। অথবা দশ অকুশলধর্ম্ম বলিলে দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি দশপুণ্যকর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠানও বুঝাইতে পারে।

সহস্র পাষণ্ডে বধি করিব বৃহৎ যজ্ঞ, রাজ্য যদি লভিবারে পাই।
হইল কামনা পূর্ণ; ভাবিলাম তবে আমি সহস্র পাষণ্ড কোথা পাব?
এবে দেখি অগণন রয়েছে পাষণ্ড জন; দেবঋণে শীঘ্র মুক্ত হব।

অমাত্যগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ভেরী বাজাইয়া এই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলেই সর্ব্ববিধ দুঃশীল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কাহাকেও দুঃশীলতাপরাধে অপরাধী হইতে দেখা যায় নাই। এইরূপে বোধিসত্ত্ব কাহাকেও কোনরূপ দণ্ড না দিয়া সমস্ত প্রজাকে শীলবান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে পারিষদবর্গসহ দেবনগরে গমন করিয়াছিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিলেন বারাণসীরাজের পরিষদগণ এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকুমার।]

---

৫১. মহাশীলবজ্-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোন বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি নাকি নিরুৎসাহ হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর করিল, 'হাঁ ভগবন।' 'সে কি কথা? এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে থাকিয়াও তুমি উৎসাহহীন হইলে! প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্টসৌভাগ্য পুনর্লাভ করিয়াছিলেন।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের সময় তাঁহার 'শীলবান কুমার' এই নাম হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালনপূর্ব্বক 'মহাশীলবান রাজ' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নগরের চতুর্দ্ধারে চারিটী, মধ্যভাগে একটী এবং প্রাসাদের পুরোভাগে একটী দানশালা স্থাপিত করিয়া অনাথ ও আতুরদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তিনি শীলপরায়ণ এবং দয়া-ক্ষান্তি-মৈত্রী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ছিলেন, উপোসথাদি ব্রতপালন করিতেন এবং

অপত্যনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতে পরিতোষ সাধন করিতেন।

রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য অন্তঃপুরনিবাসিনী এক রমণীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথা রাষ্ট্র হইয়া ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন অমাত্যের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মূঢ়! তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ; অতএব তোমাকে এ রাজ্যে আর থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি স্ত্রীপুত্র ও ধনসম্পত্তি লইয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।'

কাশী হইতে এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া উক্ত অমাত্য কোশলাজ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে তত্রত্য রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইলেন। একদিন তিনি কোশলরাজকে বলিলেন, 'মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ; তত্রত্য রাজার প্রকৃতি অতি মৃদু; সামান্য সেনাবল লইয়াই এ রাজ্য অধিকার করিতে পারা যায়।' এই কথা শুনিয়া কোশলরাজ ভাবিলেন, 'কাশী একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য; অথচ এ ব্যক্তি বলিতেছে, অতি অল্প সেনাবলেই ইহা অধিকার করিতে পারা যায়। এ তবে কোন গুপ্তচর নাকি?' অনন্তর তিনি ঐ নির্ব্বাসিত অমাত্যকে বলিলেন, 'আমার বোধ হইতেছে তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।' 'মহারাজ! আমি গুপ্তচর নহি; আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; যদি প্রত্যয় না করেন তবে কাশীরাজ্যের কোন প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদিগের প্রাণসংহারার্থ লোক প্রেরণ করুন; দেখিবেন এই সকল লোক ধৃত হইয়া কাশীরাজের নিকট নীত হইলে, তিনি ইহাদিগকে দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, বরং ধন দিয়া বিদায় করিবেন।'

কোশলরাজ দেখিলেন লোকটী অতি দৃঢ়তার সহিত কথা বলিতেছে। তখন তিনি ঐ পরামর্শ মতই কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং কতকগুলি লোক পাঠাইয়া কাশীরাজের একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণ করিলেন। এই পাষণ্ডেরা ধৃত হইয়া কাশীরাজের নিকট নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু সকল! তোমরা গ্রমবাসীদিগের প্রাণবধ করিলে কেন?' তাঁহারা উত্তর দিল, 'দেব! আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় নাই।' 'যদি তাহাই হয়, তবে আমার নিকট আসিলে না কেন? যাও, এই ধন লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও; আর কখনও এমন কাজ করিও না।' তাহারা কোশলে গিয়া তথাকার রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কিন্তু এরূপ প্রমাণ পাইয়াও কোশলরাজ কাশী আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না; তিনি কাশীরাজ্যের মধ্যভাগস্থ কোন গ্রামে অত্যাচার করিবার জন্য পুনর্ব্বার লোক পাঠাইলেন। তাহারাও কাশীরাজের সমীপে নীত হইয়া পূর্ব্ববৎ সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ইহাতেও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হইয়া কোশলরাজ একদল লোককে বারাণসী নগরের

রাজপথসমূহে লুণ্ঠন করিতে পাঠাইলেন; কিন্তু ইহারাও ধৃত হইয়া দণ্ডের পরিবর্ত্তে ধনলাভ করিল। তখন কোশলরাজের প্রতীতি জন্মিল যে, কাশীরাজ অতীব নিরীহ ও ধর্ম্মপরায়ণ। তিনি বলবাহনাদি সঙ্গে লইয়া কাশী অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে কাশীরাজের এক সহস্র মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর্য্যবান। তাঁহারা মত্তমাতঙ্গকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেন না, মস্তকে বজ্রপাত হইলেও বিচলিত হইতেন না; শীলবান মহারাজের অনুমতি পাইলে তাঁহারা জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্য জয় করিতে সমর্থ ছিলেন। কোশলরাজ বারাণসী জয় করিতে আসিতেছেন শুনিয়া উক্ত বীরপুরুষেরা কাশীরাজের নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, 'অনুমতি দিন, আমাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবামাত্রই কোশলরাজকে বন্দী করিয়া আনি।' কাশীরাজ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'বাপ সকল, আমার জন্য যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। যাহাদের রাজ্যলোভ আছে, তাহারা ইচ্ছা করে ত আমার রাজ্য অধিকার করুক।' এদিকে কোশলরাজ কাশীরাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক জনপদে প্রবেশ করিলেন; এবং অমাত্যেরা কাশীরাজের নিকট গিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু কাশীরাজ ইঁহাদিগকেও নিবারণ করিলেন। অতঃপর কোশলরাজ রাজধানীর পুরোভাগে উপনীত হইয়া কাশীরাজকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।' কাশীরাজ উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধ করিব না; ইচ্ছা হয় আপনি রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন।' অমাত্যেরা তখনও তাঁহাকে বলিলেন, 'দেব, আজ্ঞা দিন, কোশলরাজকে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না; বাহিরে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিব।' কিন্তু রাজা মহাশীলবান ইহাতে সম্মত হইলেন না; অপিচ নগর-দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং অমাত্য সহস্র-পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

কোশলরাজ বিপুল বলবাহনসহ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এক প্রাণীও তাঁহার গতিরোধ করিল না। তিনি রাজভবনে উপস্থিত হইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং নিরপরাধ কাশীরাজ ও তাঁহার সহস্র অমাত্যকে বন্দী করিয়া আদেশ দিলেন, 'ইহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধ, আমক শ্মশানে[১] গর্ত্ত খুঁড়িয়া গলা পর্য্যন্ত মাটির মধ্যে পোত; গর্ত্তের মাটি চারিপাশে এমন করিয়া পিটিয়া দাও, যেন ইহারা হাত নাড়িতে না পারে; তাহা হইলে রাত্রিকালে ইহাদিগকে শিয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলিবে।' চোর-রাজের[২] ভৃত্যেরা এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা

---

[১]। আমক শ্মশান—যেখানে শব দগ্ধ করা হয় না, পচিয়া গলিয়া কুক্কুরের ভক্ষ হয়।

[২]। যে ব্যক্তি রাজ্য অপহরণ করিয়াছে (ইংরাজীতে usurper) এখানে এই শব্দ কোশলরাজকে বুঝাইতেছে।

শিরোধার্য্য করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহার অমাত্যদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া লইয়া গেল।

এত অত্যাচারেও কাশীরাজের মনে চোর-রাজের প্রতি কোনরূপ ক্রোধের উদ্রেক হইল না। তাঁহার পার্শ্বচরগণও এমন সুবিনীত ছিলেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। চোর-রাজের ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে শ্মশানে লইয়া গেল; সেখানে গর্ত্ত খনন করিয়া মধ্যভাগে রাজাকে এবং উভয় পার্শ্বে অমাত্যদিগকে আকণ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিল এবং গর্ত্তের মধ্যে মাটি ফেলিয়া এমন করিয়া পিটিল যে কাহারও নড়িবার চড়িবার সাধ্য রহিল না। এ অবস্থাতেও শীলবান রাজার মনে চোর-রাজের উপর অণুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইল না। চোর-রাজের ভৃত্যেরা চলিয়া গেলে তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ কর; অন্য কোন ভাবকে স্থান দিও না।'

নিশীত সময়ে শৃগালেরা মনুষ্যমাংস আহার করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট চীৎকার করিলেন যে শৃগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহারা কিয়দ্দূর গিয়া যখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কেহই তাহাদের অনুধাবন করিতেছে না, তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ পুনর্ব্বার চীৎকার করিলেন, শৃগালেরাও পুনর্ব্বার পলায়ন করিল এবং পুনর্ব্বার ফিরিল। এইরূপে একে একে তিনবার পলাইয়া শৃগালেরা যখন দেখিতে পাইল কেহই তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে না, তখন তাহাদের সাহস বাড়িল, তাহারা বুঝিল যে, এ সকল লোক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় নিবদ্ধ; অতএব তাহারা আর পলায়ন করিল না। পালের প্রধান শৃগাল রাজাকে খাইতে গেল, অন্যান্য শৃগাল অমাত্যদিগকে খাইতে গেল।

উপায়কুশল কাশীরাজ শৃগালকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন। শৃগাল ভাবিল তিনি যেন তাহার দংশনেরই সুবিধা করিয়া দিতেছেন। কিন্তু সে যেমন দংশন করিতে উদ্যত হইল, অমনি তিনি তাহারই গ্রীবা দংশন করিয়া ধরিলেন। তাঁহার হনুতে যন্ত্রের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাঁহার দশনপঙ্ক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া মরণভয়ে বিকট রব করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া অপর শৃগালেরা মনে করিল, তাহাদের দলপতি নিশ্চিত কোন মানুষের হাতে ধরা পড়িয়াছে। তখন তাহারা সকলেই অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

রাজা যে শৃগালকে হনুদ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সে লাফালাফি করিতে করিতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দিল। চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা

শিথিল হইয়াছে জানিয়া রাজা শৃগালকে ছাড়িয়া দিলেন এবং গজোপম বলপ্রয়োগপূর্ব্বক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে দেহ চালিত করিয়া হাত দুইখানি উপরে তুলিলেন। অনন্তর গর্ত্তের দুই ধার ধরিয়া তিনি বিবর হইতে বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং একে একে অমাত্যদিগের উদ্ধার সাধন করিলেন।

ঐ শ্মশানে যে সকল যক্ষ থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে দিনের কথা হইতেছে, সেদিন কতিপয় লোক দুই যক্ষের সীমার উপর একটা শব ফেলিয়া গিয়াছিল। যক্ষদ্বয় এই শব বিভাগ করিতে না পারিয়া বলিল, 'চল, ঐ শীলবান রাজার নিকট যাই। উনি ধার্ম্মিক; এই শব বিভাগ করিয়া আমাদের যাহার যতটুকু প্রাপ্য তাহা ঠিক করিয়া দিবেন।' অনন্তর তাহারা সেই শবের পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার নিকট গেল এবং শব ভাগ করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। রাজা বলিলেন, 'ভাগ করিয়া দিব বটে, কিন্তু আমি অশুচি অবস্থায় আছি। অগ্রে আমাকে স্নান করাও।' চোর-রাজের জন্য যে সুবাসিত জল ছিল, যক্ষদ্বয় প্রভাববলে তাহা আহরণ করিয়া শীলবান রাজাকে স্নান করাইল; স্নান হইলে চোর-রাজের জন্য যে পরিচ্ছদ ছিল তাহা আনিয়া তাঁহাকে পরাইল; চতুর্ব্বিধগন্ধ সমন্বিত[১] সুবর্ণপেটিকা আনিয়া তাঁহাকে অনুলেপন করিতে দিল; সুবর্ণপেটিকার অভ্যন্তরে মণিখচিত তালবৃন্তের উপর পুষ্প ছিল, তাহা আনিয়া তাঁহাকে সাজাইল; এবং জিজ্ঞাসা করিল 'মহারাজ! আর কিছু অনুমতি করেন কি?' রাজা বলিলেন, 'আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।' ইহা শুনিয়া যক্ষদ্বয় চোর-রাজের জন্য যে নানারসসমন্বিত অন্ন প্রস্তুত ছিল তাহা লইয়া আসিল। স্নাত, অনুলিপ্ত ও কৃতবেশবিন্যাস রাজা সেই উৎকৃষ্ট অন্ন আহার করিলেন। চোর-রাজের জন্য সুবর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধ পানীয়-জল ছিল, যক্ষদ্বয় সুবর্ণময় পানপাত্রসহ উহাও আনয়ন করিল। কাশীরাজ জলপান করিয়া মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক হাত ধুইতে লাগিলেন, এদিকে যক্ষদ্বয় চোর-রাজের জন্য প্রস্তুত পঞ্চসুগন্ধযুক্ত[২] তাম্বুল আনিয়া দিল। কাশীরাজ তাম্বুল খাইতে লাগিলেন; যক্ষেরা বলিল, 'আর কি করিতে হইবে আদেশ করুন।' কাশীরাজ বলিলেন, 'চোর-রাজের উপধানের নিম্নে আমার মঙ্গল খড়্গ আছে, তাহা লইয়া আইস।' যক্ষেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই খড়্গ লইয়া উপস্থিত হইল।

রাজা খড়্গ গ্রহণ করিয়া শবটাকে দাঁড় করাইলেন; ইহার মস্তকে আঘাত

---

[১]। চতুর্ব্বিধ গন্ধ যথা, কুঙ্কুম, যবনপুষ্প (কুন্দুরু বা লাবন; ইংরাজী frankincense); তগরক (এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণ) এবং তুরস্ক (শিলারস)। ইহা হইতে বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকালেই তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিলাসসামগ্রী আনীত হইত।

[২]। লবঙ্গ, কর্পুর ইত্যাদি।

করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয়া যক্ষদ্বয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খড়ুগ ধুইয়া কোষের মধ্যে রাখিলেন। যক্ষেরা মনুষ্য মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং 'মহারাজ আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?' জিজ্ঞাসা করিল। রাজা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে স্বীয় প্রভাববলে চোর-রাজের শয়নকক্ষে এবং এই অমাত্যদিগকে ইঁহাদের নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া আইস।' তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল।

চোর-রাজ বিচিত্র শয়নকক্ষে বিচিত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কাশীরাজ খড়ুগতল দ্বারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন। চোর-রাজ মহা ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং দীপালোকে দেখিতে পাইলেন শীলবান রাজা তাঁহার শয়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাহসে ভর করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, এখন নিশীতকাল; চতুর্দ্দিকে প্রহরী রহিয়াছে; দ্বারগুলি অর্গলনিরুদ্ধ; আমার শয়নগৃহে জনপ্রাণীর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই; এরূপ অবস্থায় আপনি কিরূপে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খড়ুগহস্তে এখানে আগমন করিলেন?' কাশীরাজ নিজের আগমন-বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া চোর-রাজের অনুতাপ জন্মিল। তিনি কহিলেন, 'অহো! রক্তমাংসাশী, ভীষণ ও নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা পর্য্যন্ত আপনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল, আর আমি মানুষ হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিলাম না! অতঃপর আমি আর কখনও আপনার ন্যায় শীলসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিব না।' অনন্তর তিনি খড়ুগ স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলেন; ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাশীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে একটী সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল; কোশলরাজ ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে পূর্ণচন্দ্রনিভ শীলবান রাজার গুণগান কীর্ত্তন করিলেন; সভামধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, অদ্যাবধি এই রাজ্যের বিদ্রোহীদিগের দমন করিবার ভার আমি লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি প্রজাপালন করুন।' অনন্তর তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের দণ্ডবিধান করিলেন এবং সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সালঙ্কার শীলবান রাজা মৃগপাদযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমি যদি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য পুনর্লাভ করিতে পারিতাম না, আমার অমাত্যদিগেরও জীবনরক্ষা

হইত না। উৎসাহ-বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, অমাত্যদিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। অহো! উৎসাহের কি অদ্ভুত ফল! সকলেরই আশায় বুক বান্ধিয়া নিরন্তর উৎসাহশীল হওয়া কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে এই গাথা বলিলেন :

ছাড়িও না আশা, মন, কর চেষ্টা অবিরাম।
অদম্য বীর্য্যের বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
উৎসাহের গুণে, দেখ, সর্ব্বদুঃখ অতিক্রমি
মন যাহা চায় তাহা লভিয়াছি সব আমি।

হৃদয়ের আবেগে বোধিসত্ত্ব এইরূপে উৎসাহের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'শীলসম্পন্ন বীর্য্য কখনও বিফল হয় না।' অতঃপর বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

* * *

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই বীর্য্যভ্রষ্ঠ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্য; বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সহস্র বিনয়ী অমাত্য, আমি ছিলাম রাজা মহাশীলবান।]

---

৫২. চূলজনক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অপর একজন উৎসাহভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) বর্ণিত হইবে।]

* * *

রাজা শ্বেতচ্ছত্রতলে উপবেশন করিয়া এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

ছাড়িও না আশা, কর চেষ্টা অবিরাম
অক্লান্ত উদ্যমে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
চেষ্টাবলে উত্তরিয়া দুস্তর সাগরে
পাইলাম কূল পুনঃ প্রহৃষ্ট অন্তরে।

* * *

---

[১]। চূল = চূল্ল (সংস্কৃত খুল্ল বা ক্ষুল্ল; ইহা সম্ভবত 'ক্ষুদ্র' শব্দজাত।)

[ইহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তখন সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন জনক রাজা।]

---

৫৩. পূর্ণপাত্রী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে বিষমিশ্রিত খাদ্যসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের কতিপয় সুরাপায়ী একস্থানে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, 'আজ মদ কিনিবার পয়সা নাই; কি উপায়ে পয়সা যোগাড় করা যায়?' ইহা শুনিয়া একটা গুণ্ডা[১] বলিল, 'তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।' 'কি উপায় বলিবে?' 'অনাথপিণ্ডদ রাজদর্শনে যাইবার সময় মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অঙ্গুরীয়ক পরিধান করিয়া যান। এস, আমরা অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে সুরাপাত্রে বিসংজ্ঞীকরণ ভৈষজ্য মিশাইয়া আপান-ভূমি সাজাইয়া রাখি; যখন তিনি আসিবেন তখন বলিব, 'আসুন, মহাশ্রেষ্ঠীন, একপাত্র পান করুন।' অনন্তর, বিষাক্ত মদ্য পান করিয়া তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক ও পরিচ্ছদ লইয়া সুরার মূল্য যোগাড় করিব।'

'এ অতি উত্তম পরামর্শ' এই কথা বলিয়া মদ্যপায়ীরা তখনই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিল এবং অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে পথে গিয়া বলিল, 'প্রভু দয়া করিয়া একবার আমাদের আপান-ভূমিতে পায়ের ধূলা দিন। আমরা আজ অতি উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করিয়াছি; আপনি তাহার একটু পান করিয়া যাইবেন।'

অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, 'কি! যে আর্য্যশ্রাবক স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছে, সে কি কখনও সুরাস্পর্শ করিতে পারে! কিন্তু সুরাপানের ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে ইহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।' তিনি আপান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুরা বিষমিশ্রিত হইয়াছে। তখন যাহাতে দস্যুরা পলায়ন করে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি বলিলেন, 'অরে ধূর্ত্তগণ, তোরা এইরূপ বিষমিশ্রিত সুরা পান করাইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিস্। তোরা তোদের আপান-ভূমিতে বসিয়া কেবল সুরার প্রশংসাই করিস্, কিন্তু নিজেরা কেহ উহা পান করিস না। যদি এই সুরা সত্যই বিষবর্জ্জিত হয়, তবে নিজেরা পান করিস না কেন?' চালাকি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া ধূর্ত্তেরা তখনই সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

---

[১]। মূলে 'কক্খলধূত্তো' এই পদ আছে। 'কক্খল' শব্দ সংস্কৃত 'কক্খট' শব্দজাত।

অনাথপিণ্ডদও শাস্তাকে এই কথা জানাইবার জন্য জেতবনে গেলেন।

শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, ধূর্ত্তেরা এজন্মে তোমায় বঞ্চনা করিতে গিয়াছিল; অতীত জন্মে তাহারা পণ্ডিতদিগকেও বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজশ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় সুরাপায়ী তখনও তাঁহাকে ঠিক এইরূপে বিষমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সুরাপানের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আপান-ভূমিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুরা বিষমিশ্রিত। অনন্তর তাহারা যাহাতে পলায়ন করে এরূপ উপায় স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, রাজভবনে গমনকালে সুরাপান করা বিধেয় নহে; তোমরা এখানে বসিয়া থাক; আমি ফিরিবার সময় ভাবিয়া দেখিব, পান করিতে পারি কি না।

বোধিসত্ত্ব যখন রাজভবন হইতে প্রতিগমন করিতেছিলেন তখন ধূর্ত্তেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিল। তিনি আপান-ভূমিতে গিয়া বিষমিশ্রিত সুরাপাত্র দেখিয়া বলিলেন, 'অরে ধূর্ত্তগণ, তোদের আকার প্রকার ত আমার কাছে ভাল বোধ হইতেছে না। আমি যাইবার সময় পানপাত্রগুলি যেমন পূর্ণ দেখিয়াছিলাম, এখনও সেগুলি তেমনি আছে; তোরা সুরার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিস্ বটে, কিন্তু নিজেরা এক বিন্দুও পান করিস নাই। এ সুরা যদি ভাল হইবে তবে তোরা পান করিলি না কেন? ইহা নিশ্চিত বিষমিশ্রিত।' এইরূপে ধূর্ত্তদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

মুখে বলিস সুরা মোদের অতি চমৎকার;
একটী বিন্দু তবু কেন পান করিসনি তার?
পূর্ব্বমত পাত্রগুলি পূর্ণ দেখতে পাই।
বিষমিশানসুরা তোদের বুঝলাম আমি তাই।

বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন সৎকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

* * *

[সমবধান—তোমার সহিত যে সকল ধূর্ত্তের দেখা হইয়াছিল তখন তাহারা ছিল সেই সকল ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।]

৫৪. ফল-জাতক

[এক উপাসক কোন ফল ভাল, কোন ফল মন্দ ইহা অতি সুন্দর বুঝিতে পারিত।[১] একদিন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া উদ্যানমধ্যে তাঁহাদের আসন করিয়া দেন এবং যাগু ও খজ্জ দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান। তদনন্তর তিনি উদ্যাপালককে বলেন, 'ভিক্ষুদিগের সঙ্গে যাও, ইঁহারা আম্রাদি ফল যে যাহা চাহিবেন, পাড়িয়া দিবে।' সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে লাগিল এবং গাছের দিকে তাকাইয়া কোন ফলটা বেশ পাকিয়াছে, কোনটা আধ পাকা, কোনটা কাঁচা এইরূপ বলিতে লাগিল। সে যে ফলটা সম্বন্ধে যাহা বলিল, পাড়িলে দেখা গেল তাহাই ঠিক। ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট ফিরিয়া উদ্যানপালককের ফলকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন 'ভিক্ষুগণ কেবল এই উপাসকই যে একা ফলকুশল তাহা মনে করিও না; পুরাকালে পণ্ডিতেরাও এরূপ ফলকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়, বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি কোন বৃহৎ অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য তাঁহাকে ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে দেখিয়া তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুনিয়াছি এই বনে নাকি বিষবৃক্ষ আছে। অতএব সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন ফল, ফুল বা পত্র আহার করিও না।' তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। অনন্তর সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই বনের সীমাসন্নিধানেই একখানি গ্রাম এবং ঐ গ্রামের পুরোভাগে একটী কিম্ফল[২] বৃক্ষ ছিল। কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সকল বিষয়েই সেই কিম্ফলবৃক্ষ আম্রবৃক্ষের অনুরূপ ছিল। কেবল দেখিতে নয়, আস্বাদে ও গন্ধেও, কাঁচা হউক, পাকা হউক, কিম্ফলে ও আম্রফলে কোন প্রভেদ দেখা যাইত না;

---

[১]। মূলে 'ফলকুশল' এই পদ আছে।

[২]। যাহার ফল কিরূপ তাহা জানা নাই।

কিন্তু উদরস্থ হইতে ইহা হলাহলের ন্যায় জীবনান্ত ঘটাইত।

বোধিসত্ত্বের কয়েকজন লোভী অনুচর দলের আগে আগে যাইতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ কিম্ফলকে আম্রফল বিবেচনা করিয়া কয়েকটা খাইয়া ফেলিল; কিন্তু অনেকে বিবেচনা করিল 'বোধিসত্ত্বকে না জিজ্ঞাসা করিয়া খাওয়া ভাল নহে।' তাহারা ফল হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা বলিল, 'আর্য্য, আমরা এই আম্রফল খাইব কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ইহা আম্রফল নহে, কিম্ফল; ইহা খাইতে নাই।' অনন্তর, যাহারা ফল খাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বমন করাইলেন এবং চতুর্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে তাহারা আরোগ্য লাভ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সার্থবাহেরা বহুবার এই বৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিয়া আম্রফল ভ্রমে কিম্ফল খাইয়াছিল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাইত, পা ধরিয়া টানিয়া শবগুলি কোন নিভৃতস্থানে ফেলিয়া দিত এবং শকট সুদ্ধ সমস্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া যাইত।

এ দিনও প্রভাত হইবামাত্র তাহারা লুণ্ঠনের আশায় বৃক্ষাভিমুখে আসিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল 'আমরা বলদগুলা লইব', কেহ কেহ বলিতে লাগিল 'আমরা গাড়ীগুলা লইব', কেহ কেহ বলিতে লাগিল 'আমরা মাল লইব।' কিন্তু বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখে এক প্রাণীও মরে নাই, সকলেই বেশ সুস্থ আছে! গ্রামবাসীরা তখন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা যে আম গাছ নয় তাহা তোমরা কিরূপে বুঝিলে?' বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, 'আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সার্থবাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।'

তখন গ্রামবাসীরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'পণ্ডিতবর, এটা যে আম গাছ নয় তাহা আপনি কিরূপে স্থির করিলেন?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'দুই কারণে তাহা বুঝিয়াছি :

গ্রামদ্বারে শোভে বৃক্ষ, দুরারোহ নয়,
ফলভারে কিন্তু সদা অবনত রয়।
ইহাতে বুঝিনু, শুন, গ্রামবাসীগণ,
এ ফল সুফল নহে; খাইলে মরণ।'

অনন্তর সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্য দেশে চলিয়া গেলেন।

* * *

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৫৫. পঞ্চায়ুধ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর দিল, 'হাঁ ভগবন।' 'অতীত যুগে পণ্ডিতেরা উপযুক্তকালে বীর্য্যপ্রয়োগ করিয়া রাজসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।' অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে তদীয় জনক জননী অষ্টশত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট উপহার দিয়া পুত্রের অদৃষ্ট কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞেরা বোধিসত্ত্বকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া উত্তর করিলেন, 'মহারাজ, এই কুমার আপনার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া সর্ব্বগুণোপেত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইবেন; পঞ্চবিধ আয়ুধের[১] প্রভাবে ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না।' এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বোধিসত্ত্বের জনক জননী তাহার নাম রাখিলেন 'পঞ্চায়ুধ কুমার।'

বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস, এখন বিদ্যা শিক্ষা কর।' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিব, বাবা?' রাজা বলিলেন, 'গান্ধার-রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক দেশবিখ্যাত আচার্য্য আছেন; তাঁহার নিকট গিয়া বিদ্যাভ্যাস কর। তাঁহাকে এই সহস্রমুদ্রা দক্ষিণা দিও।'

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিতে চাহিলেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চায়ুধ লইয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক বন ছিল; সেখানে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই বনের নিকটবর্ত্তী হইলে যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল; তাহারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল। তাহারা বলিল, 'ঠাকুর, এই বনে প্রবেশ করিও না; ইহার মধ্যে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ আছে; সে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই মারিয়া ফেলে। বোধিসত্ত্ব

---

[১]। খড়্গ, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও চর্ম্ম।

আত্মবল বুঝিতেন; তিনি নির্ভীক সিংহের ন্যায় বনে প্রবেশ করিলেন এবং উহার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন। তখন যক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার শরীর তালতরুর ন্যায় মস্তক একটা কূটাগারের[১] ন্যায়, চক্ষুদুইটী দুইটা গামলার মত, উপরের দুইটা দাঁত দুইটা মূলার মত, মুখ বাজপাখীর মুখের মত, উদর নানা বর্ণে চিত্রিত, হস্ত ও পাদ নীলবর্ণ। সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'কোথায় যাচ্ছ? থাম; তুমি আমার খাদ্য।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'দেখ যক্ষ আমি নিজের বল বুঝিয়া-সুঝিয়াই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ কর নাই; কারণ আমি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিয়া, তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেইখানেই, তোমায় নিপাত করিব।' এই বলিয়া তিনি শরাসনে হলাহলযুক্ত শরসন্ধান করিয়া যক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব একে একে পঞ্চাশটী শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সমস্তই যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল, শরীর বিদ্ধ করিতে পারিল না। যক্ষ একবার গা ঝাড়া দিয়া সমস্ত বাণ নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল, এবং বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধিসত্ত্ব হুঙ্কার ছাড়িয়া খড়ুগ নিষ্কোষিত করিয়া আঘাত করিলেন। ঐ খড়ুগখানা তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ছিল; কিন্তু ইহাও যক্ষের লোমস্পর্শ করিবামাত্র আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, মুদ্‌গর দ্বারা প্রহার করিলেন; কিন্তু সমস্তই অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন বোধিসত্ত্ব সিংহনিনাদে বলিলেন, 'যক্ষ! আমার নাম যে পঞ্চায়ুধকুমার তাহা বোধহয় তোমার জানা নাই। আমি যে কেবল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই তোমার বনে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করিও না; আমার দেহেও বিলক্ষণ বল আছে। আমি এক মুষ্ট্যাঘাতে তোমার শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছি।' কিন্তু তিনি যেমন দক্ষিণ হস্তদ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন, অমনি উহা তাহার লোমে আবদ্ধ হইল। তিনি বামহস্তদ্বারা আঘাত করিলেন, বামহস্তও আবদ্ধ হইল; দক্ষিণ পাদদ্বারা আঘাত করিলেন, দক্ষিণ পাদও আবদ্ধ হইল; বাম পাদদ্বারা আঘাত করিলেন, বামপাদও আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও বোধিসত্ত্ব নির্ব্বীর্য্য হইলেন না। 'তোমাকে এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ করিব' বলিয়া এবার তাহাকে মস্তক দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু মস্তকও লোমজালে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এইরূপে পঞ্চাঙ্গে আবদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষের দেহের উপর ঝুলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক তেজ পুর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ন রহিল। যক্ষ ভাবিল, 'এই

---

[১]। কূটাগার = চিলা কোঠা।

ব্যক্তি দেখিতেছি অদ্বিতীয় পুরুষসিংহ; আমার ন্যায় যক্ষের হাতে পড়িয়াও ইহার কিছুমাত্র সন্ত্রাস জন্মে নাই। আমি এত দিন এই বনে মানুষ ধরিয়া খাইতেছি, কিন্তু কখনও এরূপ নির্ভীক লোক দেখি নাই। এ যে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছে না, ইহার কারণ কি?' সে বোধিসত্ত্বকে তখনই খাইয়া ফেলিতে সাহস করিল না; সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর, তোমার মরণভয় নাই কেন?'

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'যক্ষ! ভয় করিব কেন? একবার জন্মিলে একবার মরণ ইহা ত অবধারিত। অধিকন্তু আমার উদরে বজ্রায়ুধ[১] আছে; তুমি আমাকে খাইতে পার, কিন্তু ঐ আয়ুধ জীর্ণ করিতে পারিবে না; উহা তোমার অন্ত্রগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিবে; সুতরাং আমার মরণে তোমারও মরণ হইবে। এখন বুঝিলে আমার মরণভয় নাই কেন?'

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিতে লাগিল, 'এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যই বলিয়াছে। এরূপ পুরুষসিংহের শরীরের মুদ্গবীজমাত্র মাংসও আমি জীর্ণ করিতে পারিব না। ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।' এইরূপে নিজ মরণভয়ে ভীত হইয়া সে বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'ব্রাহ্মণকুমার, তুমি পুরুষসিংহ; তুমি আমার হস্ত হইতে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের ও স্বজনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বদেশে গমন কর।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যক্ষ! আমি ত চলিলাম; কিন্তু তোমার কি গতি হইবে? তুমি পূর্ব্বজন্মকৃত অকুশল কর্ম্মের ফলে অতিলোভী, হিংসাপরায়ণ, পররক্তমাংসভুক্ যক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যদি ইহজীবনেও এইরূপ অকুশল কর্ম্মেই নিরত থাক, তাহা হইলে তোমাকে এক অন্ধকার হইতে অপর অন্ধকারে গতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তখন আর অকুশল কর্ম্মে আসক্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাণিহত্যা মহাপাপ; নিয়রগমন; তীর্য্যগযোনিলাভ, প্রেত বা অসুররূপে পুনর্জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম। যদি দৈবাৎ নররূপেও পুনর্জন্ম লাভ হয়, তাহা হইলেও প্রাক্তনফলে আয়ুষ্কাল অতীব অল্প হইয়া থাকে।[২]

এবংবিধ উপদেশ পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব পঞ্চদুঃশীল কর্ম্মের অশুভ ফল এবং পঞ্চশীলের শুভ ফল প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে নানা উপায়ে তিনি যক্ষের মনে পারলৌকিক ভয় উৎপাদিত করিলেন এবং তাহাকে সংযমী ও পঞ্চশীলপরায়ণ

---

[১]। জ্ঞানরূপ তরবারি। বাইবলে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান, আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার রক্ষাসাধক গুণগুলি অস্ত্র-শস্ত্রাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[২]। বৌদ্ধমতে অকালমৃত্যু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল। যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মানবের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

করিয়া তুলিলেন, অনন্তর তাহাকে ঐ বনের দেবত্বপদে স্থাপিত করিয়া, পূজোপহার গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া এবং অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া বোধিসত্ত্ব বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে তিনি যক্ষের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া গেলেন।

অবশেষে পঞ্চায়ুধ-কুমার বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। উত্তরকালে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছিলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ পরিণত বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

*　　*　　*

[কথাবসানে ভগবান অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

বিষয়-বাসনাহীন চিত্ত আর মন,
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সদা নির্ব্বাণ-কারণ,
এরূপ লক্ষণযুত সাধু সদাশয়
সর্ব্ববন্ধ-বিনির্মুক্ত জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে অর্হত্ত্ব-ফলোপযোগী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল[১] ছিল সেই যক্ষ, এবং আমি ছিলাম পঞ্চায়ুধ-কুমার।]

---

৫৬. কাঞ্চনখণ্ড-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রলোক শাস্তার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রত্নশাসনে[২] শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যে সকল আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের উপর তাঁহার শিক্ষাবিধানের ভার বিন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিষয় শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইটী প্রথম শীল, একটী দ্বিতীয় শীল ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা দশশীল ব্যাখ্যা করিলেন,

---

[১]। অঙ্গুলিমাল বা অঙ্গুলিমালক। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঘটনাক্রমে একজন ভীষণ দস্যু হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে ইনি একে একে ৯৯৯ জন পথিকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়াছিলেন। পরিশেষে বুদ্ধের কৃপায় ইঁহার মতি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[২]। উৎকৃষ্ট শাসন অথবা ত্রিরত্ন শাসন, শাসন = ধর্ম্ম।

কোনগুলি চুল্লশীল, কোনগুলি মধ্যমশীল, কোনগুলি মহাশীল[১] তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, প্রাতিমোক্ষসংবরশীল,[২] ইন্দ্রিয়সংবরশীল, আজীবপরিশুদ্ধিশীল, প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল, এই সকলও প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিলেন না। ক্রমাগত এই সকল উপদেশ শুনিয়া ঐ ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন, 'শীল ত দেখিতেছি অশেষ প্রকার; আমি কখনই ইহাদের সমস্তগুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিব না। তাহাই যদি না পারিলাম, তবে ভিক্ষু হইয়া ফল কি? অতএব আমার পক্ষে পুনর্ব্বার গৃহী হওয়াই ভাল। গৃহী হইলে আমি দানাদি পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব, স্ত্রী পুত্রেরও মুখ দেখিতে পাইব।' অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগকে বলিলেন, 'মহাশয়গণ, আমি শীলব্রত সম্পাদনে অসমর্থ, আমার প্রব্রজ্যা বিফল; কাজেই পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যরূপ হীনাশ্রমে প্রবেশ করিব স্থির করিয়াছি। আপনারা আমায় যে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন তাহা প্রতিগ্রহণ করুন।' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'যদি এইরূপই সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে দশবলের নিকট বিদায় লইয়া যাও।' অনন্তর তাঁহারা এই ভিক্ষুকে লইয়া ধর্ম্মসভায় দশবলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এই ভিক্ষুকে ইঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আনয়ন করিলে কেন?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভগবন, এই ভিক্ষু সমস্ত শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন না বলিয়া পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন; তাই আমরা ইঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।' ইহা শুনিয়া শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ইঁহাকে এককালে এতগুলি শীল শিক্ষা দিতে গেলে কেন? ইঁহার যতদূর শীলরক্ষার শক্তি আছে, ততদূরই রক্ষা করিবেন; তাহার অতিরিক্ত কিরূপে রক্ষা করিবেন? অতঃপর যেন তোমাদের এরূপ ভ্রম না ঘটে। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা আমি নির্ণয় করিয়া দিতেছি?' অনন্তর তিনি সেই ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোমার এক সঙ্গে বহুশীল অভ্যাস করিতে হইবে না; তুমি তিনটী

---

[১]। বৌদ্ধদিগের শীলস্কন্ধ তিন অংশে বিভক্ত :—চুল্ল, মধ্যম ও মহান। চুল্লশীল বলিলে যে সকল সদাচার সহজেই প্রতিপালন করা যায় সেই গুলিকে বুঝায়, যেমন অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি। মহাশীল বলিলে দৈবগণনা প্রভৃতি গর্হিত বৃত্তির পরিহার বুঝায়। সর্ব্ববিধ গর্হিত বৃত্তির পরিহার অনেকের পক্ষে সুখকর নহে, এই জন্যই এই সকল নিয়ম মহাশীল নামে অভিহিত। মধ্যমশীলগুলি রক্ষা করা তত সহজও নহে, তত কঠিনও নহে।

[২]। 'প্রাতিমোক্ষ' শব্দে বিনয়পিটকের অন্তর্গত ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ৭৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়সংবরশীল = ব্রহ্মচর্য্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী। আজীবপরিশুদ্ধিশীল = যাবজ্জীবন বিশুদ্ধিমার্গে বিচরণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী। প্রত্যয়প্রতিসেবন শীল = ভিক্ষুদিগের প্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, খাদ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ ব্যবহার্য্য বস্তুসংক্রান্ত নিয়মাবলী।

শীল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে কি?' হাঁ ভগবন, আমি তিনটী শীল পালন করিতে পারিব।' 'বেশ কথা! তুমি এখন হইতে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার এই তিনটী পাপপ্রবেশ-পথ রক্ষা করিয়া চল। কায়ে কখনও কুকার্য্য করিও না, মনে কখনও কুচিন্তা করিও না, বাক্যে কখনও কুকথা প্রয়োগ করিও না। তুমি হীন গার্হস্থ্য দশায় প্রতিগমন করিও না, এখানে অবস্থিতি করিয়া উক্ত শীলত্রয় পালন করিতে থাক।' এই উপদেশ লাভ করিয়া ভিক্ষুর বড় আনন্দ হইল; তিনি 'হাঁ ভগবন, আমি এই শীলত্রয় পালন করিব' বলিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। এই শীলত্রয় পালন করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ আমাকে এত শীলের কথা বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহ বুদ্ধ নহেন বলিয়া এই তিনটী শীলেরও মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেন না, কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ নিজের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে পাপদ্বার নিরোধক তিনটী মাত্র নিয়ম দ্বারা আমাকে সর্ব্বশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অহো! শাস্তা আশ্রয় দিয়া আমার কি উপকারই না করিলেন!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় দিনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। যখন ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'অহো, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! যে ব্যক্তি শীল রক্ষা করিতে পারিবে না ভাবিয়া হীনাশ্রমে প্রতিগমন করিতেছিল, তাহাকে তিনি তিনটী মাত্র নিয়ম দ্বারা সর্ব্বশীল শিক্ষা দিলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন!' ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'অতি গুরুভারও খণ্ডশ বহন করিলে লঘু হইয়া থাকে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অতি বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ পাইয়া প্রথমে উহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই; শেষে, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অনায়াসে লইয়া গিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কর্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, যেখানে পূর্ব্বে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী ঊরুপ্রমাণস্থূল চতুর্হস্ত দীর্ঘ এক কাঞ্চনখণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের লাঙ্গল সেই কাঞ্চনখণ্ডে প্রতিহত হইল। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত কোন বৃক্ষমূলে তাহার লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু খনন করিয়া দেখেন উহা কাঞ্চনখণ্ড। উহাতে ময়লা লাগিয়াছিল, তাহা তিনি সযত্নে ছাড়াইয়া রাখিলেন। অনন্তর সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বোধিসত্ত্ব যুগ ও লাঙ্গল এক

পাশে রাখিয়া দিয়া ঐ কাঞ্চনখণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তিনি উহা তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ সুবর্ণদ্বারা কি কি কাজ করিবেন বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, 'এক অংশ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিব, এক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিব, এক অংশ লইয়া বাণিজ্য করিব এবং এক অংশ দ্বারা দানাদি পুণ্যকার্য্য করিব।' অনন্তর তিনি সেই কাঞ্চনখণ্ডকে চারি টকুরা করিয়া কাটিলেন এবং একটী করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবনযাপনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

* * *

[কথাশেষে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

পুর্ণানন্দচিত্ত আর পূর্ণানন্দমন,
নিয়ত কুশলকর্ম্মা নির্ব্বাণ-কারণ,
ভবপাশ-মুক্ত সেই সাধুসদাশয়
ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী সদা জানিবে নিশ্চয়।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কর্ষক, যে কাঞ্চনখণ্ড লাভ করিয়াছিল।]

☞ কাঞ্চনখণ্ড-জাতক, সুজাতা-জাতক, শ্রমণ্যফল-সূত্র প্রভৃতি হইতে দেখা যায় জনসাধারণকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী ছিল; তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার গুণে অতি জটিল বিষয়ও সরল হইত, পাষণ্ডেরও হৃদয় গলিত। বুদ্ধের কোন কোন উপদেশ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে। প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় উপদেষ্টাই অনেক সময় পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ বাহির করিয়া পরিশেষে তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

---

৫৭. বানরেন্দ্র-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও দেবদত্ত আমার প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছিল,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই' অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ণবয়সে তিনি অশ্ব-শাবক প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান হইয়াছিলেন। তিনি একচর হইয়া কোন নদীতীরে বাস করিতেন। ঐ নদীর মধ্যে আম্রপনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষসম্পন্ন এক দ্বীপ বিরাজ করিত। বোধিসত্ত্ব যে পারে থাকিতেন সেখান হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত ঠিক অর্দ্ধপথে নদীগর্ভে একটী শৈল অবস্থিত ছিল। হস্তিবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীতীর হইতে একলম্ফে সেই শৈলের উপর এবং সেখান হইতে আর এক লম্ফে দ্বীপে গিয়া পড়িতেন। সেখানে তিনি দ্বীপজাত নানাবিধ ফল আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় ঠিক ঐরূপে নদী পার হইয়া বাসস্থানে ফিরিতেন।

ঐ নদীতে সস্ত্রীক এক কুম্ভীর বাস করিত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন এপার ওপার হইতে দেখিয়া তাহার অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যার সাধ হইল যে বানরের হৃৎপিণ্ড খায়। সে কুম্ভীরকে বলিল, 'আর্য্যপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বানরেন্দ্রের হৃদয়মাংস আনিয়া দিন।' কুম্ভীর বলিল, 'আচ্ছা, তোমার সাধ পুরাইতেছি; এই বানর আজ যখন সন্ধ্যার সময় ফিরিবে তখন ইহাকে ধরিব।' ইহা স্থির করিয়া সে শৈলোপরি উঠিয়া থাকিল।

বোধিসত্ত্ব নাকি প্রতিদিন নদীর জল কতদূর উঠিত এবং পাহাড়টা কতদূর জাগিয়া থাকিত, তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইতেন। অদ্য সমস্ত দিন বিচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে শৈলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন যে যদিও নদীর জল কমেও নাই, বাড়েও নাই, তথাপি পাষাণের অগ্রভাগ উচ্চতর বোধ হইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল হয়ত তাঁহাকে ধরিবার জন্য ওখানে কুম্ভীর অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত যেন সেখানে থাকিয়াই পাষাণের সহিত কথা বলিতেছেন এই ছলে, উচ্চৈঃস্বরে 'ওহে পাষাণ' বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং কোন উত্তর না পাইয়া তিন বার 'ওহে পাষাণ' বলিয়া ডাকিলেন। অনন্তর ইহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি বলিলেন, 'কিহে ভাই পাষাণ, আজ কোন উত্তর দিতেছ না কেন?'

কুম্ভীর ভাবিল, 'তাই ত, এই পাষাণ প্রতিদিন বানরেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়া থাকে। আজ তবে আমিই পাষাণের পরিবর্ত্তে সাড়া দিই। তখন সে 'কেও, বানরেন্দ্র না কি?' এই বলিয়া উত্তর দিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে গো?' সে বলিল, 'আমি কুম্ভীর।' 'ওখানে বসিয়া আছ কেন?' 'তোমাকে

ধরিতে ও তোমার কলিজা খাইতে।' বোধিসত্ত্ব দেখিলেন দ্বীপ হইতে ফিরিবার অন্য পথ নাই; অতএব কুম্ভীরকে বঞ্চনা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, 'কুমীর ভাই, আমি তোমায় ধরা দিতেছি; তুমি হাঁ কর; আমি যেমন লাফাইয়া পড়িব, অমনি তুমি আমায় ধরিয়া ফেলিবে।

কুম্ভীরেরা যখন মুখ ব্যাদান করে তখন তাহাদের চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হয়।[১] বোধিসত্ত্ব যে প্রবঞ্চনা করিতেছেন কুম্ভীরের মনে এ সন্দেহ হয় নাই। কাজেই সে তাঁহার কথামত মুখ ব্যাদান ও চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তদবস্থ জানিতে পারিয়া এক লম্ফে তাহার মস্তকের উপর এবং অপর লম্ফে বিদ্যুৎবেগে নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুম্ভীর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বলিল, 'বানরেন্দ্র, চারিটী গুণ থাকিলে সর্ব্ব শত্রু দমন করিতে পারা যায়। তোমার দেখিতেছি সে চারিটী গুণই আছে।

সত্য,[২] ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা,—এই চারিগুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করিয়া কুম্ভীর স্বস্থানে চলিয়া গেল।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কুম্ভীর; চিঞ্চাব্রাহ্মণী[৩] ছিল সেই কুম্ভীরের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।

☞ এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত গুহাশায়ী সিংহের এবং শেষাংশের সহিত সাগরতীরস্থ জম্বুবৃক্ষবাসী মর্কটের কথার সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রকারের হাতে গল্পাংশের যে সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা পাঠকেরা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

---

[১]। প্রাণিতত্ত্ববিদরা কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না।

[২]। এখানে 'সত্য' বাক্যে, কার্য্যে নহে এইরূপ বুঝিতে হইবে। বানর কুম্ভীরের নিকট যাইবে বলিয়াছিল, গিয়াও ছিল; কুম্ভীর যে ধরিতে পারিল না তাহা তাহার নিজের দোষ।

[৩]। চিঞ্চাব্রাহ্মণী একজন অসামান্য রূপবতী ভিক্ষুণী। গৌতমের শত্রুরা ইহাকে গর্ভিণী সাজাইয়া তাহার চরিত্রের কলুষতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিরূপে এই প্রতারণা ধরা পড়ে তাহা ধর্ম্মপদে বর্ণিত আছে। চিঞ্চাসম্বন্ধে বন্ধনমোক্ষ-জাতক (১২০) এবং মহাপদ্ম-জাতকও (৪৭২) দ্রষ্টব্য।

৫৮. ত্রয়োধর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে প্রাণিহত্যার চেষ্টা সম্বন্ধে এই কথা বলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় দেবদত্ত বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আত্মজ বানরযূথ-পরিবৃত হইয়া হিমাচলের পাদদেশে বিচরণ করিত। 'ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার আধিপত্য নষ্ট করিতে পারে' এই আশঙ্কায় সে দন্তদ্বারা দংশন করিয়া আত্মজদিগকে ছিন্নমুষ্ক করিয়া দিত। দেবদত্তের ঔরসে বোধিসত্ত্ব যখন জননীজঠরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এক অরণ্যে পলাইয়া রহিল এবং যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। যখন বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তি হইল ও বোধ জন্মিল তখন তিনি অসাধারণ বীর্য্যবান হইলেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বাবা কোথায় থাকেন মা?' বানরী কহিল, 'তিনি অমুক পর্ব্বতের পাদদেশে এক বানরযূথের উপর আধিপত্য করেন।' 'আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল'। 'না বাছা, তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না; তিনি আধিপত্যলোপের ভয়ে নিজের সন্তানদিগকে দন্তদ্বারা ছিন্নমুষ্ক করিয়া দেন।' 'তাহা করুন; তুমি আমায় লইয়া চল; কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা আমার জানিতে কষ্ট হইবে না।'

বোধিসত্ত্বের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বানরী তাঁহাকে দেবদত্তের নিকট লইয়া গেল। দেবদত্ত পুত্রকে দেখিয়াই ভাবিল, 'এ বড় হইলে আমার আধিপত্য কাড়িয়া লইবে; অতএব এখনই আলিঙ্গনচ্ছলে ইহাকে নিষ্পেষিত করিয়া নিহত করা যাউক।' অনন্তর, 'এস বাপ আমার, এত দিন কোথায় ছিলে?' বলিয়া আলিঙ্গন করিবার ছলে সে বোধিসত্ত্বকে নিষ্পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নাগবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্বও জনককে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ বানরের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণপ্রায় হইল। তখন দেবদত্তের ধ্রুব বিশ্বাস হইল বোধিসত্ত্ব বড় হইলে তাহার জীবনান্ত করিবেনই করিবেন। অতএব কি উপায়ে বোধিসত্ত্বকেই অগ্রে মারিয়া ফেলিতে পারে সে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অদূরে রাক্ষসনিষেবিত একটী সরোবর ছিল; দেবদত্ত স্থির করিল বোধিসত্ত্বকে সেখানে পাঠাইতে পারিলে রাক্ষস তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার ইচ্ছা তোমাকে এই বানরযূথের আধিপত্য প্রদান করি; আজই তোমাকে বানররাজ-পদে অভিষিক্ত করিব। অমুক স্থানে একটী সরোবর আছে; সেখানে দুই প্রকার কুমুদ, তিন প্রকার উৎপল[১] এবং পাঁচ প্রকার পদ্ম জন্মে। যাও, সেখান হইতে কয়েকটী ফুল

---

[১]। এখানে 'উৎপল' শব্দে নীল বা রক্তপদ্ম বুঝিতে হইবে।

লইয়া আইস।' বোধিসত্ত্ব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তখনই সেই সরোবরে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব সহসা সেই সরোবরের জলে অবতরণ না করিয়া তটদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, প্রাণীগণ জলে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই সেখান হইতে প্রতিগমন করে নাই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন এই সরোবরে রাক্ষস আছে; পিতা নিজে আমাকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাক্ষসের উদরসাৎ হইবার জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, 'আমি জলে অবতরণ না করিয়াই পদ্মচয়ন করিতেছি।' অনন্তর তিনি তীরস্থ নিরুদক স্থানে গিয়া বেগগ্রহণ-পূর্ব্বক লম্ফ দিলেন এবং আকাশপথে সরোবর লঙ্ঘন করিবার সময় জলের উপরে যে সকল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার দুইটী ছিঁড়িয়া লইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন; ফিরিবার সময়ও তিনি এইরূপে আর দুইটী পদ্ম তুলিয়া লইলেন। এইরূপে একবার এপারে, একবার ওপারে লাফাইয়া গিয়া তিনি সরোবরের উভয় পার্শ্বে পদ্মরাশিসংগ্রহ করিলেন, অথচ একবারও তাঁহাকে জলে অবতরণ করিতে হইল না। শেষে ইহার অধিক পুষ্প বহন করিতে পারিব না মনে করিয়া তিনি অবচিত পুষ্পগুলি একপারে রাশি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভাবিতে লাগিল, 'আমি এত কাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু কখনও এরূপ প্রজ্ঞাবান ও অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ দেখি নাই। এই বানর যত ইচ্ছা পুষ্প চয়ন করিল, অথচ জলে অবতরণ করিল না।' অনন্তর সে জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, 'বানরেন্দ্র, জগতে যাহার তিনটী গুণ আছে সে শত্রু দমন করিয়া থাকে। আমার বোধ হইতেছে আপনাতে সেই তিনটী গুণই বিদ্যমান আছে :

দক্ষ, শৌর্য্যবান, উপায়কুশল যেই জন এ সংসারে
সদাজয়ী সেই, সকল সংগ্রামে, শত্রুর সংহার করে।'

এইরূপে বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিয়া উদকরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এই সকল পুষ্প চয়ন করিলেন কেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বাবা আমাকে আজ রাজপদ দিবেন, সেই জন্য পুষ্প লইতে আসিয়াছি।' 'আপনার মত মহাত্মা পুষ্প বহন করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা ভাল দেখাইবে না, আমি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া রাক্ষস সমস্ত ফুল কুড়াইয়া লইয়া বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া দেবদত্ত বুঝিতে পারিল তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি ছেলেকে পাঠাইলাম রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে বলিয়া; কিন্তু এখন দেখিতেছি বিনীতভাবে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুষ্প বহন

করিয়া আনিতেছে। অহো! এতদিন আমার সর্ব্বনাশ হইল!' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃৎপিণ্ড শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অপর সমস্ত বানর সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিল।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বানররাজ এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

---

৫৯. ভেরীবাদ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন 'ওহে ভিক্ষু, লোকে বলে তুমি বড় অবাধ্য; ইহা সত্য কি?' ভিক্ষু বলিল, 'হাঁ ভগবন, সত্য।' শাস্তা বলিলেন, 'তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও তোমার এই দোষ ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গ্রামে বাস করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন বারাণসী নগরে কোন যোগ উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। সমাগত লোকের নিকট ভেরী বাজাইলে বিলক্ষণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তিনি নিজের পুত্রসহ সেখানে গমন করিলেন।

ভেরী বাজাইয়া বোধিসত্ত্ব বহু ধন লাভ করিলেন এবং পর্ব্ব শেষ হইলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল; সেখানে দস্যুরা উপদ্রব করিত। বোধিসত্ত্বের পুত্র পথ চলিবার সময় অবিরত ভেরী বাজাইতেছিল; তিনি তাহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'বৎস, নিরন্তর বাজাইও না; বড় লোকের পথ চলিবার সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে ভেরী বাজে, সেইরূপ বাজাও।' কিন্তু পিতার নিষেধ সত্ত্বেও সেই বালক ক্ষান্ত হইল না, সে ভাবিল, ভেরীর শব্দ শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিবে। প্রথমে ভেরীর বাদ্য শুনিয়া দস্যুরা বাস্তবিকই পলায়ন করিল, কারণ তাহারা ভাবিল কোন বড় লোক হয়ত বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যখন নিরন্তর ভেরীর ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং ফিরিয়া দেখিল দুইটী মাত্র লোক

যাইতেছে। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়া সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'হায়, এত কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিলাম, ক্রমাগত ভেরী বাজাইয়া তুমি তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিলে।' অনন্তর তিনি এইগাথা পাঠ করিলেন :

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন;
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জন।
ভেরী বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জন;
কিন্তু পুনঃপুন করি ভেরীর বাদন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সব বিসর্জ্জন।

* * *

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই ভেরীবাদকের পুত্র এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

৬০. শঙ্খধ্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অপর একজন অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শঙ্খধ্ম-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন যোগের সময় পিতার সহিত রাজধানীতে গিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বিস্তর অর্থলাভপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে একটা বন ছিল এবং সেই বনে দস্যুরা উপদ্রব করিত। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ করিলেন। বৃদ্ধ ভাবিল, শঙ্খধ্বনি শুনিলে দস্যুরা পলায়ন করিবে; কাজেই সে নিষেধ না শুনিয়া নিরন্তর শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া (ঊনষষ্টিতম জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে) দস্যুরা সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন,
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জ্জন
শঙ্খ বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জ্জন;
কিন্তু পুনঃপুন করি শঙ্খর স্বনন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সবে বিসর্জ্জন।

* * *

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বৃদ্ধ শঙ্খধ্ম এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

----

৬১. অশাতমন্ত্র-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত উন্মাদয়ন্তী-জাতকে (৫২৭) বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে, বলিলেন, 'দেখ, রমণীরা কামপরায়ণা, অসতী, হেয়া ও নীচমনা। তুমি এইরূপ জঘন্যপ্রকৃতি নারীর জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?' অনন্তর তিনি অতীত যুগের একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বেদত্রয়ে এবং অপর সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং নিজেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অচিরে সর্ব্বত্র তাঁহার যশ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে বারাণসী নগরের কোন ব্রাহ্মণকুলে একটী পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহার ভুমিষ্ঠ হইবার সময় তদীয় পিতা যে অগ্নিস্থাপন করিয়াছিলেন,[২] তাহা এক দিনের জন্যও নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। বালকটীর বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাহার জনক-জননী বলিলেন, 'বৎস, যেদিন তোমার জন্ম হয় সেইদিন এই অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি ইহা কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। যদি তোমার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অগ্নি লইয়া বনে যাও, এবং সেখানে একাগ্র চিত্তে ভগবান অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও; কিন্তু যদি গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে

---

[১]। শাত = সুখ, মঙ্গল, অশাত = অসুখ, অমঙ্গল। ৬১ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত দশটী জাতক 'স্ত্রীবর্গ' নামে অভিহিত। এই সকল উপাখ্যানে নারীজাতির প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। কামিনী ও কাঞ্চনের অপকারিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মমতেরও ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য কোন শাস্ত্রকার সমগ্র নারী সমাজকে এত ঘৃণার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। উত্তর-কালে স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে রমণী সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং বিশাখা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি উপাসিকা ও স্থবিরাদিগের কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

[২]। এই অগ্নিকে জাতাগ্নি বা প্রগল্ভাগ্নি বলে। অগ্নিহোত্রীরা, বিবাহের সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, যাবজ্জীবন তাহারই সেবা করিয়া থাকেন।

অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর।' ব্রাহ্মণকুমার বলিল, 'আমি বনে গিয়া অগ্নিপূজা করিতে অশক্ত; অতএব সংসারধর্ম্মই পালন করিব।' অনন্তর সে মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্র মুদ্রা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার মাতাপিতার ইচ্ছা ছিল না যে সে এই অনর্থজনক সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সে বনে গিয়া অগ্নির উপাসনা করিবে তাঁহাদের মনে এই বাসনাই বলবতী হইল। মাতা স্থির করিলেন, 'স্ত্রীচরিত্রের দোষপ্রদর্শন দ্বারা ইহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদিত করিতে হইবে।' তিনি ভাবিলেন, 'ইহার আচার্য্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; তিনি নিশ্চয় ইহাকে নারীজাতির হীনচরিত্রতা বুঝাইতে পারিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ রমণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস তুমি কি সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছ?' ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিল, 'হাঁ, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছি।' 'তাহা হইলে তুমি অশাতমন্ত্র শিখিয়াছ সন্দেহ নাই।' 'না, মা, সে মন্ত্র ত শিখি নাই।' 'তবে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইল কি রূপে? তুমি তক্ষশিলায় ফিরিয়া যাও এবং অশাতমন্ত্র শিখিয়া আইস।' পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পুনর্ব্বার তক্ষশিলায় গেল।

তক্ষশিলার সেই আচার্য্যের (বোধিসত্ত্বের) জননী তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল একশ বিশ বৎসর। আচার্য্য অতি যত্নসহকারে এই জরতীর শুশ্রূষা করিতেন। তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইতেন; স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইতেন। কিন্তু আশ্বর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধা জননীর এইরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে বড় ঘৃণা করিত। সেই কারণে তিনি শেষে সঙ্কল্প করিলেন, 'বনে গিয়া সেখানে জননীর সেবা শুশ্রূষা করিব।' যেখানে জলের সুবিধা আছে বনমধ্যে এমন একটী নিভৃত ও মনোরম স্থান দেখিয়া তিনি সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, তথায় ঘৃত, তণ্ডুল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং মাতাকে লইয়া ঐ কুটীরে গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীর ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যকে তক্ষশিলায় দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে কেন?' ব্রাহ্মণকুমার বলিল, 'আমি আপনার নিকট অশাতমন্ত্র গ্রহণ করি নাই; এখন তাহা শিখিতে আসিয়াছি।' 'কে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখিবার কথা বলিয়াছেন?' 'মা বলিয়াছেন।' বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অশাতমন্ত্র নামে ত কোন মন্ত্র নাই; ইহার মাতার বোধহয় ইচ্ছা যে ইহাকে স্ত্রীচরিত্রের দোষ বুঝাইয়া দেওয়া হয়।' তিনি

ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, 'বেশ, তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখাইব। তুমি অদ্য হইতে আমার স্থান গ্রহণ করিয়া আমার জননীর সেবাশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও; তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইবে, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইবে, এবং তাঁহার হাত, পা, মাথা ও পিঠ টিপিয়া দিবার সময় বলিবে, 'আর্য্যে, জরাগ্রস্ত হইয়াও আপনার কি অপরূপ দেহকান্তি; না জানি যৌবনকালে আপনি কীদৃশী রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন!' যখন তাঁহার হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে তখনও তাঁহার হস্ত ও পাদের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিবে। আমার মাতা তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা আমাকে জানাইবে; কিছুই গোপন করিও না বা বলিতে লজ্জা করিও না। এইরূপ করিলে তুমি অশাতমন্ত্র লাভ করিবে; নচেৎ উহা শিখিতে পারিবে না।'

ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যের উপদেশানুসারে পুনঃপুনঃ বৃদ্ধার রূপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, 'আমি দেখিতেছি এই যুবকের প্রণয়ভাজন হইয়াছি!' তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, শরীর জরাজীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি এইরূপ বিশ্বাসে তাঁহার মনে কামভাবের উদ্রেক হইল। একদিন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার রূপের ব্যাখ্যা করিতেছে শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য সত্যই কি আমাতে তোমার আসক্তি জন্মিয়াছে?' ব্রাহ্মণকুমার বলিল, 'আর্য্যে, আমি সত্য সত্যই আপনার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমার মনে ভয় হয়, কারণ, আচার্য্য অতি কঠোর প্রকৃতির লোক।' 'তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার পুত্রকে মারিয়া ফেল না কেন?' 'সে কি হয়? আমি আচার্য্যের নিকট এত বিদ্যা শিক্ষা করিতাম, এখন কামবশে কিরূপে তাঁহার প্রাণ সংহার করি?' 'তবে বল যে আমাকে ত্যাগ করিবে না; তাহা হইলে আমিই তাহাকে বধ করিব।'

স্ত্রী জাতি এমনই অসতী, হেয়া ও নীচাশয়া যে এত অধিকবয়স্কা বৃদ্ধাও কামভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বোধিসত্ত্বের ন্যায় ভক্তিশীল ও শুশ্রূষাপরায়ণ পুত্রের প্রাণসংহারের জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎস, আমাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া ভালই করিয়াছ।' অনন্তর তিনি নিজের গর্ভধারিণীর আয়ুষ্কাল আর কত অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, তখন ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, 'এস বৎস, আমার মাতার সঙ্কল্প পরীক্ষা করা যাউক।' অনন্তর তিনি একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা কাটিয়া নিজের দেহপ্রমাণ এক দারুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন, উহাকে আপাদমস্তক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন, উহাতে এক গাছি রজ্জু বাঁধিলেন, নিজের শয্যায় এই অবস্থায় মূর্ত্তিটীকে উত্তানভাবে শয়ান করিয়া রাখিলেন এবং রজ্জুর অপর

প্রান্তে শিষ্যের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'কুঠার লইয়া যাও এবং মার হাতে এই সঙ্কেত-রজ্জু দাও।'[১]

ব্রাহ্মণকুমার বৃদ্ধার নিকট গিয়া বলিল, 'আর্য্যে, আচার্য্য পর্ণশালার ভিতর নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। আমি তাঁহার দেহে এই রজ্জুর এক প্রান্তে বান্ধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যদি শক্তি থাকে তবে এই কুঠার লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করুন।' বৃদ্ধা বলিলেন, 'দেখিও, তুমি ত আমাকে পরিত্যাগ করিবে না?' 'আপনাকে পরিত্যাগ করিব কেন?' ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কুঠার লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, রজ্জুর সাহায্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই শয্যার নিকট উপস্থিত হইল, 'এই আমার পুত্র' মনে করিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির মুখ হইতে আবরণখানি সরাইল এবং কুঠার উত্তোলন করিয়া 'এক আঘাতেই বধ করিব' এই উদ্দেশ্যে উহার গ্রীবাদেশে প্রহার করিল। অমনি 'ঠক্' করিয়া শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল মূর্ত্তিটা কাষ্ঠনির্ম্মিত। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিতেছ, মা?' বৃদ্ধা তারস্বরে বলিলেন, 'আমি প্রতারিত হইয়াছি' এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিংবদন্তী আছে যে সেই মুহূর্ত্তে নিজের পর্ণশালাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাই তাঁহার নিয়তি ছিল।

মাতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার সৎকার করিলেন এবং চিতানল নির্ব্বাপণ করিয়া বনপুষ্পদ্বারা প্রেতপূজা করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকুমারের সহিত পর্ণশালার দ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বৎস, অশাতমন্ত্র নামে কোন স্বতন্ত্র মন্ত্র নাই। স্ত্রীজাতি অসতী। তোমার মাতা যে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি স্ত্রীচরিত্রের দোষ জানিতে পারিবে। আমার মাতার চরিত্রে কি দোষ ছিল তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে রমণীরা কীদৃশী অসতী ও হেয়া।' এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমারকে গৃহে প্রতিগমন করিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মাতাপিতার নিকট প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন বৎস, এবার অশাতমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?' 'হাঁ মা, এবার অশাতমন্ত্র শিখিয়াছি।' 'এখন তবে তুমি কি করিবে বল—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে, না গৃহী হইবে?' 'আমি স্বচক্ষে যখন স্ত্রীজাতির দোষ দেখিয়াছি তখন গৃহী হইবার সাধ গিয়াছে; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' তিনি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত

[১]। বৃদ্ধা অন্ধ; রজ্জু ধরিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে এই অভিপ্রায়ে।

করিলেন :

নারীর চরিত্র, হায়, কে বুঝিতে পারে?
অসতী প্রগল্‌ভা বলি জানি সবাকারে।
কামিনী কামাগ্নি-তাপে যবে দগ্ধ হয়,
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয়।
খাদ্যের বিচার নাই আগুনের ঠাঁই।
নারীপ্রেমে পাত্রাপাত্র-ভেদজ্ঞান নাই।
অতএব ত্যজি হেন জঘন্য সংসার
সন্ন্যাসী হইব এই সঙ্কল্প আমার।
ধ্যানবলে বিবেকের হবে উপচয়
ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি শেষে হবে নিঃসংশয়।

এইরূপে নারীজাতির দোষ কীর্ত্তন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমার মাতাপিতার চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উক্তবিধ ধ্যানবলে বিবেকের উপচয় জন্মাইয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'দেখিলে ভিক্ষু, নারীজাতি কেমন হীনচরিত্রা ও দুঃখদায়িকা।' তিনি নারীদিগের আরও অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন কাপিলানী[১] ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমারের মাতা, মহাকাশ্যপ[২] ছিল তাঁহার পিতা, আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

[১]। কাপিলানী—বা ভদ্রা কাপিলানী। ইনি গৃহস্থাবস্থায় মহাকাশ্যপের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। স্বামী, স্ত্রী উভয়েই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, ধম্মদিন্না (ধর্ম্মদত্ত), নন্দা, শোণা, সকুলা, ভদ্রা কাপিলানী, ভদ্রা কুণ্ডকেশা, ভদ্রা কচ্চনা, কিসা গৌতমী (কৃশা গৌতমী) এবং শৃগালকমাতা এই তের জন ভিক্ষুণী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌতমের শিষ্য ছিলেন এবং অর্হত্ত্বলাভ করিয়া জাতিস্মর হইয়াছিলেন। জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে গৌতম ভদ্রা কাপিলানীকেই প্রধান আসন দিয়াছিলেন।

[২]। মহাকাশ্যপ—ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। প্রবাদ আছে যে ইনি যতক্ষণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই ততক্ষণ কিছুতেই বুদ্ধের চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। ইঁহার চেষ্টায় সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

৬২. অন্ধভূত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় এই কথাও জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে, ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর দিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।' তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'দেখ রমণীরা নিতান্ত অরক্ষণীয়া। পুরাকালে জনৈক পণ্ডিত কোন রমণীকে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও সৎপথে রাখিতে পারেন নাই।' অনন্তর তিনি সেই, অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্য লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেন এবং রজতফলকের উপর সুবর্ণপাশক ফেলিবার সময় জিতিবার আশায় এই গীত গাইতেন :

যাহার স্বভাব যেই যেই মত চলে সেই,
কি সাধ্য কাহার, করে প্রকৃতি লঙ্ঘন?
বনভূমি পায় যথা, তরুরাজি জন্মে তথা,
আঁকা বাঁকা পথে সদা নদীর গমন।
পাপাচারপরায়ণ জানিবে রমণীগণ,
স্বভাব তাদের এই নাহিক সংশয়;
যখন (ই) সুবিধা পায়, কুপথে ছুটিয়া যায়,
ধর্ম্মে মতি তাহাদের কভু নাহি হয়।

এই মন্ত্রের প্রভাবে প্রতি বাজিতেই রাজা জিতিতেন এবং পুরোহিত হারিতেন। ক্রমাগত হারিতে হারিতে পুরোহিত নিঃস্বপ্রায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রতিদিন এইরূপ হারিলে শেষে আমি কপর্দ্দকশূন্য হইব।' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'কখনও পুরুষের মুখ দেখে নাই, ঈদৃশী একটী কন্যা আনিয়া গৃহে রাখিতে হইবে। অন্য পুরুষের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন কন্যার চরিত্র রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব মাতৃগর্ভ হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এরূপ কন্যা আনা চাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থা করিব যে কখনও সে পুরুষান্তরের মুখ দেখিতে না পায়। তাহা হইলেই সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর সম্পূর্ণরূপে আমার বশীভূত হইবে এবং (রাজার মন্ত্র মিথ্যা হইবে বলিয়া)

আমিও রাজপুরী হইতে ধনলাভ করিতে পারিব।'

পুরোহিত অঙ্গবিদ্যায়[১] নিপুণ ছিলেন। তিনি এক গর্ভবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সে কন্যাপ্রসব করিবে। তিনি কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে নিজের গৃহে আনয়ন করিলেন এবং প্রসবান্তে কন্যাটীকে রাখিয়া প্রসূতিকে কিছু উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। এই কন্যার লালন পালনের ভার শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হইল। সে কখনও পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মুখ দেখিতে পাইত না। কাজেই যখন সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইল; তখন সম্পূর্ণরূপে পুরোহিতেরই বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিল।

উক্ত কন্যাটী যতদিন পূর্ণবয়স্কা না হইল, ততদিন পুরোহিত রাজার সহিত আবার দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু যখন সে যৌবনে উপনীত হইয়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইল, তখন তিনি রাজাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। রাজা বলিলেন, 'উত্তম কথা।' অনন্তর তিনি ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন; কিন্তু যখন তিনি সেই মন্ত্রটী গান করিলেন, তখন পুরোহিত বলিলেন, 'কেবল আমার গৃহিণী ছাড়া।' তদবধি পুরোহিতের জয় এবং রাজার পরাজয় হইতে লাগিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের সন্দেহ হইল যে পুরোহিতের গৃহে এমন কোন রমণী আছে যে পতিভিন্ন পুরুষান্তরে আসক্ত হয় নাই। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এই অনুমানই সত্য। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন এই রমণীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে। তিনি এক ধূর্ত্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে, তুই পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রনাশ করিতে পারিবি কি?' সে বলিল, 'হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারিব।' বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধন দিয়া এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে।

ধূর্ত্ত রাজদত্ত ধন দ্বারা গন্ধ, ধূপ, চূর্ণ[২] কর্পূর প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পুরোহিতের গৃহের অতিদূরে এক গন্ধদ্রব্যের দোকান খুলিল। পুরোহিতের বাসভবন সপ্তভূমিক এবং সপ্তদ্বার কোষ্ঠযুক্ত ছিল। প্রতি দ্বারকোষ্ঠে রমণী প্রহরিণী থাকিত; পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন পুরুষই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। যে সকল ঝুড়িতে পূরিয়া আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া যাইত, সেগুলিও তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কেহ বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে দিত না। ফলত একা পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেরই তাঁহার পত্নীকে দেখিবার সাধ্য ছিল না।

পুরোহিত-পত্নীর একজন মাত্র পরিচারিকা ছিল। সে প্রতিদিন অর্থ লইয়া গন্ধপুষ্পাদি কিনিতে যাইত। এই উপলক্ষে তাহাকে সেই ধূর্ত্তের দোকানে নিকট দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ধূর্ত্ত বুঝিল সে পুরোহিত-পত্নীর দাসী। সে

---

[১]। যে বিদ্যার কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণা যাইতে পারে।

[২]। চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ; ইহা toilet powder-রূপে ব্যবহৃত হইত।

একদিন সেই দাসীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পাদমূলে পড়িয়া দুই হাতে তাহার পা দুখানি দৃঢ়রূপে ধরিল এবং 'মা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?' বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

ঐ ধূর্ত্ত পূর্ব্ব হইতেই আরও কয়েকজন ধূর্ত্তকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা একপাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'কি আশ্চর্য্য, মাতা ও পুত্র দুই জনেরই এক চেহারা। হাত, পা, মুখ ও শরীরের গড়ন, এমন কি পোষাকেও কোন তফাৎ নাই।' পুনঃ পুনঃ নানা জনের মুখে এই কথা শুনিয়া দাসীর মতিভ্রম ঘটিল; 'এই যুবক হয়ত প্রকৃতই আমার পুত্র' ইহা ভাবিয়া সেও কান্দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা দুইজনেই কান্দিতে কান্দিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। অতঃপর ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, তুমি এখন কোথায় আছ?' পরিচারিকা বলিল, 'বাবা, রাজপুরোহিতের এক যুবতী পত্নী আছেন; তাঁহার রূপের কথা কি বলিব? দেখিতে যেন বিদ্যাধরীর ন্যায়। আমি তাঁহার দাসী।' 'এখন কোথা যাইতেছ, মা?' 'তাঁহার জন্য গন্ধমাল্য ইত্যাদি কিনিতে যাইতেছি? 'ইহার জন্য অন্যত্র যাইবে কেন? আমার দোকান হইতে লইবে।' ইহা বলিয়া সে তাহাকে বিনামূল্যে বহু তাম্বুল, তক্কোল[১] প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ পুষ্প দিল। পুরোহিত-পত্নী প্রচুর গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝি মা, ব্রাহ্মণ যে আজ আমাদের প্রতি এত প্রসন্ন হইয়াছেন ইহার কারণ কি?' দাসী বলিল, 'আপনি এ কথা বলিতেছেন কেন?' 'এত গন্ধদ্রব্য এবং রাশি রাশি পুষ্প দেখিয়া', ব্রাহ্মণ যে অন্য দিন অপেক্ষা অধিক দাম দিয়াছেন তাহা নহে। আমি এ সকল আমার ছেলের দোকান হইতে আনিয়াছি।' সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ যে দাম দিতেন, দাসী তাহা আত্মসাৎ করিত এবং সেই ধূর্ত্তের নিকট হইতে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া যাইত।

ধূর্ত্ত কতিপয় দিন পরে পীড়া হইয়াছে ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। দাসী দোকানের দরজায় আসিয়া তাহাকে না দেখিতে পাইয়া 'আমার ছেলে কোথায় গেল?" জিজ্ঞাসা করিল। এক ব্যক্তি উত্তর দিল, 'বাছা, তোমার ছেলের বড় অসুখ করিয়াছে।' ইহা শুনিয়া সে, ধূর্ত্ত যেখানে শুইয়া ছিল সেইখানে গেল এবং তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাছা, তোর কি অসুখ করিয়াছে?' ধূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথার উত্তর দিতেছিস্ না কেন রে বাপ?' 'প্রাণ যায় মা, সেও ভাল, তবু তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব না।' 'আমায় না বলিলে কাকে বলিবি?' 'বলিতে কি, মা, আমার অন্য কোন অসুখ করে নাই, তোমার মুখে পুরোহিত-পত্নীর রূপের

[১]। এক প্রকার গন্ধদ্রব্য অথবা অগুরু (?)।

কথা শুনিয়া আমি সেই যুবতীতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়াছি। তাহাকে পাই ত প্রাণ বাঁচিবে; নচেৎ আমার মরণ ঘটিবে।' 'আচ্ছা, বাবা, সে ভার আমার উপর থাকিল। তুই এর জন্যে কোন চিন্তা করিস না।' এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া দাসী প্রচুর গন্ধপুষ্পাদি লইয়া পুরোহিত পত্নীর নিকট গিয়া বলিল, 'মা ঠাকুরুণ, আমার ছেলেটা তোমার রূপের কথা শুনিয়া পাগল হইয়াছে; এখন কর্ত্তব্য কি?' 'আমি তোকে অনুমতি দিলাম, পারিস ত তাহাকে এখানে লইয়া আসিস।'

এই আদেশ পাইয়া দাসী বাড়ীর যেখানে যে আবর্জ্জনা ছিল সমস্ত ঝাঁট দিয়া বড় বড় ফুলের ঝুড়িতে রাখিল, এবং একদিন উহার একটা লইয়া বাহিরে যাইবার সময়, একজন প্রহরিণী যেমন উহাতে কি আছে পরীক্ষা করিতে আসিল, অমনি সমস্ত আবর্জ্জনা তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিল। প্রহরিণী এই অত্যাচারে পলাইয়া গেল। অন্য প্রহরিণীরাও যখন দাসী কি লইয়া যাইতেছে পরীক্ষা করিতে চাহিত, তখন সে তাহাদের মাথায় ঐরূপে আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিত। কাজেই ইহার পর সে যখন কিছু লইয়া আসিত বা যাইত তখন উহা পরীক্ষা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। অতএব সে তাহার ইচ্ছানুরূপ সুযোগ পাইল। সে ধূর্ত্তকে একটা ফুলের ঝুড়ির মধ্যে বসাইয়া পুরোহিত-পত্নীর নিকট লইয়া গেল।

এইরূপে পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রস্খলন হইল। ধূর্ত্ত দুই একদিন সেই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিল; পুরোহিত যখন বাহিরে যাইতেন, সে তখন তাঁহার পত্নীর সহিত আমোদপ্রমোদ করিত; তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন, সে তখন লুকাইয়া থাকিত। দুই একদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পুরোহিত-পত্নী বলিল, 'সখে, এখন তোমার যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' ধূর্ত্ত বলিল, 'যাইব বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া যাইতে হইবে।' 'বেশ, তাহাই হইবে।' ইহা বলিয়া সেই রমণী ধূর্ত্তকে লুকাইয়া রাখিল এবং ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলে বলিল, 'স্বামিন, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আপনি বীণা বাজাইবেন এবং আমি সেই সঙ্গে নৃত্য করিব।' 'ভদ্রে, এ অতি উত্তম কথা; তুমি নৃত্য কর'। ইহা বলিয়া পুরোহিত বীণা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী কহিল, 'নাচিব বটে, কিন্তু আপনি আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলে লজ্জা করিবে। আপনার সুন্দর মুখানি শাড়ী দিয়া বান্ধিয়া নাচিব।' 'আচ্ছা, লজ্জা হয়ত তাহাই কর।' যুবতী তখন একখানা মোটা কাপড় দিয়া তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া মুখ বান্ধিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আচ্ছাদিত মুখে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। যুবতী ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া বলিল, 'আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আপনার মাথায় একটা কিল দেই।' স্ত্রৈণ ব্রাহ্মণ তাহার দূরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া

বলিলেন, 'দাও না।' যুবতী তখন ধূর্ত্তকে সঙ্কেত করিল; সে যবনিকার অন্তরাল হইতে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের পৃ'দেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথার খুলিতে কিল মারিল। কিলের চোটে ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী যেন ছুটিয়া বাহির হইবে বলিয়া মনে হইল এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ আঘাতের যন্ত্রণায় বলিলেন, 'প্রিয়ে, তোমার হাত দাও দেখি।' যুবতী নিজের হাত তুলিয়া তাঁহার হস্তোপরি রাখল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কল্যাণি, তোমার হস্ত এত কোমল, কিন্তু ইহার আঘাত ত অতি দারুণ!'

এ দিকে সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার পরেই লুকাইয়া ছিল। সে লুক্কায়িত হইলে যুবতী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কাপড় খুলিয়া লইল এবং তৈল আনিয়া তাঁহার মাথায় দিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বাহিরে গেলে দাসী ধূর্ত্তকে ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া দিল। ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, 'আসুন পুরোহিত মহাশয়, দ্যূতক্রীড়া করা যাউক।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।' রাজা দ্যূতমণ্ডল সাজাইয়া পূর্ব্বের মত দূতগীতি গান করিয়া পাশক নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীর দুষ্টাচরণের কথা জানিতেন না; তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, 'কেবল আমার যুবতী ভার্য্যা ছাড়া।' কিন্তু ইহা বলিয়াও তিনি পরাজিত হইলেন।

রাজা সমস্ত ব্যাপার জানিতেন। তিনি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনার স্ত্রীকে বাদ দিতেছেন কেন? তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে। এই রমণী যখন গর্ভে ছিল তদবধি আপনি ইহাকে সপ্ত দ্বারে প্রহরিণী-বেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভাবিয়াছিলেন এইরূপ করিলে ইহার চরিত্রভ্রংশ ঘটিবে না। কিন্তু আপনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রমণীদিগকে নিজের কুক্ষির অভ্যন্তরে রাখিয়া নিয়ত সঙ্গে লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করা অসম্ভব। জগতে বোধহয় এমন স্ত্রী নাই যে স্বামী ভিন্ন পুরুষান্তরের সংসর্গে আইসে নাই। আপনার পত্নী নৃত্য করিতে অভিলাষ করিয়াছিল; আপনি যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, তখন সে আপনার মুখ বান্ধিয়া দিয়াছিল, নিজের জারের দ্বারা আপনার মস্তকে আঘাত করাইয়াছিল এবং শেষে তাহাকে গোপনে গৃহের বাহির করিয়া দিয়াছিল। অতএব তাহার বেলা ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন?' ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

শাটক-আচ্ছন্নমুখে বাজাইলে বীণা তুমি
কী হেতু তা জান কি, ব্রাহ্মণ?
আগর্ভ রক্ষিয়া ভার্য্যা লভিলে কি ফল, দেখ;

নারী নহে বিশ্বাস-ভাজন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পুরোহিতকে নারীধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া গৃহে গিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তুই নাকি এইরূপ পাপকার্য্য করিয়াছিস?' যুবতী বলিল, 'আর্য্যপুত্র, কে এমন কথা মুখে আনে? আমি কোন দোষ করি নাই। আমিই আপনার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলাম; আর কেহ নয়। যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে 'আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই' এই সত্যক্রিয়া দ্বারা অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে প্রস্তুত আছি।' 'বেশ, তাহাই কর,' বলিয়া ব্রাহ্মণ কাষ্ঠরাশি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং পত্নীকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুই যদি সত্য বলিতেছিস্ বলিয়া বিশ্বাস করিস, তবে এই অগ্নির মধ্যে যা।'

ব্রাহ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই পরিচারিকাকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল, 'ঝি মা, তোমার পুত্রকে গিয়া বল, আমি যখন অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইব, তখন সে যেন গিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলে।' পরিচারিকা গিয়া সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল; এবং ধূর্ত্ত আসিয়া সমবেত লোকদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। যুবতী ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে সেই জনসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'ব্রাহ্মণ, আমি জীবনে আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই, এ কথা যদি সত্য হয় তবে এই অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে।' ইহা বলিয়া সে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল; অমনি, 'দেখত পুরোহিত ঠাকুরের অবিচার, তিনি এমন সুন্দরী স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করিতে যাইতেছেন,' এই বলিয়া সেই ধূর্ত্ত গিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া ফেলিল। যুবতী তখন হাত ছাড়াইয়া পুরোহিতকে বলিল, 'আর্য্য পুত্র, আমার সত্যক্রিয়া ব্যর্থ হইল; আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থা।' 'কেন অসমর্থা?' 'আমি আজ সত্যক্রিয়া করিয়াছিলাম আমার স্বামি ব্যতীত অন্যপুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই; কিন্তু এখন এই পুরুষ আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল।' ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দুষ্টা ভার্য্যা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। তিনি তাহাকে প্রহার করিতে করিতে দূর করিয়া দিলেন।

রমণীজাতি এমনই অধর্ম্মপরায়ণা! তাহারা কি গুরু পাপই না করে এবং পাপ করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে শেষে 'আমি একাজ করি নাই' বলিয়া দিনে দুপ্রহরে কি শপথই না করিয়া থাকে! তাহাদের চিত্ত কত পুরুষের দিকেই না ধাবিত হয়! সেই জন্যই কথিত আছে :

নারীর স্বভাব এই দেখিবারে পাই,
চৌরী, বহুবুদ্ধি তারা; সত্যজ্ঞান নাই।
জলমধ্যে যাতায়াত করে মৎস্যগণ,

কে পারে তাদের পথ করিতে দর্শন?
রমণী-হৃদয় ভাব তেমতি দুর্জ্জেয়,
মিথ্যা তারা সত্য করে, সত্য করে হেয়।
নিত্য নব তৃণ খোঁজে গাভীগণ যথা,
কামিনী নূতন বর নিত্য চায় তথা।
ভুজঙ্গিনী খলতায় মানে পরাজয়,
চাপল্যে বালুকা ভয়ে দূরে সরে যায়।
পুরুষ-চরিত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয়া নারী;
নখদর্পণেতে আছে সংসার তাহারি।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'রমণীরা এইরূপই অরক্ষণীয়া।' অনন্তর ধর্ম্মদেশনা সমাপ্ত করিয়া তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

৬৩. তক্ক (তক্র) জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, 'তুমি সত্যসত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, 'হাঁ প্রভু।' তখন শাস্তা বলিলেন, 'স্ত্রীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; তাহাদের জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ?' অনন্তর তিনি একটী অতীত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে সমাপত্তি ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন এবং ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদে 'তক্ক' শব্দের খর্জ্জুর এই অর্থ ধরা হইয়াছে, পালিভাষায় 'তক্র' (ঘোল) এবং 'তর্ক' এই শব্দ দুইটীও 'তক্ক' হইয়াছে। এস্থলে 'ঘোল' অর্থই করা গেল। কিন্তু 'তক্ক' শব্দে যে তর্ক শব্দেরও ধ্বনি আছে তাহা নিশ্চিত। 'তক্ক পণ্ডিত' অর্থাৎ তক্রবিক্রয়কারী পণ্ডিত কিংবা তর্কপণ্ডিত (যেমন তর্কবাগীশ ইত্যাদি)। বোধিসত্ত্বের পক্ষে খর্জ্জুন বিক্রয় করা অপেক্ষা তক্র বিক্রয় করাই অধিক সম্ভবপর, কেননা ভারতবর্ষে খর্জ্জুর তত সুলভ নহে।

ঐ সময়ে বারাণসী শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের দুষ্টকুমারী নাম্নী এক প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী দুহিতা ছিল। সে দাসদাসীদিগকে নিয়ত কটু কথা বলিত, সময়ে সময়ে প্রহারও করিত। তাহারা একদিন জলকেলি করিবার লোভ দেখাইয়া দুষ্টকুমারীকে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল। তাহারা কেলি করিতেছে, এমন সময়ে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল এবং আকাশে ঝড় উঠিল। লোকে ঝড় আসিল দেখিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। শ্রেষ্ঠীকন্যার দাসীরা বলিল, 'যাহাতে আর কখনও এ আপদের মুখ না দেখিতে হয়,[১] আজ তাহা করিবার অতি সুন্দর সুযোগ ঘটিয়াছে।' অনন্তর তাহারা দুষ্টকুমারীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল; সূর্য্য অস্ত গেল, চারিদিক্ অন্ধকারে ঘিরিল। দাসীরা প্রভুকন্যাকে না লইয়াই গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমারী কোথায়?' তাহারা উত্তর করিল, 'আমরা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে উঠিতে দেখিয়াছি; কিন্তু শেষে তিনি কোথায় গিয়াছেন জানি না।' তখন আত্মীয় বন্ধুগণ নানাদিকে অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলেন না।

এদিকে দুষ্টকুমারী চীৎকার করিতে করিতে জলপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল এবং নিশীথকালে বোধিসত্ত্বের আশ্রমের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে বামাকণ্ঠের স্বর! এই রমণীকে উদ্ধার করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তৃণের উল্কা হস্তে লইয়া নদীতীরে গেলেন এবং দুষ্টকুমারীকে দেখিতে পাইয়া 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাঁহার শরীর হস্তীর মত বল ছিল। তিনি নদীতে অবতরণপূর্ব্বক দুষ্টকুমারীকে তুলিয়া আনিলেন এবং আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহার সেবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। ইহার পর তাহার শীত ভাঙ্গিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নানাবিধ মধুর ফল খাইতে দিলেন; এবং তাহার আহার শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি গঙ্গায় পড়িলে কিরূপে? দুষ্টকুমারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন বোধিসত্ত্ব 'তুমি এইখানে অবস্থিতি কর' বলিয়া তাহাকে পর্ণশালায় রাখিয়া নিজে বাহিরে গেলেন এবং দুই তিন দিন খোলা জায়গায় থাকিলেন। অতঃপর একদিন তিনি শ্রেষ্ঠীকন্যাকে বলিলেন, 'এখন তুমি বাড়ী যাও।' কিন্তু সে বাড়ী গেল না; সে ভাবিল, 'প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া এই তপস্বীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে।'

অনন্তর কিয়ৎকালমধ্যে দুষ্টকুমারী স্ত্রীজনসুলভ কুটিলতা ও বিলাস-বিভ্রম

১। মূলে 'এতস্‌সা পিট্‌টিম পসসিতুম্' আছে। ইহার অর্থ 'ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে' অর্থাৎ মুখ না দেখিতে।

প্রয়োগ করিয়া বোধিসত্ত্বের চরিত্রস্খলন সম্পাদন করিল, তাঁহার ধ্যান অন্তর্হিত হইল; তিনি ঐ রমণীকে লইয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে একদিন বলিল, 'আর্য্য, বনবাস করিয়া কি হইবে? চলুন আমরা লোকালয়ে যাই।' বোধিসত্ত্ব তদনুসারে তাহাকে লইয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং সেখানে তক্র বিক্রয় দ্বারা তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি তক্র বিক্রয় করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তক্রপণ্ডিত বলিতে লাগিল। ইহার পর গ্রামবাসীরা গ্রামদ্বারে তাঁহাকে একখানি কুটীর দান করিয়া বলিল, 'আপনি এখানে বাস করুন; আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিবেন; আমরা আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিব।'

কিয়ৎকাল পরে দস্যুরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহারা একদিন তক্রপণ্ডিতের গ্রামে আসিয়া পড়িল এবং হতভাগ্য গ্রামবাসীদিগের দ্বারাই তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বহন করাইয়া চলিল; দুষ্টকুমারীকেও মোট লইয়া ইহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। অতঃপর দস্যুরা আপনাদের আবাসস্থলে গিয়া অপর সকলকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দুষ্টকুমারীকে ছাড়িল না। দস্যুদলপতি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিল।

গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিলে তক্রপণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন 'আমার স্ত্রী কোথায়?' তাহারা বলিল, 'দস্যুদলপতি তাঁহাকে নিজের ভার্য্যা করিয়া লইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া তক্রপণ্ডিত ভাবিলেন, 'সে আমায় ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারিবে না, নিশ্চিত পলাইয়া আসিবে।' এই আশায় দুষ্টকুমারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি সেই গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুষ্টকুমারী ভাবিল, 'আমি এখানে বেশ সুখে আছি; কিন্তু যদি কখনও তক্রপণ্ডিত কোন সূত্রে এখানে আসিয়া আমায় লইয়া যায়, তাহা হইলে এ সুখ থাকিবে না। অতএব প্রণয়ের ভাণ দেখাইয়া তাহাকে এখানে আনাইয়া নিহত করাইতে হইবে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে একজন লোকদ্বারা তক্রপণ্ডিতকে জানাইল, 'আমি এখানে বড় কষ্ট পাইতেছি; আপনি আসিয়া যেন আমায় লইয়া যান।' তক্রপণ্ডিত এই কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং দস্যুদিগের গ্রামদ্বারে গিয়া দুষ্টকুমারীকে আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। সে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'আর্য্য, আমরা এখনই চলিয়া গেলে দস্যু দলপতি ধরিয়া ফেলিবে এবং দুই জনকেই বধ করিবে। অতএব এখন অপেক্ষা করুন; আমরা রাত্রিকালে পলায়ন করিব।' ইহা বলিয়া সে তক্রপণ্ডিতকে গৃহে লইয়া ভোজন করাইল এবং একটী প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখিল।

সায়ংকালে দস্যুদলপতি গৃহে ফিরিল, এবং সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইল।

তখন দুষ্টকুমারী বলিল, 'স্বামিন, এখন যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার সেই পূর্ব্ব পতিকে[১] হাতে পান ত কি করেন বলুন ত?' দলপতি 'তাহাকে ইহা করিব, তাহা করিব'[২] ইত্যাদি বলিতে লাগিল। 'আপনি মনে করিয়াছেন সে বুঝি দূরে আছে! তাহা নহে, সে পাশের ঘরে রহিয়াছে।' ইহা শুনিয়া দস্যুদলপতি একটা মশাল লইয়া সেই ঘরে গেল এবং তক্রপণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিল ও মেজের উপর ফেলিয়া মনের সুখে লাথি, কিল মারিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রহৃত হইয়াও তক্রপণ্ডিত আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন, 'অহো! কি নিষ্ঠুরা, কি অকৃতজ্ঞা, কি পরিবাদকারিণী, কি মিত্রদ্রোহী!' দস্যুদলপতি প্রহারান্তে তক্রপণ্ডিতের পায়ে দড়ি বান্ধিয়া তাঁহাকে অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখিল, নিজে সায়মাশ সম্পাদন করিয়া শয়ন করিল এবং প্রাতঃকালে যখন নেশা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিল। তখনও কিন্তু তক্রপণ্ডিত পূর্ব্ববৎ কেবল ঐ চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দস্যুপতির বিস্ময় জন্মিল; সে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি এত মার খাইয়াও আর কিছু বলিতেছে না, পুনঃ পুনঃ এই চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতেছে; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিল, 'ওহে, তুমি এত মার খাইতেছ, অথচ আর কিছু না বলিয়া বার বার কেবল 'অহো নিষ্ঠুরা! অহো অকৃতজ্ঞা! এই কথা বলিতেছ, ইহার মানে কি?' তক্রপণ্ডিত উত্তর দিলেন 'বলিতেছি শুন।' অনন্তর তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—'আমি পূর্ব্বে অরণ্যে বাস করিতাম; তপস্যাদ্বারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলাম; এই রমণী গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; আমি ইহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; শেষে ইহার কুহকে পড়িয়া আমার তপোবল বিনষ্ট হয়; আমি ইহার সঙ্গে অরণ্য ছাড়িয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করি এবং সেখানে ইহার ভরণপোষণের জন্য তক্রবিক্রয়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহার পর দস্যুরা ইহাকে লইয়া যায়। এ আমায় সংবাদ দেয় যে বড় কষ্টে আছে; আমি আসিয়া যেন ইহাকে লইয়া যায়। এখন এ আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এই সমস্ত ভাবিয়া আমি ওরূপ বলিতেছি।'

দস্যুদলপতি ভাবিল, 'যে এইরূপ গুণবান ও উপকারী ব্যক্তির এতাদৃশ অনিষ্ট করে, সে আমার না জানি কতই বিপদ্ ঘটাইতে পারে। অতএব মৃত্যুই ইহার উপযুক্ত দণ্ড।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে আশ্বাস দিয়া দুষ্টকুমারীকে জাগাইল এবং 'চল, আমরা গ্রামের বাহিরে গিয়া এই লোকটার প্রাণসংহার করি'

---

[১]। মূলে 'সপত্ত' এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'সপত্ন'। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুংলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু।

[২]। অর্থাৎ তাহার মাথা ভাঙ্গিব, ঘাড় ছিঁড়িব, হাত গুঁড়া করিব, এইরূপ।

এই কথা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খড়ুগহস্তে বাহির হইল। গ্রামদ্বারে গিয়া সে দুষ্টকুমারীকে বলিল তুমি এই ব্যক্তির হাত ধরিয়া থাক। সে তাহাই করিল। তখন দস্যুদলপতি খড়ুগ উত্তোলনপূর্ব্বক যেন তক্রপণ্ডিতকেই আঘাত করিতে যাইতেছি এই ভাব দেখাইয়া এক আঘাতে পাপিষ্ঠাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ইহার পর সে তক্রপণ্ডিতকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে কয়েকদিন পরিতোষের সহিত আহার করাইল এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এখন কোথায় যাইবেন?' তক্রপণ্ডিত বলিলেন, 'গৃহবাসে আর আমার অভিরুচি নাই; আমি পুনর্ব্বার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যেই অবস্থিতি করিব।' তাহা শুনিয়া দস্যুনায়ক বলিল, 'তবে আমিও প্রব্রাজক হইব।'

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই প্রব্রজ্যা লইলেন, বনমধ্যস্থ এক আশ্রমে তপস্যাপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং জীবিতক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

* * *

[অনন্তর শাস্তা কথাদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :

> ক্রোধপরায়ণা, কৃতজ্ঞতাহীনা, নিন্দারতা, অনুক্ষণ,
> কলহের বীজ বপনে নিপুণা, রমণীর এ লক্ষণ;
> অতএব লহ ব্রহ্মচর্য্যব্রত; ছাড়িও না সে আশ্রয়;
> যে সুখ তাহাতে তুঞ্জিবে, নিশ্চয় নাহিক তাহার ক্ষয়।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই দস্যুদলপতি; এবং আমি ছিলাম সেই তক্রপণ্ডিত।]

---

৬৪. দুরাজান-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে কোন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

শ্রাবস্তীবাসী এক উপাসক ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাহার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই ব্যক্তির এক অতি দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা ভার্য্যা ছিল। সে যেদিন কোন অন্যায়

---

[১]। দুরাজান—দুর্জ্ঞেয়।

কার্য করিত সেদিন শত মুদ্রায় ক্রীত দাসীর ন্যায়, এবং যেদিন কোন অন্যায় কার্য্য করিত না সেদিন প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী ঘরণীর ন্যায় ব্যবহার করিত। উপাসক ভার্য্যার এই প্রকৃতিবৈষম্যের কারণ বুঝিতে পারিত না। শেষে সেই রমণী তাহাকে এমন জ্বালাতন করিতে লাগিল যে, সে আর প্রতিদিন বুদ্ধের অচ্চনার্থ বিহারে যাইতে পারিত না।

ইহার পর একদিন সে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া বিহারে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস নাই?' উপাসক বলিল, 'ভগবন, আমার স্ত্রী এক এক দিন শতমুদ্রাক্রীতা দাসীর ন্যায় বিনীতা ও আজ্ঞাবহা হয়, এক একদিন মুখরা ও প্রচণ্ডা গৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে। আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি না। তাহারই জ্বালায় এতদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতে পারি নাই।'

এই কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপাসক, পণ্ডিতেরা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্জেয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এখন তোমার মানসপটে সুস্পষ্ট উদিত হইতেছে না।' অনন্তর উপাসক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে এক বিদেশী ব্রাহ্মণ যুবক কোন রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর সে বারাণসী নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুই তিন বার যথাসময়ে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে, উক্ত রমণী অতি দুঃশীলা ও পাপচারিণী ছিল; সে যেদিন দুষ্কার্য্য করিত সেদিন দাসীর ন্যায়, এবং যেদিন দুষ্কার্য্য করিত না, সেদিন প্রচণ্ডা ও কটুভাষিণী গৃহিণীর ন্যায় আচরণ করিত। তাহার স্বামী তাহার এই বিচিত্র প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিত না; সে স্ত্রীর অত্যাচারে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে শেষে যথাসময়ে আচার্য্যসকাশেও উপস্থিত হইতে পারিত না। অনন্তর সে সাত আট দিন পরে একবার আচার্য্যের নিকট গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন 'কিহে মাণবক, এ কয়দিন তোমায় দেখি নাই কেন?' শিষ্য কহিল, 'আচার্য্য, আমার স্ত্রীই ইহার কারণ। সে এক একদিন দাসীর ন্যায় বিনীতা হয়, এক একদিন মুখরা ও প্রচণ্ডা গৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে; আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে অসমর্থ। তাহার এই 'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট' ভাব দেখিয়া আমি

এত জ্বালাতন হইয়াছি যে, যথারীতি আপনার পাদপদ্ম দর্শনেও অবহেলা করিয়াছি।’

আচার্য্য কহিলেন, ‘এইরূপই হইবার কথা। রমণীগণ যেদিন দুষ্কার্য্য করে সেদিন স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, দাসীর ন্যায় বিনীত হইয়া চলে; কিন্তু যেদিন দুষ্কার্য্য করে না, সেদিন তাহারা মদোদ্ধতা হইয়া স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা রমণীদের এইরূপই স্বভাব। তাহাদের প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। তাহারা তুষ্ট হউক, বা রুষ্ট হউক, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।’ অনন্তর আচার্য্য শিষ্যের প্রবোধের জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন :

ভাল যদি বাসে নারী, হইও না হৃষ্ট তায়;
যদি ভাল নাহি বাসে, তাতেই কি আসে যায়?
নারীর চরিত্র বুঝে হেন সাধ্য আছে কার?
বারিমাঝে চলে মাছ, কে দেখিবে পথ তার?

আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। তদবধি সে তাহার স্ত্রীর আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল। সেই রমণীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুঃশীলতার কথা আচার্য্যের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তখন সে দুষ্কার্য্য পরিহার করিল।

* * *

[এই উপাসকের পত্নীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুশ্চরিত্রতা সম্যকসম্বুদ্ধের অগোচর নহে তখন সে পাপাচার ত্যাগ করিল। অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই উপাসক-দম্পতী ছিলেন সেই শিষ্য ও তাহার ঘরণী, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

৬৫. অনভিরতি-জাতক

[পূর্ব্বে (৬৪ সংখ্যক জাতকে) যে উপাসকের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ অপর একজন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা ভার্য্যার দুশ্চরিত্রতার বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার চিত্ত এত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে সাত আট দিন সে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। অনন্তর একদিন সে বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা

জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি এতদিন আস নাই কেন? সে বলিল, 'ভগবন! আমার ভার্য্যা দুঃশীলা; সেই জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আমি আসিতে পারি নাই।' শাস্তা বলিলেন, 'উপাসক! তোমাকে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে স্ত্রী দুঃশীলা হইলেও তজ্জন্য কোপাবিষ্ট হইতে নাই; পরন্তু চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তুমি সেই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছ।' অনন্তর উপাসক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ) একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র ভার্য্যার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়া এমন বিক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিল যে কয়েকদিন সে আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই।

আচার্য্য তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ উত্তর দিল। তাহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, 'বৎস, নারীগণ সাধারণ ধন এবং তাহারা স্বভাবত দুঃশীলা; এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন না।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিষ্যের উপদেশার্থ এই গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :

নদী, রাজপথ, পানের আগার[১] উৎস, সভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থানে অবাধে সকলে ভুঞ্জে সম অধিকার।
তেমনি রমণী ভোগ্যা সকলের, কুপথে তাহার মন;
চরিত্রস্খলন দেখিলে তাহার, রোধে না পণ্ডিত জন।

বোধিসত্ত্ব অন্তেবাসিককে এইরূপ উপদেশ দিলেন। তদবধি ভার্য্যার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য জন্মিল; তাহার ভার্য্যাও 'আচার্য্য আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' এই বিশ্বাসে পাপকর্ম্ম পরিহার করিল।

* * *

[সেই উপাসকের ভার্য্যাও 'শাস্তা আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' ভাবিয়া পাপ হইতে বিরত হইল। কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

[১]। পানাগার—শুড়ির দোকান, যেখানে সকলে মদ খায়।

৬৬. মৃদুলক্ষণা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কামভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে শ্রাবস্তীবাসী এক কুলপুত্র শাস্তার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া ত্রিরত্নশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেন, যোগাভ্যাসে রত থাকিতেন, কখনও কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে অবহেলা করিতেন না। একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় তিনি নানালঙ্কারভূষিতা এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া সুখভোগেচ্ছায় নীতিভ্রষ্ট হইলেন এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষ[১] যেমন ভূতলে পতিত হয়, হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চারবশত তিনিও সেইরূপ পাপপঙ্কে পতিত হইলেন। রিপুর তাড়নায় তিনি দেহের ও মনের স্ফূর্ত্তি হারাইলেন এবং মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বুদ্ধশাসনে বীতরাগ হইলেন। তাহার নখ ও কেশ বৃদ্ধি হইল; চীবরগুলি মলিন হইল।

এই ব্যক্তির ভিক্ষুসহচরগণ তাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিয়াছে জানিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তোমার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি পূর্ব্বের মত প্রসন্ন বোধ হইতেছে না, ইহার কারণ কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বন্ধুগণ, আমার আর সুখ নাই।' অনন্তর ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমরা এ ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন?' 'ভগবন, ইনি বলিতেছেন যে, জীবনে ইঁহার আর সুখ নাই।' 'কি হে ভিক্ষু, এ কথা সত্য কি?' 'হাঁ প্রভু, এ কথা সত্য।' 'তোমার উদ্বেগের কারণ কি বল ত?' 'ভগবন, আমি ভিক্ষাচর্য্যাকালে এক রমণীদর্শনে নীতিমার্গস্খলিত হইয়া তাহাকে বিলোকন করিয়াছিলাম। তাহাতে হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হইয়া আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।' 'তুমি ধর্ম্মনীতিলঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজের তৃপ্তিসাধনার্থ নিষিদ্ধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন রিপুর তাড়না ভোগ করিতেছ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীতকালে যাঁহারা পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধ্যানবলে সমগ্র রিপু দমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, এবংবিধ বোধিসত্ত্বগণও নিষিদ্ধ পদার্থ অবলোকন করিয়া ধ্যানভ্রষ্ট ও রিপুতাড়িত হইয়া অশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। যে বায়ু সুমেরুপর্ব্বত উৎপাটিত করিতে পারে, সে হস্তিপ্রমাণ শিলাখণ্ড গ্রাহ্য করিবে কেন? যে বায়ু জম্বুবৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া বলের পরিচয় দেয়, সে ছিন্নতটস্থিত গুল্মকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না; যে বায়ু

---

[১]। ক্ষীরবৃক্ষ বা ক্ষীরতরু বলিলে ন্যাগ্রোধ, উডুম্বও, অশ্বত্থ ও মধুক এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার বৃক্ষ বুঝায়।

মহাসমুদ্রশোষণক্ষম, তাহার নিকট ক্ষুদ্র তড়াগ অতি তুচ্ছ বিষয়। রিপুগণ যখন উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধচিত্ত বোধিসত্ত্বদিগেরও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে, তখন তাহারা তোমায় দেখিয়া কি লজ্জিত হইবে? রিপুবলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও বিপথগামী হন, যশস্বী ব্যক্তিরাও কলঙ্কভাগী হয়ে থাকেন। ইহা বলিয়া শাস্তা অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানোদয়ের পর সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইয়া বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ববিধ কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সমাধান করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিমাচলের এক নিভৃত প্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ[১] হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীতে গমন করিয়া রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন শারীরকৃত্য সমাপনান্তর নগর মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাহার পরিধান রক্তবসন, স্কন্ধের একদেশে মৃগচর্ম্ম, মস্তকে সুবিন্যস্ত জটামণ্ডল, স্কন্ধে কাচ।[২] তিনি এই বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার-প্রকার দেখিয়া রাজার বড় ভক্তি জন্মিল। তিনি তাঁহার আহ্বান করিয়া মহার্হ আসনে বসাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক ভোজনার্থ প্রচুর সুমধুর খাদ্য দান করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহাতে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন, আপনি এখন হইতে এই উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।' বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইয়া রাজ্যোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকুলস্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং রাজভোগ আহার করিতেন। এইরূপে ষোড়শ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অতঃপর কাশীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল; তাহা দমন করিবার জন্য একদিন রাজাকে বারাণসী হইতে প্রস্থান করিতে হইল। যাত্রাকালে তিনি অগ্রমহিষী মৃদুলক্ষণাকে বলিয়া গেলেন, 'তুমি অতি সাবধানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচর্য্যা করিবে।' রাজার প্রস্থানের পরেও বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ যখন ইচ্ছা রাজভবনে যাইতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী মুদৃলক্ষণা যথাসময়ে বোধিসত্ত্বের আহার প্রস্তুত করিলেন;

১। পালি 'অম্বিলো'—আমানি বা অম্লজল (Vinegar)

২। কাচ (পালি 'কাজো বা কাচো) = বাঁক। ইহাতে বাঁকের শিকাও (শিক্যা) বুঝায়।

কিন্তু সেদিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। মৃদুলক্ষণা সেই অবসরে স্নানাদি শারীরকৃত্য শেষ করিয়া লইলেন। তিনি সুবাসিত জলে স্নান করিলেন, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন এবং একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানশেষ হইলে তিনি দেখিলেন অনেক বেলা হইয়াছে। তখন তিনি আকাশপথেই রাজভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কল ও চীবরের শব্দ শুনিতে পাইয়া মৃদুলক্ষণা 'আর্য্য আসিয়াছেন' বলিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। ব্যস্ততাবশত তাঁহার উৎকৃষ্ট শাটকখানি ঈষৎ স্খলিত হইল; কাজেই বাতায়নপথে প্রবেশ করিবার সময় বোধিসত্ত্ব তদীয় আলোক-সামান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক নয়নের তৃপ্তিসাধনার্থ তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কামনা জন্মিল; তিনি পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষবৎ পাতিত্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানফলও বিনষ্ট হইল এবং তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ভোজ্য গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিয়া রিপু প্রকম্পিত দেহে প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। সেখানেও পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তিনি ফলকশয্যার নিম্নে ভোজ্য রাখিয়া দিলেন এবং অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলেন। মহিষীর অসামান্যরূপের ভাবনায় তাঁহার হৃদয় বাসনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি সপ্তাহকাল সেই ফলকশয্যায় অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

সপ্তম দিবসে রাজা বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং ভাবিলেন, 'একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়া আসি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি উদ্যানে গিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় শয্যাশায়ী। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ইনি অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ণশালা পরিষ্কৃত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার অসুখ করিয়াছে কি?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার অন্য কোন অসুখ নাই; কিন্তু আমার চিত্ত কামনা-প্রতিবদ্ধ হইয়াছে।' 'কাহার জন্য কামনা?' 'মৃদুলক্ষণার জন্য।' 'বেশ কথা! আমি মৃদুলক্ষণাকে আপনাকেই দান করিতেছি। এই বলিয়া রাজা তপস্বিসহ গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং মহিষীকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দান করিলেন। কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'প্রিয়ে, তুমি স্বীয় প্রভাবে এই তপস্বীকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিও।' মৃদুলক্ষণা বলিলেন, 'যে, আজ্ঞা, মহারাজ, চেষ্টার ক্রুটি হইবে না।'

ইহার পর বোধিসত্ত্ব মৃদুলক্ষণাকে লইয়া রাজভবনের বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহারা যখন সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মৃদুলক্ষণা বলিলেন, 'প্রভো, আমাদের বাসোপযোগী কোন গৃহ নাই। আপনি রাজার নিকট গিয়া একটা বাসগৃহ প্রার্থনা করুন। বোধিসত্ত্ব তদনুসারে রাজার নিকট গৃহ প্রার্থনা করিলেন। রাস্তার ধারে একখানি জীর্ণ কুটীর ছিল; পথিকেরা তাহাতে মলত্যাগ করিত। রাজা বোধিসত্ত্বকে ঐ কুটীর দান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব মহিষীকে লইয়া সেই কুটীরে গেলেন; কিন্তু মহিষী উহা দেখিয়াই বলিলেন 'আমি ইহার ভিতর যাইব না।' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন যাইবে না?' 'অশুচি বলিয়া।' 'তবে এখন কি করিতে হইবে বল?' 'ঘর পরিষ্কার করুন; রাজার নিকট গিয়া কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া আসুন।' এই বলিয়া মহিষী বোধিসত্ত্বকে পুনর্ব্বার রাজার নিকট পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা ঘরের মল ও আবর্জ্জনা ফেলাইলেন, গোবর আনাইয়া মেজে ও বেড়া লেপাইলেন; 'আবার যান, খাটিয়া আনুন, পিড়ি আনুন, বিছানা আনুন, জালা আনুন, ঘটি আনুন' বলিয়া এক একবার এক একটী দ্রব্য আনাইলেন, এবং শেষে তাঁহাকে জল ও অন্যান্য উপকরণ আনিতে বলিলেন। বোধিসত্ত্ব ঘটে করিয়া জল আনিয়া জালায় পূরিলেন, মহিষীর স্নানের জন্য জল আনিলেন এবং শয্যা প্রস্তুত করিলেন।

এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে বোধিসত্ত্ব মহিষীর সহিত শয্যায় উপবেশন করিলেন। 'তুমি না ব্রাহ্মণ? তুমি না শ্রমণ? তুমি কি সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ?' বলিতে বলিতে মহিষী তাঁহার দাড়ি[১] ধরিয়া নিজের মুখের সম্মুখে তদীয় মুখ টানিয়া আনিলেন। মহিষীর কথায় বোধিসত্ত্বের চৈতন্য হইল; এতক্ষণ তিনি অজ্ঞানে ডুবিয়াছিলেন।

['ভিক্ষুগণ, কামরিপু ধর্ম্মের বিঘ্নজনক[২] এবং ক্লেশ বলিয়া পরিগণিত; কেন না অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং অবিদ্যাজাত সমস্তই জীবকে অন্ধ করিয়া ফেলে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এখানে বলা আবশ্যক।]

চৈতন্যলাভের পর বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই কুপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে আমি আর চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিব না। আমি অদ্যই মহিষীকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব এবং হিমালয়ে চলিয়া যাইব।' অনন্তর তিনি মহিষীকে লইয়া রাজার নিকট উপনীত

---

[১]। সংস্কৃত 'দাঢ়িকা', পালি 'দাঠিকা', বাঙ্গালা 'দাড়ি'।

[২]। মূলে 'কামচ্ছন্দ-নীবরণা' এই পদ আছে। নীবরম = ধর্ম্মপরিপন্থক। বৌদ্ধশাস্ত্রে কাম, ব্যাপাদ (ঈর্ষ্যা), স্ত্যানমিদ্ধ (অলসতা), ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সংশয়), ঋণ, রোগ বন্ধনাগার, দাসত্ব প্রভৃতি নানা নীবরণের নাম দেখা যায়।

হইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার মহিষীতে আর আমার প্রয়োজন নাই; ইঁহারই জন্য আমার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :

মৃদুলক্ষণার তরে একমাত্র অভিলাষ ছিল মম পূর্ব্বে হে রাজন;
কিন্তু সেই বিশালাক্ষী লভি এবে, এক ইচ্ছা ইচ্ছান্তরে করে উৎপাদন।

এই গাথা আবৃত্তি করিবামাত্র বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন এবং আর কখনও মনুষ্যপথের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিলেন না। তিনি ব্রহ্মবিহারে বিচরণপূর্ব্বক অবিরত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন এবং যথাকালে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন মৃদুলক্ষণা এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

---

৬৭. উৎসঙ্গ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক জনপদবাসিনী রমণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন :

একদা কোশলরাজের তিনজন লোক কোন বনের ধারে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিল। ঐ সময়ে তস্করেরা বনের মধ্যে পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলাইয়া যাইতেছিল। যাহাদের সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছিল তাহারা তস্করদিগের অনুধাবন করিতে করিতে উক্ত কর্ষকত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকেই তস্কর মনে করিয়া বলিল, 'বটে, বনের ভিতর চুরি করিয়া বনের বাহিরে এখন চাষা সাজিয়াছ? আচ্ছা, দেখাইতেছি তোমাদিগকে'। এই বলিয়া তাহারা ঐ তিন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া কোশলরাজের নিকট লইয়া গেল।

এই সময়ে একজন স্ত্রীলোক রাজভবনে গিয়া 'আমায় আচ্ছাদন দাও, আমায় আচ্ছাদন দাও' বলিয়া পুনঃপুন কান্নাকাটি আরম্ভ করিল। রাজা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, 'উহাকে একখানা আচ্ছাদন দান কর।' রাজভৃত্যেরা এই আদেশ পাইয়া ঐ রমণীকে একখানা শাড়ী দিতে গেল; কিন্তু সে বলিল, 'আমি এ আচ্ছাদন চাই না।' তখন ভৃত্যেরা রাজার নিকট গিয়া এই কথা

জানাইল। তাহারা বলিল, 'মহারাজ, ভিখারিণী এ আচ্ছাদন চায় না; সে স্বামি-রূপ আচ্ছাদন চায়।' এই কথা শুনিয়া রাজা রমণীকে ডাকাইলেন এবং সে প্রকৃতই স্বামী চায় কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিল, 'হাঁ মহারাজ; কারণ স্বামীই নারীদিগের প্রকৃত আচ্ছাদন। যাহার স্বামী নাই, সে সহস্র মুদ্রার আচ্ছাদন পরিধান করিলেও নগ্না।'

এখানে নিম্নলিখিত সূত্রটী আবৃত্তি করিলে অর্থ পরিস্ফুটিত হইবে :

নগ্না জলহীনা নদী, নগ্ন অরাজক দেশ,
বিধবা রমণী নগ্না, কি বলিব তাহার ক্লেশ?
ভ্রাতা বন্ধু দশ জন পারে কি রক্ষিতে তায়?
বিধবার দুঃখ হেরি পাষাণ ফাটিয়া যায়।]

রমণীর কথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বন্দী তিনজন তোমার কে হয়?' সে কহিল, 'মহারাজ, ইহাদের একজন আমার স্বামী, একজন ভ্রাতা ও একজন পুত্র।' রাজা কহিলেন, 'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের একজনকে ক্ষমা করিলাম। তুমি কাহাকে চাও বল।' সে বলিল, 'মহারাজ, বাঁচিয়া থাকি ত আবার স্বামী পাইব, পুত্রও পাইব, কিন্তু যখন আমার মাতা পিতা কেহই বর্ত্তমান নাই, তখন ভ্রাতা গেলে আর ভ্রাতা পাইব না। অতএব আমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।' রাজা এই কথায় আরও সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ তিনজন বন্দীকেই ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে সেই রমণীর সাহায্যে উক্ত তিন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিল।

ক্রমে এই ঘটনা রাষ্ট্র হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া ঐ রমণীর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'এই রমণী যে এ জন্মেই ইহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এমন নহে। পূর্ব্ব জন্মেও সে ইহাদিগকে মুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

*   *   *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় একদিন তিনজন লোক বনের নিকট ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিল। তোমরা যেরূপ বলিলে, তাহাদের সম্বন্ধে সমস্তই সেইরূপ ঘটিয়াছিল। যখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনজনের মধ্যে কাহার মুক্তি প্রার্থনা কর, তখন রমণী বলিল, 'মহারাজ, আপনি কি তিনজনকেই মুক্তি দিতে পারেন না?' রাজা কহিলেন, 'না, আমি তাহা পারিব না।' 'যদি তিনজনকেই ছাড়িতে না পারেন, তবে আমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিন।' 'পুত্র বা স্বামীকে না

চাহিয়া ভ্রাতাকে চাহিতেছ কেন?' 'মহারাজ, পুত্র ও স্বামী সুলভ, কিন্তু ভ্রাতা দুর্লভ।'এই বলিয়া রমণী নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল :

কোলে ছেলে পথে পতি, সহজেই পাই;
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই?

রাজা দেখিলেন রমণী সত্য বলিতেছে। তিনি প্রীত হইয়া তিনজনকেই বন্ধনাগার হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তি দিলেন; রমণী তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল।

* * *

[অতএব দেখিতে পাইলে ঐ রমণী এই তিন ব্যক্তিকেও পূর্ব্বেও বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিল।

সমবধান—তখন এই রমণী ও এই ব্যক্তিত্রয় ছিল সেই রমণী এবং সেই ব্যক্তিত্রয় এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

☞ ইহাতে বিধবাদিগের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা লক্ষিত হয়। তবে প্রত্যুৎপন্নত ও অতীতবস্তু উভয়ত্রই রমণী নীচজাতীয়া। হিন্দু সমাজের নীচজাতীয় লোকের মধ্যে (বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে) বিধবাবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

---

৬৮. সাকেত-জাতক

[শাস্তা অঞ্জনবনে অবস্থিতি কালে কোন ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা যখন ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া সাকেত[১] নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সাকেতবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারদেশে দশবলের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে তদীয় গুল্‌ফদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, মাতাপিতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের সেবা করা কি পুত্রের ধর্ম্ম নয়? তুমি এতকাল আমাদিগকে দেখা দাও নাই কেন? আমি ত এখন তোমায় দেখিতে পাইলাম। চল, তোমার মাতাকে দেখা দিয়া যাও।' ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ শাস্তাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এখানে তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী আসিয়া তাঁহার

---

[১]। অযোধ্যার অন্তঃপাতী প্রাচীন নগরবিশেষ।

পাদমূলে পড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 'বাবা, এতকাল কোথায় ছিলি? বুড়া মা বাপের কি সেবা করিতে নাই রে, বাপ?' অনন্তর তিনি পুত্রকন্যাদিগকে 'তোরা শীঘ্র আয়, তোদের দাদাকে প্রণাম কর' বলিয়া ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা শাস্তাকে প্রণাম করাইলেন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পরম সন্তোষ লাভ করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে জরাসূত্র[১] শুনাইলেন; তাহাতে ঐ দম্পতি অনাগামীফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর আসন হইতে উত্থিত হইয়া শাস্তা অঞ্জনবনে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'দেখ তথাগতের পিতা শুদ্ধোধন এবং মাতা মহামায়া, এ কথা ব্রাহ্মণ নিশ্চিত জানেন; তথাপি তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই শাস্তা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন; শাস্তাও তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। ইহার কারণ কি?' ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারা দুইজনে পুত্রকেই পুত্র বলিয়াছেন।' অনন্তর তিনি অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

এই ব্রাহ্মণ অতীতকালে নিরন্তর উপর্য্যুপরি পঞ্চশত জন্ম আমার পিতা, পঞ্চশত জন্ম খুল্লতাত,[২] এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণীও অতীতকালে নিরন্তর পঞ্চশত জন্ম আমার মাতা, পঞ্চশত জন্ম পিতৃব্য-পত্নী এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহী ছিলেন। এইরূপে সার্দ্ধসহস্র জন্ম আমি এই ব্রাহ্মণের হস্তে এবং সার্দ্ধসহস্র জন্ম এই ব্রাহ্মণীর হস্তে প্রতিপালিত হইয়াছি।

এইরূপে ত্রিসহস্র জন্ম-বৃত্তান্ত বলিয়া অভিসম্বুদ্ধ শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

দরশন মাত্র মন যারে চায়,
দরশনে যার প্রসন্ন অন্তর,
প্রাক্তন বান্ধব জানিবে তাহায়;
বিশ্বাসের পাত্র সেই মিত্রবর।

* * *

---

[১]। জরাসূত্র—সূত্র নিপাঠের সূত্রবিশেষ।

[২]। মূলে চুল্লপিতা (খুল্লতাত), মহাপিতা (পিতামহ, মাতামহ), চুল্লমাতা (পিতৃব্য পত্নী), মহামাতা (পিতামহী, মাতামহী) এই কয়েকটী শব্দ দেখা যায়। 'মহাপিতা' ইংরাজী grandfather শব্দের অবিকল অনুরূপ।

[সমবধান—এই ব্রাহ্মণদম্পতি উক্ত সমস্ত অতীত জন্মেই দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং আমি তাঁহাদের সন্তান ছিলাম।]

---

৬৯. বিষবান্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই স্থবির যখন পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন তখন একদিন লোকে ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারার্থ এত পিষ্টক লইয়া গিয়াছিলেন যে ভিক্ষুদিগের আহারান্তেও বিস্তর উদ্‌বৃত্ত ছিল। তাহা দেখিয়া দাতারা বলিলেন, 'মহাশয়গণ, যাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার্থ গ্রামে গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যও কিছু পিষ্টক রাখিয়া দিন।'

এই সময়ে সারীপুত্রের এক সার্দ্ধবিহারিকও কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহার জন্য পিষ্টকের এক অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি ফিরিতেছেন না দেখিয়া বিহারবাসীরা মনে করিল ভোজন-বেলা অতিক্রান্ত হইতে চলিল; (ইহার পর পিষ্টক ভক্ষণের সময় থাকিবে না)[১] অতএব তাহারা ঐ অংশ স্থবিরকে আহার করিতে দিল। তিনি উহা আহার করিয়াছেন এমন সময় সার্দ্ধবিহারিক বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাকে দেখিয়া স্থবির বলিলেন, 'বৎস, তোমার জন্য যে পিষ্টক রাখা হইয়াছিল তাহা আমি আহার করিয়াছি। সার্দ্ধবিহারিক বলিল, 'তাহা করিবেন না কেন? মধুর দ্রব্য কি কাহারও নিকট অপ্রিয় হইতে পারে?'

এই কথায় মহাস্থবিরের মনে বড় অশান্তি জন্মিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'অদ্য হইতে পিষ্টক ভোজন ত্যাগ করিলাম।' শুনা যায় ইহার পর নাকি সারীপুত্র আর কখনও পিষ্টক ভক্ষণ করেন নাই।

সারীপুত্র পিষ্টক ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা অচিরে বিহারবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। তাহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আন্দোলন করিতেছে এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?' তাহারা আলোচনার বিষয় নিবেদন করিলে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, সারীপুত্র একবার যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রাণ গেলেও তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে না।' অতঃপর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

---

[১]। কেন না মধ্যাহ্নের পর পিষ্টকাদি চর্ব্ব্য খাদ্য নিষিদ্ধ।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বিষবৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি এই ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন কোন জনপদবাসী সর্পকর্তৃক দষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া তখনই বোধিসত্ত্বকে আনাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঔষধ প্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না যে সাপে ইহাকে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া তাহার দ্বারা বিষ চুষাইয়া লইব?' গ্রামবাসীরা বলিল 'সাপ আনিয়াই বিষ বাহির করান।' তখন বোধিসত্ত্ব সর্পকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি এই ব্যক্তিকে দংশন করিয়াছ?' সর্প বলিল, 'হাঁ, আমিই ইহাকে দংশন করিয়াছি।' 'তবে এখন ক্ষতস্থান হইতে বিষ চুষিয়া বাহির কর।' 'আমি একবার যে বিষ ঢালিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেও কখন পুনর্গ্রহণ করি নাই, এখনও করিব না।' এই উত্তর শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কাষ্ঠ আনাইয়া অগ্নি জ্বালাইলেন এবং সর্পকে বলিলেন, 'হয় বিষ চুষিয়া লও, নয় এই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মর।' সর্প কহিল, 'পুড়িয়া মরি সেও ভাল, তথাপি পরিত্যক্ত বিষ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব না।'

ঢালি একবার প্রাণভয়ে পুনঃ গিলিতে যাহারে হয়,
ধিক হেন বিষে; ইহাতে আমার নাহি কোন ফলোদয়।
নীচতা স্বীকারে লভিলে জীবন, কেমনে দেখাব মুখ?
তার চেয়ে আমি তেজ দেখাইয়া মরণে পাইব সুখ।

ইহা বলিয়া সর্প অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাহাকে বাধা দিয়া ঔষধ ও মন্ত্রবলেই বিষ বাহির করিলেন। এইরূপে উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব সর্পকে শীলব্রত শিখাইলেন এবং 'অতঃপর কাহাকেও অনিষ্ঠ করিও না' বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

* * *

[সারীপুত্র যখন একবার কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করে, তখন কখনও তাহা প্রাণান্তে পুনর্ব্বার স্পর্শ করে না।

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই বৈদ্য।]

---

৭০. কুদ্দাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে চিত্রহস্ত সারীপুত্র নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র শ্রাবস্তীনগরের কোন ভদ্রবংশীয় যুবক[১] তিনি একদিন হলকর্ষণান্তে[২] গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় কোন বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জনৈক স্থবিরের পাত্র হইতে স্নিগ্ধমধুর ভোজ্যপেয়ের আস্বাদ পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'আমি দিবারাত্র স্বহস্তে নানা কার্য্য সম্পাদন করি, অথচ কখনও এরূপ মধুর খাদ্য পাই না। অতএব আমিও শ্রমণ হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক দেড় মাস কাল একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মচিন্তা করিলেন, কিন্তু শেষে রিপুপরতন্ত্র হইয়া সজ্ঘত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর অন্নকষ্টে তিনি পুনর্ব্বার প্রব্রাজক হইয়া অভিধর্ম্ম[৩] শিক্ষা করিলেন। এইরূপে তিনি উপর্য্যুপরি ছয়বার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ছয় বার সংসারী হইলেন। অনন্তর সপ্তমবার সংসার ত্যাগ করিবার পর তিনি অভিধর্ম্মের সাতটী প্রকরণই কণ্ঠস্থ করিলেন এবং বহুবার ভিক্ষুধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার ভিক্ষুবন্ধুগণ পরিহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'কিহে ভায়া, তোমার চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় রিপুগণের প্রাদুর্ভাব হয় না কি?' তিনি বলিলেন, 'বন্ধুগণ, পার্থিব গৃহিভাব আর আমায় অভিভূত করিতে পারে না।'

চিত্রহস্ত সারীপুত্র এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভ করিলে ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, যদিও চিত্রহস্ত সারীপুত্র ভাগ্যবলে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তথাপি (এ কথা বলিতে হইবে যে) তিনি ছয়বার সজ্ঘত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা পৃথগ্‌জন (অর্থাৎ যাহারা ত্রিরত্নের শরণ না লইয়া কেবল পার্থিব বিষয়ই লইয়া থাকে) তাহাদের বহু দোষ।

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত লঘু ও দুর্দ্দমনীয়। বিষয়বাসনা এরূপ চিত্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চিত্ত একবার আবদ্ধ হইলে সহসা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশংসার্হ ও বশীভূত হইলে ইহা পরম সুখাবহ ও কল্যাণসাধক হয়।

---

[১]। যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিতেন তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ না হইলেও 'স্থবির' উপাধি পাইতেন। এই নিমিত্ত চিত্রহস্ত সারীপুত্র যুবক হইয়াও 'স্থবির' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

[২]। ভদ্রবংশীয়দিগের পক্ষে স্বহস্তে হলকর্ষণ প্রাচীনকালে দোষাবহ ছিল না।

[৩]। অর্থাৎ তৃতীয় পিটক।

বিষয়ীর চিত্ত রিপু-পরায়ণ, অসার বিষয়ে রত অনুক্ষণ।
হেন চিত্ত যেই বশীভূত করে; প্রশংসা তাহার করে সব নরে।
চিত্তের দমন সুখের কারণ; কল্যাণ তাহাতে লভে সর্ব্বজন।

চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তাবশত পণ্ডিতেরাও লোভপরবশ হইয়া একখানি কুদ্দাল পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে পারেন নাই এবং সেই সামান্য বস্তুর মায়ায় ছয়বার প্রব্রজ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তমবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁহারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলেন এবং লোভ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে[১] জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর 'কুদ্দালপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারে সেই একখানি কোদাল ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোদালখানি লুকাইয়া রাখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মনে সেই ভোঁতা কোদালের লোভ প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় সংসারে আসিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,—তিনি ছয়বার কোদাল লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয়বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তমবারে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃ পুনঃ গৃহে আসিতেছি; এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' তখন তিনি নদীতীরে গিয়া, পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয় এই আশঙ্কায়, চক্ষুদ্বয় নিমীলন করিলেন, বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং 'আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!' বলিয়া তিনবার সিংহনাদ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল।

---

[১]। যাহারা শাকসবজি উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা পর্ণিক নামে অভিহিত হইত। বঙ্গদেশে পুণ্ডরীক নামক জাতিরও এই ব্যবসায়। পুণ্ডরীকেরা সাধারণত পুঁড়া নামে পরিচিত।

তাহাদিগকে দমন করিয়া বারাণসীপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। দৈবগত্যা ঐ সময়ে তিনি সেই নদীতেই অবগাহনপূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, 'এ লোকটা 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিতেছে! কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত।'

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, যদি চিত্তনিহিত রিপুগণকে জয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করাও বৃথা। আমি অদ্য লোভদমনপূর্ব্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :

সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয়ভয়?
যে জয়ের কভু নাই পরাজয়, সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এখন কোথায় যাইবেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।' 'তবে আমিও প্রব্রাজক হইব' বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মাণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

বারাণসীবাসীরা যখন শুনিল কুদ্দালপণ্ডিতের উপদেশবলে রাজা প্রব্রজ্যাভিমুখী হইয়াছেন এবং সৈন্যরা তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, তখন তাহারা ভাবিল, 'আমরা ঘরে থাকিয়া কি করিব?' অনন্তর দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগর হইতে সমস্ত অধিবাসী তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ জনস্রোত বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করিল।

এদিকে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত[১] হইল। তিনি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিলেন, কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এত লোকের বাসস্থানের কি কি সুবিধা করা যায় ভাবিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতেছেন। ইঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা

১। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় সাধুপুরুষদিগের কোন বিপদ্ ঘটিলে শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়; হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় ভক্তের বিপদে দেবতার আসন টলে।

করিতে হইবে। তুমি এখনই হিমাচলে গিয়া দৈবশক্তিপ্রভাবে সমতল ভূভাগে ত্রিংশদ্‌যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চদশযোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ প্রস্তুত কর।' বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন এবং দেবরাজের আদেশমত আশ্রমপদ প্রস্তুত করিলেন।

[অতঃপর সংক্ষেপে বলা যাইতেছে; সবিস্তর বিবরণ হস্তিপাল-জাতকে (৫০৯) প্রদত্ত হইবে। এই জাতক এবং হস্তিপাল-জাতক প্রকৃতপক্ষে একই আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ।]

বিশ্বকর্ম্মা আশ্রমপদ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; সেখান হইতে বিকটরাবী পশু, পক্ষী ও রাক্ষসাদি দূর করিয়া দিলেন এবং চারিদিকে চারিটী একপদিক মার্গ[১] প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সানুচর কুদ্দালপণ্ডিত হিমাচলে উপনীত হইয়া শক্রদত্ত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত প্রব্রাজকোচিত কুটীর ও উপকরণাদি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, পরে অনুচরদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমপদ ভাগ করিয়া কে কোন অংশে থাকিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিলেন।

এইরূপে বারাণসীবাসীরা ইন্দ্রতুল্য বিভব পরিহার করিলেন, ত্রিংশদ্‌যোজনব্যাপী সমস্ত আশ্রমপদ প্রব্রাজকপূর্ণ হইল। কুদ্দালপণ্ডিত অবশিষ্ট সমস্ত কৃৎস্ন ধ্যান করিয়া[২] ব্রহ্মবিহার প্রাপ্ত হইলেন এবং অনুচরদিগের জন্য যথাযোগ্য কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সকলেই অষ্টসমাপত্তি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং যাহারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিল, তাহারাও দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, রিপুপরবশ চিত্তের মুক্তিসম্পাদন অতি দুষ্কর। লোভ জন্মিলে তাহা সহজে দূর করিতে পারা যায় না। কুদ্দালপণ্ডিতের ন্যায় বিজ্ঞলোকেও তখন অজ্ঞের মত আচরণ করিয়া থাকেন।]

এই উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তি-ফল, কেহ সকৃদাগামী ফল, কেহ অনাগামীফল লাভ করিলেন, কেহ কেহ বা অর্হৎ হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কুদ্দালপণ্ডিতের অনুচর; এবং আমি ছিলাম কুদ্দালপণ্ডিত।]

১। সঙ্কীর্ণপথ—যাহাতে একবারে একজন মাত্র লোক চলিতে পারে। তপোবনে প্রধানত এইরূপ সঙ্কীর্ণ পথেরই উল্লেখ দেখা যায়।

২। অর্থাৎ জল ব্যতীত অন্য সমস্ত কৃৎস্ন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

৭১. বরুণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে তিষ্যনামক জনৈক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একজন ভূম্যাধিকারীর পুত্র ছিলেন।[১]

একদিন শ্রাবস্তীবাসী বন্ধুত্বসূত্রাবদ্ধ ত্রিশজন ভদ্রবংশীয় যুবক বহুসংখ্যক অনুচরসহ গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি উপঢৌকন লইয়া শাস্তার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণার্থ জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা নাগমালক, শালমালক[২] প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানাংশে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর সায়ংকালে শাস্তা যখন সুরভিগন্ধবাসিত গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহারা সেখানে গিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং তদীয় চক্রলাঞ্ছিত পাদপদ্মে প্রণিপাতপূরঃসর একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মকথা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা স্থির করিলেন যে ভগবানের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহাদের পক্ষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে, শাস্তা যখন ধর্ম্মসভা ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন, আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।' শাস্তা তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

এই যুবকগণ আচার্য ও উপাধ্যায়গণের সেবা করিয়া যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করিলেন। তাঁহারা পাঁচ বৎসর ইঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া মাতৃকাদ্বয়[৩] আয়ত্ব করিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন, ত্রিবিধ অনুমোদন[৪] অভ্যাস করিলেন এবং তৎপরে চীবর সীবন ও রঞ্জন করিয়া শ্রমণধর্ম্ম পালনার্থ ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, 'ভগবন, আমরা পুনর্জন্মভয়ে ব্যাকুল এবং জরাব্যাধিমরণভয়ে সন্ত্রস্ত। আমাদিগের জন্য এমন এক একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা ধ্যান করিয়া আমরা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।' শাস্তা মনে মনে অষ্টত্রিংশ কর্ম্মস্থান পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের জন্য এক একটী উপযুক্ত কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচিত করিলেন এবং তাহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

---

[১]। মূলে 'কুটুম্বিপুত্ত' এই শব্দ আছে। কুটুম্বী = সম্পন্ন গৃহস্থ; ভূম্যাধিকারী।

[২]। মালক = বৃক্ষবেষ্টিত স্থান, নিকুঞ্জ (arbour)। 'নাগ' সম্ভবত নাগকেশর বৃক্ষকে বুঝাইতেছে।

[৩]। অর্থাৎ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। 'মাতৃকা' বলিলে সংক্ষিপ্তসার বুঝায়।

[৪]। দানানুমোদন, শীলানুমোদন ও ভাবনানুমোদন; অর্থাৎ কেহ দান করিলে, পঞ্চশীল প্রতিপালন করিলে বা ধ্যানাদি করিলে তাহাকে প্রশংসাদি দ্বারা উৎসাহিত করা।

কর্ম্মস্থান লাভান্তে এই ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব পরিবেশে[১] গমন করিলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকট বিদায় লইয়া শ্রমণধর্ম্ম-পালনার্থ পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্ব্বক বিহার হইতে যাত্রা করিলেন।

এই যুবকদিগের মধ্যে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অতি অলস, হীনবীর্য্য ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কখনও বনে বাস করিতে, কঠোর তপস্যা করিতে বা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব ইহাদের সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি বিহারে ফিরিয়া যাই।' এইরূপে নিরুৎসাহ হইয়া তিনি সহচরদিগের সহিত কিয়দ্দূর যাইবার পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপর ঊনত্রিশজন যুবক কোশলাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যমধ্যে বর্ষাযাপন করিলেন। সেখানে পুনঃ পুনঃ কঠোর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধিলাভে সমস্ত পৃথিবী আনন্দধ্বনিতে নিনাদিত হইল।

ক্রমে বর্ষা শেষ হইল; ভিক্ষুগণ প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তাকে সিদ্ধিলাভবার্ত্তা জানাইবার অভিপ্রায়ে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইলেন, একস্থানে পাত্র ও চীবর রাখিয়া দিলেন, আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথাগতের দর্শনালাভার্থে তাঁহার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সিদ্ধিলাভের কথা জানাইলেন এবং শাস্তার নিকট প্রশংসাবাদ পাইলেন। ইহা শুনিয়া কুটুম্বিপুত্র তিষ্য একাকীই শ্রমণধর্ম্মপালনার্থ পুনর্ব্বার বিহারত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহচর সেই ঊনত্রিশজন ভিক্ষুও পুনর্ব্বার অরণ্যবাসে যাইবার জন্য শাস্তার অনুমতি চাহিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'উত্তম কথা। তোমরা অরণ্যেই ফিরিয়া যাও।' অনন্তর তাঁহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব পরিবেশে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবিরের মনে সেই রাত্রিতেই তপস্যা আরম্ভ করিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং তিনি শ্রমণধর্ম্ম অভ্যাস করিবার অভিপ্রায়ে তক্তাপোষের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মধ্যমযামের অবসানে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন এবং সেই আঘাতে তাঁহার ঊরুদেশের অস্থি ভগ্ন হইল। তখন তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য উল্লিখিত ভিক্ষুদিগের অরণ্যবাস-গমনে বাধা

---

[১]। পরিবেশ = ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell)।

জন্মিল। পরদিন উপস্থানকালে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তোমরা না বলিয়াছিলে, আজই যাইবে?' 'তাহাই বলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আমাদের বন্ধু কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অসময়ে অতি উৎকটভাবে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ঊরুর অস্থি ভগ্ন হইয়াছে; তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইতেছে বলিয়া যাইতে পারি নাই।' শাস্তা বলিলেন, 'এই ব্যক্তি এ জন্মেই যে কেবল প্রথমে হীনবীর্য্যতা দেখাইয়া এবং শেষে অতিবীর্য্য দেখাইতে গিয়া তোমাদের গমনে বাধা দিয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও এ তোমাদের গমনান্তরায় হইয়াছিল; অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে গান্ধাররাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিত। একদিন এই শিষ্যেরা কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে একজন বড় অলস ছিল; সে একটী প্রকাণ্ড বরুণ বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'এই গাছটা বোধ হইতেছে শুষ্ক; অতএব ক্ষণকাল একটু তন্দ্রা ভোগ করিয়া শেষে ইহাতেই আরোহণপূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারণপূর্ব্বক নাক ডাকাইয়া[১] নিদ্রা যাইতে লাগিল। অন্য শিষ্যেরা কাঠের আটি বান্ধিয়া গুরুগৃহে ফিরিবার সময় তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং নিজেরা চলিয়া গেল। অলস শিষ্য উত্তরীয়-শয্যা হইতে উঠিয়া কিছুকাল চোখ রগড়াইতে লাগিল, কারণ তখনও তাহার ঘুম ভালরূপে ভাঙ্গে নাই। অনন্তর ঘুমের ঘোরেই সে গাছে চড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যেমন একখানা ডাল ধরিয়া টানিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভগ্নপ্রান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহার চোখে লাগিল। তখন সে এক হস্তে আহত চক্ষুটী আবৃত করিয়া এবং অন্য হস্তে কাঁচা ডালগুলি ভাঙ্গিয়া নীচে ফেলিল, এবং শেষে গাছ হইতে নামিয়া সেগুলিই আটি বান্ধিল। তাহার সহাধ্যায়ীরা যে শুকনা কাঠ আনিয়াছিল, গুরুগৃহে সে তাহারই উপর নিজের কাঁচা কাঠ ফেলিয়া রাখিল।

ইহার পরদিন জনপদবাসীর গৃহে ব্রাহ্মণভোজনের উপলক্ষে আচার্য্যের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ, কল্য অমুক গ্রামে যাইতে হইবে; কিন্তু তোমরা কিছু আহার না করিয়া যাইতে পারিবে না। অতএব ভোরে

[১]। মূলে 'কাকচ্ছমানো' এই পদ আছে।

উঠিয়া যাগু পাক করিবে এবং উহা খাইয়া রওনা হইবে। সেখানে তোমাদের নিজেদের জন্য এবং আমার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোজ্য পাইবে। সে সমস্ত লইয়া ফিরিয়া আসিও।'

আচার্য্যের আদেশে শিষ্যেরা পরদিন প্রত্যুষে দাসীকে জাগাইয়া বলিল, 'আমাদের জন্য শীঘ্র যাগু পাক কর।' দাসী কাঠ আনিতে গিয়া উপরে যে কাঁচা কাঠ ছিল তাহাই লইয়া উনানে দিল; কিন্তু বার বার ফুঁ দিয়াও আগুন জ্বালিতে পারিল না। এদিকে সূর্য্য উঠিল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বলিল, 'বেলা হইয়াছে; এখন আর রওনা হইবার সময় নাই।' অনন্তর তাহারা আচার্য্যের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তোমরা যে এখনও যাও নাই?' 'না, গুরুদেব, আমরা এখনও যাইতে পারি নাই।' 'কেন যাইতে পার নাই?' 'অমুক অলস ছাত্র আমাদের সঙ্গে কাঠ আনিতে গিয়া প্রথমে একটা বরুণ বৃক্ষের মূলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; শেষে তাড়াতাড়ি গাছে চড়িতে গিয়া চক্ষুতে আঘাত পাইয়াছে এবং আমরা যে কাঠ আনিয়াছিলাম তাহারই উপর কাঁচা কাঠ আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। পাচিকা ভাবিয়াছে, সমস্ত শুকনা কাঠ; এই নিমিত্ত শুকনা বলিয়া কাঁচা কাঠ উনানে দিয়াছে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আগুন জ্বালিতে পারে নাই। কাজেই আমাদের যাইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।' অলস ছাত্রের কার্য্য জানিতে পারিয়া আচার্য্য বলিলেন, 'একটা মূর্খের দোষেই তোমাদের কার্য্যহানি ঘটিল।' অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

অগ্রে যাহা করণীয়, পশ্চাতে করিতে চায়;
এ হেন অলস লোকে বহু অনুতাপ পায়।
তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ শিষ্যের কাজ;
আনিয়া বরুণ কাষ্ঠ শেষে কত পায় লাজ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

*   *   *

[সমবধান—এখন যে তিষ্যর ঊরু ভগ্ন হইয়াছে তখন সে ছিল আহতচক্ষু অলস ছাত্র; বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণাচার্য্য।]

---

৭২. শীলবন্-নাগ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, 'দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ; সে তথাগতের গুণ বুঝিতে পারিল না।' শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল এবং আমার গুণ বুঝিতে পারে নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃকুক্ষি হইতে বিনির্গত হইবার পরই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রজতপুঞ্জবৎ শুভ্র হইয়াছিল। তাঁহার মণিগোলকসদৃশ চক্ষুদ্বয় হইতে প্রসন্নচিত্ততার মধুররশ্মি বিনির্গত হইত। তাঁহার মুখ ছিল রক্তকম্বলোপম; শুণ্ড ছিল রক্তসুবর্ণপ্রতিমণ্ডিত রজতদামবৎ, তাঁহার পদচতুষ্টয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখিলে মনে হইত যেন সেগুলি লাক্ষাদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। ফলত তাঁহার দেহ দানশীলাদি দশপারমিতাযুক্ত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন হিমাচলবাসী অপর সমস্ত হস্তী তাঁহাকে অধিনেতা করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এইরূপে ষষ্টি সহস্র হস্তীর আধিপত্য লাভ করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন দলের মধ্যে পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক একাকী অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে তিনি 'শীলবান গজরাজ' এই নাম প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনচর নিজের জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহার্থে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে অভীষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে দিগভ্রান্ত হইয়া পথ হারাইল এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইলে তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাহার দুঃখমোচনার্থ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বনচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব তাহার অনুধাবন না করিয়া যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বকে থামিতে দেখিয়া বনচরও থামিল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু বনচরও আবার পলায়নপর হইল। এইরূপ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল—বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেই বনচর পলায়, বোধিসত্ত্ব থামিলেই সে থামে। অনন্তর বনচর ভাবিতে লাগিল, 'এই হস্তী আমাকে পলাইতে দেখিলেই থামে; আমার থামিতে দেখিলেই অগ্রসর হয়;

ইহাতে বোধ হইতেছে এ অনিষ্টকামী নয়; বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছ কেন?' সে কহিল, 'প্রভু, আমার দিগভ্রম হইয়াছে; পথ হারাইয়া প্রাণভয়ে বিলাপ করিতেছি।'

তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং নানাবিধ ফলদ্বারা কয়েক দিন তাহার পরিচর্য্যা করিলেন। অনন্তর 'ভয় নাই, আমি তোমাকে লোকালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছি' বলিয়া তিনি তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লোকালয়াভিমুখে চলিলেন, কিন্তু সেই মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি ভাবিল, 'যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে (কোথায় ছিলে বা কোন পথে আসিলে), তাহা হইলে ত উত্তর দেওয়া চাই।' এই জন্য সে বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে বসিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও শৈলসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অবশেষে বোধিসত্ত্ব বনভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে বারাণসীর পথে স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই পথে চলিয়া যাও, কেহ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক, কাহাকেও আমার বাসস্থানের কথা জানাইও না।' এইরূপে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

বারাণসীবাসী বনচর নগরে বিচরণ করিতে করিতে একদিন দন্তকারবীথিতে[১] প্রবেশ করিল। লোকে গজদন্ত কাটিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা জীবিত হস্তীর দন্ত পাইলে ক্রয় কর কি?' দন্তকারেরা বলিল, 'তুমি বল কি? মৃত হস্তীর দন্ত অপেক্ষা জীবিত হস্তীর দন্ত অনেক অধিক মূল্যবান।' 'তবে আমি জীবিত হস্তীর দন্ত আহরণ করিতেছি।' এই বলিয়া সে কিছু পাথেয় ও একখানি সুতীক্ষ্ণ করাত লইয়া বোধিসত্ত্বের বাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ফিরিয়া আসিলে যে?' সে বলিল, 'প্রভু, আমি এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া আপনার দন্তের কিয়দংশ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যদি সফলকাম হই, তাহা হইলে দেখিব উহা বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয় কি না।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যদি তোমার নিকট যেমন তেমন একখান করাত থাকে, তবে দন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি।' সে বলিল, 'আমি করাত সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বেশ করিয়াছ; তবে দুইটী দন্তই কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাও।' অনন্তর তিনি পাগুলি গুটাইয়া, গরু যেমন মাটিতে বসিয়া থাকে, সেইভাবে বসিলেন; লোকটা তাহার দুইটী দন্তেরই অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিল। কাটা শেষ হইলে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়া সেই খণ্ডদ্বয় তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'দেখ ভাই, তুমি মনে করিও না যে এই দাঁত দুটীর প্রতি আমার কোন

[১]। বাজারে যেখানে লোকে গজদন্ত দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ('হাড়কাটা গলি')।

মমতা নাই বলিয়াই তোমায় দিতেছি। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিবেধন-সমর্থ সর্ব্বজ্ঞতারূপ দন্ত আমার নিকট সহস্রগুণে, শত-সহস্র-গুণে প্রিয়তর। অতএব এই দন্তদানক্রিয়াদ্বারা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ঘটে।’ অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ দন্তখণ্ডযুগল সেই বনচরকে দান করিলেন। সে উহা লইয়া বিক্রয় করিল এবং তল্লব্ধ অর্থ নিঃশেষ হইলে পুনর্ব্বার বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, ‘স্বামিন, আপনার দন্ত বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার ঋণমাত্র শোধ হইয়াছে; আপনার দন্তের অবশিষ্ট যে অংশ আছে তাহা দিতে আজ্ঞা হউক।’ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ‘বেশ, তাহাই দিতেছি।’ তিনি দন্তদ্বয়ের অবশিষ্টও পূর্ব্ববৎ কাটাইয়া ঐ ব্যক্তিকে দান করিলেন। সে উহা বিক্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ আবার তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, ‘স্বামিন, আমার সংসার ত আর চলে না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় দন্ত দুইটীর মূলভাগটুকু দান করুন।’ বোধিসত্ত্ব ‘তথাস্তু’ বলিয়া পূর্ব্বের মত উপবেশন করিলেন। তখন পাপিষ্ঠ মহাসত্ত্বের রজতদামসন্নিভ শুণ্ড মর্দ্দন করিয়া কৈলাসকূটবৎ কুম্ভে আরোহণ করিল এবং পদাঘাতে দন্তকোটী হইতে মাংস বিশ্লিষ্ট করিয়া তীক্ষ্ণ করপত্রদ্বারা মূলদন্ত ছেদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই সুমেরুযুগান্ধরাদি[১] পর্ব্বতের এবং দুর্গন্ধযুক্ত-মলমূত্রাদির মহাভারবহনসমর্থা বিপুলা[২] পৃথিবী যেন তাহার পাপভার বহনে অক্ষম হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল; সেই বিদীর্ণ স্থল দিয়া অবীচিমহানিরয় হইতে ভীষণ জ্বালা নির্গত হইল এবং নিজের নিত্য-ব্যবহার্য্য কম্বলের[৩] ন্যায় পাপাত্মাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। সে যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, তখন বনবাসিনী বৃক্ষদেবতা চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘রাজচক্রবর্ত্তীর পদ দান করিয়াও অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারা যায় না।’ অনন্তর সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :

---

[১]। যুগন্ধর—বৌদ্ধমতে সপ্ত কুলাচলের অন্যতম। সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী সুমেরুকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নাম যুগন্ধর, ঈষাধরা, করবীক, সুদর্শন, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ।

[২]। মূলে ‘চতুনহুতাধিকানি যোজনশতসহস্রাণি বহুল-ঘন-পথবী’ এইরূপ আছে। ‘নহুতরং = ১,০০,০০,০০০[৪] অর্থাৎ ১এর পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহা।

[৩]। ফস্‌বোল-প্রকাশিত মূলে ‘কুশলান্তক কম্বল’ আছে; ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে shroud of destiny করিয়াছেন। কিন্তু ‘কুশলান্তক’ শব্দ অভিধানে দেখা যায় না। বস্তুত ‘কুলসন্তক’ এই পাঠ হইবে। কুলসান্তক অর্থাৎ যাহা কুলের বা পরিবারের দ্রব্য—ঘরের জিনিস। ফলিতার্থ ‘তাহাকে সর্ব্বত পরিবেষ্টন করিয়া’।

যত পায় তত চায় অকৃতজ্ঞ জন,
বিশাল সাগরাম্বরা পায় যদি বসুন্ধরা,
তবু দুরাকাঙ্খা তার না পুরে কখন;
পাপীর লালসা, হায়, প্রবল এমন।

সেই বৃক্ষদেবতা উক্তরূপে বনভূমি নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যতদিন আয়ুঃ ছিল, ততদিন পৃথিবীতে বাস করিয়া শেষে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

*　　*　　*

[ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী পুরুষ, সারীপুত্র ছিল সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান গজরাজ।]

---

৭৩. সত্যং-কিল-জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় উপবেশন করিয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ, দেবদত্ত কি পাপিষ্ঠ! সে শাস্তার মাহাত্ম্য বুঝিল না, তাঁহার প্রাণবধের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

*　　*　　*

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার স্বভাব এমন ভীষণ ও নিষ্ঠুর ছিল যে, লোকে তাহাকে আহত বিষধরবৎ ভয় করিত। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে সে হয় তাহাকে গালি দিত, নয় তাহাকে প্রহার করিত। এই কারণে সে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল; তাহাকে দেখিলেই লোকে মনে করিত যেন একটা রাক্ষস তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দুষ্টকুমার একদিন জলক্রীড়া করিবার জন্য বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নদীতীরে গিয়াছিল। সকলে ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছে, এমন সময় ঝড় উঠিল, চারিদিক্

---

[১]। এই জাতকের মধ্যে যে গাথা আছে তাহার প্রথম শব্দদ্বয় 'সত্যং কির'।

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্টকুমার পরিচালকদিগকে বলিল, 'আমাকে নদীর মাঝখানে লইয়া চল, এবং সেখান হইতে স্নান করাইয়া আন্।' পরিচারকেরা তাহাকে নদীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া পরামর্শ করিল, 'এস, আমরা এই পাপি'কে মারিয়া ফেলি; রাজা আমাদের কি করিবেন?' অনন্তর 'আপদ্, নিপাত যাও'[১] বলিয়া তাহারা রাজকুমারকে জলে ফেলিয়া দিল এবং নিজেরা তীরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে কুমারের কর্ম্মসচিবেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমার কোথায়?' তাহারা বলিল, 'কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধহয় তিনি ঝড় জল দেখিয়া আগেই উঠিয়া আসিয়াছেন এবং বাড়ী গিয়াছেন।'

তাহারা সকলে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'কুমার কোথায়?' তাহারা বলিল, 'আমরা জানি না, মহারাজ! মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম তিনি আগেই চলিয়া আসিয়াছেন; কাজেই আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।' রাজা তৎক্ষণাৎ পুরদ্বার খুলিয়া নদীর তীরে গমন করিলেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ খবর পাইলেন না।

এদিকে কুমারের কি দশা হইল শুন। সে মেঘান্ধকারে দিশাহারা হইয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিল; শেষে একটা গাছের গুঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল এবং মরিবার ভয়ে 'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

[ক্রমে রাজপুত্রের তিনটী সঙ্গী জুটিল।] বারাণসীর এক ধনশালী বণিক ঐ নদীর ধারে চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্যধিক অর্থলালসা-নিবন্ধন মৃত্যুর পর তিনি সর্পরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ঐ গুপ্তধনের নিকটস্থ একটী বিবরে বাস করিতেছিলেন। এইরূপ অপর এক বণিকও ত্রিশ কোটি সুবর্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ধনতৃষ্ণার প্রবলতাবশত ইন্দুররূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ পাহারা দিতেছিলেন। [যখন অতিবৃষ্টিবশত নদীতে বান আসিল], তখন সর্প ও ইন্দুর উভয়েই গর্ত্তে জল প্রবেশ করিল, এবং তাহারা বাহির হইয়া সাঁতার দিতে দিতে চলিল। অনন্তর একটী কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া উহার এক প্রান্তে সাপ ও অন্য প্রান্তে ইন্দুর আরোহণ করিল। [তাহার পর একটা শুকপাখী আসিয়াও উহার উপর আশ্রয় লইল]। ঐ শুক নদীর ধারে একটা শিমূল গাছে বাস করিত। বন্যার বেগে গাছটা উৎপাটিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িল; শুক উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিয়দ্দূর উড়িতে না উড়িতেই বৃষ্টির বেগে সেই প্লবমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া পড়িল। এইরূপে চারিটী প্রাণী এক খণ্ড

---

[১]। মূলে 'এত্থ গচ্ছ কালকণ্নী' এইরূপ আছে।

কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। [ক্রমে রাত্রি হইল।]

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ঐ নদীর এক নিবর্ত্তন-স্থানে[১] পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি নিশীথকালে ইতস্তত পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। 'আমার ন্যায় দয়া-দাক্ষিণ্য-ব্রত মুনি নিকটে থাকিতে এই মহাপ্রাণী মারা গেলে বড় পরিতাপের কারণ হইবে, আমি জল হইতে উদ্ধার করিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইব' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি এক টানে গুঁড়িটাকে তীরের নিকট আনিলেন এবং রাজপুত্রকে তুলিয়া উপরে রাখিলেন। অনন্তর সর্প, ইন্দুর ও শুকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সকলকেই আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়া প্রথমে ইতর প্রাণী তিনটীর, পরে রাজপুত্রের শরীরে সেক দিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইতর প্রাণীরা দুর্ব্বল; অতএব ইহাদেরই অগ্রে পরিচর্য্যা করা উচিত।' অতিথি চতুষ্টয়ের আহারার্থ ফলাদি পরিবেষণ করিবার সময়ও তিনি প্রথমে সর্প, ইন্দুর ও শুককে খাওয়াইলেন, পরে রাজপুত্রকে খাইতে দিলেন। ইহা দেখিয়া দুষ্টকুমারের বড় ক্রোধ হইল। সে ভাবিল, 'আমি রাজপুত্র, অথচ এই ভণ্ডতপস্বী আমা অপেক্ষা ইতর জন্তুগুলার অধিক আদর অভ্যর্থনা করিতেছে!' এইরূপে রাজপুত্রের হৃদয়ে বোধিসত্ত্বের প্রতি বিকট ঘৃণার উদ্রেক হইল।

বোধিসত্ত্বের শুশ্রূষার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে রাজপুত্র ও সর্পাদি সকলেই সুস্থ ও সবল হইল; বন্যার জলও কমিয়া গেল। বিদায় লইবার সময় সর্প বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'বাবা, আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। আমি নির্ধন নহি; কারণ অমুক স্থানে আমার চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। যদি আপনার কখনও প্রয়োজন ঘটে, তবে ঐ ধন আপনারই জানিবেন। আপনি সেখানে গিয়া 'দীঘা' বলিয়া ডাকিবেন; আমি বাহির হইয়া উহা আপনাকে দিব।' ইন্দুরও বলিল, 'আপনি আমার বিবরের নিকট গিয়া 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিবামাত্র আমি বাহিরে আসিয়া আমার ত্রিশ কোটি সুবর্ণ আপনাকে দিব' শুক বলিল, 'বাবা, আমার সোণা রূপা নাই; কিন্তু যদি আপনার কখনও ভাল ধানের দরকার হয়, তবে অমুক গাছের নিকট গিয়া 'শুক' বলিয়া ডাকিবেন। আমি জ্ঞাতিবন্ধুর সাহায্যে আপনার জন্য গাড়ী গাড়ী ভাল ধান যোগার করিয়া দিব।' মিত্রদ্রোহী রাজপুত্র ভাবিয়াছিল, 'বেটাকে নিজের কোঠে পাইলে মারিয়া ফেলিব'; কিন্তু

---

[১]। বাঁকের মোড়ে।

বিদায় লইবার সময় সে মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল, 'আমি রাজা হইলে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন; আমি অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ উপচার দিয়া আপনার পূজা করিব।' ইহার কিছুদিন পরেই দুরাত্মা বারাণসীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদিন বোধিসত্ত্বের ইচ্ছা হইল ইহারা প্রতিজ্ঞামত কাজ করে কি না দেখি। তিনি প্রথমে সর্পের বিবরের নিকট গিয়া 'দীঘা' বলিয়া ডাকিলেন। সে শুনিবামাত্র এক ডাকেই, বাহিরে আসিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, 'বাবা, এইখানে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ আছে; আপনি সমস্ত তুলিয়া লইয়া যান।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তাহাই হইবে; যখন প্রয়োজন হইবে, তখন এ কথা স্মরণ করিব।' অনন্তর সেখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি ইন্দুরের গর্ত্তের নিকট গেলেন এবং 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন। ইন্দুরও সর্পের ন্যায় বাহিরে আসিয়া নিজের গুপ্তধন সমর্পণ করিতে চাহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট আসিল এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুক বৃক্ষের অগ্রে বসিয়াছিল; সে ডাক শুনিবামাত্র উড়িয়া নীচে আসিল এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, জ্ঞাতি বন্ধু লইয়া হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আপনার জন্য স্বয়ংজাত ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিব কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তোমার এই কথা ভুলিব না। এখন তুমি বাসায় ফিরিয়া যাও।'

শুকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার অঙ্গীকার পরীক্ষার্থ বারাণসীতে গিয়া রাজ্যোদ্যানে উপনীত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য তপস্বিজনোচিত বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মিত্রদ্রোহী রাজা নানালঙ্কার-শোভিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনুচরবৃন্দসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বকে দূর হইতে দেখিয়াই পাপিষ্ঠ মনে করিল, 'ঐ সেই ভণ্ডতপস্বী আমার স্কন্ধে চাপিয়া চর্ব্ব্যচুষ্য ভোজন করিতে আসিতেছে। ও যে আমার উপকার করিয়াছে তাহা লোকের নিকট বলিবার অবসর দেওয়া হইবে না; তাহার পুর্ব্বেই উহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে অনুচরদিগের দিতে তাকাইল। তাহারা 'মহারাজের কি আজ্ঞা' বলিয়া সসম্ভ্রমে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে কহিল, 'ঐ ভণ্ড তপস্বীটা ভিক্ষার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিতেছে। দেখিস্, ও যেন আমার কাছে ঘেষিতে না পারে। উহাকে এখনই বান্ধিয়া ফেল, প্রত্যেক চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া প্রহার কর, নগরের বাহিরে মশানে লইয়া যা, সেখানে আগে উহার মাথাটা কাট; তার পর ধড়টা শূলে চাপাইয়া দে।'

আজ্ঞাবহ রাজভৃত্যগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নিরপরাধ বোধিসত্ত্বকে মশানের দিকে লইয়া চলিল এবং প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে নিদারুণরূপে

কশাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব একবারও 'বাপরে, মারে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে এই গাথা বলিতে লাগিলেন :

মানুষ আর কাঠ যাচ্ছে দু'য়ে ভেসে বানের জলে;
কাঠ তুলি লও মানুষ ছাড়ি, লোকে ইহা বলে।
সত্য সত্য সত্য ইহা বুঝলাম আমি আজ;
মানুষ তোমার শত্রু হবে, কাঠে হবে কাজ।

রাজভৃত্যেরা যখনই বোধিসত্ত্বকে প্রহার করিতে লাগিল, তখনই তিনি কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। [তখন রাস্তায় বিস্তর লোক জমিয়াছিল।] ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কখনও আমাদের রাজার কোন উপকার করিয়াছিলেন কি?' তখন বোধিসত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, 'অতএব দেখা যাইতেছে, তোমাদের রাজাকে ভীষণ প্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়া আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তখন আমি প্রবীণদিগের উপদেশমত কাজ করি নাই বলিয়া এখন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি।'

বোধিসত্ত্বের মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—'আঃ! রাজা কি পাপিষ্ঠ! এই ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী উহার জীবন দিয়াছেন; কোথা ইঁহাকে পূজা করিবে, তাহা না করিয়া ইঁহার এত নিগ্রহ করিতেছে! এমন রাজা দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে?' ধর্, নরাধমকে এখনই মার।' তখন তাহারা ক্রোধভরে চারিদিক হইতে রাজাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তীর, শক্তি, মুদগর, প্রস্তর, যে যাহা হাতে পাইল নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার মৃতদেহ রাস্তার ধারে একটা খানায় ফেলিয়া দিল এবং বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে বসাইল।

বোধিসত্ত্ব রাজপদ পাইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল সর্প, ইন্দুর ও শুকের মনের ভাব আর একবার পরীক্ষা করা যাউক। তখন তিনি বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্পের বিবরসমীপে উপনীত হইলেন এবং 'দীঘা' বলিয়া ডাকিলেন। সর্প ঐ ডাক শুনিবামাত্র বাহিরে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, 'প্রভু, এই আপনার ধন রহিয়াছে; গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।' বোধিসত্ত্ব ঐ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ লইয়া অনুচরদিগের নিকট রাখিলেন এবং ইন্দুরের বিবরের নিকট গেলেন। সেখানেও তিনি যেমন 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন, অমনি ইন্দুর বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া ত্রিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দিল। এই অর্থও অনুচরগণের নিকট রাখিয়া বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুকও তাহা

শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজের জন্য ধান্য সংগ্রহ করিব কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন 'প্রয়োজন হইলে সংগ্রহ করিও; এখন চল তোমাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাই।' অনন্তর সত্তর কোটি সুবর্ণমুদ্রাসহ সর্প, ইন্দুর ও শুককে সঙ্গে লইয়া তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন, এক মনোরম প্রাসাদের ঊর্দ্ধতলে আরোহণ করিয়া সেখানে ঐ ধন রক্ষা করিলেন, এবং সর্পের বাসার্থ সুবর্ণনালিকা, ইন্দুরের বাসার্থ স্ফটিক গুহা, শুকের বাসার্থ সুবর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে সর্প ও শুকের আহারার্থ মধুমিশ্রিত লাজ[১] এবং ইন্দুরের জন্য গন্ধশালীতণ্ডুল দিবার আদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব এবং সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণিত্রয় পরস্পর সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিয়া যথাসময়ে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল দুষ্টকুমার; সারীপুত্র ছিল সেই সর্প; মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল সেই ইন্দুর; আনন্দ ছিল সেই শুক; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী, যিনি পুণ্যবলে শেষে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।]

---

৭৪. বৃক্ষধর্ম্ম-জাতক

[রোহিণী নদীর জল লইয়া নিজের জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কুলক্ষয়কর কলহ উপস্থিত হইলে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। কলহ সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া শাস্তা আকাশপথে গমনপূর্ব্বক রোহিণীর ঊর্দ্ধদেশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করেন। তাঁহার দেহ হইতে তখন নীলরশ্মির নির্গত হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাঁহার জ্ঞাতিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নদীতীরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলহ উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে সমস্ত সংক্ষেপে বলা হইল; সবিস্তর বিবরণ কুণালজাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'মহারাজগণ, আপনারা জ্ঞাতিবিরোধ ত্যাগ করুন; জ্ঞাতিজনের পক্ষে পরস্পর সম্প্রীতভাবে বাস করাই কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে একতা থাকিলে শত্রুপক্ষ বৈরসাধনের অবসর পায় না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, চেতনাহীন বৃক্ষদিগের মধ্যেও একতা থাকা

---

[১]। খই।

আবশ্যক। পুরাকালে হিমালয় প্রদেশে এক শালবনে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষ, গুচ্ছ, লতা পরস্পর ধরাধরি করিয়াছিল বলিয়া, প্রভঞ্জন যদিও তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছিল তথাপি, একটী বৃক্ষও পাতিত করিতে পারে নাই। ঐ প্রদেশেই কোন অঙ্গনে একটী বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষ ছিল; ঐ বৃক্ষ কিন্তু অন্য বৃক্ষদিগের সহিত একতাবদ্ধ ছিল না বলিয়া উন্মূলিত ও ভূপাতিত হইয়াছিল। অতএব আপনাদেরও কর্ত্তব্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বাস করেন।' অনন্তর জ্ঞাতিদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় প্রথম বৈশ্রবণের[১] মৃত্যু হয় এবং শক্র অপর এক দেবতাকে তাঁহার রাজ্যভার প্রদান করেন। নূতন বৈশ্রবণ রাজপদ গ্রহণ করিয়া তরু-গুচ্ছ-লতা-গুল্মবাসিনী দেবতাদিগকে আদেশ দিলেন 'তোমরা স্ব স্ব মনোমত বিমান নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর।'

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়স্থ এক শালবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা বিমান নির্ম্মাণ করিবার সময় অঙ্গনস্থ বৃক্ষ পরিহার করিবে? আমি এই শালবনে বিমান প্রস্তুত করিলাম; তোমরা ইহারই চতুষ্পার্শ্বে বাস কর।' বৃক্ষদেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা বোধিসত্ত্বের কথামত কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বোধ, তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা বনে বাস করিব কেন? লোকালয়ে গ্রাম, নগর, রাজধানী প্রভৃতির বহির্ভাগে থাকিলে কত সুবিধা! যে সকল দেবতা এরূপ স্থানে বাস করেন, তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট কত উপহার পাইয়া থাকেন!' সুতরাং নির্ব্বোধ দেবতারা লোকালয় সমীপে গমনপূর্ব্বক অঙ্গনস্থ মহাবৃক্ষসমূহে বাস করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন সেই অঙ্গনে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রাচীন বৃক্ষগুলি দৃঢ়মূল এবং বহু শাখাপ্রশাখা সমন্বিত ছিল বটে; কিন্তু তাহারা ঐ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে পারিল না; তাহাদের শাখা-প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন এবং কাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন হইল, অনেকে বা বায়ুবেগে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; কিন্তু এই ঝটিকা যখন পরস্পরসম্বন্ধ শালবৃক্ষসমূহের বনে উপস্থিত হইল তখন পুনঃপুন আঘাত করিয়াও সেখানকার একটী বৃক্ষেরও কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

ভগ্নবিমান দেবগণ নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদিসহ হিমাচলে গমন করিলেন

[১]। কুবেরের নামান্তর। বৌদ্ধমতে দেবতারাও মরণশীল; এক দেবতার প্রাণবিয়োগের পর অপর একজন তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক তৎপদে অভিষিক্ত হন।

এবং তত্রত্য শালবনবাসিনী দেবতাদিগের নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী জানাইলেন। তাঁহারা আবার বোধিসত্ত্বের নিকট ইঁহাদের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ না করাতেই ইঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :

বনমাঝে তরুরাজি পরস্পরে আলিঙ্গিয়া ভয় নাহি করে প্রভঞ্জনে;
একাকী থাকে যে বৃক্ষ, নিস্তার তাহার কিন্তু অসম্ভব হেরি সর্ব্বক্ষণে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, মিলিয়া মিশিয়া থাকি শত্রুভয়ে ভীত কভু নয়;
কিন্তু যবে বুদ্ধিদোষে কলহ আসিয়া পশে, ফল তার ধ্রুব কুলক্ষয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর জীবনাবসানে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিবার জন্য লোকান্তরে প্রবশ করেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজগণ, আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে উপায়েই হউক জ্ঞাতিগণের পক্ষে একতাবদ্ধ হইয়া ও সম্প্রীতভাবে বাস করা কত আবশ্যক।

সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত দেবতা।]

---

৭৫. মৎস্য-জাতক

[শাস্তা একবার বারিবর্ষণ ঘটাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় একবার কোশলরাজ্যে অনাবৃষ্টিবশত শস্য বিনষ্ট ও হ্রদ, তড়াগ, পুষ্পরিণী প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। জেতবন-দ্বারপ্রকোষ্ঠের নিকট যে পুষ্করিণী ছিল, তাহা পর্য্যন্ত জলহীন হইয়াছিল। মৎস্যকচ্ছপগণ কর্দ্দমের ভিতর লুকাইয়াছিল; কাক ও শোনগণ অনুক্ষণ শল্যসদৃশ তুণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইত। কর্দ্দম হইতে উত্তোলিত হইবার সময় এই সকল হতভাগ্য প্রাণীর শরীর ভয়ে ও যন্ত্রণায় স্পন্দিত হইত।

মৎস্যকচ্ছপদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শাস্তার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি অদ্যই বারিবর্ষণ করাইব।' অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার সময় সমাগত হইলে বহুসংখ্যক ভিক্ষু-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষা সংগ্রহার্থ বুদ্ধলীলাবলম্বনে

শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষা শেষ হইলে অপরাহ্নে বিহারে প্রতিগমনসময়ে শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীর সোপানে অবস্থান করিয়া স্থবির আনন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আমার স্নানবস্ত্র লইয়া আইস; আমি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিব।' আনন্দ বলিলেন, 'প্রভো, এই পুষ্করিণীর সমস্ত জলই যে শুকাইয়া গিয়াছে; এখন কর্দ্দমমাত্র রহিয়াছে।' শাস্তা বলিলেন, 'আনন্দ, বুদ্ধের অসীম বল; তুমি স্নানবস্ত্র আনয়ন কর না।' তখন আনন্দ গিয়া স্নানবস্ত্র আনিলেন; শাস্তা তাহার এক প্রান্তে কটি বেষ্টন করিলেন এবং অন্য প্রান্তে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সোপানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিব।'

সেই মুহূর্ত্তে শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষক মেঘরাজকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ, শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নানের অভিলাষে সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি শীঘ্র গিয়া সমগ্র কোশলরাজ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ কর। বর্ষক মেঘরাজ শক্রের আদেশে একখণ্ড মেঘঅন্তর্ব্বাস এবং অপর একখণ্ড মেঘবহির্ব্বাসরূপে পরিধানপূর্ব্বক মেঘগীতি গান করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বাকাশে খলমণ্ডলপ্রমাণ[১] হইয়া দেখা দিলেন, পরে শতগুণে, সহস্রগুণে বৃহদাকার ধারণ করিলেন; বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অধোমুখে স্থাপিত জলকুম্ভের ন্যায় এরূপ বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত কোশলরাজ্য প্লাবিত হইল। অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রচুর বর্ষণ হওয়াতে জেতবনস্থ পুষ্করিণী মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল; যতক্ষণ না সর্ব্বোচ্চ সোপান পর্যন্ত জল উঠিল, ততক্ষণ বৃষ্টির বিরাম হইল না।

পুষ্করিণী পূর্ণ হইলে শাস্তা তাহাতে অবগাহন করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি রক্তদ্বিপট্ট পরিধান করিলেন, কায়বন্ধ[২] ধারণ করিলেন এবং বুদ্ধোচিত মহাচীবর এমনভাবে বিন্যাস করিলেন যে, স্কন্ধের একাংশ অনাবৃত রহিল।

ভিক্ষুগণ-পরিবৃত শাস্তা এই বেশে বিহারে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিলে মণিসোপানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা বিদায় লইলেন, শাস্তা সুরভি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তার অলৌকিক ক্ষান্তি ও

---

[১]। খল—ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার।

[২]। কটিবন্ধ।

দয়াদাক্ষিণের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ, শস্য বিনষ্ট হইতেছিল, জলাশয়সমূহ বিশুষ্ক হইয়াছিল, মৎস্যকচ্ছপাদির দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না; কিন্তু শাস্তা করুণাবলে সকলের দুঃখমোচন করিলেন। তিনি স্নানবাস পরিধান করিয়া জেতবনস্থ পুষ্করিণীর উচ্চতম সোপানে দাঁড়াইলেন এবং নিমেষের মধ্যে আকাশ হইতে এমন বেগে বারিবর্ষণ হইল যে সমস্ত কোশলদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপ সর্ব্বজীবের কায়িক ও মানসিক দুঃখের অবসান করিয়া তিনি বিহারে প্রতিগমন করিলেন।'

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলেন এবং আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'তথাগত যে এই জন্মেই বারিবর্ষণ করাইয়া বহুপ্রাণীর ক্লেশমোচন করিলেন এমন নহে; অতীত জন্মে যখন তিনি ইতর যোনিতে মৎস্যরূপ জন্মলাভ করিয়াছিলেন; তখনও তিনি এবংবিধ বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

এই কোশলরাজ্যে এবং এই শ্রাবস্তীনগরে, যেখানে এখন জেতবন-সরোবর রহিয়াছে; সেইখানে লতাবিতান-পরিবৃত একটী সরোবর ছিল। বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সরোবরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও অনাবৃষ্টিবশত তড়াগাদি জলহীন হইয়াছিল, মৎস্যকচ্ছপগণ পঙ্কের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল; তখনও কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া পঙ্কমধ্যগত মৎস্যাদিকে তুণ্ড দ্বারা তুলিয়া উদরসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জ্ঞাতিবন্ধুগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অতএব আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক বারিবর্ষণ করাইব; তাহা হইলে ইহাদের দুঃখ মোচন হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল দেহ কজ্জললিপ্ত চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, 'পর্জ্জন্য! আমি জ্ঞাতিগণের দুর্দ্দশায় বড় ব্যথিত হইয়াছি। আমি শীলবান, অথচ জ্ঞাতিজনের দুর্দ্দশায় দুঃখিত, ইহা দেখিয়া তুমি যে বারিবর্ষণ করিতেছ না এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একে অপরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি কখনও তণ্ডুলপ্রমাণ মৎস্যও উদরস্থ করি নাই, অন্য কোন জীবেরও প্রাণহানি করি নাই। যদি আমার এই শপথ সত্য হয় তবে তুমি এখনই বারিবর্ষণ করিয়া আমার জ্ঞাতিগণকে বিপন্মুক্ত কর।' এইরূপে, প্রভু

যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ দেবরাজ পর্জ্জন্যকে আদেশ দিয়া আবৃত্তি করিলেন :

এস হে পর্জ্জন্য, কর গরজন, কাকের আশায় পড়ুক ছাই;
কর কর তুমি বারি বরষণ, বাঁচুক আমার জ্ঞাতিবন্ধু ভাই।

এইরূপ, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেইভাবে পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন। তখন প্রচুর বৃষ্টি হইল, বহুপ্রাণী মরণভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের জীবন শেষ হইল; তিনি কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সরোবরের মৎস্যকচ্ছপগণ, আনন্দ ছিল দেবরাজ পর্জ্জন্য এবং আমি ছিলাম মৎস্যরাজ।]

---

৭৬. অশঙ্ক্য-জাতক

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক কার্য্যবশত এক শকটসার্থবাহের সঙ্গে পথভ্রমণ করিতে করিতে একদা অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে লোকে বলীবর্দ্দগুলি খুলিয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল; শ্রাবকটী সার্থবাহের অবিদূরে একটী বৃক্ষতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশত দস্যু অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা এই স্কন্ধাবার লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে ধনু, মুদ্গর প্রভৃতি প্রহরণহস্তে ঐ স্থান পরিবেষ্টন করিল; কিন্তু শ্রাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াও পাদচারণ হইতে বিরত হইলেন না। দস্যুরা ভাবিয়াছিল তাহারা অতর্কিতভাবে স্কন্ধাবার আক্রমণ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে পাদচারণ করিতে দেখিয়া তাহারা সে আশা পরিত্যাগ করিল। তাহারা ভাবিল 'এ ব্যক্তি স্কন্ধাবারের প্রহরী; অতএব এ নিদ্রিত হইলে আক্রমণ করিতে হইবে।' তখন তাহারা যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে থাকিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উপাসক প্রথম প্রহরে, মধ্যম প্রহরে, শেষ প্রহরে, সমস্ত রাত্রিই পাদচারণ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, তথাপি দস্যুরা আক্রমণের সুযোগ পাইল না। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া প্রস্তর, মুদ্গরাদি ফেলিয়া পলায়ন করিল।

কিয়দ্দিন পরে এই উপাসক নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন এবং শাস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভগবন, লোকে আত্মরক্ষা করিবার সময়েও পরের রক্ষক হইতে পারে কি?' শাস্তা বলিলেন, 'পারে বৈ কি, উপাসক! মানুষ যখন নিজের রক্ষাবিধানে নিরত থাকে, তখনও সে অপরের রক্ষা করিতে সমর্থ; আবার অপরের রক্ষাদ্বারাও আত্মরক্ষা সম্পাদিত হইয়া থাকে।' 'আহা, প্রভু কি সুন্দর কথাই বলিলেন! আমি এক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন আত্মরক্ষার্থ বৃক্ষতলে পাদচারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; তাহার ফলে সমস্ত সার্থেরই রক্ষাবিধান হইয়াছিল।' শাস্তা বলিলেন 'অতীত কালেও লোকে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া পরের রক্ষা করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি দেখিতে পাইলেন কামনাই দুঃখের মূল; এই জন্য তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয় প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। কোন এক সময়ে লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ তিনি জনপদে অবতরণপূর্ব্বক জনৈক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা ঐ সার্থবাহ অনুচরগণসহ বনমধ্যে বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিলেন; বোধিসত্ত্ব অদূরে এক বৃক্ষতলে ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া পাদচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। সায়মাশের পর পঞ্চশত দস্যু লুণ্ঠনার্থ সেই স্কন্ধাবার বেষ্টন করিল; কিন্তু তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল 'এ ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিতে পাইলে সার্থবাসীদিগকে সংবাদ দিবে; অতএব এ নিদ্রিত হইলেই আক্রমণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তপস্বী কিন্তু রাত্রির মধ্যে একবারও পাদচরণে ক্ষান্ত হইলেন না, কাজেই দস্যুরা সুযোগ না পাইয়া মুদ্গরপাষাণাদি ফেলিয়া প্রস্থান করিল— চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, 'ওহে সার্থবাসীগণ, আজ যদি বৃক্ষমূলে ঐ তপস্বী পাদচারণ না করিতেন, তাহা হইলে তোমাদের সকলেই প্রাণক্ষয় হইত। অতএব কল্য তোমরা ইঁহাকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইবে।'

রজনী প্রভাত হইলে সার্থবাসীগণ দস্যুপরিত্যক্ত মুদ্গরপাষাণাদি দেখিয়া মহাভীত হইয়া এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক বলিল, 'প্রভো, আপনি কি দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম।' 'আপনি কি এত দস্যু দেখিয়াও ভীত ও সন্ত্রস্ত হন নাই?' 'না, আমি ভীত হই নাই। দস্যুদর্শনে ভয়নামক পদার্থের উৎপত্তি ধনবানদিগের পক্ষেই সম্ভবে। আমি নির্ধন, আমার ভয় হইবে কেন? গ্রামেই থাকি কিংবা অরণ্যেই থাকি আমার কখনও ভয়ের কারণ নাই।' অনন্তর

ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :

লভেছি নির্ব্বাণপথ মৈত্রী-করুণার বলে;
কি ভয় গ্রামেতে মোর, কি বা ভয় বনস্থলে?

বোধিসত্ত্ব এই গাথাদ্বারা সার্থবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইল এবং তাহারা তাঁহাকে পরমভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে ধ্যান করিয়া দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

* * *

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাসীগণ; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

---

৭৭. মহাস্বপ্ন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে, একদা কোশলরাজ সমস্ত রাত্রি নিদ্রাভোগ করিয়া শেষ প্রহরে ষোলটী মহাস্বপ্নদর্শনে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এরূপ দুঃস্বপ্নের না জানি কি কুফলই ঘটিবে এই ভাবিয়া তিনি মরণভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া শয্যার উপরই জড়সড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজের সুষুপ্তি হইয়াছিল ত?' রাজা কহিলেন—'আচার্য্যগণ, কিরূপে সুষুপ্তি ভোগ করিব বলুন? আমি অদ্য ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তদবধি নিতান্ত ভয়ব্যাকুল হইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া এই স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করুন।' ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিতে পাইলে আমরা তাহাদের ফল নির্ণয় করিয়া দিতেছি।'

রাজা একে একে স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি নিবেদন করিয়া তাহাদের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বপ্ন শুনিয়া হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিপ্রগণ! আপনারা হস্ত নিপীড়ন করিতেছেন কেন? তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ! এগুলি অতীত দুঃস্বপ্ন।' 'এরূপ দুঃস্বপ্নের ফল কি?' হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশ, এই তিনটীর একটী না একটী।' 'এ ফল প্রতিবিধেয়, না অপ্রতিবিধেয়?' 'এমন দুঃস্বপ্ন অপ্রতিবিধেয় হইবারই কথা; তথাপি আমরা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব; ইহার যদি প্রতিবিধান করিতে না

পারিলাম, তবে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের কি ফল?' 'আপনারা তবে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন অনুমতি করুন।' 'মহারাজ! আমরা চতুষ্ক যজ্ঞ করিব।' ভয়বিহ্বল রাজা নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, 'আচার্য্যগণ! দেখিবেন, আমার প্রাণ আপনাদের হাতে; আমি যাহাতে অচিরে নিরাময় হইতে পারি তাহার উপায় করুন।' রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, 'এই উপলক্ষ্যে আমরা বহু ধন ও চর্ব্ব্যচূষ্য প্রচুর খাদ্য লাভ করিব।' তাঁহারা 'কোন চিন্তা নাই, মহারাজ!' এই আশ্বাস দিয়া প্রাসাদ হইতে চলিয়া গেলেন; নগরের বহির্ভাগে যজ্ঞকুণ্ড খনন করিয়া সেখানে বহুসংখ্যক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চতুষ্পদ জন্তু এবং শত শত পক্ষী আনয়ন করাইলেন এবং তাহার পরেও ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী মল্লিকাদেবী ব্রাহ্মণদিগের গতিবিধি দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণেরা আজ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন কেন?'

রাজা কহিলেন, 'তুমি কি সুখেই আছ! কর্ণমূলে আশীবিষ বিচরণ করিতেছে, অথচ তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না।' 'মহারাজ! আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।' 'আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি,—ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন যে, তজ্জন্য হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশের আশঙ্কা আছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহারা উপকরণ সংগ্রহের জন্য বার বার যাতায়াত করিতেছেন।' 'যিনি নরলোকের ও দেবলোকের ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, তাঁহাকে স্বপ্নের প্রতিকারার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?' 'ভদ্রে! নরলোকে ও দেবলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য বলিয়া কাহাকে মনে করিয়াছ?' 'সে কি মহারাজ! যিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, আপনি কি সেই ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য মহাপুরুষকে জানেন না? সেই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান নিশ্চয় আপনার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিবেন। আপনি গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।' রাজা বলিলেন, 'দেবি! এ অতি উত্তম পরামর্শ' এবং তখনই বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহারাজ যে এত ভোরে আসিয়াছেন ইহার কারণ কি?' 'প্রভাত হইবার প্রাক্কালে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বপ্নগুলি নিতান্ত অমঙ্গলসূচক এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ-সঙ্গমে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহারা এখন যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন; তদুপলক্ষে বহু প্রাণী মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই জন্য আপনার শরণ লইলাম। আপনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

আপনার জ্ঞানগোচর। দয়া করিয়া আমার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়।' 'মহারাজ! ত্রিভুবনে আমি ব্যতীত আর কেহ যে এই সকল স্বপ্নের ধর্ম্ম বুঝিতে ও ফল বলিতে পারিবে না, ইহা সত্য। আমি আপনাকে সমগ্র বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি যে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যথাক্রমে বলুন।' 'যে আজ্ঞা, প্রভো' বলিয়া রাজা স্বপ্নসমূহের এই তালিকা[১] দিলেন :

'বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস, তুরগ, কাংস্যেও পাত্র[২], একে একে করি দরশন;
শৃগাল, লসী, পুনঃ পুষ্করণী শোভাময়ী, তার পর তণ্ডুল চন্দন;
অলাবু ডুবিল জলে,কিন্তু ভাসে শিলা তথা, ভেকে কণ্ডে কৃষ্ণসর্প গ্রাস;
সুবর্ণ-পালকে শোভে যত কাক-পরিজন, ছাগভয়ে বৃক পায় ত্রাস।"

● **প্রথম স্বপ্ন ও তাহার ফল :**

'প্রথম স্বপ্ন এইরূপ : বোধ হইল যেন চারিটা কজ্জলকৃষ্ণ বৃষ চারিদিক হইতে যুদ্ধার্থ রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; বৃষ-যুদ্ধ দেখিবে বলিয়া সেখানে বহুলোক সমবেত হইল; বৃষগণ যুদ্ধের ভাব দেখাইল বটে কিন্তু কেবল নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শেষে যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া গেল। এই আমার প্রথম স্বপ্ন। বলুন ত, প্রভু, এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম এবং ইহার ফলই বা কি।'

শাস্তা কহিলেন, 'মহারাজ, এই স্বপ্নের ফল আপনার বা আমার জীবদ্দশায় ফলিবে না, কিন্তু অতঃপর দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক ও কৃপণস্বভাব হইবেন, মনুষ্য অসৎপথে বিচরণ করিবে, জগতের অধোগতি হইতে থাকিবে; তখন কুশলের ক্ষয়, অকুশলের উপচয় ঘটিবে। জগতের সেই অধঃপতন-সময়ে আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ হইবে না, মেঘের পা খঞ্জ হইয়া যাইবে, শস্য শুষ্ক হইবে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিবে। তখন চারিদিক হইতে মেঘ উঠিবে বটে, লোকে মনে করিবে কতই যেন বৃষ্টি হইবে; গৃহিণীগণ যে ধান্যাদি রৌদ্রে দিয়াছেন তাহা আর্দ্র হইবে আশঙ্কায় গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন; পুরুষেরা কোদাল ও ঝুড়ি হাতে লইয়া আলি বান্ধিবার জন্য বাহির হইবে; কিন্তু সে মেঘ বর্ষণের ভাবমাত্র দেখাইবে; তাহাতে গর্জ্জন হইবে, বিদ্যুৎ খেলিবে; কিন্তু আপনার স্বপ্নদৃষ্ট বৃষগণ যেমন যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, উহাও সেইরূপ বর্ষণ না করিয়া পলাইয়া যাইবে। আপনার স্বপ্নের এই ফল জানিবেন; কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই; ইহা সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল নিজেদের উপজীবিকার অনুরোধেই আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।' এইরূপে প্রথম স্বপ্নের নিষ্পত্তি করিয়া শাস্তা

---

[১]। মূলে 'মাতিকা' (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।

[২]। এখানে কাংস্যপাত্রের উল্লেখ থাকিলেও স্বপ্ন-বিবরণে স্বর্ণপাত্র দেখা যায়।

জিজ্ঞাসিলেন, 'বলুন মহারাজ, আপনার দ্বিতীয় স্বপ্ন কি?'

● দ্বিতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল :

রাজা কহিলেন, 'ভগবন, আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বোধ হইল পৃথিবী ভেদ করিয়া শত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্ম উত্থিত হইল এবং কোন কোনটী বিতস্তি প্রমাণ, কোন কোনটী বা হস্তপ্রমাণ হইয়াই পুষ্পিত ও ফলিত হইল! এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।'

শাস্তা কহিলেন, 'মহারাজ, যখন জগতের অবনতির সময়ে মনুষ্যেরা স্বল্পায়ু হইবে, তখনই এ স্বপ্নের ফল দেখা যাইবে। সেই অনাগতকালে প্রাণিগণ তীব্র রিপুপরবশ হইবে, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাগণ পুরুষ-সংসর্গে ঋতুমতী পূর্ণবয়স্কাদিগের ন্যায় গর্ভধারণপূর্ব্বক পুত্রকন্যা প্রসব করিবে। আপনি যে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মাদির পুষ্প দেখিয়াছেন তাহা অকালজাত-রজস্বলা-ভাবসূচক এবং যে ফল দেখিয়াছেন তাহা বালদম্পতীজাত-পুত্রকন্যা-সূচক। কিন্তু মহারাজ, স্বপ্নের এ ফলে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না। এখন বলুন, আপনার তৃতীয় স্বপ্ন কি?'

● তৃতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল :

রাজা কহিলেন, 'আমি দেখিলাম ধেনুগণ সদ্যোজাত বৎসগণের ক্ষীর পান করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?'

'ইহারও ফল অনাগতকালগর্ভে; তখন মনুষ্যেরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিরত হইবে। মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবে, বৃদ্ধদিগকে ইচ্ছা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, ইচ্ছা না হইলে দিবে না। তখন অনাথ ও অসহায় বৃদ্ধগণ সদ্যোজাত বৎসক্ষীরপায়িনী ধেনুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব সন্তানসন্ততির অনুগ্রহান্নভোজী হইবে। তবে ইহাতে আপনার ভীত হইবার কি আছে? আপনার চতুর্থ স্বপ্ন কি বলুন।'

● চতুর্থ স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম লোকে ভার-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগকে খুলিয়া দিয়া তাহাদের স্থানে তরুণ বলীবর্দ্দ যুগবদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পাদমাত্রও চলিল না, এক স্থানেই স্থির হইয়া রহিল, কাজেই শকটগুলি যেখানে ছিল, সেখানে পড়িয়া থাকিল। এ স্বপ্নের কি ফল, প্রভো?'

'ইহারও ফল অনাগতকালে দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রবীণ, সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল এবং রাজ্যপরিচালনক্ষম মহামাত্যদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না। ধর্ম্মাধিকরণে এবং মন্ত্রভবনেও বিচক্ষণ, ব্যবহারজ্ঞ

বয়োবৃদ্ধদিগকে নিযুক্ত করিবেন না; পক্ষান্তরে ইঁহাদের বিপরীতলক্ষণযুক্ত তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই আদর বৃদ্ধি হইবে; এইরূপ অর্ব্বাচীনেরাই ধর্ম্মাধিকরণে উচ্চাসন পাইবে, কিন্তু বহুদর্শিতার অভাবে এবং রাজকর্ম্মে অনভিজ্ঞতাবশত তাহারা পদগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না, রাজকর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারিবে না; তাহারা কর্ম্মভার পরিহার করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ মহামাত্যগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যনির্ব্বাহসমর্থ হইলেও পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া রাজার সাহায্যে পরান্মুখ হইবেন; তাঁহারা ভাবিবেন, আমাদের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমরা ত এখন বাহিরের লোক; ছেলে ছোকরারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহারাই জানে।' এইরূপে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট ঘটিবে। ধুর-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধ হইতে যুগ অপসারিত করিয়া ধুরবহনে অসমর্থ তরুণ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধে স্থাপিত করাতে যাহা হয়, তখনও তাহাই হইবে—রাজ্যরূপ শকট অচল হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনার পঞ্চম স্বপ্ন বলুন।'

● পঞ্চম স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম, একটা অশ্বের দুই দিকে দুই মুখ; লোকে দুই মুখেই ঘাস ও দানা দিতেছে এবং অশ্ব দুই মুখেই তাহা আহার করিতেছে। এই আমার পঞ্চম স্বপ্ন। ইহার ফল কি বলুন।'

'ইহারও ফল অনাগতকালে, অধার্ম্মিক রাজাদিগের রাজ্যে সংঘটিত হইবে। তখন অবোধ ও অধার্ম্মিক রাজাগণ অধার্ম্মিক ও লোভী ব্যক্তিদিগকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অশ্ব যেমন উভয় মুখদ্বারাই আহার গ্রহণ করিয়াছে, পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য মূর্খ বিচারকগণ ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া বিচার করিবার সময় সেইরূপে অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের হস্ত হইতেই উৎকোচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয়হেতু দেখা যায় না। আপনার ষষ্ঠ স্বপ্ন কি বলুন।'

● ষষ্ঠ স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম লোকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটা সুমার্জ্জিত সুবর্ণ পাত্র লইয়া একটি বৃদ্ধ শৃগালকে তাহাতে মূত্র ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল এবং শৃগাল তাহাই করিল। এ স্বপ্নের কি ফল বলুন।'

'ইহারও ফল বহুকাল পরে ফলিবে। তখন রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন; অভিজাতদিগকে অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের প্রতি অসম্মান দেখাইবেন; এবং অকুলীনদিগকে উচ্চপদ দিবেন। এইরূপে সদ্‌বংশীয়দিগের দুর্গতি এবং নীচকুলোদ্ভদিগের উন্নতি হইবে। কুলীনেরা তখন

জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ন্তর না দেখিয়া অকুলীনদিগের আশ্রয় লইবেন এবং তাহাদিগকে কন্যাদান করিবেন। বৃদ্ধ শৃগালের মূত্র-স্পর্শে সুবর্ণ পাত্রের অপবিত্রীভাবও যে কথা, অকুলীনের সংসর্গে কুলকন্যার বাসও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার সপ্তম স্বপ্ন বলুন।'

● সপ্তম স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম এক ব্যক্তি চৌকীর উপর বসিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিতেছে এবং যতটুকু পাকান হইতেছে তাহা নীচে ছাড়িয়া দিতেছে; চৌকীর তলদেশে এক ক্ষুধার্ত্তা শৃগালী বসিয়া ঐ রজ্জু খাইতেছে; লোকটা তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছে না। এই আমার সপ্তম স্বপ্ন; ইহার কি ফল বলুন।'

'ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। তখন রমণীগণ পুরুষ-লোলুপ, সুরা-লোলুপ, অলঙ্কার-লোলুপ, পরিভ্রমণ-লোলুপ এবং প্রমোদপরায়ণা হইবে; পুরুষেরা কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অতিকষ্টে যে ধন উপার্জ্জন করিবে, এই দুঃশীলা ও দুশ্চরিত্রা রমণীরা তাহা জারের সহিত সুরাপানে এবং মাল্যগন্ধানুলেপ-সংগ্রহে উড়াইয়া দিবে; গৃহে নিতান্ত অনটন হইলেও তাহারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না; বহিঃপ্রাচীরের উপরিভাগে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়াও তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া নিয়ত জারাগমন প্রতীক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে; পরদিন যে বীজশস্য বপন করিতে হইবে তাহা পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া অন্ন ও কাঞ্জিক প্রস্তুত করিবে। ফলত শৃগালী যেমন চৌকীর তলে বসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির অগোচরে তাহার প্রস্তুত রজ্জু উদরসাৎ করিতেছিল, এই সকল স্ত্রীও সেইরূপ ভর্ত্তাদিগের অগোচরে তাহাদের বহুকষ্ট-লব্ধ ধনের অপচয় করিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আপনার অষ্টম স্বপ্ন বলুন।'

● অষ্টম স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম রাজদ্বারে একটী বৃহৎ পূর্ণ কলসের চারিদিকে অনেকগুলি শূন্য কলস সজ্জিত রহিয়াছে; চারিদিক্ এবং চারি অনুদিক হইতে চতুর্ব্বর্ণের জনস্রোত ঘটে ঘটে জল আনিয়া সেই পূর্ণ কলসে ঢালিতেছে; উপশ্রুত জল স্রোতের আকারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহারা পুনঃপুন ঐ কলসীতেই জল ঢালিতেছে, ভ্রমেও একবার শূন্য কলসীগুলির দিকে তাকাইতেছে না। বলুন, প্রভো, এ স্বপ্নের কি ফল।'

'এ স্বপ্নের ফলও বহুদিন পরে দেখা যাইবে। তখন পৃথিবীর বিনাশকাল আসন্ন হইবে, রাজারা দুর্গত ও কৃপণ হইবেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, তাঁহাদেরও ভাণ্ডারে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত

থাকিবে না। এই অভাবগ্রস্ত নৃপতিগণ জনপদবাসীদিগকে আপনাদের বপনকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন; উপদ্রুত প্রজারা নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া রাজাদেরই কাজ করিবে; তাঁহাদের জন্য ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্‌গমাষাদি বপন করিবে, তৎসমস্ত রক্ষা করিবে, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া আনিবে, মর্দ্দন করিবে, এবং রাজভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিবে। তাহারা ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, যন্ত্র প্রস্তুত করিবে ও চালাইবে, রস পাক করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবে; তাহারা পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান রচনা করিবে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা তাহারা রাজাদিগের কোষ্ঠাগারই পুনঃপুন পূর্ণ করিবে; কিন্তু নিজেদের কোষ্ঠাগারগুলি যে শূন্য রহিয়াছে সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না—শূন্য কুম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ণকুম্ভেই পুনঃ পুনঃ জল ঢালিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার নবম স্বপ্ন বলুন।'

● নবম স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম একটী পঞ্চবিধ পদ্মসম্পন্ন গভীর পুষ্করিণীর চারিধারেই স্নানের ঘাট; তাহাতে জলপান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ অবতরণ করিতেছে, কিন্তু এই পুষ্করিণীর জল সুগভীর মধ্যভাগে পঙ্কিল, অথচ তীরসমীপে দ্বিপদ, চতুষ্পদাদির অবতরণ-স্থানে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এ স্বপ্নের পরিণাম কি?"

'ইহারও পরিণাম সুদূর ভবিষ্যদ্‌গর্ভে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইবেন; যথেচ্ছভাবে অন্যায়রূপে রাজ্যশাসন করিবেন; বিচার করিবার সময় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবেন না। তাঁহারা অর্থলালসায় উৎকোচ গ্রহণ করিবেন, প্রজাদিগের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি ও প্রীতি প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন; লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ফেলিয়া ইক্ষু নিষ্পেষণ করে, তাঁহারও সেইরূপ অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণভাবে প্রজাদিগের পীড়নপূর্ব্বক নানা প্রকার কর গ্রহণ করিয়া ধনসংগ্রহ করিবেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাগণ অবশেষে করদানে অসমর্থ হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় লইবে। এইরূপে রাজ্যের মধ্যম জনপদসমূহ জনশূন্য এবং প্রত্যন্ত ভাগ বহুজন-সমৃদ্ধ হইবে, অর্থাৎ রাজরূপ পুষ্করিণীর মধ্যভাগ আবিল এবং তীরসন্নিহিত ভাগ অনাবিল হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দশম স্বপ্ন কি বলুন।'

● দশম স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম একটী পাত্রে তণ্ডুল পাক হইতেছে; কিন্তু তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। সুসিদ্ধ হইতেছে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তণ্ডুলগুলি যে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিয়া যাইতেছে—একই পাত্রে একসঙ্গে তিন প্রকার পাক

হইতেছে—কতকগুলি তণ্ডুল গলিয়া গিয়াছে, কতকগুলি তণ্ডুলই রহিয়াছে, কতকগুলি সুপক্ক রহিয়াছে। এ স্বপ্নের ফল বলিতে আজ্ঞা হয়।'

'ইহারও ফল বহুকাল পরে ভবিতব্য। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিকগণ, এবং ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, পৌর ও জানপদবর্গও অধার্ম্মিক হইবে। ফলত তখন সকল মনুষ্যই অধার্ম্মিক হইবে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে চলিবে না। তদনন্তর তাহাদের বলিপ্রতিগ্রাহী বৃক্ষদেবতা, আকাশ-দেবতা প্রভৃতি উপাস্য দেবদেবীগণ পর্য্যন্ত অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিবেন। অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বায়ু খর ও বিষম বেগে প্রবাহিত হইবে এবং আকাশস্থ বিমানকে কম্পিত করিবে; বিমান-প্রকম্পন হেতু দেবতারা কুপিত হইয়া বারিবর্ষণে বাধা দিবেন, বর্ষণ হইলেও সমস্ত রাজ্যে এক সময়ে হইবে না, তদ্দারা ক্ষেত্র-কর্ষণ ও বীজবপনেরও সুবিধা ঘটিবে না। রাজ্যের ন্যায় নগরের ও জনপদের সর্ব্বত্র এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইবে না; তড়াগাদির উপরিভাগে বৃষ্টি হইবে ত নিম্নভাগে হইবে না, নিম্নভাগে বৃষ্টি হইবে ত উপরিভাগে হইবে না। রাজ্যের এক অংশে অতিবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যহানি হইবে, অংশান্তরে অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া যাইবে; ক্কচিৎ ক্কচিৎ বা সুবৃষ্টিবশত শস্যোৎপত্তি হইবে। এইরূপ একই রাজ্যের উপ্ত শস্য একপাত্রে পচ্যমান স্বপ্নদৃষ্ট তণ্ডুলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন শঙ্কার কারণ নাই। আপনার একাদশ স্বপ্ন কি বলুন।'

● **একাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল :**

'দেখিলাম পূতি-তক্রের[১] বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দন বিক্রীত হইতেছে। ইহার কি ফল বলুন।'

'যখন সৎপ্রতিষ্ঠিত শাসনের অবনতি ঘটিবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল পরিদৃষ্ট হইবে। তখন ভিক্ষুগণ নির্লজ্জ ও লোভপরায়ণ হইবে; আমি লোভের নিন্দা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহারা চীবরাদি পাইবার লোভে লোকের নিকট সেই সকল কথাই বলিবে; তাহারা লোভবশে বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবে; কাজেই মনুষ্যদিগকে নির্ব্বাণাভিমুখে লইতে পারিবে না। কিরূপে মধুরস্বরে ও মিষ্টবাক্যে লোকের নিকট হইতে চীবরাদি লাভ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল দান করিবার জন্য লোকের মতি উৎপাদন করিতে পারা যায়, ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় তাহারা কেবল ইহাই চিন্তা করিবে। অনেকে হাটে, বাজারে ও রাজদ্বারে বসিয়া কার্যাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ প্রভৃতি মুদ্রাপ্রাপ্তির অশাতেও ধর্ম্মকথা শুনাইতে

---

[১]। পচা ঘোল।

কুণ্ঠিত হইবে না। ফলত যে ধর্ম্মের মূল্য নির্ব্বাণরূপ মহারত্ন, এই সকল ব্যক্তি তাহা চীবরাদি উপকরণ, কিংবা কার্ষাপণাদি মুদ্রারূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে—পূতি-তক্রের বিনময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করিবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন।'

● দ্বাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম যেন একটী শূন্যগর্ভ অলাবুপাত্র জলে ডুবিয়া গেল। ইহার ফল কি হইবে, প্রভো?'

'ইহারও ফল বহুকাল পরে দেখা দিবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, পৃথিবী বিপথে চলিবে। তখন রাজারা সদ্‌বংশজাত কুলপুত্রদিগের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন এবং অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন। অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে; কুলীনেরা দরিদ্র হইবেন। রাজসম্মুখে, রাজদ্বারে, মন্ত্রভবনে ও বিচারস্থানে সর্ব্বত্রই অলাবু-পাত্র-সদৃশ অকুলীনদিগের কথা প্রবল হইবে—যেন তাহারাই কেবল সর্ব্ববিষয়ে তলস্পর্শী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে! ভিক্ষুসঙ্ঘেও পাত্র, চীবর, বাসস্থানাদির সম্বন্ধে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে দুঃশীল ও পাপিষ্ঠ ভিক্ষুদিগের বাক্যই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষুদিগের কথায় কর্ণপাত করিবে না। ফলত সমস্ত বিষয়েই অলাবু-পাত্রসদৃশ অন্তঃসারহীন ব্যক্তিদিগের সারবত্তা প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। আপনি ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বলুন।'

● ত্রয়োদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল :

'দেখিলাম, গৃহপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডসমূহ নৌকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার ফল কি বলুন।'

'ইহারও ফল পূর্ব্বোক্ত সময়ে দেখা যাইবে। তখন অধার্ম্মিক নৃপতিগণ অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন, অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে, কুলীনদিগের দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। তখন লোকে কুলীনদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, অকুলীনদিগের সম্মান করিবে। রাজসম্মুখে, মন্ত্রভবনে, বিচারস্থানে, কুত্রাপি শিলাখণ্ডসদৃশ সারবান, বিচারকুশল কুলপুত্রদিগের কথা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না; তাহা বৃথা ভাসিয়া যাইবে; তাহারা কোন কথা বলিতে চাহিলে অকুলীনেরা পরিহাস-সহকারে বলিবে, 'এরা আবার কি বলে?' ভিক্ষু সঙ্ঘেও এইরূপে শ্রদ্ধার্হ ভিক্ষুর কথার আদর থাকিবে না; উহা কাহারও হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করিবে না; আবর্জ্জনার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার চতুর্দ্দশ স্বপ্ন বলুন।'

● **চতুর্দ্দশ স্বপ্ন ও তাহার ফল :**

দেখিলাম মধুকপুষ্প-প্রমাণ[১] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডুকেরা মহাবেগে একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্পের অনুধাবন করিয়া তাহাকে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিল। এ স্বপ্নের কি ফল হইবে বলুন।'

'ইহার ফল বহুকাল পরে ঘটিবে। তখন লোকক্ষয় আরব্ধ হইবে; লোকে প্রবল রিপুর তাড়নায় তরুণী ভার্য্যাদিগের বশীভূত হইয়া পড়িবে, গৃহের ভৃত্য ও দাসদাসী, গোমহিষাদি প্রাণী এবং সুবর্ণরজতাদি ধন, সমস্তই এই সকল রমণীদিগের আয়ত্ত হইবে; স্বামীরা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'অমুক পরিচ্ছদ বা অমুক স্বর্ণ রৌপ্য কোথায় আছে', তখন তাহারা উত্তর দিবে 'যেখানে খুশি সেখানে থাকুক; তোমরা তোমাদের আপন কাজ কর; আমাদের ঘরে কি আছে না আছে, তাহা তোমরা জানিতে চাও কেন?' ফলত রমণীগণ নানা প্রকারে ভর্ত্তাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, বাক্যবাণে জর্জরিত করিবে এবং ক্রীতদাসের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবে। এরূপ হওয়াও যে কথা, মধুকপুষ্পপ্রমাণ-মণ্ডুককর্ত্তৃক কৃষ্ণসর্পভক্ষণও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার পঞ্চদশ স্বপ্ন কি বলুন।'

● **পঞ্চদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল :**

'দেখিলাম দশবিধ অসদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট[২] এক গ্রাম্য কাক কাঞ্চনবর্ণপক্ষযুক্ত সুবর্ণ রাজহংসপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে। ইহার ফল কি হইবে?'

'ইহারও ফল বহুদিন পরে হইবে। তখন রাজারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, এবং গজশাস্ত্রাদিতে ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইবেন। তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় স্বজাতীয় কুলপুত্রদিগের হস্ত কোনরূপ প্রভুত্ব রাখিবেন না; পরন্তু নীচ জাতীয় দাস, নাপিত প্রভৃতিকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে জাতিগোত্রসম্পন্ন কুলপুত্রগণ রাজপ্রাসাদে বঞ্চিত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কাক-পরিচর্য্যা-নিরত সুবর্ণ রাজহংসদিগের ন্যায় জাতিগোত্রহীন অকুলীনদিগের উপাসনা করিবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার ষোড়শ স্বপ্ন কি বলুন।'

● **ষোড়শ স্বপ্ন ও তাহার ফল :**

'এতকাল দেখিয়াছি বৃকেরাই ছাগ বধ করিয়া আহার করিয়াছে; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম ছাগে বৃকদিগের অনুধাবন করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া মুর্মুর

---

[১]। মহুয়ার ফুল। 'মধুক' শব্দে অশোকও বুঝায়। কিন্তু এখানে সে অর্থ ধরা যাইবে না।

[২]। নির্লজ্জতা প্রভৃতি দোষ। সচরাচর সাতটী অসদ্ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়। অথবা ইহাতে দশ অকুশল কর্ম্মও বুঝাইতে পারে (২৪২ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

করিয়া খাইতেছে। বৃকগণ দূর হইতে ছাগ দেখিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং গুল্মগহনে আশ্রয় লইতেছে। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।'

'ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে দেখা যাইবে। তখন অকুলীনগণ রাজানুগ্রহ প্রভুত্বভোগ করিবে এবং কুলীনেরা অবজ্ঞাত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। রাজার প্রিয়পাত্রগণ ধর্ম্মাধিকরণেও ক্ষমতাশালী হইবে, এবং প্রাচীন কুলীনদিগের ভূমি ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। কুলীনেরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে বেত্রদ্বারা প্রহার করিবে এবং গ্রীবা ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া বলিবে, 'তোমরা নিজেদের পরিমাণ বুঝনা যে আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ! রাজাকে বলিয়া তোমাদের হস্তপদাদি ছেদন করাইয়া দুর্দ্দশার চূড়ান্ত ঘটাইব।' ইহাতে ভয় পাইয়া কুলীনগণ বলিবেন, 'এ সকল দ্রব্য আমাদের নহে, আপনাদের; আপনারাই এ সমস্ত গ্রহণ করুন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিবেন। ভিক্ষুসমাজেও এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে; ক্রুরমতি ভিক্ষুগণ-ধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগকে যথারুচি উপদ্রুত করিবে; ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অশরণ হইয়া বনে পলায়ন করিবেন। ফলত স্বপ্নদৃষ্ট-ছাগভয়ে বৃকগণ যেমন পলায়ন করিয়াছে, সেইরূপ অভিজাতগণ নীচবংশীয় লোকের ভয়ে এবং ধার্মিক ভিক্ষুগণ অধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগের ভয়ে পলায়নপর হইবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; কারণ এ স্বপ্নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ। ব্রাহ্মণেরা যে বহু বিপত্তি ঘটিবে বলিয়া আপনাকে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, আপনার প্রতি স্নেহসম্ভুতও নহে; অত্যন্ত অর্থলালসাবশতঃই তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন।'

শাস্তা উক্তরূপে ষোড়শ মহাস্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনিই যে প্রথম এই সকল স্বপ্ন দেখিলেন তাহা নহে, অতীত কালের রাজারাও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তখনও ব্রাহ্মণেরা তদুপলক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ছল পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের পরামর্শে রাজারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন এবং আমি যেমন ব্যাখ্যা করিলাম, বোধিসত্ত্বও তখন সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।' অনন্তর শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং হিমালয়ে অবস্থান করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

আপনি যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছেন, রাজা ব্রহ্মদত্তও একদিন সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়নার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন তরুণবয়স্ক মেধাবী অন্তেবাসিক ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিয়াছেন। একের প্রাণসংহার দ্বারা অপরের মঙ্গল সম্পাদন অসম্ভব, বেদে এই মর্ম্মের একটী বচন আছে বলিয়া মনে হয় না কি?' আচার্য্য বলিলেন, 'বৎস, এই উপায়ে আমাদের বহু ধনপ্রাপ্তি ঘটিবে। তুমি দেখিতেছি রাজার ধন রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ!' অন্তেবাসিক বলিলেন, 'আচার্য্য, আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন; আমার এখানে থাকিয়া ফল কি?' এই বলিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন বোধিসত্ত্ব ধ্যানযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমি অদ্য লোকালয়ে গেলে অনেককে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিব।' অনন্তর তিনি আকাশপথে বিচরণ করিয়া রাজ্যোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন—সেখানে তাঁহার দেহ হিরণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অন্তেবাসিক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে বিশ্রদ্ধভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে মধুরালাপ আরম্ভ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা যধাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতেছেন কি?' অন্তেবাসিক উত্তর দিলেন, 'রাজা নিজে ধার্ম্মিক; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি ষোলটী স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা এই সুযোগে যজ্ঞের ঘটা আরম্ভ করিয়াছেন। আপনি যদি দয়া করিয়া রাজাকে প্রকৃত স্বপ্নফল বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে বহু প্রাণীর ভয় বিমোচন হইতে পারে।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন 'তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি রাজাকে চিনি না, রাজাও আমাকে চিনেন না। তবে রাজা যদি এখানে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে পারি।' অন্তেবাসিক বলিলেন, 'আমি এখনই গিয়া রাজাকে আনয়ন করিতেছি; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।' বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে অন্তেবাসিক রাজসমীপে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এক ব্যোমচারী তপস্বী আসিয়া উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে সম্মত হইয়া আপনাকে সেখানে যাইতে বলিয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বহু অনুচরের সহিত সেই উদ্যানে গিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, আপনি আমার স্বপ্নফল বলিতে পারিবেন এ কথা সত্য কি?' 'পারিব

বৈকি, মহারাজ! আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলুন।' রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বপ্ন বর্ণন আরম্ভ করিলেন :

বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস ... ইত্যাদি।

'ফলত আপনি এখন যে পর্য্যায়ে স্বপ্নগুলি বলিলেন, ব্রহ্মদত্তও ঠিক সেই পর্য্যায়ে বলিয়াছিলেন।'

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কোন স্বপ্ন হইতেই আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নাই।' এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া সেই মহাপুরুষ পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে আসীন হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তিনি উপসংহার কালে বলিলেন, 'মহারাজ, অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিয়া কখনও পশু ঘাতকর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।' ইহার পর বোধিসত্ত্ব আকাশপথেই নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তদীয় উপদেশানুসারে চলিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ যথাকালে দেহত্যাগ করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'কোশলরাজ, আপনার কোন ভয় নাই।' অনন্তর শাস্তার আদেশে যজ্ঞ বন্ধ এবং পশুপক্ষিগণ বন্ধনবিমুক্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত, সারীপুত্র ছিল সেই অন্তেবাসিক এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

---

৭৮. ইল্লীস-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কৃপণ শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় রাজগৃহের নিকট শর্করানিগম নামে একটী নগর ছিল। সেখানে অশীতিকোটি সুবর্ণের অধিপতি মৎসরী কৌশিক নামে এক অতি কৃপণ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও তৈলবিন্দু দান করিতেন না; নিজেও কিছু ভোগ করিতেন না। কাজেই বিপুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা কিংবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কাহারও কোন উপকার হইত না; উহা রাক্ষসপরিগৃহীত পুষ্করিণীবৎ সকলেরই অস্পৃশ্য ছিল।

একদিন প্রত্যুষে শাস্তা শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, ত্রিভুবনে কে কোথায় বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে মহাকরুণাপরবশ হইয়া তাহা অবলোকন করিতে করিতে জানতে পারিলেন, পঞ্চচত্বারিংশদ্ যোজন দূরস্থ সস্ত্রীক মৎসরী

কৌশিকের স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিন ঐ শ্রেষ্ঠী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক ক্ষুধার্ত্ত জনপদবাসী কাঞ্জিকসিক্ত পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়েও ঐরূপ পিষ্টক খাইবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি পিষ্টক খাইব বলি, তাহা হইলে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই খাইতে চাহিবে এবং অনেক তণ্ডুল, ঘৃত ও গুড় নষ্ট করিতে হইবে। অতএব মনের ইচ্ছা মনেই লয় করিতে হইল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ইচ্ছা নিরুদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর ততই পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, এবং শীর্ণদেহের উপর ধমনিগুলি রজ্জুর ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি শয়নকক্ষে গিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তখনও ভাণ্ডারের অপচয়ভয়ে তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তাঁহার ভার্য্যা আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আপনার কোন অসুখ করিয়াছে কি?'

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'না, আমার কোন অসুখ করে নাই।' 'তবে রাজা কুপিত হইয়াছেন কি?' 'না, রাজা কুপিত হইবেন কেন?' 'ছেলেরা বা চাকর চাকরাণীরা কি আপনার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে?' 'তাহাও কেহ করে নাই।' 'তবে আপনার কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কি?' এ প্রশ্নে কিন্তু শ্রেষ্ঠী নিরুত্তর রহিলেন, কারণ মনের কথা প্রকাশ করিলেই ধনহানি হইবার সম্ভাবনা। গৃহিণী বুঝিলেন, 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্;' কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন না, আর্য্যপুত্র, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে?' শ্রেষ্ঠী গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন, 'একটা জিনিস খাইতে ইচ্ছা হয় বটে।' 'কোন জিনিষ, আর্য্যপুত্র?' 'ইচ্ছা হয় আমানিতে ভিজান পিঠে খাই।'

'এতক্ষণ এ কথা বলেন নাই কেন? আপনার অভাব কি? আমি আমানিতে ভিজান এত পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি যাহা ঐ শর্করানিগমের সমস্ত লোকেও খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না।'

'নগরের লোককে দিয়া কি হইবে? তাহারা যে যাহা পারে নিজেরা খাটিয়া খাইবে।' 'তাহা না হয়, আমাদের এই গলিতে যে সকল লোক আছে তাহাদের জন্যই তৈয়ার করিব।' 'তোমার ভাণ্ডারে ধন রাখিবার স্থান নাই?' 'আচ্ছা, আমাদের বাড়ীর লোকজদিগের জন্যই আয়োজন করিব।' 'তুমিত দেখিতেছি কল্পতরু হইয়া বসিয়াছ!' 'তবে কেবল ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি,' 'ছেলেদিগকে এর মধ্যে টানিয়া আন কেন?' 'তাহাতেও যদি আপত্তি হয় তবে,

কেবল আমাদের স্বামীস্ত্রীর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাউক।' 'তুমি বুঝি ভাগ না লইয়া ছাড়িবে না?' 'বেশ; আমিও চাই না। কেবল আপনার জন্যই আয়োজন করিতেছি।' 'এখানে পিঠা তৈয়ার করিলে বহুলোকে দেখিতে পাইবে। তুমি কিছু ক্ষুদ চাহিয়া লও, তাহার সঙ্গে যেন একটীও গোটা চাউল না থাকে; তাহার পর উনন, কড়া ও একটু একটু দুধ, ঘি, মধু ও গুড় লইয়া সাততলায় গিয়া পিঠা রান্ধ; আমি সেখানে বিরলে বসিয়া আহার করিব।'

শ্রেষ্ঠীগৃহিণী 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া নিজেই সমস্ত উপকরণ বহন করিয়া সপ্তমতলে আরোহণ করিলেন এবং দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলেন। শ্রেষ্ঠী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় প্রত্যেক তলের দ্বারগুলি অর্গলরুদ্ধ করিয়া গেলেন এবং সপ্তমতলে উঠিয়া সেখানকারও দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি উপবেশন করিলেন, গৃহিণী উনন জ্বালিলেন, কড়া চাপাইয়া দিলেন এবং পিষ্টক পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রত্যুষে শাস্তা স্থবির মৌদ্গল্যায়কে বলিলেন, 'রাজগৃহের অনতিদূরবর্ত্তী শর্করা-নিগমবাসী মৎসরী শ্রেষ্ঠী একাকী পিষ্টক ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে, পাছে অন্য কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায়, সপ্তমতলে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি সেখানে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে আত্মসংযম শিক্ষা দাও এবং স্বীয় বিভূতিবলে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, পিষ্টক প্রভৃতি সহ স্ত্রীপুরুষ উভয়কে জেতবনে আনয়ন কর। আমি আজ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারেই অবস্থিতি করিব এবং ঐ পিষ্টক দ্বারা সকলকেই ভোজন করাইব।'

স্থবির মৌদ্গল্যায়ন আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর্করনিগমে শ্রেষ্ঠীভবনে উপনীত হইলেন এবং সুবিন্যাস্ত অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসে পরিশোভিত হইয়া সপ্তমতলে বাতায়নসমীপে মণিময় মূর্ত্তির ন্যায় আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে অকস্মাৎ এইভাবে আবির্ভূত দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর হৃৎকম্প হইল। তিনি ভাবিলেন, 'লোকের ভয়ে সাততলায় উঠিয়া আসিলাম; কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই, শ্রমণটা আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।' শ্রেষ্ঠীকে সেই দিনই যাহা বুঝিতে হইবে, তিনি তখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কাজেই তিনি তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া[১] বলিলেন, 'কিহে শ্রমণ, আকাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি লাভ হইবে বল। দাঁড়ান দূরে থাকুক বার বার পায়চারি করিয়া পথহীন আকাশে পথ প্রস্তুত করিলেও এখানে ভিক্ষা মিলিবে না।'

এই কথা শুনিবামাত্র স্থবির আকাশেই ইতস্তত পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, 'পাদচারণ করিয়া কি লাভ, পদ্মাসনে বসিয়া থাকিলেও কিছু

---

[১]। মূলে আছে 'লবণ কিংবা শর্করা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যেমন চিট্মিট্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে সেইভাবে।'

পাইবে না।' স্থবির তৎক্ষণাঃ আকাশে পদ্মাসনেই সমাসীন হইলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, 'ওখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? বাতায়নের দেহলীতে আসিয়া দাঁড়াইলেও কোন ফল নাই।' স্থবির তখন দেহলীর উপরেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠী আবার কহিলেন, 'দেহলীতে দাঁড়াইলে কি হবে বল? মুখ হইতে ধূম উদ্‌গিরণ করিলেও ভিক্ষা পাইতেছ না।' স্থবির ধূমই উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিলেন, সমস্ত প্রাসাদ ধূমপূর্ণ হইলে, শ্রেষ্ঠীর চক্ষুদ্বয়ে যেন সূচী বিদ্ধ হইতে লাগিল। পাছে বাড়ী পুড়িয়া যায় এই আশঙ্কাতেই বোধহয় তিনি বলিলেন না যে মুখ দিয়া আগুন বাহির করিলেও ভিক্ষা পাইবে না। তিনি দেখিলেন স্থবির নিতান্ত নাছোড়, কিছু না কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব একখান পিষ্টক দিতে হইবে। তিনি পত্নীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, একখানা ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক কর এবং তাহা দিয়া উহাকে বিদায় হইতে বল।' শ্রেষ্ঠীপত্নী অল্পমাত্র পিঠালি লইয়া কড়াতে দিলেন, কিন্তু উহা ফুলিয়া বড় হইতে হইতে সমস্ত কড়া পুরিয়া উঠিল। এত প্রকাণ্ড পিষ্টক দেখিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'করিয়াছ কি? কত পিঠালি দিয়াছ?' অনন্তর তিনি হাতার কোণায় বিন্দুমাত্র পিঠালি লইয়া কড়ায় দিলেন, কিন্তু ইহাও ফুলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বড় একখানা পিঠা হইল। ইহার পর শ্রেষ্ঠী আরও অনেকবার ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট হওয়া দূরে থাকুক সেগুলি উত্তরোত্তর বড়ই হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রেষ্ঠী নিতান্ত দিক্ হইয়া[১] পত্নীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতেই উহাকে একখানা পিষ্টক দাও।' কিন্তু শ্রেষ্ঠীপত্নী যেমন চুপড়ি হইতে একখানা পিষ্টক তুলিতে গেলেন অমনি অন্য পিষ্টকগুলি তাহার সঙ্গে লাগিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র! সমস্ত পিষ্টক এক সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে; ছাড়াইতে পারিতেছি না।' শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'আমি ছাড়াইয়া দিতেছি'; কিন্তু তিনিও ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন স্বামী স্ত্রী দুইজনে পিষ্টকপুঞ্জের দুই পাশ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। পিষ্টকের সঙ্গে এইরূপ ব্যায়াম করিতে করিতে শেষে শ্রেষ্ঠীর শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর পিপাসা পাইল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আমার পিষ্টকে প্রয়োজন নাই; চুপড়িসুদ্ধ সমস্তই এই ভিক্ষুকে দান কর।'

শ্রেষ্ঠীপত্নী চুপড়ি লইয়া স্থবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন স্থবির উভয়কে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য শুনাইলেন। 'দানই প্রকৃত যজ্ঞ' এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তিনি দানফলকে গগনতলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'ভগবন, আপনি ভিতরে

---

[১]। মূলে 'নিব্বিণ্ণো' আছে। সংস্কৃত 'নির্ব্বিণ্ণ'।

আসুন এবং পর্য্যঙ্কে বসিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করুন।'

স্থবির বলিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠীন! সম্যকসম্বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারে অবস্থিতি করিতেছেন, যদি অভিরুচি হয় চল, এই সকল পিষ্টক ও ক্ষীরাদিসহ তোমাকে সস্ত্রীক তাঁহার নিকট লইয়া যাই।' 'শাস্তা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?' 'এখান হইতে পঞ্চচত্বারিংশদ্‌যোজন-দূরস্থ জেতবন-বিহারে!' 'এত পথ অতিক্রম করিতে যে বহু সময় লাগিবে!' 'তোমার যদি ইচ্ছা হয়, মহাশ্রেষ্ঠীন, তাহা হইলে আমি ঋদ্ধিবলে তোমাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া যাইতেছি। তোমার প্রাসাদের সোপানাবলীর শীর্ষভাগ যেখানে আছে সেখানেই রহিবে, কিন্তু ইহার অপরপ্রান্ত জেতবনদ্বারে স্থাপিত হইবে। কাজেই প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নতম তলে অবতরণ করিতে যতটুকু সময় আবশ্যক তাহার মধ্যেই আমি তোমাকে জেতবনে লইয়া যাইব।' শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করুন।'

তখন স্থবির সোপানাবলীর অগ্রভাগ সেখানেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, 'ইহার পাদমূল জেতবনের দ্বারদেশ স্পর্শ করুক।' তন্মুহূর্ত্তে তাহাই ঘটিল। এইরূপে স্থবির শ্রেষ্ঠীদম্পতীকে, যতক্ষণে তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষাও অল্প সময়ে জেতবনে লইয়া গেলেন।

শ্রেষ্ঠীদম্পতী শাস্তার সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, 'ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।' শাস্তা ভোজনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগের হস্তে দক্ষিণার্থ জল ঢালিয়া দিলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিনী তথাগতের ভিক্ষাপাত্রে একখানি পিষ্টক রাখিলেন। তথাগত তাহা হইতে প্রাণধারণমাত্রোপযোগী কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; পঞ্চশত ভিক্ষুও তন্মাত্র আহার করিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠী ঘৃত-মধু শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ পরিবেষণ করিলেন। পঞ্চশত শিষ্যসহ শাস্তার ভোজন শেষ হইল। মহাশ্রেষ্ঠীও সস্ত্রীক পরিতোষসহকারে আহার করিলেন, তথাপি পিষ্টক নিঃশেষ হইল না। বিহারবাসী অন্য সমস্ত ভিক্ষু এবং উচ্ছিষ্টভোজীরা[১] পর্য্যন্ত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। তখন সকলে শাস্তাকে বলিলেন, 'ভগবন, পিষ্টকের ত হ্রাসের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।' শাস্তা বলিলেন, 'এখন তবে যাহা আছে, বিহারদ্বারে ফেলিয়া দাও।' তখন তাহারা বিহারদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গহ্বরের ভিতর উহা ফেলিয়া দিল। অদ্যাপি লোকে সেই গহ্বরের এক প্রান্তকে 'কপল্লপূব' নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।[২]

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী শাস্তার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

---

[১]। মূলে 'বিঘাসাদো' এই পদ আছে। সংস্কৃত 'বিঘসাদ' বা 'বিঘসাশ'।

[২]। কপল্ল = খাপড়া; পূব (পূপ) = পিষ্টক।

শাস্তা তাঁহাদিগের দানের অনুমোদন করিলেন; তচ্ছ্রবণে সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া বিহারদ্বারে সোপানারোহণপূর্ব্বক স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের উন্নতিকল্পে নিজের অশীতিকোটি সুবর্ণের সমস্তই মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেন।

পরদিন সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যান্তে জেতবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সায়ংকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের কি মহানুভব! তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মৎসরী শ্রেষ্ঠীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরহিতব্রত শিক্ষা দিলেন, পিষ্টকাদিসহ সস্ত্রীক জেতবনে আনয়ন করিয়া শাস্তার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, এবং স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করাইলেন।' তাঁহারা এইরূপে মৌদ্‌গল্যায়নের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মধুকর যেমন পুষ্পের কোন পীড়ন না করিয়া তাহা হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ যে ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ গৃহস্থের কোনরূপ পীড়া বা ক্লেশ না জন্মাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন। বুদ্ধগুণ প্রচার করিতে হইলে গৃহীদিগের নিকট এইভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

না করি পুষ্পের বর্ণের ব্যত্যয়,
না করি তাহার গন্ধ অপচয়,
অলি যথা করে মধু আহরণ,
তুমিও তেমতি গ্রামবাসিজনে
শিখাইবে ধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে
হ'য়ো না তাদের বিরাগ ভাজন।[১]

---

[১]। এই গাথা ধর্ম্মপদ হইতে গৃহীত। দীক্ষা উপদেশবলে সাধিত হইবে, পীড়ন দ্বারা নহে, গৌতমের এই মহামন্ত্র তাঁহার শিষ্যগণ কখনও ভুলেন নাই। ইহার প্রভাবেই অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধভূপালগণ বিপুলপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাধারণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে আর কুত্রাপি এরূপ সাম্যনীতির উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

এক চুপড়ি পিষ্টক দ্বারা শতশত লোকের ভূরিভোজনসম্পাদন গৌতমের লোকাতীত শক্তির পরিচায়ক। মথিলিখিত সুসমাচারে, যীশুখ্রীষ্টও দুইবার অতি অল্পমাত্র খাদ্য লইয়া বহুলোককে ভোজন করাইয়াছিলেন এরূপ দেখা যায়। আর্থার লীলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মথি যে বৌদ্ধ কিংবদন্তীর নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে?

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় অশীতিকোটি সুবর্ণের অধিপতি ইল্লীস নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মনুষ্যের যত কিছু দোষ হইতে পারে, ইল্লীসের দেহে ও চরিত্রে তাহাদের প্রায় কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি খঞ্জ, কুব্জ ও তির্যগ্‌দৃষ্টি ছিলেন, তিনি ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতেন না, কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি এতদূর কৃপণ ছিলেন যে, অপরকে দান করা দূরে থাকুক, নিজেও কপর্দ্দকপ্রমাণ ভোগ করিতেন না। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহার গৃহকে রাক্ষসপরিগৃহীত-পুষ্করিণীবৎ মনে করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার পিতৃ পিতামহগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইনি শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করিয়াই কুলাচার পরিহার করিয়াছিলেন। ইঁহার আদেশে দানশালা ভস্মীভূত এবং যাচকগণ প্রহৃত এবং বিতাড়িত হইয়াছিল। ইনি নিয়ত ধনই সঞ্চয় করিতেন।

একদিন ইল্লীস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন পরিশ্রমক্লান্ত এক জনপদবাসী সুরাভাণ্ড হস্তে লইয়া টুলের উপর বসিয়া আছে, পাত্র পূরিয়া অম্লসুরা পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক কবল দুর্গন্ধ শুষ্ক মৎস্য অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। এই জুগুপ্সিত দৃশ্য দেখিয়াও কিন্তু ইল্লীসের মনে সুরা পানের বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমি সুরা পান করিলে দেখাদেখি বাড়ীর অন্য সকলেও সুরাপান করিতে চাহিবে; তাহা হইলেই ধনক্ষয় হইবে।’ কাজেই তিনি তখনকার মত তৃষ্ণা চাপা দিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইল্লীসের সুরাপানেচ্ছা অধিক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিল না। তাঁহার শরীর পুরাতন কার্পাসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, শীর্ণ দেহের উপর ধমনিগুলি দেখা দিল; তিনি শয়নকক্ষে গিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনার অসুখ করিয়াছে কি?’ অনন্তর (প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ অনেক সাধ্যসাধনার পর) স্বামীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, ‘আপনি একা যতটুকু সুরাপান করিতে পারিবেন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।’ ইল্লীস বলিলেন, ‘গৃহে সুরা প্রস্তুত করিলে অনেকেই তাহা দেখিতে পাইবে; অন্য স্থান হইতে আনিয়া এখানে পান করাও অসম্ভব।’ শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি একটী মুদ্রা বাহির করিয়া শৌণ্ডিকালয় হইতে একভাণ্ড সুরা ক্রয় করাইয়া আনাইলেন এবং উহা একজন দাসের স্কন্ধে দিয়া নগরের বাহিরে রাজপথের অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী একটী গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দাসকে বিদায় দিয়া পাত্র পূরিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

ইল্লীসের পিতা দানাদিপুণ্যফলে দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইল্লীস যখন সুরাপানে নিরত, তখন শক্রর মনে হইল, 'আমি নরলোকে যে দানব্রত পালন করিতাম তাহা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না দেখি।' তিনি প্রভাববলে জানিতে পারিলেন তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র কুলধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক দানশালা ভস্মীভূত করিয়াছে, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়াছে এবং এতই কৃপণ হইয়াছে যে পাছে কাহাকেও অংশ দিতে হয়, এই আশঙ্কায় একাকী এক গুল্মের ভিতর বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। ইহাতে শক্র বড় দুঃখিত হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন 'আমি এখনই ভূতলে যাইব এবং উপদেশবলে যাহাতে আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন ঘটে, সে কর্ম্মফল বুঝিতে পারে এবং পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ত লাভে সমর্থ হয় তাহার উপায় করিব।'

শক্র তখনই ভূতলে অবতরণ করিয়া মানবস্বভাব পরিগ্রহণপূর্ব্বক ইল্লীসের বিগ্রহ ধারণ করিলেন। সেইরূপ খঞ্জ, সেইরূপ কুব্জ, সেইরূপ তির্যগদৃষ্টি—উভয়ের আকারে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ রহিল না। তিনি এই বেশে বারাণসী নগরে প্রবেশ করিলেন, রাজদ্বারে উপনীত হইয়া রাজাকে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, অনন্তর রাজার অনুমতি পাইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'শ্রেষ্ঠীন, তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন?' শ্রেষ্ঠীরূপী শক্র বলিলেন, 'মহারাজ আমার চুরাশি কোটি সুবর্ণ আছে। আপনি দয়া করিয়া তাহা নিজের ভাণ্ডারে লইয়া আসুন।' 'তাহা আনিব কেন? আমার ভাণ্ডারে যে ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক ধন আছে।' 'আপনার যদি এই ধনে প্রয়োজন না থাকে, তবে অনুমতি দিন আমি ইহা যথারুচি দান করিব।' 'নিশ্চয় করিবে, মহাশ্রেষ্ঠীন!' তখন শক্র 'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ইল্লীসের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চারিদিক হইতে ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল; তিনিই যে ইল্লীসের এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তিনি দেহলীর নিকট দাঁড়াইয়া দ্বারবানকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ, আমারই মত দেখতে, এমন যদি কেহ 'এ বাড়ী আমার' বলিয়া ঢুকিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূর করিয়া দিবে। ইহার পর শক্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়া শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইল্লীসের পত্নীকে ডাকাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, 'ভদ্রে, এস আমরা এখন হইতে দানশীল হই।'

এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা-ভৃত্য-দাস সকলেই ভাবিল, 'এতকাল ত ইঁহার দান করিতে ইচ্ছা হয় নাই; আজ বুঝি মদ খাইয়া মন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য দান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।' শ্রেষ্ঠীপত্নী

উত্তর দিলেন 'স্বামিন, আপনার ধন আপনি যথেচ্ছ দান করুন।' শক্র বলিলেন, 'তবে এখনই একজন ভেরীবাদক ডাকাইয়া সমস্ত নগর প্রচার করিতে বল, যে কেহ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তাদি পাইতে অভিলাষী, সে যেন এখনই ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়। শ্রেষ্ঠীপত্নী তাহাই করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক ঝুড়ি, চুপড়ি, বস্তা প্রভৃতি হাতে লইয়া ইল্লীসের দ্বারে সমবেত হইল। তখন শক্র সপ্তরত্নপূর্ণ ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, 'এই ধন তোমাদিগকে দান করিলাম, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাও।' এই কথা শুনিবামাত্র উহারা প্রথমে যে যত পারিল ধন বাহির করিয়া সুবিস্তীর্ণ কক্ষতলে রাশি রাশি করিয়া সাজাইয়া রাখিল; পরে স্ব স্ব ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকদিগের মধ্যে এক জনপদবাসী ইল্লীসের একখানি রথ বাহির করিয়া উহা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়াছিল। গোশালা হইতে গরু আনিয়া সে ঐ রথে যুতিল এবং হাঁকাইতে হাঁকাইতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথ অবলম্বনে চলিল। ইল্লীস যে গুল্মের ভিতর সুরাপান করিতেছিল জনপদবাসী তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল : 'আমার প্রভু ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর একশত বৎসর পরমায়ু হউক। তিনি যাহা দান করিলেন তাহা পাইয়া আমি পায়ের উপর পা রাখিয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিব। এ গরু তাঁহার, এ রথ তাঁহার, এ রত্নরাশিও তাঁহার। এ সকল আমার মাও আমায় দেন নাই, আমার বাবাও আমায় দেন নাই।'

জনপদবাসীর কথা কর্ণগোচর করিয়া ইল্লীস ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ব্যাপারটা কি? এ লোকটা দেখিতেছি আমারই নাম করিয়া এই সকল কথা বলিতেছে। রাজা কি আমার সমস্ত বিভব প্রজাদিগের মধ্যে লুঠাইয়া দিলেন?' তিনি নিমিষের মধ্যে গুল্মের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই গরু ও রথ তাঁহার। তখন 'অরে ধূর্ত্ত! আমার গরু, আমার রথ লইয়া কোথায় যাচ্ছিস?' বলিয়া তিনি গরুর নাসারজ্জু ধরিয়া ফেলিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বলিল, 'কি বল্লিরে জুয়াচোর, ইল্লীস শ্রেষ্ঠী সমস্ত নগরবাসীকে ধন দান করিতেছেন, তুই কথা বলিবার কে রে?' তাহার পর সে ইল্লীসকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল এবং রথ হাঁকাইয়া চলিল; ইল্লীস কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আবার রথ ধরিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে নামিল, ইল্লীসের চুল ধরিয়া মাথাটা মাটিতে টানিয়া বেশ করিয়া ঠুকিল, গলাধাক্কা দিয়া তিনি যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার রথে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

প্রহারের চোটে ইল্লীসের নেশা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং লোকে তাঁহার ধন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একে তাকে ধরিয়া 'ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাণ্ডার লুঠ করিতে আদেশ দিয়াছেন?' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যাহাকে ধরিলেন সেই তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল। তিনি ক্ষত বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন, কিন্তু দ্বারবানেরা তাঁহাকে 'কোথায় যাস, ধূর্ত্ত?' বলিয়া বংশযষ্টি দ্বারা প্রহার করিল এবং গলাধাক্কা দিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল। ইল্লীস দেখিলেন গতিক বড় খারাপ। এখন রাজার শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অনন্তর তিনি রাজদ্বারে গিয়া 'দোহাই মহারাজ, আপনি কি অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিয়াছেন?' বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

রাজা বলিলেন, 'সে কি মহাশ্রেষ্ঠীন! আমি তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিব কেন? এই মাত্র তুমিই না বলিয়া গেলে আমি তোমার ধনগ্রহণ না করিলে তুমি উহা যথাভিরুচি দান করিবে। তাহার পর তুই নাকি ভেরী পিটাইয়া নগরবাসীদিগকে সংবাদ দিয়া কথামত কাজ করিয়াছ!' ইল্লীস কহিলেন, 'মহারাজ, আমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা বলিতে আসি নাই। আমি যে কেমন কৃপণ তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি ত কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও কিছু দান করি না। যে আমার ধন দান করিতেছে, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এখন আনাইয়া বিচার করুন।'

রাজা শ্রেষ্ঠীরূপী শক্রকে ডাকাইলেন। তিনি আগমন করিলে সকলে দেখিয়া বিস্মিয় হইল যে ইল্লীসের সহিত তাঁহার আকারে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে প্রকৃত ইল্লীস কে। ইল্লীস বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ আমিই ইল্লীস'। রাজা বলিলেন, 'আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দুই জনের মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে, তাহা আর কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে কি? ইল্লীস বলিলেন, 'আমার ভার্য্যাই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।' কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা শক্রকেই নিজপতি স্থির করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অতঃপর ইল্লীসের পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও দাসদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাহারা সকলেই একবাক্যে শক্রকে মহাশ্রেষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিল। তখন ইল্লীস ভাবিলেন, 'আমার মাথার চুলের মধ্যে একটী চর্ম্মকীল[১] আছে; নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানে না। অতএব নাপিতকে ডাকাইয়া আমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলি।'

এই সময় বোধিসত্ত্ব ইল্লীসের নাপিত ছিলেন। রাজার আদেশে তাঁহাকে

---

[১]। চর্ম্মকীল—আঁচিল।

আনয়ন করা হইল এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে বলিতে পার কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ ইঁহাদের মধ্যে মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বলিতে পারিব।' রাজা বলিলেন, 'আচ্ছা, দুই জনেরই মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখ।' কিন্তু শক্র তন্মুহূর্ত্তেই নিজের মস্তকে একটী চর্ম্মকীল উৎপাদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব দুইজনের মাথা দেখিয়া বলিলেন 'না মহারাজ, ইহাদের দুইজনের মাথাতেই দেখিতেছি এক রকম আঁচিল; কাজেই কে প্রকৃত শ্রেষ্ঠী, কে ছদ্মবেশী, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।

দুই'ই টেরা, দুই'ই কুঁজো, দুয়েরই খোঁড়া পা;
দুয়ের মাথায় সমান আঁচিল, কিছু বুঝিতে পারি না।'

বোধিসত্ত্বের কথায় ইল্লীস ধনশোকে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শক্র মহাপ্রভাববলে আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি ইল্লীস নহি'। এদিকে লোকে ইল্লীসের মুখে ও শরীরে জলসেচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেবরাজ শক্রকে প্রণাম করিলেন। তখন শক্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'শুন ইল্লীস, এই প্রচুর বিভব আমার ছিল, তোমার নহে; আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমি জীবিতকালে দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছি; তুমি কিন্তু পিতৃপন্থা পরিহার করিয়াছ, দান কাহাকে বলে জান না, কেবল কার্পণ্য শিখিয়াছ, দানশালা বন্ধ করিয়াছ, যাচকদিগকে নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ এবং একমনে কেবল ধনসঞ্চয় করিতেছ। এ ধনে তোমার ভোগ নাই, অন্যেরও নাই। এ ধন রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায়; কেহই ইহার কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। যদি প্রতিজ্ঞা কর যে দানশালা পুননির্ম্মাণ করিবে, এবং দীন দুঃখীর পোষণ করিবে, তাহা হইলে এ সমস্ত তোমার সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে; নচেৎ তোমার সমস্ত ধন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং অশনিপাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার প্রাণান্ত ঘটিবে।'

ইল্লীস প্রাণভয়ে বলিয়া উঠিলেন 'আমি এখন হইতে দানশীল হইব।' শক্র তাঁহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে আসীন থাকিয়াই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে শীলাদি শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইল্লীস দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করিলেন।

*　　*　　*

[সমবধান—তখন এই কৃপণ শ্রেষ্ঠী ছিল ইল্লীস, মৌদ্গল্যায়ন ছিল দেবরাজ শক্র, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই নাপিত।]

---

৭৯. খরস্বর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোন অমাত্যকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি কোশলরাজের মনোরঞ্জন করিয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকরসংগ্রহান্তে দস্যুদিগের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে একদিন তিনি গ্রামবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিবেন; দস্যুরা সেই সুযোগে গ্রামলুন্ঠন করিবে এবং লুন্ঠনলব্ধ ধনের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিবে।

অনন্তর একদিন প্রাতঃকালে গ্রামখানি যখন এই কৌশলে অরক্ষিত অবস্থায় রহিল, তখন দস্যুরা আসিয়া লুন্ঠন আরম্ভ করিল; তাহারা গবাদি পশু বধ করিয়া মাংস খাইল এবং গ্রামাবাসীদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সেই অমাত্য সায়ংকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন রাজা তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কাজেই রাজা তাহাকে কোন নিম্নপদে অবনমিত করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে সেই প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন।

একদিন রাজা জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট অমাত্যের এই কুকীর্ত্তির কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান কহিলেন, 'মহারাজ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মেও এবংবিধ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।' অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের এক অমাত্যকে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনি যেরূপ বলিলেন, এই ব্যক্তিও সেখানে গিয়া অবিকল সেইরূপই করিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যার্থ প্রত্যন্ত গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এবং ঘটনাক্রমে উক্ত দিবসে সেই গ্রামেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন গ্রামাধ্যক্ষ সন্ধ্যাকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই দুষ্ট অধ্যক্ষ দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া গ্রাম লুন্ঠন করাইয়াছে; এখন দস্যুরা পলাইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আসিতেছে—যেন কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।' অনন্তর তিনি এই কথা আবৃত্তি করিলেন :

হরিতে গোধন, করিতে দহন লোকের আলয় যত,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া লইতে গ্রামবাসী শত শত,
দস্যুগণে হের, দিল অবসর; কিন্তু তাহে লজ্জা নাই;
ঢক্কার নিনাদে প্রকম্পিত করে দশদিক্ এবে তাই।
এমন নির্লজ্জ তনয় অপুত্রক বলি তারে;
এমন পুত্রের পিতা যেন কেহ নাহি হয় এ সংসারে।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা অধ্যক্ষের দোষ কীর্ত্তন করিলেন। অচিরাৎ তাহার কুকীর্ত্তি রাষ্ট্র হইল এবং রাজা তাহার দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই গ্রামাধ্যক্ষ ছিল সেই গ্রামাধ্যক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই গাথাপাঠক পণ্ডিত পুরুষ।]

---

৮০. ভীমসেন-জাতক

[ভিক্ষুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বড় আত্মশ্লাঘা করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে এই ব্যক্তি প্রাচীন, প্রৌঢ়, নব্য, সমস্ত ভিক্ষুকে নিজের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে নানারূপ বিকথন দ্বারা প্রতারিত করিত। সে বলিত, 'দেখ ভাই, জাতি ও গোত্রে কেহই আমার সমকক্ষ নহে; আমার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। বংশমর্য্যাদাতেই বল, আর কুলসম্পত্তিতেই বল, আমার সমান কে আছে? আমাদের সুবর্ণ রজতের অন্ত নাই; আমাদের দাস দাসীরা পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট অন্ন ও মাংস আহার করে, বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে এবং বারাণসীর গন্ধবিলেপন ব্যবহার করে। কিন্তু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এই কদর্য্য অন্ন আহার ও এই কদর্য্য চীবর পরিধান করিতেছি।'

অনন্তর এক ভিক্ষু অনুসন্ধান দ্বারা এই ব্যক্তির কুলসম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া অন্য ভিক্ষুদিগের নিকট ইহার মিথ্যা গৌরবের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন সকলে ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ অমুক ভিক্ষু এরূপ নিষ্কাম শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও আমাদিগকে বিকত্থন দ্বারা প্রতারিত করিতেছিলেন।' ভিক্ষুরা এইরূপে উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'এ ব্যক্তি পূর্ব্বেও এইরূপ বিকত্থন করিত।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন নিগম গ্রামে[১] উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত' এই নাম দিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব অধীত বিদ্যাসমূহ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া অন্ধ্ররাজ্যে[২] গমন করিলেন। বোধিসত্ত্বের যে জন্মের বৃত্তান্ত বলা হইতেছে, তখন তিনি ঈষৎ কুব্জ ও খর্ব্বকার ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, 'আমি কোন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমার মত বামন দ্বারা কি কাজ হইতে পারে?' অতএব লম্বা চওড়া কোন একটা লোক খুঁজিয়া তাঁহাকে মুখ-পাত্র[৩] করিতে হইবে। সেরূপ করিলে তাহারই ছায়ায় আমার জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐরূপ পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে তন্তুবায়-পল্লীতে গমন করিলেন এবং ভীমসেন নামক এক মহাকায় তন্তুবায়কে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন 'সৌম্য, তোমার নাম কি?' সে বলিল, 'আমার নাম ভীমসেন।' 'তোমার দেহ এমন সুন্দর ও বিশাল; তুমি কেন তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিতেছ?' 'না করিলে চলে না।' 'আর তোমায় এ কাজ করিতে হইবে না। আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; অথচ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার ক্ষুদ্রকায় দেখিয়া মনে করিবেন আমি কোন কাজের লোক নহি। তুমি আমার সঙ্গে চল; রাজার নিকট উপস্থিত হইলে আস্ফালন করিবে যে তুমিই মহাধনুর্দ্ধর। তাহা হইলে রাজা একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তোমায় নিযুক্ত করিবেন এবং তোমায় কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব এবং যখন যে কাজ উপস্থিত হইবে সম্পাদিত করিয়া দিব। এইরূপে তোমার আড়ালে থাকিয়া আমারও জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা কর; তাহা হইলে আমরা উভয়েই সুখে থাকিতে পারিব।' ভীমসেন বলিল, 'উত্তম কথা! তাহাই করা যাইবে।'

অনন্তর বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন ভীমসেন থাকিল সম্মুখে, বোধিসত্ত্ব রহিলেন তাহার পশ্চাতে এবং তাহারই বাল-ভৃত্য-ভাবে। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের দ্বারা রাজাকে আপনাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন।

---

[১]। নিগমগ্রাম—যেখানে হাটবাজার আছে এমন গণ্ডগ্রাম।

[২]। মূলে 'মহীংসকরট্‌ঠ' আছে; ইহা প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের নামান্তর।

[৩]। মূলে 'ফলক' এই শব্দ আছে।

রাজার অনুমতি পাইয়া বোধিসত্ত্ব ও ভীমসেন উভয়েই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?' ভীমসেন বলিল, 'মহারাজ, আমি ধনুর্দ্ধর; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ধনুর্বিদ্যায় কেহই আমার তুল্যকক্ষ নহে।' 'আমার কর্ম্মচারী হইলে কি বেতন চাও বল? 'প্রতি পক্ষে সহস্র মুদ্রা।' 'তোমার সঙ্গে এ লোকটী কে?' 'এ আমার বালক ভৃত্য।' 'বেশ, তোমাকে নিযুক্ত করা গেল।'

এই রূপে ভীমসেন রাজকর্ম্মচারী হইল; কিন্তু বোধিসত্ত্বই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের কোন বনে একটা ব্যাঘ্র বড় উপদ্রব করিতেছিল; তজ্জন্য একটী বহুজনসঞ্চরণ পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়াছিল, বহু মনুষ্যও প্রাণ হারাইয়াছিল। এই ব্যাপার রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ভীমসেনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বাঘটা ধরিতে পারিবে কি?' ভীমসেন বলিল, 'মহারাজ, যদি বাঘই ধরিতে না পারিব, তবে ধনুর্দ্ধর নাম ধারণে কি ফল?' রাজা তাহাকে পাথেয় দিয়া বাঘ ধরিতে পাঠাইলেন।

ভীমসেন গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বেশ কথা, বাঘ ধরিতে যাও।' 'তুমি যাইবে না কি?' 'আমি যাইব না, কিন্তু তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।' 'কি উপায় বল।' 'তুমি সহসা একাকী ব্যাঘ্রের গহন-স্থানে প্রবেশ করিও না, তুমি জনপদ হইতে সেখানে দুই হাজার তীরন্দাজ সমবেত কর; অনন্তর যখন বুঝিবে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তখন পলাইয়া ঝোপের মধ্যে যাইবে এবং উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে। এ দিকে জনপদবাসীরা প্রহার দ্বারা বাঘটা মারিয়া ফেলিবে। যখন বুঝিবে বাঘটা মারিয়াছে তখন ঝোপের মধ্য হইতে দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া লইবে এবং উহার একদিক ধরিয়া টানিতে টানিতে মড়া বাঘের কাছে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিবে 'কে বাঘ মারিল? আমি ভাবিয়াছিলাম বাঘটাকে ধরিয়া, এই লতা দিয়া বান্ধিয়া গরুর মত টানিতে টানিতে রাজার কাছে লইয়া যাইব; সেই জন্য লতা আনতে ঝোপের মধ্যে গিয়াছিলাম; কিন্তু লতা আনিবার আগেই বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল! কে এমন কাজ করিল বল?' তোমার কথা শুনিয়া জনপদবাসীরা ভীত হইবে এবং 'প্রভু, এ কথা রাজাকে জানাইবেন না' বলিয়া তোমায় প্রচুর ধন দিবে। রাজা জানিবেন তুমিই বাঘ মারিয়াছ; কাজেই তিনিও তোমায় বহু ধন পুরস্কার দিবেন।'

ভীমসেন বলিল, 'বা, এ অতি উত্তম পরামর্শ!' অনন্তর সে বোধিসত্ত্ব যেরূপ বলিলেন, সেই উপায়ে ব্যাঘ্রবিনাশপূর্ব্বক পথ নিরাপদ করিল, বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে; সেই বনে পথিকদিগের আর উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই।'

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু ধন দান করিলেন।

আর একদিন সংবাদ আসিল একটা মহিষ কোন রাজপথে বড় উপদ্রব করিতেছে। রাজা ভীমসেনকে ডাকাইয়া মহিষ মারিতে পাঠাইলেন। এবারও সে বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কৌশলপ্রয়োগে মহিষ বধ করিল এবং রাজার নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইল।

ভীমসেন এইরূপে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইল। সে ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল; তাঁহার পরামর্শগ্রহণে বিরত হইল; 'তুমি না হইলে আমার চলিবে; তুমি কি ভাব, তোমা ভিন্ন আর লোক নাই?' এইরূপ কটু কথাও বলিতে লাগিল।

ইহার কিছুকাল পরে এক শত্রুরাজ বারাণসী অবরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হয় রাজ্য ছাড়, নয় যুদ্ধ কর।' ব্রহ্মদত্ত ভীমসেনকে এই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ভীমসেন আপাদ মস্তক সৈনিকবেশে সুসজ্জিত হইয়া সুসন্নদ্ধ গজপৃষ্ঠে আসীন হইল। বোধিসত্ত্ব আশঙ্কা করিলেন ভীমসেন পাছে নিহত হয়। এই জন্য তিনিও সর্ব্বসন্নদ্ধসম্পন্ন হইয়া তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই হস্তী সৈন্যপরিবৃত হইয়া নগর দ্বার দিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। কিন্তু রঁণভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র ভীমসেন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি এখন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে নিশ্চিত মারা যাইবে,' এবং যাহাতে সে পড়িয়া না যায় সেই জন্য তাহাকে রজ্জুদ্বারা বান্ধিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভীমসেন রণভূমির দৃশ্যে মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে মলত্যাগপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠ দূষিত করিয়া ফেলিল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বা, পশ্চাতের সহিত অগ্রের ঐক্য রহিল কোথা? পূর্ব্বে তুমি মহাবীর বলিয়া আস্ফালন করিতে, এখন কি না হস্তীর পৃষ্ঠে মলত্যাগ করিলে!' অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :

করিলে কতই গর্ব্ব, এবে লাগে চমৎকার,
রণক্ষেত্রে বীর্য্য তব মলত্যাগমাত্র সার।
পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, পরে যা করিলে ভাই,
সামঞ্জস্য তার মধ্যে কিছু না দেখিতে পাই।

বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, 'ভয় নাই; আমি থাকিতে কাহার সাধ্য তোমার প্রাণনাশ করে?' তিনি ভীমসেনকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি স্নান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাও।'

অনন্তর 'আমি অদ্য যশস্বী হইব' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব রণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুব্যূহ-ভেদপূর্ব্বক শত্রুরাজকে

জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া বারাণসীরাজের নিকট লইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রচুর পুরস্কার দান করিলেন। তদবধি সমস্ত জম্বুদ্বীপে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতের যশোগাথা গীত হইতে লাগিল। তিনি ভীমসেনকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন এবং যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই বিকত্থনকারী ভিক্ষু ছিল ভীমসেন এবং আমি ছিলাম চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিত।]

---

৮১. সুরাপান-জাতক

[শাস্তা কৌশাম্বী নগরের নিকটবর্ত্তী ঘোষিতরামে অবস্থিতিকালে স্থবির স্বাগতকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে বর্ষাকাল যাপন করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে ভদ্রবাটিকা নামক নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য গোপাল, অজপাল, কৃষক ও পথিকেরা তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, 'প্রভু, আপনি আম্রতীর্থে যাইবেন না, কারণ সেখানে জটাধারী তপস্বীদিগের আশ্রমসন্নিধানে আম্রতীর্থক নামধারী এক অতি উগ্রবিষ নাগ বাস করে; সে আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।' তাহারা এইরূপে তিন বার নিষেধ করিল, কিন্তু ভগবান যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি অভীষ্ট স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনন্তর ভগবান যখন ভদ্রবাটিকার নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন পৃথগ্‌জনলভ্য ঋদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধোপস্থাপক স্থবির স্বাগত জটাধারীদিগের সেই আশ্রমে গিয়া নাগরাজের বাসস্থানে তৃণাসন বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নাগরাজ নিজের দুঃস্বভাব গোপন রাখিতে অসমর্থ হইয়া ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া স্থবিরও ধূম্‌ উদ্‌গিরণ করিলেন। তখন নাগ অগ্নিশিখা বাহির করিল, স্থবিরও তাহাই করিলেন। নাগের তেজে স্থবিরের কোন যন্ত্রণা হইল না; কিন্তু স্থবিরের তেজে নাগের বড় যন্ত্রণা হইল; তিনি এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে নাগকে দমন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে ত্রিশরণে ও শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্তার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

শাস্তা যতদিন ইচ্ছা ভদ্রবাটিকায় অবস্থান করিয়া কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন। স্থবির স্বাগতকর্ত্তৃক নাগদমন বার্ত্তা সমস্ত জনপদে প্রচারিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীবাসীরা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক শাস্তার চরণ বন্দনা করিল। তাহার পর

তাহারা স্থবির স্বাগতের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে উপবেশন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনার কি প্রয়োজন বলুন, আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।' স্থবির তূষ্ণীভাবে রহিলেন; কিন্তু ষড়্বর্গীয়েরা উত্তর দিল, 'মহাশয়গণ, প্রব্রাজকদিগের পক্ষে কাপোতিকা সুরা দুর্লভও বটে, মনোজ্ঞও বটে[১]; যদি পারেন তবে স্থবিরের জন্য কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট কাপোতিকা সুরা সংগ্রহ করিয়া দিন।' তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শাস্তাকে পর দিনের জন্য নিমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

নগরবাসীরা স্থির করিল প্রতি গৃহেই স্থবিরের নিমিত্ত কাপোতিকা সুরা রাখিতে হইবে। অনন্তর তাহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক গৃহে গৃহে সুরাপান করাইতে লাগিল। ইহাতে স্থবির সুরামদে মত্ত হইলেন এবং বহির্গমন-কালে নগরদ্বারে নিপতিত হইয়া প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। আহারান্তে নগর হইতে প্রতিগমন সময়ে শাস্তা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং 'ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বাগতকে তুলিয়া লইয়া যাও' এই বলিয়া আবাসে ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষুরা স্থবিরের মস্তক বুদ্ধের পাদমূলে রাখিয়া তাঁহাকে শোওয়াইলেন; কিন্তু স্থবির ঘুরিয়া তথাগতের দিকেই পা রাখিয়া শুইয়া রহিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে ভিক্ষুগণ, স্বাগত পূর্ব্বে আমার প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইত, এখন সেরূপ দেখাইতেছে কি?' তাঁহারা বলিলেন, 'না প্রভু।' 'ভিক্ষুগণ, আম্রতীর্থক নাগকে কে দমন করিয়াছিল?' 'স্বাগত দমন করিয়াছিলেন, প্রভু।' 'স্বাগত বর্ত্তমান অবস্থায় একটা উদক ডুণ্ডুভও[২] দমন করিতে পারে কি?' 'সাধ্য কি, প্রভু।' 'তবে দেখ দেখি যাহা পান করিলে বিসংজ্ঞ হইতে হয়, তাহা কি পান করা উচিত?' 'তাহা পান করা নিতান্ত অনুচিত।' এইরূপে স্থবিরের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'সুরাপানরূপ অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।' এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া তিনি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্ম সভায় সমবেত হইয়া সুরাপানের দোষ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'আহা! সুরাপান কি দোষাবহ! দেখ, ইহার প্রভাবে স্বাগতের ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ঋদ্ধিমান স্থবির পর্য্যন্ত শাস্তার মর্য্যাদারক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন!' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা

---

[১]। মদ্যবিশেষ। সম্ভবত ইহা কপোতের ন্যায় ধূসর বর্ণবিশিষ্ট ছিল; কিংবা কপোত নামক উদ্ভিদ ইহার একটী উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত।

[২]। ঢোঁড়া সাপ।

বলিলেন, 'প্রব্রাজকেরা এ জন্মে যেমন সুরাপানে বিসংজ্ঞ হয়, পূর্ব্ব জন্মেও সেইরূপ হইত।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

*   *   *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

একদা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা বলিলেন, 'গুরুদেব, যদি অনুমতি পাই, তাহা হইলে লোকালয়ে গিয়া লবণ ও অম্ল সংগ্রহ করিয়া আনি।' আচার্য্য বলিলেন, 'বৎসগণ, আমি এখানেই থাকিব; তোমরা শরীররক্ষার্থ লোকালয়ে যাইতে পার; বর্ষাশেষ হইলে ফিরিয়া আসিবে।'

তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং বারাণসীতে গিয়া রাজ্যোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। পরদিন তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া নগরদ্বারের বহিঃস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য পাইলেন। তাহার পরদিন তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও লোকে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিতে লাগিল এবং কিয়দ্দিন পরে রাজাকে জানাইল, 'হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি আগমন করিয়া উদ্যানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মহাতপা, জিতেন্দ্রিয় এবং শীলবান।' রাজা তাঁহাদের গুণের কথা শুনিয়া উদ্যানে গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'আপনারা দয়া করিয়া এই চারি মাস এখানেই অবস্থিতি করুন।' তপস্বীরা ইহাতে সম্মত হইয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহারা রাজভবনে আহার এবং রাজ্যোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন নগরে পানোৎসব হইল; রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রব্রাজকদিগের ভাগ্যে সুরা দুর্লভ। অতএব তিনি তপস্বীদিগের পানার্থ প্রচুর সুপেয় মদ্য দান করিলেন। তাঁহারা সুরাপান করিয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন এবং উন্মত্ত হইয়া কেহ নাচিতে লাগিলেন, কেহ গাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে চাউলের ঝুড়ি প্রভৃতি উল্টাইয়া ফেলিলেন। ইহার পর অবসন্ন হইয়া সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন নেশা ভাঙ্গিল তখন তাঁহারা জাগিয়া শুনিতে পাইলেন, রাত্রিকালে কি দুষ্কার্য্য করিয়াছেন; তাহার নিদর্শনও চারিদিকে দেখা গেল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা যে কাজ করিয়াছি তাহা পরিব্রাজকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। আচার্য্যের নিকট না থাকাতেই এইরূপ

পাপকার্য্য করিয়াছি।' তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া হিমালয়ে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎসগণ, লোকালয়ে গিয়া তোমাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই? ভিক্ষাচর্য্যার সময় ত কোন অসুবিধা ভোগ কর নাই? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ত বেশ সম্প্রীতি ছিল?

তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ গুরুদেব, আমরা বেশ সুখে ছিলাম। কিন্তু আমরা অপেয় পান করিয়া বিসংজ্ঞ হইয়াছিলাম; আমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; আমরা সুরামদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও গান করিয়াছিলাম।' অনন্তর তাঁহারা মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গাথা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন :

করিলাম সুরাপান, গাইলাম কত গান,
কতবার নাচিলাম, কাঁদিলাম আর;
পরম সৌভাগ্য এই, হেন সংজ্ঞাহর যেই,
পান করি সেই বিষ, হইনি বানর!

বোধিসত্ত্ব তপস্বীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'যাহারা গুরুর শাসনে বাস না করে, তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হয়! সাবধান, আর কখনও এমন দুষ্কার্য্য করিও না।' অতঃপর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ধ্যানসুখভোগ করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাঁহাদের গুরু]

---

৮২. মিত্রবিন্দক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের ঘটনা সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় হইয়াছিল। তাহার বিবরণ মহামিত্রবিন্দক-জাতকে (৪৩৯) প্রদত্ত হইবে। তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

স্ফটিক-রজত মণিনির্ম্মিত সুন্দর
কোথা তব সেই সব প্রাসাদ-নিকর?

উরশ্চক্র[১] পরি এবে যাবৎ জীবন
নরকেতে প্রায়শ্চিত্ত কর সম্পাদন।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকস্থ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। মিত্রবিন্দক উরশ্চক্র পরিধান-পূর্ব্বক পাপক্ষয় পর্য্যন্ত মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

* * *

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষুক ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ।]

---

৮৩. কালকর্ণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের কোন মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম কালকর্ণী। সে অনাথপিণ্ডদের সহিত শৈশবে ধূলাখেলা করিয়াছিল এবং এক গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া অনাথপিণ্ডদের শরণ লয়। শ্রেষ্ঠী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বেতন নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি সে তাঁহার কর্ম্মচারী হইয়া সমস্ত কাজ করিতে লাগিল।

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর গৃহে আসিবার পর সেখানে 'দাঁড়াও, কালকর্ণী', 'বসো, কালকর্ণী', 'খাও, কালকর্ণী' সর্ব্বদা প্রায় এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। ইহাতে শ্রেষ্ঠীর বন্ধুবান্ধবগণ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠীন, আপনার গৃহে এরূপ হইতে দেওয়া ভাল দেখায় না।' 'দাঁড়াও, কালকর্ণী', 'বসো, কালকর্ণী', 'খাও, কালকর্ণী' এই সকল শব্দ শুনিলে যক্ষ পর্য্যন্ত পলাইয়া যায়। এ লোকটা কিছু আপনার সমশ্রেণীর নয়; এ নিতান্ত দুর্গত; অলক্ষ্মী ইহার সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেছে। আপনি ইহার সহিত সংস্রব রাখেন কেন?' কিন্তু অনাথপিণ্ডদ এ সকল কথায় কান দিলেন না; তিনি উত্তর করিলেন, 'দেখ, নাম কেবল বস্তুনির্দ্দেশের জন্য; পণ্ডিতেরা কখনও নামদ্বারা কাহারও গুণাগুণ নির্ণয় করেন না। অতএব কেবল নাম শুনিয়াই অমঙ্গলাশঙ্কা

---

[১]। পাপীর দণ্ডবিধানার্থ ব্যবহৃত পাষাণময় চক্রবিশেষ। ইহা দেখিতে মনোজ্ঞ হারের ন্যায়, কিন্তু পাপীর গলে পরাইয়া দিলে ইহা ঘুরিতে থাকে এবং ইহার তীক্ষ্ণ ধারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়।

করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি নামের উপর নির্ভর করিয়া ধূলাখেলার সাথী এই বাল্যবন্ধুকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইব না।'

অনাথপিণ্ডদের একখানি ভোগগ্রাম[১] ছিল। একদা তিনি কালকর্ণীর হস্তে গৃহরক্ষার ভার দিয়া সেখানে গমন করিলেন। তস্করেরা ভাবিল, 'শ্রেষ্ঠী গ্রামে গিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহার গৃহে গিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিব।' অনন্তর তাহারা নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে অনাথপিণ্ডদের গৃহ বেষ্টন করিল। কালকর্ণী সন্দেহ করিয়াছিল যে তস্করেরা আসিতে পারে। সুতরাং সে নিদ্রা না গিয়া বসিয়া রহিল। অনন্তর দস্যুরা সমাগত হইয়াছে বুঝিয়া সে লোকজন জাগাইবার জন্য 'তোমরা শাঁখ বাজাও, দামামা বাজাও' এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করিয়া তুলিল—তস্করদিগের ধারণা হইল, সে যেন কত লোকই সমবেত করিতেছে। তাহারা মনে করিল, তাই ত, বাড়ীতে যে কোন লোক নাই শুনিয়াছিলাম, তাহা ত ঠিক নহে। বোধহয় শ্রেষ্ঠী ফিরিয়া আসিয়াছেন।' তখন তাহারা পাষাণ, মুদ্‌গর প্রভৃতি সমস্ত প্রহরণ রাখিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন লোকে ঐ সমস্ত প্রহরণ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং শতমুখে কালকর্ণীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, 'এরূপ বুদ্ধিমান লোকে যদি গৃহরক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে তস্করেরা অনায়াসে যথারুচি প্রবেশলাভ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। শ্রেষ্ঠীর পরম সৌভাগ্য যে এমন বিশ্বাসী বন্ধু পাইয়াছেন।' এই সময়ে শ্রেষ্ঠী গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং উহারা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী কহিলেন, 'কেমন, তোমরা না এইরূপ গৃহরক্ষক বন্ধুকে তাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে? যদি তোমাদের কথামত ইহাকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে আজ পথের ভিখারী হইতাম। নামের গুণে মনুষ্যত্ব জন্মে না; মনুষ্যত্বের মূল হৃদয়।' অনন্তর তিনি কালকর্ণীর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এবং শাস্তাকে এই কথা জানাইতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, কালকর্ণী নামক মিত্র যে কেবল এই জন্মে তস্কর হইতে মিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার কালকর্ণী নামে এক মিত্র ছিল। [উপরে যাহা যাহা বলা

---

[১]। ভোগগ্রাম—কাহারও ভোগের জন্য রাজদত্ত গ্রাম, যেমন দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি।

ইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছে।] বোধিসত্ত্ব ভোগগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি তোমাদের কথা শুনিয়া এইরূপ বন্ধুকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে অদ্য আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

'সপ্ত পদ যার সঙ্গে হয় বিচরণ,
মিত্র বলি সেই জনে করি সম্ভাষণ।
থাকিব দ্বাদশ দিন এক সঙ্গে যার,
সহায় বলিয়া তারে জানিব আমার।
এক পক্ষ কিংবা মাস কাটে যার সাথে,
জ্ঞাতিসম সেই, নাহি সন্দেহ ইহাতে।
ততোধিক কাল যারে রাখি নিজ ঠাঁই,
আত্মসমভাবি তারে, যেন মোর ভাই।
কালকর্ণী বন্ধু মম শৈশব হইতে;
আত্মসুখহেতু তারে পারি কি বর্জ্জিতে?

* * *

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই কালকর্ণী এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী।]

---

৮৪. অর্থস্যদ্বার-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অর্থকুশল[২] বালককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীনগরবাসী কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেই প্রজ্ঞাবান ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন পিতার নিকট গিয়া অর্থের দ্বার কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পিতা কিন্তু ইহা জানিতেন না। তিনি পুত্রকে বলিলেন, 'এ অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত ঊর্দ্ধে ভবাগ্র হইতে নিম্নে অবীচি পর্য্যন্ত কোথাও এমন কেহ নাই যে এই প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ।' অনন্তর তিনি বহুমাল্যগন্ধবিলেপন লইয়া পুত্রসহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চ্চনা ও বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশন করিয়া নিবেদন

---

[১]। অর্থের দ্বার অর্থাৎ পরমার্থ লাভের উপায়।

[২]। 'অর্থ' শব্দ এখানে পরমার্থবাচক।

করিলেন, 'ভগবন, আমার এই পুত্রটী প্রজ্ঞাবান ও অর্থকুশল; এ, অর্থের দ্বার কি, আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার অর্থ জানি না বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। দয়া করিয়া ইহার সদুত্তর দিন।' শাস্তা বলিলেন, 'উপাসক, এই বালক পূর্ব্বেও আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তখন এ উহা শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু জন্মান্তর-পরিগ্রহনিবন্ধন এখন তাহা স্মৃতিগোচর করিতে পারিতেছে না।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ষড়বর্ষ বয়সেই বিলক্ষণ প্রজ্ঞাবান ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'পিতঃ, অর্থের দ্বার কি বলুন।' তিনি অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

'আরোগ্য—যাহার তুল্য নিধি নাই আর।
লভিতে তাহারে সদা হইতে তৎপর;
সদাচার, বৃদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ,
শাস্ত্রানুশীলনে রত হও অনুক্ষণ;
চল ধর্ম্মপথে, ত্যজ বিষয়-বাসনা,
তা হলে তোমার আর কিসের ভাবনা?
পরমার্থ লভিবারে, জে'ন তুমি সার,
রহিয়াছে সদা মুক্ত এই ছয় দ্বার।'

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পুত্রের অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। সেই বালক তদবধি উক্ত ষড়বিধ ধর্ম্মের আচরণ করিত। বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপগতি লাভ করিয়াছিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই বালক ছিল সেই বালক এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠী।]

---

৮৫. কিংপক্ক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

কোন কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ ঐ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, 'হাঁ প্রভু'। তখন শাস্তা বলিলেন, 'দেখ, রূপরসাদি পঞ্চ কামগুণ পরিভোগকালে রমণীয় বটে; কিন্তু ইহাদের পরিভোগ নিরয়গমন প্রভৃতি অগতির হেতু বলিয়া কিংপক্ক ফলের পরিভোগসদৃশ। কিংপক্কফল শুনিয়াছি বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন; কিন্তু উদরস্থ হইলেই অন্ত্রসমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবননাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক লোকে এই ফলের দোষ জানিত না; তাহারা বর্ণগন্ধরসে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা আহার করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সার্থবাহ ছিলেন। তিনি একদা পঞ্চশত শকটসহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার সময় এক বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেন, 'শুনিয়াছি এই বনে বিষবৃক্ষ আছে। সাবধান, আমায় না জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কোন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ফল আহার করিও না।' অতঃপর বনভূমি অতিক্রম করিয়া সকলে অপরপ্রান্তে ফলভারনমিতশাখা এবং কিংপক্ক বৃক্ষ দেখিতে পাইল। স্কন্ধ, শাখা, পত্র, ফল, আকার, বর্ণ, গন্ধ, রস সর্ব্ববিষয়েই এই বৃক্ষ অবিকল আম্রবৃক্ষের ন্যায় দেখাইত। সার্থবাহদলের কেহ কেহ বর্ণরসগন্ধে ভ্রান্ত হইয়া উহাকে আম্রবৃক্ষ বলিয়াই মনে করিল এবং উহার ফল খাইল। কিন্তু অপর সকলে বলিল, 'সার্থবাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব।' সুতরাং তাহারা ফল পাড়িয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ফলগুলি ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং যাহারা খাইয়াছিল তাহাদিগকে বমন করাইলেন ও ঔষধ দিলেন। ইহাদের কেহ কেহ আরোগ্যলাভ করিল; কিন্তু যাহারা প্রথমে খাইয়াছিল তাহারা রক্ষা পাইল না। অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলেন, পণ্যবিক্রয় দ্বারা বহু লাভ করিলেন, গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

কামপরিণাম অতি দুঃখকর; জানে না ক তাই কাম সেবে নর।
কিংপক্ক খাইয়া শমনসদন গিয়াছিল, হায়! শত শত জন।

কামাদি রিপু যে পরিভোগকালে মনোজ্ঞ হইলেও পরিণতির সময় সর্ব্বনাশ সাধন করে, এরূপে তাহা প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু, স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিলেন। অপর সকলের কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী, কেহ বা অর্হৎ হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

---

৮৬. শীলমীমাংসা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শীলমীমাংসক[১] ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্রাহ্মণ কোশলরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। তিনি ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। পঞ্চশীল পালন করিতেন এবং বেদত্রয়ের ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শীলবান বলিয়া জানিতেন এবং যথেষ্ট সম্মান করিতেন। একদিন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে নিজের গুরুর পদে বরণ করিয়াছেন। এখন আমার মীমাংসা করিতে হইবে যে এত অনুগ্রহ আমার জাতি, গোত্র, কুল, দেশ ও বিদ্যার জন্য, কিংবা আমার চরিত্রের জন্য।' অনন্তর তিনি একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় ধনপালের[২] ফলক হইতে না বলিয়া একটী কার্ষাপণ লইয়া গেলেন। ঐ ধনপাল তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে ইহা দেখিতে পাইয়াও তিনি নীরব রহিলেন।

ইহার পরদিন ব্রাহ্মণ উক্তরূপে দুই কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়াও ধনপাল কিছু বলিলেন না। অতঃপর তৃতীয় দিন ব্রাহ্মণ এক মুষ্টি

১। যিনি শীল অর্থাৎ চরিত্রের কি বল তাহার মীমাংসা করিয়াছিলেন।

২। ধনপাল—যিনি রাজার ভাণ্ডার হইতে লোকের প্রাপ্য দিয়া থাকেন। মূলে 'হিরণ্যক' এই শব্দ আছে। ইনি বেষ্টনীর ভিতর থাকিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মুখস্থ কাষ্ঠফলকের উপর গণিয়া রাখেন; লোকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া যায়।

কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। তখন ধনপাল বলিলেন, 'আর্য্য, অদ্য পর্যন্ত আপনি তিন দিন উপর্য্যুপরি রাজার ধন অপহরণ করিলেন।' ইহা বলিয়া তিনি, 'রাজধনাপহারককে ধরিয়াছি' এইরূপ তিনবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তচ্ছ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, 'কেমন ঠাকুর, তুমি না এতকাল নিজেকে শীলবান বলিয়া পরিচয় দিতে! চল তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাই।' অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিল এবং অল্প স্বল্প প্রহার করিতে করিতে রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি এমন দুঃশীলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কেন?' ইহার পর তিনি ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মহারাজ, আমি চোর নহি।' 'যদি চোর না হইবে তবে ফলকস্থ রাজধনে হাত দিলে কেন?' 'আপনি আমায় বড় সম্মান করেন; ভাবিলাম একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি এই রাজদত্ত সম্মান আমার জাতি ইত্যাদির ফল কিংবা আমার চরিত্রের ফল। এই প্রশ্নেরই মীমাংসার জন্য আমি ফলক হইতে স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম চরিত্রগুণেই আমার এরূপ সম্মান হইয়াছে, জাতিগোত্রাদির জন্য নহে; বুঝিলাম যে চরিত্রই ইহলোকে সর্ব্বোত্তম। কিন্তু গৃহে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিলে জীবনে কখনও চরিত্রবান হইতে পারিব না; অতএব অদ্যই জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' অনন্তর রাজার অনুমতিক্রমে সেই ব্রাহ্মণ জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুরা তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যালাভ করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে ক্রমশ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তখন তিনি শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভগবন, আমি প্রব্রজ্যার সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।'

ব্রাহ্মণের অর্হত্ত্বলাভের কথা অচিরে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইল। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ অমুক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে রাজার উপস্থাপক ছিলেন; তিনি নিজের চরিত্রবল মীমাংসা করিতে গিয়া শেষে রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন।' তাঁহারা এইরূপে উক্ত ব্রাহ্মণের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, 'কেবল এই ব্রাহ্মণই যে নিজের মীমাংসাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে এইরূপ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি দানাদি সৎকার্য্য করিতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। এই জন্য রাজা অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। [এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে শুনিয়াছ, বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছিল।]

রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন পথে একস্থানে অহিতুণ্ডিকেরা সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং তাহারা একটা সর্পের লাঙ্গুল ও গ্রীবা ধরিয়া নিজেদের গ্রীবাদেশে জড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বাপু সকল, সাপটাকে এমন করিয়া ধরিও না, নিজেদের গলাতেও জড়াইও না; কি জানি কখন হঠাৎ তোমাদিগকে দংশন করিবে; তাহা হইলে তোমরা মারা যাইবে।' অহিতুণ্ডিকেরা বলিল, 'ঠাকুর, আমাদের সর্প শীলবান ও আচারসম্পন্ন, তোমার ন্যায় দুঃশীল নহে। তুমি দুঃশীলতাবশত রাজার ধন অপহরণ করিয়াছ এবং সেই জন্য ইহারা তোমাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে।'

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'সর্পেও যদি দংশন বা আঘাত না করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে শীলবান বলে; মানুষের ত কথাই নাই। ইহলোকে শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না।'

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট নীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্রগণ, এ কি ব্যাপার?' রাজপুরুষেরা বলিল, 'মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ রাজভাণ্ডার হইতে ধন অপহরণ করিয়াছে।' রাজা বলিলেন, 'যাও, ইহাকে লইয়া উপযুক্ত শাস্তি দাও।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি চোর নহি।' 'তবে কার্ষাপণ গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?' বোধিসত্ত্বও এই ব্রাহ্মণের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, 'অতএব বুঝিলাম জগতে শীলই সর্ব্বোকৃষ্ট; শীলের তুল্য আর কিছুই নাই। যাহাই হউক, যখন সর্পেও দংশন না করিলে 'শীলবান' এই বিশেষণে ভূষিত হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শীলই সর্ব্বোকৃষ্ট গুণ। 'অনন্তর তিনি শীলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

> কায়মনোবাক্যে শীল-অনুষ্ঠান অশেষ কল্যাণকর;
> শীলসম গুণ নাহি ত্রিভুবনে; হও সদা শীলপর।
> এই বিষধর, মৃত্যুর কিঙ্কর, দেখিলে তরাস পাই;
> তথাপি ইহারে শীলবান দেখি নাহি বধে কেহ তাই।

বোধিসত্ত্ব এই গাথাদ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট

সমাপত্তির অধিকারী হইলেন এবং তাহার বলে ব্রহ্মলোকবাসের সামর্থ্য লাভ করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন আমার শিষ্যেরা ছিল সেই রাজপুরুষগণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

---

৮৭. মঙ্গল-জাতক

[রাজগৃহবাসী একজন ব্রাহ্মণ কোন বস্ত্র পরিধান করিলে মঙ্গল হয়, কোন বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।[১] তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে যে এই ব্রাহ্মণ প্রচুর বিভবসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি রত্নত্রয়ে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে মিথ্যামত পোষণ করিতেন এবং নিমিত্তসম্বন্ধে সাতিশয় কৌতূহলপরায়ণ ছিলেন। একবার একটা ইন্দুর তাঁহার পেটিকাভ্যন্তরস্থ বস্ত্রযুগল কাটিয়াছিল। একদিন তিনি স্নানান্তে ঐ বস্ত্রযুগল আনয়ন করিতে বলিলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে সেই কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মূষিকদষ্ট বস্ত্র গৃহে থাকিলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। অমঙ্গল দ্রব্য কালকর্ণীসদৃশ; ইহা নিজের পুত্র, কন্যা কিংবা দাসদাসীগিকেও দিতে পারি না, কারণ যে ইহা পরিধান করিবে, সে নিজেও মারা যাইবে, অন্যেরও মৃত্যু ঘটাইবে। অতএব ইহা আমকশ্মশানে নিক্ষেপ করা যাউক। কিন্তু নিক্ষেপই বা করা যায় কিরূপে? দাসদাসীদিগের হাতে দিতে পারি না, কারণ তাহারা হয়ত লোভবশে নিজেরাই রাখিয়া দিবে এবং নিজেদের ও আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। অতএব পুত্রের হাত দিয়াই নিক্ষেপ করাই। ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন, 'তুমি ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিও না, যষ্টির অগ্রে করিয়া লইয়া যাও এবং শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া ফিরিয়া আইস।'

সেই দিন শাস্তা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ত্রিভুবনে কে কোথায় সত্যপথে চলিবার উপযুক্ত হইয়াছে ইহা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে স্রোতাপত্তি-ফল লাভের সময় সমুপাগত। তখন তিনি মৃগয়াগমনোদ্যত ব্যাধবেশ ধারণপূর্ব্বক আমকশ্মশানে

---

[১]। মূলে 'সাটকলক্ষণ' এই পদ আছে।

গমন করিলেন এবং উহার দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ হইতে বুদ্ধত্ত্বব্যঞ্জক ষড়বিধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে ব্রাহ্মণপুত্র তাহার পিতা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে উক্ত বস্ত্রযুগল যষ্টির অগ্রে বহন করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল—তাহার সতর্কতা দেখিয়া মনে হইল যেন সে দুর্লক্ষণ বস্ত্র আনে নাই, গৃহবাসী কালসর্প লইয়া আসিয়াছে।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে মাণবক! কি করিতেছ?' ব্রাহ্মণপুত্র বলিল, 'ওহে গৌতম,[১] এই বস্ত্রযুগল মূষিকদষ্ট হওয়াতে কালকর্ণী-সদৃশ হইয়াছে; ইহা হলাহলের ন্যায় পরিত্যাজ্য। ভৃত্যদিগকে বলিলে পাছে তাহারা লোভপরবশ হইয়া আত্মসাৎ করে, কাজেই ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য পিতা আমাকেই পাঠাইয়াছেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি বস্ত্র ফেলিয়া দিবার পর অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিব। সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি।' শাস্তা বলিলেন, 'বেশ, এখন তবে ফেলিয়া দাও।' এই শুনিয়া ব্রাহ্মণপুত্র সেই বস্ত্রযুগল ফেলিয়া দিল। 'ইহা তবে এখন আমার হইল' এই বলিয়া শাস্তা ব্রাহ্মণপুত্রের সাক্ষাতেই সেই অমঙ্গলকর বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিলেন। 'উহা কালকর্ণী সদৃশ, উহা স্পর্শ করিও না' বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার কত নিষেধ করিল; কিন্তু শাস্তা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বেণুবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার ছুটিয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, 'বাবা, আমি আমকশ্মশানে বস্ত্রযুগল নিক্ষেপ করিলে শ্রমণ গৌতম, 'বা, এ বস্ত্র এখন আমার হইল' বলিয়া উহা তুলিয়া লইয়া বেণুবনে চলিয়া গেলেন। আমি বারণ করিলাম; কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এই বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক এবং কালকর্ণীসদৃশ; উহা পরিধান করিলে শ্রমণ গৌতমেরও বিনাশ ঘটিবে। তাহা হইলে আমার অযশ হইবে। আমি তাহাকে অন্য বহু বস্ত্র দান করিয়া এই বস্ত্র পরিত্যাগ করাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বহু বস্ত্র সঙ্গে লইয়া সপুত্র বেণুবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে অবলোকন করিয়া একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ গৌতম, তুমি আমকশ্মশান হইতে বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়াছ এ কথা সত্য কি?' 'হাঁ, এ কথা সত্য।' 'শুন, গৌতম, এ বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক। ইহা ব্যবহার করিলে তুমি নিজেও মারা যাইবে; বিহারবাসী অপর সকলেরও মৃত্যু ঘটিবে। যদি তোমার অন্তর্ব্বাস বা বহির্ব্বাসের অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া ঐ দুর্লক্ষণ বস্ত্র ত্যাগ কর।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আমি প্রব্রাজক; আমকশ্মশানে, হাটে বাজারে, আবর্জ্জনা-

---

[১]। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে 'ভগবন্' এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন না করিয়া, 'ভো গৌতম' এই সাধারণ সম্বোধন-পদে অভিভাষণ করিতেন।

স্তূপে, স্নানতীর্থে, রাজপথে বা তদ্রূপস্থানে পরিত্যক্ত চীবরখণ্ডই আমার উপযুক্ত পরিচ্ছদ। তুমি দেখিতেছি পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও কুসংস্কারজালে আবদ্ধ রহিয়াছ।' অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সেইসময়ে বোধিসত্ত্ব এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পর ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করেন এবং হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তিনি একদা হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া রাজগৃহের পুরোবর্ত্তী রাজ্যোদ্যানে উপনীত হইলেন এবং দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আসন ও ভোজ্য দিয়া তাঁহা-দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে অতঃপর তিনি ঐ উদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আহার এবং রাজ্যোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

তখন রাজগৃহে দুস্‌সলক্ষণ।[১] নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তোমার বস্ত্রযুগল-সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণের পেটিকাস্থিত বস্ত্রযুগলেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপুত্র যখন শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব শ্মশানদ্বারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণপুত্র গিয়া বস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনি উহা গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পিতাকে এই কথা জানাইলে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, 'রাজার প্রিয়পাত্র এই তপস্বী এবার বিনষ্ট হইবে।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন, 'তপস্বিন, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে এখনই ঐ বস্ত্র পরিত্যাগ করুন।' তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'শ্মশানচীবরই আমাদের পরিধেয়। আমরা নিমিত্তে বিশ্বাস করি না; নিমিত্তে আস্থা স্থাপন করা বুদ্ধ, প্রত্যেক-বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের অনুমোদিত নহে। এই নিমিত্ত সুধীগণও বিশ্বাস করেন না।' বোধিসত্ত্ব এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছিলেন; তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজের ভ্রম-পূর্ণ সংস্কার ছিন্ন করিয়া বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

---

[১]। পালিভাষায় দুস্‌স শব্দের অর্থ বস্ত্র।

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ বিচারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে নাক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার জালে ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।
না পারে তাঁহারে স্পর্শিতে কখন যমজ যে সব পাপ;[১]
পুনর্জন্ম তাঁর কভু নাহি হয় ভুঞ্জিতে ত্রিবিধ তাপ।

* * *

শাস্তা উক্ত গাথাদ্বারা ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতাপুত্র ছিল সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

---

৮৮. সারম্ভ-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে রূঢ়বাক্য প্রয়োগের অনৌচিত্য-শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু নন্দিবিলাস জাতকের (২৮) বস্তুসদৃশ; প্রভেদের মধ্যে এই যে এই জাতকে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যের অন্তঃপাতী তক্ষশিলা নগরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সারম্ভ নামক বলীবর্দ্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতীত বস্তু বলিবার পর শাস্তা এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

মিষ্টবাক্যে তুষ্ট কর সকলের মন,
ভ্রমেও বলোনা কভু অপ্রিয় বচন।
মিষ্ট ভাষে অনায়াসে পরচিত্ত হরে,
পরুষে অশেষ ক্লেশ আনয়ন করে।

* * *

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ, উৎপলবর্ণা ছিল তাহার পত্নী এবং আমি ছিলাম সারম্ভ।]

---

[১]। যমজ পাপ, যথা, ক্রোধ ও হিংসা, ম্রক্ষা (আত্মদোষগোপন) ও প্রলাপ। ইহাদের একটীর উৎপত্তি হইলেই অপরটী আসিয়া দেখা দেয়।

৮৯. কুহক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ধূর্ত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার ধূর্ত্ততাসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে।]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে এক জটাধারী ধূর্ত্ত তপস্বী বাস করিত। ঐ গ্রামের এক ভূম্যধিকারী তাহার বাসের জন্য বনমধ্যে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার আহারের জন্য নিজের গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য যোগাইতেন। ভূস্বামীর প্রতীতি হইয়াছিল ঐ ভণ্ড তপস্বী পরম শীলবান; সেই নিমিত্ত তিনি দস্যুভয়ে একশত সুবর্ণমুদ্রা উক্ত পর্ণশালার ভূগর্ভে প্রোথিত করিলেন এবং তপস্বীকে বলিলেন, 'প্রভু, আপনি এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।' তপস্বী বলিল, 'বৎস, আমরা প্রব্রাজক; আমাদিগকে আবার এ কথা বলিতে হইবে কেন? পরের দ্রব্যে আমাদের কখনও লোভ জন্মে না।' ভূস্বামী তপস্বীর কথা বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাকে সাধুবাদ দিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তখন ধূর্ত্ত তপস্বী ভাবিতে লাগিলেন, 'এই সুবর্ণে একজনের সমস্ত জীবনের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হইতে পারে।' অনন্তর কয়েকদিন পরে সে উহা তুলিয়া লইয়া পথপার্শ্বে একস্থানে পুতিয়া রাখিল এবং পর্ণশালায় গিয়া পূর্ব্ববৎ বাস করিতে লাগিল। পরদিন ভূস্বামীর গৃহে অন্নাহার করিয়া তপস্বী বলিল, 'বৎস, আমি দীর্ঘকাল তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। বহুদিন একস্থানে অবস্থিতি করিলেই মনুষ্যের সংসর্গে আসিতে হয়, কিন্তু মনুষ্যসংসর্গ প্রব্রাজকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব আমি অন্যত্র গমন করিব।' ভূস্বামী তাহাকে থাকিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, 'প্রভু, যদি নিতান্তই থাকিতে চান না, তবে অভীষ্ট স্থানে গমন করুন।' অনন্তর তিনি গ্রামদ্বার পর্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া তপস্বী ভাবিল, 'এই ভূস্বামীকে প্রবঞ্চিত করা যাউক।' তখন সে জটার মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া ভূস্বামীর গৃহে ফিরিয়া গেল। ভূস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ফিরিলেন কেন? 'বৎস, তোমার চালের একগাছা খড় আমার জটায় লাগিয়া রহিয়াছে। প্রব্রাজকদিগের পক্ষে অদত্তাদান নিষিদ্ধ; সেইজন্য তোমাকে সেই খড়গাছটী দিতে আসিলাম।' ভূস্বামী বলিলেন 'খড় গাছটা ফেলিয়া দিয়া যান।' তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো! আর্য্যের কি সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান! পরের দ্রব্য বলিয়া ইনি কুটা গাছটী পর্য্যন্ত স্পর্শ

করেন না!’ তিনি তপস্বীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। এই সময়ে ঘটনাক্রমে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়া সেই গ্রামেই বাসা লইয়াছিলেন। তপস্বীর কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে ধূর্ত্ত নিশ্চিত ভূস্বামীর কিছু অপহরণ করিয়াছে। তিনি ভূস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভদ্র, তুমি এই তপস্বীর নিকট কখনও কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছিলে কি? ‘হাঁ মহাশয়, ইঁহার নিকট আমার একশত সুবর্ণ মুদ্রা ছিল।’ ‘তবে এখনই গিয়া তাহা লইয়া আইস।’ ভূস্বামী পর্ণশালায় গিয়া দেখেন সেখানে সুবর্ণ নাই। তিনি দ্রুতবেগে বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, ‘না মহাশয়, সেখানে সুবর্ণ পাইলাম না।’ ‘তোমার সুবর্ণ অন্যে লয় নাই, সেই ধূর্ত্ত তপস্বীই লইয়াছে। চল, তাহাকে অনুধাবন করিয়া ধরি।’ অনন্তর তাঁহারা বেগে ছুটিয়া গেলেন এবং ভণ্ডকে ধরিয়া লাথি ও কিলের চোটে সুবর্ণ আদায় করিলেন। সুবর্ণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ‘তাইত, একশত সুবর্ণ মুদ্রা হরণ করিতে পারিলে, অথচ তৃণমাত্র লইলে পাপ হইবে ভাবিলে?’ অনন্তর তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

অতীব বিশ্বাসযোগ্য বলেছিলে কথা,
অদত্ত-গ্রহণ নহে প্রব্রাজক-প্রথা!
পাপভয়ে তৃণমাত্র পরশ না কর;
তবে কোন যুক্তি বলে শতমুদ্রা হর?

এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই কূটতপস্বীকে বলিলেন, ‘সাবধান, আর কখনও এমন ধূর্ত্ততা করিও না।’ ইহার পর বোধিসত্ত্ব যথাকালে কর্ম্মফলভোগার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, এখন দেখিতে পাইতেছ এই ভিক্ষু এখনও যেমন ধূর্ত্ত, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ ছিল।

সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

---

৯০. অকৃতজ্ঞ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রত্যন্তবাসী এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরস্পর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী একদা স্থানীয় পণ্যে

পঞ্চশত শকট বোঝাই করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এই পণ্য লইয়া শ্রাবস্তী নগরে যাও। সেখানে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সাক্ষাতে ইহা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য লইয়া আসিবে।' তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশানুসারে শ্রাবস্তীতে গিয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা করিল এবং যথারীতি উপঢৌকন দিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য জানাইল। মহাশ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'এস, এস, পথে ত কোন কষ্ট হয় নাই? আমার বন্ধু ত ভাল আছেন?' অনন্তর তিনি তাহাদিগের বাসের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, আহারাদির ব্যয় দিলেন এবং তাহাদিগের পণ্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য দেওয়াইলেন। তাহারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিরিয়া গেল এবং নিজেদের প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

ইহার কিয়দ্দিন পরে অনাথপিণ্ডদও সেই প্রদেশে পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সেখানে গিয়া উপঢৌকন লইয়া সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোথা হইতে আসিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা শ্রাবস্তী হইতে আসিতেছি। আপনার বন্ধু অনাথপিণ্ডদ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।' তাহা শুনিয়া তিনি পরিহাস-সহকারে বলিলেন, 'অনাথপিণ্ডদ নাম ত যার ইচ্ছা সেই গ্রহণ করিতে পারে।' তিনি উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে বাসস্থান বা আহারাদির ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। কাজেই তাহারা আপনারা যেরূপ পারিল সেইরূপে পণ্য বিক্রয় করিল এবং অন্য পণ্য ক্রয়পূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া মহাশ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অতঃপর প্রত্যন্তবাসী সেই শ্রেষ্ঠী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পঞ্চশত পণ্যপূর্ণশকট শ্রাবস্তীনগরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা উপঢৌকন লইয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু অনাথপিণ্ডদের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'দেখিব, আমাদের প্রভু কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাসস্থান ও ভোজনাদির ব্যয় দেন।' তাহারা আগন্তুকদিগকে নগরের বহির্ভাগে লইয়া গেল এবং মনোমত একটী স্থান দেখাইয়া বলিল, 'তোমরা এখানে গাড়ী খুলিয়া দাও; আমাদের প্রভু গৃহ হইতে তোমাদের আহারের জন্য অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অর্থ আসিবে।' অনন্তর মধ্যমরাত্রিকালে তাহারা অনেক দাস ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ঐ পঞ্চশত শকট লুণ্ঠন করিল, আগন্তুকদিগের বস্ত্রাবরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল, বলদগুলি তাড়াইয়া দিল। শকট চক্রগুলি খুলিয়া ফেলিল এবং শকটগুলি ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। প্রত্যন্তবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দ্রুতবেগে স্বদেশে পলায়ন করিল। তখন অনাথপিণ্ডদের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। অনাথপিণ্ডদ

ভাবিলেন, 'এই অপূর্ব্ব কথা শাস্তাকে উপহার দিতে হইবে।' তিনি শাস্তার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা আমূল নিবেদন করিলেন।

তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী যে এখনই এরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছিলেন।' অনন্তর মহাশ্রেষ্ঠীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ নগরে একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহারও প্রত্যন্ত প্রদেশে একজন শ্রেষ্ঠীবন্ধু ছিলেন; কিন্তু উক্ত বন্ধুর সহিত কখনও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। [প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ ঘটিয়াছিল বলা হইল, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল]।

বোধিসত্ত্বের লোকেরা, যখন তাঁহাকে আপনারা যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল, তখন তিনি বলিলেন, 'ইহারা পূর্ব্বকৃত উপকার ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই এরূপ প্রতিফল পাইয়াছে।' অনন্তর তিনি সমবেত জনসমূহকে এই গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :

অন্যকৃত উপকার করিয়া স্মরণ
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে যেজন,
পুনর্ব্বার অকুশল দেখা দেয় যবে
পায় না সে সহায়ক কুত্রাপি এ ভবে।

* * *

[সমবধান—বর্ত্তমান সময়ের এই প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠী ছিল অতীতকালের সেই মহাশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

---

৯১. লিপ্ত-জাতক

[সম্যক বিবেচনা না করিয়া কোন দ্রব্যভোগ-সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সে সময়ে নাকি ভিক্ষুগণ উপাসকপ্রদত্ত বহু চীবরাদি পাইয়া তৎসমস্ত যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতেন। নিরঙ্কুশভাবে উপকরণচতুষ্টয় সম্ভোগ করায় তাঁহারা নিরয়গমন বা তির্য্যগযোনি-প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেন না।

তাহা দেখিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগকে নানা পর্য্যায় ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং অসংযতভাবে দ্রব্যসম্ভোগের দোষ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা চতুর্ব্বিধ উপকরণ পাইয়া তাহা যদি নিতান্ত অবিবেচনার সহিত পরিভোগ করে, তবে বড় অন্যায় হয়। অতএব এখন হইতে সম্যক বিবেচনাসহকারে ঐ সমস্ত পরিভোগ করিবে।' অনন্তর তিনি পরিভোগ-সম্বন্ধে এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন, সুবিবেচক ভিক্ষু যখন চীবর ব্যবহার করিবেন, তখন তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে—ঐ উদ্দেশ্য শীত নিবারণ। এইরূপ অন্যান্য উপকরণ সম্বন্ধেও নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপকরণ চারিটার পরিভোগ সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা বলিলাম; তাহাদিগকে সম্যগবিবেচনা না করিয়া পরিভোগ করাও যে কথা, হলাহল সেবন করাও সেই কথা। পুরাকালে অসমীক্ষাকারীরা না জানিয়া বিষ গ্রহণ করিয়া পরিণামে মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন সঙ্গতিপন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সাতিশয় দ্যূতপরায়ণ হইয়াছিলেন। একজন অক্ষধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বের সহিত খেলা করিত। সে যতক্ষণ জয়লাভ করিত ততক্ষণ ক্রীড়া ভঙ্গ করিত না, কিন্তু পরাজয় আরম্ভ হইলেই একখানি অক্ষ মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিত, 'একখানা পাশ্‌টী যে পাওয়া যাইতেছে না।' ইহা বলিয়া সে খেলা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইত। বোধিসত্ত্ব তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা দেখিতেছি, তোমার ধূর্ত্ততা ঘুচাইতে পারি কি না।' তিনি পাশ্‌টী গুলি নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং হলাহল দ্বারা লিপ্ত করিলেন। অনন্তর সেগুলি বার বার শুকাইয়া ঐ ধূর্ত্তের নিকট গিয়া বলিলেন, 'এস ভাই, পাশা খেলি।' সে বলিল, 'আচ্ছা ভাই' এবং তখনই দ্যূতফলক সাজাইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল; কিন্তু যেমন তাহার পরাজয় আরম্ভ হইল এমনি একখানি পাশ্‌টী মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, 'গিলিয়া ফেল; শীঘ্রই টের পাইবে এ কি জিনিস।' অনন্তর তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

হলাহল লিপ্ত এই অক্ষ তুই মুখে দিলি,
গিলিলে যে ফল হবে কিন্তু তাহা না বুঝিলি!
এখনি গিলিয়া ফেল, বুঝিবিরে ক্ষণপরে
কত উগ্র হলাহল পশিয়াছে ধূর্ত্তোদরে।

বোধিসত্ত্বের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই ধূর্ত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইল; তাহার চক্ষু দুইটী ঘুরিতে লাগিল, ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সে ভূতলে পড়িয়া গেল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন লোকটার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি তাহাকে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইলেন এবং বমন করাইয়া ঘৃত, মধু, শর্করা প্রভৃতি একত্র মিশাইয়া খাইতে দিলেন। এই উপায়ে সে আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন আর কখনও এরূপ ধূর্ত্ততা না করে। বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

* * *

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনের পর বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, সম্যক বিবেচনা না করিয়া উপকরণ পরিভোগ এবং না বুঝিয়া বিষ-সেবন একইরূপ।'

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান অক্ষক্রীড়ক।

☞ সমবধানে ধূর্ত্ত অক্ষক্রীড়কের উল্লেখ নাই, কারণ তৎসময়ে তাহার স্থানীয় কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল না।]

---

৯২. মহাসার-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে আয়ুষ্মান আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীগণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 'আহা! আমাদের কি দূরদৃষ্ট। জগতের বুদ্ধের আবির্ভাব সুদুর্লভ, পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন[২] মানবজন্মও দুর্লভ। এখন বুদ্ধ দেখা দিয়াছেন, আমরাও মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ ইচ্ছামত বিহারে যাইতে পারি না, ধর্ম্মকথা শুনিতে পাই না, ভগবানকে বন্দনা করিতে পারি না, দানাদি ব্রতানুষ্ঠানেরও অবসর পাই না। আমরা যেন মঞ্জুষায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছি। চল আমরা রাজার নিকট বলি, তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ভিক্ষু আনয়ন করুন। আমরা তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিব; তাহা হইলে আমাদের এই শুভযোগে জন্মগ্রহণ

---

[১]। মহাসার—মহামূল্য।

[২]। মূলে 'পরিপুণ্ণায়তনা' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ দর্শনে আয়তন বারটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন এই ছয়টী আধ্যাত্মিক আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই ছয়টী বহিরায়তন। মনুষ্যজন্মেই এই দ্বাদশ আয়তনের পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

সফল হইবে।' অনন্তর তাঁহারা সকলে রাজার নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন, রাজাও 'উত্তম কথা' বলিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

এই সময়ে একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার অভিলাষ করিলেন। তিনি উদ্যানপালককে ডাকাইয়া বলিলেন, উদ্যান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন কর।

উদ্যানপালক উদ্যান পরিষ্কৃত করিবার সময় দেখিতে পাইল, শাস্তা একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। সে তখনই রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, উদ্যান পরিষ্কৃত করা হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ভগবান একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন।' রাজা বলিলেন, 'সে ত আরও উত্তম হইয়াছে; শাস্তার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইব।' তিনি অলঙ্কৃত রথারোহণে উদ্যানে গমন করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ছত্রপাণি নামক এক অনাগামী উপাসক শাস্তার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। উপাসককে দেখিয়া রাজা ক্ষণকাল অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিলেন, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পাপকর্ম্মা নহে, কারণ পাপকর্ম্মা হইলে কখনও শাস্তার নিকট বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত না।' অতএব দ্বিধাবোধ না করিয়া তিনি শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অসঙ্গত মনে করিয়া উপাসক রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডয়মান হইলেন না, তাঁহাকে অভিবাদনও করিলেন না। ইহাতে রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া শাস্তা উপাসকের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, এই উপাসক সুপণ্ডিত, আগমবিশারদ[১] এবং বিষয়বিবিক্ত।' ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন শাস্তা যখন ইঁহার এত প্রশংসা করিতেছেন, তখন ইনি নিশ্চিত একজন অসাধারণ ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন, 'উপাসক, আপনার যদি কোন অভাব থাকে ত আমায় বলুন।' উপাসক রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, 'না মহারাজ, আমার কোন অভাব নাই।' ইহার পর রাজা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজা দেখিতে পাইলেন, সেই উপাসক প্রাতরাশান্তে ছত্রহস্তে জেতবনাভিমুখে যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, শুনিয়াছি আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। আমার অন্তঃপুরবাসিনীরা ধর্ম্মকথা শুনিবার ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। আপনি যদি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা হইলে আমি বড় প্রীত হই।' উপাসক কহিলেন,

---

[১]। আগম—বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র।

'গৃহিগণ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মোদেশন করিবেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ কার্য্যে আর্য্যাদিগেরই[১] অধিকার।'

রাজা দেখিলেন উপাসক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে বিদায় দিয়া রাণীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দেখ তোমাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইবার এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তার নিকট গিয়া একজন ভিক্ষু প্রার্থনা করিব। সেখানে অশীতিজন মহাশ্রাবক আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে প্রার্থনা করিব বল।' রাণীরা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'আপনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে[২] আনয়ন করুন।

রাজা শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'ভগবন, আমার অন্তঃপুরচারিনীগণ স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। তিনি যদি আমার গৃহে ধর্ম্মোদেশন করেন, তাহা হইলে বড় উত্তম হয়।' শাস্তা ইহাতে সম্মত হইয়া আনন্দকে অনুমতি দিলেন। তদবধি রাজমহিলারা স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে, ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন রাজার চূড়ামণি হারাইয়া গেল। মণিহরণ-বার্ত্তা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'যাহারা অন্তঃপুরে যায় তাহাদের সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া মণি উদ্ধার কর!' এই আদেশ পাইয়া অমাত্যগণ স্ত্রীপুরুষ যাহাকে পাইলেন ধরিয়া মণির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সকলে জ্বালাতন হইল কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। সেইদিন আনন্দ রাজভবনে গিয়া দেখিলেন রমণীদিগের বিষণ্ন ভাব। অন্যদিন স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহারা কত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন; কিন্তু আজ কেহই সেরূপ করিতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অদ্য আপনাদিগকে এরূপ দেখিতেছি কেন?' তাঁহারা বলিলেন, 'মহাশয়, মহারাজের চূড়ামণি অপহৃত হইয়াছে; অমাত্যগণ সে জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, সমস্ত অন্তঃপুর মথিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের ভাগ্যেই বা কি ঘটে ইহা ভাবিয়া আমরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছি।' আনন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।'

অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনার মণি নাকি অপহৃত হইয়াছে?' রাজা বলিলেন, 'হাঁ, মহাশয়।' 'উহা কি পাওয়া যাইবে না বোধহয়?' 'মহাশয়, অন্তঃপুরের

---

[১]। আর্য্য—ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাহারা সাধুতার উচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন।

[২]। বৌদ্ধশাসনে নারীজাতির অধিকার প্রধানত আনন্দের চেষ্টাসম্ভূত। তাঁহারই অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

সমস্ত লোক আবদ্ধ করিয়া পীড়ন করা হইতেছে, তথাপি পাওয়া যায় নাই।' 'মহারাজ, কাহারও পীড়ন না করিয়াও ইহার পুনঃপ্রাপ্তির একটী উপায় আছে।' 'কি উপায়, মহাশয়?' 'মহারাজ, যে যে ব্যক্তির প্রতি আপনার সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক একটী পলালপিণ্ড[১] বা মৃৎপিণ্ড দিন, এবং বলুন যে তাহারা যেন প্রত্যুষে সে সমস্ত অমুক স্থানে রাখিয়া দেয়। যে মণি চুরি করিয়াছে সে উহা ঐ পিণ্ডের মধ্যে রাখিয়া আনয়ন করিবে। সে যদি প্রথম দিবসেই মণি আনিয়া দেয় ভাল; নচেৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসেও এই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক লোক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবে, আপনিও মণি পাইবেন।' রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্থবির প্রস্থান করিলেন।

আনন্দের উপদেশানুসারে রাজ্য উপর্য্যুপরি তিন দিন পিণ্ড বিতরণ করিলেন; কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবসে আনন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কেমন মহারাজ, মণি পাইয়াছেন কি?' 'না মহাশয়, এখনও পাওয়া যায় নাই।' 'তবে মহাপ্রাঙ্গণের এক নিভৃত অংশে জলপূর্ণ এক বৃহৎ ভাণ্ড রাখিয়া উহার সম্মুখে পর্দ্দা খাটাইয়া দিন, এবং আদেশ করুন যে অন্তঃপুরচর স্ত্রীপুরুষ উত্তরীয় বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক একে একে পর্দ্দার ভিতর যাইয়া হাত ধুইয়া আসুক।' এই পরামর্শ দিয়া স্থবির সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন। রাজাও তাহাই করিলেন।

তখন মণিচোর ভাবিতে লাগিলেন—'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক এই ব্যাপার লইয়া যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে মণি না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনই নিরস্ত হইবেন না; অতএব আর গোল না বাড়াইয়া মণি ফিরাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া সে বস্ত্রের অভ্যন্তরে মণি লুক্কায়িত রাখিয়া পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল এবং উহা জলভাণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে আসিল। অনন্তর সকলে চলিয়া যাইবার পর ভাণ্ডস্থ জল ঢালিয়া ফেলিয়া মণি পাওয়া গেল। স্থবিরের পরামর্শে কাহারও পীড়ন না করিয়া মণির উদ্ধার হইল দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অন্তঃপুরের লোকেও আহ্লাদে বলিতে লাগিলেন, 'স্থবিরের কৃপাতেই আমরা মহাদুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলাম।'

আনন্দের অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজা অপহৃত মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন, অচিরে এই কথা নগরে ও ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'স্থবির আনন্দ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও উপায়কুশল; সেই জন্যই বহুলোকে পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, রাজাও তাঁহার নষ্টমণি ফিরিয়া পাইয়াছেন।' এই সময়ে

[১]। পলালপিণ্ড অর্থাৎ খড়ের গুলি।

শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আজ তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?' ভিক্ষুরা বলিলেন, 'স্থবির আনন্দের বিষয়।' তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পরহস্তগত ধন যে এই প্রথম পাওয়া গেল এবং আনন্দই যে একা ইহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা নহে; অতীত কালেও পণ্ডিতেরা বহুলোককে পীড়ন হইতে অব্যাহতি দিয়া ইতরপ্রাণীর হস্তগত ধন বাহির করিয়াছিলেন।' অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন :

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া তাঁর অমাত্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। একদা রাজা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যান-বিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জলকেলি করিবার বাসনা হইল এবং তিনি মঙ্গল পুষ্করিণীতে অবতরণপূর্ব্বক রাণীদিগকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাণীরা আসিয়া স্ব স্ব মস্তক ও গ্রীবা হইতে আভরণ উন্মোচন এবং উত্তরীয় বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পেটিকার ভিতর রাখিলেন এবং সেই সমস্ত দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন।

এই সময়ে উদ্যানবাসিনী এক মর্কটী একটী বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। যখন অগ্রমহিষী আভরণ উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তখন সে তাহা দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইল মহিষীর মুক্তাহারটী নিজের গলায় পরে। এই নিমিত্ত সে, দাসী কখন অন্যমনস্কা হইবে, তাহা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দাসী প্রথমে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আভরণগুলি রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তন্দ্রাভিভূত হইয়া ঢুলিতে লাগিল। মর্কটী যেমন তাহার অনবধানভাব বুঝিতে পারিল, অমনি বায়ুবেগে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গজ মুক্তাহার গলায় পরিল, এবং বায়ুবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শাখার অন্তরালে বসিয়া রহিল। অনন্তর পাছে অন্য কোন মর্কট দেখিতে পায় এই আশঙ্কায়, সে হারগাছটী তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিল, এবং মুখখানি এমন করিয়া সেখানে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে সে এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে?

এদিকে দাসীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল হার নাই। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ? চোরে মহিষীর মুক্তামালা লইয়া পলাইয়া গেল।' এই কথা শুনিয়া চারিদিক হইতে প্রহরীগণ ছুটিয়া আসিল এবং দাসীর কথামত রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা বলিলেন, 'চোর ধর।' তদনুসারে প্রহরীরা উদ্যান হইতে বাহির হইল এবং 'চোর ধর' 'চোর ধর' বলিয়া ইতস্তত অবলোকন

করিতে লাগিল। এই সময় এক জনপদবাসী কর দিতে আসিয়াছিল; সে গণ্ডগোল শুনিয়া ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রহরীরা মনে করিল, এই লোকটাই চোর। তখন তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং প্রহার করিতে করিতে বিদ্রূপসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরে ধূর্ত্ত চোর, তুই এমন মূল্যবান হার চুরি করিলি কেন?'

জনপদবাসী ভাবিল, 'আমি যদি বলি চুরি করি নাই, তাহা হইলে আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না; ইহারা প্রহার করিতে করিতেই আমায় মারিয়া ফেলিবে। অতএব চুরি করিয়াছি বলিয়া অপরাধ স্বীকার করাই ভাল।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, 'আমিই হার চুরি করিয়াছি বটে।' তখন প্রহরীরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ঐ মহামূল্য হার অপহরণ করিয়াছ?' 'হাঁ, মহারাজ।' 'হার কোথায়?' 'দোহাই মহারাজ! আমি বড় গরীব, হারই বলুন, আর খাটপালঙ্গই বলুন, আমার বাবার বয়সেও কখনও এসব জিনিষ দেখি নাই। শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলিলেন, 'হারগাছটা আনিয়া দে; তাই আমি উহা লইয়া তাঁহাকে দিয়াছি। উহা এখন কোথায় আছে তিনিই বলিতে পারেন, আমি জানি না।' তখন রাজা শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই ব্যক্তির হস্ত হইতে হার গ্রহণ করিয়াছ কি?' 'হাঁ, মহারাজ!' 'হার কোথায়?' 'পুরোহিত মহাশয়কে দিয়াছি।' অনন্তর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'গন্ধর্ব্বকে দিয়াছি' এবং গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'পুরোহিত মহাশয় হার দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি উহা প্রণয়োপহারস্বরূপ অমুক বারবিলাসিনীকে দান করিয়াছি।' তখন সেই বারবিলাসিনীকে আনয়ন করা হইল। সে কিন্তু বলিল, 'আমি কোন হার পাই নাই।'

এই পাঁচটী লোককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত হইল। তখন রাজা বলিলেন, 'অদ্য আর সময় নাই; কল্য দেখা যাইবে।' অনন্তর তিনি বন্দীদিগকে জনৈক অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'হার হারাইল উদ্যানের অভ্যন্তরে, জনপদবাসী ছিল উদ্যানের বাহিরে। উদ্যানদ্বারে বহু প্রহরী আছে। কাজেই ভিতর হইতে কেহ যে হার লইয়া বাহিরে পলায়ন করিয়াছে তাহা অসম্ভব। ফলত ভিতর হইতেই হউক কিংবা বাহির হইতেই হউক, হার চুরি যাইবার উপায় দেখা যায় না। তবে যে এই হতভাগ্য জনপদবাসী বলিতেছে যে হার চুরি করিয়া শ্রেষ্ঠীকে দিয়াছি, তাহা কেবল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য; শ্রেষ্ঠী ভাবিয়াছেন পুরোহিতকে জড়াইতে পারিলে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন; তাই তিনি পুরোহিতের নাম করিয়াছেন। কারাগৃহে গন্ধর্ব্বকে লইতে পারিলে আমোদ

প্রমোদের সুবিধা হইবে, সেইজন্য পুরোহিত মহাশয় গন্ধর্ব্বকেও ইহার মধ্যে ফেলিয়াছেন; আর বারবনিতা সঙ্গে থাকিলে কারাযন্ত্রণার উপশম হইবে আশা করিয়া গন্ধর্ব্বও এই রমণীকে দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। আমার অনুমান হয় এই পাঁচ জনের একজনও চোর নহে; উদ্যানে বহু মর্কট বাস করে; তাহাদের মধ্যে কোন মর্কটই এ কাজ করিয়াছে।'

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, চোরদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমি নিজে তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।' রাজা বলিলেন, 'এ অতি উত্তম প্রস্তাব, পণ্ডিতবর! আপনি তাহাদিগের পরীক্ষা করুন।' তখন বোধিসত্ত্ব ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, 'বন্দী পাঁচজনকে একই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখ এবং চারিদিকে পাহারা দাও। তাহারা পরস্পর কে কি বলে কাণ পাতিয়া শুনিবে এবং আমায় জানাইবে।' ভৃত্যেরা আজ্ঞামত কার্য্য করিল।

বন্দীরা একত্র উপবেশন করিবার পর কথোপকথন আরম্ভ করিল। শ্রেষ্ঠী জনপদবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'অরে জনপদবাসী ধূর্ত্ত, তুই কি পূর্ব্বে কখনও আমায় দেখিয়াছিলি না আমি তোকে দেখিয়াছিলাম? তুই কখন হার দিলি বল?' সে কহিল, 'শেঠজি, মহামূল্য হার ত দূরের কথা, আমি ভাঙ্গা খাটিয়াখানা পর্য্যন্ত চক্ষে দেখি নাই। আপনার দোহাই দিয়া যদি বাঁচিতে পারি এই আশাতেই ও কথা বলিয়াছি।' তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠীন যে দ্রব্য তুমি নিজেই ইহার নিকট পাও নাই, তাহা আমায় দিয়াছ কি প্রকারে বলিলে?' শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, 'ভাবিলাম আমরা দুই জনেই যখন উচ্চপদস্থ লোক, তখন একসঙ্গে মিলিলে ও বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পথ হইতে পারে।' গন্ধর্ব্ব বলিল, 'ঠাকুর, তুমি তবে আমায় কখন হার দিয়েছিলে?' 'ওহে ভায়া, তোমায় এখানে আনিতে পারিলে সময়টা সুখে অতিবাহিত হইবে; তাই তোমায় জড়াইয়াছি।' সর্ব্বশেষে বারাঙ্গনা বলিল, 'তবেরে যে গন্ধর্ব্ব! তুই বা কখন আমার কাছে আসিয়াছিলি, আর আমিই বা কখন তোর কাছে গিয়াছিলাম, যে তুই বলিলি আমায় হার দিয়াছিস?' গন্ধর্ব্ব বলিলেন, 'এত রাগ কেন, ভাই? তুমি কাছে থাকিলে বেশ ঘরকন্না চলিবে, মনে কোন উদ্বেগ থাকিবে না, সময়টা সুখে কাটিবে, বোধ হইবে যেন বাড়ীতেই আছি; সেই জন্য তোমার নাম করিয়াছি।'

নিয়োজিত মনুষ্যদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত বুঝিলেন ইহারা চোর নহে, কোন মর্কটই হার লইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে মর্কট ঐ হার ফিরইয়া দেয়। তিনি পদ্মবীজ দ্বারা অনেকগুলি হার প্রস্তুত করাইলেন এবং কয়েকটী মর্কটী ধরাইয়া তাহাদের

কাহারও হাতে, কাহারও গলে সেইগুলি পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। যে মর্কটী মুক্তাহার অপহরণ করিয়াছিল, সে বৃক্ষে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতেছিল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ লোকদিগকে বলিলেন, 'তোমরা গিয়া বাগানের সমস্ত মর্কটীর উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং যাহার গলে মুক্তার হার দেখিতে পাইবে তাহাকে ভয় দেখাইয়া উহা লইয়া আসিবে।'

এদিকে, যে মর্কটীরা পদ্মবীজহার পাইয়াছিল তাহারা প্রহৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তাহারাপহারিণী মর্কটীর নিকট গিয়া বলিল, 'দেখত, আমরা কেমন অলঙ্কার পাইয়াছি।' ইহাদের আস্ফালন তাহার অসহ্য হইল; সে বলিল, 'ভারী ত হার! পদ্মবীজের হার পাইয়াই এত অহঙ্কার!' ইহা বলিয়া সে মুক্তার হার বাহির করিল। নিয়োজিত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়া করিল; মর্কটী ভয়ে হার ফেলিয়া পলাইয়া গেল; তাহারা উহা বোধিসত্ত্বকে আনিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব হার লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এই আপনার হার আনিয়াছি; এই পাঁচজন নিরপরাধ; উদ্যানের একটা মর্কটী ইহা চুরি করিয়াছিল।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'পণ্ডিতবর, মর্কটী যে হার লইয়াছিল তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন এবং কি উপায়েই বা ইহা প্রাপ্ত হইলেন?' তখন বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন, 'সংগ্রামের পুরোভাগেই বীরের প্রয়োজন।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের স্তুতিবাদ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

সংগ্রামে পুরোভাগে চাই মহাবীর;
মন্ত্রণায় যেই জন মন্ত্রণায় ধীর;
পানাশনোৎসবকালে তুষিবারে মন
নর্ম্মসচিবের শুধু হয় প্রয়োজন;
কিন্তু লভিবারে সুক্ষ্মবিচারের ফল
পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কেবল সম্বল।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা ও স্তুতি করিয়া, মহামেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে সেইরূপ, তাঁহার উপর সপ্তরত্ন বর্ষণপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং যাবজ্জীবন তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপুরঃসর কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

* * *

[শাস্তা উক্ত ধর্ম্মোপদেশনের পর স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিয়া এই জাতকের সমবধান করিলেন, তখন আনন্দ ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পণ্ডিতামাত্য।]

---

৯৩. বিশ্বাসভোজন-জাতক

[শুদ্ধ বিশ্বাসবলে অন্যপ্রদত্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, এই সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে তৎকালে প্রায় সমস্ত ভিক্ষুই জ্ঞাতিবন্ধুপ্রদত্ত বস্ত্রভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ উপকরণ[১] গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, 'ইহা আমার মাতা দিয়াছেন, ইহা ভ্রাতা দিয়াছেন, ইহা ভগিনী দিয়াছেন, ইহা খুড়া দিয়াছেন, ইহা খুড়ী দিয়াছেন, ইহা মামা দিয়াছেন, ইহা মামী দিয়াছেন। আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখনও ইহারা এই সকল দ্রব্য দিতেন, এখনও দিতেছেন; অতএব এ সমুদয় গ্রহণ করিতে বাধা কি?' ভিক্ষুদিগের এই আচরণ লক্ষ্য করিয়া শাস্তা দেখিলেন ইঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর তিনি সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ, জ্ঞাতি বন্ধুই হউক বা অপরেই হউক, কেহ উপহার দিলে তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করিতে হইবে; যদি তাহা গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে ভোগ করা যায়; কিন্তু যে বিবেচনা না করিয়া গ্রহণযোগ্য দ্রব্য ভোগ করে সে মৃত্যুর পর যক্ষ-প্রেতাদিরূপে পুনর্জন্মগ্রহণ করে। সম্যক বিবেচনা না করিয়া কোন বস্তু ভোগ এবং বিষপান উভয়ই একরূপ। বিশ্বাসী (পরিচিত) লোকেই দিউক, কিংবা অবিশ্বাসী (অপরিচিত) লোকেই দিউক, বিষ সকল অবস্থাতেই প্রাণহানিকর। পুরাকালেও কেহ কেহ আত্মীয়প্রদত্ত বিষপান করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। যখন মাঠে শস্য জন্মিত, তখন তাঁহার গোপালক সমস্ত গোপাল সঙ্গে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিত, সেখানে গোপল্লী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চরাইত; এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ প্রভৃতি আনিয়া বোধিসত্ত্বকে দিয়া যাইত। অরণ্যমধ্যস্থ ঐ গোপল্লীর অনতিদূরে এক সিংহ বাস করিত। গবীগণ সিংহের ভয়ে এত ভীত হইত যে তাহাদের দুধ কমিয়া যাইত। একদিন গোপালক ঘৃত লইয়া উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্র, ঘৃত এত কম কেন?' গোপালক তাঁহাকে ইহার কারণ জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'এই সিংহ অন্য কোন প্রাণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে কি না বলিতে পার?' 'হাঁ,

---

[১]। মূলে 'পচ্চয়ো' (প্রত্যয়) এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ উপকরণ। ভিক্ষুর পক্ষে ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয্যা ও ভৈষজ্য।

ধর্ম্মাবতার, এই সিংহ একটা মৃগীর প্রণয়াসক্ত।' 'তুমি ঐ মৃগীকে ধরিতে পারিবে কি?' 'হাঁ মহাশয়, ধরিতে পারিব।' 'তবে তাহাকে ধর, তাহার ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীরের লোমে বিষ মাখ এবং দুই দিন আবদ্ধ রাখিবার পর, বিষ যখন বেশ শুকাইয়া যাইবে, তখন ছাড়িয়া দাও। সিংহ স্নেহবশত তাহার শরীর লেহন করিবে এবং তাহা হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি উহার চর্ম, নখ, দন্ত ও বসা লইয়া আমার নিকট আসিবে।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব গোপালককে হলাহল দিয়া বনে পাঠাইলেন।

গোপালক বনে গিয়া জাল পাতিয়া মৃগীকে ধরিল এবং বোধিসত্ত্ব যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই করিল। সিংহ মৃগীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইয়া প্রগাঢ় স্নেহের প্রভাবে তাহার শরীর লেহন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; গোপালকও তাহার চর্ম্মাদি গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'স্নেহপরবশ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখ, এবংবিধ বলসম্পন্ন মৃগরাজও মৃগীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার দেহ লেহন করিতে করিতে বিষপান করিল এবং তাহাতেই ইহার মৃত্যু ঘটিল।' অনন্তর তিনি সমবেত লোকদিগের উপদেশার্থ এই গাথা পাঠ করিলেন :

এজন বিশ্বাসী, এই অবিশ্বাসী জন, ভাবি ইহা করো' নাক বিশ্বাস স্থাপন।
বিশ্বাসে বিপদ ঘটে, তার সাক্ষী হেন, বিশ্বাসে বিনষ্ট প্রাণ হইল সিংহের।

বোধিসত্ত্ব সমবেত মনুষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। অনন্তর চিরজীবন দানাদি সৎকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি কর্ম্মানুরূপফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

---

৯৪. রোমহর্ষ-জাতক

[শাস্তা বৈশালীর অবিদূরস্থ পাটিকারামে সুনক্ষত্র নামক একব্যক্তি সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সুনক্ষত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যাকালে ক্ষত্রিয়কুলজাত কোর[১] নামক তীর্থিকের ধর্ম্মমতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। এই

---

[১]। সুনক্ষত্র বৈশালীর রাজকুলজাত। কালকঞ্জক এক প্রকার প্রেত বা অসুর। সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রাণীকেই একবার না একবার এই যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কোর ক্ষত্রিয়সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কোরিক্ষত্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া কালকঞ্জক অসুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুনক্ষত্র তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দশবলকে পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার গৃহী হইল এবং বৈশালীর প্রাকারত্রয়ের অন্তরে বিচরণ করিতে করিতে এইরূপে শাস্তার প্রতি অবজ্ঞা সূচক কথা বলিতে লাগিল— 'শ্রমণ গৌতমের কোন লোকোত্তর গুণ নাই; তিনি যাহাতে অন্য মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন এমন কোন পরমা বিদ্যার অধিকারী নহেন; তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার নিজেরই চিন্তা ও তর্কপ্রসূত, যে উদ্দেশ্যে তিনি ইহা শিক্ষা দেন তাহা কখনও এতদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ ইহা কখনও দুঃখক্ষয়ের সম্যক উপযোগী নহে।'

আয়ুষ্মান সারীপুত্র ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় সুনক্ষত্রের এই সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'দেখ সারীপুত্র, সুনক্ষত্র ক্রোধপরায়ণ ও মন্দমতি। সে ক্রোধবশেই এরূপ বলিয়াছে এবং আমার ধর্ম্ম যে সম্যক দুঃখক্ষয়কর ইহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সে অজ্ঞানবশাৎ আমার গুণই কীর্ত্তন করিয়াছে। 'অজ্ঞানবশাৎ' বলিতেছি, কেন না সে মূঢ় নিশ্চিত আমার গুণ জানে না। আমি ষড়বিধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন[১]; অতএব আমি অতিমানুষধর্ম্মবান। আমি দশবল এবং চতুর্ব্বৈশারদ্য।[২] জীবের যে চতুর্যোনিতে জন্ম হইতে পারে এবং পঞ্চবিধ গতি ঘটে[৩] তাহা আমার সুবিদিত। এ সমস্তও লোকাতীত জ্ঞান। তথাপি যে বলিবে শ্রমণ গৌতমের লোকাতীত জ্ঞান নাই, সে হয় তাহার কথার প্রত্যাহার করিবে, মতিপরিবর্ত্তন করিবে এবং ভ্রমদূষিত বিশ্বাস পরিহার করিবে, নয় নিশ্চিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।' এইরূপে নিজের অতিমানুষ গুণ ও বীর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, সারীপুত্র, সুনক্ষত্র কোরক্ষত্রিয়ের দুঃখজনক মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে আমার ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। একনবতি কল্প অতীত হইল, আমিও তপস্যায় কোন ফলোদয় হয় কি না দেখিবার জন্য বাহ্য মিথ্যা তপস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া

---

[১]। সচরাচর পঞ্চ অভিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায় (২১৪ পৃষ্ঠের টীকা)। কিন্তু কেহ কেহ 'আশ্রবক্ষয়করণ' অর্থাৎ অর্হত্ত্ব নামে ষষ্ঠ অভিজ্ঞারও উল্লেখ করেন।

[২]। বুদ্ধের চারি প্রকার বৈশারদ্য (আত্মপ্রত্যয়) ছিল, অর্থাৎ তিনি জানিতেন যে আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি রাগমোহাদিমুক্ত, আমি সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছি এবং আমি নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছি।

[৩]। চতুর্যোনি—অণ্ডজযোনি, জরায়ুযোনি, স্বেদজযোনি এবং ঔপপাতিক যোনি। ঔপপাতিক যোনিতে জাত জীব প্রেত, পিশাচ, দেবতা প্রভৃতি হয়, এরূপ জন্মের জন্য স্ত্রীপুরুষসংসর্গের প্রয়োজন নাই। পঞ্চগতি যথা—নরক, তির্য্যগযোনি, প্রেত, মনুষ্য ও দেব।

চতুরঙ্গবিশিষ্ট[১] ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি তপস্বীদিগের মধ্যে পরম তপস্বী হইয়াছিলাম; তখন কেহই আমার ন্যায় অস্থিচর্ম্মসার ছিল না, কেহই আমার ন্যায় জুগুপ্সিত ছিল না, কেহই আমার ন্যায় বিবিক্ত[২] ছিল না।' অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

একনবতি কল্প অতীত হইল বোধিসত্ত্ব বাহ্য তপস্যার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আজীবক-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। তিনি একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেন, মনুষ্য দেখিলে হরিণের ন্যায় চকিত হইয়া পলায়ন করিতেন। তিনি ক্ষুদ্র মৎস্য, গোময়াদি অতি বিকট খাদ্যে দেহ ধারণ করিতেন; পাছে তপস্যার কোন ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় অরণ্যের এক ভীষণ অংশে থাকিতেন। যখন হিমবায়ু প্রবাহিত হইত, তখন তিনি রাত্রিকালে গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেন এবং সূর্য্যোদয় হইলে গহন স্থানে ফিরিয়া যাইতেন। কাজেই তিনি রাত্রিকালে যেমন হিমোদকে সিক্ত হইতেন, দিবাভাগেও সেইরূপ বৃক্ষশাখাচ্যুত বারিবিন্দু দ্বারা সিক্ত হইতেন, এবং অহোরাত্র শীতদুঃখ ভোগ করিতেন। আবার যখন গ্রীষ্মকাল আসিত, তখন তিনি দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণপূর্ব্বক রাত্রিকালে গহন স্থানে প্রবেশ করিতেন, কাজেই যেমন দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া আতপক্লিষ্ট হইতেন, সেইরূপ রাত্রিকালেও নির্বাত বনসন্ধিতে থাকিয়া দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতেন; এবং তাঁহার দেহ হইতে নিয়ত স্বেদধারা নির্গত হইত। অনন্তর তাঁহার মনে এই অশ্রুতপূর্ব্ব গাথা উদিত হইল :

মুক্তিলাভ উত্তাপে ভীষণ কাননে একাকী বসতি করি;
দুঃসহ উত্তাপে কভু ক্লেশ পাই, কিন্তু তাহে নাহি ডরি।
কখনও বা পুনঃ শীতের প্রকোপে কাঁপে অঙ্গ থরথরি,
নগ্নদেহ তবু ভ্রমেও কখন অগ্নিসেবা নাহি করি।
মৌন ব্রত সদা; বাক্যালাপ কভু না করি কাহার সনে;
হেন তপস্যায় মুক্তি যদি পাই এই আশা সদা মনে!

কিন্তু সমস্ত জীবন এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াও বোধিসত্ত্ব মরণসময়ে নরকের দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন তপস্যা নিরর্থক। সেই অন্তিম

---

[১]। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ-বানপ্রস্থ-ভৈক্ষ্যাত্মক।

[২]। নির্জ্জনবাসী।

মুহূর্ত্তেও তাঁহার ভ্রম দূর হইল বলিয়া তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন এবং তন্নিমিত্ত দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন।

* * *

[সমবধান—আমি ছিলাম সেই আজীবক।]

---

৯৫. মহাসুদর্শন-জাতক

[শাস্তা পরিনির্ব্বাণমঞ্চে শয়ান হইলে স্থবির আনন্দ বলিয়াছিলেন, 'ভগবন, আপনি এরূপ নগণ্য নগরে দেহত্যাগ করিবেন না।' তাহা শুনিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন তখন নালগ্রাম-জাত-স্থবির সারীপুত্র কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন বরক নামক স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার অর্দ্ধমাসান্তে ঐ মাসেরই কৃষ্ণপক্ষে মহামৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ হয়। উপর্য্যুপরি দুইজন অগ্রশ্রাবক ইহলোক ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শাস্তা স্থির করিলেন। 'আমিও কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।' অনন্তর তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কুশীনগরে উপনীত হইলেন এবং শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তরশীর্ষ মঞ্চকে আর এখান হইতে উঠিব না এই সঙ্কল্প করিয়া শয়ন করিলেন। তখন স্থবির আনন্দ বলিতে লাগিলেন, 'ভগবন, এ নগর অতি ক্ষুদ্র, অতি বন্ধুর; ইহা বনমধ্যে অবস্থিত; ইহা বৃহৎ নগরের একটী শাখা বলিয়াও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; আপনি এখানে পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না। রাজগৃহ প্রভৃতি কোন বৃহৎ নগরেই ভগবানের পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হওয়া উচিত।

তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'আনন্দ, তুমি ইহাকে ক্ষুদ্র নগর, বন্য নগর বা শাখানগর বলিও না; অতীত যুগে আমি যখন সুদর্শন নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলাম, তখন আমি এই নগরেই বাস করিতাম। তখন ইহা দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ রত্নপ্রাকার-পরিবেষ্টিত মহানগর ছিল।' অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা প্রকট করিবার জন্য মহাসুদর্শনসূত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

যখন মহাসুদর্শন[১] ধর্ম্মপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া তালবনে, তাঁহার জন্য যে সপ্তরত্নময় মঞ্চক প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে অন্তিম শয্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর

---

[১]। বোধিসত্ত্বই মহাসুদর্শন হইয়াছিলেন।

দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মহিষী সুভদ্রা বলিয়াছিলেন, 'স্বামিন, আপনি রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশিতি সহস্র নগরের অধিপতি; তাহাদের কোন একটীতে চলুন। ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিয়াছিলেন, 'প্রিয়ে, এমন কথা বলিও না; বরং বল যে এই নগরের প্রতি যেন আমার চিত্ত প্রসন্ন থাকে এবং অন্য নগরের জন্য উৎকণ্ঠা না জন্মে।' 'ইহাদের কারণ কি দেব?' 'কারণ আমি অদ্যই দেহত্যাগ করিব।' তখন গলদশ্রুলোচনা মহিষী নয়নযুগল অবমার্জন করিতে করিতে, রাজা যাহা বলিতে বলিলেন, অতিকষ্টে সেই কথাগুলি বলিলেন। তাহার পর তিনি বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; অন্তঃপুরের চতুরশিতি সহস্র মহিলা রোদন ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; অমাত্যেরাও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না; সকলেই কান্দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তোমরা কেহই গোল করিও না।' তাঁহার কথায় সকলে ক্রন্দন বন্ধ করিল; অনন্তর তিনি মহিষীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবি, আপনি ক্রন্দন বা পরিদেবন করিবেন না; জগতে অতিবৃহৎ পদার্থ হইতে তিলবীজাদি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ পর্য্যন্ত চরাচর সমস্তই অনিত্য, সমস্তই ভঙ্গুর।' অতঃপর মহিষীর সান্তনার জন্য তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

অনিত্য নিশ্চয় সংস্কার-নিচয়;[১]
প্রকৃতি এদের উৎপত্তি-বিলয়।
এই দেখা দেয় জনম লভিয়া,
এই লীন হয় বিনাশ পাইয়া।
মরণ (ই) পরম সুখের আকর,
না ভুঞ্জিলে আর ভব-কারাগার।

এইরূপে মহাসুদর্শন ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অমৃতোপম নির্ব্বাণ লাভের উপায় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিলেন। সমবেত অন্য সমস্ত ব্যক্তিকেও তিনি দানপরায়ণ, শীলচার ও উপোসথসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকগমনার্হ হইলেন।

* * *

[সমবধান—তখন রাহুলজননী ছিল সুভদ্রা দেবী; রাহুল ছিল পরিনায়ক[২] বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সুদর্শনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সমবেত জনসঙ্ঘ এবং আমি ছিলাম মহাসুদর্শন।]

---

[১]। সংস্কার বলিলে চরাচর, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই বুঝায়। বৌদ্ধমতে কেবল আকাশ ও নির্বাণ এই দুইটী নিত্য পদার্থ, আর সমস্তই অনিত্য।

[২]। Crown prince; ইনি রাজার অন্যতম রত্ন বলিয়া গণ্য হইতেন।

৯৬. তৈলপাত্র-জাতক

[শাস্তা যখন শুম্ভরাজ্যের[১] অন্তঃপাতী দেশক নামক নগরের অনতিদূরে একটী বনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী[২] সূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মনে করে কোথাও বহুলোক সমবেত হইয়া 'জনপদকল্যাণী', 'জনপদকল্যাণী' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং তাহার পর জনতা আরও বৃদ্ধি হইয়া, 'জনপদকল্যাণী গান করিতেছে', 'জনপদকল্যাণী নৃত্য করিতেছে' এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে প্রাণের মায়া রাখে, মরণে ভয় করে, সুখের অন্বেষণ করে, দুঃখ এড়াইতে চায়, এমন কোন পুরুষ যদি সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে বলা যায়, 'তুমি এই তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া জনপদকল্যাণী এবং জনসঙ্ঘের অন্তর দিয়া চলিয়া যাও; একজন লোক নষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে এবং তুমি যদি বিন্দুমাত্র তৈল ফেলিয়া দাও, তবে তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ডপাত করিবে', তাহা হইলে সেই হতভাগ্য কি তৈলপাত্র বহন করিবার সময় অসাবধান ও অন্যমনস্ক হইবে?' ভিক্ষুরা বলিলেন, 'কখনই নহে, কখনই নহে।' শাস্তা বলিলেন, 'আমি নিজের মনোভাব বুঝাইবার; ও জানাইবার জন্য এই উপমা প্রয়োগ করিতেছি। আমার মনোভাব এই—লোকের কায়গতা স্মৃতি[৩] তৈলপূর্ণপাত্রস্থানীয়; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে কায়গতা-স্মৃতি যত্নসহকারে অভ্যাস ও আয়ত্ত করা আবশ্যক। তোমরা ইহাতে অবহেলা করিও না।' অতঃপর শাস্তা জনপদকল্যাণীসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, 'ভগবন, জনপদকল্যাণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তৈলপূর্ণ পাত্র বহন করা সেই ব্যক্তির পক্ষে অতীব দুষ্কর হইয়াছিল।' শাস্তা বলিলেন, 'ইহা তাহার পক্ষে দুষ্কর হয় নাই, বরং সুকরই হইয়াছিল, কারণ অন্য একব্যক্তি অসি উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু অতীত যুগে পণ্ডিতেরা যখন অপ্রমত্তভাবে স্মৃতিরক্ষাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অকলঙ্ক দিব্যরূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা প্রকৃতই দুষ্কর করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

[১]। শুম্ভ বা শুম্ভপুর; নামান্তর একচক্র। কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ত্তমান সম্ভলপুর।

[২]। জনপদকল্যাণী যশোধারার নামান্তর। কিন্তু এখানে ইহার অর্থ 'অনবদ্যাঙ্গী রমণী।' জনপদকল্যাণীসূত্র কোথায় আছে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

[৩]। কায়গতাস্মৃতি অর্থাৎ দেহ অনিত্য ইত্যাদি চিন্তা।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালসহকারে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত ও হিতাহিতজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন। এই সময়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোজন করিতে যাইতেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার বহু ভ্রাতা বিদ্যমান; এই নগরে আমার পক্ষে পিতৃপৈতামহিক রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? দেখি, প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিতে পারি কিনা।' পরদিন প্রত্যেকবুদ্ধগণ যথাসময়ে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, পবিত্র জলভাণ্ড গ্রহণ করিলেন, জল ছাঁকিয়া পা ধুইলেন, পা পুঁছিয়া আহার করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধগণ উত্তর দিলেন, 'রাজকুমার, তুমি এ নগরে রাজত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এখান হইতে দ্বিসহস্র যোজন দূরে গান্ধার দেশে তক্ষশীলা নামে এক নগর আছে। যদি সেখানে যাইতে সমর্থ হও, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজ্যলাভ করিবে। পথে কিন্তু একটা মহাবনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বড় ভয়ের কারণ আছে। সেই বন পরিহার করিয়া অন্যপথে গেলে যদি একশত যোজন চলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া ঋজুভাবে গেলে পঞ্চাশ যোজন মাত্র চলিতে হয়। কিন্তু উহা যক্ষদিগের বাসস্থান। যক্ষিণীরা মায়াবলে পথপার্শ্বে গ্রাম ও পান্থশালা সৃষ্টি করে, তাহারা সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত পট্টশাণ-পরিবৃত মহার্হ শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং স্ব স্ব দেহ দিব্যালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া গৃহদ্বার হইতে পথিকদিগকে মধুর বচনে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। তাহারা বলে, 'পান্থ, তুমি বোধহয় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ; এস, এখানে উপবেশন করি; সুশীতল জল পান করিয়া পুনর্ব্বার পথ চলিবে।' তাহারা পথিকদিগকে এইরূপে ভুলাইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়, বসিবার আসন দেয়; এবং আপনাদের অলৌকিক রূপ ও হাবভাব দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ফেলে। অনন্তর হতভাগ্যেরা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া যেমন পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়, অমনি যক্ষিণীগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদের দেহ হইতে নিঃশেষে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই, উদরস্থ করিয়া ফেলে। যক্ষিণীরা লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মুগ্ধ করিতে পারে। তাহারা যে রূপপ্রিয়, তাহাকে রূপের ছটায়, যে শব্দমাধুর্য্য প্রিয় তাহাকে গীতবাদ্যে, যে সৌরভপ্রিয় তহাকে দিব্যগন্ধে, যে সুরসপ্রিয় তাহাকে অমৃতোপম ভোজ্যে, যে স্পর্শসুখপ্রিয় তাহাকে দুগ্ধফেননিভ দেবদুর্লভ রক্তাস্তরণযুক্ত উপধান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তবে যদি তুমি ইন্দ্রয়দমনে সমর্থ হও এবং কিছুতেই

ইহাদের মুখাবলোকন করিব না, এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক মনকে সংযত রাখিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে সপ্তম দিবসে নিশ্চিত রাজ্য লাভ করিবে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যাহাই হউক না কেন, আপনাদের এই উপদেশ শুনিবার পর কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি?' অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'আপনারা আমায় এমন কোন মন্ত্রপূত দ্রব্য দিন, যাহার প্রভাবে পথে আমার কোন বিপদ ঘটিবে না।' প্রত্যেক বুদ্ধগণ তাঁহাকে মন্ত্রপূত সূত্র ও বালুকা দিলেন; তিনি উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং জনকজননীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসভবনে গেলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ, আমি রাজ্যলাভার্থ তক্ষশিলায় যাইতেছি; তোমরা এখানেই অবস্থিতি কর।' কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাঁচজন বলিল, 'আমরাও যাইব।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না; পথে নাকি অনেক যক্ষিণী আছে; তাহারা রূপাদি প্রলোভন দ্বারা মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং যাহারা প্রলুব্ধ হয় তাহাদিগকে নিহত করে। এ বড় ভয়ের কথা। আমি আত্মনির্ভর করিয়াই যাইব স্থির করিয়াছি।' 'যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে আমরাই কি আত্মপ্রীতির জন্য তাহাদের রূপাদি অবলোকন করিব? আপনি যাহাই বলুন, আমরাও তক্ষশিলায় যাইব।' 'চল, তবে সাবধান যেন কোনরূপ প্রমাদ না ঘটে।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

যক্ষিণীরা পথে গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বোধিসত্ত্বের অনুচরদিগের মধ্যে একজন রূপপ্রিয় ছিল; সে যক্ষিণীদিগকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং সঙ্গীদিগের একটু পশ্চাতে পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, তুমি পিছনে পড়িলে কেন?' সে বলিল, 'দেব, পায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে; এই পানস্থশালায় একটু বিশ্রাম করিয়া, আসিতেছি।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'দেখ বাপু, উহারা যক্ষিণী; উহাদের ফাঁদে পা দিও না।'

'যাহাই হউক না কেন, কুমার, আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।' 'আচ্ছা, এখনই দেখা যাইবে তুমি কেমন লোক।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্য চারিজন অনুচরের সহিত চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই রূপপ্রিয় ব্যক্তি যক্ষিণীদিগের নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু সে যেমন তাহাদের সহিত পাপাচারে প্রবৃত্ত হইল, অমনি তাহারা হতভাগ্যের প্রাণসংহার করিয়া বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে অপর এক পান্থশালা নির্ম্মাণ করিল এবং সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান আরম্ভ করিল। সেখানে শব্দমাধুর্য্যপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়া নিহত ও খাদিত হইল। ইহার পর যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া নানাবিধগন্ধকরণ্ডপূর্ণ দোকান সাজাইয়া

অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং সেখানে সৌরভপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল। যক্ষিণীরা তাহাকেও খাইয়া পুনর্ব্বার পুরোভাগে গিয়া দিব্যরসযুক্তভোজ্য পরিপূর্ণ বহুপাত্র দ্বারা দোকান সাজাইল। সেখানে সুরসপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং যক্ষিণীদিগের উদরস্থ হইল। সর্ব্বশেষে যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া দিব্য শয্যা রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেখানে স্পর্শসুখপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল এবং যক্ষিণীরা তাহাকেও ভোজন করিল।

তখন এক বোধিসত্ত্ব জীবিত রহিলেন এবং একজন যক্ষিণী তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি যতই দৃঢ়চেতা হউক না কেন, আমি ইহাকে না খাইয়া ফিরিতেছি না।' বনের এক অংশে বনচরেরা কাজ করিতেছিল। তাহারা যক্ষিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওগো, ঐ যে তোমার আগে আগে পুরুষটী যাইতেছে, ও তোমার কে?' যক্ষিণী কহিল, 'মহাশয়গণ, উনি আমার স্বামী।' ইহা শুনিয়া বনচরেরা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'ওগো মহাশয়, এমন পুষ্পদামসদৃশী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুকুমারী তোমার জন্য পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আর তোমার এমনই কঠিন হৃদয় যে যাহাতে এ বেচারি সুখ স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে যাইতে পারে তাহা করিতেছ না! (তুমি ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়াই ছুটিয়াছ!)' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'এ রমণী আমার ভার্য্যা নহে; এ যক্ষিণী; এ আমার পাঁচজন সঙ্গীকে খাইয়া ফেলিয়াছে।' তখন যক্ষিণী বলিল, 'হায়, হায়! পুরুষ ক্রোধকালে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও যক্ষিণী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।'

কিয়ৎক্ষণ যাইবার পর যক্ষিণী প্রথমে গর্ভিণীর বেশে এবং পরে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এইরূপ রমণীর বেশে, পুত্র কোলে লইয়া বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে লাগিল। পথে যে এই দুই জনকে দেখিতে পাইল, সেই বনচরদিগের ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। অবশেষে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় উপনীত হইলেন। তখন যক্ষিণী মায়াবলে পুত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটাইয়া একাকিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। বোধিসত্ত্ব নগরদ্বারে গিয়া একটী পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন; তাঁহার তেজোবলে যক্ষিণী ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না; সে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিল।

সেই সময়ে তক্ষশিলার রাজা উদ্যানাভিমুখে যাইতেছিলেন; তিনি যক্ষিণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং একজন অনুচরকে বলিলেন, 'গিয়া জানত, ঐ রমণীর স্বামী আছে কি না।' সে ব্যক্তি যক্ষিণীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদ্রে, আপনার স্বামী আছেন কি?' যক্ষিণী বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে আমার স্বামী গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া রহিয়াছেন।' তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ঐ রমণী আমার স্ত্রী নহে; ও যক্ষিণী; ও আমার পাঁচজন অনুচরকে

খাইয়া ফেলিয়াছে।' যক্ষিণী পূর্ব্ববৎ বলিল, 'হায় হায়! পুরুষে রাগের বশে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে।'

রাজপুরুষ রাজার নিকট গিয়া দুই জনের মুখে যাহা শুনিয়াছিল, নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, 'অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য।' তিনি যক্ষিণীকে আনাইয়া নিজের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন, এবং তাহাকে অগ্রমহিষীর পদে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাজা স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইলেন এবং সায়মাশ সম্পাদনপূর্ব্বক রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। যক্ষিণীও নিজের আহার প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিল এবং মনোহর বেশ ধারণ করিয়া রাজার পার্শ্বে শয়ন করিল; কিন্তু রাজা যখন অনুরাগের আধিক্যনিবন্ধন তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, তখন সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাজা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছ কেন?' 'মহারাজ, আপনি আমায় রাস্তায় দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। আপনার অন্তঃপুরে বহু রমণী আছেন। সপত্নীদিগের সহিত বাস করিবার সময় যদি কেহ বলে, 'তোকে ত রাজা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছেন; তোর মা বাপ, জাতি গোত্র কেহই জানে না,' তাহা হইলে লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মাথা কাটা যাইবে।' কিন্তু আপনি আমায় সমস্ত রাজ্যের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করিলে কেহই আমার চিত্তের অসন্তোষকর কোন কথা বলিতে সাহস করিবে না।'

রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই;[১] আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা দুরাচার, কেবল তাহাদিগকেই দণ্ডবিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভু নহি, তখন তোমাকে তাহাদের উপর আধিপত্য কিরূপে দিব?'

'আচ্ছা, যদি আমাকে সমস্তরাজ্যবাসীর বা নগরবাসীর উপর প্রভুত্ব না দিতে পারেন, তবে অন্তত আপনার অন্তঃপুরের উপর প্রভুত্ব প্রদান করুন; তাহা হইলেও আমি অন্তঃপুরবাসীদিগকে শাসনে রাখিতে পারিব।'

রাজা যক্ষিণীর রূপে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কিছুতেই তাহার প্রার্থনা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমাকে অন্তঃপুরের উপর আধিপত্য দিলাম; তুমি অন্তঃপুরবাসীদিগকে পালন কর।' যক্ষিণী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল এবং রাজা নিদ্রিত হইলে যক্ষনগরে গিয়া সেখান হইতে সমস্ত যক্ষসহ রাজভবনে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর সে নিজে রাজাকে নিহত করিয়া কেবল অস্থিগুলি ব্যতীত তাঁহার দেহের স্নায়ু, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত

---

[১]। রাজার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিন্দ প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

সমস্ত উদরসাৎ করিল; অন্যান্য যক্ষেরাও সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক রাজভবনে যাহাকে দেখিতে পাইল, শুদ্ধ অস্থিমাত্র ত্যাগ করিয়া সমস্ত গ্রাস করিল—কুক্কুর কুক্কুট পর্য্যন্ত নিস্তার পাইল না।

পরদিন পুরবাসীরা রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া পরশুদ্বারা কবাটে আঘাত করিতে লাগিল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল সর্ব্বত্র অস্থি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 'সে লোকটা ত সত্যই বলিয়াছিল যে ঐ রমণী তাহার স্ত্রী নহে, যক্ষিণী। রাজা কিন্তু না জানিয়া তাহাকে নিজের গৃহে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিশ্চয় অন্যান্য যক্ষ আনিয়া অন্তঃপুরবাসীদিগকে আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে।'

বোধিসত্ত্ব এই মন্ত্রপূত বালুকা মস্তকে রাখিয়া, মন্ত্রপূত সূত্র কপালে জড়াইয়া এবং খড়গ হস্তে লইয়া অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় পান্থশালায় বসিয়াছিলেন। পুরবাসীরা রাজভবন ধুইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিল, মেঝেগুলি নূতন করিয়া সাজাইল, তাহাদের উপর গন্ধদ্রব্যের বিলেপ দিল, চতুর্দ্দিকে পুষ্প ছড়াইল, স্থানে স্থানে পুষ্পমালা ঝুলাইয়া দিল, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধুনা গুগগুল পোড়াইতে লাগিল এবং তোরণাদি পুষ্পদামে সুসজ্জিত করিল। অনন্তর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল :

'যে পুরুষ এরূপ জিতেন্দ্রিয় যে তাদৃশ দিব্যলাবণ্যবতী রমণী পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে জানিয়াও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই, তিনি নিশ্চিত অতি উদারসত্ত্ব, ধীমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তাদৃশ ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করিলে সমস্ত রাজ্যের পরম সুখ হইবে। অতএব আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব।'

এই প্রস্তাবে সমস্ত অমাত্য ও নগরবাসী একমত হইল এবং তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট বলিল, 'দেব, আপনি আমাদের রাজপদ গ্রহণ করুন।' অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে নগরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া নানা রত্নে অলঙ্কৃত করিল এবং তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনিও চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করিয়া দানাদি পুণ্যব্রত সম্পাদন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ যথাকালে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন অতি সতর্কতা চাই;
নচেৎ উছলি পড়িবে ভূমিতে তৈল তব, শুন ভাই।

ঠিক সেইমত অজ্ঞাত দিকের প্রার্থনা করে যে জন,
অপ্রমত্তভাবে চিত্তরক্ষা যেন করে সেই অনুক্ষণ।

শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনদ্বারা নির্ব্বাণরূপ চরমকাল প্রদর্শনপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন, তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তক্ষশিলারাজের অমাত্য প্রভৃতি এবং আমি ছিলাম সেই রাজ্যপ্রাপ্ত কুমার।]

---

৯৭. নামসিদ্ধিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নামসিদ্ধিক[১] ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, পাপক নামে এক কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'এস পাপক' বসো পাপক' সর্ব্বদা এইরূপ বলিতেন। ইহাতে তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যখন 'পাপক' এই নাম লোকে নীচ ও দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করে, তখন আমায় কোন মঙ্গলশংসী নাম গ্রহণ করিতে হইবে।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহাশয়গণ, আমার নামটী অমঙ্গলসূচক, আপনারা আমার অন্য কোন নাম রাখুন।' তাঁহারা বলিলেন, 'বৎস, নাম কেবল কোন ব্যক্তি কে, তাহা চিনিবার জন্য; ইহাতে অন্য কোন ইষ্টাপত্তি নাই। অতএব তোমার যে নাম আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।' কিন্তু ভিক্ষু ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি পুনঃ পুনঃ নাম পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি নামপরিবর্ত্তনের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছেন, এ কথা শেষে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি, নামের উপর লোকের ভাগ্য নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে নিজে একটী শুভশংসী নামগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।' শাস্তা সেই সময়ে ধর্ম্মসভায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছিলে?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'এই কথা দেব।' শাস্তা বলিলেন, 'এখন যেমন দেখিলে, এই লোকটী পূর্ব্বেও সেইরূপ নামসিদ্ধিক ছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

*　　*　　*

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন;

---

[১]। যে মনে করে যে নাম ভাল হইলেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়।

পঞ্চশত ব্রাহ্মণ-বালক তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল ছাত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল পাপক। অন্যান্য ছাত্রেরা নিয়ত তাহাকে 'এস, পাপক', 'যাও, পাপক' এইরূপ বলিত। তাহাতে পাপক চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার নামটা অমঙ্গলশংসী; অতএব আমি অন্য একটী নাম গ্রহণ করিব।' সে আচার্য্যের নিকট গিয়া বলিল, 'গুরুদেব, আমার বর্ত্তমান নামটী অমঙ্গলসূচক, আমার অন্য একটী নাম রাখুন।' আচার্য্য বলিলেন, 'যাও, তুমি জনপদে বিচরণপূর্ব্বক নিজের অভিরুচিমত মঙ্গলশংসী নাম নির্ব্বাচন করিয়া আইস। তুমি ফিরিয়া আসিলে বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাম রাখিব।'

সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পাথেয়সহ যাত্রা করিল এবং গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণপূর্ব্বক এক নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে সেদিন জীবক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাহাকে সৎকারের জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পাপক জিজ্ঞাসিল, 'এই ব্যক্তির নাম কি ছিল?' তাহারা বলিল, 'ইহার নাম ছিল জীবক।' 'কি! জীবকের মরণ হইল?' 'জীবকও মরে, অজীবকও মরে। মরা বাঁচা কি নামের উপর নির্ভর করে? নাম কেবল কোন পদার্থকে কি বলিতে হইবে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।'

এই কথা শুনিয়া পাপক তখন নিজের নামসম্বন্ধে মধ্যমভাব অবলম্বন করিল (অর্থাৎ তাহার বিরক্তিও রহিল না, অনুরক্তিও জন্মিল না)। সে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক দাসী উপার্জ্জন দ্বারা বেতন আনিতে পারে নাই[১] বলিয়া তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া রজ্জুদ্বারা প্রহার করিতেছে। এই দাসীর নাম ছিল ধনপালী। পাপক পথ দিয়া যাইবার সময়, তাহাকে মারিতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারা ইহাকে প্রহার করিতেছেন কেন?' 'এ আজ কিছুই উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারে নাই।' ইহার নাম কি?' 'ধনপালী।' 'সে কি! ইহার নাম হইল ধনপালী, অথচ ইহার এক দিনেরও বেতন দিবার সাধ্য নাই!' 'নাম ধনপালীই হউক, আর অধনপালীই হউক, দুরদৃষ্টকে কে এড়াইতে পারে? নামে কি আসে যায়? নামে শুধু কোন ব্যক্তি কে, এই পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি দেখিতেছি অতি স্থূলবুদ্ধি।'

এই কথা শুনিয়া পাপক নিজ নামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিল এবং নগর হইতে বাহির হইয়া পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া সে দেখে এক ব্যক্তি পথ হারাইয়াছে। পাপক জিজ্ঞাসা করিল, 'আর্য্য, আপনি কি করিতেছেন?' 'আমি পথ হারাইয়াছি, তাই কোন পথে যাইব, খুঁজিতেছি।' আপনার নাম কি?' 'আমার নাম পন্থক।' 'সে কি! যে পন্থক, সে আবার পথ

---

[১]। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিত, দাসস্বামীরা তাহা পাইত।

হারায় কিরূপে?' 'পন্থকই হউক, আর অপন্থকই হউক, সকলেই পথ হারাইয়া থাকে। নামে কি করিবে বাপু? নাম কেবল, কোন ব্যক্তি কে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।'

এবার পাপক নিজ নামের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষহীন হইল এবং আচার্য্যের নিকট ফিরিয়া গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বৎস, নাম নির্ব্বাচন করিয়া আসিলে কি?' পাপক উত্তর দিল, 'গুরুদেব, যাহার নাম জীবক, সেও মরে, যাহার নাম অজীবক, সে মরে, ধনপালীও দরিদ্রা হয়, অধনপালীও দরিদ্রা হয়; যে পন্থক সেও পথ হারায়, যে অপন্থক সেও পথ হারায়; ফলত নামের কোনই সারবত্তা নাই; নাম দ্বারা কেবল পদার্থ-নির্দ্দেশ চলে, সিদ্ধিলাভ হয় না; সিদ্ধির নিদান কর্ম্ম। অতএব আমার নামান্তরে প্রয়োজন নাই; আমার যে নাম আছে, তাহাই থাকুক।'

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব, শিষ্য যাহা বলিল এবং যাহা দেখিয়াছে, একত্র সন্নিবেশিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

জীবকের জীবনান্ত, এ বড় অদ্ভুতকথা, ধনপালী নাহি পায় ধন;
পন্থক যাহার নাম, হারাইয়া পথ সেই বনে বনে করিছে ভ্রমণ;
হেরি এই সব কাণ্ড পাপক ফিরিল ঘরে; নিজ নামে ঘৃণা নাহি তার;
নামে কি করিতে পারে? একমাত্র সিদ্ধিদাতা কর্ম্ম, এই জেন সত্য সার।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'তবেই দেখিতেছি এই ভিক্ষু বর্ত্তমান জন্মের ন্যায় অতীত জন্মেও ভাবিয়াছিল যে, নামের উপর ভাগ্য নির্ভর করে।'

সমবধান—তখন এই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু ছিল সেই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

৯৮. কূট-বাণিজ (বণিক)-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কূট বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী এক সাধু ও এক অসাধু বণিক, একসঙ্গে মিলিয়া বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে পণ্যদ্রব্য ও শকটাদি সংগ্রহপূর্ব্বক জনপদে গিয়াছিল এবং সেখানে বহু লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর কূট বণিক ভাবিল, 'আমার অংশী বহুদিন কদন্ন ভোজন করিয়াছে; জঘন্য স্থানে বাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছে; এখন গৃহে আসিয়া যত ইচ্ছা সুমধুর খাদ্য উদরস্থ করিবে; কাজেই অজীর্ণ রোগে মারা যাইবে। তখন আমি লব্ধদ্রব্য তিন ভাগ করিয়া এক

ভাগ তাহার পুত্রদিগকে দিব এবং দুই ভাগ নিজে লইব।' ইহা স্থির করিয়া সে 'আজ ভাগ করিব', 'কাল ভাগ করিব' বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

সাধু বণিক দেখিল, লাভ বিভাগের জন্য ইহাকে পীড়াপীড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। সে একদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিল। শাস্তা তাহাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমায় ত অনেক দিন দেখি নাই; এত দিন বুদ্ধের অর্চ্চনা করিতে আস নাই কেন?' সে শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই গৃহপতি যে কেবল এ জন্মেই প্রবঞ্চক হইয়াছে, তাহা নহে; এ পূর্ব্বেও প্রবঞ্চনাপরায়ণ ছিল। এ এখন তোমায় বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে, পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল।' অনন্তর সাধু বণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'পণ্ডিত'। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর অপর এক বণিকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল 'অতিপণ্ডিত।' ইঁহারা দুইজনে পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকটসহ জনপদে গিয়া ক্রয় বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর লাভ-বিভাগকালে অতিপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি দুই অংশ লইব (তুমি এক অংশ লইবে)।' পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি দুই অংশ পাইবে কেন?' অতিপণ্ডিত বলিলেন, 'তুমি পণ্ডিত, আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত, সে এক ভাগ এবং যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাইবার উপযুক্ত।' 'সে কি কথা? পণ্যের মূল্যই বল, আর গাড়ী বলদই বল, আমরা দুইজনেই ত সমান সমান দিয়াছি; তবে তুমি কিরূপে দুই ভাগ পাইবে?' 'অতিপণ্ডিত বলিয়া।' এইরূপে কথা বাড়াইয়া শেষে তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর অতিপণ্ডিত ভাবিলেন, 'আচ্ছা ইহার মীমাংসার এক উপায় করিতেছি।' তিনি তাঁহার পিতাকে এক তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'আমরা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিব, তখন আপনি বলিবেন, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবে।' তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভাই, আমাদের কাহার কি ভাগ প্রাপ্য, তাহা বৃক্ষদেবতার জানা আছে; চল তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।'

তদনুসারে তাঁহারা দুইজনে সেই তরুতলে উপস্থিত হইলেন এবং অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবতি বৃক্ষদেবতে! আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন।' তখন অতিপণ্ডিতের পিতা স্বর-পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,

'তোমাদের বিবাদ কি বল।' অতিপণ্ডিত বলিলেন, 'ভগবতি, এ ব্যক্তি পণ্ডিত; আর আমি অতিপণ্ডিত; আমরা একসঙ্গে ব্যবসায় করিয়াছিলাম, তাহার লাভের অংশ কে কত পাইবে।' তরুকোটর হইতে উত্তর হইল, 'পণ্ডিত এক ভাগ এবং অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবেন।' বোধিসত্ত্ব এই বিচার শুনিয়া ভাবিলেন, 'এখানে দেবতা আছে কি না আছে, তাহা জানিতে হইতেছে।' তিনি পলাল সংগ্রহ করিয়া কোটরে পুরিলেন এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অতিপণ্ডিতের পিতা অর্দ্ধদগ্ধশরীরে তাহা হইতে বাহির হইলেন এবং শাখাবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি, সাধুবর, নাহি ইথে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিতের নাম নিরর্থক, হায় হায়! তারি দোষে এত মোর ক্লেশ।

ইহার পর তাঁহারা সমান অংশে লাভ ভাগ করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

* * *

[অতএব তোমার অংশী পূর্ব্বেও কূট বণিক ছিল।

সমবধান—তখন এই অসাধুবণিক ছিল সেই অসাধু বণিক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক।]

☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথার সৌসাদৃশ্য বিবেচনীয়।

---

৯৯. পরসহস্র-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পৃথক্জনপৃষ্ঠ প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শরভঙ্গ জাতকে (৫২২) বলা যাইবে।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, ভগবান দশবল যাহা সংক্ষেপে বলেন, ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র তাহা সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।' তাঁহারা বসিয়া এইরূপে সারীপুত্রের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'সারীপুত্র কেবল এ জন্মেই যে আমার সংক্ষিপ্তোক্তির সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে

---

[১]। পরসহস্র—সহস্রেরও অধিক।

লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভপূর্ব্বক হিমালয়ে অবস্থিতি করিতেন। সেখানে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

একবার বর্ষাকালে তাঁহার প্রধান শিষ্য সার্দ্ধদ্বিশত তপস্বিসহ লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের দেহত্যাগকাল সমাগত হইল। তখন উপস্থিত শিষ্যগণ, তিনি কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান[১] লাভ করিয়াছেন তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি গুণ লাভ করিয়াছেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'নাস্তি কিঞ্চিৎ' এবং ক্ষণকাল পরেই তনুত্যাগ করিয়া আভাস্বর ব্রহ্মালোকে[২] জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া তপস্বিগণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্য কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।' অতএব তাঁহারা তাঁহার শ্মশান-সৎকার করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে প্রধান শিষ্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য কোথায়?' তাঁহারা বলিলেন, 'আচার্য্য উপরত হইয়াছেন।' 'তোমরা আচার্য্যকে অধিগমসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?' 'জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।' তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন?' 'তিনি বলিয়াছিলেন, নাস্তি কিঞ্চিৎ।' এইজন্যই আমরা তাঁহার শ্মশান সৎকার করি নাই।' 'তোমরা আচার্য্যের কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই। 'নাস্তি কিঞ্চিৎ' বলায় তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সম্পত্তি[৩] লাভ করিয়াছেন।' প্রধান শিষ্য সতীর্থদিগকে এই কথা বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু

---

[১]। মূলে 'অধিগম' এই শব্দ আছে।

[২]। ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মদেবসমূহের নিকতেন। ইহা প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত—নিম্নে রূপব্রহ্মলোক; তদূর্দ্ধে অরূপব্রহ্মলোক। রূপ-ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ শরীরী; অরূপ ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ অশরীরী—শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। রূপ ব্রহ্মলোক আবার ষোলটী অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটীর নাম আভাস্বর ব্রহ্মলোক। অরূপ-ব্রহ্মলোকের চারি অংশ। বোধিসত্ত্বগণ সমাপত্তি-সম্পন্ন হইলেও অরূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। সেই জাতকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তিশালী ছিলেন বলিয়া তৃতীয় অরূপ-ব্রহ্মলোকের অধিকারী; কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে রূপব্রহ্মলোকেই জন্মিতে হইয়াছিল। (৭ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

[৩]। ধ্যানফলবিশেষ—ইহা সপ্তম সমাপত্তি। এ অবস্থায় কিছুই সত্য নহে, সমস্ত মায়াময়, এই জ্ঞান জন্মে (১১৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

তপস্বীদিগকে সংশয়মান দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘ইহারা কি মূর্খ; আমার প্রধান শিষ্যের কথাতেও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেছে না! আমাকেই দেখিতেছি, প্রকৃত ব্যাপার প্রকট করিতে হইল।’ অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া মহানুভব-বলে আশ্রমপাদের উপরিভাগে আকাশে অধিষ্ঠান করিয়া প্রধান শিষ্যের প্রজ্ঞাবল করিতে করিতে এই গাথা পাঠ করিলেন :

মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
হউক সহস্রাধিক হেন শিষ্য সমাগম,
কাঁদুক শতেক বর্ষ সেই সব শিষ্যাধম;
তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান এক শিষ্যপ্রিয়তর,
বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব মধ্যাকাশে থাকিয়া সত্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন এবং ঐ সকল তপস্বীও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উপযোগী উৎকর্ষ লাভ করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য এবং আমি হইয়াছিলাম মহাব্রহ্ম।]

---

১০০. অশাতরূপ-জাতক

[শাস্তা কুণ্ডিয় নগরের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডধানবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোলিয় রাজদুহিতা সুপ্রবাসা নাম্নী উপাসিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই রমণী সপ্তবর্ষকাল গর্ভধারণ করিয়া এক সপ্তাহ প্রসববেদনা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল; কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি ভাবিতে লাগিলেন—‘সেই ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, কারণ এবংবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণপ্রদানার্থই তিনি ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন; তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘই সুপ্রতিপন্ন, কারণ তাঁহারাই এবংবিধ দুঃখনিবৃত্তির জন্য সম্মার্গে বিচরণ করেন; আর নির্ব্বানই পরমসুখকর, কারণ তাহা লাভ করিলে আর এবংবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।’ এইরূপ চিন্তা দ্বারা সুপ্রবাসা প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও উপশম অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শাস্তার নিকট নিজের প্রণাম জানাইবার ও অবস্থা বিজ্ঞাপন করাইবার জন্য স্বামীকে ডাকাইয়া বিহারে পাঠাইলেন।

সুপ্রবাসার ভক্তিপূর্ণ বার্ত্তা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'কোলীয় দুহিতা সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হউন এবং সুস্থকায় পুত্র প্রসব করুন।' ভগবান এই কথা বলিবামাত্র সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হইলেন এবং এক সুস্থকায় পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার স্বামী গৃহে ফিরিয়া যখন পত্নীকে সুপ্রসবা দেখিতে পাইলেন, তখন তথাগতের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়াভিভূত হইল।

পুত্রপ্রসবের পর সুপ্রবাসা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি উপহার দিবার অভিলাষ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভর্ত্তাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে মহামৌদ্‌গল্যায়নের উপস্থাপক এক উপাসকও বুদ্ধপ্রমুখসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাস্তা বিবেচনা করিলেন সুপ্রবাসাকেই অগ্রে দানানুষ্ঠানের অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘসহ সপ্তাহকাল সুপ্রবাসার গৃহে দানগ্রহণ করিলেন। সপ্তম দিবসে সুপ্রবাসা পুত্রকে (ইহার শীবলি এই নাম রাখা হইয়াছিল) সুসজ্জিত করিয়া শাস্তা ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রণাম করাইলেন। প্রণামকালে শিশুটী যখন স্থবির সারীপুত্রের সম্মুখে আনীত হইল, তখন তিনি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, 'শিবলী, তুমি সুখে আছত?' শিশু উত্তর করিল, 'সুখ কিরূপে হইবে, মহাশয়? আমাকে যে সপ্তবর্ষ রক্তপূর্ণ কুম্ভে বাস করিতে হইয়াছে?' সপ্তাহমাত্র বয়স্ক শিশু এইরূপে স্থবিরের সহিত কথা বলিতে লাগিল।

ইহাতে সুপ্রবাসার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, 'আমার এই পুত্রের বয়স সপ্তাহমাত্র; অথচ এ ধর্ম্মসেনাপতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছে!' তাহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন সুপ্রবাসা, তুমি এইরূপ আর একটী পুত্র চাও কি?' সুপ্রবাসা বলিলেন, 'ভগবন, যদি সকলেই এইরূপ হয়, তবে আর একটী কেন, সাতটী চাই,' অনন্তর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহার প্রশংসা করিয়া শাস্তা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এই শীবলি সপ্তমবর্ষবয়সে বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরিপূর্ণ বয়সে[১] উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। তিনি সর্ব্বদা পুণ্যপথে চলিতেন এবং কালে পুণ্যশীলজনলভ্য অর্হত্ত্বরূপ অগ্রস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন সমস্ত পৃথিবী পুলকিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ আয়ুষ্মান

[১]। অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সে।

স্থবির শীবলি এখন অনাগামী মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু সপ্তবর্ষ শোণিতকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অহো! তখন প্রসূতি ও পুত্রের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল! না জানি কি কর্ম্মের ফলে ইঁহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন! 'এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মহাপুণ্যবান শীবলি নিজ কর্ম্মফলেই সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহযন্ত্রণা পাইয়াছিলেন; সুপ্রবাসাও নিজ কর্ম্মফলে সপ্তবর্ষব্যাপী গর্ভধারণক্লেশ ও সপ্তাহব্যাপিনী প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়াছিলেন। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে কোশলরাজ বিপুল সেনা লইয়া বারাণসী নগর অধিকার করিলেন, তত্রত্য রাজাকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন। বারাণসীরাজের পুত্র পিতার নিধনকালে একটী নৰ্দ্দামা দিয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক বারাণসীর পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'হয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় যুদ্ধ কর।' রাজা উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধই করিব।' রাজকুমারের গর্ভধারিণী এই কথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; বারাণসী বেষ্টনপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে সঞ্চরণ-পথ রুদ্ধ কর, তাহা হইলে ইন্ধন, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে নগরবাসীরা ক্লিষ্ট হইবে, তুমি বিনাযুদ্ধেই নগর অধিকার করিতে পারিবে।' জননীর পরামর্শমত রাজকুমার সপ্তাহকাল বারাণসীর সমস্ত আগমন-নিগম-পথ অবরুদ্ধ করিলেন; নগরবাসীরা গত্যন্তর না দেখিয়া রাজার মাথা কাটিয়া তাহা কুমারের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন কুমার নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

* * *

[সপ্তাহকাল নগর অবরোধ করিবার ফলে শীবলি সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে ছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পদ্মোত্তর বুদ্ধের পাদমূলে পতিত হইয়া, 'আমি যেন অর্হত্ত্ব লাভ করি' এই

বরপ্রার্থনাপূর্ব্বক মহাদান দিয়াছিলেন এবং বিপস্সী বুদ্ধের সময়েও নগরবাসীদিগের সহিত সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের গুড় ও দধি বিতরণ করিয়া ঐ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যবলে তিনি এখন অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপিচ, সুপ্রবাসাও পত্রদ্বারা পুত্রকে নগর অবরোধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া সপ্তবর্ষ গর্ভধারণ এবং সপ্তাহপ্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :

অমধুর আসি মধুরের বেশে, প্রিয়মূর্ত্তি করি অপ্রিয় গ্রহণ;
অগ্রে সুখ, হায়, দুঃখ হ'য়ে শেষে, অভিভূত করে প্রমত্ত যে জন।[১]

সমবধান—তখন শীবলি ছিল সেই নগরাবরোধক, যে পরে রাজা হইয়াছিল; সুপ্রবাসা ছিল তাহার জননী এবং আমি ছিলাম তাহার জনক।]

☞ সুপ্রবাসার আখ্যাত হইতে পুরাকালে ভদ্রসমাজেও বিধবাবিবাহের আভাস পাওয়া যায়।

----

১০১. পরশত-জাতক

মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
থাকুক এ হেন শিষ্য শত কিংবা ততোধিক,
করুক তাহারা ধ্যান শতবর্ষ, তবু ধিক।
তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান এক শিষ্য প্রিয়তর,
বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

* * *

এই জাতক এবং পরসহস্র জাতক (৯৯) প্রায় সর্ব্বাংশে একরূপ; পার্থক্যের মধ্যে কেবল গাথায় 'কাঁদুক' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ধ্যান করুক' এই পদ দেখা যায়।

----

[১]। যাহারা প্রমত্ত (অনবধানচিত্ত), দুঃখকর, অমধুর ও অপ্রিয় বিষয় মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। পূর্ব্বে নগরের অবরোধ ইত্যাদি মধুর, প্রিয় ও সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদেরই ফলে শেষে গর্ভযন্ত্রণাদি দুঃখ দেখা দিয়াছিল।

১০২. পর্ণিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক পর্ণিক জাতীয় উপাসক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নানাবিধ শাক, মূলা, অলাবু, কুস্মাণ্ড প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার একটী রূপবতী, সুশীলা সদাচারপরায়ণা এবং পাপপরাম্মুখী কন্যা ছিল; কিন্তু সেই কন্যা সর্ব্বদাই হাস্য করিত। একদিন পর্ণিকের সমানকুলজাত কোন পাত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে সে ভাবিল, 'এখন ইহার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু এ যে সর্ব্বদাই হাসে ইহার কারণ কি? কুমারীরা যদি অসতী হয় তাহা হইলে স্বামিগৃহে গিয়া মাতাপিতার লজ্জার কারণ হইয়া থাকে। অতএব দেখিতে হইতেছে এ কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে কি না।'

ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কন্যার হাতে একটা চুবড়ি দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া শাকাহরণার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং যেন কাম মোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া হাত চাপিয়া ধরিল। এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে কন্যাটী তখনই ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'পিতঃ, করেন কি? এ যে জল হইতে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাণ্ড! ছি! এরূপ করিবেন না!' তখন পর্ণিক বলিল, 'আমি তোমার চরিত্র পরীক্ষার জন্যই হাত ধরিয়াছি। বলত; তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ কি?' সে উত্তর দিল, 'আমি কুমারীভাবেই আছি; কখনও কোন পুরুষের দিকে লোভবশে দৃষ্টিপাত করি নাই।' তখন পর্ণিক দুহিতাকে আশ্বাস দিয়া গৃহে লইয়া গেল এবং মহাসমারোহে তাহাকে গোত্রান্তারিত করিল। অতঃপর 'শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আসি' এই সঙ্কল্পে সে গন্ধমাল্যাদি সহ জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি এতদিন আস নাই কেন?' সে তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, 'দেখ উপাসক, এই কন্যাটী চিরকালই আচারশীলসম্পন্না; তুমিও যে কেবল এই একবার ইহার চরিত্র পরীক্ষা করিলে তাহা নহে; পূর্ব্বেও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলে?' অনন্তর পর্ণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন : —]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অরণ্যমধ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীবাসী এক পর্ণিক তাহার কন্যার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। অতঃপর তুমি যেরূপ করিয়াছিলে, সেও তাহার কন্যাসম্বন্ধে ঠিক সেই মত করিয়াছিল। পিতা যখন

তাহার হাত ধরিয়াছিল, তখন রোরুদ্যমানা বালিকা এই গাথাটী পাঠ করিয়াছিল :

যেজন রক্ষার কর্ত্তা সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীত বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পবিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয়, কে শুনেছে কবে?

তখন পিতা তাহাকে আশ্বাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ কি?' সে উত্তর দিল, 'আমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি।' ইহা শুনিয়া সে কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং যথারীতি উৎসব করিয়া তাহার বিবাহ দিল।

* * *

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মদেশন ও সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই পিতা ছিল সেই পিতা; এই কন্যা ছিল সেই কন্যা; এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন।

☞ প্রাচীনকালে কন্যারা যে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে পাত্রস্থা হইত না, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ।

---

১০৩. বৈরি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদ ভোগগ্রাম হইতে প্রতিগমন করিবার সময় পথে দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'পথে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, ত্বরায় শ্রাবস্তীতে যাইতে হইবে।' তিনি বলদগুলিকে যথাসাধ্য তাড়াইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'গৃহপতি, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা পথে দস্যু দেখিয়া সেখানে আর বিলম্ব করেন নাই, যতশীঘ্র পালিয়াছিলেন, নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।' অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি একদিন কোন গ্রামে নিমন্ত্রণ-ভোজনে গিয়াছিলেন এবং

প্রত্যাগমনকালে পথে দস্যু দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বদলগুলি হাঁকাইতে লাগিলেন এবং নিরাপদে গৃহে ফিরিলেন। অনন্তর সুরস খাদ্য আহারপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি দস্যুহস্ত এড়াইয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :

চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে শত্রু অগণন,
পণ্ডিতেরা হেন স্থান করুন বর্জ্জন।
এক রাত্রি, দুই রাত্রি, শত্রুমধ্যে বাস,
জানিবে তাহার পর ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উদান পাঠ করিলেন। ইহার পর তিনি দানাদি পুণ্যকার্য্যে জীবনযাপনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতিলাভার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

---

১০৪. মিত্রবিন্দক-জাতক (২)

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু লোশক জাতকে (৪১) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এই জাতকে লিখিত বৃত্তান্ত কাশ্যপবুদ্ধের সময় সংঘটিতে হইয়াছিল।

* * *

তখন এক ব্যক্তি উরশ্চক্র[১] ধারণ করিয়া নরকে পচিতেছিল। সে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ভগবন, আমি কি পাপ করিয়াছি?' বোধিসত্ত্ব তৎকৃত পাপসমূহ শুনাইয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন :

চারি, আট, ষোল, শেষে বত্রিশ রমণী
লভিলে, তথাপি তব প্রলোভ এমনি,
ছুটিলে আরও সুখ পাইবার তরে!
সেই হেতু বহ চক্র মস্তক-উপরে।
পৃথিবীতে আছে যত দুরাকাঙ্খজন,
ক্ষুরধার চক্র করে মস্তকে বহন।

---

[১]। ৩৫১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই কথা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকে চলিয়া গেলেন; সেই নরকবাসী ব্যক্তিও পাপ ক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

----

১০৫. দুর্ব্বলকাষ্ঠ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অতিভীরু ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু দিবারাত্র মরণভয়ে শসব্যস্ত থাকিতেন। তরুপল্লবে বায়ুর শব্দ, তালবৃন্তের ব্যজনশব্দ, কাষ্ঠখণ্ডাদির পতনশব্দ, পশুপক্ষীর রব—এইরূপ যে কোন শব্দ হঠাৎ কর্ণগোচর হইলেই ঐ ভিক্ষু মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইতেন। একদিন যে মরিতেই হইবে, তিনি কখনও এ চিন্তা করিতেন না। যাহারা এরূপ চিন্তা করে, তাহারা কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহারা মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানের অনুধ্যান করে না, তাহারাই মরণের নামে কাঁপিয়া উঠে।

এই ভিক্ষুর মরণসম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভয়ের কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই কথা উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, অমুক ভিক্ষু একান্ত মরণভীত। মরণস্মৃতির অনুধ্যান করা, অর্থাৎ আমাকে একদিন না একদিন মরিতেই হইবে এই চিন্তা করা, সকল ভিক্ষুরই কর্ত্তব্য।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?' তাঁহারা শাস্তাকে সেই ভিক্ষুর কথা বলিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, তুমি কি প্রকৃতই মরণকে এত ভয় কর?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হাঁ প্রভু।' 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর উপর রাগ করিও না। এ যে কেবল এই জন্মেই মরণভয়ে ভীত তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন : —]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে বাস করিতেন। ঐ সময়ে রাজা তাঁহার মঙ্গলহস্তীকে নিশ্চল ও নির্ভয় থাকিতে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গজাচার্য্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাকে আলানের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেন, এবং তোমর-হস্তে উহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিশ্চল থাকা শিখাইতেন। এই শিক্ষাপ্রাপ্তির সময় যে দারুণ যন্ত্রণা হইত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গজবর

একদিন আলান ভাঙ্গিয়া গজাচার্য্যদিগকে দূর করিয়া দিল এবং হিমালয়ে চলিয়া গেল। গজাচার্য্যরা তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মঙ্গলহস্তী হিমালয়ে গিয়াও সর্ব্বদা মরণভয়ে কম্পিত হইত। সামান্য বায়ুর শব্দেও তাহার ত্রাস জন্মিত এবং সে উহা শুনিবামাত্র ইতস্তত শুণ্ড সঞ্চালন করিতে করিতে মহাবেগে পলায়ন করিত। সে ভাবিত বুঝি আলানেই নিবদ্ধ আছি এবং নিশ্চলতা শিক্ষা করিতেছি। এইরূপ উদ্বেগে তাহার শরীরের বল গেল, চিত্তের স্ফূর্ত্তি গেল, সে নিয়ত কম্পমান দেহে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থা দেখিয়া একদিন বৃক্ষদেবতা বিটপস্কন্ধে সমাসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

শুষ্ক শাখা শত শত ভাঙ্গিতেছে অবিরত বায়ুবেগে এই বনমাঝে;
তাতে যদি পাও ভয়, হবে রক্তমাংস-ক্ষয়; এ ভীরুতা তোমায় না সাজে।

বৃক্ষদেবতা হস্তীকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তদবধি সে নির্ভয়ে বিচরণ করিত।

* * *

[কথান্তে এই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই গজ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

---

১০৬. উদঞ্চনি-জাতক[১]

[এক ভিক্ষু কোন স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [তদবৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বর্ণিত হইবে]। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। শাস্তা ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, তুমি প্রণয়াসক্ত হইয়াছ এ কথা সত্য কি?' ভিক্ষু কহিলেন, 'হাঁ ভগবন।' 'কোন রমণী তোমার প্রণয়পাত্রী?' 'অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারী।' 'সে তোমার অনিষ্টকারিণী; তাহারই জন্য পূর্ব্বে তোমার চরিত্রস্খলন হইয়াছিল এবং তুমি কামাতুর হইয়া বিচরণ করিয়াছিলে। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তুমি পুনরায় শান্তিলাভ করিয়াছিলে।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

---

[১]। উদঞ্চনি = ঘটিকা বা ছোট বালতি (সংস্কৃত 'উদঞ্চন')।

চুল্লনারদকাশ্যপ জাতকে অতীত বস্তু যেরূপ বিবৃত হইবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফলসহ তপোবনে প্রত্যাগমন করিয়া কুটীরের দ্বারোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পুত্রকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি অন্যদিন কাষ্ঠ আহরণ কর, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া থাক, অগ্নি জ্বালিয়া রাখ; অদ্য কিন্তু ইহার কিছুই কর নাই; বিষণ্ন বদনে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি?'

তাপসবালক বলিল, 'পিতঃ, আপনি যখন বন্যফল সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, তখন এক রমণী আসিয়া আমাকে প্রলোভন দ্বারা তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আপনার অনুমতি বিনা যাইতে পারি না বলিয়া তাহাকে অমুক স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। এখন অনুমতি দেন ত তাহার সঙ্গে যাই।' বোধিসত্ত্ব দেখিলেন পুত্রের প্রেমরোগ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। তিনি বলিলেন, 'বেশ, যাইতে পার; কিন্তু ঐ রমণীর যখন মৎস্য, মাংস খাইবার অভিলাষ জন্মিবে, কিংবা ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে, এবং 'ইহা আন', 'উহা আন' বলিয়া সে তোমায় বিব্রত করিয়া তুলিবে, তখন এই শান্তিময় তপোবনের কথা স্মরণ করিবে এবং এখানে ফিরিয়া আসিবে।'

পিতার অনুমতি পাইয়া তাপসকুমার সেই রমণীসহ লোকালয়ে গমন করিল। তাহাকে আপন বশে পাইয়া রমণী আজ 'মাংস আন', কাল 'মৎস্য আন' বলিয়া যখন যাহা আবশ্যক হইত আনয়নের জন্য আদেশ করিতে লাগিল। তখন তাপসকুমার ভাবিল, 'এই রমণী আমাকে নিজের ভৃত্য বা ক্রীতদাসের ন্যায় পীড়ন করিতেছে।' সে একদিন পলায়ন করিয়া তপোবনে ফিরিয়া গেল এবং পিতাকে বন্দনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিল :

যে সুখে ছিলাম পূর্ব্বে তোমার চরণতলে
হরিল সে সব মম, মায়াবিনী মায়াবলে।
নামে সে বনিতা মোর, কাজে কিন্তু প্রভু হয়,
দাসবৎ পালি আজ্ঞা হয়েছে শরীরক্ষয়।
রমণী ঘটিকাসমা, তুলি জল বারবার,
ঘটিকা নিঃশেষ করে কূপ আদি জলাধার;
সেইরূপ বামাগণ ক্রমে কুহকের বলে
পুরুষের পুরুষত্ব হরি লয় অবহেলে।

তখন বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'বৎস যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এস, মৈত্রী ও কারুণ্য ভাবনা কর।' অনন্তর তিনি পুত্রকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার এবং কৃৎস্ন পরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন; তাহার বলে সে অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং দেহান্তে পিতার সহিত ব্রহ্মলোকে

বাস করিতে লাগিল।

* * *

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনা শেষ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন এই স্থূলাঙ্গী কুমারী ছিল সেই কুহকিনী এবং এই প্রেমাসক্ত ভিক্ষু ছিল সেই তাপস কুমার।

---

১০৭. সালিত্তক-জাতক[১]

[এক ভিক্ষু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া একটা হংস নিহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষু শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্তকুলজাত। তিনি অব্যর্থ সন্ধানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। একদিন তিনি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করেন। কিন্তু শিক্ষা কিংবা আচার অনুষ্ঠান কিছুতেই তাঁহার উন্নতি ঘটে নাই। একদা তিনি এক দহর ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া অচিরবতী নদীতে[২] গিয়াছিলেন। অবগাহনান্তে তাঁহারা নদীপুলিনে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটী শ্বেত হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া উপসম্পন্ন ভিক্ষু দহর ভিক্ষুকে বলিলেন, ‘আমি পশ্চাতের হংসটীকে লোষ্ট্র দ্বারা চক্ষুতে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতেছি।’ দহর ভিক্ষু বলিলেন, ‘পাতিত করিলে আর কি! তুমি উহাকে আহত করিতেও পারিবে না।’ ‘আচ্ছা দেখ, আমি উহার এক পার্শ্বের চক্ষুতে লোষ্ট্র বিদ্ধ করিয়া অপর পার্শ্বের চক্ষুর ভিতর দিয়া বাহির করিতেছি।’ ‘মিছামিছি প্রলাপ বলিতেছ কেন?’ ‘তুমি দাঁড়াইয়া দেখনা আমি কি করি।’ অনন্তর তিনি অঙ্গুলি দ্বারা একটী ত্রিকোণ প্রস্তরখণ্ড লইয়া সেই হংসটীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরখণ্ড বন্‌বন্‌ করিয়া ছুটিল; হংসটী বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া থামিল। অনন্তর উড্ডনবিরত হংস কিসের শব্দ জানিবার নিমিত্ত যেমন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই ভিক্ষু একটা মসৃণ লোষ্ট্র লইয়া উহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে তাহা ঐ চক্ষু ভেদ করিয়া অপর চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া গেল।

---

[১]। পালিটীকাকার ইহার এই অর্থ করেন :—সালিত্ত = শর্করাক্ষেপণ। শর্করা = উপলখণ্ড, লোষ্ট্র। পাঠান্তর ‘সালিতক’।

[২]। অযোধ্যা দেশস্থ নদী—বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী।

হংসটী তখন আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। দহর ভিক্ষু তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'তুমি বড় অন্যায় কাজ করিলে। চল তোমাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাই।' অনন্তর দহর ভিক্ষু শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা প্রবীণ ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'তুমি অতীত কালেও এইরূপ লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিপুণ ছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন রাজপুরোহিত এমন মুখর ও বহুভাষী ছিলেন, যে তিনি কথা আরম্ভ করিলে অন্য কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবসর জুটিত না। ইহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করিতে পারে এমন একটী লোক পাইলে ভাল হয়।' তদবধি তিনি সেইরূপ একটী লোক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীতে লোষ্ট্রনিক্ষেপনিপুণ এক খঞ্জ বাস করিত। ছেলেরা তাহাকে এক ক্ষুদ্র রথে চড়াইয়া নগরদ্বারে টানিয়া লইয়া যাইত। সেখানে শাখাপল্লবযুক্ত এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। ছেলেরা তাহার তলে খঞ্জকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, এবং তাহার হস্তে কাকিণী[১] প্রভৃতি দিয়া বলিত, 'একটা হাতী কর,' 'একটা ঘোড়া কর' ইত্যাদি। খঞ্জ ক্রমান্বয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া যে, যেরূপ বলিত, বটপত্রগুলি সেই আকারে কাটিয়া দেখাইত। এই কারণে উক্ত বৃক্ষটীর প্রায় সমস্ত পত্রই ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল।

একদিন রাজা উদ্যানগমনকালে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজার রথ আসিতেছে দেখিয়া ছেলেরা পলাইয়া গেল। খঞ্জ বেচারি একাকী সেখানে পড়িয়া রহিল। রাজা যখন বৃক্ষমূলে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন পত্রসমূহের সচ্ছিদ্রতাবশত বটচ্ছায়া শবলীকৃত হইয়াছে। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রায় সমস্ত পত্রই সচ্ছিদ্র। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন এক খঞ্জ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পাতাগুলির উক্তরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভবত এই লোকটীর দ্বারা ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করা যাইতে পারে।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'খঞ্জ কোথায়?' রাজপুরুষেরা চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহাকে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাইল এবং রাজার নিকট বলিল, 'মহারাজ, 'এই সেই খঞ্জ।' রাজা তাহাকে নিকট আনাইয়া সহচরদিগকে

---

[১]। একপ্রকার ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা (১০২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, 'আমার সভায় একজন অতিমুখর ব্রাহ্মণ আছেন। তুমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পার কি?'

খঞ্জ উত্তর দিল, 'মহারাজ, যদি শুষ্ক অজবিষ্ঠাপূর্ণ একটা নালী পাই তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পারি।' ইহা শুনিয়া রাজা সেই খঞ্জকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাহাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দিলেন। ঐ যবনিকায় একটী ছিদ্র রহিল; রাজা তদভিমুখে ব্রাহ্মণের আসন স্থাপন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ যথাসময়ে রাজদর্শনে আগমন করিয়া উক্ত আসনে উপবেশন করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এমন অনর্গলভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, যে অন্য কাহারও একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবার অবসর রহিল না। এই সময়ে খঞ্জ যবনিকার ছিদ্রপথে এক একটী অজবিষ্ঠাপিণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেগুলি ব্রাহ্মণের তালুর ভিতর গিয়া মক্ষিকার মত পড়িতে লাগিল, এবং যেমন পড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ সেগুলি এক একটী করিয়া তৈলবিন্দুর ন্যায় উদরসাৎ করিলেন। এরূপ নালীস্থ সমস্ত অজবিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত হইল।

এক নালী অজবিষ্ঠা ব্রাহ্মণের উদরস্থ হইয়া ক্রমে ফুলিয়া অর্দ্ধ আঢ়কপ্রমাণ হইল।[১] রাজা সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি অজবিষ্ঠার পরিমাণ ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি এমনই মুখর যে কথা বলিতে বলিতে একনালী অজবিষ্ঠা গিলিয়া ফেলিলেন, অথচ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না! একবারে বোধহয় ইহার অধিক জীর্ণ করিতে পারিবেন না। এখন গৃহে যাউন, প্রিয়ঙ্গু-জল[২] খাইয়া বমন করুন, তাহা হইলে সুস্থ হইতে পারিবেন।'

তদবধি সেই ব্রাহ্মণের মুখ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে চাহিলেও তিনি কথা বলিতেন না। রাজা ভাবিলেন, 'এই খঞ্জের কৌশলবলেই আমার কাণ জুড়াইয়াছে।' অতএব তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষমুদ্রা আয়ের চারিখানি গ্রাম দান করিলেন। ঐ গ্রামগুলির এক এক খানি বারাণসী রাজ্যের এক এক দিকে অবস্থিত ছিল।

বোধিসত্ত্ব একদিন রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, পৃথিবীতে কোন না কোন কাজে নৈপুণ্যলাভ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য। দেখুন, কেবল লোষ্ট্রনিক্ষেপ নৈপুণ্যের বলেই এই খঞ্জ বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছে।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

যাহার যে কাজ, তাহাতেই তার নৈপুণ্য কল্যাণ-কর;
লোষ্ট্র নিক্ষেপণে নিপুণ বলিয়া খঞ্জ চতুর্গ্রামেশ্বর।

---

[১]। আঢ়ক—৪০৯৬ মাষা অর্থাৎ প্রায় ৪ সের।

[২]। প্রিয়ঙ্গু—কাঙনি; পিপ্পলি। এখানে বোধহয় 'পিপ্পলি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই খঞ্জ, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার পণ্ডিত অমাত্য।]

----

১০৮. বাহ্য-জাতক

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী মহাবনস্থ কুটাগারশালায় অবস্থিতিকালে জনৈক লিচ্ছবিরাজ[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হইয়া বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একদা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি বহু উপকরণ দান করিয়াছিলেন। ইঁহার ভার্য্যা এত স্থূলাঙ্গী ছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলে স্ফীতশব বলিয়া মনে হইত; তাঁহার বেশবিন্যাসও অতি কদর্য্য ছিল।

ভোজনাবসানে শাস্তা লিচ্ছবিরাজকে ধন্যবাদ দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দান করিবার পর গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'দেখ, লিচ্ছবিরাজ কেমন সুপুরুষ; তিনি কিরূপে এই স্থূলাঙ্গী ও হীনবেশা ভার্য্যার সংসর্গে সুখী হইতে পারেন?' এই সময়ে শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবিরাজ পূর্ব্বেও এক স্থূলাঙ্গীর প্রণয়াসক্ত ছিলেন।' অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন জনপদবাসিনী হীনবেশা এক স্থূলাঙ্গী রমণী গৃহস্থদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন রাজভবনের প্রাঙ্গণের নিকট দিয়া যাইবার সময় মলবেগে পীড়িত হইল এবং অবনতদেহে নিজের পরিচ্ছদটী চারি পাশে বিস্তারপূর্ব্বক নিমেষের মধ্যে মলত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাজা একটা বাতায়নের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তিনি জনপদবাসিনীর এই সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যে রমণী রাজপ্রাঙ্গণসমীপে মলত্যাগ করিবার

---

[১]। বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। যে সকল ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই 'রাজা' উপাধি ভোগ করিতেন।

সময় এইরূপে লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক নিজের পরিচ্ছদে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া পলকের মধ্যে বেগপীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, সে নিশ্চিত নীরোগ; তাহার বাসস্থানও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। যে পুত্রের জন্ম পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহে, সে নিজেও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং পুণ্যবান হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে আমার অগ্রমহিষী করিতে হইবে।' অনন্তর রাজা যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহ হয় নাই, তখন তিনি তাহাকে রাজভবনে আনাইয়া অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রমণী অচিরে রাজার অতিপ্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন এবং এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র উত্তরকালে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব জনপদবাসিনীর সৌভাগ্য দেখিয়া এক দিন রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, যখন এই পুণ্যবতী রমণী লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক প্রতিচ্ছন্নভাবে মলত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন এবং ঈদৃশ সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন, তখন লোকে শিক্ষিতব্য বিষয় কেন শিক্ষা করিবে না?' অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

নিজে যাহা জানে তাহা ভাল ভাবি মনে
শিখিতে বিরত আছে কত শত জনে।
না চলি তাদের পথে বুদ্ধিমান জন
শিক্ষিতব্য শিখি লয় করি প্রাণপণ।
বাহ্য-জনপদজাতা রমণীরতন,
লজ্জাশীলতায় তোষে নৃমণির মন।

যাহারা শিক্ষিতব্য বিষয় শিক্ষা করে, মহাসত্ত্ব এইরূপে তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

---

১০৯. কুণ্ডক-পূপ-জাতক[১]

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্যাদির জন্য শ্রাবস্তীনগরে এক এক সময়ে এক এক ব্যবস্থা হইত। কখনও এক এক গৃহস্থ একাকীই ঐ ভার লইতেন; কখনও তিন চারি জন গৃহস্থ, কখনও এক একটী সম্প্রদায়, কখনও কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অধিবাসী, কখনও বা সমস্ত নগরবাসী চাঁদা তুলিয়া ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদিদানে পরিতুষ্ট করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী লোকে সম্মিলিত হইয়া ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে প্রথমে যাগু পান করাইয়া পরে পিষ্টক দিতে হইবে।

ঐ পথের পার্শ্বে এক অতি নিঃস্ব ব্যক্তির বাস ছিল। সে মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিত। সে ভাবিল, 'আমার যাগু দিবার সাধ্য নাই; অতএব আমি পিষ্টক দিব।' সে তুষ হইতে কিছু মিহি কুঁড়া যোগাড় করিল, উহা জলে ভিজাইল, আকন্দের পাতা দিয়া জড়াইল এবং উত্তপ্ত ভস্মের মধ্যে রাখিয়া পাক করিল। এইরূপে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সে স্থির করিল এই পিষ্টক স্বয়ং বুদ্ধকে দান করিতে হইবে। সে উহা হাতে লইয়া বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অনন্তর যেমন পিষ্টক পরিবেষণের কথা হইল, অমনি সে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের পাত্রে নিজের পিষ্টক দান করিল। অপর সকলেও বুদ্ধকে পিষ্টক দিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই কুণ্ডক-পিষ্টকই আহার করিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ প্রসন্নচিত্তে এক অতিদরিদ্রপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক আহার করিয়াছেন, অচিরে এই কথা মহা কোলাহলে সমস্ত নগরে রাষ্ট্র হইল। দৌবারিক হইতে মহামাত্য ও রাজা পর্য্যন্ত সকলে সেখানে সমবেত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ওহে, এই খাদ্য লও,' 'এই দুই শত মুদ্রা লও', 'এই পঞ্চশত মুদ্রা লও' এবং ইহার বিনিময়ে আমাদিগকে তোমার সুকৃতির অংশ দান কর।[২] সে ভাবিল, 'শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কি কর্ত্তব্য।' সে তাঁহার নিকটে গিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, 'ধন গ্রহণ কর এবং সর্ব্বপ্রাণীকে

---

[১]। কুণ্ডক = কুঁড়া।

[২]। পুণ্যবিক্রয়ের কথা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যেও দেখা যায়। রোমের পোপ সেন্টপিটারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অর্থের বিনিময়ে Indulgence নামক যে পুণ্যক্রিয়ের পত্রী দান করিতেন তাহা ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

তোমার সুকৃতির ফল দাও।' এই আদেশ পাইয়া সে ধন গ্রহণ আরম্ভ করিল। তখন উপস্থিত জনসঙ্ঘ মুক্তহস্তে ধনবর্ষণ করিতে লাগিল। এক জনে এক মুদ্রা দিল ত আর একজনে দুই মুদ্রা, আর একজনে চার মুদ্রা, আর একজনে অষ্টমুদ্রা এইভাবে—উত্তরোত্তর একে অপরকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্থদান করিল এবং ক্ষণকালমধ্যে সেই দুর্গত ব্যক্তি নবকোটি সুবর্ণের অধিপতি হইল।

এদিকে শাস্তা নগরবাসীদিগকে ভোজনের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে ইহা জানাইয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করাইয়া ও বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া, গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাজা সায়ংকালে ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে ডাকাইয়া শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহাদুর্গতপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক ঘৃণা করা দূরে থাকুক, শাস্তা উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন, মহাদুর্গত প্রচুর বিভব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' এই সময় শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও যখন বৃক্ষদেবতা ছিলাম তখন এই ব্যক্তির কুণ্ডক-পিষ্টক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার প্রসাদে এ শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক এরণ্ড বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেছিলেন। তখন গ্রামবাসীরা ইষ্টসিদ্ধি-কামনায় দেবদেবীর পূজা করিত। একদিন কোন পর্ব্বাহে তাহারা উপাস্য বৃক্ষদেবতাদিগকে পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দুর্গত ব্যক্তি অন্য সকলকে স্ব স্ব বৃক্ষদেবতাকে পূজা করিতে দেখিয়া নিজে এক এরণ্ড বৃক্ষকে পূজা করিবার সঙ্কল্প করিল। অন্য সকলে দেবতাদিগের জন্য মাল্য, গন্ধ, বিলেপন ও নানাবিধ মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিয়াছিল; দুর্গত ব্যক্তি কেবল একখানি কুণ্ডক-পিষ্টক ও এক ওড়ং জল আনয়ন করিল এবং এরণ্ড তরুর অদূরে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'দেবতারা নাকি উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করেন? আমার দেবতা কখনও এই কুণ্ডক-পিষ্টক আহার করিবেন না। অতএব বৃক্ষমূলে সমর্পণ করিলে ইহা কেবল নষ্ট করা হইবে। তাহা না করিয়া বরং আমি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলি।' এই স্থির করিয়া সে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন বোধিসত্ত্ব তরুস্কন্ধ হইতে বলিলেন, 'ভদ্র, ঐশ্বর্য্য থাকিলে তুমি আমাকে নিশ্চিত মধুর খাদ্য দান করিতে। কিন্তু তুমি দরিদ্র। আমি যদি তোমার পিষ্টক না খাই, তবে আর কি খাইব! আমাকে আমার প্রাপ্য বলি হইতে বঞ্চিত করিও না।' অনন্তর

তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

ভক্তের জুটিবে যাহা, দেবতারা লন তাহা,
তার চেয়ে ভাল আর পাইবেন কেমনে?
কুণ্ডক-পিষ্টক তব, পাইলে প্রসন্ন হব;
ওই মোর প্রাপ্য বলি, এনেছ যা যতনে।

ইহা শুনিয়া দুর্গত ব্যক্তি ফিরিল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া পূজা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই সুখাদ্য পিষ্টক আহার করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি কি মানসে আমায় পূজা দিলে বল?' সে বলিল, 'প্রভু, আমি অতি দরিদ্র; যাহাতে দুঃখ ঘুচে, সেই নিমিত্ত পূজা দিয়াছি।' 'তোমার চিন্তা নাই; তুমি যাঁহাকে পূজা করিলে তিনি কৃতজ্ঞ। এই এরণ্ড বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে নিধিপূর্ণ অনেকগুলি কলস নিহিত আছে। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে একটার গলার সহিত আর একটা গলা ঠেকিয়াছে। তুমি গিয়া রাজাকে এই কথা জানাও এবং সমস্ত ধন শকট বহন করিয়া রাজভবনের অঙ্গনে পুঞ্জ করিয়া রাখ। তাহাতে রাজা অতিমাত্র প্রীত হইয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিবেন।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্গত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল এবং রাজা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রসাদে সেই দুর্গত ব্যক্তি মহাসম্পত্তির অধিপতি হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

* * *

[সমবধান—তখন এই দুর্গত ব্যক্তি ছিল সেই দুর্গত ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম সেই এরণ্ড বৃক্ষদেবতা।]

---

১১০. সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) সবিস্তার বর্ণিত হইবে।

---

১১১. গর্দ্দভ-প্রশ্ন

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে বর্ণিত হইবে।

---

১১২. অমরাদেবী-প্রশ্ন[১]

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে বর্ণিত হইবে।

----

১১৩. শৃগাল-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ, দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া গয়শিরে চলিয়া গিয়াছেন; 'শ্রমণ গৌতম যাহা করেন তাহা ধর্ম্ম নহে, আমি যাহা করি তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ মিথ্যা বাক্যে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সপ্তাহে দুই দিন উপোসথের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' তাঁহারা এইরূপে দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই কথা শুনিতে পাইলেন। তখন শাস্তা কহিলেন, 'দেবদত্ত কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও মিথ্যাবাদী ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন শ্মশানবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। একদা বারাণসী নগরে কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল এবং নগরবাসীরা যক্ষদিগকে পূজা দিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা চত্ত্বরে ও রাজপথে মাংস ছড়াইয়া ও সুরাপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিল।[২]

নিশীথ সময়ে এক শৃগাল নর্দ্দামা দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ মৎস্য মাংস খাইল, সুরাপান করিল এবং এক গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শৃগাল দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে, আর বাহির হইয়া যাইবার সময় নাই। কাজেই সে পথের ধারে লুকাইয়া রহিল। সে অনেক লোককে ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিল, কিন্তু কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। অনন্তর এক ব্রাহ্মণ মুখ ধুইতে যাইতেছেন দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল, 'ব্রাহ্মণেরা ধনলোভী; ইহাকে ধনের লোভ দেখাইয়া যাহাতে আমাকে কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা

---

[১]। অমরাদেবী রাজা মহৌষধের মহিষী। বোধিসত্ত্ব একবার মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ মহৌষধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

[২]। এখনও চড়কপূজা উপলক্ষে পিশাচাদিকে এইরূপে বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া যে মনুষ্যভাষায় 'ওহে ব্রাহ্মণ', এইরূপ সম্বোধন করিল।

ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'কে আমায় ডাকে?' শৃগাল বলিল, 'আমি ডাকিয়াছি।' 'কেন?' 'দেখুন, আমার দুইশত কাহণ ধন আছে। আপনি যদি আমায় কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া এমনভাবে নগরের বাহিরে লইয়া যান যে কেহ দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ঐ ধন আপনাকে দিব'। ব্রাহ্মণ ধনলোভে বলিলেন, 'উত্তম কথা।' তিনি শৃগালকে সেইভাবে বহন করিয়া নগরের বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর, এ কোন যায়গা?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'অমুক যায়গা।' 'আরও একটু যাইতে হইবে।' এইরূপে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে হইতে শৃগাল শেষে মহাশ্মশানের নিকট উপস্থিত হইলে বলিল, 'এইখানে আমার নামাইয়া দিন।' ব্রাহ্মণ তাহাকে সেখানে নামাইয়া দিলেন। তখন শৃগাল কহিল, 'ব্রাহ্মণ, এখন ভূমির উপর আপনার উত্তরীয় খানি বিস্তৃত করুন।' ব্রাহ্মণ ধনলোভে উত্তরীয় বিস্তৃত করিলে শৃগাল আবার কহিল 'এই বৃক্ষমূল খনন করুন।' ব্রাহ্মণ তদনুসারে ভূমিখননে প্রবৃত্ত হইলেন; ইত্যবসরে শৃগাল উত্তরীয় বস্ত্রের উপর উঠিয়া উহার চতুষ্কোণে ও মধ্যভাগে মলমূত্রত্যাগপূর্ব্বক উহা মলাক্ত ও মুত্রসিক্ত করিয়া শ্মশানে চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষশাখা হইতে এই গাথা বলিলেন :

একে শিবা, তাহে মত্ত সুরাপান করি;
বিশ্বাস করিলে তারে, বুদ্ধি বলিহারি!
দুই শত কার্ষাপণ, সেত বড় কথা;
কপর্দ্দক শতমাত্র পাবে না ক হেথা।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এখন যাও, উত্তরীয় ধুইয়া ও স্নান করিয়া গৃহে গমন কর এবং নিজের কাজকর্ম্ম দেখ।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন; ব্রাহ্মণও 'কি ঠকাই ঠকিলাম' ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষভাবে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

* * *

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী বৃক্ষ-দেবতা।]

---

১১৪. মিতচিন্তি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ 'স্থবির' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন জনপদের নিকটস্থ অরণ্যে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার দর্শনলাভার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং পাথেয় সংগ্রহপূর্ব্বক 'আজ যাইব', 'কাল যাইব' করিতে করিতে এক মাস কাটাইলেন। তাহার পর আবার পাথেয় সংগ্রহ হইল, পূর্ব্ববৎ আরও একমাস কাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন মাস অতিবাহিত হইল।

অলসতাবশত নিবাসন-স্থানে একাদিক্রমে তিনমাস কাটাইয়া অবশেষে তাঁহারা সেখানে হইতে সত্য সত্যই যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিহারস্থ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসিলেন, 'আজ অনেক দিন হইল আপনারা বুদ্ধোপসনা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার এত বিলম্ব হইল কেন?' স্থবিরদ্বয় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল খুলিয়া বলিলেন। তচ্ছ্রবনে সঙ্ঘস্থ সকলে তাঁহাদের অলসতার কথা জানিতে পারিল; ধর্ম্মসভাতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই কথা শুনিলেন এবং স্থবিরদ্বয়কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা সত্যই কি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়াছিলে?' স্থবিরদ্বয় বলিলেন, 'হাঁ ভগবন, আমরা প্রকৃতই নিতান্ত অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম।' শাস্তা বলিলেন, 'তোমরা পূর্ব্বেও এইরূপ আলস্যবশত বাসস্থান পরিহারে বিরত হইয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীর নিকটস্থ নদীতে বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী ও মিতচিন্তী নামে তিনটী মৎস্য উপনীত হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে বন্য অঞ্চলে বাস করিত, পরে নদীর স্রোতোবেগে লোকালয়-সমীপস্থ এই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ভীত হইয়া মিতচিন্তী অপর মৎস্যদ্বয়কে বলিল, 'দেখ, লোকালয়সমীপস্থ স্থান বিপদজ্জনক ও ভয়োৎপাদক। এখানে কৈবর্ত্তেরা নানারূপ জাল ও ঘোনা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মাছ ধরিয়া থাকে। চল, আমরা আরণ্যপ্রদেশে ফিরিয়া যাই।' কিন্তু অপর দুইটী মৎস্য আলস্যের ও খাদ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া আজ না কাল করিতে করিতে তিন মাস কাটাইল। অতঃপর একদিন কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নদীতে জাল ফেলিল। বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী খাদ্যানুসন্ধানে অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধের ন্যায় জাল দেখিতে না পাইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মিতচিন্তী পশ্চাতে আসিতেছিল; সে জালগ্রন্থি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহার সঙ্গিদ্বয় জালকুক্ষিগত হইয়াছে। তখন সে এই আলস্যান্ধ মৎস্যদ্বয়ের জীবন-রক্ষার

সঙ্কল্প করিল। অনন্তর সে জালের এক পাশ দিয়া সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যে সে যেন জাল ভেদ করিয়া সেখানে গিয়াছে। তাহার পর সে জালের পশ্চাদ্ভাগেও গিয়াও জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া কৈবর্ত্তেরা সিদ্ধান্ত করিল, মাছগুলা জাল ছিঁড়িয়া পলাইতেছে। তাহারা জালরক্ষা করিবার জন্য উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া তুলিতে লাগিল এবং সেই অবসরে বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী মুক্তিলাভ করিয়া জলে পতিত হইল। মিতচিন্তী কৌশলবলে এইরূপে তাহাদের জীবনরক্ষা হইল।

* * *

[শাস্তা অতীত কথা শেষ করিয়া অভিসম্বুদ্ধভাবে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী পড়ি কৈবর্ত্তের জালে
লভিল জীবন শেষে মিতচিন্তী-বুদ্ধিবলে।

অতঃপর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া স্থবিরদ্বয় স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন এই স্থবিরদ্বয় ছিল বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী; এবং আমি ছিলাম মিতচিন্তী।]

☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যদ্‌ভবিষ্য নামধেয় মৎস্যত্রয়ের আখ্যায়িকার তুলনা আবশ্যক।]

---

১১৫. অনুশাসক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে এক অনুশাসিকা[১] ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক সম্ভ্রান্ত কুলজাতা। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করেন; কিন্তু তদবধি তিনি শ্রমণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল খাদ্যলালসায় ব্যস্ত থাকিতেন। নগরের যে অংশে অন্য ভিক্ষুণীরা যাইতেন না, তিনি সেই অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতেন। সেখানে লোকে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিত। উদরসর্ব্বস্বা ভিক্ষুণী মনে করিতেন, 'যদি অন্য ভিক্ষুণীরা এখানে আগমন করে তাহা হইলে আমার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে

---

[১]। যে সর্ব্বদা অপরকে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দেয়।

অন্য কেহ নগরের এ অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় না আসিতে পারে।’ এই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া বলিতেন, ‘অমুক স্থানে একটা পাগলা হাতী, অমুক স্থানে একটা ক্ষেপা ঘোড়া, অমুক স্থানে একটা খেঁকী কুকুর আছে; এ সকল অতি ভয়ানক স্থান। সাবধান, তোমরা কেহ এরূপ স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইও না।’ এ কথা শুনিয়া কোন ভিক্ষুণী সে অঞ্চলের দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাকাইতেন না।

উদরসেবারতা ভিক্ষুণী একদিন নগরের এই অংশে ভিক্ষা করিতে গিয়া যেমন তাড়াতাড়ি একবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি একটা প্রকাণ্ড ভেড়া ঢু মারিয়া তাহার উরুদেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন লোকজন জুটিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিয়া বাঁধিল মাচায় তুলিয়া উপাশ্রয়ে লইয়া গেল। ভিক্ষুণীরা তখন পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘তুমি আমাদিগকে এত সাবধান করিতেন; অথচ নিজে নিষিদ্ধস্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া আসিলেন।’

অচিরে এই কথা ভিক্ষুসমাজে রাষ্ট্র হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই ভিক্ষুণীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘এই ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন, অথচ নিজেই সেই নিষিদ্ধ স্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া মেষশৃঙ্গ-প্রহারে ভগ্নপদা হইলেন।’ এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ‘এই ভিক্ষুণী পূর্ব্বেও অপরকে সাবধান করিয়া দিত, কিন্তু নিজে তদনুসারে চলিত না এবং সেইজন্য দুঃখ ভোগ করিয়াছিল।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষীদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র পক্ষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক প্রচণ্ডা পক্ষিণী খাদ্যান্বেষণে এক রাজপথে চরিতে আরম্ভ করিল। সেখানে শকট হইতে ধান, মুগ প্রভৃতি শস্য পড়িয়া যাইত। সেই সমস্ত পাইয়া সে ভাবিল, ‘এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে এখানে অন্য কোন পক্ষী চরিতে না আইসে।’

ইহা স্থির করিয়া সে অন্যান্য পক্ষীদিগকে সাবধান করিয়া দিল, ‘দেখ, রাজপথে নানা আশঙ্কা। সেখান দিয়া হাতী ঘোড়া যাইতেছে, ভয়ানক ষাঁড়গুলা গাড়ী টানিতেছে। হঠাৎ উড়িয়া যাওয়াও সহজ নহে। অতএব সাবধান, তোমরা সেখানে চরিতে যাইও না।’ সে প্রতিদিন পক্ষীদিগকে এইরূপ সতর্ক করিত বলিয়া তাহারা তাহার ‘অনুশাসিকা’ এই নাম রাখিয়াছিল।

একদিন অনুশাসিকা রাজপথে চরিবার সময় শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল অতিবেগে একখানি শকট আসিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইল এবং ভাবিল, 'এখনও অনেক দূরে আছে; আরও কিছুক্ষণ চরা যাউক।' সে পুনর্ব্বার চরিতে আরম্ভ করিল, এদিকে শকটখানি বায়ুবেগে আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। অনুশাসিকা উড়িয়া যাইবার অবসর পাইল না; শকটচক্র তাহার দেহ দ্বিধা ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যখন সমাগত পক্ষীদিগকে গণিতে লাগিলেন, 'তখন অনুশাসিকাকে না দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ আদেশ দিলেন। পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজপথে তাহার দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বকে জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তাই ত! সে অন্য পক্ষীদিগকে বারণ করিত; আর নিজেই নিষিদ্ধ স্থানে চরিতে গিয়া প্রাণ হারাইল!' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

অন্যেরে সতর্ক করে, নিজে কিন্তু লোভবশে
নানা বিঘ্নসমাকুল নিষিদ্ধ স্থানেতে পশে।
অনুশাসিকার প্রাণ চক্রাঘাতে গেল, হায়,
ছিন্ন দেহ রাজপথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।

* * *

[সমবধান—তখন এই অনুশাসিকা ভিক্ষুণী ছিল সেই অনুশাসিকা পক্ষিণী এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

---

১১৬. দুর্ব্বচ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে; পূর্ব্বেও অবাধ্যবশত পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত কর নাই এবং তন্নিবন্ধন শক্তির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব লঙ্ঘননটকুলে[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতি প্রজ্ঞাবান ও উপায়কুশল হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এক আচার্য্যের নিকট শক্তিলঙ্ঘন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শক্তিলঙ্ঘনক্রীড়াদি প্রদর্শন করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ঐ আচার্য্য নৃত্যকালে চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিতে পারিতেন; কিন্তু কিরূপে পাঁচটি শক্তি লঙ্ঘন করিতে হয় তাহা জানিতেন না। একদিন কোন গ্রামে ক্রীড়া প্রদর্শন করাইবার সময় তিনি কিন্তু নেশার ঝোঁকে পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া পাঁচটা শক্তিই যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আচার্য্য, আপনি ত পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করার কৌশল জানেন না। অতএব একটা তুলিয়া লউন। পাঁচটাই লঙ্ঘন করিতে গেলে আপনি পঞ্চম শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইবেন; তাহাতে আপনার অপমৃত্যু ঘটিবে।'

আচার্য্য তখন প্রমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের কথা না শুনিয়া বলিলেন, 'তুমি আমার ক্ষমতা জান না।' অনন্তর তিনি চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিয়া যেমন পঞ্চমটী লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি উহার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া, মধুকপুষ্প যেমন বৃন্ত হইতে ঝুলিতে থাকে সেইভাবে, ঝুলিতে ঝুলিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াই আপনি প্রাণ হারাইলেন। 'অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :

করিনু নিষেধ তবু দিলেনা ক কাণ,
অসাধ্য সাধিতে গিয়া হারাইলে প্রাণ।
লঙ্ঘিলে চারিটী শক্তি;—সাধ্য ছিল এই,
পঞ্চত্ব, পঞ্চম চেষ্টা লঙ্ঘিবারে যেই।

বোধিসত্ত্ব ইহা বলিয়া আচার্য্যকে শক্তি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম তাঁহার অন্তেবাসিক।]

---

[১]। লঙ্ঘন-নর্ত্তক, যাহারা রজ্জু প্রভৃতির উপর শারীরকৌশলসাধ্য নৃত্যাদি দেখায়; বাজিকর (acrobat)।

১১৭. তিত্তির-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যাহারা দেবদত্তের কুপরামর্শে বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ করিয়াছিল, কোকালিক তাহাদের অন্যতম। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু তর্কায্য-জাতকে (৪৮১) বলা হইবে। শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কোকালিক কেবল এজন্মেই যে নিজের মুখের দোষে বিনষ্ট হইয়াছে, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে এই কারণে বিনষ্ট হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্যব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে যত ঋষি ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ঋষির গুরু হইয়া হিমালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতেন।

একদা পাণ্ডুরোগগ্রস্ত এক তপস্বী কুঠার দ্বারা কাঠ চিরিতেছিলেন। এক বাচাল তপস্বী তাহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি 'এখানে এক কোপ মার', 'ওখানে এক কোপ মার' এইরূপ অযাচিত পরামর্শ দিয়া রুগ্ন তপস্বীর ক্রোধোদ্রেক করিলেন। রুগ্ন তপস্বী ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি এখন কাঠচেরা কাজে আমার আচার্য্য হইলে নাকি?' ইহা বলিয়াই তিনি সেই তীক্ষ্ণকুঠার উত্তোলনপূর্ব্বক এক আঘাতে মুখর তপস্বীকে নিহত ও ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব তাহার শারীরকৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

এই সময়ে আশ্রমের অবিদূরে কোন বল্মীকপাদে একটা তিত্তির থাকিত। সে সকালে ও সন্ধ্যায় বল্মীকাগ্রে বসিয়া নিয়ত টী, টী শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া এক ব্যাধ বুঝিল এখানে তিত্তির আছে। সে শব্দানুসরণে অগ্রসর হইয়া তিত্তিরটাকে মারিয়া লইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব আর তিত্তিরের ডাক শুনিতে না পাইয়া তপস্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অমুক স্থানে যে একটী তিত্তির ছিল, তাহার আর ডাক শুনা যায় না কেন?' তপস্বীরা তাঁহাকে তিত্তিরবধবৃত্তান্ত জানাইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় একত্র করিয়া ঋষিদিগের নিকট এই গাথা পাঠ করিলেন :

> অসময়ে উচ্চরবে বাচাল হইয়া
> পরশু-প্রহারে প্রাণ গেল দুর্মেধের;

---

[১]। কোকালিক দেবদত্তের সম্প্রদায়ভূক্ত জনৈক পাষণ্ড। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সারাদিন উচ্চরবে ডাকিয়া ডাকিয়া
আনিল শমনে ডাকি তিত্তির নিজের।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই অনধিকারচর্চ্চী তাপস, আমার শিষ্যগণ ছিল অপর সকল তাপস এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

---

১১৮. বর্ত্তক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রকে[১] লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। উত্তর-শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীনগরের এক মহাবিভবশালী ব্যক্তি। এক পুণ্যবান পুরুষ ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ব্রহ্মার ন্যায় মনোহর বপু ধারণ করিয়াছিলেন।

একদা শ্রাবস্তীনগরে কার্ত্তিকোৎসব[২] ঘোষিত হইল এবং সমস্ত নগরবাসী উৎসবে মাতিল। উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহচর অন্যান্য শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি এতকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন যে কামাদি কোন রিপুই তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিত না। তাঁহার সহচরগণ স্থির করিল, এই উৎসবের জন্য তাঁহাকেও একটী রমণী আনিয়া দিতে হইবে। তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, 'বন্ধু, কার্ত্তিকমহোৎসব আরব্ধ হইয়াছে; আমাদের একান্ত ইচ্ছা তোমার জন্য একজন রমণী আনয়ন করি। তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে বেশ আমোদ প্রমোদ করিতে পারিব।' তিনি বলিলেন, 'রমণীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' কিন্তু বন্ধুগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অবশেষে তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইল, এক বর্ণদাসীকে[৩] সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। এবং শ্রেষ্ঠীপুত্রের নিকট যাও বলিয়া তাহাকে শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

রমণী শ্রেষ্ঠীপুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু তিনি একবারও তাহার

---

[১]। উত্তর-শ্রেষ্ঠি = প্রধানশ্রেষ্ঠি।

[২]। ১৫০ সংখ্যক জাতকেও এই উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। এই উৎসব কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত হইত।

[৩]। বর্ণদাসী = গণিকা।

দিকে দৃকপাত করিলেন না; তাহার সহিত একটী কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি আমার ন্যায় পরম রূপবতী ও রসবতী রমণীকে পাইয়াও একবার মাত্র এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। দেখা যাউক নারীসুলভ বিলাস-বিভ্রম দ্বারা ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি কি না। অনন্তর সে মুনি-মনোহর হাবভাব প্রকটিত করিয়া এবং মুক্তাপঙ্ক্তিনিভ দন্তরাজি বিকশিত করিয়া স্মিতমুখে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। কিন্তু তাহার দন্ত দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রের মনে অস্থি-ভাবনার উদয় হইল। তিনি অস্থিসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সেই রমণীর লাবণ্যময় দেহ তাঁহার নিকট কেবল অস্থিবিনির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।' রমণী তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় এক ধনশালী ব্যক্তি রাজপথে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে অর্থ দিয়া নিজ ভবনে লইয়া গেলেন।

সপ্তাহান্তে কার্ত্তিকোৎসব শেষ হইল। কন্যা তখনও ফিরিল না দেখিয়া সেই বর্ণদাসীর মাতা শ্রেষ্ঠীপুত্রদিগের নিটক গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মেয়ে কোথায়?' তাহারা উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রের গৃহে দিয়া ঐ রমণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিলেন, 'আমি তাহাকে তখনই বিদায় দিয়াছি।'

বর্ণদাসীর মাতা বলিল, 'আমার মেয়েকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও।' ইহা বলিতে বলিতে সে উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ সেই রমণীকে লইয়া তোমার গৃহে দিয়াছিল কি না?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, মহারাজ।' 'তবে এখন সে কোথায়?' 'তাহা আমি জানি না।' আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম।' 'তুমি এখন তাহাকে আনয়ন করিতে পার কি?' 'না মহারাজ, আমার সে সাধ্য নাই।' তখন রাজা কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন, 'এ যদি সেই কন্যাকে আনিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে ইহার প্রাণদণ্ড কর।'

তখন রাজপুরুষেরা 'ইঁহার প্রাণদণ্ড করিব' বলিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রের হস্তদ্বয় পৃষ্টের দিকে বন্ধন করিল এবং তাঁহাকে মশানে লইয়া চলিল। শ্রেষ্ঠীপুত্র এক বর্ণদাসীকে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল হইল। সমবেত জনসজ্ঘ বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'প্রভু, এ কি হইল? আপনি বিনা অপরাধে দণ্ডভোগ করিলেন!'

শ্রেষ্ঠীপুত্র ভাবিলেন, 'গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম বলিয়াই এই কষ্ট পাইলাম। যদি ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করি তাহা হইলে সম্যকসম্বুদ্ধ মহাগৌতমের নিকট

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’

এদিকে সেই বর্ণদাসীও কোলাহল শুনিতে পাইল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল। তখন সে ‘সরে যাও, সরে যাও, রাজপুরুষদিগকে আমায় দেখিতে দাও’ ইহা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে মশানের দিকে ছুটিল এবং রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্র বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া নদীতে গিয়া স্নান করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রাতরাশান্তে জনকজননীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তিনি ভিক্ষুজনোচিত চীবরাদি গ্রহণপূর্ব্বক বহু অনুচরের সহিত শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে বন্ধনরূপ কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে করিতে অচিরে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুগণ উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রের গুণাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘ইনি আপৎকালে ত্রিরত্নশাসনের উৎকর্ষ উপলব্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মুক্তি লাভ করিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। সেই সুচিন্তার ফলেই ইনি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবং প্রব্রাজক হইয়া এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন।’ এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রের আপৎকালে ‘মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব’ এই চিন্তা দ্বারা মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। অতীতকালেও পণ্ডিতেরা আপৎকালে এই উপায়েই দুঃখসাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব জন্মান্তরগ্রহণরূপ নিয়মবশাৎ বর্ত্তক যোনিতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময় এক বর্ত্তক ব্যাধ বনে গিয়া বর্ত্তক ধরিত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইত এবং যখন তাহারা বেশ মোটা সোটা হইত তখন বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বহুবর্ত্তকের সহিত বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘এই ব্যক্তি আমায় যে খাদ্য ও পানীয় দিবে, আমি যদি তাহা গ্রহণ করি তাহা হইলে এ আমায় বিক্রয় করিবে। কিন্তু আমি যদি সে সব স্পর্শ না করি, তাহা হইলে এত

কৃশ হইব যে কেহই আমায় ক্রয় করিবে না; তখন বোধহয় আমার উদ্ধারের পথ হইবে। অতএব আমার পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব পানাহার হইতে বিরত হইলেন এবং অস্থিচর্ম্মাসার হইয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহাকে ক্রয় করিতে চাহিল না। ব্যাধ অন্য সমস্ত বর্ত্তক বিক্রয় করিয়া খাঁচাখানি আনিয়া দ্বারদেশে রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে হস্তে লইয়া তাঁহার কি অসুখ করিয়াছে দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন ব্যাধ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, তখন পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক উড্ডয়ন করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া অন্য সকল বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, 'এতদিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন? কোথা গিয়াছিলে?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'এক ব্যাধ আমায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।' 'কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?' 'সে আমায় যে খাদ্য দিয়াছিল তাহার কণামাত্র স্পর্শ করি নাই; যে পানীয় দিয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র পান করি নাই। এই উপায়েই আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

পরিণামচিন্তা বিনা সুফল না ঘটে;
পরিণামচিন্তা বলে উত্তরি সঙ্কটে।
পরিণাম ভাবি আমি অন্নজল ত্যজি
ব্যাধবন্ধমুক্ত হয়ে ফিরিয়াছি আজি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ নিজের কৃতকার্য্যের ব্যাখ্যা করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত বর্ত্তক।]

---

১১৯. অকালরাবি-জাতক

[এক ভিক্ষু অসময়ে চীৎকার করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তীনগরে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন, উপদেশও গ্রহণ করিতেন না। কখন কোন কৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে, কখন তথাগতের অর্চ্চনা করিতে হইবে, কখন শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তিনি এসব কিছুই জানিতেন না। প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, সমস্ত রাত্রি, এমন কি যখন লোকে জাগিয়া থাকিত তখনও, তিনি কেবল বিকট চীৎকার করিতেন; তজ্জন্য অন্য ভিক্ষুরা নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,

'অমুক ভিক্ষু এবংবিধ রত্নশাসনে প্রবেশ করিয়াও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কালাকাল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না।' শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বকালেও অকালরাবী ছিল এবং কালাকাল না জানিয়া চীৎকার করিত বলিয়া গ্রীবাদেশে দৃঢ়রূপে ধৃত হইয়া শ্বাসরোধবশত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই শিষ্যদিগের এক কুক্কুট ছিল; সে যথাকালে ডাকিত। তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক পাঠ অভ্যাস করিত।

কিয়ৎকাল পরে ঐ কুক্কুট মরিয়া গেল। তখন শিষ্যেরা আর একটী কুক্কুটের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর এক শিষ্য শ্মশানবনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া একটী কুক্কুট দেখিতে পাইল এবং তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ কুক্কুট শ্মশানে বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া কোন সময়ে ডাকা উচিত তাহা জানিত না; কাজেই কখনও নিশীথকালে, কখনও বা অরুণোদয় সময়ে ডাকিয়া উঠিত। তাহার ডাক শুনিয়া নিশীথ সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শিষ্যেরা পাঠ আরম্ভ করিত; কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িত এবং নিদ্রালস্যহেতু পাঠেও মনঃসংযোগ করিতে পারিত না। আবার কুক্কুট যখন প্রভাত হইবার পর ডাকিত তখন তাহারা পাঠের জন্য আদৌ অবসর পাইত না। এইরূপে কুক্কুটের অকালরব নিবন্ধন তাহাদের পাঠের মহা বিঘ্ন ঘটিল দেখিয়া শিষ্যেরা একদিন তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল এবং আচার্য্যকে সেই কথা জানাইল।

আচার্য্য তাহাদের উপদেশার্থ বলিলেন এই কুক্কুট প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হয় নাই বলিয়াই বিনষ্ট হইল। অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

মাতাপিতা কিংবা আচার্য্যোপাধ্যায়
করে নাই এর শিক্ষার বিধান;
সেই হেতু এই কুক্কুটের, হায়,
জন্মে নাই কভু কালাকালজ্ঞান।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন এবং পৃথ্বীতলে আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অকালরাবি কুক্কুট; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

১২০. বন্ধনমোক্ষ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে ব্রাহ্মণকুমারী চিঞ্চা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। চিঞ্চার বৃত্তান্ত মহাপদ্ম-জাতকে (৪৭২) সবিস্তর বলা হইবে।

শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, চিঞ্চা যে এই জন্মেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহা নহে; অতীতকালেও সে আমার উপর অমূলক দোষারোপ করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তির পর যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি নিজেই রাজপুরোহিত হইলেন।

একদা বারাণসীরাজ অগ্রমহিষীকে একটী বর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভদ্রে। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।' মহিষী বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! আমি কোন দুর্লভ বর চাহি না; আপনি এখন হইতে অনুরাগভরে অন্য কোন রমণীকে অবলোকন করিবেন না এইমাত্র প্রার্থনা করি।' রাজা প্রথমে এই অঙ্গীকার করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু মহিষী এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইয়াছিলেন যে শেষে তাঁহাকে অগত্যা ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী ছিল; কিন্তু তদবধি তিনি তাহাদের কাহারও দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

ইহার কিছুদিন পরে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে অশান্তি উপস্থিত হইল। প্রত্যন্তস্থিত সৈনিকেরা দস্যুদিগের সহিত দুই তিনবার যুদ্ধ করিয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইল 'আমরা দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে পারিতেছি না।' তখন রাজা স্বয়ং সেখানে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া এক বৃহৎ বাহিনী সুসজ্জিত করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি মহিষীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! আমি প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইতেছি; সেখানে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে কাহারও জয় কাহারও বা পরাজয় ঘটিবে। তাদৃশ স্থান রমণীদিগের বাসের অনুপযুক্ত। অতএব তুমি রাজধানীতেই অবস্থিতি কর।'

মহিষী পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ আপনাকে ছাড়িয়া আমি

থাকিতে পারিব না; কিন্তু রাজার নিতান্ত অমত দেখিয়া শেষে বলিলেন, 'তবে অঙ্গীকার করুন যে এক এক যোজন গিয়া আমার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসার্থে এক একজন লোক পাঠাইবেন?' রাজা বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করিব।' অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের উপর রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া সেই মহতী সেনার সহিত যাত্রা করিলেন, এবং এক এক যোজন যাইবার পর মহিষীর নিকট এক একজন লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন, 'যাও, আমার কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া মহিষী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' এই সকল লোকের প্রত্যেকে যখন রাজধানীতে উপস্থিতি হইত তখন মহিষী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কি হে, রাজা তোমায় কি নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন?' সে বলিত, 'আপনি কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত।' মহিষী বলিতেন, 'তবে এস', এবং তাহাকে লইয়া পাপাচরণ করিতেন। রাজা বত্রিশ যোজন গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষীর সকাশে একে একে বত্রিশ জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। মহিষী তাহাদের সকলের সঙ্গেই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়া দস্যুদমনপূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসীদিগের ভয়াপনোদন করিলেন এবং রাজধানীতে প্রতিগমন করিবার সময়েও মহিষীর নিকট পূর্ব্ববৎ বত্রিশ জন লোক পাঠাইলেন। মহিষী ইহাদেরও সহিত পাপাচরণ করিলেন। এদিকে রাজা নগরের পুরোভাগে উপনীত হইয়া জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিয়া পাঠাইলেন—'নগরবাসীদিগকে আমার অভিনন্দনার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিন।' বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় সমস্ত নগরে রাজার অভিনন্দনার্থ উদ্যোগ হইল; অতঃপর তিনি রাজভবনেও যথোচিত আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে গমন করিয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিয়া মহিষী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং বলিলেন, 'এস, ব্রাহ্মণ! আমরা আমোদপ্রমোদ করি।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'দেবি, এমন কথা মুখে আনিবেন না। রাজা পিতৃস্থানীয়; আমিও পাপকে ভয় করি; অতএব আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম।' মহিষী বলিলেন, 'চৌষট্টি জন বার্ত্তাবহ ত রাজাকে গুরু বলিয়া মনে করে নাই, পাপের ভয়েও ভীত হয় নাই। তবে তুমিই বা কেন রাজাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া পাপের ভয় করিতেছ?'

'আমি যেরূপ ভাবিতেছি, তাহারাও যদি সেইরূপ ভাবিত, তবে কখনও পাপে প্রবৃত্ত হইত না। আমি জানিয়া শুনিয়া এরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারিব না।'

'কেন এত প্রলাপ বকিতেছ?' যদি আমার কথামত কাজ না কর, তাহা হইলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকিবে না।'

'মাথাই কাটুন। এ জন্মে মাথা কাটা যাউক, আর শতসহস্র জন্মেই মাথা

কাটা যাউক, আমি কিছুতেই এরূপ পাপে লিপ্ত হইব না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

বোধিসত্ত্বকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া মহিষী শয়নকক্ষে গিয়া নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি দাসীদিগকে বলিয়া দিলেন, 'রাজা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস যে আমার অসুখ করিয়াছে।'

ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রত্যুদগমন করিলেন। অনন্তর রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, এবং মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দেবী কোথায়?' পরিচারিকা উত্তর দিল, 'তাঁহার অসুখ করিয়াছে।' তখন রাজা শয়নাগারে গিয়া মহিষীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'ভদ্রে! তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে?' মহিষী প্রথমে নীরব রহিলেন; কিন্তু রাজা একবার, দুইবার, তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে শেষে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি জীবিত থাকিতেই কি আমার ন্যায় হতভাগিনীকে পরপুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে?' 'প্রিয়ে! তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।' 'আপনি যে পুরোহিতের উপর নগররক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি প্রাসাদপর্য্যবেক্ষণের ছলে এখানে আসিয়া আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা মুখে আনা যায় না। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই বলিয়া তিনি আমায় মনের সাথে প্রহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

অগ্নির মধ্যে লবণ বা শর্করা ফেলিয়া দিলে তাহা যেমন চিট্‌মিট্‌ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, মহিষীর কথা শুনিয়া রাজাও ক্রোধবশে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া দ্বারবান ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ দিলেন, 'এখনই পুরোহিতকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যেরূপ করা হয় সেইভাবে নগরের বাহিরের মশানে লইয়া যাও এবং সেখানে তাহার শিরশ্ছেদ কর।' ভৃত্যগণ তখনই ছুটিয়া গেল এবং বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া বধ্যভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'দুষ্টা মহিষী পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত আমার সম্বন্ধে রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছেন। এখন আমাকে নিজের বলেই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।' অতঃপর তিনি রাজভৃত্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা আমাকে প্রথমে রাজার নিকট লইয়া চল, পরে আমায় বধ করিবে।' তাহারা বলিল, 'কেন, এরূপ করিতে যাইব কেন?' 'আমি রাজার কর্ম্মচারী; রাজার কার্য্যে বহু পরিশ্রম করিয়াছি; এক স্থানে প্রচুর গুপ্তধন আছে; তাহা কেবল

আমিই জানি; ঐ ধন রাজার প্রাপ্য; কিন্তু তোমরা আমায় রাজার নিকট না লইয়া গেলে উহা তাঁহার হস্তগত হইবে না। অগ্রে রাজাকে ঐ ধনের কথা বলিতে দাও, তাহার পর তোমরা তোমাদের কাজ করিও।'

ইহা শুনিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে ব্রাহ্মণ! তোমার কি লজ্জা হইল না? তুমি এমন দুষ্কার্য্য করিলে কেন?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'মহারাজ! আমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি কখনও পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণহানি করি নাই; কেহ দান না করিলে পরের তৃণশলাকাটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নাই; লোভবশে চক্ষু মেলিয়া পরস্ত্রীর দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই; কুশাগ্রেও মদ্য স্পর্শ করি নাই। মহারাজ! আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সেই চপলা রমণীই লোভবশে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমাকে শাসাইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের পূর্ব্বকৃত পাপের কথাও বলিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ! আবার বলিতেছি আমি নিরপরাধ। আপনার পত্র লইয়া যে চৌষট্টি জন লোক আসিয়াছিল, তাহারাই অপরাধী। আপনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা মহিষীর আদেশমত কার্য্য করিয়াছিল কি না।'

রাজা তখন সেই চৌষট্টি জন পত্রবাহককে বন্ধন করাইয়া মহিষীকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহাদের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিলে কি না সত্য বল।' মহিষী দোষ স্বীকার করিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, 'পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া এই চৌষট্টি জনের মুণ্ডপাত কর।'

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ইহাদেরই বা দোষ কি? ইহারা দেবীর আদেশমত তাঁহারই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব ইহারা নিরপরাধ ও ক্ষমার যোগ্য। আবার ভাবিয়া দেখিলে দেবীরও দোষ দেখা যায় না, কারণ স্ত্রীজাতির দুষ্প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়া, যাহা জাতিস্বভাব তাহা দূরতিক্রম; অতএব মহারাজ, তাঁহাকেও ক্ষমা করুন।' এইরূপে রাজাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব সেই চৌষট্টি জন পুরুষ ও মহিষীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! পণ্ডিতেরা বন্ধনের অযোগ্য হইলেও মূর্খদিগের অসার অভিযোগে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতদিগের যুক্তিগর্ভ বাক্যে বন্ধনমুক্ত হইল। অতএব মূর্খের কাজ হইতেছে বন্ধনের অযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করা, পণ্ডিতের কাজ হইতেছে মূর্খকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া।'

মূর্খ বক্তা যথা, পণ্ডিতের তথা সদা বন্ধনের ভয়;
পণ্ডিত-বচনে কিন্তু মূর্খ জনে বন্ধনবিমুক্ত হয়।

মহাসত্ত্ব এই গাথাদ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া বলিলেন, ‘আমি সংসারে রহিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখ পাইলাম। আমার আর সংসারে কাজ নাই; এখন আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।’ অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন; জ্ঞাতিজনের সাশ্রুনয়নে, নিজের বিপুল বৈভব, কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

হিমালয়ে অবস্থিতি করিয়া বোধিসত্ত্ব ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

* * *

[সমবধান—তখন চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই দুষ্টা মহিষী; আনন্দ ছিল রাজা; এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

---

১২১. কুশনালী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদের বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিগণ পুনঃপুন বলিতেন, ‘মহাশ্রেষ্ঠীন, এই ব্যক্তি জাতিগোত্রধনধান্যাদি কোন বিষয়েই আপনার তুল্যকক্ষ নহে; উচ্চকক্ষ হওয়া ত দূরের কথা। ইহার সঙ্গে মিত্রতা করিবার হেতু কি? আপনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করুন।’ অনাথপিণ্ডদ এই সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না; তিনি বলিতেন, ‘নীচকক্ষ, তুল্যকক্ষ, উচ্চকক্ষ, সকলের সঙ্গেই মিত্রতা করা যাইতে পারে।’ তিনি একবার সেই বন্ধুর উপর গৃহরক্ষার ভার দিয়া ভূসম্পত্তি পরিদর্শনার্থ শ্রাবস্তী হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর, কালকর্ণী-জাতকে (৮৩) যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ সমস্ত ঘটিল। অনাথপিণ্ডদ গৃহে ফিরিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শাস্তা বলিলেন, ‘গৃহপতি, যে প্রকৃত মিত্র, সে কখনও নীচকক্ষ হইতে পারে না। মিত্রধর্ম্মপ্রতিপালন করিবার ক্ষমতাই মিত্রতার প্রমাণ। যে প্রকৃত মিত্র, সে জাতিগোত্রাদি সম্বন্ধে নীচকক্ষ হউক বা তুল্যকক্ষ হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই সবিশেষ সম্মানের পাত্র, কারণ তাহার উপর যে ভারই সমর্পণ করা যাক না কেন, সে তাহা সযত্নে বহন করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি তোমার প্রকৃত মিত্র বলিয়াই তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে। পুরাকালেও এক প্রকৃত মিত্র দেববিমান রক্ষা করিয়াছিলেন।’ অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজোদ্যানে এক কুশগুচ্ছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই উদ্যানের মঙ্গলশিলার[১] নিকটে একটী সরল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা-পরিশোভিত অতিসুন্দর রুচিবৃক্ষ[২] ছিল। (ঐ বৃক্ষের নামান্তর মুখ্যক)। রাজা এই বৃক্ষের বড় আদর করিতেন। এই বৃক্ষেও এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে প্রভূত ক্ষমতাশালী কোন দেবরাজ ছিলেন।[৩] বোধিসত্ত্বের সহিত এই দেবতার মিত্রতা জন্মিয়াছিল।

বারাণসীরাজ এক একস্তম্ভ প্রাসাদে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন স্তম্ভটী বড় জীর্ণ হইয়াছিল। রাজভৃত্যগণ যখন দেখিল স্তম্ভটী নড়িতেছে, তখন তাহারা রাজাকে জানাইল। রাজা সূত্রধরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ‘বাপ সকল, আমার মঙ্গলপ্রাসাদের স্তম্ভটী নড়িতেছে। একটী সারবান স্তম্ভ আনিয়া প্রাসাদ নিশ্চল কর। তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া রাজার আদেশ গ্রহণ করিল এবং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তদনুরূপ বৃক্ষ না পাইয়া শেষে উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং সেই মুখ্যক বৃক্ষ দেখিয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, ‘কিহে, স্তম্ভের উপযুক্ত বৃক্ষ পাইলে কি?’ ‘তাহারা বলিল, ‘হাঁ মহারাজ, একটা পাইয়াছি বটে; কিন্তু উহা আমরা কাটিতে চাই না।’ ‘কাটিতে চাও না কেন?’ ‘আমরা অন্য কোথাও উপযুক্ত বৃক্ষ না পাইয়া উদ্যানে গিয়াছিলাম; সেখানেও মঙ্গলবৃক্ষ ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ পাইলাম না যাহাতে আমাদের কাজ হইতে পারে। কিন্তু সেটা যখন মঙ্গলবৃক্ষ, তখন কাটি কি প্রকারে?’ ‘যাও, সেই বৃক্ষই কাট এবং প্রাসাদ স্থির কর। আমি অন্য মঙ্গলবৃক্ষের ব্যবস্থা করিব।’ তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া পূজোপহার লইয়া পুনর্ব্বার উদ্যানে গেল এবং বৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া, ‘কাল আসিয়া কাটিব’ এই বলিয়া চলিয়া গেল।

বৃক্ষদেবতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘হায়, কালই আমার বিমান নষ্ট হইবে। আমি পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া কোথায় যাইব?’ তিনি যাইবার কোন স্থান না পাইয়া সন্তানদিগের গলা ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

---

[১]। মঙ্গলশিলা—রাজার বসিবার শিলা অর্থাৎ রাজা যে শিলায় উপবেশন করেন।

[২]। ‘রুচিবৃক্ষ’ কি বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে wishing tree করিয়াছেন। বোধহয় এই শব্দটি রাজার প্রিয় কোন বৃক্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাঠান্তরেও ‘মঙ্গলরুক্খো’ দেখা যায়।

[৩]। মূলে ‘মহেসাক্খদেবরাজ’ এই পদ আছে। মহেশাখ্য = মহা + ঈশ + আখ্য (প্রভূত-ক্ষমতাশালী)।

বৃক্ষদেবতার বিপদের কথা শুনিলেন, কিন্তু সেই সূত্রধরদিগকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গণপূর্ব্বক নিজেরাও কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় বোধিসত্ত্ব ঐ বৃক্ষদেবতার সহিত দেখা করিবার মানসে সেখানে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'কোন চিন্তা নাই; আমি এই বৃক্ষ ছেদন করিতে দিব না। কাল যখন সূত্রধরেরা আসিবে তখন দেখিবে আমি কি করি।'

এইরূপে বৃক্ষদেবতাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন সূত্রধরদিগকে আগমনসময়ে বহুরূপের[১] বেশ ধারণ করিলেন, তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই মঙ্গলবৃক্ষের নিকট গমন করিলেন এবং উহার মূলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে উপরে উঠিয়া শাখার মধ্যে উপনীত হইলেন। তখন বৃক্ষের কাণ্ডটা বহু ছিদ্রযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব শাখার মধ্যে সমাসীন হইয়া ইতস্তত শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এদিকে সূত্রধরেরা সেখানে গমন করিয়া শাখার মধ্যে বহুরূপ দেখিতে পাইল এবং তাহাদের দলপতি হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া ও আঘাতজনিত শব্দ শুনিয়া বলিল, 'এ বৃক্ষ যে বহুছিদ্রযুক্ত ও সারহীন! কাল ভালরূপ না দেখিয়াই আমরা ইহার পূজা দিয়াছি।' এই বলিয়া তাহারা সেই সারবান ও একঘন[২] মহাবৃক্ষের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় এইরূপে বৃক্ষদেবতার বিমান অক্ষুণ্ন রহিল। অতঃপর তাঁহার বন্ধু দেবগণ[৩] বৃক্ষদেবতার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিমান রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া বৃক্ষদেবতা সানন্দচিত্তে তাঁহার সমক্ষে বোধিসত্ত্বের গুণগান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমরা মহেশাখ্য দেবতা বটে; কিন্তু বুদ্ধির জড়তাবশত বিমানরক্ষার কোন উপায় করিতে পারি নাই; অথচ এই কুশগুচ্ছ দেবতা অদ্ভুত বুদ্ধিবলে আমার বিমান রক্ষা করিয়া দিলেন। উচ্চপদস্থ, তুল্যপদস্থ বা নিম্নপদস্থ সকলের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে; কারণ সকলই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে সাহায্য করিয়া আমাদের দুঃখমোচন ও সুখবিধান করিতে সমর্থ।' অনন্তর তিনি মিত্রধর্ম্ম বর্ণন করিয়া এই গাথা বলিলেন :

জাতিগোত্রকুলে শ্রেষ্ঠ কিংবা সম,
অথবা হউক সর্ব্বাংশে অধম,
প্রকৃত বান্ধব বলি সেই জনে,
বিপদে যে রক্ষা করে প্রাণপণে।

---

[১]। মূলে 'ককন্টক' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'কৃকণ্ঠক' শব্দের অপভ্রংশ।

[২]। একঘন = আগাগোড়া নিরেট।

[৩]। মূলে 'সন্দিট্‌ঠসম্ভট্‌টা' এই পদ আছে। সন্দৃষ্ট = দর্শন মাত্রেই যাহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে। সম্ভক্ত = একান্ত হিতকামী।

বৃক্ষের দেবতা আমি শক্তিমান,
নাই সাধ্য কিন্তু রক্ষিতে বিমান।
কুশের দেবতা, ক্ষুদ্র বলে যারে,
বিপদে উদ্ধার করিল আমারে।

এইরূপে সমাগত দেবতাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, 'অতএব যাহারা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চায় তাহারা, অমুক আমার তুল্যকক্ষ বা উচ্চকক্ষ এরূপ বিচার না করিয়া, বুদ্ধিমান নীচকক্ষস্থ ব্যক্তিদিগেরও সহিত মিত্রতা করিবে।' অতঃপর বৃক্ষদেবতা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ কুশগুচ্ছ-দেবতার সহিত লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই বৃক্ষের দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই কুশগুচ্ছের দেবতা।]

---

১২২. দুর্ম্মেধা-জাতক (২)

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ, দেবদত্ত তথাগতের পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল এবং ব্যামপ্রমপ্রভাকদম্ব-পরিলক্ষিত ও সর্ব্ববিধ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত[১] দিব্য দেহ দেখিয়া ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতেছে। বুদ্ধের এমন রূপ, এমন শীল, এমন সমাধি, এমন প্রজ্ঞা, এমন বিমুক্তি, এমন যুক্তিদান-সামর্থ্য—এ সকল কথা তাহার কর্ণে বিষ বর্ষণ করে; সে সর্ব্বদাই অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে।' ভিক্ষুরা এইরূপে দেবদত্তের নিন্দা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার গুণকীর্ত্তন শুনিয়া অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

[১]। এই রূপের সহিত প্রথম জাতকে বর্ণিত রূপের তুলনা করিতে হইবে। উভয়ত্রই প্রায় একই ভাষায় বুদ্ধের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে (৭৩ পৃষ্ঠা)।

পুরাকালে মগধরাজ্যের রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন হস্তিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ফলত শীলবন্নাগ-জাতকে (৭২) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ জন্মেও তিনি সেইরূপ রূপসম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে মঙ্গলহস্তীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজগৃহ নগর দেবনগরের ন্যায় অলঙ্কৃত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কার-পরিশোভিত মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। পথপার্শ্বস্থ সমস্ত জনসঙ্ঘ মঙ্গলহস্তীর অদ্ভুত রূপ দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইল যে তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, 'অহো, কি সুন্দর রূপ! কি সুন্দর গতি; কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কি সুন্দর সুলক্ষণাবলী! এমন সর্ব্বশ্বেত বারণ রাজচক্রবর্ত্তীদিগেরই উপযুক্ত বাহন।' ফলত তাহারা কেবল মঙ্গল হস্তীরই গুণগান করিতে লাগিল, রাজার নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। ইহা কিন্তু রাজার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি অসূয়াপরবশ হইয়া ভাবিলেন, 'এই হস্তীটীকে পর্ব্বতপ্রপাত[১] হইতে পাতিত করিয়া নিহত করাইতে হইবে।' অনন্তর তিনি গজাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই হস্তীকে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে কর কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ মহারাজ, এই হস্তী অতি সুশিক্ষিত' 'না, এ সুশিক্ষিত নহে, বরং দুঃশিক্ষিত।' 'না মহারাজ, এ সুশিক্ষিত।' 'এ যদি সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তুমি ইহাকে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করাইতে পার কি?' 'হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারি।' 'আচ্ছা, তবে এস দেখি।' ইহা বলিয়া রাজা নিজে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং গজাচার্য্যকে আরোহণ করাইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গেলেন। গজাচার্য্যও গজপৃষ্ঠে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরে উঠিলেন। অতঃপর রাজা পাত্রমিত্রসহ শিখরোপরি আরোহণ করিয়া মঙ্গলহস্তীকে প্রপাতাভিমুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ এই হস্তী সুশিক্ষিত; অতএব ইহাকে তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও। গজাচার্য্য গজস্কন্ধে বসিয়াই অঙ্কুশদ্বারা সঙ্কেত করিলেন, 'গজবর, তুমি তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও।' বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, 'সম্মুখেই দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাও।' মহাসত্ত্ব পশ্চাতের দুই পা তুলিয়া সম্মুখের দুই পায়ের উপর দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, 'পশ্চাতেই দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও।' গজবরও সম্মুখের দুই পা তুলিয়া পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর আদেশ হইল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাইতে হইবে;

---

[১]। প্রপাত = ভৃগু (Precipice)।

গজরাজও তিন পা তুলিয়া এক পায়েই দাঁড়াইলেন।

রাজা যখন দেখিলেন মঙ্গলহস্তী কিছুতেই পড়িয়া যাইতেছে না, তখন তিনি গজাচার্য্যকে বলিলেন, 'যদি সাধ্য থাকে তবে আকাশে দাঁড়াইতে বল।' ইহা শুনিয়া আচার্য্য চিন্তা করিলেন, 'সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইহার ন্যায় সুশিক্ষিত হস্তী আর নাই। রাজা নিশ্চিত ইহাকে প্রপাত হইতে পাতিত করিয়া বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন।' অনন্তর তিনি হস্তীর কর্ণমূলে বলিলেন, 'বৎস, এই রাজা তোমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প। এমন পাষণ্ড কখনও তোমার ন্যায় হস্তীর উপযুক্ত প্রভু নহে। যদি তোমার আকাশ-গমনশক্তি থাকে, তবে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া ব্যোমপথে বারাণসীতে চল।' পূর্ণদ্ধিসম্পন্ন মহাসত্ত্ব সেই মুহূর্ত্তেই আকাশে উত্থিত হইলেন। তখন গজাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, এই হস্তী পূর্ণমাত্রায় ঋদ্ধিমান; তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ ও পাপাচার রাজা ইহার অধিপতি হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পুণ্যবান পণ্ডিত রাজারই এরূপ হস্তিরাজের যোগ্য। তোমার ন্যায় ক্রূর কর্ম্মা ব্যক্তিরা এবংবিধ বাহন পাইলে ইহার মর্য্যাদা বুঝে না। তাহারা বাহন হইতে বঞ্চিত হয় এবং তাহাদের যে কিছু যশ ও মর্য্যাদা থাকে তাহাও বিনষ্ট হয়।' অনন্তর গজস্কন্ধারূঢ় আচার্য্য এই গাথা পাঠ করিলেন :

বশঃপ্রাপ্তি মূর্খদের অনর্থের হেতু হয়;
আত্মদ্রোহী, পরদ্রোহী হেন জন নিঃশংসয়।

এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, 'তবে মহারাজ, আপনি এখানে থাকুন' বলিয়া গজাচার্য্য মঙ্গলহস্তিস্কন্ধে আকাশপথে উত্থিত হইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক রাজাঙ্গনের উপরিভাগে উপনীত হইলেন এবং আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল, যে বারাণসীরাজের জন্য এক উৎকৃষ্ট বাহন আসিয়া রাজাঙ্গনের ঊর্দ্ধস্থ আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকে ছুটিয়া গিয়া রাজাকেও এই সংবাদ দিল। রাজা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি আমার উপভোগের জন্য আসিয়া থাক, তবে ভূতলে অবতরণ কর।' তখন বোধিসত্ত্ব ভূতলে অবতণ করিলেন; গজাচার্য্যও অবরোহণপূর্ব্বক রাজাকে প্রণিপাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'বাপ আমার, তোমরা কোথা হইতে আসিলে?' গজাচার্য্য উত্তর দিলেন, 'রাজগৃহ হইতে।' অনন্তর তিনি রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা কহিলেন, 'তুমি এখানে আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ।' তিনি মনের আহ্লাদে নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তী পদ দিলেন। অতঃপর তিনি রাজ্য তিন ভাগ করিয়া একভাগ বোধিসত্ত্বকে দান করিলেন। একভাগ গজাচার্য্যকে দান করিলেন এবং একভাগ নিজের জন্য

রাখিলেন। বোধিসত্ত্বের আগমনের পর তাঁহার রাজশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইলেন।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মগধরাজ; সারীপুত্র ছিল সেই বারাণসীরাজ; আনন্দ ছিল সেই গজাচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মঙ্গলহস্তী।]

---

১২৩. লাঙ্গলীষা-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই স্থবির ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় কখন কি বক্তব্য, কখন কি অবক্তব্য ইহা জানিতেন না। তিনি মাঙ্গল্যকার্য্যে অমঙ্গলসূচক বচন আবৃত্তি করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, 'প্রাচীরের বহির্ভাগে, প্রতি চৌমাথায় তারা, লুকাইয়া আছে অনুক্ষণ'[২]; আবার কোন অমঙ্গল কার্য্যে তিনি মাঙ্গল্য গাথাপাঠ করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, 'দেবতা, মানস সর্ব্বে পুলকিত-মন' কিংবা 'হেন শুভসংঘটন, হয় যেন পুনঃ পুনঃ ভাগ্যে তব, করি আশীর্ব্বাদ।'

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'স্থবির লালুদায়ীর ঔচিত্যানৌচিত্য জ্ঞান নাই; তিনি সর্ব্বদাই যাহা বলা উচিত নয় তাহা বলিয়া থাকেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মেই তন্দ্রাবশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধহীন হইয়া অযুক্তবাক্য বলিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। সে চিরকালই হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানহীন।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহৈশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া বারাণসী নগরে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজন অতি জড়মতি ছিল।

---

[১]। লাঙ্গল + ঈষা।

[২]। ক্ষুদ্রকপাঠ, ১১।

সে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত; কিন্তু বুদ্ধির জড়তাবশত কিছুমাত্র শিখিতে পারিত না। তথাপি তাহাদ্বারা বোধিসত্ত্বের বড় উপকার হইত, কারণ সে নিয়ত দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব সায়মাশ নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন। ঐ শিষ্য তাঁহার হস্তপাদ পৃষ্ঠাদি টিপিয়া বাহিরে যাইতেছে এমন সময় বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎস, আমার খাটের পায়াগুলি ঠিক করিয়া দিয়া যাও।' শিষ্য একদিকের পায়া ঠিক করিয়া দেখে, অন্যদিকের পায়া নাই; তখন সে নিজের ঊরুর উপর সেই দিক্ স্থাপিত করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। বোধিসত্ত্ব প্রত্যুয়ে নিদ্রাত্যাগ করিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস্য, তুমি এভাবে বসিয়া আছ কেন?' শিষ্য বলিল, 'গুরুদেব, খাটের এদিকে পায়া নাই বলিয়া ঊরুতে রাখিয়া বসিয়া আছি।' এই কথায় বোধিসত্ত্বের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই শিষ্য আমার অতীব উপকারী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত শিষ্যের মধ্যে ইহারই বুদ্ধি জড়; সেই কারণে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। ইহাকে পণ্ডিত করিবার কি কোন উপায় নাই?' অনন্তর তাঁহার মনে হইল, 'এক উপায় আছে। এ যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিবে, তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি দেখিয়াছ ও কি করিয়াছ। এ উত্তর দিবে, এই দেখিয়াছি এবং এই করিয়াছি; তাহা হইলে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিব, যাহা দেখিলে বা যাহা করিলে তাহা কিসের মত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই ইহাকে উপমা প্রয়োগ করিতে হইবে, কার্য্য কারণসম্বন্ধেও ভাবিতে হইবে। এইরূপে নূতন নূতন উপমা প্রয়োগ ও কার্য্যকারণনির্ণয় করাইয়া ইহার পাণ্ডিত্য জন্মাইতে হইবে।'

মনে মনে এই যুক্তি করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস, এখন হইতে তুমি যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহের জন্য বনে যাইবে, তখন যাহা দেখিবে, খাইবে বা পান করিবে, আমায় আসিয়া জানাইবে।' সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিল। অনন্তর একদিন সে সতীর্থগণের সহিত কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া একটা সর্প দেখিতে পাইল এবং চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'আর্য্য, আমি একটা সাপ দেখিয়াছি।' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সর্প কীদৃশ?' শিষ্য উত্তর দিল, 'ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।' বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'উপমাটী সুন্দর হইয়াছে; সর্প দেখিতে অনেক অংশে লাঙ্গলের ঈষার ন্যায়ই বটে। বোধ হইতেছে ইহাকে ক্রমে পণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিব।'

অপর একদিন ঐ শিষ্য বনমধ্যে হস্তী দেখিতে পাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট সেই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, 'হস্তী কীদৃশ?' শিষ্য উত্তর দিল

'ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।' বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, হস্তীর শুণ্ড লাঙ্গলেষার ন্যায় বটে; দন্ত দুইটীও তৎসদৃশ; এ বুদ্ধির জড়তাবশত হস্তীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক, পৃথক বর্ণনা করিতে পারিতেছে না, কেবল শুণ্ডটাকেই লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিতেছে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

আর একদিন ঐ শিষ্য নিমন্ত্রণে ইক্ষু খাইতে পাইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'আচার্য্য, আমি আজ আখ খাইয়াছি' বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইক্ষু কীদৃশ?' শিষ্য উত্তর দিল 'ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।' বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, উপমাটীতে সাদৃশ্যের বড় অভাব; তথাপি তিনি সেদিন কোন কথা বলিলেন না।

পরিশেষে একদিন শিষ্যেরা নিমন্ত্রণে গিয়া দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইল। জড়মতি শিষ্য আসিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'গুরুদেব, আজ আমি দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইয়াছি।' আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দধি, দুগ্ধ কীদৃশ বলত?' শিষ্য উত্তর দিল, 'ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।' ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত; এ যখন সব লাঙ্গলের সদৃশ বলিয়াছিল, তখন উপমটী সুন্দর হইয়াছিল; হস্তী লাঙ্গলীষাসদৃশ, এ কথা বলাতেও শুণ্ড সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল। তাহার পর বলিল ইক্ষু লাঙ্গলীষাসদৃশ; ইহাতেও যে সাদৃশ্যের লেশমাত্র ছিল না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু দধি, দুগ্ধ শুক্লবর্ণ; এই দুই দ্রব্য যে পাত্রে থাকে তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়; এখানে ত উপমাটী সর্ব্বাংশেই অপ্রযোজ্য। এ স্থূলবুদ্ধির শিক্ষাবিধান অসম্ভব। অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

অতি জড় বুদ্ধি এর; অসর্ব্বতোগামিবাক্য সর্ব্বত্র প্রয়োগ করে তাই;
দধি বল, দুগ্ধ বল, কিংবা লাঙ্গলের ঈষা, কিছুর (ই) সম্বন্ধে জ্ঞান নাই।
সেই হেতু বলে মূর্খ দধি যেন লাঙ্গলীষা, শুনি আমি হইনু হতাশ
হেন জনে শিক্ষা দিতে নাহি কেহ পৃথিবীতে; গুরুগৃহে বৃথা এর বাস।

* * *

[সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল সেই জড়বুদ্ধি শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

---

১২৪. আম্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথানিয়মে ধর্ম্মনির্দিষ্ট সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন।[১] কি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের শুশ্রূষার, কি পান ভোজনে, কি উপোসথাগারে, কি স্নানাগারে সমস্ত কার্য্যে এবং সর্ব্বত্র তিনি নির্দিষ্ট নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। ফলত তিনি ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য চতুর্দ্দশ প্রধান নিয়ম এবং অশীতি খণ্ড নিয়ম অবহিতচিত্তে প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। তিনি বিহার, ভিক্ষুদিগের প্রকোষ্ঠসমূহ, চঙ্ক্রমণ স্থান এবং বিহারমার্গ সম্মার্জ্জন করিতেন, পিপাসার্ত্তদিগকে পানীয় দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে প্রতিদিন যথানিয়মে পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজ্য দান করিত। এইরূপে একের গুণে বহুজনের উপকার হইত, বিহারের আয় বৃদ্ধি হইত মর্যাদাও বৃদ্ধি হইত।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই ভিক্ষুর কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'অমুক ভিক্ষুর নিষ্ঠাবলে আমাদের কত লাভ ও সুনাম হইয়াছে; তাঁহার একার গুণে আমরা বহুজনে পরমসুখে আছি।' এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহারই গুণে তখন পঞ্চশত ঋষিকে বন্যফলমূলসংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে হইত না; তাঁহারা আশ্রমে বসিয়াই আহারার্থ ফলমূল প্রাপ্ত হইতেন।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে বাস করিতেন।

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইল; সমস্ত জলাশয় শুকাইয়া গেল; পানীয়ের অভাবে পশুপক্ষীরা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে লাগিল। ইহাদের পিপাসাযন্ত্রণা দেখিয়া একজন তাপসের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি একটা বৃক্ষ ছেদন করিয়া দ্রোণী প্রস্তুত করিলেন এবং উহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলেন। ক্রমে এত প্রাণী জলপান করিতে আসিতে লাগিল যে তাপসের নিজের আহারার্থ ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার অবকাশ রহিল না; কিন্তু তিনি অনাহারে থাকিয়াও তাহাদিগকে জল যোগাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া

---

[১]। মূলে 'বত্তসম্পন্নো' এই পদ আছে। 'বত্ত' (বর্ত্ত) বলিলে ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বুঝায়। চতুর্দ্দশ মহাবত্ত যথা, আগন্তুক বত্ত (অতিথিসৎকার), আবাসিক বত্ত (বিহারবাসী ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য), পিণ্ডচারিক বত্ত (ভিক্ষাচর্য্যাসংক্রান্ত কর্ত্তব্য), আরণ্যবত্ত, ইত্যাদি। এতদভিন্ন বহুবিধ খণ্ডবত্ত আছে, যথা ভিক্‌খাচরিয়বত্ত, ভোজনসালাবত্ত ইত্যাদি।

পশুগণ চিন্তা করিতে লাগিল, ‘এই মহাত্মা আমাদিগকে জল দিবার জন্য নিজের খাদ্যসংগ্রহের অবসর পাইতেছেন না; অনাহারে অতীব কষ্ট পাইতেছেন। এস, আমরা এক ব্যবস্থা করি; আজ হইতে আমরা যখন জলপান করিতে আসিব, তখন ইঁহার জন্য স্ব স্ব বলানুসারে ফল আনয়ন করিব।’ ইহার পর প্রত্যেক পশুই নিজের সাধ্যমত মধুর, অমধুর, আম্র, জম্বু, পনস প্রভৃতি ফল লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন একজন তপস্বীর জন্য এত ফল আসিতে লাগিল যে তাহাতে সার্দ্ধদ্বিশত শকট পূর্ণ হইতে পারিত। আশ্রমস্থ পঞ্চশত তপস্বীও উহা ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিতেন না; যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত, তাহা ফেলিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ‘সৎকার্য্যের কি অদ্ভুত ফল! এই একব্যক্তির ব্রতের বলে এতগুলি তপস্বীকে আর ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইতে হয় না; তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়াই পর্য্যাপ্ত আহার পাইতেছেন। অতএব সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য,’ অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

ছাড়িও না আশা কভু, কর চেষ্টা প্রাণপণে;
নিরুৎসাহ কোন কালে হয় না পণ্ডিত জনে।
নিজে থাকি অনাহারে এই ঋষি নিষ্ঠাবান
জল দিয়া রক্ষিলেন অসংখ্য জীবের প্রাণ;
সেই পুণ্যে হেথা এবে পুঞ্জীকৃত এত ফল;
ভুঞ্জি সুখে নাশে ক্ষুধা এই তাপসের দল।[১]

মহাসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই নিষ্ঠাবান তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাহাদের গুরু।]

---

১২৫. কটাহক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকর্থী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তৎসদৃশ।[২]]

* * *

---

[১]। মহাশীলবজ্‌-জাতকে (৫১) এবং শরভঙ্গমৃগ-জাতকেও (৪৮৩) ও এই মর্ম্মের গাথা আছে।

[২]। সম্ভবত ভীমসেন-জাতকে (৮০)।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে; ঠিক সেই দিন তাঁহার এক দাসীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশু দুইটী এক সঙ্গে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর পুত্র যখন পাঠশালায় লিখিতে যাইত, দাসীর পুত্র তখন ফলক[১] বহন করিয়া তাহার অনুগমন করিত এবং এইরূপে নিজেও লিখিতে শিখিত। অতঃপর দাসীর পুত্র দুই তিনটী শিল্পও শিক্ষা করিল এবং কালক্রমে একজন বচনকুশল ও প্রিয়দর্শন যুবক হইয়া উঠিল। তাহার নাম হইল কটাহক। সে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত হইল।

একদিন কটাহক চিন্তা করিতে লাগিল, 'চিরকাল ভাণ্ডারী হইয়া থাকিলে চলিবে না; সামান্য একটু দোষ দেখিলেই প্রভু আমায় হয় মারিবেন, নয় কারাগারে পাঠাইবেন, নয় দাগা দিবেন এবং আমাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের ন্যায় কদন্নে প্রাণধারণ করিতে হইবে। প্রত্যন্ত প্রদেশে নাকি আমার প্রভুর বন্ধু এক শ্রেষ্ঠী বাস করেন। একবার তাঁহার কাছেই গিয়া দেখি না কেন? এখান হইতে প্রভুর কৃত্রিম স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র লইয়া যাই; পরিচয় দিব যে আমি প্রভুর পুত্র; তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাটাইতে পারিব।'

এইরূপ স্থির করিয়া কটাহক নিজেই এক পত্র লিখিল—'আমার পুত্র অমুক আপনার নিকট যাইতেছে। আপনার ও আমার পরিবারের মধ্যে আদানপ্রদান সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এই পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া নবদম্পতীকে আপাতত আপনার নিকট রাখুন। আমি অবকাশ পাইলেই নিজে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব।' অনন্তর এই পত্র শ্রেষ্ঠীর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, সে যত ইচ্ছা পাথেয় এবং গন্ধবস্ত্রাদিসহ প্রত্যন্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' কটাহক বলিল, 'বারাণসী হইতে।' 'তুমি কাহার পুত্র?' 'আমি বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পুত্র।' 'কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?' 'এই পত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।' ইহা বলিয়া কটাহক শ্রেষ্ঠীর হস্তে সেই পত্র দিল। শ্রেষ্ঠী পত্র পড়িয়া বলিলেন, 'আঃ, এখন আমি বাঁচিলাম।' তিনি মনের উল্লাসে কটাহকের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থার গুণে নবদম্পতী বিস্তর দাস-দাসী লইয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে শীঘ্রই কটাহকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ভক্ষ্যভোজ্য, বস্ত্র, গন্ধ সমস্ত দ্রব্যেরই দোষ ধরিতে লাগিল।' এই অন্ন প্রত্যন্তবাসীদিগের মুখেই ভাল লাগে, এ মিষ্টান্নে কেবল প্রত্যন্তবাসীদিগেরই রুচি হইতে পারে' ইহা

[১]। কাষ্ঠফলক বা ভক্তি; ইহা শ্লেটের কাজ করিত।

বলিয়া সে ভক্ষ্যভোজ্যের নিন্দা করিত। 'মূর্খ প্রত্যন্তবাসীরা কি বস্ত্রের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে? প্রত্যন্তবাসীরা কি গন্ধ পিষিতে জানে বা ফুলের মালা গাঁথিতে পারে?' এইরূপ বলিয়া সে বস্ত্রগন্ধাদিরও দোষ ধরিত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব দাসকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, 'কটাহককে ত দেখিতেছি না; সে কোথায় গেল?' অনন্তর তিনি তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া কটাহককে চিনিতে পারিল এবং বোধিসত্ত্বকে আসিয়া জানাইল। কটাহক কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না।

কটাহকের কীর্ত্তি শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কটাহক বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে; আমি গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি।' অনন্তর তিনি রাজার অনুমতি লইয়া বিস্তর অনুচরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতেছেন, এই সংবাদ অচিরে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তচ্ছ্রবণে কটাহক কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'তাঁহার আসিবার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না; তিনি নিশ্চয় আমারই জন্য আসিতেছেন। আমি যদি এখন পলায়ন করি, তাহা হইলে আর কখনও এখানে ফিরিতে পারিব না। এ সঙ্কটে একমাত্র উপায় এই যে, আমি প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া তাঁহার শরণ লই এবং পূর্ব্ববৎ দাসরূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করি।' তদবধি সে সভাসমিতিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল, 'আজকালকার ছেলেছোক্‌রারা পিতামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করে না; তাহারা ভোজনকালে তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসে। যখন আমার মাতাপিতা আহারে বসেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে থালা, বাটী, গেলাশ, ডাবর, জল ও পান আনিয়া দিই। কদাচ ইহার ব্যতিক্রম করি না।'

প্রভুর সম্বন্ধে দাসের যাহা কর্ত্তব্য, এমন কি, প্রভু শৌচের জন্য প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গেলে দাস কিরূপে জলের কলস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, কটাহক এ সমস্তও সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া কটাহক যখন বুঝিল বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন সে শ্বশুরকে বলিল, 'পিতঃ! শুনিতেছি, আমার জনক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আপনি তাঁহার ভোজনাদির উদ্যোগ আরম্ভ করুন; আমি কিছু উপঢৌকন লইয়া পথেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।' শ্বশুর বলিলেন, 'অতি উত্তম কথা বলিয়াছ।' তখন কটাহক বহুবিধ উপঢৌকন ও বিস্তর অনুচরসহ অগ্রসর হইল এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎসমস্ত তাঁহাকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ঐ সমস্ত গ্রহণ করিলেন, মিষ্টবাক্যে তাহার অভিভাষণ

করিলেন এবং প্রাতরাশকালে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিয়া মলত্যাগার্থ কোন নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া কটাহক নিজের অনুচরদিগকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল, নিজে জলের কলস লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহার উদককৃত্য শেষ হইলে তদীয় পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল, 'প্রভু, আপনি যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে আমার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, তাহার বিলোপ করিবেন না।'

বোধিসত্ত্ব তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'তোমার ভয় নাই, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।' অনন্তর তিনি প্রত্যন্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠী মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কটাহক তখনও দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব সুখাসীন হইলে প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'মহাশ্রেষ্ঠীন, আমি আপনার পত্র পাইয়াই আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।' কটাহক যেন প্রকৃতই তাঁহার পুত্র, এইভাবে বোধিসত্ত্ব যথোচিত প্রিয়বচন দ্বারা প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠীর মনস্তুষ্টি করিলেন। কিন্তু তদবধি তিনি কটাহকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এস মা, আমার মাথার উকুন মার।' শ্রেষ্ঠীকন্যা উকুন মারিলে বোধিসত্ত্ব মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার পুত্রটী সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই অপ্রমত্ত থাকে ত? তুমি তাহার সহিত সুখে সম্প্রীতিতে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছ ত?'

শ্রেষ্ঠীদুহিতা বলিল, 'আর্য্য, আমার স্বামীর অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি ভোজ্যদ্রব্যমাত্রেরই নিন্দা করেন।'

'মা, তাহার এই দোষ চিরকালই আছে। কিন্তু আমি তোমাকে তাহার মুখবন্ধন করিবার মন্ত্র দিতেছি। তুমি এই মন্ত্র অবধান সহকারে অভ্যাস কর; আমার পুত্র ভোজনকালে যখনখাদ্যদ্রব্যের নিন্দা করিবে, তখন তুমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমি যেভাবে বলিতেছি, ঠিক সেইভাবে ইহা পাঠ করিবে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীদুহিতাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া কয়েকদিন পরে বারাণসীতে প্রতিমগন করিলেন। কটাহক বহু উপহার লইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সে সমস্ত দান করিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে কটাহকের দম্ভ আরও বাড়িয়া উঠিল। একদিন শ্রেষ্ঠীদুহিতা স্বামীর জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া স্বহস্তে চমস দ্বারা পরিবেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কটাহক সেই ভোজ্যেরও নিন্দা আরম্ভ করিল।

তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

পরবাসীর বড়াই বেশী, যা খুসী তাই কর,
আসবে আবার মনিব যখন, দেখব কিবা হয়।
জারিজুরি কটাহক তোমার নাহি সাজে,
চুপ্‌টী ক'রে খাবার খেয়ে যাওগো নিজে কাজে।[১]

কটাহক ভাবিল, 'সর্ব্বনাশ! শ্রেষ্ঠী, দেখিতেছি, ইহাকে আমার নাম ও কুলের কথা বলিয়া গিয়াছেন।' তদবধি তাহার দর্প চূর্ণ হইল। সে কখনও ভোজ্যদ্রব্যের নিন্দা করিত না; যাহা পাইত, নীরবে আহার করিত। অনন্তর জীবনাবসানে সে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

* * *

[সমবধান—তখন এই বিকত্থী ভিক্ষু ছিল কটাহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

---

১২৬. অসিলক্ষণ-জাতক

[কোশলরাজের সভায় এক ব্রাহ্মণ ছিল; সে বলিত যে কোন তরবারি সুলক্ষণ, কোন তরবারি দুর্লক্ষণ, তাহা সে জানিতে পারে। এই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

কর্ম্মকারেরা যখন রাজার জন্য কোন তরবারি প্রস্তুত করিত, তখন ঐ ব্রাহ্মণ নাকি কেবল আঘ্রাণ লইয়াই উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত। বস্তুত কিন্তু সে যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত, তাহাদেরই তরবারি সুলক্ষণ ও মঙ্গলজনক বলিয়া প্রশংসা করিত; যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত না, তাহাদের তরবারি অমঙ্গলের নিদান বলিয়া রাজাকে ভয় দেখাইত।

একদিন কোন কর্ম্মকার একখানি তরবারি প্রস্তুত করিয়া উহার কোষের ভিতর কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম মরিচ-চূর্ণ-প্রলেপ করিল এবং রাজাকে উহা আনিয়া দিল। রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এই তরবারি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' ব্রাহ্মণ তরবারি খুলিয়া যেমন আঘ্রাণ লইল, অমনি মরিচচূর্ণ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হাঁচির বেগ জন্মাইল এবং ব্রাহ্মণ এমন জোরে হাঁচি দিল যে

---

[১]। বোধিসত্ত্ব সম্ভবত এই গাথা সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠিকন্যা অর্থ না বুঝিয়া উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথচ কটাহক বুঝিয়াছিল, এরূপ না হইলে আখ্যায়িকাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

তরবারির ধারে প্রতিহত হইয়া তাহার নাক দুই খান হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের নাসাচ্ছেদবৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহারা একদা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'শুনিলাম রাজার অসিলক্ষণ-পাঠক নাকি অসিলক্ষণ পাঠ করিতে গিয়া নিজের নাক কাটিয়া ফেলিয়াছে।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্রাহ্মণ ঘ্রাণ লইতে গিয়া নিজের নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার একজন অসিলক্ষণ-পাঠক ব্রাহ্মণ ছিল। উপরে প্রতুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা বৈদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণের জন্য একটী কৃত্রিম নাসাগ্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং উহা লাক্ষাদ্বারা এমন রঞ্জিত করাইয়াছিলেন যে কেহই উহাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করিত না। এই কৃত্রিম নাসাগ্রসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ আবার রাজসভায় পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে লাগিল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিল না; এক কন্যা ও এক ভাগিনেয় ছিল। তিনি এই দুই জনকেই নিজের কাছে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। নিয়ত একসঙ্গে থাকায় কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমার ভাগিনেয়ই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আমি ইহাকে কন্যাদান করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিব।'[১]

কিন্তু ইহার পর রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'ভাগিনেয় ত একপ্রকার আত্মজস্থানীয়। অন্য কোন রাজকুমারী আনিয়া ইহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাউক; তাহার পর ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব; এবং অন্য কোন রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিব। তাহা হইলে আমার অনেক নাতিপুতি হইবার সম্ভাবনা; তাহারা দুইটী রাজ্যে আধিপত্য করিবে।' অতঃপর অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা স্থির করিলেন, এখন হইতে এই দুইজনকে পৃথক রাখিতে হইবে। তিনি ভাগিনেয়ের জন্য একটী এবং কন্যার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কুমার ও কুমারী উভয়েরই বয়স যখন ষোল

---

[১]। ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে অসঙ্গত ছিল না। মৃদুপাণি-জাতকে (২৬২), বর্দ্ধ-কিশূকর-জাতকে (২৮৩) প্রভৃতি আরও কয়েকটী আখ্যায়িকায় এই প্রথার উল্লেখ দেখা যায়।

বৎসর; এবং উভয়েরই মধ্যে গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।[১] পৃথক হইবার পর, কি উপায়ে মাতুল কন্যাকে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন, কুমার একমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এক উপায় স্থির করিলেন; তিনি এক দৈবজ্ঞাকে[২] ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমায় কি করিতে হইবে, বাবা?' 'মা, আপনি না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। এমন একটী উপায় বলিয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে মাতুলরাজকন্যাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া আনা যাইতে পারে।' দৈবজ্ঞা বলিল, 'উপায় করিয়া দিতেছি, বাবা; আমি রাজার নিকট গিয়া বলিব, 'আপনার কন্যার উপর কালকর্ণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে; ঐ কালকর্ণী এতদিন ধরিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে আপনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না; আমি অমুক দিন রাজকন্যাকে রথে তুলিয়া শ্মশানে লইয়া যাইব। বহুসংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার রক্ষাবিধানে নিযুক্ত থাকিবে, বিস্তর দাস দাসীও সঙ্গে যাইবে। সেখানে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া একটা শবের উপর শয্যা প্রস্তুত করিব এবং রাজকন্যাকে ঐ শয্যায় শোওয়াইয়া অষ্টোত্তর শতঘট গন্ধজলে স্নান করাইব; তাহা হইলেই কালকর্ণী বিদূরিত হইবে।' এই বলিয়া আমি একদিন রাজকন্যাকে শ্মশানে লইয়া যাইব। আপনিও সে দিন কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ লইয়া এবং সায়ুধ অনুচরগণ সঙ্গে করিয়া রথারোহণে, আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, শ্মশানে উপস্থিত হইবেন; রথখানি শ্মশানদ্বারের একপার্শ্বে রাখিয়া দিবেন, অনুচরদিগকে শ্মশানবনে লুক্কায়িত থাকিতে বলিবেন এবং নিজে শ্মশানে গিয়া মণ্ডলোপরি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবেন। আমি সেখানে গিয়া আপনার দেহোপরি শয্যা রাখিয়া রাজকন্যাকে শোওয়াইব; আপনি তখন নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া দুই তিন বার হাঁচিবেন। আপনি হাঁচিবামাত্র আমরা সকলে রাজকন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিব। সেই অবসরে আপনি উঠিয়া রাজকন্যাকে গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাকে অবগাহন করাইয়া ও নিজে অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।' ইহা শুনিয়া কুমার কহিলেন, 'চমৎকার! এ অতি সুন্দর উপায়।'

দৈবজ্ঞা রাজার নিকট গিয়া ঐরূপ বলিল; রাজাও তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর নিষ্ক্রমণ-দিবসে রাজকুমারীকে সমস্ত চক্রান্ত খুলিয়া বলিল এবং তাঁহার রক্ষণ বিধানার্থ যে বহু-সংখ্যক যোদ্ধা যাইতেছিল তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কহিল, 'আমি যখন রাজকন্যাকে মঞ্চের উপর

---

[১]। ইহাতে এবং অন্যান্য আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় তৎকালে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ হইত না।

[২]। মূলে 'মহেক্খণিকা' এই পদ আছে। ঈক্ষণিক = দৈবজ্ঞ—ইংরাজী seer শব্দের স্থানীয়।

তুলিব তখন মঞ্চের নিম্নে যে শব আছে সে হাঁচিবে এবং হাঁচিবার পর মঞ্চতল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই ধরিবে। অতএব তোমরা সকলে সাবধান থাকিবে।

কুমার ইহার পূর্ব্বেই শ্মশানে গিয়া দৈবজ্ঞার উপদেশমত মঞ্চতলে মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন। দৈবজ্ঞা রাজকুমারীকে লইয়া মণ্ডলপৃষ্ঠে উঠিল এবং তাঁহাকে 'ভয় নাই' এই আশ্বাস দিয়া মঞ্চোপরি তুলিয়া দিল। কুমারও সেই সময়ে নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া হাঁচিলেন। ঐ হাঁচি শুনিবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে দৈবজ্ঞা বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজকুমারীকে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া এক প্রাণীরও সেখানে থাকিতে সাহস হইল না; তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে, যে দিকে পারিল, ছুটিয়া গেল। তখন কুমার পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা হইয়াছিল সেই মত সমস্ত করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া গৃহে গেলেন। দৈবজ্ঞাও রাজভবনে গিয়া ব্রহ্মদত্তকে সংবাদ দিল।

রাজা ভাবিলেন, 'আমি বাস্তবিকই ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছিলাম। একত্র লালিত পালিত হইয়া তাহারা দুই জনে পায়সে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় যেন এক হইয়া গিয়াছে।' সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি যথাকালে ভাগিনেয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া কন্যাকে তাঁহার মহিষী করিয়া দিলেন। কুমার রাজপদ লাভ করিয়া মহিষীর সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই অসিলক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণ নবীন ভূপতিরও সভাসদ্ হইল। সে একদিন রাজদর্শনে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহার কৃত্রিম নাসাগ্রের লাক্ষা দ্রবীভূত হইল এবং উহা ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া রাজা পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, 'আচার্য্য, কোন চিন্তা করিবেন না; হাঁচি দ্বারা কাহারও কল্যাণ, কাহারও বা অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। আপনি হাঁচিয়া নিজের নাসিকা ছেদন করিয়াছেন আমি হাঁচিয়া রাজকন্যা ও রাজত্ব পাইয়াছি।' অনন্তর রাজা এই গাথা পাঠ করিলেন :

একের যাহাতে হয় কল্যাণসাধন, তাহাতেই অপরের অনিষ্ট ঘটন।
'ইহাতে নিয়ত শুভ', 'ইহাতে শুধু অশুভ',
মূঢ় জনে এই রূপ বিশ্বাসকারণ হয়ে থাকে বহুবিধ অশান্তি-ভাজন।

রাজা এই গাথা দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

* * *

[শাস্তা এই দেশনদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কোন লক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন শুভসূচক বা অশুভসূচক, লোকের এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক।

সমবধান—তখন এই অসিলক্ষণ পাঠক ছিল সেই অসিলক্ষণ পাঠক এবং আমি ছিলাম ব্রহ্মদত্তের ভাগিনেয়।]

---

১২৭. কলন্দুক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকত্থী ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু কটাহক-জাতকের (১২৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তুর ন্যায়।

*   *   *

এই জাতকে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর এক দাসের নাম কলন্দুক। সে পলায়নপূর্ব্বক প্রত্যন্ত-শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন বহু দাসদাসী লইয়া মহাসুখে বাস করিতেছিল, এবং বারাণসী শ্রেষ্ঠী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার সন্ধান পান নাই, তখন তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ নিজের একটী পোষা শুক পাখী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শুক নানা দিকে বিচরণ করিয়া অবশেষে কলন্দুক যে নগরে বাস করিতেছিল সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কলন্দুক পত্নীর সহিত নদীতে জলকেলি করিতেছিল। সে প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নদীবক্ষে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। সে দেশে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা নদীকেলি করিবার সময় কটুভৈষজ্যমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতেন; ইহার গুণে সমস্ত দিন জলক্রীড়া করিলেও তাঁহাদের সর্দ্দি হইত না। কলন্দুক এই ভৈষজ্য-মিশ্রিত ক্ষীরের এক গণ্ডুষ গ্রহণ করিয়াই মুখ ধুইয়া থু থু করিয়া ফেলিল এবং ঐ থুৎকার শ্রেষ্ঠীদুহিতার মস্তকোপরি পতিত হইল। শুকপক্ষী সেই নদীতীরে গিয়া এক উডুম্বুর বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। সে কলন্দুককে চিনিতে পারিয়া এবং শ্রেষ্ঠীকন্যার মস্তকে নিষ্ঠীবন দেখিয়া বলিল, 'অরে কলন্দুক দাস, নিজের জাতিরও অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখ, ক্ষীর-গণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া মুখ ধুইয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুখবর্দ্ধিতা শ্রেষ্ঠীদুহিতার মস্তকে নিষ্ঠীবন ফেলিস্ না; নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস্।' অনন্তর শুক এই গাথা পাঠ করিল :

আমি বনের পাখী, তবু জানি কুলের কথা তোর,
এখন বল্‌ব গিয়া, শীঘ্র ধরা পড়্‌বি, ওরে চোর।
তাই বল্‌ছি ভাল, কলন্দুক, কথা আমার রাখ।
খেয়ে দুধ একটু, মুখ বাঁকিয়ে' দেখাস নাক জাঁক।

[সমবধান—তখন এই বিকত্তী ভিক্ষু ছিল কলন্দুক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

----

১২৮. বিড়াল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুর[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যখন তাহার ভণ্ডামির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও শূকরশাবকের ন্যায় বৃহদাকার ছিলেন এবং বহুশত মূষিক পরিবৃত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেন।

একদিন এক শৃগাল ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে ঐ মূষিকযূথ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া খাইতে হইবে।' সে মূষিকদিগের বিবরের অবিদূরে একপায়ে ভর দিয়া ও সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া বায়ু পান করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন, 'এই শৃগাল বোধ হইতেছে সদাচারসম্পন্ন।' অতএব তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনার নাম কি?' শৃগাল উত্তর দিল 'আমার নাম ধার্ম্মিক।' 'ভূমিতে চারি পা না রাখিয়া কেবল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন?' 'আমি ভূমিতে চারি পা দিলে পৃথিবী সে ভার বহন করিতে পারিবে না; সেই জন্য এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছি।' 'আপনি মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন কেন?' 'আমি অন্ন ভক্ষণ করি না, বায়ু মাত্র সেবন করি, সেই জন্য।' 'সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া আছেন কেন?' 'সূর্য্যকে নমস্কার করিবার জন্য।' শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'অহো! এই শৃগালের কি অপূর্ব্ব সাধুতা!' তিনি তদবধি নিজের সমস্ত অনুচরসহ সায়ংপ্রাতঃ এই শৃগাল-সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মূষিকেরা প্রণিপাতান্তে ফিরিয়া যাইবার সময় শৃগাল তাহাদের সর্ব্ব পশ্চাতেরটীকে ধরিয়া তাহার মাংস কতকচর্ব্বণ করিয়া, কতক গিলিয়া খাইয়া মুখ পুছিয়া দেখাইত যেন সে কিছুই জানে না। এইরূপে ক্রমে

---

[১]। মূলে 'কুহকভিক্‌খু' এই পদ আছে।

মূষিকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মূষিকেরা ভাবিতে লাগিল, 'পূর্ব্বে আমাদিগের এই বিবরে স্থান—সঙ্কুলন হইত না; আমাদিগকে ঠেসাঠেসি করিয়া থাকিতে হইত; কিন্তু এখন এত ফাঁক হইল কেন? বিবর ত এখন পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ হয় না। ইহার কারণ কি?' অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্বও চিন্তা করিতে লাগিলেন কি হেতু মূষিকদিগের দলক্ষয় হইতেছে। শৃগালের উপর তাহার সন্দেহ জন্মিল। তখন, 'ইহার মীমাংসা করা আবশ্যক' ইহা স্থির করিয়া তিনি শৃগালকে প্রণাম করিয়া ফিরিবার সময় অন্যান্য মূষিককে অগ্রে রাখিয়া স্বয়ং সকলের পশ্চাতে রহিলেন। শৃগাল বোধিসত্ত্বের উপর লাফাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহার চেষ্টিত লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'অরে শৃগাল, তোর ব্রতানুষ্ঠান দেখিতেছি ধর্ম্মের জন্য নহে; তুই প্রাণি-হিংসার জন্য ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া বিচরণ করিতেছিস।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

তুলিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা বঞ্চে সর্ব্বজনে,
পাপাচারে রত কিন্তু গোপনে গোপনে;
মনে বিষ মুখে কিন্তু মধুর বচন,
জানিবে বিড়াল-ব্রত-লক্ষণ[১] এমন।

মূষিকরাজ ইহা বলিতে বলিতে লম্ফ দিয়া শৃগালের গ্রীবার উপর পতিত হইলেন এবং তাহার হনুর নিম্নে গলনালীতে দংশন করিয়া উহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে শৃগাল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন অন্য সকল মূষিক ফিরিয়া সুর সুর করিয়া শৃগালের মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। বলা আবশ্যক যে, যাহারা প্রথমে ফিরিয়াছিল তাহারই মাংস খাইতে পাইয়াছিল, যাহারা পশ্চাতে ফিরিয়াছিল তাহারা কিছুমাত্র পায় নাই।

ইহার পর মূষিকেরা নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

* * *

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড তপস্বী ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিকরাজ।]

---

[১]। এই জাতকের প্রথমাংশে শৃগালের কথা থাকিলেও গাথায় বিড়ালের উল্লেখ আছে এবং সেই জন্যই ইহার বিড়ালজাতক নাম হইয়াছে। মহাভারতেও এই গল্প দেখা যায়।

১২৯. অগ্নিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অন্য একজন ভণ্ডের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকরাজ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। একদা দাবানল উপস্থিত হইলে এক শৃগাল পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কোন বৃক্ষকাণ্ডে মস্তক সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে তাহার সমস্ত শরীরের লোম দগ্ধ হইয়া গেল; কেবল মস্তকের যে অংশ বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল সেখানে শিখার ন্যায় এক গুচ্ছ লোম রহিল। সে একদিন এক পার্ব্বত্য হ্রদে জলপান করিবার সময় নিজের প্রতিবিম্বে রোমগুচ্ছ দেখিয়া ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল।' অনন্তর বিচরণ করিতে করিতে সে মূষিকদিগের গুহা দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া মারিব ও খাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বের জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে সে সেইভাবে মূষিক-গুহার অবিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিতে গিয়া শৃগালকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই শৃগাল সম্ভবত সাধুস্বভাব।' তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের নাম কি?' শৃগাল বলিল, 'আমার নাম অগ্নি ভরদ্বাজ।'[১] 'এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন।' 'তোমাদিগকে লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত।' 'আমাদিগকে কি উপায় রক্ষা করিবেন?' 'আমি অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিতে পারি। তোমরা যখন প্রাতঃকালে[২] গুহা হইতে বাহির হইয়া চরায় যাইবে, তখন একবার তোমাদের সংখ্যা গণিব; আবার সন্ধ্যাকালে যখন ফিরিবে তখনও গণিব। এই উপায়ে তোমাদিগকে রক্ষা করিব।' 'আপনি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, মামা! এখন হইতে আপনি আমাদের রক্ষক হইলেন।' 'বেশ তাহাই হইবে।'

অনন্তর যখন মূষিকগণ প্রাতঃকালে গুহা হইতে বাহির হইত তখন শৃগাল তাহাদিগকে গণিত—এক, দুই, তিন ইত্যাদি। সন্ধ্যার সময় তাহারা ফিরিয়া আসিলেও সে এইরূপ গণিত। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে বলা হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে মূষিকরাজ শৃগালের অভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, 'অহে অগ্নি ভরদ্বাজ, তুমি শিখা রাখিয়াছ ধর্ম্মের জন্য নহে, উদরপূর্ত্তির জন্য।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

১। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সুক্তগুলির দেবতা অগ্নি এবং ঋষিগণ ভরদ্বাজগোত্রীয়।

২। ইন্দুর কিন্তু রাত্রিকালেই খাদ্যান্বেষণ করিয়া থাকে।

শিখা তোমায় পেটের তরে, পুণ্যহেতু নয়;
আঙ্গুল গণি দলের হানি করছ মহাশয়।
পরিচয়টা ভালমতে পেয়েছি তোমার;
ভণ্ডামিতে আমরা কভু ভুল্‌ব নাক আর।

* * *

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিক-রাজ।]

---

১৩০. কৌশিকী-জাতক[১]

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় শ্রাবস্তীবাসিনী এক রমণীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণীর স্বামী একজন সাধু ও শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাসক, কিন্তু সে নিজে অতি দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল। সে সমস্ত রাত্রি অভিসারে অতিবাহিত করিত এবং দিনমানে পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিত; সংসারের কোন কাজকর্ম্ম করিত না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?' সে বলিত, 'পেটে বায়ু হইয়া কষ্ট দিতেছে।' 'কি খাইলে ভাল হইবে বল।' 'স্নিগ্ধ, মধুর, সুস্বাদু যাগু, অন্নত, তৈল ইত্যাদি।' রমণী যখন যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিত, ব্রাহ্মণ তাহাই আনিয়া দিতেন। সে কিন্তু, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন ততক্ষণ, শয্যায় পড়িয়া থাকিত; আবার তিনি গৃহের বাহিরে গেলেই জারদিগের সহিত সময় অতিবাহিত করিত। ব্রাহ্মণ দেখিলেন কিছুতেই গৃহিণীর উদরবায়ুর উপশম হইতেছে না। তখন তিনি শাস্তার শরণ হইলেন। তিনি একদিন গন্ধমাল্য প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তোমায় এতদিন দেখিতে পাই নাই কেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'আমার ব্রাহ্মণী বলেন যে তিনি বাতশূলে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার জন্য আমাকে ঘৃত, তৈল এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহার শরীর যখন বেশ স্থূল হইয়াছে; বর্ণও উজ্জ্বল; অথচ বাতশূলের কোন উপশম দেখা যায় না। ভার্য্যার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকায় এখানে আসিবার অবসর পাই নাই।'

শাস্তা এই ব্রাহ্মণীর পাপভাব জানিতেন। তিনি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, রমণীদিগের এইরূপ রোগ উপশম না হইলে কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়,

---

[১]। ২২৬ সংখ্যক জাতকের সহিত ইহার সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য। 'কৌশিকী' গোত্রনাম।

পুরাকালে পণ্ডিতেরা তাহা তোমায় বলিয়াই দিয়াছিলেন; কিন্তু জন্মান্তর পরিগ্রহবশত তাহা তোমার বেশ স্মরণ হইতেছে না।' অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে অধ্যাপকতা করিতেন। তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। রাজধানীর সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত।

এক জনপদবাসী ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান[১] শিক্ষা করিয়া নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন এবং প্রতিদিন দুই তিন বার বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইঁহার ব্রাহ্মণী নিতান্ত দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল। ফলত প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'এই কারণে অবকাশাভাবে আপনার নিকট উপদেশলাভার্থ আসিতে পারি না।' তখন বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন রমণী পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকে। তিনি শিষ্যকে রোগের অনুরূপ ঔষধ বলিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন, 'বৎস, এখন হইতে তুমি তাহাকে ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি দিওনা। গোমুত্রে পাঁচ প্রকার ফল প্রভৃতি ভিজাইয়া তাহা একটা নূতন তামার পাত্রে এতক্ষণ রাখিয়া দিবে যে সমস্ত দ্রব্য তাম্রগন্ধবিশিষ্ট হয়। তাহার পর, দড়ি, যোত বা লাঠি, যাহা পার হাতে লইয়া গৃহিণীকে গিয়া বল, 'এই তোমার রোগের অমোঘ ঔষধ; হয় ইহা পান কর, নয় উঠিয়া তুমি প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর, তাহার অনুরূপ কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।' এই কথা বলিয়া আমি তোমাকে যে গাথা শিখাইতেছি তাহাও পাঠ করিবে। যদি সে ঔষধ সেবনে আপত্তি করে, তাহা হইলে দড়ি, যোত বা লাঠি দিয়া দুই চারবার প্রহার করিবে, চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কনুই দিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রহারও দিবে। তুমি দেখিবে সে তখনই উঠিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবে।' ব্রাহ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন, উক্ত নিয়মে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, এই ঔষধ পান কর।' সে জিজ্ঞাসিল, 'কে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচার্য্য।' 'ইহা লইয়া যাও, আমি পান করিব না।' 'ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইবেনা

---

[১]। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদচতুষ্টয় অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান বলিয়া গণ্য। উপবেদ চতুষ্টয় যথা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ এবং শস্ত্রশাস্ত্র বা স্থাপত্যবেদ বা শিল্পশাস্ত্র।

বটে।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দড়ি হাতে লইলেন এবং আবার বলিলেন, 'হয় রোগের অনুরূপ ঔষধ পান কর, নয় প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর তদনুরূপ কাজ কর্ম্ম কর।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

যাহা তুমি বল মুখে সত্য যদি হয়,
করিতে হইবে পান ঔষধ নিশ্চয়।
সুমধুর ভক্ষ্য কিন্তু করিলে ভোজন,
কর্ম্মশীলা তুমি নাহি হবে কি কারণ?
বল দেখি, হে কৌশিকী বলগো আমায়,
বাক্যে ও ভোজনে তব সমতা কোথায়?

ইহাতে ব্রাহ্মণী ভীত হইল। সে দেখিল আচার্য্য যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে প্রতারিত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সে উঠিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল। 'আচার্য্য আমার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছেন; এখন হইতে আর এরূপ পাপাচার করিতে পারিব না' ইহা ভাবিয়া আচার্য্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশত সে পাপকর্ম্ম হইতেও বিরতা এবং ক্রমশ শুদ্ধচারিণী হইল।

*　　*　　*

[শ্রাবস্তীবাসিনী সেই ব্রাহ্মণীও 'সম্বুদ্ধ আমায় জানিতে পারিয়াছেন' এই জ্ঞানে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন অনাচার ত্যাগ করিল।

সমবধান—তখন এ দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

১৩১. অসম্পদান-জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলিতেছিলেন 'দেখ, দেবদত্ত কি অকৃতজ্ঞ! সে তথাগতের গুণ বুঝে না।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া কহিলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

*　　*　　*

১। অসম্পদান—অগ্রহণ।

পুরাকালে মগধরাজ্যে রাজগৃহ নগরে বোধিসত্ত্ব এক মগধরাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। অশীতিকোটি ধনের অধিপতি বলিয়া তাঁহার নাম ছিল 'শঙ্খশ্রেষ্ঠী'। তখন বারাণসী নগরেও অশীতিকোটি ধনের অধিপতি পিলিয় নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার সহিত শঙ্খশ্রেষ্ঠীর বিশিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে কোন কারণবশত পিলিয়শ্রেষ্ঠীর মহা বিপত্তি ঘটিল; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল; তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত ও অসহায় হইয়া, শঙ্খশ্রেষ্ঠীর নিকট সাহায্য পাইবেন এই আশায়, ভার্য্যাসহ বারাণসী হইতে পদব্রজে চলিয়া রাজগৃহনগরে বন্ধুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খশ্রেষ্ঠী তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'এসহে বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং যথারীতি তাঁহার সৎকার ও সম্মান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস, অতিবাহিত হইলে একদিন শঙ্খশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসিলেন, 'বন্ধু, তুমি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ বল।' পিলিয়শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'আমার বড় বিপদ; আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এখন তুমি সাহায্য না করিলে আমার দাঁড়াইবার উপায় নাই।'

'সাহায্য করিব বৈকি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।' এই বলিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠী ভাণ্ডাগার খুলিয়া তাহা হইতে পিলিয়শ্রেষ্ঠীকে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ দিলেন। অতঃপর তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর, দাসদাসী প্রভৃতি সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তিও দুই সমান ভাগ করিয়া এক ভাগ বন্ধুকে দান করিলেন। পিলিয়শ্রেষ্ঠী এই বিপুল বিভব লাভ করিয়া, বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন এবং সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর শঙ্খশ্রেষ্ঠীরও সেইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'আমি ত একবার বন্ধুর মহা উপকার করিয়াছিলাম; তাঁহাকে আমার সমস্ত বিভবের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলাম; তিনি কখনও আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না; অতএব তাঁহারই নিকটে যাই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভার্য্যাসহ পদব্রজে বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ভার্য্যাকে বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি আমার সঙ্গে রাজপথে হাঁটিয়া গেলে ভাল দেখাইবে না। আমি গিয়া তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য যানাদি পাঠাইতেছি। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিবে। যতক্ষণ যান না পাঠাই ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।' ইহা বলিয়া তিনি ভার্য্যাকে একটী ধর্ম্মশালায় রাখিয়া দিলেন, একাকী নগরে প্রবেশ করিয়া পিলিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, 'রাজগৃহ নগর হইতে আপনার বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী আগমন করিয়াছেন।'

পিলিয় বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে বল; কিন্তু আগন্তুকের অবস্থা দেখিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না, অভ্যর্থনাও করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?' শঙ্খশ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, 'আপনার দর্শনলাভার্থ।' 'বাসা কোথায় লইয়াছেন?' 'এখন পর্য্যন্ত বাসা ঠিক হয় নাই; আমার পত্নীকে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বরাবর এখানে আসিয়াছি।' 'এখানে ত আপনাদের থাকার সুবিধা হইবে না। কোথাও বাসা ঠিক করুন গিয়া। সেখানে পাক করিয়া আহার করিবেন এবং যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা করিবেন না।' ইহা বলিয়া তিনি এক ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, 'আমার বন্ধুর কাপড়ের খোঁটে এক আড়া মোটা ভুসি দাও।' সেইদিনই নাকি পিলিয় সহস্রশকট-প্রমাণ উৎকৃষ্ট ধান্য ঝাড়াইয়া গোলায় পুরিয়াছিলেন। অথচ সেই মহাচৌর এমনই অকৃতজ্ঞ যে যাঁহার নিকট হইতে চল্লিশকোটি সুবর্ণ পাইয়াছিলেন সেই বন্ধুকে এখন এক আড়া মাত্র ভুসি দিলেন।

পিলিয়ের ভৃত্য এক আড়া ভুসি মাপিয়া উহা একটা ধামায় ফেলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই পাপাত্মা আমার নিকট চল্লিশকোটি সুবর্ণ পাইয়া এখন আমায় কেবল এক আড়া ভুসি দিতেছে! ইহা আমি গ্রহণ করিব বা গ্রহণ করিব না?' অনন্তর তিনি ভাবিলেন, এই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি আমায় বিনষ্টসর্ব্বস্ব জানিয়া বন্ধুত্ববন্ধন উচ্ছিন্ন করিল; কিন্তু আমি যদি এই এক আড়া ভুসি অতি তুচ্ছ বলিয়া গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমারও বন্ধুত্ববন্ধনচ্ছেদনের অপরাধ হইবে। যাহারা মূঢ় ও নীচমনা তাহারাই লব্ধবস্তু অল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং এইরূপে বন্ধুত্ব বিনাশ করে। অতএব এ যে এক আড়া ভুসি দিল তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক আমার যতটুকু সাধ্য মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাপড়ের খোঁটে সেই ভুসি বান্ধিয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্য্যপুত্র, বন্ধুর নিকট কি পাইলেন বলুন।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভদ্রে, আমার বন্ধু পিলিয়শ্রেষ্ঠী এক আড়া ভুসি দিয়া আজই আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।' 'আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কেন? ইহাই কি চল্লিশকোটি ধনের অনুরূপ প্রতিদান?' এই বলিয়া বোধিসত্ত্বের ভার্য্যা রোদন করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি ক্রন্দন করিও না। পাছে তাঁহার সহিত মিত্রভাবের ভেদ হয় এই আশঙ্কাতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে তুমি দুঃখ করিতেছ কেন?' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

মিত্রদত্ত বস্তু যদি তুচ্ছ হয়, তথাপি গ্রহণ করিবে তাহায়।
যে মূর্খ সে দান না করে গ্রহণ, ছিন্ন করে সেই মিত্রতা-বন্ধন।

দিল মোরে বন্ধু ভুসি অর্দ্ধমান[১]; তথাপি তাহার রাখিতে সম্মান
লইলাম উহা সানন্দ অন্তরে; মিত্রতা কি কেহ বিনষ্ট করে?
অবস্থা-বৈগুণ্য চিরস্থায়ী নয়; মিত্রতা শাশ্বতী সর্ব্বজনে কয়।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাঁহার ভার্য্যার ক্রন্দননিবৃত্তি হইল না।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী পিলিয়কে যে সমস্ত দাস দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক কৃষাণ ছিল। সে ধর্ম্মশালার নিকট দিয়া যাইবার সময় শ্রেষ্ঠীপত্নীর ক্রন্দন শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং ভূতপূর্ব্ব প্রভু ও প্রভুপত্নীকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারা এখানে কেন?' বোধিসত্ত্ব তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া দাস বলিল, 'কোন চিন্তা নাই, প্রভু; যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে।' ইহা বলিয়া সে তাঁহাদিগকে নিজের আলয়ে লইয়া গেল, গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইল, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইল। অনন্তর সে অন্যান্য দাসদিগকেও জানাইল, 'আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভু এখানে আসিয়াছেন।' এইরূপ কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে সে একদিন সমস্ত দাস সঙ্গে লইয়া রাজাঙ্গনে গেল এবং 'দোহাই মহারাজ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তাহাদিগের কথা শুনিয়া রাজা উভয় শ্রেষ্ঠীকেই আহ্বান করাইলেন এবং শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সত্য সত্যই পিলিয়কে চল্লিশকোটি সুবর্ণ দিয়াছিলে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমার বন্ধু যখন অভাবগ্রস্ত হইয়া রাজগৃহ নগরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যে কেবল চল্লিশকোটি ধন দিয়াছিলাম তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমার স্থাবর, অস্থাবর, দাস, দাসী প্রভৃতি অপর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধ পরিমাণও দান করিয়াছিলাম।'

'কেমন হে, পিলিয়, এ কথা সত্য কি?'

'হাঁ মহারাজ, এ কথা সত্য।'

'আচ্ছা, এই ব্যক্তি যখন অভাবে পড়িয়া তোমার নিকট সাহায্যের আশায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি ইহার উপযুক্ত সৎকার ও সম্মান করিয়াছিলে কি?'

এই প্রশ্ন শুনিয়া পিলিয় নিরুত্তর রহিলেন। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি না ইহার খোঁটে এক আঢ়া ভুসি বাঁধিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছিলে?' পিলিয় এখনও নিরুত্তর। অতঃপর রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয়ার্থে

---

[১]। আট নালিকায় কে মান; চারি নালিকায় এক আঢ়া বা তুম্ব।

অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং পিলিয়ের দণ্ডস্বরূপ এই আদেশ দিলেন :

'তোমরা পিলিয়ের গৃহে গিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে দাও।'

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি পরের ধন চাই না; আমি যাহা দিয়াছিলাম তাহাই প্রতিদান করাইতে আজ্ঞা হউক।' তখন রাজা আদেশ দিলেন, বোধিসত্ত্বকে তাঁহার পূর্ব্বদত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বপ্রদত্ত সমস্ত বিভব পাইয়া দাসদাসীগণে পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়া তিনি জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

*　　*　　*

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল পিলিয়শ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম শঙ্খশ্রেষ্ঠী।]

---

১৩২. পঞ্চগুরু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে প্রলোভনসূত্র অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে[২] মারদুহিতারা তাঁহাকে যে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, ঐ সূত্র তদবলম্বনে রচিত। ভগবান প্রথমে সূত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন; উহার প্রথমাংশ এই :

ধরি মনোহর বেশ, ভুলাইতে মন,
আসিলে অরতি, রতি, তৃষ্ণা, তিন-জন[৩]
শাস্তার প্রভাবে কিন্তু পলাইয়া গেল;
তুলা যেন বায়ুবেগে বিদূরিত হ'ল।

শাস্তা আদ্যোপান্ত সমস্ত সূত্র পাঠ করিলে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া

---

[১]। এই জাতকের 'পঞ্চগুরু' নাম কি জন্য হইল বুঝা যায় না। হস্তলিখিত একখানি পালিগ্রন্থে ইহার নাম 'ভিরুক জাতক' বলিয়া লিখিত আছে।

[২]। ইহা বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী একটী বটবৃক্ষ। অজপালকেরা এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে গৌতম এখানে যান। এই সময়ে মারকন্যারা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। মার বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শয়তানও খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধচরিত ও খ্রীষ্টচরিত উভয়ের মধ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়।

[৩]। অরতি = হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ ইত্যাদি। রতি = অনুরাগ, আসক্তি; ইহার নামান্তর রগা। তৃষ্ণা = বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগেচ্ছা।

কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'অহো, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা। মারকন্যাগণ তাঁহার প্রলোভনার্থ শতসহস্র দিব্যরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই।' অতঃপর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি এজন্মে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি; সুতরাং মারকন্যাদিগের দিকে যে দৃকপাত করি নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি কেবল জ্ঞানপথের পথিক ছিলাম, যখন পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, সেই অতীত জন্মেও আমি ইন্দ্রিয়সংযম করিতাম এবং সম্মুখে দিব্যলাবণ্যবতী রমণী উপস্থিত হইলেও কোনরূপ অসদভিপ্রায়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। সেই জিতেন্দ্রিয়তার বলেই আমি তখন মহারাজ্য লাভ করিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত ইতিপূর্ব্বে তক্ষশিলা-জাতকে[১] বলা হইয়াছে। তখন তক্ষশিলাবাসীরা নগরের বহির্ভাগস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহার অভিষেক-সম্পাদনপূর্ব্বক নগর সুসজ্জিত করিল। তক্ষশিলা নগর অমরাবতীর ন্যায় এবং রাজভবন ইন্দ্রভবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিয়া রাজভবনস্থ বৃহৎ কক্ষে নানারত্নখচিত পালঙ্কে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন দেবরাজ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ এবং ক্ষত্রিয় কুমারগণ সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন, বিদ্যাধরী সদৃশী ও নৃত্যগীতবাদ্য-কুশলা ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী নৃত্য, গান ও বাদ্য করিতে লাগিল; তাহার শব্দে রাজভবন মেঘগর্জ্জননিনাদিত অর্ণবকুক্ষিবৎ এক-নিনাদ হইয়া উঠিল। বোধিসত্ত্ব নিজের শ্রী ও সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি যক্ষিণীদিগের দিব্যরূপে প্রমুগ্ধ হইতাম তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিনাশ ঘটিত, আমি এ শ্রী ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিতাম না। প্রত্যেক বুদ্ধদিগের উপদেশানুসারে চলিয়াছিলাম বলিয়াই আমার এই অভ্যুদয়

---

[১]। ৯৬ সংখ্যক। ইহার নাম সেখানে 'তেলপাত্র-জাতক' বলা হইয়াছে।

হইয়াছে।' পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষে তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

প্রাণ-পণে পালিয়াছি প্রত্যেকবুদ্ধের
কুশল বচন আমি; হই নাই ভীত
ভয়হেতু শত শত করি নিরীক্ষণ;
পশি নাই মায়াবিনী যক্ষিণী-আগারে।
তাই আজি মহাভয়ে লভি পরিত্রাণ
আনন্দ সাগরে মম ভাসিতেছে প্রাণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে উক্ত গাথাদ্বারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফল লাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

*　　*　　*

[সমবধান—আমিই তখন তক্ষশিলায় গিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম।]

---

১৩৩. ঘৃতাশন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং বর্ষা যাপন করিবার অভিপ্রায়ে কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম মাসেই তিনি একদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে পর্ণশালাখানি পুড়িয়া গেল। তিনি উপাসকদিগকে জানাইলেন যে বাসস্থানাভাবে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। তাহারা বলিল, 'সেজন্য চিন্তা কি? আমরা আর একখানি পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।' কিন্তু মুখে এরূপ বলিলেও তাহারা তিনমাসের মধ্যে কিছুই করিল না। শয়ন, আসনের স্থানাভাবে এই ভিক্ষু কর্ম্মস্থানধ্যানে কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে পারিলেন না,—সিদ্ধিপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বর্ষা শেষে তিনি জেতবনে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'কেমন, তুমি কর্ম্মস্থানধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ত?' তখন ভিক্ষু ঐ কয়েকমাস যে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন সমস্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'পূর্ব্বকালে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে কি সুবিধাজনক এবং কি অসুবিধাজনক তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং যতদিন সুবিধা ছিল ততদিন

নিজেদের বাসস্থানে থাকিয়া, অসুবিধা উপস্থিত হইবামাত্র অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। যাহা ইতর প্রাণীরা করিয়াছিল, তুমি মানুষ হইয়া তাহা করিতে পারিলেন না কেন? নিজের সুবিধা বা অসুবিধা বুঝিতে পারিলে না কেন?' অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিসঞ্চারের পর তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয় এবং তিনি পক্ষীদিগের রাজপদ লাভ করেন। তিনি বনমধ্যস্থ কোন হ্রদের তীরবর্ত্তী শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন নিবিড়পত্র এক মহাবৃক্ষে সানুচর বাস করিতেন। উদকোপরিস্থিত শাখাবাসী বহুপক্ষী যে মলত্যাগ করিত তাহা ঐ হ্রদের জলে নিপতিত হইত। সেই হ্রদে চণ্ড নামে এক নাগরাজ বাস করিত। জল নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে একদিন ভাবিতে লাগিল, 'পক্ষীরা আমার বাসস্থানে মলত্যাগ করিতেছে; জল হইতে অগ্নি উত্তাপিত করিয়া এই বৃক্ষ দগ্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলেই ইহারা পলাইয়া যাইবে।' অনন্তর যখন রাত্রি হইল এবং সমস্ত পক্ষী আসিয়া স্ব স্ব শাখায় বসিল, তখন সে প্রথমে হ্রদের জল আলোড়িত করিল, তাহার পর ধূম উদ্গিরণ করিল এবং পরিশেষে তালস্কন্ধ প্রমাণ অগ্নিশিখা উত্থাপিত করিল।

জল হইতে অগ্নিশিখা উঠিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব পক্ষীদিগকে সম্বোধনপুর্ব্বক বলিলেন, 'অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, জলই প্রজ্বলিত হইতেছে; এখানে আর থাকা যাইতে পারে না, চল আমরা অন্যত্র যাই।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

নিরাপদ ভাবিয়াছ যেই বাসস্থান,
সেখানে প্রবল শত্রু হেরি বিদ্যমান,
উদকের মধ্যে দেখ জ্বলে হুতাশন;
এই বৃক্ষ ছাড়ি কর অন্যত্র গমন।
নির্ভয় ভাবিয়া যার লইলে আশ্রয়,
অদৃষ্টের দোষে সেই ভয়হেতু হয়।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী পক্ষীদিগকে লইয়া অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। যাহারা তাহার কথা না শুনিয়া সেখানে রহিল, তাহারা বিনষ্ট হইল।

* * *

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই আজ্ঞাবহ পক্ষিগণ এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

---

১৩৪. ধ্যানশোধন-জাতক

[সাঙ্কাশ্যা নগরের দ্বারে শাস্তা সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, ধর্ম্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু এই :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি 'নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, অন্যান্য তপস্বীরা তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব আভাস্বর স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

সংজ্ঞা দুঃখময়, দুঃখ অসংজ্ঞায়। ছাড় এই দুয়ে ভাই;
কলুষবিহীন ধ্যানসুখ যাহা, সুখের আগার তাই।

এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব প্রধান শিষ্যের প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতঃপর অন্য তাপসগণ প্রধান শিষ্যের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিল।

* * *

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য; এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্মা।]

---

১৩৫. চন্দ্রাভা-জাতক

[শাস্তা সাঙ্কাশ্যা নগরের দ্বারে সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, স্থবির সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন তপোবনে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি শিষ্যদিগের প্রশ্নের উত্তরদানকালে 'চন্দ্রাভা সূর্য্যাভা' এই বাক্য বলিয়া আভাস্বর লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অন্য শিষ্যদিগের মনঃপূত হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

জ্যোৎস্না, রৌদ্র[১] এই কৃৎস্নদ্বয় সদা একমনে চিন্তা করি
অবিতর্ক ধ্যানে যায় ব্রহ্মালোকে নরলোক পরিহরি।

বোধিসত্ত্ব তাপসদিগকে এই উপদেশ দিয়া এবং প্রধান শিষ্যকে প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মালোকে প্রতিগমন করিলেন।

* * *

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য; এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্মা।

---

১৩৬. সুবর্ণহংস-জাতক

[শাস্তা জেতবনে স্থূলনন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীদিগকে রসুন দান করিবার সঙ্কল্প করিয়া ক্ষেত্রপালকে বলিয়াছিলেন 'যদি ভিক্ষুণীরা রসুন চাহিতে আসেন তাহা হইলে প্রত্যেককে দুই তিন গণ্ডা[২] দিবে।' তদবধি ভিক্ষুণীরা রসুনের জন্য কখনও তাঁহার গৃহে, কখনও তাঁহার ক্ষেত্রে যাইতেন।

একবার কোন পর্ব্বাহে এই উপাসকের গৃহে রসুন ফুরাইয়া গিয়াছিল ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা দলবল লইয়া রসুনের জন্য উপস্থিত হইয়া তদনুসারে স্থূলনন্দা ক্ষেত্রে গিয়া প্রচুর পরিমাণে রসুন তুলিয়া লইল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রপাল বিরক্ত হইয়া বলিল, 'ভিক্ষুণীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক? পরিমাণ বিবেচনা না করিয়া যত পারিল রসুন লইয়া গেল।' ইহাতে, যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেই সন্তুষ্ট, তাঁহারা বড় ক্ষুণ্ন হইলেন এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরাও ভগবানকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ভগবান স্থূলনন্দাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যে

---

[১]। জ্যোৎস্না অবদাত কৃৎস্ন এবং রৌদ্র প্রীতি কৃৎস্ন (৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ধ্যানের যে অবস্থায় বিতর্ক অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগ থাকে না তাহার নাম অবিতর্কধ্যান।

[২]। 'গণ্ডিকা' ('গণ্ডক') শব্দজাত।

দুরাকাঙ্ক্ষ সে নিজের গর্ভধারিণীর প্রতিও রূঢ় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ লোকে অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষা দিতে পারে না, দীক্ষিতদিগকেও বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে না; ইহাদের বুদ্ধির দোষে ভিক্ষা দুর্লভ হয়, লব্ধ ভিক্ষা স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, তাহারা অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষিত এবং দীক্ষিতদিগকে বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে। যেখানে ভিক্ষা দুর্লভ সেখানেও তাহারা ভিক্ষা পায়, এবং লব্ধভিক্ষাদ্বারা তাহারা অনেক দিন চালায়।' এইরূপে ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শাস্তা বলিলেন, 'স্থূলনন্দা যে এবারই অতিলোভ দেখাইয়াছে, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে এই প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সমকুলজাত এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই রমণীর গর্ভে নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরীনন্দা নামে তাঁহার তিনটী কন্যা জন্মে। অতঃপর বোধিসত্ত্বের মৃত্যু হয়; কাজেই তাঁহার পত্নী ও কন্যাত্রয় প্রতিবেশীদিগের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

মানবদেহ ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জাতিস্মর হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন তিনি নিজের সুবর্ণপক্ষাবৃত পরম রমণীয় বিশালদেহ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম?' অমনি তাঁহার স্মরণ হইল তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য ছিলেন। তখন, তাঁহার ব্রাহ্মণী ও কন্যারা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহারা পরগৃহে দাসীবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে কাল কাটাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার পালকগুলি কুট্টিত সুবর্ণের[১] ন্যায়; আমি স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এক একটী পালক দিব; তাহারা ইহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া গিয়া তাহাদের কুঁড়ে ঘরের মাঝের আড়ার এক পাশে গিয়া বসিলেন।[২] তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আপনি কোথা হইতে আসিলেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি তোমাদের পিতা; মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হইয়া জন্মলাভ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি; এখন হইতে তোমাদিগকে আর পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না; আমি এক একটী পালক দিব;

---

[১]। পেটা সোণা।

[২]। মূলে 'পিট্ঠবংসকোটি' এই পদ আছে।

তাহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।' ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে এক একটী পালক দিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে এক একটী পালক দিয়া যাইতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রচুর অর্থলাভ হইত এবং তিনি পরমসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু একদিন ব্রাহ্মণী কন্যাদিগকে বলিলেন, 'ইতর প্রাণীদিগের চরিত্র বুঝা ভার; তোদের পিতা যে কখনও আসা বন্ধ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? তাই বলি, সে এবার যখন আসিবে, তখন আমরা তাহার সবগুলি পালক ছিঁড়িয়া লইব।' কিন্তু পিতার যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া কন্যারা এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ব্রাহ্মণী কিন্তু কিছুতেই নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলেন না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, একবার আমার কাছে আসুন।' বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গেলেন; তিনি তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া সমস্ত পালক উপাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইল বলিয়া কোন পালকই হিরণ্ময় রহিল না, তৎক্ষণাৎ বকের পালকের ন্যায় হইয়া গেল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিলেন; কিন্তু উড়িতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটী বড় জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া খাবার দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বোধিসত্ত্বের নূতন পালক উঠিল, কিন্তু সেগুলি সমস্ত সাদা হইল। অনন্তর তিনি উড়িয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর কখনও পত্নী ও কন্যাদিগকে দেখিতে আসিলেন না।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাইলে যে স্থূলনন্দা এজন্মের ন্যায় পূর্ব্বেও দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণা ছিল। সেই দুরাকাঙ্ক্ষাবশত পূর্ব্বজন্মে সে সুবর্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, এজন্মেও রসুন হইতে বঞ্চিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহার লোভাতিশয়ে সমস্ত ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই আর রসনুপ্রাপ্তি ঘটিবে না। ইহা দেখিয়া তোমরা লোভ সংযত করিতে শিখ, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যতই অল্প হউক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর।' অনন্তর তিনি এই কথা বলিলেন :

যাহা পাও তাহাতেই তুষ্ট রাখ মন;
পাপাচারে রত সদা অতিলোভী জন।
সোণার পালক পেয়ে প্রয়োজন মত
হয়েছিল ব্রাহ্মণীর স্বচ্ছলতা কত;
সমস্ত পালক কিন্তু যুগপৎ হরি,
পুনঃ কষ্ট পেল সেই দাসীবৃত্তি করি।

শাস্তা স্থূলনন্দাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে রসুন খাইলে ভিক্ষুণীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

*　　*　　*

[সমবধান—তখন স্থূলনন্দা ছিল সেই ব্রাহ্মণী; তাহার ভগ্নীরা ছিল ব্রাহ্মণীর কন্যা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণরাজহংস।]

☞ ঈষপের গ্রন্থে সুবর্ণডিম্বপ্রসূতি হংসীর কথা আছে; লা ফন্টেনের গ্রন্থেও সুবর্ণপর্ণবিশিষ্ট হংসের কথা আছে। সুবর্ণহংস-জাতকই বোধহয় এই কথাদ্বয়ের বীজ।]

---

১৩৭. বব্রু-জাতক[১]

[কাণা নাম্নী এক রমণীর মাতার সম্বন্ধে ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী একজন শ্রাবস্তীবাসিনী স্রোতাপন্না আর্য্যশ্রাবিকা; কন্যার নামানুসারে লোকে ইঁহাকে কাণার মাতা বলিয়া ডাকিত। তিনি গ্রামান্তরবাসী স্বজাতীয় এক পুরুষকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। একদা কাণা কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার মাতার নিকট আসিয়াছিল; কয়েক দিন পরে তাহার স্বামী লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, 'আমার ইচ্ছা কাণা এখন ফিরিয়া আইসে।' দূতমুখে এই কথা শুনিয়া কাণা তাহার মাতার অনুমতি চাহিল। মাতা বলিলেন, 'এতদিন এখানে থাকিয়া এখন কিরূপে খালি হাতে যাইবি? একটু অপেক্ষা কর, কিছু পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি।' কাণার মাতা পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন এমন সময়ে এক ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপাসিকা তাঁহাকে বসাইয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া পিষ্টক দান করিলেন। তিনি বাহিরে গিয়া অন্য একজন ভিক্ষুকে এই সংবাদ দিলেন। তখন দ্বিতীয় ভিক্ষুও উপাসিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একপাত্র পিষ্টক পাইলেন। আবার দ্বিতীয় ভিক্ষুও সে স্থান হইতে গিয়া তৃতীয় এক ভিক্ষুকে এই কথা জানাইলেন, এবং তিনিও আসিয়া পূর্ব্ববৎ পিষ্টক পাইলেন। এইরূপে উপাসিকা একে একে চারিজন ভিক্ষুকে দান করিলেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত পিষ্টক নিঃশেষ হইল; কাজেই সে দিন কাণার পতিগৃহে গমন হইল না। তাহার পর কাণার স্বামী একে একে আরও দুই দূত পাঠাইল; শেষের দূতকে বলিয়া দিল, 'কাণা যদি না আইসে তাহা হইলে আমি অন্য স্ত্রী বিবাহ

---

[১]। বব্রু = বিড়াল।

করিব।' কিন্তু এবারও ঠিক উক্তরূপে কাণার গমনে বাধা পড়িল। তখন কাণার স্বামী ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিল এবং তাহা শুনিয়া কাণা রোদন করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শাস্তা পূর্ব্বাহ্ণে পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক কাণার মাতার গৃহে গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, 'কাণা কান্দিতেছ কেন?' কাণার মাতা তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা সেই উপাসিকাকে আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং আসন ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল যে সেই চারিজন ভিক্ষু প্রস্তুত পিষ্টক গ্রহণ করিয়া তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমন বন্ধ করিয়াছেন। একদিন সমস্ত ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'শুনিতেছি, চারিজন ভিক্ষু, কাণার মাতা যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা খাইয়া, তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমনের অন্তরায় হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন কাণার স্বামী কাণাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সেই মহোপাসিকা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছেন।' এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, 'এই ভিক্ষু চতুষ্টয় যে কেবল এজন্মে কাণার মাতার পিষ্টক খাইয়া তাহার কষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পাষাণকুট্টককুলে[১] জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তিরপর সেই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে চল্লিশকোটি সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার ভার্য্যা মৃত্যুর পর ধনস্নেহবশত মূষিকরূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া ঐ ধনের উপর বাস করিত। কালক্রমে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই শ্রেষ্ঠীকুল লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্রেষ্ঠী নিজে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে গ্রামও উজাড় হইয়াছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন বোধিসত্ত্ব এই পুরাতন গ্রামস্থানে প্রস্তর তুলিয়া কাটিতেছিলেন। ধনরক্ষিণী সেই মূষিকা আহারার্থ ইতস্তত বিচরণকালে বোধিসত্ত্বকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া তাঁহার অনুরক্তা হইল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার বহু ধন অকারণে নষ্ট হইতেছে; এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উহা ভোগ করা

---

[১]। পাষাণ কুট্টক = যে পাথর কাটিয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে।

যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে একদিন একটী কাহণ[১] মুখে লইয়া বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি কাহণ মুখে লইয়া আসিয়াছ কেন?' সে বলিল, 'সৌম্য, ইহা লইয়া তোমার নিজের ভোজ্য সংগ্রহ কর; আমার জন্যও মাংস ক্রয় করিয়া আন।' 'বেশ, তাহাই করিব' বলিয়া বোধিসত্ত্ব কাহণটী লইয়া গৃহে গেলেন এবং এক মাষার মাংস আনিয়া মূষিকাকে দিলেন। মূষিকা উহা লইয়া বিবরে গেল এবং যথারুচি ভোজন করিল। তদবধি মূষিকা প্রতিদিন বোধিসত্ত্বকে এক একটী কাহণ দিতে লাগিল; তিনিও তাহার জন্য মাংস আনিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন এক বিড়াল ঐ মূষিকাকে ধরিল। মূষিকা বলিল, 'সৌম্য, আমায় মারিও না।' বিড়াল জিজ্ঞাসিল, 'কেন মারিব না? আমি যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি এবং মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।' 'একদিনই মাংস খাইতে ইচ্ছা হয়, না নিত্য খাইতে ইচ্ছা হয়'? 'পাইলে ত নিত্যই খাইতে ইচ্ছা হয়।' 'যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে প্রত্যহ মাংস দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও।' 'আচ্ছা, ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু সাবধান, মাংস দিতে যেন ত্রুটি না হয়।'

ইহা বলিয়া বিড়াল মূষিকাকে ছাড়িয়া দিল। মূষিকা তদবধি নিজের জন্য আনীত মাংস দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ বিড়ালকে দিত এবং এক ভাগ নিজে খাইত।

ইহার পর একদিন অন্য এক বিড়ালে সেই মূষিকাকে ধরিল এবং সে তাহাকেও ঐরূপ বুঝাইয়া মুক্তি লাভ করিল। তখন ইহাতে মাংস তিন ভাগ করিয়া মূষিকা তাহার এক ভাগ খাইত। অনন্তর আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল, এবং সে তাহারও সহিত উক্তরূপ নিয়ম করিয়া মুক্তিলাভ করিল। তখন মাংস চারি ভাগ হইতে লাগিল। তাহার পর আবার আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল এবং তাহারও সহিত ঐ নিয়ম করিয়া সে মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মাংস পাঁচ ভাগ হইতে লাগিল। পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র মাংস খাইয়া অল্পাহারবশত মূষিকার রক্তমাংস শুষ্ক হইল, সে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি এত কৃশ হইতেছে কেন?' মূষিকা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন?' ইহার যে প্রতীকার আছে তাহা আমি জানি।' ইহা বলিয়া মূষিকাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব সুধাস্ফটিক পাষাণ দ্বারা[২] এক গুহা প্রস্তুত করিলেন এবং উহা আনিয়া মূষিকাকে বলিলেন, 'মা, তুমি এই গুহায়

---

[১]। কাহণ—কহাপণ (কার্ষাপণ) ইহা তৎকাল-প্রচলিত এক প্রকার মুদ্রা; স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উপাদানের তারতম্যবশত ইহার মূল্যের তারতম্য ছিল। (৯১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

[২]। অর্থাৎ অতি নির্ম্মল স্ফটিক।

প্রবেশ করিয়া যে আসিবে তাহাকেই পরুষবচন দ্বারা উত্তেজিত করিবে।' ইহা শুনিয়া মূষিকা সেই গুহার ভিতর গিয়া রহিল। অনন্তর এক বিড়াল আসিয়া বলিল, 'আমায় মাংস দাও।' মূষিকা বলিল, 'অরে ধূর্ত্ত বিড়াল, আমি কি তোর মাংস যোগাইবার চাকর? মাংস খাবি ত নিজের পুতের মাংস খা।' বিড়াল জানিত না যে মূষিকা স্ফটিক গুহার ভিতর আছে; সে কোপবশে, 'মূষিকাকে এখনই খাইয়া ফেলিব' মনে করিয়া সহসা এমন লম্ফ দিল যে স্ফটিক গুহায় লাগিয়া বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত পাইল; তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটী কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ মার্জারলীলা সংবরণ করিয়া এক প্রতিচ্ছন্ন স্থানে পড়িয়া গেল। এই উপায়ে একে একে চারিটা বিড়াল বিনষ্ট হইল এবং তদবধি মূষিকা নির্ভর হইয়া বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন দুই তিন কাহণ দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সে সমস্ত ধনই বোধিসত্ত্বকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ও মূষিকা যাবজ্জীবন মিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :

লোভ পাইলে প্রথম আসে একটা বিড়াল;
দুই, তিন, চার তাহার পরে ক্রমে পালে পল :
আসলো যেমন বিড়ালের দল মাংস খাবার তরে;
স্ফটিকগুহার চোটে কিন্তু সবাই শেষে মরে।

* * *

সমবধান—তখন এই চারি ভিক্ষু ছিল চারি বিড়াল, মূষিকা ছিল কাণার মাতা এবং আমি ছিলাম সেই পাষাণকুট্টক মণিকার।]

---

১৩৮. গোধা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে এক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, পূর্ব্বে বিড়াল-জাতকে (১২৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহার সদৃশ।[১]]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন এক তাপস কোন প্রত্যন্ত

---

[১]। ৩২৫ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। বোধিসত্ত্ব ঐ তাপসের চঙ্ক্রমণ স্থানের এক প্রান্তে এক বল্মীকে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার ধর্ম্মশাস্ত্রের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই তাপস গ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই শীলবান তাপস চলিয়া গেলে এক কপট তাপস আসিয়া সেই আশ্রমপদে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ইহাকেও শীলসম্পন্ন মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নিদাঘকালে একদিন অকস্মাৎ দুর্য্যোগ হওয়ায় ঐ বল্মীক হইতে পুত্তিকাসমূহ বাহির হইয়া পড়িল এবং তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য চারিদিক হইতে বিস্তর গোধা আসিয়া জুটিল। এই সময়ে গ্রামবাসীরাও বাহির হইয়া অনেক গোধা ধরিল এবং অম্লপক্ক স্নিগ্ধসম্ভারযুক্ত গোধামাংস আনিয়া তাপসকে আহার করিতে দিল। গোধামাংসের আস্বাদ পাইয়া তাপসের লালসা জন্মিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘এই মাংস অতি মধুর; এ কিসের মাংস?’ তাহারা বলিল ‘এ গোধার মাংস।’ ইহা শুনিয়া তাপস ভাবিল, ‘আমার কাছে ত একটা বড় গোধা আসিয়া থাকে। তাহাকে মারিয়া মাংস খাইতে হইবে।’ ইহা স্থির করিয়া সে পাকপাত্র, ঘৃত, লবণাদি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল এবং নিজের কাষায় বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গর লুকাইয়া রাখিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় অতি প্রশান্তভাবে বসিয়া রহিল। সেদিন বোধিসত্ত্ব সায়াহ্নকালে তাপসের নিকট আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সায়াহ্নে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাপসের নিকটবর্ত্তী হইয়াই তাহার ইন্দ্রিয়বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই তাপস অন্যদিন যেভাবে বসিয়া থাকে, আজ ত সেভাবে নাই। আজ আমাকে দেখিয়াই যেন মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে এইভাবে তাকাইতেছে। দেখিতে হইবে ব্যাপার কি?’ তখন আশ্রমপাদ হইতে বায়ু বহিতেছিল; বোধিসত্ত্ব তাহা পরীক্ষা করিয়া গোধামাংসের গন্ধ পাইলেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, ‘এই ভণ্ড তপস্বী বুঝি আজ গোধামাংস খাইয়াছে এবং তাহার রস পাইয়া আজ আমি নিকটে গেলেই আমাকে মুদ্গরের আঘাতে নিহত করিয়া মাংস পাক করিয়া খাইবে মনে করিয়াছে।’ তখন তিনি আর তাপসের নিকট গেলেন না, ফিরিয়া চলিলেন। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া তাপস চিন্তা করিল, ‘তবে কি এ টের পাইয়াছে যে আমি ইহাকে মারিবার জন্য বসিয়া আছি, সেই কারণে আসিতেছে না? কিন্তু না আসিলেই কি অব্যাহতি পাইবে?’ এই ভাবিয়া সে মুদ্গর বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিল; কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের লাঙ্গুরের অগ্রভাগ

মাত্র স্পর্শ করিল। বোধিসত্ত্ব অতিবেগে বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং অন্য স্থান দিয়া মস্তক বাহির করিয়া বলিলেন, 'ভো ভণ্ড তপস্বিন, তোমাকে শীলবান মনে করিয়াই আমি এতদিন তোমার নিকট যাইতাম; এখন তোমার কপটতা বুঝিতে পারিলাম। তোমার ন্যায় মহাচৌরের পক্ষে কি জটাজুটাদি প্রব্রাজকচিহ্ন সাজে?' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

শিরে জটাজুট ধরি অজিন বসন পরি
সন্ন্যাসীর বেশ তুমি ধরিয়াছ বেশ;
কিন্তু এই সাধু ভাব কেবল বাহিরে তব,
অন্তরে খলতা সদা পুষিছ অশেষ।

এইরূপে কূটতাপসকে ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব বল্মীকের ভিতর চলিয়া গেলেন। অতঃপর কূটতাপসও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

* * *

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূটতাপস; সারীপুত্র ছিল সেই শীলবান তাপস এবং আমি ছিলাম সেই গোধা।]

---

১৩৯. উভতোভ্রষ্ট-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, দুই প্রান্তে দগ্ধ, মধ্যভাগে শ্মশান-কাষ্ঠ খণ্ডের যে দশা, দেবদত্তেরও ঠিক সেই দশা। ঈদৃশ কাষ্ঠখণ্ড আরণ্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না, গ্রাম্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না। দেবদত্তও এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়া উভয়ত দ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার ভাগ্যে না হইল গার্হস্থ্যসুখভোগ, না হইল শ্রমণধর্ম্ম পালন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত 'ইতোভ্রষ্ঠস্ততোনষ্টঃ' হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন কোন গ্রামে কতকগুলি বড়িশজীবী কৈবর্ত্ত বাস করিত। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একদিন বড়িশ লইয়া এবং একটী ছোট ছেলে

সঙ্গে করিয়া মাছ ধরিতে গেল। অন্যান্য বড়িশজীবিরা যে যে জলাশয়ে বড়িশ ফেলিয়া মাছ ধরিত, সেও সেই সেইখানে বড়িশ ফেলিল। জলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা গাছের গুঁড়ি ছিল। তাহার বড়িশ সেই গুঁড়িতে আবদ্ধ হইল। বড়িশজীবী বড়িশ টানিয়া তুলিতে না পারিয়া ভাবিল, 'খুব বড় একটা মাছে আমার বড়িশ গিলিয়াছে। ছেলেটাকে এখন বাড়ীতে পাঠাইয়া বলিয়া দিই, উহার মাতা যেন প্রতিবেশীদিগের সহিত ঝগড়া বাধায়; তাহা হইলে কেহই এখানে আসিয়া ভাগ চাহিবে না।' এই বুদ্ধি আটিয়া সে ছেলেকে বলিল, 'বাবা, ছুটিয়া বাড়ীতে যা। তোর মাকে গিয়া বল, ছিপে খুব বড় একটা মাছ পড়িয়াছে; সে প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিউক।' এই বলিয়া পুত্রকে পাঠাইয়া বড়িশজীবী পুনর্ব্বার বড়িশ তুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। পাছে সূতা ছিঁড়িয়া যায় এই ভয়ে সে জামা খুলিয়া স্থলে রাখিয়া জলে নামিল এবং মৎস্যলোভে গাছের গুঁড়ি ধরিতে গিয়া দুইটা চক্ষুতেই দারুণ আঘাত পাইল। এদিকে স্থলে সে যে জামা রাখিয়াছিল তাহাও চোরে লইয়া গেল। সে নিরতিশয় যাতনায় কাতর হইয়া আহত চক্ষু দুইটী ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জল হইতে উঠিল। এবং জামা খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক কলহ ঘটাইয়া প্রতিবেশীদিগকে ব্যাপৃত রাখিব মনে করিয়া এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়া দিল, একটা চক্ষুতে হাঁড়ির কালী মাখিল এবং একটা কুকুর কোলে লইয়া এক প্রতিবেশীর গৃহে গেল। ইহা দেখিয়া তাহার একজন সখী বলিল, 'মরণ আর কি! এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়াছিস, এক চোখে জল দিয়াছিস, একটা কুকুর কোলে লইয়াছিস—ওটা যেন তোর কত আদরের ছেলে! তুই পালগ হইলি না কি?' 'আ মর! আমি পাগল হইব কেন? তুই আমায় বিনা কারণে গালি দিলি; চল আমার সঙ্গে; মণ্ডলের কাছে গিয়া অকারণে গালি দিবার জন্য তোর আট কাহণ[১] জরিমানা করাইব।'

এইরূপে কলহ করিতে করিতে উভয়েই মণ্ডলের গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু বিচারকালে বড়িশজীবির পত্নীই দণ্ডভোগ করিল। মণ্ডলের ভৃত্যগণ তাহাকে বন্ধন করিল এবং 'দে, জরিমানাটার টাকা ফেল' বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। গ্রামে পত্নীর এবং অরণ্যে পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অহে বড়িশজীবী, জলে স্থলে উভয়ত্রই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

---

[১]। এই কাহণ বোধহয় তৎকালে প্রচলিত তাম্রমুদ্রা হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোণার কাহণেরও উল্লেখ পাইয়াছি (বব্রুজাতক, ১৩৭-সংখ্যক); কিন্তু বড়িশজীবিরা দরিদ্র; তাহাদের পক্ষে আটটা সোণার কাহণ দণ্ড দেওয়া অসম্ভব।

পতির গেল চক্ষু দুটী পত্নী খায় মার;
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি এবার।

*   *   *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বড়িশজীবী এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

১৪০. কাক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক সুবিজ্ঞ পরামর্শদাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৫) বলা হইবে।]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজপুরোহিত নগরের বাহিরে নদীতে গমন করিলেন, সেখানে স্নান করিয়া গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিলেন ও মালা ধারণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন নগরদ্বার তোরণে দুইটী কাক বসিয়াছিল। তাহাদের একটা অপরটাকে বলিল, 'আমি এই ব্রাহ্মণের মস্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করিব।' দ্বিতীয় কাক বলিল, 'তোমার এ বুদ্ধি ভাল নয় কারণ এই ব্রাহ্মণ ক্ষমতাবান লোক; ক্ষমতাবানের সহিত শত্রুতা করা অশুভকর। এ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাক মারিয়া ফেলিবে।' প্রথম কাক বলিল, 'আমি যাহা বলিয়াছি তাহা না করিয়া পারিব না।' 'কর, কিন্তু ধরা পড়িবে,' ইহা বলিয়া দ্বিতীয় কাক সেখান হইতে উড়িয়া গেল। এদিকে ব্রাহ্মণ যেমন তোরণের নিম্নে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি, উর্দ্ধ হইতে যেমন ফুলের মালা পড়ে, সেইভাবে তাঁহার মস্তকে কাকবিষ্ঠা পতিত হইল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাকজাতির উপর জাতক্রোধ হইলেন।

এই সময়ে এক দাসী গোলার ধান বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়াছিল, কিন্তু উহা রক্ষা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া এক দীর্ঘলোম ছাগ আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে জাগিয়াছে দেখিলেই পলাইতে লাগিল। এইরূপে ছাগটা তিনবার আসিয়া দাসীকে নিদ্রিত পাইয়া ধান খাইল। দাসী তিনবার ছাগ তাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'ছাগটা যদি বার বার আসিয়া খাইতে থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ধান নিকাশ করিবে। তাহাতে আমার বড় ক্ষতি হইবে। অতএব এমন একটা উপায় করিতে হইবে যে এ আর

এখানে আসিতে না পারে।’ অনন্তর সে একটা প্রজ্বলিত উল্কা হাতে লইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া বসিয়া রহিল এবং ছাগ যখন আবার ধান খাইতে আরম্ভ করিল, তখন হঠাৎ উঠিয়া ঐ উল্কাদ্বারা উহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল। তাহাতে উহার লোম জ্বলিয়া উঠিল। ছাগ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার আশায় হস্তিশালার নিকটস্থ এক তৃণকুটীরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। তখন তৃণকুটীরেও আগুন ধরিল এবং ঐ অগ্নির শিখা হস্তিশালায় গিয়া লাগিল। হস্তিশালা জ্বলিতে আরম্ভ করিলে হস্তীরা পুড়িতে লাগিল এবং বহু হস্তীর শরীর এমন দগ্ধ হইল যে বৈদ্যেরা তাহাদের আরোগ্যসাধন না করিতে পারিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, ‘আচার্য্য, হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে পারিতেছেন না; আপনি কোন ঔষধ জানেন কি?’ পুরোহিত বলিলেন, ‘হাঁ মহারাজ, আমি এক ঔষধ জানি।’ ‘কি আয়োজন করিতে হইবে বলুন।’ ‘কাকবসা’। রাজা অমনি আজ্ঞা দিলেন, ‘কাক মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।’ ‘তদবধি কাক মারা আরম্ভ হইল; কিন্তু বসা পাওয়া গেল না; যেখানে সেখানে রাশি রাশি মৃত কাক পড়িয়া রহিল। ইহাতে কাককুলে মহাভয় উপস্থিত হইল।

তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র-কাকপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানে বাস করিতেন। এক কাক সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট কাকদিগের বিপত্তির বার্ত্তা জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘আমি ছাড়া আর কেহই আমার জ্ঞাতিগণের উপস্থিত ভয় নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব আমাকেই এভার গ্রহণ করিতে হইল।’ তখন তিনি দশ পারমিতা স্মরণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মৈত্রীপারমিতা সহায় করিয়া একবেগে উড়িয়া গিয়া উন্মুক্তবাতায়ন পথে রাজার আসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। একজন রাজভৃত্য তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন।

মহাসত্ত্ব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মৈত্রীপারমিতা স্মরণপূর্ব্বক আসনতল হইতে বাহিরে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, ‘মহারাজ, স্বেচ্ছাচারপ্রভৃতি[১] পরিহার করিয়া প্রজাপালন করাই রাজধর্ম্ম। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া শুনা ও দেখা উচিত। এইরূপে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইবে রাজারা তাহাই করিবেন, অকর্ত্তব্য করিবেন না। রাজা যদি অকর্ত্তব্য করেন তাহা হইলে শত সহস্র প্রাণীর মহাভয়, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত সমুপস্থিত হয়। আপনার পুরোহিত শত্রুতাবশত মিথ্যাকথা বলিয়াছেন; কাকের কখনও বসা থাকে না।’ বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে কাঞ্চনভদ্রপীঠে বসাইলেন, তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইয়া দিলেন,

---

[১]। ছন্দাদি অগতি অর্থাৎ ছন্দ, দোষ, মোহ ও ভয়ের বশবর্ত্তী হওয়া।

কাঞ্চনপাত্রে রাজভোগ আনাইয়া আহার করাইলেন এবং পানীয় পান করাইলেন। অনন্তর মহাসত্ত্ব যখন পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া বিগতক্লম হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, আপনি বলিলেন যে কাকের বসা নাই। কেন ইহাদের বসা নাই বলুন।' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'বলিতেছি, শুনুন।' অনন্তর সমস্ত রাজভবন একরবে নিনাদিত করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

উদ্‌বিগ্ন হৃদয়ে থাকে নিরন্তর,
সর্ব্বজনে তারে শত্রু মনে করে;
এই দুই কারণে, শুন নরেশ্বর,
বসা নাহি জন্মে কাক-কলেবরে।

এইরূপে কারণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—'মহারাজ, সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া রাজাদিগের পক্ষে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।' রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত রাজ্য দান করিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাতে তাঁহার রাজ্য প্রতিদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন এবং সমস্ত প্রাণীর জন্য অভয় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে রাজার মন পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন, বিশেষত কাকদিগের আহারার্থ প্রচুর দানের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রতিদিন কাকভোজনের জন্য এক মান তণ্ডুলের অন্ন নানাবিধ মধুর রসে মিশ্রিত করাইতেন এবং মহাসত্ত্বের জন্য রাজভোগের অংশ দিতেন।

* * *

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই কাকরাজ।]

---

১৪১. গোধা-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে এক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহিলামুখ-জাতকের (২৬) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নদীতীরস্থ এক বৃহৎ বিবরে বহুসহস্রগোধা-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। বোধিসত্ত্বের এক পুত্র ছিল; সে এক বহুরূপের

সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিত এবং 'তোমাকে আলিঙ্গন করি' বলিয়া তাহার উপর পতিত হইত। বোধিসত্ত্ব উভয়ের মধ্যে এই প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়া একদিন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি অস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ; বহুরূপেরা নীচ জাতীয়; তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই; যদি তুমি ঐ বহুরূপের সহিত বন্ধুত্বরক্ষা কর তাহা হইলে তাহারই জন্য এই গোধাকুল বিনষ্ট হইবে। সাবধান, তুমি অদ্যাবধি তাহার সংসর্গ ত্যাগ কর।' কিন্তু তাঁহার পুত্র সে কথা শুনিল না। বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তাহার মতি ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই বহুরূপ হইতে, দেখিতেছি, আমাদের বিপত্তি ঘটিবে; অতএব ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যাহাতে পলায়ন করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বহির্নির্গমনের জন্য একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিবর প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বের পুত্র ক্রমে ক্রমে বৃহৎকায় হইয়া উঠিল। বহুরূপ কিন্তু পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্রকায়ই রহিল। বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন 'বহুরূপকে আলিঙ্গন করি' বলিয়া তাহার উপর নিপতিত হইত তখন বহুরূপের মনে হইত যেন তাহার উপর একটা পর্ব্বত আসিয়া পড়িল। সে এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এ যদি আমাকে আরও কয়েকদিন এইভাবে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে প্রাণ ত থাকিবে না; অতএব কোন ব্যাধের সহিত যোগ দিয়া গোধাকুল নাশ করিতে হইবে।'

গ্রীষ্মকালে একদিন খুব ঝড় জল হইল এবং পুত্তিকারা বল্মীকের উপর উঠিল। গোধারাও বিবর হইতে বাহির হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া তাহাদিগকে খাইতে লাগিল। এই সময়ে এক ব্যাধ গোধাবিবর খনন করিবার জন্য কোদাল হাতে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বহুরূপ ভাবিল, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।' সে অগ্রসর হইয়া ব্যাধের অদূরে দাঁড়াইল এবং 'ওগো মহাশয়, কি জন্য এই বনে আসিয়াছেন?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ব্যাধ উত্তর দিল, 'গোধা ধরিবার জন্য।' 'আমি এমন একটা স্থান জানি যেখানে বহুশত গোধা আছে। আপনি অগ্নি ও পলাল লইয়া আসুন।' অনন্তর সে ব্যাধকে গোধাবিবরের নিকট লইয়া বলিল, 'এইখানে পলাল রাখুন, তাহাতে অগ্নি দিয়া ধুম উৎপাদন করুন। আপনার কুকুরগুলি চারিদিকে রাখিয়া দিন এবং নিজে একটা বৃহৎ মুদগর হস্তে লইয়া দঁড়াইয়া থাকুন। যখন গোধারা ধূমের জ্বালায় বাহির হইয়া পড়িবে তখন মুদ্‌গরের আঘাতে তাহাদিগকে বধ করিবেন এবং মৃত গোধাদিগকে রাশিকৃত করিয়া রাখিবেন।' ইহা বলিয়া বহুরূপ অদূরে একান্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; সে ভাবিল,

আজ আমি শত্রুকুলের বিনাশ দেখিতে পাইব।[১]

ব্যাধ বহুরূপের পরামর্শ মত গোধাবিবরে ধূম প্রবেশ করাইল; গোধারা ধূমে অন্ধ হইয়া এবং মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিবর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল কিন্তু তাহারা যেমন বাহিরে আসিতে লাগিল, অমনই ব্যাধ মুদ্গরাঘাতে তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল; যাহারা ব্যাধের হাত এড়াইল, তাহারও কুকুরদিগের দংশনে প্রাণ হারাইল। এইরূপে বহু গোধা বিনষ্ট হইল। বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ইহা বহুরূপেরই কর্ম্ম। তিনি বলিলেন, 'দুষ্টদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি গর্হিত; কারণ এরূপ বন্ধুত্ব কেবল দুঃখেরই নিদান। একটা দুষ্ট বহুরূপের জন্য আজ এতগুলি গোধার প্রাণনাশ হইল।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্রবিবরদ্বারা পলায়ন করিলেন :

কুসংসর্গে কভু কারো হয় না ক শুভোদয়
বহুরূপে বন্ধুকরি গোধাবংশ ধ্বংস হয়।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বহুরূপ; এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অনববাদক[২] গোধারাজ কুমার এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

---

১৪২. শৃগাল-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় যখন ভিক্ষুগণ দেবদত্তের এই জঘন্য আচরণসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; বরং নিজেই মনস্তাপ ভোগ করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগালরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শৃগালদিগের রাজা হইয়াছিলেন। এবং বহুশৃগাল-পরিবৃত হইয়া

---

[১]। মূলে 'পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব' এইরূপ আছে। ইহার অর্থ 'তাহারা পলায়ন করিবে।' কিন্তু এ স্থলে 'পলায়ন করিবে' অপেক্ষা 'বিনষ্ট হইবে' অর্থই সঙ্গত।

[২]। যে অববাদ অর্থাৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করে।

এক শ্মশানবনে বাস করিতেন। এই সময়ে রাজগৃহ নগরে এক মহোৎসব হইয়াছিল; তাহাকে পানোৎসব বলিলেও চলে, কারণ তদুপলক্ষে অনেক লোকেই অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়াছিল। একদল ধূর্ত্ত প্রচুর মদ্য ও মাংস সংগ্রহ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়াছিল, তাহারা কখনও গান করিতেছিল, কখনও সুরাপান করিতেছিল, কখনও মাংস ভক্ষণ করিতেছিল। এইরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে প্রথম যামাবসানে তাহাদের মাংস ফুরাইয়া গেল, কিন্তু তখনও প্রচুর মদ্য অবশিষ্ট রহিল। এই সময়ে একজন বলিল, 'আমায় মাংস দাও।' অন্য সকলে বলিল, 'মাংস নাই, সব ফুরাইয়াছে।' 'আমি থাকিতে কি মাংস ফুরাইতে পারে? আমক শ্মশানে শব ভক্ষণ করিবার জন্য শৃগাল আসিয়া থাকে; তাহাদেরই একটা মারিয়া মাংসের যোগাড় করিতেছি।' এই বলিয়া সে একটা মুদ্গর লইয়া নর্দ্দামা দিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং আমক শ্মশানে গিয়া মুদ্গর হস্তে মৃতবৎ উত্তান হইয়া শয়ন করিল। ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অন্য অনেক শৃগালসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সন্দেহ করিলেন, 'এ লোকটা বোধহয় মৃত নহে। একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার অধোবাত স্থানে গিয়া ঘ্রাণদ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে লোকটা প্রকৃতই মৃত নহে। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'লোকটাকে একটু জব্দ করিয়া যাইতে হইবে।' তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দন্তদ্বারা মুদ্গরের একপ্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। লোকটা মুদ্গর ছাড়িল না, কিন্তু বোধিসত্ত্ব যে তাহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিল না; সে মুদ্গরটাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব একটু পশ্চাতে সরিয়া গেলেন এবং ধূর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো ধূর্ত্তরাজ, তুমি যদি সত্য সত্যই মৃত হইতে, তাহা হইলে, আমি যখন মুদ্গর টানিয়াছিলাম, তখন তুমি উহা আরও জোরে ধরিয়া রাখিতে না। এই এক পরীক্ষা দ্বারাই তুমি মৃত কি জীবিত টের পাওয়া গিয়াছে।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

> বুঝব কিসে মড়া কি না তুমি, মহাশয়?
> মড়ার মত আছ পড়ি, কেনই বা সংশয়?
> কিন্তু যখন ছাড়লে নাক হাতের মুগুরটী,
> তখন তুমি মড়া কিনা বুঝতে পেরেছি।

ধূর্ত্ত দেখিল তাহার বিদ্যা ধরা পড়িয়াছে। সে তখনই উঠিয়া বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া মুদ্গর নিক্ষেপ করিল; কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের দেহে লাগিল না। ধূর্ত্ত বলিল, 'যা ব্যাটা শেয়াল; এবার তোকে মারিতে পারিলাম না।' বোধিসত্ত্ব

মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'আমায় পাইলে না বটে, কিন্তু অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে যন্ত্রণা পাইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।'

ধূর্ত্ত কিছুই না পাইয়া শ্মশান হইতে বাহির হইল এবং একটা পরিখায় স্নান করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই নগরে ফিরিয়া গেল।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম সেই শৃগালরাজ।]

---

১৪৩. বিরোচন-জাতক[১]

[দেবদত্ত গয়শিরে গিয়া দ্বিতীয় সুগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন ধ্যান-বল অন্ত হত এবং লাভ ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়, তখন তিনি ইহার প্রতিকারার্থ শাস্তার নিকট পাঁচটী নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ উচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের[২] পঞ্চশত সার্দ্ধবিহারিক ছিল; তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তখনও ধর্ম্ম ও বিনয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে নাই। দেবদত্ত তাহাদিগকে ভুলাইয়া গয়শিরে লইয়া যান এবং একই সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র এক সঙ্ঘ গঠন করেন। অনন্তর শাস্তা যখন দেখিলেন সেই পঞ্চশত ভিক্ষুর জ্ঞানপরিপাক-কাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে গয়শিরে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মদেশনা করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'আমি বুদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।' অনন্তর নিজেই যেন বুদ্ধ এই ভাব দেখাইয়া দেবদত্ত বলিলেন, 'মহাত্মন, সারীপুত্র! এই ভিক্ষুসঙ্ঘ এখনও অলস বা নিদ্রালু হয় নাই; ইহাদিগকে বলিবার জন্য আপনি কোন ধর্ম্মকথা ভাবিয়া দেখুন; আমার পিঠ ব্যথা করিতেছে। আমি একটু শয়ন করিব।' ইহা বলিয়া দেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগকে মার্গফলসমূহ বুঝাইয়া দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন

---

[১]। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সহিত লক্ষণ-জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

[২]। অগ্রশ্রাবকদ্বয়, সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন।

করিলেন। বিহার শূন্য দেখিয়া কোকালিক দেবদত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল, 'ওগো দেবদত্ত, অগ্রশ্রাবক দুই জন তোমার দল ভাঙ্গিয়া বিহার শূন্য করিয়া গিয়াছে, আর তুমি নিদ্রা যাইতেছে।' ইহা বলিয়া সে তাঁহার উত্তরাসঙ্গ খুলিয়া লইয়া, লোকে যেমন ভিত্তির মধ্যে কীলক প্রোথিত করে সেইরূপ বলে, পার্ষ্ণিদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। তাহাতে দেবদত্তের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল এবং তদবধি তিনি এই আঘাতজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

শাস্তা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারীপুত্র, তোমরা যখন দেবদত্তের বিহারে গিয়াছিলে তখন সে কি করিতেছিল?' সারীপুত্র বলিলেন, 'ভগবন, দেবদত্ত আমাদিগকে দেখিয়া বুদ্ধলীলা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধের মত আচরণ করিতে গিয়া তিনি ভীষণ দণ্ড পাইয়াছেন।' সাস্তা বলিলেন, 'সারীপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া ভীষণ দণ্ড ভোগ করিল তাহা নহে; পুরাকালেও সে এইরূপ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।' অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহজন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। তিনি একদিন কাঞ্চনগুহা হইতে বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক মণিসদৃশস্বচ্ছ জলপান দ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল; সে সহসা সিংহ দেখিয়া এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পায়ে লুঠাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে, শৃগাল তুমি কি চাও?' শৃগাল বলিল, 'আমি ভৃত্য হইয়া প্রভুর পদসেবা করিতে চাই।' 'বেশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা শুশ্রূষা কর, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট মাংসাদি খাওয়াইব।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চনগুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাইতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন গুহায় অবস্থানকালে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে বলিলেন, 'তুমি গিয়া পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াও। পর্ব্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্রাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা কর তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক

বলিবে, 'প্রভু, আপনার তেজ প্রদর্শন করুন।'[১] আমি তাহাকে বধ করিয়া মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব।' শৃগাল তদনুসারে পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া নানা প্রকার পশু অবলোকন করিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইত এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া 'বিরোচ সামি' এই বাক্য বলিত; তিনিও মহাবেগে লম্ফ দিয়া, মহিষই হউক, আর মত্তহস্তীই হউক, ঐ প্রাণীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়া তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং খাইতেন এবং অবশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দিতেন। শৃগাল উদর পূর্ণ করিয়া মাংস খাইত এবং ঐ গুহার ভিতর নিদ্রা যাইত। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দর্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'আমিও ত চতুষ্পদ; তবে কেন প্রতিদিন পরপ্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিব? এখন হইতে আমিও হস্তী প্রভৃতি মারিয়া মাংস খাইব। সিংহ যে হস্তী বধ করে তাহা কেবল 'বিরোচ সামি' এই মন্ত্রের গুণে। আমিও এই সিংহ দ্বারা 'বিরোচ জম্বুক' এই মন্ত্র বলাইব। তাহার পর একটা প্রকাণ্ড হস্তী মারিয়া মাংস খাইব। অনন্তর সে সিংহের নিকট গিয়া বলিল, 'প্রভু, আপনি যে বরাহবারণাদি বধ করিয়াছেন, তাহাদের মাংস আমি বহুকাল আহার করিয়া আসিতেছি। আমিও একটা হস্তী মারিয়া মাংস খাইতে মানস করিয়াছি। আপনি কাঞ্চনগুহায় যেখানে অবস্থিতি করেন, আমিও সেইখানে থাকিব; আপনি গিয়া পর্ব্বতপাদে বিচরণকারী বরাহবারণাদি অবলোকনপূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিলেন। দয়া করিয়া এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতে কৃপণতা করিবেন না।' ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কহিলেন, 'শৃগাল, হস্তিবধ করা কেবল সিংহদিগেরই সাধ্য; জম্বুকে হস্তী মারিয়া তাহার মাংস খাইবে এ কথা কেহ কখনও শুনে নাই। তুমি এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিও না। আমি যে বরাহবারণাদি সংহার করিব তুমি তাহাদেরই মাংস খাইয়া এখানে অবস্থিতি কর।' কিন্তু বোধিসত্ত্বের এ কথা শুনিয়াও শৃগাল তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিল না; সে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে কাঞ্চন গুহায় রাখিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণপূর্ব্বক এক মত্তমাতঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গুহাদ্বারে গিয়া 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিলেন। অমনি শৃগাল কাঞ্চনগুহা হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইল এবং বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া ও তিনবার উচ্চরব করিয়া, 'মত্তমাতঙ্গের কুম্ভের উপরে গিয়া পড়িব' এই সঙ্কল্পে লম্ফ দিল; কিন্তু কুম্ভের উপর না পড়িয়া সে তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী

---

[১]। 'বিরোচ সামি' মূলে এইরূপ আছে। ইহা হইতেই এই জাতকের 'বিরোচন জাতক' নাম হইয়াছে। বিরোচন = উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল।

তখন দক্ষিণ পাদ তুলিয়া তাহার মাথা চাপিয়া ধরিল; তাহাতে তাহার মস্তকের অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর হস্তী শৃগালের ধড়টা পা দিয়া মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিল এবং তদুপরি মলত্যাগ করিয়া বৃংহণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া, 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিয়া নিম্ন-লিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

করিপদাঘাতে করোটীর অস্থি চূর্ণীকৃত সব হ'ল;
মস্তিষ্ক তোমার বাহিরে আসিয়া কাদায় মিশিয়ে গেল।
সাবাস তোমায়, শৃগালপুঙ্গব; সাবাস তোমার বীরত্ব গৌরব
ভাল তেজ আজি দেখাইলে তুমি, বাখানি সৌভাগ্য তব।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি, যতদিন আয়ুঃ ছিল ততদিন ইহলোকে থাকিয়া জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন।

* * *

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

---

১৪৪. লাঙ্গুষ্ঠ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে আজীবকদিগের মিথ্যা তপস্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাকি আজীবকেরা জেতবনের পশ্চাবর্ত্তী ভূভাগে নানাবিধ মিথ্যা তপশ্চর্য্যা করিত।[২] তাহারা জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকিত, বাদুড়ের ন্যায় অধোমুখে ঝুলিত, কণ্টকের উপর শুইত এবং পঞ্চাগ্নি সেবন করিত। তাহাদিগের এইরূপ মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কি কোন লাভ আছে?' শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ! এবংবিধ মিথ্যা তপস্যায় কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। পুরাকালে পণ্ডিতেরা এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কল্যাণ হইবে মনে করিয়া জাতাগ্নি[৩] লইয়া বনে গিয়াছিলেন; কিন্তু হোমাদি ক্রিয়ার কোন ইষ্টাপত্তি ঘটে নাই বলিয়া শেষে জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন এবং পরিণামে কৃৎস্ন-

---

[১]। লাঙ্গুষ্ঠ = লাঙ্গল, এইরূপ 'অঙ্গুল' হইতে 'অঙ্গুষ্ঠ' পদ নিষ্পন্ন।

[২]। মধ্যমনিকায় (৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা) এই মিথ্যা তপশ্চর্য্যার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধেরা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন।

[৩]। শিশুর জাতকর্ম্মের সময় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ইহার অপর নাম প্রগল্‌ভাগ্নি।' [অশাত-মন্ত্র জাতক (৬৩) দেখ]।

পরিকর্ম্মের বলে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহার মাতাপিতা জাতাগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নিশালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা তোমার জাতাগ্নি রক্ষা করিতেছি। যদি তুমি গৃহধর্ম্ম করিতে চাও, তাহা হইলে বেদত্রয় অধ্যয়ন কর; আর যদি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই অগ্নিসহ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা মহাব্রহ্মের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও।' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন 'গৃহধর্ম্মে আমার প্রয়োজন নাই।' ইহা বলিয়া তিনি ঐ অগ্নি লইয়া বনে গেলেন এবং সেখানে আশ্রমপদ প্রস্তুত করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব কোন একদিন এক প্রত্যন্তগ্রামে দক্ষিণাস্বরূপ একটী গো লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ গরুটীকে আশ্রমে আনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান অগ্নিকে গোমংস খাওয়াইব।' কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার মনে হইল, 'আশ্রমে ত লবণ নাই; ভগবান বিনা লবণে আহার করিতে পারিবেন না। অতএব গ্রাম হইতে লবণ আনিয়া ভগবান অগ্নিকে সলবণ খাদ্য দিতে হইবে।' তখন তিনি গরুটীকে একস্থানে বান্ধিয়া রাখিয়া লবণ আনিবার জন্য কোন গ্রামে গমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার পর কতিপয় ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হইয়া গরুটীকে দেখিতে পাইল এবং উহাকে বধ করিয়া মাংস রান্ধিয়া খাইল। তাহারা যে মাংস খাইতে পারিল না, তাহাও লইয়া গেল, সেখানে কেবল গরুটার লাঙ্গুল, জঙ্ঘা বা চর্ম্ম পড়িয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আশ্রমে আসিয়া এই তিন দ্রব্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'তাই ত, ভগবান অগ্নি, দেখিতেছি, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতেও অসমর্থ। তিনি তবে আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? এরূপ অগ্নির পূজা করা নিরর্থক। ইহাতে কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই।' এইরূপে অগ্নি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভো ভগবন অগ্নে! আপনি যখন নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তখন আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? মাংস ত নাই; এখন ইহা খাইয়াই পরিতোষ লাভ করুন।' ইহা বলিয়া তিনি লাঙ্গুলাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :

‘ছি ছি অগ্নি! হেয় তুমি বুঝিলাম আজ,
নিত্য নিত্য পূজি তোমা কিবা হয় কাজ?
দিতেছি লাঙ্গুল এই, খাও যদি পার;
ইহার তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার।
জানি আমি মাংসপ্রিয় তুমি সাতিশয়,
তবে না রক্ষিলে কেন মাংস, মহাশয়?
মাংস নাই আছে মাত্র লেজ, হাড়, চাম;
ইহাই খাইয়া কর ক্ষুধার বিরাম।’

* * *

[ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভানন্তর ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

* * *

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস, যিনি জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।]

---

১৪৫. রাধ-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) বলা হইবে।

শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন, ‘স্ত্রীজাতি অরক্ষণীয়া; ইহাদিগকে রীতিমত প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া রক্ষার চেষ্টা পাইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। তুমিও পূর্ব্বে প্রহরী রাখিয়া এই স্ত্রীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু রক্ষা করিতে পার নাই। এ জন্মেও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহা কিরূপে বুঝিলে? অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে পুত্ররূপে পালন করিতেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল শ্রেষ্ঠীপাদ এবং তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল রাধা। সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যা অতি দুঃশীলা ও অনাচারিণী ছিল। একদা

ব্রাহ্মণ কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশে যাইবার সময় শুক দুইটীকে বলিলেন, ‘বৎসদ্বয়, যদি তোমাদের মাতা কোনরূপ অনাচার করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিও।’ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ‘যে আজ্ঞা পিতঃ; যদি বারণ করিবার সাধ্য থাকে তবে নিশ্চিত করিব। কিন্তু যদি সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিব।’

এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলেন। কিন্তু তিনি যেদিন গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, সেইদিন হইতে সে অত্যাচার আরম্ভ করিল। কত জার যে আসিতে যাইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তাহার কার্য্য দেখিয়া রাধ বোধিসত্ত্বকে বলিল, ‘দাদা, বাবা বলিয়া গিয়াছেন মা যদি কোন অনাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিতে হইবে। এখন দেখিতেছি ইনি ঘোর অনাচার করিতেছেন; এস আমরা তাঁহাকে বারণ করি।’ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ‘ভাই, তুমি বালক, কিছু বুঝনা, তাই এরূপ বলিতেছ। রমণীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য।’ অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

রাধ তুমি নাহি জান আর(ও) কত জন
না হইতে অর্দ্ধ রাত্রি দিবে দরশন।
নিতান্ত অবোধ তুমি, তাহার(ই) কারণ
বলিলে করিতে মোরে অসাধ্যসাধন।
কামিনীর কুপ্রবৃত্তি, পতিভক্তি বিনা
দমিতে যে পারে কেহ, আমিত দেখি না।
কিন্তু সেই পতিভক্তি, হায়, হায়, হায়,
মাতার হৃদয়ে কিছু নাহি দেখা যায়।

এই কারণ বুঝাইয়া তিনি রাধকে কোন কথা বলিতে দিলেন না। যতদিন ব্রাহ্মণ না ফিরিলেন, ব্রাহ্মণী মনের সুখে অনাচার করিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রোষ্ঠপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, তোমাদের মাতা কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন?’ বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনাইলেন এবং বলিলেন, ‘পিতঃ, এমন দুঃশীলা ভার্য্যায় আপনার কি প্রয়োজন?’ অতঃপর তিনি বলিলেন, ‘পিতঃ, আমরা যখন মাতার দোষের কথা বলিলাম, তখন অদ্যাবধি আর এখানে থাকিতে পারিব না।’ ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চরণবন্দনাপূর্ব্বক রাধর সহিত উড়িতে উড়িতে অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

*   *   *

[এই ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া পত্নীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিত্ত সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিল সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। আনন্দ ছিল সেই রাধ এবং আমি ছিলাম প্রোষ্ঠপাদ।]

---

১৪৬. কাক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনেকগুলি বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্তকুলজ। ইঁহারা যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন ইঁহাদের প্রচুর বিভব ছিল। ইঁহারা পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিয়া একযোগে পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন আর গৃহবাসে ফল কি? চল, আমরা শাস্তার নিকট গিয়া রমণীয় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করি।’ এই সঙ্কল্প করিয়া ইঁহারা সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকন্যাদিগকে দান করিয়া এবং সাশ্রুমুখে জ্ঞাতিজনকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রব্রজ্যানুরূপ শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন না, বার্দ্ধক্যবশত ধর্ম্মও আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিহারের এক প্রান্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিলেন, ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া অন্যত্র যাইতেন না, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রদিগের গৃহে গিয়া ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। এই সকল বৃদ্ধ ভিক্ষুর মধ্যে একজনের ভার্য্যা বিশিষ্টভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। তিনি এই ভিক্ষুদিগকে সূপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অন্যত্র ভিক্ষাদ্বারা যে যাহা পাইতেন, তাহাও ঐ বৃদ্ধার গৃহে আনিয়া আহার করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই বৃদ্ধা রোগাক্রান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহারে গিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ‘হায়, মধুরহস্তরসা উপাসিকা আর ইহলোকে নাই।’ বিহারপ্রান্তে তাঁহাদের এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নানা দিক হইতে অন্যান্য ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘আমাদের বন্ধু অমুকের পূর্ব্বতন ভার্য্যা মধুরহস্তরসার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমাদের অতীব উপকারিণী ছিলেন; এখন কে আমাদিগের সেরূপ যত্ন করিবে ইহা ভাবিয়া আমরা রোদন করিতেছি।’

বৃদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই শ্রমণবিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'ছি, এই কারণে বৃদ্ধ স্থবিরেরা বিহারপ্রান্তে পরস্পরের গলা ধরিয়া কান্দিতেছেন!' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এই স্থবিরেরা যে কেবল ইহ জন্মেই ঐ রমণীর মৃত্যুনিবন্ধন রোদন করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও যখন ইহারা সকলে কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন এই রমণী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলে ইহারা তাহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের জলসেচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল।' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক কাক নিজের ভার্য্যাসহ আহারান্বেষণে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিল। সেই সময়ে কতকগুলি লোকে ক্ষীর, পায়স, মৎস্য ও সুরা প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্র তীরে নাগপূজা করিতেছিল। কাকদ্বয় সেই পূজা স্থানে গিয়া ক্ষীরপায়াসমাংসাদি ভোজন ও প্রচুর সুরা পান করিল এবং উভয়েই সুরামদে মত্ত হইয়া সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিবার উদ্দেশ্যে বেলান্তে উপবেশনপূর্ব্বক স্নান করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে একটা তরঙ্গ আসিয়া কাকীকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গেল, এবং একটা মৎস্য ঐ কাকীর মাংস খাইয়া ফেলিল। কাক স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল; তাহার বিলাপ শুনিয়া সেখানে বহু কাক সমবেত হইল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, 'আমার ভার্য্যা বেলান্তে বসিয়া স্নান করিবার সময় নিহত হইয়াছেন।' তাহা শুনিয়া সমস্ত কাকই একরবে রোদন আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা স্থির করিল, সমুদ্র তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ; তাহারা জল সেচন করিয়া সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে এবং এইরূপে সেই কাকীর উদ্ধার সাধন করিবে। তদনুসারে তাহারা মুখ পুরিয়া জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। লবণোদকে যখন তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইত তখন তাহারা স্থলে বিশ্রাম করিত। এইরূপ বহুদিন লবণজল মুখে বহন করিয়া তাহাদের কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তাহারা তন্দ্রাবেশে পড়ে ত মরে এই দশা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা হতাশ হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'দেখ, আমরা সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া বাহিরে ফেলিতেছি বটে, কিন্তু এক জল তুলিতে না তুলিতেই অন্য জল আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। অতএব আমরা সমুদ্র জলহীন করিতে পারিব না।' অনন্তর তাহারা নিম্নলিখিত গাথা বলিল :

লোণাজলে মুখ পুড়িয়া, কণ্ঠ শুকাইল,
সাগর কিন্তু যাহা ছিল তাহাই রহিল।

তখন সমস্ত কাক মৃত কাকীর রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, 'তাঁহার পুচ্ছ কি সুন্দর ছিল। তাঁহার চক্ষু, তাঁহার দেহ, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, সমস্তই মনোহর ছিল। এই সমস্ত গুণ দেখিয়াই চোর সমুদ্র তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে।' কাকেরা এইরূপে বিলাপ প্রলাপ করিতেছে শুনিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তাহাতেই তাহাদের জীবনরক্ষা হইল (নচেৎ তাহারাও তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন হইত)।

* * *

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ ভিক্ষুর স্ত্রী ছিল সেই কাকী; এই ভিক্ষু ছিল সেই কাক; অপর বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ ছিল অপর সমস্ত কাক এবং আমি ছিলাম সমুদ্র-দেবতা।]

---

১৪৭. পুষ্পরক্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ ভগবন।' 'কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ?' 'পূর্ব্বে যিনি আমার ভার্য্যা ছিলেন তিনি এমনই, মধুরহস্তরসিকা যে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।' 'এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য শূলে চড়িয়াছিলে এবং মৃত্যুকালে ইহার জন্য পরিদেবনা করিয়া নিরয়গামী হইয়াছিলে। এখন আবার ইহাকে পাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইলে কেন?' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আকাশ-দেবতা হইয়াছিলেন। একবার বারাণসীতে কার্ত্তিকরাত্রির উৎসবোপলক্ষে সমস্ত নগরী সুসজ্জিত হইয়া দেবনগরীর ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছিল এবং সমগ্র অধিবাসী আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক দুঃস্থ ব্যক্তির দুইখানি মাত্র মোটা কাপড় ছিল। সে বস্ত্র দুইখানি সুন্দররূপে ধোওয়াইয়া শত সহস্র ভাঁজে চোনাট করাইয়া আনিল।

অনন্তর তাহার ভার্য্যা বলিল, 'স্বামিন, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে কুসুম্ভরঞ্জিত[১] একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং অন্য একখানি গায়ে দিয়া, তোমার গলা ধরিয়া, কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাই।' সে বলিল, 'ভদ্রে, আমার ন্যায় দরিদ্রলোকে কুসুম্ভফুল কোথায় পাইব? এই শাদা ধোওয়া কাপড় পরিয়াই উৎসব দেখিতে চল।' 'আমি কুসুম্ভে রঞ্জিত বস্ত্র না পাইলে উৎসবে যাইব না, তুমি অন্য স্ত্রী লইয়া আমোদ কর গিয়া।' 'ভদ্রে, বৃথা কেন জ্বালাতন করিতেছে? আমরা কুসুম্ভ পাইব কোথায়?' 'স্বামিন, পুরুষের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কিসের অভাব থাকে? রাজার কুসুম্ভবাস্তুতে নাকি বহু কুসুম্ভফুল আছে?' 'আছে বটে, কিন্তু তাহা যে রাক্ষস-পরিগৃহীত সরোবরসদৃশ; শত শত বলবান প্রহরী তাহার রক্ষা বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই। তুমি এ অসঙ্গত ইচ্ছা ত্যাগ কর; নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।' 'স্বামিন, রাত্রিকালে যখন অন্ধকার হয়, তখন কোন স্থান কি পুরুষের অগম্য থাকে?'

ভার্য্যাকর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃপুন অনুরুদ্ধ হইয়া এবং তাহার প্রতি অত্যধিক প্রণয়বশত সেই দুর্গত ব্যক্তি শেষে, 'আচ্ছা, তাহাই করা যাইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না।' বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাত্রিকালে প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইল এবং রাজার কুসুম্ভবাস্তুর নিকট গিয়া বৃতি ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রক্ষিগণ বৃতিভঙ্গের শব্দ শুনিয়া 'চোর, চোর' বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, গালি দিতে দিতে ও মারিতে মারিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আদেশ দিলেন, 'যাও, ইহাকে নিয়া শূলে চড়াও।' তখন তাহারা সেই হতভাগ্যের হাত দুইখানি পিঠের দিকে টানিয়া বান্ধিল, এবং ভেরী বাজাইতে বাজাইতে তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলে চাপাইল। একে শূলের অসহ্য যন্ত্রণা, তাহাতে আবার কাক আসিয়া তাহার মস্তকোপরি বসিয়া শল্যসদৃশ তুণ্ডদ্বারা চক্ষু ঠোকরাইতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও সে নিজের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া ভার্য্যার কথাই স্মরণ করিল এবং ভাবিতে লাগিল, 'হায়, প্রিয়ে! তুমি কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বাহুযুগলদ্বারা আমার কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাইবে ইচ্ছা করিয়াছিলে, কিন্তু দগ্ধবিধি আমাদিগকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিল।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল :

> পুষ্পরাগ-সুরঞ্জিত বসনযুগল পরি,
> বাহুলতা দিয়া বেষ্টি কণ্ঠ মোর প্রাণেশ্বরী

---

[১]। কুসুম্ভ—'কুসুম' ফুল (Safflower)।

উৎসব দেখিতে যাবে, ছিল বড় সাধ মনে;
সে আশা পূরণ কিন্তু হইল না এ জীবনে।
এই দুঃখ বড় মোর, এর সঙ্গে তুলনায়,
শূল, কাকতুণ্ডাঘাত তুচ্ছ বলি মনে হয়।

স্ত্রীর জন্য এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি পঞ্চত্ব হইল এবং নরকে গমন করিল।

*   *   *

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী; এবং আমি ছিলাম সেই আকাশ-দেবতা যিনি উক্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

---

১৪৮. শৃগাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কামাদিরিপুদমন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত বিভবশালী শ্রেষ্ঠীপুত্র শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জেতবনের যে অংশ অনাথপিণ্ডদ কোটি সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই অংশে বাস করিতেছিলেন।

একদা নিশীথকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কামাদি রিপু প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহারা যে রিপু পরিহার করিয়াছিলেন, এখন উৎকণ্ঠিতচিত্তে পুনর্ব্বার বশীভূত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ঠিক এই সময়ে জেতবনস্থ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কাহার হৃদয়ে কিরূপ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত শাস্তা সর্ব্বজ্ঞতারূপ দণ্ডদীপিকা[১] উত্তোলিত করিলেন এবং ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুর মনে যে কামভাবের উদ্রেক হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। একপুত্রিকা জননী যেমন পুত্রের, কিংবা একচক্ষু ব্যক্তি যেমন চক্ষুর রক্ষাবিধানে যত্নপর, শাস্তাও সেইরূপ শ্রাবকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখনই শ্রাবকদিগের মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হইত, তখনই তিনি সেই প্রবৃত্তিকে আর বৃদ্ধি পাইতে দিতেন না, উপদেশবলে দমন করিতেন। এই শিষ্যহিতৈষণাবশতঃই তিনি এখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চক্রবর্ত্তী রাজার নগরে চোর প্রবেশ করিলে যেমন হয়, এও সেইরূপ। আমি এখনই উপদেশ বলে এই ভিক্ষুদিগকে কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব এবং ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিব।'

---

[১]। মশাল (torch)।

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সুরভি গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অতি মধুরস্বরে 'আনন্দ' বলিয়া ডাকিলেন। আনন্দ আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক সুবর্ণমণ্ডিত অংশে যত ভিক্ষু আছে সকলকে আহ্বান করিয়া গন্ধকুটীরে সমবেত হইতে বল।' শাস্তা ভাবিয়াছিলেন, 'শুদ্ধ ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুকে আহ্বান করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়াছি। এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে তাঁহাদের মন উদ্বিগ্ন হইবে; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মদেশনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।' এই কারণেই তিনি সমস্ত ভিক্ষু আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। আনন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চাবি[১] লইয়া প্রতি পরিবেণে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সমস্ত ভিক্ষু গন্ধকুটীরে সমবেত হইলে আনন্দ সেখানে বুদ্ধাসন স্থাপিত করিলেন। তখন শাস্তা আসিয়া সেই আসনে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দেহ ঠিক ঋজুভাবে অবস্থিত রহিল, বোধ হইল যেন শিলাময়ী ধরিত্রীর উপর সুমেরু পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। তিনি দেহ হইতে ষড়বর্ণের রশ্মি বিকিরণ করিলেন; মনে হইল যেন তাঁহার মস্তকোপরি স্তরে স্তরে কুসুমদাম সজ্জিত রহিয়াছে। সেই রশ্মিমালা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র পাত্রের আকারে, ছত্রের আকারে, কূটাগার-কুক্ষির আকারে গগণতলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অর্ণবকুক্ষি বিক্ষুব্ধ করিয়া যেমন অরুণের উদয় হয়, ভগবানের আবির্ভাবও সেইরূপ প্রতীয়মান হইল। ভিক্ষুসঙ্ঘ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে তাঁহাকে রক্তকম্বলবৎ পরিবেষ্টন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা ব্রহ্মস্বরে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভিক্ষুরা কাম, ব্যাপাদ[২] ও বিহিংসা এই ত্রিবিধ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিবে না; কারণ এগুলি অকুশলজনক বিতর্ক বলিয়া পরিগণিত। যখন এই সকল কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে, তখন তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না, কুপ্রবৃত্তি মাত্রেই শত্রু এবং শত্রু কখনও তুচ্ছ পাত্র নহে, সে অবকাশ পাইলেই বিনাশসাধন করে। অল্পমাত্র কুপ্রবৃত্তিও আবির্ভাবের পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি হলাহলোপম, কিংবা চর্ম্মকণ্ডুনিভ, কিংবা আশীবিষসদৃশ, কিংবা বিদ্যুদগ্নিকল্প, অতএব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ও শঙ্কনীয়। যখনই কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইবে, তখনই উহা জ্ঞানবলে, যুক্তিবলে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে

---

[১]। মূলে 'অবাপূরণ' এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'অবাবরণ' এইরূপ হইবে। আবরণ = তাল, তালা। অবাবরণ = কুঞ্চিকা, চাবি। 'চাবি' শব্দটী পর্টুগীজ ভাষা হইতে গৃহীত। তালার আর একটী সংস্কৃত নাম 'কুডুপ'; ইহা হইতে বাঙ্গালা 'কুলুপ' হইয়াছে।

[২]। পরের অনিষ্টচিন্তা।

হইবে। যেমন পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পড়িলে উহা তাহাতে সংলগ্ন থাকিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, উক্তরূপ যত্ন করিলে কুপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অচিরাৎ মন হইতে অপসারিত হইতে পারে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র চিত্তবিকারকেও এরূপ ঘৃণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা উহাকে বৃদ্ধি পাইবার অবসর না দিয়া অঙ্কুরেই উন্মুলিত করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এক নদীতীরস্থ অরণ্যে বাস করিতেন। একদা এক বৃদ্ধ হস্তী গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া ঐ মৃতহস্তী দেখিয়া ভাবিলেন, 'অদ্য আমার প্রচুর খাদ্যের উপায় হইল।' তিনি প্রথমে হস্তির শুণ্ডে দংশন করিলেন; কিন্তু দেখিলেন উহা লাঙ্গলের ঈষার ন্যায় কঠিন। অতএব সেখানে আহারের কোন সুবিধা না দেখিয়া তিনি উহার দন্তে দংশন করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, ইহা উহা কেবল হাড়; অতএব এখানে দংশন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তিনি কর্ণে দংশন করিলেন, কিন্তু উহা শূর্পের ন্যায় নীরস; উদরে দংশন করিলেন, উহা যেন একটা ধানের গোলা; পায়ে দংশন করিলেন, উহা যেন উদূখল; লাঙ্গুলে দংশন করিলেন, উহা যেন মূষল। এইরূপে কোথাও কিছু খাইবার সুবিধা না পাইয়া অবশেষে তিনি মলদ্বারে দংশন করিলেন; এবার তাঁহার বোধ হইল যেন সুমিষ্ট পিষ্টক আহার করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণ পরে আমি ইহার শরীরে সুমধুর খাদ্য পাইবার স্থান লাভ করিলাম।' তদবধি তিনি খাইতে খাইতে হস্তীর কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেখানে বৃক্ক খাইলেন, হৃৎপিণ্ড খাইলেন, পিপাসা পাইলে রক্তপান করিলেন এবং শয়নকালে উদর বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই হস্তীর দেহের অভ্যন্তরে বাস করা কি সুখকর! অতএব ইহাই আমার গৃহ; আহারের ইচ্ছা হইলেও এখানে বসিয়াই প্রভূত মাংস পাইব। অতএব ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি?' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্তিকুক্ষিতেই বাস করিতে ও মাংস খাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গ্রীষ্ম দেখা দিল; নিদাঘবাতে ও সূর্য্যরশ্মিতে মৃত হস্তীর চর্ম্ম শুষ্ক ও আকুঞ্চিত হইল; বোধিসত্ত্বের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; কুক্ষিবিবর অন্ধকারপূর্ণ হইল; বোধিসত্ত্ব যেন ইহলোকের ও পরলোকের সন্ধিস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চর্ম্মের পর মাংসও শুষ্ক হইল, রক্ত নিঃশেষ হইল; বাহির হইবার পথ না পাইয়া বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত ভীত

হইলেন। তিনি পথ পাইবার আশায় এদিকে ওদিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীরই আহত হইতে লাগিল, নির্গমের পথ পাওয়া গেল না। হণ্ডীতে যেমন পিষ্টকপিণ্ড সিদ্ধ হইতে থাকে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ হস্তিকুক্ষিতে সিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিন পরে মহামেঘ দেখা দিল ও প্রচুর বর্ষণ হইল। তাহাতে হস্তীর মৃতদেহ ভিজিয়া পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠিল, হস্তীর মলদ্বারও খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া নক্ষত্রের ন্যায় আলোক দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই ছিদ্র দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'এতদিনে আমার প্রাণরক্ষা হইল।' তিনি হস্তীর মস্তকের দিকে হাটিয়া গিয়া এক লম্ফে নিজের মস্তক দ্বারা মলদ্বার ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু আসিবার সময় রন্ধ্রপথে তাঁহার শরীরের লোম উৎপাটিত হইয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব হস্তিকুক্ষি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমে মুহূর্ত্তকাল ছুটিলেন, পরে থামিলেন, এবং শেষে উপবেশন করিয়া নিজের তালস্কন্ধতুল্য মসৃণ শরীর অবলোকনপূর্ব্বক ভাবিলেন, 'হায়, আমার এই দুর্দ্দশা অন্যকৃত নহে; লোভের জন্যই আমি এত কষ্ট পাইলাম। এখন হইতে আর লোভের বশবর্ত্তী হইব না; হস্তিশরীরেও প্রবেশ করিব না।' অনন্তর তিনি উদ্‌বিগ্নচিত্তে এই গাথা পাঠ করিলেন :

হস্তীর কুক্ষিতে পশি পাইয়াছি শিক্ষা বেশ;
লোভবশে আর কভু পাব না ক হেন ক্লেশ।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; অতঃপর তিনি আর কখনও সেই মৃতহস্তীর বা অন্য কোন মৃত হস্তীর দিকে দৃকপাতও করিতেন না, লোভেরও বশবর্ত্তী হইতেন না।

*　　*　　*

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, হৃদয়ে কখনও কুপ্রবৃত্তি পোষণ করিও না; যখনই চিত্তবিকার হইবে তখনই উহা দমন করিবে।' অনন্তর তিনি সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই শৃগাল।]

---

১৪৯. একপর্ণ-জাতক

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীর কোন দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে বৈশালী নগরীর সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহা এক এক গব্যুতি[১] অন্তরে তিনটী প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং ইহার দ্বারত্রয় অট্টালক[২] দ্বারা রক্ষিত হইত। সাত হাজার সাত শত সাত জন রাজা[৩] নিয়ত ইহার শাসনকার্য নির্ব্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি এবং ভাণ্ডাগারিকের সংখ্যাও এই পরিমাণ ছিল।

বৈশালীর রাজকুমারদিগের মধ্যে একজনকে লোকে 'দুষ্ট লিচ্ছবিকুমার' এই নাম দিয়াছিল। তিনি ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন এবং দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি এতই কোপন ছিল যে, কেহই তাঁহার সমক্ষে দুই তিনটীর অধিক বাক্য বলিতে পারিত না। মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, বন্ধু কেহই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। একদিন তাঁহার মাতাপিতা ভাবিলেন, 'এই কুমার অতি নিষ্ঠুর ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য; সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহই ইহাকে বিনয় শিখাইতে সমর্থ হইবে না; একমাত্র বুদ্ধই বোধহয় ইহার প্রকৃতির কোমলতা সাধন করিতে পারিবেন।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ঐ কুমারকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভগবন, আমাদের এই পুত্রটী ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর; সর্ব্বদাই যেন অগ্নির মত প্রজ্জ্বলিত থাকে। আপনি দয়া করিয়া ইহাকে কিছু উপদেশ দিন।'

শাস্তা কুমারকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ, কাহারও ক্রোধন, নিষ্ঠুর, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও পরপীড়ক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধন ব্যক্তি নিজের গর্ভধারিণী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, মিত্র, বন্ধু—সকলেরই অপ্রিয় হয়; সে দংশনোদ্যত সর্পের ন্যায়, আক্রমণোদ্যত বনদস্যুর ন্যায়, গ্রাসোদ্যত রাক্ষসের ন্যায় সকলেরই ভয়াবহ। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকাদি যন্ত্রণাগারে বাস করে, ইহজীবনেও, বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইলেও সে অতি ভীষণাকাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রনিভ হইলেও উত্তাপম্লান পদ্মের ন্যায়, কিংবা মলাচ্ছন্ন কাঞ্চনমুকুরমণ্ডলের ন্যায় বিশ্রী ও বিরূপ। ক্রোধের বশেই লোকে কখনও ভৃগুস্থান হইতে পতনে, কখনও

---

[১]। গব্যুতি = এক ক্রোশ।

[২]। অট্টালক = প্রহরীদিগের জন্য দুর্গ-প্রাকারোপরিস্থ কূটাগার বিশেষ (watch tower)

[৩]। বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা সমবেত হইয়া ইহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'।

শস্ত্রাঘাতে, কখনও বিষপানে, কখনও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে এবং ক্রোধবশত নিজের জীবনান্ত করিয়া নরকাদিতে গমন করে। যাহারা পরপীড়ক, তাহারাও ইহলোকে ঘৃণিত এবং দেহত্যাগের পর নিরয়গামী ও দণ্ডভোগী হইয়া থাকে। অতঃপর যখন তাহারা পুনর্ব্বার মানবশরীর লাভ করে, তখনও জন্মরোগী হয়, জন্মবধি চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও অন্যান্য রোগে কষ্ট পায়; নিয়ত রোগভোগ করায় তাহাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। এজন্য সকলেরই মৈত্রীভাবাপন্ন ও পরহিতপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ লোক নরকাদির ভয় হইতে বিমুক্ত।'

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া কুমারের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার দম্ভ, ক্রোধ ও স্বার্থপরতার দমন হইল, তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন ও মৃদুচিত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি কাহাকেও গালাগালি দিতেন না, বা প্রহার করিতেন না। তিনি ভগ্নদন্ত বিষধরের, কিংবা ভগ্নশৃঙ্গ কর্কটের, কিংবা ভগ্নবিষাণ বৃষের ন্যায় নিরীহ হইলেন।

লিচ্ছবিকুমারের প্রকৃতিসম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র তাহার মাতা, পিতা এবং জ্ঞাতিবন্ধুগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করিতে পারেন নাই; কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই তাহাকে বিনীত ও স্বার্থপরতাশূন্য করিলেন। এরূপ লোকের দুষ্প্রবৃত্তি-দমন এবং যুগপৎ ছয়টী মত্তহস্তীর দমন, উভয় কার্য্যই একবিধ অসাধ্যসাধন। শাস্ত্রকারেরা সত্যই বলিয়াছেন, 'হস্তিদমকেরা দম্য হস্তীকে ইচ্ছামত একই দিকে পরিচালিত করে—হয় পুরোভাগে, নয় পশ্চাতে, হয় উত্তরে, নয় দক্ষিণে, যখন যে দিকে ইচ্ছা, তাহাকে সেইদিকে চালায়। অশ্বদমক এবং গোদমকদিগের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগতও যাহাকে বিনয়ী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অষ্টদিকের যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহার অনুগ্রহে শিষ্যগণ বাহ্যবস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারে। বুদ্ধ এবংবিধ গুণসম্পন্ন; তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও এ ক্ষমতা নাই...যিনি বিনেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষদম্যদিগের সারথি[১] বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।' বস্তুত সম্যক সম্বুদ্ধের ন্যায় পুরুষদম্য-সারথি দ্বিতীয় দেখা যায় না।'

ভিক্ষুগণ এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ,

---

[১]। পুরুষরূপ দম্য অর্থাৎ দামড়া; তাহাদিগের সারথি অর্থাৎ বিনেতা। অজ্ঞ লোক দামড়ার মত স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল; তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া সংযত করিতে হয়। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রাকৃত জন flock এবং যাজক pastor নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্ট নিজেও Good Shepherd নামে বর্ণিত।

আমি যে কেবল এই প্রথম একবার মাত্র উপদেশ দিয়া কুমারের চরিত্র-সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরীতে তিন বেদ এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক কিয়ৎকাল গৃহবাস করেন, পরে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। এখানে ধ্যানাদি দ্বারা তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর লবণ, অম্ল প্রভৃতি কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাববশত বোধিসত্ত্বকে জনপদে আগমন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজার উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে আসিবার পরদিন তিনি যত্নসহকারে তাপসজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা বাতায়ন হইতে তাঁহাকে নয়নগোচর করিলেন এবং তদীয় গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপসের ইন্দ্রিয়সমূহ কেমন শান্ত! ইঁহার মনেও কি অপূর্ব্ব শান্তি! সম্মুখভাগে ইঁহার দৃষ্টি শুদ্ধ যুগপ্রমাণ[১] স্থানে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইনি যেরূপ সিংহবিক্রমে ও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যেন, প্রতিপাদবিক্ষেপে ইনি সহস্র মুদ্রার এক একটী স্থবিকা[২] রাখিয়া আসিতেছেন। যদি কোথাও সদ্ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে ইঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া', রাজা পার্শ্বস্থ এক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি আজ্ঞা করিতেছেন?' রাজা বলিলেন, 'ঐ তাপসকে এখানে আনয়ন করেন।' অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদীয় হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, 'ধার্ম্মিকবর, আপনি কি চান?' অমাত্য উত্তর করিলেন, 'রাজা আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।' 'আমি হিমালয়ে বাস করি; আমার ত কখনও রাজভবনে গতিবিধি নাই।'

অমাত্য রাজাকে গিয়া এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, 'আমার কোন

---

[১]। যুগ—পরিমাণ বিশেষ, লাঙ্গলের যুগ যত দীর্ঘ, তত। তপস্বী ইতস্তত দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল সমুখের দুই চারি পা পথ দেখিয়া অগ্রসর হইতেছেন এই অর্থ।

[২]। স্থবিকা = থলি।

কুলোপগ তাপস নাই।[১] ঐ তাপসকে আনয়ন কর; উনি আমার কুলোপগ হইবেন।' তদনুসারে অমাত্য পুনর্ব্বার গমন করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

রাজা সসম্মানে বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্রযুক্ত সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং নিজের জন্য যে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ভোজন করাইলেন। বোধিসত্ত্ব বিশ্রাম করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার আশ্রম কোথায়?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি হিমালয়ে থাকি।' 'এখন কোথায় যাইবেন?' 'আমি এখন বর্ষাবাসের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।' 'তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।' বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, রাজা নিজেও আহার করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার এক অংশ দিবাভাগের ও এক অংশ রাত্রিকালের বাসোপযোগী করাইলেন। প্রব্রাজকদিগের যে অষ্টবিধ পরিষ্কার[২] আবশ্যক রাজা সেগুলিরও ব্যবস্থা করিলেন এবং উদ্যানপালকের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি রাজ্যোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিনবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

এই রাজার অতীব দুষ্টস্বভাব, ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর এক পুত্র ছিল; রাজা এবং তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কেহই উহাকে দমন করিতে পারিতেন না। অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সমবেত হইয়া রাজকুমারকে ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন, 'আপনি এরূপ কুব্যবহার করিবেন না, এরূপ আচরণ নিতান্ত গর্হিত।' কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। বোধিসত্ত্বকে পাইয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই শীলসম্পন্ন পরমপূজ্য তপস্বী ভিন্ন অন্য কেহই আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, অতএব ইঁহারই উপর পুত্রের উদ্ধারের ভার দিই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি একদিন কুমারকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেলেন, এবং বলিলেন, 'মহাশয়, আমার এই পুত্রটী অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাব। আমি কিছুতেই ইহাকে দমন করিতে পারিলাম না। আপনি ইহার শিক্ষাবিধানের কোন উপায় করুন।' এই প্রার্থনা করিয়া তিনি কুমারকে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে একটা নিমের চারা বাহির হইয়াছে; তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী মাত্র পাতা দেখা

---

[১]। যিনি গৃহে নিয়ত ভিক্ষা করিতে আসেন এবং সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দেন।

[২]। পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, বাসি, সূচি ও পরিস্রাবণ।

দিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'কুমার, এই চারার একটা পাতা খাইয়া দেখ ত ইহার আস্বাদ কিরূপ।' কুমার উহা মুখে দিয়াই 'ছ্যা ছ্যা' করিয়া ভূমিতে থুথু ফেলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে কুমার?' কুমার বলিল, 'মহাশয়, এখনি এই বৃক্ষ হলাহল বিষের মত; বড় হইলে না জানি ইহার দ্বারা কত লোকের প্রাণনাশ ঘটিবে।' ইহা বলিয়া সে নিমের চারাটা উপড়াইয়া হস্তের দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল :

অঙ্কুরে যে বৃক্ষ হেন বিষোপম, বর্দ্ধিত হইবে যবে,
ফল খেয়ে তার শত শত জীব, নিশ্চিত বিনষ্ট হবে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'কুমার, এই নিম্ববৃক্ষ এখনই তিক্ত, বড় হইলে না জানি আরও কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি ইহাকে উৎপাটিত ও মর্দ্দিত করিলে। তুমি এই চারাটীর সম্বন্ধে যাহা করিলে, এই রাজ্যের অধিবাসীরাও তোমার সম্বন্ধে তাহাই করিবে। তাহারা ভাবিবে, 'এই কুমার বাল্যকালেই যখন এমন উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর হইল, তখন বড় হইয়া রাজপদ পাইলে ইহার প্রকৃতি আরও ভীষণ হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের কোনও উন্নতি হইবে না' অতএব তাহারা তোমাকে রাজ্য দিবে না, এই নিম্ববৃক্ষের মত উৎপাটিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। সেই নিমিত্ত বলিতেছি এই নিম্ববৃক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা সাবধান হইতে শিক্ষা কর; অতঃপর ক্ষান্তিমান ও মৈত্রীসম্পন্ন হও।'

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনিয়া কুমারের মতি ফিরিয়া গেল। তিনি তদবধি ক্ষান্তিমান ও মৈত্রীসম্পন্ন হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া দানাদিপুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

* * *

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এ জন্মেই দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।

সমবধান—তখন এই লিচ্ছবিকুমার ছিল সেই দুষ্ট কুমার, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা]

---

১৫০. সঞ্জীব-জাতক

মহারাজ অজাতশত্রু অসৎসংসর্গে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী, দুঃশীল ও পাপ-কর্ম্মা দেবদত্তকে শ্রদ্ধা করিতেন; সেই ক্রুরমতি নরাধমকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বহুঅর্থব্যয়ে গয়শিরে এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কুমন্ত্রণায় নিজের জনক ধার্ম্মিকবর স্রোতাপন্ন বিম্বিসারের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এবংবিধ দুষ্কার্য্য-পরম্পরায় সেই নৃপ-কুলাঙ্গারের স্রোতাপত্তি-মার্গ রুদ্ধ ও সদগতির আশা বিনষ্ট হইয়াছিল।

অজাতশত্রু যখন শুনিলেন, যে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে, তখন তাঁহারও আশঙ্কা হইল পাছে নিজেও ঐ পথের পথিক হন। এই দুশ্চিন্তায় রাজত্বে তিনি আর সুখ পাইতেন না, শয়নে শান্তিলাভ করিতেন না; তীব্রযন্ত্রণাভিভূত হস্তিশাবকের ন্যায় নিয়ত কম্পমানদেহে ইতস্তত বিচরণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে, অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইতেছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; যেন তিনি আদীপ্ত লৌহশয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া আছেন এবং লৌহশূল-সমূহ দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইতেছে। ফলত এই ভয়বিহ্বল হতভাগ্য নৃপতি আহত কুক্কুটবৎ ক্ষণমাত্রও শান্তিভোগ করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'সম্যকসম্বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং তাঁহারই উপদেশ মত অবিশিষ্ট জীবন যাপন করিব।' কিন্তু কৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না।

এই সময়ে রাজগৃহ নগরে কার্ত্তিকোৎসব আরম্ভ হইল; পৌরজন রাত্রিকালে সমস্ত নগর এমন সুসজ্জিত করিল যে, উহা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অজাতশত্রু অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে কাঞ্চনাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি অদূরে জীবক কুমারভৃত্যকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহাকে সঙ্গে লইয়া সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে।' কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া বলি যে 'আমি একাকী তাঁহার নিকটে যাইতে পারিব না; এস আমাকে সঙ্গে লইয়া চল?' তাহা না করিয়া বরং রাত্রির শোভা বর্ণনপূর্ব্বক বলা যাউক 'আমি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের পর্য্যুপসনা করিব।' অতঃপর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, 'কাহার পর্য্যুপাসনা করিলে শান্তি লাভ করা যাইতে পারে?' অমাত্যেরা ইহার উত্তরে নিশ্চিত স্ব স্ব গুরুর নাম করিবেন, জীবকও সম্যকসম্বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন করিবেন।' তখন আমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া অজাতশত্রু নিম্নলিখিত পঞ্চপদী গাথা দ্বারা রাত্রির বর্ণনা করিলেন :

'দেখ কি অপূর্ব্ব বেশ পরিধান করি,
পাইতেছে শোভা এই চারু বিভাবরী।
নিরমল নভস্তল, বহে বায়ু সুশীতল,
রমণীয় দৃশ্য হেরি জুড়ায় নয়ন;
উত্তপ্ত হৃদয়ে হয় শান্তির সিঞ্চন।

আপনারা বলুন দেখি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গেলে তাঁহার উপদেশসুধা পান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব?'

ইহা শুনিয়া কোন অমাত্য পূরণ কাশ্যপের, কোন অমাত্য মস্কারী গোশালীপুত্রের, কেহ কেহ বা অজিত কেশ কম্বল, কদুক কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরট্টীপুত্র বা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতি পুত্রের নাম করিলেন।[১] কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না, মহামাত্য জীবক কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জীবক অবিদূরে নীরব হইয়া বসিয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা কিছু বলাইতে চান কিনা তাহা নিশ্চিত জানা আবশ্যক।' রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য জীবক, আপনি নীরব রহিলেন যে?' এই কথা শুনিয়া জীবক দণ্ডায়মান হইয়া যে দিকে ভগবান বুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্যকসম্বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, পরমপূজ্য সম্যকসম্বুদ্ধ সার্দ্ধত্রিশতাধিকসহস্র-ভিক্ষুসহ ঐ স্থানে মদীয় আম্রকাননে বাস করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সুযশঃ কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি অর্হত্ত্বাদি নবগুণসম্পন্ন।[২] অতঃপর জীবক ভগবানের নবগুণ কীর্ত্তন করিলেন; তিনি রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বে নিমিত্তাদি দ্বারা যে সকল মহাপুরুষলক্ষণ সূচিত হইয়াছিল, বুদ্ধ জন্মাবধি অনুভাববলে তদপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহার-কালে জীবক বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি সেই ভগবানের শরণ লউন, তাঁহারই নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুন, তাঁহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয়াপনোদন করুন।'

এতক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া অজাতশত্রু জীবককে বলিলেন, 'বেশ, তাহাই করা যাউক। আপনি হস্তিযান সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিন।' মুহূর্ত্তের মধ্যে যান প্রস্তুত হইল; অজাতশত্রু রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত-জীবকের

---

[১]। ইঁহারা বৌদ্ধশাসন বিদ্বেষী এবং তীর্থক বা তৈর্থিয় নামে পরিচিত। পালি ভাষায় ইঁহাদের নাম যথাক্রমে, পূরণ কস্‌সপ, মক্‌খালি গোসাল অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত (৭৩ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।)

[২]। নবগুণসম্পন্ন = ভগবান, অর্হৎ, বুদ্ধ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তরপুরুষদম্য-সারথী ও দেবনরগণের শাস্তা।

আম্রকাননে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘে-পরিবৃত গন্ধমণ্ডলমালে[১] বীচিবিক্ষোভহীন মহার্ণবের ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজ করিতেছেন। রাজা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই শত শত ভিক্ষু দেখিতে পাইলেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও এত সাধুপুরুষের একত্র সমাগত দেখি নাই।' তিনি ভিক্ষুদিগের বিনীত, প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সঙ্ঘের স্তুতি করিলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যফল-প্রশ্ন[২] জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান তাঁহার নিকট অংশদ্বয়বিশিষ্ট শ্রামণ্যফল সূত্র[৩] ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু পরম প্রীত হইলেন এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'দেখ, এই রাজা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইনি যদি রাজ্যলোভে ধর্ম্মরাজ-কল্প পরম ধার্ম্মিক পিতার প্রাণবধ না করিতেন, তাহা হইলে অদ্য ঐ আসনে বসিয়াই অনাবিল ও বীতমল ধর্ম্মচক্ষু লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ক্রুরমতি দেবদত্তের অসাধু সংস্রবে থাকিয়া অর্হত্ত্ব দূরে থাকুক, ইনি স্রোতাপত্তি-ফলও প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না।'

পরদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা

১। মণ্ডলমাল = গোলাকার একচূড়াবিশিষ্ট মণ্ডপ।

২। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এবং গৌতম ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সংশয়-নিরাকারক বলিয়া পরিগণিত। প্রশ্নটীর তাৎপর্য্য এই : লোকে যে সমস্ত শিল্প কর্ম্ম করে, তাহার এক একটী প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। কুম্ভকার ঘট গড়ে; ঘট মনুষ্যের কাজে লাগে; ইহা বিক্রয় করিয়া কুম্ভকারের অর্থপ্রাপ্তি হয়। অতএব কুম্ভকারের কার্য্যের উপযোগিতা সুস্পষ্ট ও অচিরলক্ষিত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হন, তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ কোন ধ্রুব, অচিরলভ্য ও প্রত্যক্ষ ফল আছে কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ, মনে করুন এক ব্যক্তি আপনার দাসত্ব করিয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। এখন যদি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে চলিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি, তাহা হইলে পরকালে আমার সদ্গতি হইবে। ইহা স্থির করিয়া সে আপনার গৃহ হইতে পলাইয়া গেল এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিংসাচৌর্য্যাদি পরিহার করিয়া সাধুভাবে চলিতে লাগিল।' এখন বলুন ত, এই ব্যক্তিকে আবার দেখিতে পাইলে আপনি তাহাকে দণ্ড দিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বে নিয়োজিত করিবেন কি?' অজাতশত্রু বলিলেন, 'কখনই না; আমি বরং তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিব এবং তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইব।' 'তবেই দেখা যাইতেছে, মহারাজ শ্রমণ্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষফলও আছে।' অজাতশত্রু এই যুক্তির যথার্থ্য স্বীকার করিলেন এবং তদবধি বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইলেন।

৩। দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য।

বলিলেন, 'দেখ, দুঃশীল ও দুরাচার দেবদত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া অজাতশত্রু পিতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; সেই নিমিত্ত তিনি স্রোতাপত্তি-ফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। অহো, রাজার কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে!' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ! অজাতশত্রু যে কেবল এই জন্যেই পাপের সহায়তা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক হন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মৃতকোত্থাপন মন্ত্র[১] দান করিয়াছিলেন। সে উত্থানপনমন্ত্র শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিবাহন মন্ত্র গ্রহণ করে নাই।

একদিন সঞ্জীব সতীর্থদিগের সঙ্গে কাষ্ঠাহরণার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক মৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া বলিল, 'আমি এই মৃত ব্যাঘ্রের জীবন সঞ্চার করিতেছি।' তাহার সঙ্গিগণ বলিল, 'করিলে আর কি? মৃতদেহে কি জীবনসঞ্চার হইতে পারে?' 'তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ না, আমি এই ব্যাঘ্রকে এখনই বাঁচাইব।' 'পার ত বাঁচাও।' ইহা বলিয়া তাহারা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল।

অনন্তর সঞ্জীব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একখণ্ড খর্পর দ্বারা মৃত ব্যাঘ্রকে আঘাত করিল। ব্যাঘ্র তখনই জীবিত হইয়া ভীমবিক্রমে সঞ্জীবের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং গলনালীতে দংশন করিল। তাহাতে সঞ্জীবের প্রাণবিয়োগ ঘটিল; ব্যাঘ্রও পুনর্ব্বার গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল; উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ কাষ্ঠসংহরণপূর্ব্বক আচার্য্যগৃহে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। আচার্য্য তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎসগণ! সঞ্জীব খলের উপকার করিতে গিয়া, অযুক্ত স্থানে সম্মান দেখাইয়া, নিজের প্রাণ হারাইল। সাবধান, তোমরা কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হও।' অনন্তর

---

[১]। মৃতক + উত্থাপন অর্থাৎ যাহার বলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়। প্রতিবাহন মন্ত্র = যে মন্ত্রের বলে উজ্জীবিত প্রাণীকে পুনর্ব্বার বীতজীবন করিতে পারা যায়।

তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

‘খলের যদ্যপি তুমি কর উপকার,
প্রতিদানে পাবে তার শুধু অপকার।
অসতের সেবা যদি করে কোন জন,
নিশ্চিত তাহার হয় অনিষ্ট-ঘটন।
মৃত ব্যাঘ্র পড়ি’ ছিল বনের মাঝারে,
সঞ্জীব মন্ত্রের বলে বাঁচাইল তারে;
কিন্তু খল নিজ প্রাণ লভিল যখনি,
সঞ্জীবের জীবনান্ত করিল তখনি।’

*　　　*　　　*

[বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই মৃতব্যাঘ্র-পুনরুজ্জীবক শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য]

☞ পঞ্চতন্ত্রেও এইরূপ একটী গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র—তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু নির্ব্বোধ। একজন শাস্ত্রপরাঙ্মুখ কিন্তু সবোধ। বনপথে যাইবার সময় ইহাদের একজন একটী মৃতসিংহের অস্থি সঞ্চয় করিল, একজন তাহাতে চর্মমাংসরুধির সংযোজন করিল এবং একজন প্রাণ সঞ্চার করিল। সিংহ তাহাদের তিন জনেরই প্রাণ সংহার করিল; কিন্তু সুবুদ্ধি পূর্ব্বেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল।

সমাপ্ত

॥ পরিশিষ্ট ॥

জাতকোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

● **অঙ্গুলিমাল**—ইনি প্রথমে নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি করিতেন; পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ভার্গব কোশল রাজের পুরোহিত ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ইনি ভুমিষ্ট হন, তখন নাকি রাজধানীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন যে ইনি কালে একজন ভয়ানক দস্যু হইবেন। ভার্গবের ইচ্ছা ছিল এরূপ পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন; কিন্তু কোশলরাজের আদেশে তিনি এই নৃশংস সঙ্কল্প হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের প্রকৃত নাম 'অহিংসক'।

অহিংসক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে গমন করেন। তাঁহার এমনই বুদ্ধি ও অধ্যবসায় ছিল যে সহধ্যায়ীদিগের কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহারা ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হয় এবং তাহাদের চক্রান্তে অধ্যাপকের মনে অযথা ধারণা জন্মে যে অহিংসক তাঁহার পত্নীর সহিত গুপ্তপ্রেমে আবদ্ধ। একদিন অধ্যাপক বলিলেন, 'বৎস অহিংসক, অতঃপর যদি তুমি এক সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়া নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী অঙ্গুলি আনিয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলেই তোমাকে বিদ্যাদান করিব; নচেৎ তোমাকে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে।' বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কায় অহিংসক একটা বনে গিয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বনের ভিতর আটটী ভিন্ন ভিন্ন রাজপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল; অতএব বধের জন্য প্রথম প্রথম লোকাভাব ঘটিত না। নিহত ব্যক্তিদিগের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইতেন বলিয়া লোকে অহিংসককে 'অঙ্গুলিমাল (ক)' বলিত।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারে অচিরে সমস্ত কোশলরাজ্য সন্ত্রস্ত হইল; প্রসেনজিৎ স্বয়ং সসৈন্যে গিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পুরোহিত বুঝিতে পারিলেন এ দস্যু আর কেহ নহে, তাঁহারই পুত্র। কিন্তু তিনি পুত্রের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, ভাবিলেন, 'আমি গেলে হয়ত আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।' তাঁহার পত্নী কিন্তু পুত্রের বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য নিজেই যাইবেন স্থির করিলেন।

বুদ্ধ এই সময় জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, 'এজন্মে যাহাই হউক, অঙ্গুলিমালের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এমন সুকৃতি আছে যে তাহার বলে একবার মাত্র ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেই তিনি অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি সুবিধা পাইলে নিজের গর্ভধারিণীকেও বধ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।' এই রমণীর প্রাণরক্ষা এবং পাতকীর উদ্ধার এই উভয় উদ্দেশ্যে করুণাবতারের করুণাসিন্ধু উদ্‌বেলিত হইল; তিনি সামান্য ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালের বনে গমন করিলেন। পথে গোপালেরা তাঁহাকে কত নিষেধ করিল, বলিল, 'ঠাকুর এপথে যাইবেন না; অঙ্গুলিমাল ভয়ঙ্কর দুস্যু; লোকে ৪০/৫০ জন একত্র না হইয়া কখনও এ পথে যাতায়াত করিতে পারে না।' কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সেই দিন পর্য্যন্ত অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জন লোকের প্রাণসংহার করিয়াছেন। আর একটী লোক মারিলেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইবে এই বিবেচনায় তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজই নরহত্যাব্রতের উদ্‌যাপন করিব। কিন্তু বহুক্ষণ প্রতিক্ষা করিয়াও তিনি সফলকাম হইলেন না, কারণ পথিকেরা সচরাচর তাঁহার ভয়ে হয় অন্য পথে যাতায়াত করিত, নয় অনেকে এক সঙ্গে যাইত। অবশেষে ভিক্ষুবেশধারী বৃদ্ধকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু ক্রমাগত ৬ ক্রোশ দৌড়াইয়াও বুদ্ধকে ধরিতে পারিলেন না। অঙ্গুলিমাল ইতিপূর্ব্বে অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি কত দ্রুতগামী প্রাণীকে বেগে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু আজ একজন ভিক্ষুকে ধরিতে পারিলেন না ইহা ভাবিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষুকে থামিতে বলিলেন। বুদ্ধ থামিলেন, কিন্তু অঙ্গুলিমালকে বলিলেন, 'তুমিও যেখানে আছ সেইখানেই থাক, আমার দিকে অগ্রসর হইও না।' অঙ্গুলিমাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তখনই থামিলেন; তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া পাষাণ গলিয়া গেল; বুদ্ধও দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক 'এহি ভিক্ষো' বলিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। অতঃপর অঙ্গুলিমাল জেতবনের বিহারে গমন করিলেন। তাঁহার জনক জননীও তদীয় অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন; তাঁহারা এসকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, কাজেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে কোশলরাজ দেখিলেন অঙ্গুলিমালকে দমন না করিতে পারিলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; অথচ লোকটার যেরূপ বলবীর্য্য তাহাতে দমন করিতে যাওয়া নিতান্ত নিরাপদও নহে। তিনি বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমন করিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে, মহারাজ? বিম্বিসার কি আপনার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন, অথবা আপনি বৈশালীর

লিচ্ছবিরাজগণ হইতে ভয় পাইয়াছেন?' প্রসেনজিৎ বলিলেন, না প্রভু, সেরূপ কিছু ঘটে নাই; তবে অঙ্গুলিমাল নামক এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে দমন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।' 'মনে করুন, অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হইয়াছে; বলুন ত আপনি তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?' 'সে যদি ভিক্ষু হইয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে সমুচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিব।'

প্রসেনজিৎ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের ন্যায় পাষণ্ডকে নিজের শিষ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, সেই ভীষণ দস্যু বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাঁহার মহা আতঙ্ক হইল। বুদ্ধ তাঁহাকে অভয় দিয়া অঙ্গুলিমালের নিকট লইয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ নিজের মণিখচিত কটিবন্ধ খুলিয়া উহা অঙ্গুলিমালকে উপহার দিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল এখন বিষয়বাসনাহীন; তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। তদ্দর্শনে কোশলরাজ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'অহো, কি অদ্ভুত ব্যাপার! আজ পাষাণে কর্দ্দম দেখা দিয়াছে, লোভী দানশীল হইয়াছে; পাপী পুণ্যবান হইয়াছে; প্রভো, এই তোমারই মহিমা! আমি রাজদণ্ডদ্বারা লোকের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয় না।'

ইহার কয়েকদিন পরে অঙ্গুলিমাল পাত্রহস্তে নিজের পল্লীতে ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিন্তু লোকে তাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন; ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক রমণী প্রসব-যন্ত্রণায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল। যিনি ৯৯৯ জন মনুষ্যের জীবনান্ত করিয়াছেন, ত্রিরত্নের মাহাত্ম্যে আজ তাঁহারই হৃদয় এক মরণীর কষ্টে বিগলিত হইল। তিনি বিহারে গিয়া বুদ্ধকে এই কথা জানাইলেন। বুদ্ধ বলিলেন, 'তুমি ফিরিয়া যাও; বল গিয়া, 'আমি জন্মাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রাণিহিংসা করি নাই। আমার সেই পুণ্যবলে এই রমণীর প্রসবযন্ত্রণার উপশম হউক।' ইহা শুনিয়া অঙ্গুলিমাল বলিলেন, 'সে কি কথা, প্রভো! আমি যে শত শত লোকের প্রাণবধ করিয়াছি!' বুদ্ধ বলিলেন, 'করিয়াছ বটে, কিন্তু তখন তুমি পৃথগ্জন ছিলে; ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া এখন তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ।' অঙ্গুলিমাল তখন সেই রমণীর গৃহে গমন করিলেন এবং যবনিকার অন্তরালে বসিয়া বুদ্ধ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেই রূপ সত্যক্রিয়া করিলেন। অমনি সেই রমণী বিনাক্লেশে এক পুত্র প্রসব করিয়া যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল।

অঙ্গুলিমালের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পাইত; এইজন্য তাঁহার ভিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিত। অতীত পাপ স্মরণ করিলেও তাঁহার বড় অনুতাপ হইত। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতেন, বলিতেন, 'ও সব তোমার পূর্ব্ব জন্মের

বৃত্তান্ত। এখন তুমি আর সে অঙ্গুলিমাল নও; এখন তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।' নিজের সাধনা এবং বুদ্ধের কৃপাবলে অঙ্গুলিমাল অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

● **অচিরবতী**—জম্বুদ্বীপের নদীবিশেষ, পঞ্চমহানদীর অন্যতম। ইহার বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী। ইহা ঘর্ঘরার একটী উপনদী। শ্রাবস্তী নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

● **অজপালন্যগ্রোধতরু**—বুদ্ধগয়ার একটী বিখ্যাত বটবৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মারের কন্যাত্রয়—তৃষ্ণা, অরতি ও রাগ প্রলুব্ধ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। এখানে এক সপ্তাহ যাপন করিবার পর বুদ্ধ এক মুচিলিন্দ বৃক্ষমূলে গমন করেন।

● **অজাতশত্রু**—মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয়; কিন্তু ইঁহার 'বেদেহীপুত্র' এই উপাধি দেখিলে মনে হয় সম্ভবত ইঁহার গর্ভধারিণী বিদেহরাজের কন্যা ছিলেন। পক্ষান্তরে জাতকের কোন কোন প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে মনে হয় কোশলরাজকন্যাই ইঁহার জননী। প্রবাদ আছে ইনি যখন গর্ভে ছিলেন তখন মহিষীর সাধ হইয়াছিল যে রাজার স্কন্ধনিঃসৃত রক্ত পান করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অভিলাষ অনেক দিন গোপন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে রাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি মনের কথা খুলিয়া বলিলেন; রাজাও প্রফুল্লচিত্তে তাহার সাধ পূর্ণ করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কিন্তু এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, 'যে মহিষীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহন্তা হইবে। এই কথা শুনিয়া মহিষী পুনঃ পুনঃ গর্ভনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার সতর্কতানিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অজাতশত্রু ষোড়শবর্ষ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেবদত্ত যখন বুদ্ধের বিরোধী হইয়াছিলেন, তখন অজাতশত্রু তাঁহার কুহকে পড়িয়া পিতার প্রাণবধের সঙ্কল্প করেন। একদিন বিম্বিসার সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় অজাতশত্রু শল্যহস্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পিতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মহা আতঙ্ক জন্মিল এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বিম্বিসার তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি আমার প্রাণবধের ইচ্ছা করিয়াছ কেন?' অজাতশত্রু বলিলেন, 'আমি রাজপদ চাই; আপনি আরও কত কাল বাঁচিবেন জানিনা, আমি তত দিন বাঁচিব কিনা সন্দেহ।' ইহা শুনিয়া বিম্বিসার বলিলেন, 'বেশ, তুমি এখনই রাজপদ গ্রহণ কর।' অনন্তর তিনি নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণের

আয়োজন করিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি অজাতশত্রুকে বুঝাইলেন, 'বিম্বিসার জীবিত থাকিলে তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার পাইবার চেষ্টা না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না। অতএব অচিরে তাঁহাকে নিহত করাই যুক্তিযুক্ত।' অজাতশত্রু অস্ত্রাঘাতে পিতার প্রাণবিনাশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবদত্ত পরামর্শ দিলেন, 'তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে বিনষ্ট করা হউক।'

অজাতশত্রু এই পথই অবলম্বন করিলেন। কারাগৃহে রাজমহিষী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না। মহিষী গোপনে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া যাইতেন; বিম্বিসার তাহা ভক্ষণ করিতেন। অজাতশত্রু ইহা বুঝিতে পারিয়া মহিষী যাহাতে কোনরূপ খাদ্য লইয়া যাইতে না পারেন এইরূপ আদেশ দিলেন। তখন মহিষী নিজের কেশদামের মধ্যে খাদ্যলুক্কায়িত রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অজাতশত্রু ক্রমে ইহাও জানিতে পারিলেন এবং মহিষীকে বেণী বান্ধিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর মহিষী নিজের সুবর্ণনির্ম্মিত পাদুকার অভ্যন্তরে খাদ্য লুক্কায়িত রাখিতেন; কিন্তু তাহা ধরা পড়িল। তখন তিনি নিজের শরীরে মধু ও অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য মাখিয়া যাইতেন; বিম্বিসার তাঁহার দেহ লেহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পরিশেষে ইহাও প্রকাশ পাইল এবং অজাতশত্রু মহিষীর কারাগৃহে গমন বন্ধ করিলেন। যিনি মগধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, যিনি অঙ্গদেশ জয় করিয়া ঐ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এই রূপে খাদ্যাভাবে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল।

যেদিন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইল, সেই দিনই অজাতশত্রুর এক পুত্র জন্মিল। পুত্র ভূমিষ্ট হইয়াছে শুনিয়া অজাতশত্রু অপত্য-স্নেহের আস্বাদ পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'আমি যখন ভূমিষ্ট হইয়াছিলাম, তখন আমার জনকেরও এইরূপ হর্ষ হইয়াছিল।' তিনি পিতাকে কারামুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তখন অজাতশত্রুর মনে অনুতাপ জন্মিল; কিন্তু দেবদত্তের চক্রান্তে সে অনুতাপ প্রথমে স্থায়ী হইল না।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশার্থ নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন; অজাতশত্রু তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু দেবদত্তের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; পৃথিবী আর তাঁহার পাপভার বহন করিতে পারিলেন না। তিনি বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে অবীচিতে লইয়া গেলেন।

বিম্বিসারের সহিত যখন কন্যার বিবাহ দেন তখন কোশলরাজ কাশী প্রদেশ যৌতুক দিয়াছিলেন। বিম্বিসারের নিধনের পর প্রসেনজিৎ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। তদুপলক্ষ্যে অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। দীর্ঘকাল

যুদ্ধের পর শেষে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন করেন। বর্দ্ধকি-শূকর জাতকের (২৮৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে এই বৃত্তান্ত দেখা যায়।

দেবদত্তের বিনাশের পর অজাতশত্রুর মনে পিতৃবধজনিত অনুতাপানল শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তীর্থিকেরা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারেন নাই। অবশেষে জীবকের পরামর্শে তিনি বুদ্ধের শরণ লইয়া ছিলেন; বুদ্ধও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া উপাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জীব জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে জানা যায়।

বুদ্ধের বয়স যখন ৭৯ বৎসর, তখন অজাতশত্রুর সহিত বৈশালীর বৃজি (লিচ্ছবি) দিগের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অজাতশত্রু বুদ্ধের উপদেশগ্রহণার্থ তাঁহার নিকট বর্ষকার নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে বৃজিগণ যতদিন একতাবদ্ধ ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে, ততদিন তাহাদের পরাভব ঘটিতে পারে না। শুনা যায় অতঃপর অজাতশত্রু বৃজিদিগের মধ্য আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাহাদের পরাভব সাধন করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই বুদ্ধ নালন্দা হইতে বৈশালীতে যাইবার সময় পাটলি নাম স্থানে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পাটলি তখন একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল; বৃজিদিগের আক্রমণ-নিরোধার্থ সুনীথ ও বর্ষকার নামক অজাতশত্রুর দুইজন কর্ম্মচারী এখানে একটী দূর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধ প্রস্থান করিবার সময় বলিয়া যান যে এই গ্রাম কালে একটী মহানগরে পরিণত হইবে; কিন্তু ত্রিবিধ উপদ্রবে পরিণামে ইহার বিনাশ ঘটিবে।' এই পাটলি উত্তরকালীন মগধসাম্রাজ্যের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র। জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ এবং শকদিগের আক্রমণে তাঁহার যে ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের সুবিদিত। পাঠানরাজ শের শাহের সময় পাটলিপুত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

পর বৎসর কুশিনগরে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হইলে অজাতশত্রু শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে তদীয় শারীরিক ধাতু সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি দূত প্রেরণ করিলেন এবং পাছে কুশিনগরবাসীরা উহা না দেয় এই আশঙ্কায় নিজেও সসৈন্যে দূতদিগের অনুগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে অংশ পাইলেন তাহা সসম্মানে রাজগৃহে আনয়ন করিয়া তদুপরি এক বিশাল স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

● **অজিতকেশকম্বল**—পালি 'অজিত কেশকম্বলী'; ইনি একজন তীর্থিক অর্থাৎ বৌদ্ধশাসনবিরোধী সন্ন্যাসী। ইনি পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিলেন; প্রভুর নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক গত্যন্তরাভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি উর্ণানির্ম্মিত

মলিনবস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তক মুণ্ডিত রাখিতেন এবং শিক্ষা দিতেন যে জীব ও উদ্ভিদ উভয়ের জীবন নাশ করাই তুল্য পাপ।

● **অনাথপিণ্ডদ**—(পালি 'অনাথপিণ্ডিক'); শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠীকুলজাত অনাথপিণ্ডদ একজন উপাসক (বা মহোপাসক); ইঁহার প্রকৃত নাম সুদত্ত। ইনি যেমন বিভবশালী, তেমনই দানশীল ছিলেন এবং দানশীলতার জন্যই 'অনাথপিণ্ডদ' আখ্যা পাইয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। রাহুল প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দিবার পর বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ফিরিয়া শীতবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনাথপিণ্ডদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। অনাথপিণ্ডদ তখন বাণিজ্যার্থ পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট লইয়া রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশবলে শতসহস্র নরনারী মুগ্ধ হইতেছে শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বুদ্ধও অনাথপিণ্ডদের সৌজন্যে এমন প্রীত হইলেন যে তাঁহার অনুরোধে শ্রাবস্তীতে গিয়া কিয়দ্দিন বাস করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া বুদ্ধের বাসোপযোগী মহাবিহার নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন। শ্রাবস্তীবাসী জেতকুমার নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকুলজ ব্যক্তির সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও সহস্র হস্ত বিস্তৃত একটী উদ্যান ছিল। অনাথপিণ্ডদ বিহার-নির্ম্মাণার্থ উহা ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, যদি সমস্ত ভূমি সুবর্ণমুদ্রামণ্ডিত করিয়া সেই মুদ্রাগুলি মূল্যস্বরূপ দিতে পার, তাহা হইলেই বিক্রয় করিব। অনাথপিণ্ডদ তাহাতেই সম্মত হইয়া অষ্টাদশকোটি সুবর্ণে ভূমি ক্রয় করিলেন। বিহারনির্ম্মাণেও অষ্টাদশ কোটি ব্যয় হইল। উহার মধ্যভাগে বুদ্ধের গন্ধকুটীর, তাহার চতুর্দ্দিকে অশীতি মহাস্থবিরের বাসভবন, ধর্ম্মশালা, আসনশালা, ভিক্ষুদিগের আশ্রম, চঙক্রমণ-স্থান, পুষ্করিণী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠীপুঙ্গব অসামান্য মুক্তহস্ততার পরিচয় দিলেন। রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী পঁয়তাল্লিশ যোজন। এই সুদীর্ঘপথে যাতায়াত করিবার সময় বুদ্ধের কোন কষ্ট না হয় এ উদ্দেশ্যে তিনি উহারও প্রতিযোজনে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

সমস্ত সম্পন্ন হইলে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে আনয়ন করিবার জন্য রাজগৃহে দূত পাঠাইলেন; বুদ্ধও শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। অনন্তর বিহারোৎসর্গের আয়োজন হইতে লাগিল। উৎসর্গের দিন যে শোভাযাত্রা বাহির হইল তাহার আড়ম্বর বর্ণনাতীত। সমস্ত মহাবিহার পতাকাপুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইল; শ্রেষ্ঠীপুত্র বিচিত্র বেশভূষণ ধারণ করিয়া পঞ্চশত শ্রেষ্ঠীকুমার সহ পতাকাহস্তে প্রত্যুদ্গমন করিলেন; শ্রেষ্ঠীকন্যা

মহাসুভদ্রা ও খুল্লসুভদ্রা পঞ্চশত কুমারীসহ পূর্ণকুম্ভ মস্তকে লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা শ্রেষ্ঠীগৃহিণী পঞ্চশত পুরন্ধ্রীসহ পূর্ণপাত্র বহন করিয়া কুমারীদিগের অনুগমন করিলেন; সর্ব্বপশ্চাতে স্বয়ং মহাশ্রেষ্ঠী পঞ্চশত শ্রেষ্ঠীসহ নববস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। এদিকে বুদ্ধও জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার পুরোভাগে সহস্র সহস্র উপাসক, চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র শ্রাবক। পথিমধ্যে দুই দলে দেখা হইল; সকলে একসঙ্গে জেতবনে প্রবেশ করিলেন; বুদ্ধের অলৌকিক দেহপ্রভায় সমগ্র জেতবন সুবর্ণ-রেণুসমাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন! এই মহাবিহার সম্বন্ধে কি করিব, অনুমতি দিন।' বুদ্ধ বলিলেন, 'তুমি এই বিহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান কর।' তখন অনাথপিণ্ডদ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সুবর্ণ ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দশবলের হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন এবং 'সর্ব্বদেশীয় বুদ্ধপ্রমুখ আগত অনাগত সঙ্ঘকে এই বিহার দান করিলাম' বলিয়া উৎসর্গক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) দেখা যায় এই মহাবিহারের নির্ম্মাণে ও উৎসর্গক্রিয়ায় অনাথপিণ্ডদের চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ ব্যয় হইয়াছিল।

বুদ্ধ হইবার পর গৌতম কিয়ৎকাল বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপতনে (বর্ত্তমান সারনাথে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন; অনন্তর তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী লট্‌ঠি উদ্যানে বাস করেন; কিন্তু শেষে বিম্বিসারের অনুরোধে বেণুবনস্থ বিহার গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিতেন। এখন অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে জেতবনও তাঁহার অন্যতম বাসস্থান হইল। অধিকাংশ জাতকই জেতবনে প্রোক্ত।'

● **অনিরুদ্ধ**—শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পুত্র[১]; ইঁহার সহোদরের নাম মহানাম। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনিরুদ্ধের কোনরূপ সংসারিক অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। অনন্তর মহানামের চক্রান্তে ইনি বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল এবং নাপিত উপালিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

● **অনুপিয়**—মল্লদেশস্থ স্থানবিশেষ। এখানেই অনিরুদ্ধ প্রভৃতি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

● **অমরাদেবী**—পণ্ডিত মহৌষধের পত্নী। বোধিসত্ত্ব কোন অতীত জন্মে মহৌষধ নাম গ্রহণ করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। মহাউন্মার্গ জাতক

---

[১]। আবার আনন্দও অমৃতোদনের পুত্র এরূপ দেখা যায়। শুদ্ধোদনের সহোদর—অমৃতোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন এবং ঘটিতোদন। Kern বলেন যে ধৌতোদন ও শুদ্ধোদন সম্ভবত একই ব্যক্তি; কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি দেখা যায় না।

(৫৪৬) দ্রষ্টব্য।

● **আনন্দ**—বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। ইনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধের যখন ৫ বৎসর বয়স, তখন আনন্দ তাঁহার উপস্থায়ক নিযুক্ত হন। শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমর্য্যাদাকর হইবে। তদবধি পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আনন্দ নিয়ত বুদ্ধের সঙ্গে থাকিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতেন এবং অতি মধুরভাবে অপরকে সেই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তথাপি তিনি বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধদিগের মতে পরিনির্ব্বাণের পর রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণী গুহায় যে প্রথম সঙ্গীতি হয়, তাহাতে বিনয়পিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে উপালি এবং সূত্রপিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে আনন্দ সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আনন্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' উপাধিতে বিভূষিত।

বুদ্ধ প্রথমে নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা দিতেন না। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গৌতমী (মহাপ্রজাপতি) প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। অনন্তর আনন্দের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তিনি নারীদিগকেও সঙ্ঘে লইবার ব্যবস্থা করেন। ফলত আনন্দের প্রযত্নেই ভিক্ষুণী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

● **আম্রপালী**—(পালি 'অম্বপালী') বৈশালী নগরের প্রধান বারাঙ্গনা। কেহ কেহ বলেন বিম্বিসারের ঔরসে ইঁহার গর্ভে অভয়ের জন্ম হয় (জীবকের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

যে বৎসর বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয় সেই বৎসর তিনি রাজগৃহ হইতে কুশিনগরে যাইবার সময় বৈশালী নগরে আম্রপালীর আম্রবনে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আম্রপালী সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। ইহার ক্ষণকাল পরে লিচ্ছবিরাজেরাও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন; কিন্তু তথাগত বলিলেন, 'আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ কল্য আম্রপালীর গৃহে গিয়া ভোজন করিব এই অঙ্গীকার করিয়াছি।' অনন্তর তথাগত যথাসময়ে আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। আম্রপালী ভক্তিভরে তাঁহার সৎকার করিলেন এবং আহার শেষ হইলে আম্রবনটী বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। থেরীগাথায় আম্রপালীরচিত কয়েকটী অতি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ গাথা

দেখা যায়।

● **আলবী**—(সংস্কৃত 'আটবী') শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহের পথে এবং শ্রাবস্তী হইতে ৩৫ যোজন দূরে গঙ্গা তীরবর্ত্তী নগর। এখানে এক নরমাংসাদ যক্ষ বাস করিত। বুদ্ধ তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন। পালি সাহিত্যে এই যক্ষ 'আলাবক' নামে অভিহিত।

● **উৎপলবর্ণা**—শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি এমন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন যে অনেক রাজা ও ধনবান ব্যক্তি ইঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে অপর সকলের কোপভাজন হইতে হইবে এই আশঙ্কায় উৎপলবর্ণার পিতা তাঁহাকে ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবেশিত করেন। ভিক্ষুণী হইবার অল্পদিন পরেই উৎপলবর্ণা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী অন্ধবনে একটী গুহার মধ্যে একাকিনী ধ্যানমগ্না থাকিতেন। এখানে ইঁহার মাতুলপুত্র নন্দ ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন অবীচিতে গিয়াছিল। উৎপলবর্ণা ও ক্ষেমা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

● **উপালি**—কপিলবাস্তুর রাজকুলের নাপিত। যখন অনিরুদ্ধ, আনন্দ দেবদত্ত প্রভৃতি রাজপুত্রগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তাঁহারা উপালিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবাস্তু হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মূল্যবান বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচনপূর্ব্বক উপালির হস্তে দিয়া বলিলেন, 'এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও।' কিন্তু উপালি বিবেচনা করিলেন, আমি একাকী কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন। বিশেষত আমি নাপিত; এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যও আমার উপযুক্ত নহে। রাজপুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে প্রব্রাজক হওয়া আরও সহজ। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি একটী বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া রাজপুত্রদিগের অনুগমন করিলেন। শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিতে অগ্রসর হইলে রাজপুত্রেরা বলিলেন, 'অগ্রে উপালিকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে প্রণাম করিব এবং নাপিতকে প্রণাম করিয়াছি বলিয়া পরে ইচ্ছা থাকিলেও আর কখনও সংসারাশ্রমে ফিরিতে পারিব না।' উপালি ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। বিনয়ে তাঁহার অসামান্য বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল এবং এই জন্য তিনি 'বিনয়ধর' উপাধি পাইয়াছিলেন। সপ্তপর্ণী সঙ্গীতিতে ইঁহারই সাহায্যে বিনয়পিটকের সঙ্কলন সুসম্পন্ন হয়।

● **ককুদকাত্যায়ন**—(পালি 'পকুব কচ্চায়ন')—তীর্থিকদিগের অন্যতম, ইনি কোন ভদ্রবংশীয় বিধবার পুত্র। শৈশবে এক ব্রাহ্মণ ইঁহাকে পালন করেন। ইনি

এবং ইঁহার শিষ্যগণ কখনও শীতল জল ব্যবহার করিতেন না, কারণ ইনি বলিতেন শীতল জলে অনেক প্রাণী থাকে।

● **কপিলবাস্তু**—বারণসীর প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে নেপাল প্রদেশে রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে বোধিসত্ত্ব কোন অতীত জন্মে 'কপিল' নাম গ্রহণ করিয়া এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তদনুসারে ইহার 'কপিলবাস্তু' এই নাম হয়। কপিলবাস্তুর শাক্যেরা ইক্ষাকুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন ইক্ষাকুবংশীয় অম্ব নামক এক রাজার চারি পুত্র এবং চারি কন্যা নির্ব্বাসিত হইয়া এখানে বাস করেন। এই রাজকুমারেরা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরাই 'শাক্য' বলিয়া পরিচিত। সহোদরের সহিত সহোদরার বিবাহ দশরথ জাতকেও (৪৬১) দেখা যায়। বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স সেই সময়ে প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক তত্রত্য শাক্যদিগের বিনাশ সাধন করেন।

● **কাপিলানী**—২৭১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

● **কালুদায়ী**—(কৃষ্ণবর্ণ উদায়ী, অথবা কালোদায়ী অর্থাৎ যিনি যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হন); সিদ্ধার্থ ও ইনি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইবার পর তাঁহাকে কপিলবাস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদন উদায়ীকে রাজগৃহে প্রেরণ করেন। ইনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের শিষ্যদিগের মধ্যে উদায়ী নামে আর একজন ভিক্ষু ছিলেন। বুদ্ধির স্থূলতাবশত তিনি লালুদায়ী আখ্যা পাইয়াছিলেন (লালক = স্থূলবুদ্ধি, বোকা)।

● **কিম্বিল**—যে সকল শাক্যরাজপুত্র অনুপিয় নামক স্থানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম।

● **কুশাবতী**—কুশিনগরের পূর্ব্বনাম। তখন বোধিসত্ত্ব 'মহাসুদর্শন' নাম ধারণ করিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন।

● **কুশিনগর**—(পালি 'কুসিনারা'; নামান্তর 'কুশনগর'); মল্লদেশস্থ নগর (বর্ত্তমান নাম 'কাশিয়া'; গোরক্ষপুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্বে)। এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয়; আনন্দ বলিয়াছিলেন, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী মহানগরের যে কোনটীতে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইলে ভাল হইত। কিন্তু তথাগত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'এও অতি পবিত্র স্থান, আনন্দ; পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং আমি এখানে মহাসুদর্শন নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলাম [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫)]।

● **কূটদন্ত**—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ। ইঁহার পঞ্চশত শিষ্য ছিল। বিম্বিসার ইঁহাকে অতি সম্মান করিতেন। একদা ইনি যজ্ঞসম্পাদনের জন্য বহু শত গো, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ ইঁহার

বাসস্থানের অবিদূরস্থ আম্রবনে উপস্থিত হন। কূটদন্ত এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'যথাশাস্ত্র যজ্ঞসম্পাদন করিতে হইলে কি কি করিতে হয়?' বুদ্ধ উত্তর দেন, 'প্রকৃত যজ্ঞ পশুবধ নহে; প্রকৃত যজ্ঞ বলিলে দান বুঝিতে হইবে। যিনি যথাশক্তি পরের অভাব মোচন করেন তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করেন।' অতঃপর কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইয়া স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

● **কোকালিক**—শাক্যবংশী বৌদ্ধ। দেবদত্তের প্ররোচনায় ইনি এবং কতমোরগ তিষ্য, খণ্ডদেবপুত্র ও সাগর দত্ত (সমুদ্রদত্ত) বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ কতিপয় উৎকট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ তাহাতে অসম্মত হইলে ইনি দেবদত্তের সহিত সঙ্ঘত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। যখন শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন দেবদত্তের দল ভাঙ্গিবার জন্য গয়াশিরে যান, তখন কোকালিক দেবদত্তকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু দেবদত্ত তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া ঐ দুই মহাস্থবিরকে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে বলেন; তচ্ছ্রবণে কোকালিক প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত অপর সকলে বৌদ্ধশাসনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। [বিরোচন জাতক (১৪৩) দ্রষ্টব্য]।

● **কোর ক্ষত্রিয়**—ইনি একজন তীর্থিক। ইনি সর্ব্বদা ভস্মে আচ্ছাদিত থাকিতেন, ভোজ্য পানীয় হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতেন না, গবাদি পশু যেরূপে খায় সেইরূপে খাইতেন। লিচ্ছবিবংশীয় সুনক্ষত্র নামক এক ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি বিরক্ত হইয়া এই ব্যক্তির শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ বলেন, 'সপ্তাহ মধ্যে কোর ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইবে এবং সে কালকঞ্জক প্রেতরূপে জন্মলাভ করিবে। তখন তাহার দেহ সার্দ্ধ যোজন দীর্ঘ হইবে; উহাতে রক্তমাংস থাকিবে না; তাহার চক্ষুদ্বয় কর্কটচক্ষুর ন্যায় মস্তকের উপরিভাগে থাকিবে, কাজেই তাহাকে দেহ অবনত করিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে হইবে।' এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সুনক্ষত্র কোর ক্ষত্রিয়কে গিয়া বলেন, 'বুদ্ধ বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে। অতএব আপনি খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিবেন।' কোর এই কথা শুনিয়া ৬ দিন অনাহারে থাকিলেন; কিন্তু সপ্তম দিবসে ক্ষুধার জ্বালায় বরাহমাংস খাইলেন এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

● **কোলিক**—রোহিণী নদীতীরস্থ নগর; ইহা কপিলবাস্তুর অপরপারে অবস্থিত ছিল। ইহার অন্য নাম দেবহ্রদ, দেবদহ ও ব্যাঘ্রপুর। দেবদত্ত ও যশোধরা কোলির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে ইক্ষাকুবংশীয় যে রাজপুত্রচতুষ্টয় কপিলবাস্তু স্থাপিত করেন তাঁহাদের এক জনের প্রিয়া নাম্নী পত্নী শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পতিকর্ত্তৃক বনে

নির্ব্বাসিতা হন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ রামও শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগের অভিপ্রায়ে উক্ত বনে উপস্থিত হন এবং দৈবযোগে একটা বৃক্ষের পুষ্প ও ফল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর প্রিয়াকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকেও ঐ ঔষধে ব্যাধি মুক্ত করেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া একটা কেলিকদম্ব (কোলি) বৃক্ষের কোটরে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রিয়া প্রতিবারে দুইটী দুইটী করিয়া ৩২টি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত কপিলবাস্তুর ৩২ জন রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। রাম বারাণসীতে ফিরিয়া যান নাই; ঐ বনেই এক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা বৃক্ষের নামে ঐ নগরের নাম হয় কেলি।

● **কোশাম্বী**—(১৩৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। কানিংহামের মতে ইহা বর্ত্তমান কোশম—এলাহাবাদের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যমুনাতীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে এই নগর কুশের পুত্র কুশাম্ব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী। বাসবদত্তা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের মহিমায় কৌশাম্বী সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত (ঘোষিল) বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে কৌশাম্বীর উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী উদ্যান দান করিয়াছিলেন। এই উদ্যান ঘোষিতরাম বা ঘোষাবতারাম নামে পরিচিত। উদয়ন বুদ্ধের জীবদ্দশায় রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলেন। হাইয়স্থ সাং বলেন তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

● **ক্ষেমা**—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী। ইনি বড় রূপগর্ব্বিতা ছিলেন। এই দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত একদিন বুদ্ধ ইঁহার সমক্ষে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাকে যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দশায় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। এমন সুন্দরী মূর্ত্তির বিকট পরিণাম দেখিয়া ক্ষেমার গর্ব্ব মন্দীভূত হয়, এবং তিনি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন। মার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্ষেমা শেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যেমন শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন 'অগ্রশ্রাবক', সেইরূপ ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

● **গয়াশির**—(গয়াশীর্ষ বা ব্রহ্মযোনি); গয়ার নিকটবর্ত্তী শৈল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কিয়দ্দিন পরে বুদ্ধ এখানে 'আদিত্ত-পরিয়ায়' (আদীপ্তপর্য্যায়) সূত্র বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া এখানেই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

● **গান্ধার**—বর্ত্তমান পেশাওর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পূর্ব্বে গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা নগর তখন নানাবিষয়িণী বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে সমবেত হইয়া উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিত।

● **চিঞ্চা মাণবিকা**—তীর্থিকদিগের একজন শিষ্যা। বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তীর্থিকেরা তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপণ করিবার নিমিত্ত চিঞ্চাকে নিয়োজিত করেন। চিঞ্চা জনসাধারণের সন্দেহ জন্মাইবার নিমিত্ত, প্রতিদিন যেন বুদ্ধের সহিত রাত্রিযাপন করিতে যাইতেছে এইভাব দেখাইতে লাগিল [মণিশূকর জাতকে (২৮৫) সুন্দরী সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়]; এবং গর্ভবতী হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিল। অনন্তর নবম মাসে, একদিন বুদ্ধ যখন ধর্ম্মশালায় বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন চিঞ্চা সেখানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, 'আপনিই গর্ভস্থ সন্তানের জনক; আমার প্রসবকাল আগতপ্রায় তজ্জন্য যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা করুন।' এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ সিংহস্বরে বলিলেন, 'ভিক্ষুণি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।' তন্মুহূর্ত্তেই শক্র মুষিকশাবকের বেশ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং যে সূত্র দ্বারা চিঞ্চা তাহার উদরে কাষ্ঠপিণ্ড বন্ধন করিয়াছিল তাহা ছেদন করিলেন। কাষ্ঠ পিণ্ডটা পতিত হইয়া পাপিষ্ঠার পদাস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিল। বুদ্ধের নিন্দাবাদ করিয়া দেবদত্ত, নন্দ (উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র), নন্দক, যক্ষ এবং সুপ্রবুদ্ধ (যশোধরার পিতা), এই চারিজনেও উক্তরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

● **জনপদকল্যাণী**—পালি সাহিত্যে এই নামের অন্তত চারিজন রমণীর উল্লেখ দেখা যায়—(১) যশোধারার নামান্তর; (২) যাঁহার সহিত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিবাহ স্থির হইয়াছিল; (৩) আনন্দের মাতা; (৪) একজন বারবনিতা (তৈলপাত্র-জাতক (৯৬)]। বোধহয় 'জনপদকল্যাণী' নাম নহে, রূপবর্ণনাত্মক উপাধি মাত্র।

● **জম্বুদ্বীপ**—চতুর্মহাদ্বীপের অন্যতম; ইহা সর্ব্বদক্ষিণে। ভারতবর্ষ এই মহাদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী। হিন্দু শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপের উল্লেখ দেখা যায় (জম্বু, প্লক্ষ বা গোমেদক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর); আবার চতুর্দ্বীপেরও উল্লেখ আছে (ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু, উত্তরকুরু)। চতুর্মহাদ্বীপের বৌদ্ধ নাম উত্তরকুরু পূর্ব্ব বিদেশ, অপর গোদান ও জম্বুদ্বীপ; ইহারা যথাক্রমে মহামেরুর উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপ ত্রিকোণ বলিয়া বর্ণিত। ফলত বৌদ্ধ সাহিত্যে জম্বুদ্বীপ বলিলে ভারতবর্ষকেই বুঝায়।

● **জীবক**—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শল্যকর্ত্তা এবং বুদ্ধের একজন প্রিয় উপাসক। কেহ কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের উপপত্নী-গর্ভজাত, কেহ কেহ

বলেন তিনি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরষে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। অভয় নিজেও বিম্বিসারের এক উপপত্নী-গর্ভজাত পুত্র। বৈশালী নগরে আম্রপালী নাম্নী এক পরমসুন্দরী ও নানাগুণবতী বারবিলাসিনী ছিল[১]। ইহাতে বিম্বিসারের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে এবং রাজগৃহ নগরেও যাহাতে ঐরূপ একজন বারাঙ্গনা থাকে তন্নিমিত্ত তিনি সাতিশয় যত্নবান হন। অনেক চেষ্টার পর তিনি শালবতী নাম্নী এক রমণীকে এই পদের উপযুক্ত স্থির করিয়া তাহার বাসের জন্য রাজগৃহ নগরে এক উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই শালবতী অভয়ের সহবাসে গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করে এবং বারাঙ্গনাদিগের প্রথানুসারে তাহাকে বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়। শালবতীর কৌশলে অভয় তাহার গর্ভধারণবৃত্তান্ত বা পুত্রপ্রসব ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি বনমধ্যে বিচরণ করবার সময় দেখিলেন একস্থানে অনেকগুলি কাক বসিয়াছে এবং সেখানে গিয়া দেখেন একটী সদ্যোজাত শিশু পড়িয়া রহিয়াছে। শিশুটী তখনও জীবিত ছিল বলিয়া তিনি উহার 'জীবক' নাম রাখিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া উহাকে নিজগৃহে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

জীবকের বাল্যসহচরেরা তাহাকে 'নির্মাতৃক' বলিয়া উপহাস করিত। তিনি একদিন মনের ক্ষোভে অভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ, আমার মা কে?' অভয় বলিলেন, 'বৎস, আমি তাহা জানি না; আমি তোমাকে বনমধ্যে পাইয়া পালন করিতেছি?' জীবক বুঝিলেন, তিনি অভয়ের পুত্র নহেন, অতএব তাঁহার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না; তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখিতে হইবে। তিনি মনে মনে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান এবং চতুঃষষ্টি কলা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে। অনন্তর তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে এক আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আমায় বিদ্যা দান করুন; আমি মগধরাজ বিম্বিসারের পৌত্র এবং রাজকুমার অভয়ের পুত্র।' আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি দক্ষিণা আনিয়াছ?' জীবক উত্তর দিলেন, 'কপর্দ্দকও না। আমি আত্মীয়স্বজনের অগোচরে আসিয়াছি। তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বিদ্যাশিক্ষান্তে আজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।' জীবকের আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্যের মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি তাঁহার শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তরকালে যাঁহার চিকিৎসাগুণে বুদ্ধদেব আরোগ্য লাভ করিবেন, দেবতারা তাঁহার সহায় হইলেন। অধ্যাপনাকালে স্বয়ং শক্র আসিয়া আচার্য্যের জিহ্বাগ্রে

---

[১]। প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ বারবিলাসিনীদিগের যথেষ্ট আদর ছিল। Pericles এর প্রিয়া Aspasia নাম্নী বারাঙ্গনার নাম পুরাবৃত্তপাঠকের সুপরিচিত।

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জীবকও অসাধারণ অভিনিবেশের সহিত শাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অন্যে যাহা চৌদ্দ বৎসরে শিখিতে পারে, তিনি তাহা সাত বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি একদিন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, আমাকে আর কতকাল শিক্ষা করিতে হইবে, বলুন।' আচার্য্য বলিলেন, 'তোমায় চারিদিন সময় দিতেছি। তুমি এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের-মধ্যে যত তরুলতা, ফল মূল ইত্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আসিয়া আমায় বল, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।' জীবক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব, ঔষধে না লাগে এমন কোন উদ্‌ভিদই দেখিতে পাইলাম না; জগতে কুত্রাপি এরূপ উদ্‌ভিদ পাওয়া যাইবে না।' ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, 'বৎস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। আমি তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। তোমায় দক্ষিণা দিতে হইবে না; পাথেয় দিতেছি; লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন কর।'

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জীবক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে সাকেত নগরে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। সেখানে এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় দারুণ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। কত দেশ হইতে কত বৈদ্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা অর্থ লইয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন; রোগের কিছু মাত্র উপশম করিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া জীবক স্থির করিলেন, 'এই মহিলাকে নীরোগ করিয়া আমার চিকিৎসানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইবে।' কিন্তু মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি বালক, তুমি কি করিতে পারিবে বল?' ইহাতে জীবক উত্তর দিলেন, 'মা, বিদ্যার নিকট বয়সের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নাই; বয়স বেশী হইলেই যে জ্ঞান বেশী হয় তাহা নহে। আপনি বয়স দিয়া কি করিবেন? আমার যে জ্ঞান আছে তাহাতেই আপনার উপকার হইবে। আপনার রোগের শান্তি না হইলে আমি কর্পদ্দকমাত্র গ্রহণ করিব না।' অনন্তর জীবক তাঁহাকে এক প্রকার নস্য টানিতে দিলেন এবং তাহার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইল। মহিলা জীবককে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তিনি রাজগৃহে গিয়া তৎসমস্ত অভয়কে দিয়া বলিলেন, 'পিত, আপনি অতি যত্নে আমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন; তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানস্বরূপ এই উপহার গ্রহণ করুন।' কিন্তু অভয় ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, জীবক তাঁহারই পুত্র। তিনি তাঁহাকে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি এখানেই থাক এবং আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।'

এই সময়ে বিম্বিসার ভগন্দর রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জীবক একবার মাত্র

বিন্দুপ্রমাণ প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করিলেন। অতঃপর বিম্বিসার ভাবিলেন, 'জীবক যদি সদাশয় লোক হন, তাহা হইলে ইঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি ইঁহার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তবে এতাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে রাজধানীতে রাখা নিরাপদ নহে।' অতএব জীবকের অভিপ্রায়-পরীক্ষার্থ তিনি রাজ্ঞীদিগকে বলিলেন, 'জীবক আমায় রোগমুক্ত করিয়াছেন; তোমরা সকলে ইঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান কর।' রাজ্ঞীরা তখন প্রত্যেকে জীবককে এক একটী মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ উপঢৌকন দিলেন। কিন্তু জীবক সেগুলি গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, 'আমার ন্যায় অকিঞ্চিনের পক্ষে রাজপরিচ্ছদ ব্যবহার করা ধৃষ্টতামাত্র। মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। আমি অন্য পুরস্কার চাই না।' ইহাতে বিম্বিসার বুঝিতে পারিলেন, জীবকের কোন দুরভিসন্ধি নাই। তিনি জীবককে রাজবৈদ্য করিলেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক গ্রাম ও উদ্যান নিয়োজিত করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দারুণ শিরঃপীড়া জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা তাঁহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে। দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য রোগ নির্ণয় করিতে আসিয়া বলিলেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহা শুনিয়া বিম্বিসার জীবককে ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন। জীবক তীক্ষ্ণধার শস্ত্রদ্বারা তাহার করোটি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে দুইটী কীট বাহির করিলেন এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন।

বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র একদিন লম্ফ দিবার সময় নিজের অন্ত্রের এক অংশ গ্রন্থিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না; অল্পমাত্র তরল পথ্য খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেন। তাহার শরীর অল্পদিনের মধ্যে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। রোগীর পিতা বিম্বিসারকে বলিয়া জীবককে বারাণসীতে লইয়া গেলেন। জীবক রোগ ও তাহার নিদান নির্ণয়পূর্ব্বক রোগীর বস্তিদেশ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

আর একবার উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড প্রদ্যোত কামলরোগগ্রস্ত হইয়া জীবককে পাঠাইবার জন্য বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতের এক অদ্ভুদ দোষ ছিল—তিনি তৈল, ঘৃত প্রভৃতি কোনরূপ স্নিগ্ধদ্রব্যের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবক দেখিলেন ভৈষজ্য-মিশ্রিত ঘৃত না দিলে প্রদ্যোতের রোপোপশম হইবে না। অথচ তাহা দিতে গেলে হয়ত তাঁহার নিজেরই জীবনান্ত হইবে। পরে কৌশলে রাজাকে ভৈষজ্যমিশ্রিত ঘৃত সেবন

করাইয়া তিনি উজ্জয়িনী হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা যখন এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন জীবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু শেষে যখন তাহার ব্যাধির উপশম হইল, তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জীবকের জন্য দুইটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে অতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ রাখিয়া বুদ্ধকে উহার ঘ্রাণ করিতে বলেন। তাহাতেই বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়। অতঃপর দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে মারিবার জন্য পাষাণ নিক্ষেপ করেন এবং ঐ পাষাণের একখণ্ড লাগিয়া বুদ্ধের পায়ে ক্ষত জন্মে, তখনও জীবকের চিকিৎসায় ঐ ক্ষত ভাল হইয়াছিল।

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া জীবক স্রোতাপত্তিমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এমনই বুদ্ধভক্ত ছিলেন যে, দিনের মধ্যে তিনবার তাঁহাকে না দেখিলে শান্তি পাইতেন না। বেণুবন তাঁহার গৃহ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল; এই জন্য তিনি বুদ্ধের বাসের জন্য অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী আম্রবনে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তদবধি বুদ্ধ সময়ে সময়ে এই আম্রকাননস্থ বিহারেও অবস্থিতি করিতেন।

জীবকের উপাধি কৌমারভৃত্য (পালি ‘কোমারভচ্চ’)।

● **জেতবন**—(জেতৃবন) শ্রাবস্তীনগরের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। ইহা পূর্ব্বে জেত (জেতৃ) কুমার নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁহার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণে ইহা ক্রয় করিয়া এখানে বুদ্ধের বাসের নিমিত্ত এক মহাবিহার নির্ম্মাণ করেন (অনাথপিণ্ডদের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। প্রবাদ আছে যে জেতকুমার অনাথপিণ্ডদের নিকট হইতে অন্যায় মূল্য গ্রহণ করিয়া শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধসেবায় পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে ঐ অর্থে উদ্যানের চারি পার্শ্বে চারিটী সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

● **দক্ষিণগিরি**—রাজগৃহের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্য জনপদ। এখানে একনালা গ্রামে বুদ্ধ কাশী ভরদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করেন।

● **দেবদত্ত**—গৌতম বুদ্ধের প্রধান বিরোধী; কেবল তর্কে নহে; নানারূপ অসদুপায় প্রয়োগ করিয়াও তিনি বুদ্ধকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি দুই তিন বার তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত অভিসন্ধি করিয়াছিলেন। ফলত যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যেমন দুর্য্যোধন, বুদ্ধের সম্বন্ধেও সেইরূপ দেবদত্ত।

দেবদত্ত কে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র; মতান্তরে তিনি কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র, যশোধারার সহোদর এবং বুদ্ধের মাতুলপুত্র। তাহা হইলে, বুদ্ধ মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। এরূপ বিবাহ করা তৎকালে রাজকুলে বিশেষত সাক্যবংশে

দোষাবহ ছিল না।[১]

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বর্ষে দেবদত্ত, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণ এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। দেবদত্ত ধ্যানবলে ঋষিপ্রাপ্ত হইলেন; তিনি কামরূপ হইলেন এবং আকাশমার্গে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি নিরতিশয় ক্রূর ছিল বলিয়া তিনি এই ঋদ্ধিবল কেবল অসদুদ্দেশ্য-সাধনেই নিয়োজিত করিতেন। তিনি পরিণামে বুদ্ধশাসনের বিরোধী হইয়া নিজেই একটী সম্প্রদায় গঠনের অভিপ্রায় করিলেন। তখন বুদ্ধের বয়স ৭২ বৎসর এবং মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উভয়েই তাঁহার শিষ্য। কাজেই তাঁহাদের নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা না দেখিয়া দেবদত্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে হাত করিলেন। অজাতশত্রু তখন যুবরাজ। তিনি দেবদত্তের বাসার্থ একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেখানে পঞ্চশত শিষ্যের জন্য প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য পাঠাইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে এই সময় হইতেই দেবদত্তের ঋদ্ধিবল বিনষ্ট হয়।

অতঃপর দেবদত্ত বুদ্ধের সহিত সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গৌতম তাঁহাকে শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন অপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা দিতে অসম্মত হইলেন বলিয়া চেষ্টা ব্যর্থ হইল; দেবদত্তের প্রকৃতিও ইহার পর ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি কুপরামর্শ দিয়া অজাতশত্রুকে পিতৃহত্যায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। অজাতশত্রু প্রথমে অস্ত্রাঘাতে পিতৃবধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার নিকট গিয়া অস্ত্র চালাইতে পারেন নাই। শেষে দেবদত্তের বুদ্ধিতে তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করেন।

অজাতশত্রু রাজা হইলে দেবদত্ত তাঁহার সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি রাজার নিকট হইতে কতিপয় সুনিপুণ ধানুষ্ক চাহিয়া আনিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাদের দ্বারা বুদ্ধের প্রাণবধ করাইয়া শেষে ইহাদিগকেও নিহত করাইব, তাহা হইলে কেহই দুষ্কার্য্যের কথা জানিতে পারিবে না।' কিন্তু ধানুষ্কদিগের নেতা বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া যে তীর নিক্ষেপ করিল, তাহা তদভিমুখে না গিয়া বিপরীত দিকে ছুটিল। এই অলৌকিক

১। সিংহহনু — অনুশাক্য = মহাযশোধারা (সিংহহনুর ভগ্নী)

সিংহহনু: শুদ্ধোদন = মহামায়া ও মহাপ্রজাপতি

অনুশাক্য = মহাযশোধারা: সুপ্রবুদ্ধ, দণ্ডপাণি, মহামায়া, মহাপ্রজাপতি

শুদ্ধোদন = মহামায়া: সিদ্ধার্থ

শুদ্ধোদন = মহাপ্রজাপতি: নন্দ

সুপ্রবুদ্ধ: দেবদত্ত, যশোধারা

ব্যাপারে ধানুষ্কদিগের চৈতন্য হইল। তাহারা বুদ্ধের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তদীয় শাসনে প্রবেশ করিল।

ইহার পর দেবদত্ত স্থির করিলেন বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূটের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তখন পাহাড়ের উপর হইতে যন্ত্রবলে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ ঘটাইতে হইবে। সঙ্কল্পমত কার্য্যও হইল; কিন্তু শিলাখণ্ড পতিত হইবার কালে ভাঙ্গিয়া গেল; উহার এক অংশমাত্র বুদ্ধের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। জীবকের চিকিৎসার গুণে বুদ্ধ এই ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন।

তখন দেবদত্ত আর এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। অজাতশত্রুর 'নালাগিরি' নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। একদিন দেবদত্ত স্থির করিলেন, 'কল্য বুদ্ধ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইবেন, তখন এই হস্তীকে মদ খাওয়াইয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিলে এ তাঁহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।' এ কথা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইল; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সে দিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কোন নিষেধ শুনিলেন না। তিনি অষ্টাদশ—বিহারের ভিক্ষুগণসহ যথাসময়ে ভিক্ষায় বাহির হইলেন; নিজে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। এদিকে নালাগিরি শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদি ভগ্ন করিয়া সচল গণ্ডশৈলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক দুঃখিনী রমণী তাহার শিশু সন্তান লইয়া উহার সম্মুখে পড়িল। মত্তহস্তী তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা ধারিতে যাইতেছে দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন, 'আমাকে মারিবার জন্য দেবদত্ত তোমায় মদ খাওয়াইয়াছে; আমি যখন উপস্থিত আছি, তখন এই অনাথার উপর আক্রোশ কেন?' এই কথা শুনিবামাত্র নালাগিরির মত্ততা বিদূরিত হইল; সে অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইয়া শুণ্ডদ্বারা গৌতমের চরণ বন্দনা করিল। অমনি সমবেত জনসমুদ্র হইতে মহান জয়ধ্বনি উত্থিল হইল; যাহার অঙ্গে যে আভরণ ছিল, সে তাহা উন্মোচন করিয়া নালাগিরিকে উপহার দিল; তদবধি নালাগিরির নাম 'ধনপালক' হইল।

ক্রমে দেবদত্তের প্রতিপত্তি গেল; রাজভবন হইতে প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুর ভক্ষ্য ভোজ্য আসা বন্ধ হইল; দেবদত্তের শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিজে ভিক্ষায় বাহির হইলেন; কিন্তু নগরবাসীরা তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট গিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনি ভিক্ষুদিগের জন্য ছয়টী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত হইব।' এই ছয়টীর মধ্যে এখানে দুইটী নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেবদত্ত বলিলেন, 'ভিক্ষুরা শ্মশানলব্ধ বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং কদাচ মাংস আহার করিবেন না।' বস্ত্রসম্বন্ধে বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'আমার

শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ভদ্রবংশীয়; শ্মশানে যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না; বিশেষত তাহারা যদি বস্ত্রদান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উপাসকদিগের মধ্যেও দানধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এ নিয়ম চলিতে পারে না।' মাংসত্যাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ দেখাইলেন যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের কোন বিচার হইতে পারে না। উপাসকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দিবে, ভিক্ষুরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই আহার করিবে। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে প্রাণিবধজনিত পাপ দাতার, ভোক্তার নহে। বিশেষত দেশভেদে যখন খাদ্যভেদ দেখা যায়, তখন এ খাদ্য গ্রাহ্য, এ খাদ্য অগ্রাহ্য, এরূপ নিয়ম অসম্ভব।

অনন্তর দেবদত্ত বুদ্ধের দল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় পঞ্চশত ভিক্ষু কিয়ৎকালের জন্য বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক তদীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইল বটে; কিন্তু শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন আসিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধ প্রশাসনে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তখন দেবদত্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; দারুণ মনস্তাপে এবং সম্ভবত কোকালিকের পদাঘাতে তাঁহার কঠিন পীড়া হইল; তিনি শয্যাগত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থির করিলেন, 'জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁহারই শরণ লই।' তিনি শিবিকারোহণে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধ লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেবদত্ত শত চেষ্টা করিলেও আমার দর্শন পাইবে না।' প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ঘটিল; দেবদত্ত জেতবন বিহারের নিকট শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে যাইবার সঙ্কল্পে যেমন ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ বহ্নিশিখা উত্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টিত করিল। 'আমি বুদ্ধের শ্যালক; আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও; হে বুদ্ধ, আমায় রক্ষা কর', বলিয়া দেবদত্ত কত চীৎকার করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে যখন পাপক্ষয় হইবে, তখন তিনি পুনর্ব্বার কুশলভাজন হইতে পারিবেন এবং প্রত্যেক বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

● **নন্দ**—এই নামে তিন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—(১) বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সিদ্ধার্থ ও নন্দ প্রায় সমবয়স্ক এবং উভয়েই মহাপ্রজাপতী-কর্তৃক পালিত। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ যখন প্রথম কপিলবাস্তুতে যান, সেই সময়ে জনপদকল্যাণীর সহিত নন্দের বিবাহের দিনই নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন; কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরও নন্দ কিছুদিন পর্য্যন্ত জনপদকল্যাণীর রূপ ভুলিতে পারেন নাই। অনন্তর একদিন বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে তাঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। যাইবার সময় পথে তাঁহারা একটা দগ্ধমুখী প্রাচীনা মর্কটী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইন্দ্রালয়ে দেবকন্যাগণ তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বুদ্ধ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বল নন্দ, এই দেবকন্যারা সুন্দরী,

না তোমার জনপদকল্যাণী সুন্দরী?' নন্দ বলিলেন, 'জনপদকল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই মর্কটীটা যেরূপ, ইঁহাদের সঙ্গে তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।' তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'যদি তুমি এইরূপ দেবকন্যা পাইবার অভিলাষী হও তবে আমার উপদেশানুসারে চল।' তদবধি নন্দ একমনে বুদ্ধের নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দিনপর অর্হত্ত্বলাভ করিলেন। (২) উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র (উৎপলবর্ণার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। (৩) ষড়বর্গীয়দিগের অন্যতম।

• **নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র**—(পালি 'নিগণ্ঠ নাতপুত্ত') একজন তীর্থিক। বিশাখার শ্বশুর মৃগার প্রথমে ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

• **ন্যগ্রোধারাম**—কপিলবাস্তুর উপকণ্ঠবর্ত্তী উদ্যান। বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তুতে যাইতেন, তখন তিনি সচরাচর এই উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন।

• **পটাচারা**—(২৭১ পৃষ্ঠা) শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠীবংশজাতা বিদুষী রমণী। পতি, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতির বিয়োগে সংসারে ইঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং ইনি ভগবান বুদ্ধের শিষ্যা হন। পঞ্চশত রমণী ইঁহার উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবিষ্ঠ হইয়াছিল। পটাচারা-কর্ত্তৃক রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গাথা আছে।

• **পূরণকাশ্যপ**—একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইনি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দাসীপুত্র; বাল্যে প্রভুর গৃহে ভারবহনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সেখান হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাসী হন। ইনি বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন, 'বস্ত্র লজ্জা আবৃত রাখিবার উপায়; লজ্জা পাপজ; আমি অর্হন, আমার মনে পাপ নাই; অতএব আমার বস্ত্রেও প্রয়োজন নাই।' অনেকে ইঁহাকেই 'বুদ্ধ' বলিয়া বিবেচনা করিত। ইঁহার অশীতি সহস্র শিষ্য ছিল। যখন তীর্থিকেরা বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অলৌকিক ক্ষমতাপ্রদর্শনে অসমর্থ হন, তখন লোকে পূরণকাশ্যপ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পূরণকাশ্যপ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

• **প্রসেনজিৎ**—(পালি 'পসেনদি') কোশলের রাজা। কেহ কেহ বলেন, মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এবং বুদ্ধদেব একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বিম্বিসারের সহিত প্রসেনজিতের এক অনুজার বিবাহ হয়। বিম্বিসারের ন্যায় ইনিও বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর সহিত ইঁহার যে বিবাদ ঘটে তাহা 'অজাতশত্রুর' বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে।

কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে কোন মালাকরের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। একদা প্রসেনজিৎ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক

রাজধানীতে প্রবেশ করিবার সময় এই কন্যা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজের প্রধানা মহিষী করেন। এই রমণী বৌদ্ধ সাহিত্যে কোশল-মল্লিকা (মালিকা) দেবী নামে পরিচিতা। কুল্মাষপিণ্ড-জাতক (৪১৫)। প্রসেনজিৎ কপিলবাস্তুর শাক্য রাজবংশীয়া একটি কন্যা বিবাহ করিবার নিমিত্ত সেখানে দূত পাঠাইয়াছিলেন। শাক্যেরা নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আদানপ্রদান করিতেন না; অথচ প্রসেনজিতের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিলে শাক্যকুলের বিপদ ঘটিতে পারে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রতারণাপূর্ব্বক দুই দিক্ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তখন শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাম কপিলবাস্তুর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। নাগমুণ্ডা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে মহানামের বাসবক্ষত্রিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি প্রসেনজিৎকে এই কন্যা দিয়া ভুলাইলেন। বিবাহের পর বাসবক্ষত্রিয়া এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল বিরূঢ়ক (বিডুড়ভ)। অতঃপর শাক্যদিগের চাতুরী প্রকাশ পাইল। তাঁহারা বিরূঢ়ককেও অবমানিত করিলেন। তখন বিরূঢ়ক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দীর্ঘচারায়ণ (পালি 'দীর্ঘকারায়ন') নামক সেনানীর সাহায্যে প্রসেনজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে পলাইয়া গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর বিরূঢ়ক কপিলবাস্তু আক্রমণ করিয়া তত্রত্য শাক্যদিগকে নির্ম্মূল করিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনিও আকস্মিক জলপ্লাবনে সসৈন্যে নিহত হইলেন। এই ঘটনা বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

● **বাসবক্ষত্রিয়া**—'প্রসেনজিৎ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

● **বিম্বিসার**—(বা শ্রেণিক বিম্বিসার) মগধের রাজা; কেহ কেহ বলেন, যে বিম্বিসার ১৬ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন, ২৯ বৎসর বয়সে উপাসক হন, ৩৬ বৎসর কাল নানা প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করেন এবং ৬৫ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির ৩৫ বৎসর বয়সে ঘটে। সুতরাং এ হিসেবে তিনি বুদ্ধের ছয় বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন এইরূপ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে অপর কেহ কেহ বলেন তিনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মিয়াছিলেন। বুদ্ধের যখন ৭২ বৎসর বয়স তখন বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও মৃত্যু ঘটে। বিম্বিসার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ অজাতশত্রু প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তিনিই বুদ্ধকে বেণুবন দান করেন।

● **বিরূঢ়ক**—প্রসেনজিৎ প্রসঙ্গ এবং ভদ্রশাল-জাতক (৪৬৫) দ্রষ্টব্য।

● **বিশাখা**—কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর

পুত্রবধূ। ইনি 'মহোপাসিকা' নামে কীর্ত্তিকা।

বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক এবং পিতা ধনঞ্জয় অঙ্গদেশস্থ ভদ্রঙ্কয় নামক স্থানের বিপুল ধনশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বুদ্ধ যখন অঙ্গদেশে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান তখন বিশাখার বয়স ৭ বৎসর; কিন্তু এই সময়েই তিনি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন মগধে অনেক ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন; কিন্তু কোশলে এরূপ লোকের কিছু অভাব ছিল; এই জন্য প্রসেনজিৎ বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, রাজগৃহ হইতে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে যেন কোশলে বাস করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। মগধের প্রধান শ্রেণীর শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে কেহই কোশলে যাইতে সম্মত হইলেন না; ধনঞ্জয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী ছিলেন; বিম্বিসার তাঁহাকেই কোশলে পাঠাইলেন। ধনঞ্জয় কোশলরাজ্যে গিয়া সাকেত নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রাবস্তীনগরে মৃগার নামক এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার পুত্র পূর্ণবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি পঞ্চকল্যাণী কন্যা না পাইলে বিবাহ করিবেন না। পঞ্চকল্যাণ যথা—(১) কেশকল্যাণী অর্থাৎ যাহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়; (২) মাংসকল্যাণী অর্থাৎ যাহার অধরোষ্ঠ সর্ব্বদা পক্ব বিম্বফলের ন্যায়; (৩) অস্থিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দন্তসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় শুভ্র, উজ্জ্বল, ঘনবিন্যস্ত ও সমদীর্ঘ। (৪) ছবিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দেহের বর্ণ সর্ব্বত্র একরূপ; কোথাও কোন কলঙ্ক নাই; (৫) বয়ঃকল্যাণী অর্থাৎ বিংশতি সন্তানের প্রসূতি হইলেও যে স্থিরযৌবনা থাকিবে, শতবর্ষ বয়সেও যে পলিতকেশা হইবে না। অনেক অনুসন্ধানের পর পূর্ণবর্দ্ধনের আত্মীয়েরা বিশাখাকে এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পাত্রী বলিয়া স্থির করেন।

বিশাখার বয়স তখন ১৫ বৎসর। ধনঞ্জয়ের গৃহে মহাসমারোহে এই উদ্‌বাহ সম্পাদিত হয়। স্বয়ং কোশলরাজ পাত্রমিত্র-সৈন্যসামন্তসহ বরযাত্রিরূপে বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। শুনা যায় তখন বর্ষাকাল বলিয়া শুষ্ককাষ্ঠের অভাব হওয়াতে ধনঞ্জয় শেষে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগের খাদ্য রন্ধন করাইয়াছিলেন। বিবাহের সময় বিশাখার পিতা তাঁহাকে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মস্তকের জন্য একটী কৃত্রিম ময়ূরের উল্লেখ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তদ্বারা উহা এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হয়াছিল যে উহা প্রকৃত ময়ূর বলিয়া ভ্রম হইত; এবং বায়ু প্রবাহিত হইলে উহার মুখ হইতে কেকা রব নিঃসৃত হইত।

কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের সময় ধনঞ্জয় তাঁহাকে প্রহেলিকার ভাষায় দশটী উপদেশ দিয়াছিলেন। মৃগার অন্তরালে থাকিয়া এই উপদেশগুলি শুনিতে

পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।[১]

মৃগার নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র নামক তীর্থিকের শিষ্য ছিলেন। তিনি বিশাখাকে লইয়া গুরুপূজা করিতে গেলেন। বিশাখা দেখিলেন গুরুদেব সম্পূর্ণ নগ্ন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। নির্গ্রন্থ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃগারকে বলিলেন, 'এই অলক্ষণা রমণী গৌতমের শিষ্যা; ইহাকে গৃহ হইতে দূর না করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।' মৃগার কাতরবচনে বলিলেন, 'আমার পুত্রবধূ বালিকা, আপনি দয়া করিয়া উহার দোষ ক্ষমা করিবেন।'

একদিন এক অর্হৎ ভিক্ষাপাত্রহস্তে মৃগারের দ্বারে উপনীত হইলে বিশাখা তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি অন্যত্র যান; এ বাড়ীর কর্ত্তা 'পুরাণ' ভক্ষণ করেন। 'পুরাণ' শব্দের একটী অর্থ পর্য্যুষিত খাদ্য। সুতরাং মৃগার যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বিশাখাকে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া বিশাখা বলিলেন, 'আমি ত ক্রীতদাসী নহি যে ইচ্ছা করিলেই আমায় দূর করিয়া দিতে পারিবেন। আমার রক্ষার্থ পিতা আট জন সম্ভ্রান্ত লোক দিয়াছেন; তাঁহাদিগকে আসিতে বলুন।' অন্তর সেই আট জন লোক সমবেত হইলে বিশাখা বলিলেন, 'আমার শ্বশুর 'পুরাণ' খাইতেছেন বলায় আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে তিনি পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন।'

আর একদিন বিশাখা রাত্রিকালে একটা আলোক লইয়া গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন। মৃগার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'একটা উৎকৃষ্ট অশ্বী শাবক প্রসব করিয়াছে; তাহা দেখিবার জন্য অশ্বশালায় গিয়াছিলাম।' ইহাতে মৃগার বলিলেন, 'তোমার পিতা না গৃহের অগ্নি বাহিরে লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।' 'হাঁ, নিষেধ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্নিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আমি নিজগৃহের নিন্দা গ্লানি বাহিরে যাইতে দেই না।' অনন্তর বিশাখা তাহার পিতৃদত্ত অন্যান্য উপদেশগুলিরও ব্যাখ্যা করিলেন। তখন মৃগার

---

[১]। (১) ঘরের আগুন বাহিরে দিওনা (অর্থাৎ গৃহের গুপ্ত কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না); (২) বাহিরের আগুন ঘরে আনিও না (অর্থাৎ ভৃত্যগণ যে সমস্ত আলোচনা করে, সে সব কথা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের কর্ণগোচর করিও না); (৩) যে দেয় তাহাকে দান করিবে; (৪) যে দেয় না তাহাকে দান করিবে (অর্থাৎ নিঃস্ব আত্মীয়স্বজনকে দান করিবে); (৫) যে দেয় বা দেয় না তাহাকেও দান করিবে (অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান করিবে) (৬) সুখে উপবেশন করিবে (অর্থাৎ উচ্চাসনে বসিবে না, কারণ গুরুজন উপস্থিতি হইলে উহা ত্যাগ করিতে হইবে; (৭) সুখে আহার করিবে (অর্থাৎ গুরুজন ও ভৃত্যদির আহারান্তে নিজে নিশ্চিন্ত মনে ভোজনে বসিবে; (৮) সুখে শয়ন করিবে (অর্থাৎ গুরুজন নিদ্রিত হইলে নিজে শয়ন করিবে) (৯) অগ্নির (অর্থাৎ পতি, শ্বশুর প্রভৃতির) পূজা করিবে; (১০) গৃহাগত দেবতাদিগের (অর্থাৎ প্রব্রাজক, অতিথি প্রভৃতির) অর্চ্চনা করিবে।

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; বিশাখাও বলিলেন, 'তবে আমি এখন পিতৃগৃহে যাইতে প্রস্তুত।' কিন্তু মৃগার নিজের দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা বলিলেন, 'আপনি তীর্থিকদিগের মতাবলম্বী; আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা; যদি আমাকে ইচ্ছামত দান করিতে এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অনুমতি দেন তাহা হইলেই আমি এখানে থাকিতে পারি; নচেৎ পারি না।' মৃগার ইহাতেই সম্মত হইলেন।

ইহার অল্পদিন পরে বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ সমস্ত সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন; মৃগার বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিশাখাকে বলিলেন, 'মা, এতদিনে তুমি এই সন্তানের উদ্ধার করিলে।' তদবধি বিশাখা 'মৃগারমাতা' এই উপাধি পাইলেন। মৃগার বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ৪০ কোটি ধন ব্যয় করিলেন।

বিশাখা প্রত্যহ তিন বার ভক্ষ্য ভোজ্য মাল্যগন্ধাদি লইয়া বিহারে যাইতেন। তিনি বুদ্ধের নিকট আটটী বর লইয়াছিলেন—(১) বুদ্ধের নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বিশাখার নিকট পাঠাইবেন; বিশাখা ঐ ভিক্ষুকে ভক্ষ্য দ্রব্য দিবেন; (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুকে আহার যোগাইবেন; (৩) কোন ভিক্ষুর পীড়া হইলে তাহার পথ্যাদির জন্য যাহা আবশ্যক বিশাখা তাহা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন; (৪) যাঁহারা পীড়িতদের শুশ্রূষা করেন বিশাখা তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন; (৫) বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন; (৬) প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেককে চীবরাদি অষ্ট পরিষ্কার দান করিবেন; (৭) বিহারের জন্য যত ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে; (৮) বিশাখা প্রতিবৎসর সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন' নামক পরিচ্ছদ দান করিবেন।

বিশাখার গর্ভে ১০টী পুত্র এবং ১০টী কন্যা জন্মে। ইহাদের প্রত্যেকের আবার ১০টী করিয়া সন্তান হয়। এই চারিশত পৌত্রদৌহিত্রাদির প্রত্যেকের আবার ২০টী করিয়া সন্তান হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নীরোগ ও সুশীল ছিল। বিশাখার দেহে এত বল ছিল যে তিনি মত্তহস্তীকেও শুণ্ডে ধরিয়া নিশ্চল রাখিতে পারিতেন।

পরিণতবয়সে বিশাখা তাঁহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে শ্রাবস্তীর পূর্ব্বপার্শ্বে একটী উদ্যান ক্রয়পূর্ব্বক সেখানে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং উহা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। এই বিহারের নাম পূর্ব্বারাম।

● **বুদ্ধ (অতীত)**—কল্পে কল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন ও হইবেন,

বৌদ্ধদিগের এই বিশ্বাস ২১৮ পৃষ্ঠের টীকার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধবংশ, জাতকের ভূমিকা, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বুদ্ধের অনেকের বিবরণ দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে ১৪৩ জন বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

বুদ্ধত্বলাভের জন্য জীবকে কোটি কোটি কল্পে বুদ্ধাঙ্কুর (বোধিসত্ত্ব) রূপে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পারমিতাসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে বোধিসত্ত্ব অভিসম্বুদ্ধ হন এবং ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে; পরে ইহার বিলোপ হয়। তখন নষ্টসত্যের পুনরুদ্ধার দ্বারা জগতের পরিত্রাণহেতু নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল বুঝিবার জন্য বৌদ্ধসাহিত্যের কালগণনা-প্রণালী জানা আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। কোন চক্রবালের প্রলয়ের সূত্রপাত হইতে পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত যে অত্যতিদীর্ঘকাল, তাহার নাম কল্প বা মহাকল্প। মনুষ্যের পরমায়ু দশবৎসর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক অসংখ্যেয়[১] বৎসর পর্য্যন্ত হইতে এবং তৎপরে ক্রমশ ক্ষীণ হইতে পুনর্ব্বার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত বৎসর লাগে তাহাকে এক অন্তরকল্প বলে। বিশ অন্তরকল্পে এক অসংখ্যেয় কল্প এবং চারি অসংখ্যেয় কল্পে এক মহাকল্প। মহাকল্পের এই চারি অংশের নাম যথাক্রমে সংবর্ত্ত, সংবর্ত্তস্থায়ী, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী। ইহার প্রথম অংশে অগ্নি, জল ইত্যাদি দ্বারা প্রলয়ঘটন, দ্বিতীয়ে প্রলয়ের স্থিতি, তৃতীয়ে নূতন সৃষ্টি, চতুর্থে সৃষ্টির স্থিতি। এইরূপে পর্য্যাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে।

যে কল্পে কোন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না তাহার নাম শূন্যকল্প; যে কল্পে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তাহার নাম অশূন্য কল্প। যে কল্পে একজন মাত্র বুদ্ধ দেখা দেন তাহাকে সারকল্প, যে যুগে দুই জন তাহাকে মণ্ডকল্প, যে যুগে তিন জন তাহাকে বরকল্প, যে যুগে চারিজন তাহাকে সারমণ্ডকল্প এবং যে যুগে পাঁচজন তাহাকে ভদ্র (বা মহাভদ্র) কল্প বলে। বর্ত্তমান কল্প মহাভদ্র। ইহাতে চারিজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং একজনের হইবে। ইহার অতীত বুদ্ধদিগের নাম ককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন (কনকমুনি), কস্‌সপ (কাশ্যপ) এবং গোতম (গৌতম)। ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধের নাম হইবে মেত্তেয্য (মৈত্রেয়)।

সচরাচর গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ জন বুদ্ধের নাম দেখা যায়। ইহার প্রথম চারি জনের নাম তণ্‌হঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর ও দীপঙ্কর। গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী

---

[১]। এক কোটির বিংশতিঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০ টী শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

২৪ জন বুদ্ধগণনা দীপঙ্কর হইতে আরম্ভ করা হয়, কারণ ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৌতমবোধিসত্ত্বকে বলেন যে তিনি উত্তরকালে সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন।

এক বুদ্ধকল্প হইতে অন্য বুদ্ধকল্পের বহু ব্যবধান থাকে। তণ্ঙ্করাদি বুদ্ধচতুষ্টয়ের পর দশটী বুদ্ধ কল্প অতীত হইয়াছে এবং তত্তৎকল্পে নিম্নলিখিত বুদ্ধগণ দেখা দিয়াছেন :

সারকল্পে	কৌণ্ডিন্য।
সারমণ্ডকল্পে	মঙ্গল, সুমনা, রেবত ও শোভিত।
বরকল্পে	অনবদর্শী (অনোমদ্সসী), পদ্ম ও নারদ।
সারকল্পে	পদ্মোত্তর।
মণ্ডকল্পে	সুমেধা ও সুজাত।
বরকল্পে	প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্ম্মদর্শী।
সারকল্পে	সিদ্ধার্থ।
মণ্ডকল্পে	তিষ্য ও পুষ্য।
সারকল্পে	বিদর্শী (বিপস্সী)।
মণ্ডকল্পে	শিখী ও বিশ্বভূ।

অতঃপর ২৯ শূন্যকল্প অতীত হইলে বর্ত্তমান মহাভদ্র কল্পের আরম্ভ হইয়াছে।

বিপস্সী হইতে গোতম পর্য্যন্ত ৭ জন সপ্তসম্যকসম্বুদ্ধ নামে বিশিষ্টভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহারা 'মানুষি বুদ্ধ' নামে অভিহিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। প্রাচীনকালে যে সকল জ্ঞানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধহয় অতীত যুগসমূহের বহুবুদ্ধের কল্পনা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত জ্ঞান তাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একরূপ; কাজেই বৌদ্ধদিগের মতে এক বুদ্ধের ধর্ম্মের সহিত অন্য বুদ্ধের ধর্ম্মের কোন প্রভেদ হইতে পারে না। তবে যুগভেদে বুদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের পরমায়ু এবং দেহের আয়তনেরও তারতম্য ঘটে। কাশ্যপ বুদ্ধের দেহ বিংশতি হস্তপরিমিত এবং পরমায়ু বিংশতি সহস্রবর্ষ পরিমিত ছিল। বুদ্ধ মাত্রেই দশবল; তাঁহাদের দেহ ৩২ টি মহাপুরুষলক্ষণ এবং ৮০টী অনুব্যঞ্জনে শোভিত।

বুদ্ধগণের সাধারণ উপাধি—বুদ্ধ, জিন, সুগত, তথাগত, অর্হন, ভগবান, শাস্তা, দশবল, লোকবিদ, পুরুষদম্যসারথি, সর্ব্বজ্ঞ, সদাভিজ্ঞ, অনুত্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্য্যসম্পন্ন, নির্ভয়, নিরবদ্য ইত্যাদি।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ (পচ্চেকবুদ্ধ) নামে আর শ্রেণীর বুদ্ধ দেখা যায়। বুদ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বুদ্ধও ধ্যানবলে নির্ব্বাণলাভোপযোগী জ্ঞান অর্জন

করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ধর্ম্মদেশনও করেন না। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় কোন প্রত্যেকবুদ্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রত্যেকবুদ্ধগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—খড় গবিষণাকল্প ও বর্গচারী। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ গণ্ডারের ন্যায় একচর অর্থাৎ নির্জ্জনে থাকেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলেন।

• **বুদ্ধ (গৌতম)**—জন্মজন্মান্তরে ত্রিংশৎ পারমিতার[১] অনুষ্ঠান দ্বারা সম্যকসম্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতালাভ—বিশ্বন্তর লীলা-সংবরণের পর ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তুষিতস্বর্গে বাস—দেবতাদিগের অনুরোধে মানবগণের পরিত্রাণহেতু ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অঙ্গীকার—অতীতবুদ্ধগণ জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে[২] হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব এ জন্মেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা—তখন ক্ষত্রিয়েরাই প্রধান; অতএব কপিলবাস্তুরাজ শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্রত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তদীয় মহিষী মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ—মহামায়ার স্বপ্নদর্শন :—যেন একটী শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল—দৈবজ্ঞদিগের গণনা—'মহিষী হয় রাজচক্রবর্ত্তী, নয় বুদ্ধ প্রসব করিবেন'—সশস্ত্র দেবপুত্রচতুষ্টয়কর্ত্তৃক গর্ভরক্ষণ।

পূর্ণগর্ভাবস্থায় মহামায়ার দেবহ্রদ (ব্যাঘ্রপুর) নামক স্থানে গিয়া তাঁহার পিত্রালয়দর্শনেচ্ছা—পথে লুম্বিনী নামক উদ্যানে প্রবেশ—সেখানে এক শালবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমায় বিনা যন্ত্রণায় পুত্রপ্রসব—ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই শিশুর সপ্তপদ ভ্রমণ এবং 'আমি এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'[৩] এই উক্তি—ঐ দিন যশোধারা, সারথি ছন্দক, কালোদায়ী, আনন্দ এবং অশ্ববর কন্ঠকেরও জন্মলাভ—সপুত্র মহামায়ার কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বোধিসত্ত্বের জন্মে দেবলোকে উল্লাস—তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্রিকালদর্শী অসিতদেবলের আগমন—শিশুকর্ত্তৃক অসিতদেবলের জটায় পদার্পণ—অসিতদেবল এবং শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক শিশুকে প্রণিপাত—শিশু ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন অসিতদেবলের এই প্রতীতি—তিনি নিজে তখন জীবিত থাকিবেন না বলিয়া ক্রন্দন—নিজের ভাগিনেয় নালককে বুদ্ধের শিষ্য হইবার জন্য উপদেশ।

পঞ্চমদিবসে শিশুর 'সিদ্ধার্থ' এই নামকরণ—নামকরণদিবসে মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তিসমূহ কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থকে প্রণিপাত—দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিণ্য কর্ত্তৃক শিশুর

---

[১]। প্রকৃতপক্ষে পারমিতার সংখ্যা দশ। কিন্তু প্রত্যেক পারমিতা ক্রমোন্নতির নিয়মে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া 'ত্রিংশৎপারমিতার' উল্লেখ দেখা যায়।

[২]। প্রকৃতপক্ষে প্রাগ্‌দেশ। ইহা প্রকৃত 'মধ্যদেশের' পূর্ব্বে অবস্থিত।

[৩]। 'অগ্‌গোহহম্‌ অস্মি লোকস্‌স।'

বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিগণনা—প্রসবের সপ্তম দিবসে মহামায়ার প্রাণত্যাগ[১] তাঁহার ভগিনী শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী মহাপ্রজাপতী (মহাগৌতমী) কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থের লালন পালন—হলকর্ষণোৎসব[২] দেখিতে গিয়া জম্বুবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থের ধ্যাননিমজ্জন—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও ঐ বৃক্ষের ছায়ায় নিশ্চলীভবন—তদ্দর্শনে শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থকে দ্বিতীয় বার প্রণিপাত।

বিশ্বামিত্র নামক আচার্য্যের নিকট সিদ্ধার্থের বিদ্যালাভ ও নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন—ষোড়শবর্ষ বয়সে সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারার সহিত বিবাহ—ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে অসামান্য নৈপুণ্য-প্রদর্শন—তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় দেবদত্ত প্রভৃতির পরাভব—দেবদত্তের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার।

সারথি ছন্দকের সহিত নগরপরিভ্রমণকালে জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দর্শনে মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার—ভিক্ষু দর্শনে সংসারত্যাগের সঙ্কল্প—রাহুলের জন্ম—ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নিশীথকালে কণ্ঠকারোহণে ছন্দকের সমভিব্যাহারে অভিনিষ্ক্রমণ—পথে বিবিধ প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য মারের বৃথা চেষ্টা—ত্রিশ যোজন পরিভ্রমণ করিবার পর অনোমা নদীর তীরে কেশচ্ছেদন, আভরণত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ—ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন—শোকাতুরা কণ্ঠকের প্রাণত্যাগ।

মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানের আম্রবনে সপ্তাহ বাস—মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন—তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহী করিবার জন্য শ্রেণিক বিম্বিসারের বিফল চেষ্টা—আরাড় কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র নামক দুই জন আচার্য্যের নিকট যোগাভ্যাস—তাঁহাদের উপদেশে অনাস্থা—ঊরুবিল্বায় গমন—কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পঞ্চবর্গীয়দিগের (ভদ্রবর্গীয়দিগের) সহিত মিলন—ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠিন তপশ্চর্য্যা—তপস্যায় অনাস্থা—তদ্দর্শনে পঞ্চবর্গীয়দিগের বারাণসীরনিকটবর্ত্তী ঋষিপতন[৩] নামক বনে প্রস্থান।

বৈশাখী পূর্ণিমা—নৈরঞ্জনায় অবগাহনান্তে পূর্ণা নাম্নী দাসীর হস্তে সুজাতা কর্ত্তৃক সুবর্ণপাত্রে প্রেরিত পায়সান্ন ভক্ষণ—বোধিদ্রুমমূলে আসন স্থাপন ও

---

[১]। বৌদ্ধেরা বলেন বুদ্ধজননীর গর্ভ পবিত্র করণ্ডস্বরূপ; পাছে অন্য কেহ বাস করিয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করে এই নিমিত্ত তাঁহারা ভাবিবুদ্ধপ্রসবের সপ্তাহান্তে দেহত্যাগ করিয়া তুষিতস্বর্গে চলিয়া যান।

[২]। ইহাকে 'বপ্‌প-মঙ্গল' বলিত। বপ্‌পো = বপ্র, বপন।

[৩]। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাবের অংশবিশেষ। হিমালয় হইতে আকাশপথে বারাণসীতে আসিবার সময় ঋষিরা এই স্থানে অবতরণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম ঋষিপতন হইয়াছিল। মৃগদাব বর্ত্তমান সারনাথ। এখানে মৃগগণ রক্ষিত হইত; কেহ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিত না।

উপবেশন—মারের সহিত যুদ্ধ—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই মারের পরাভব—পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান লাভ,[১] দিব্যচক্ষুঃপ্রাপ্তি ও বুদ্ধত্বলাভ' (বয়স ৩৫ বৎসর)।[২]

বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম সাত সপ্তাহ—বোধিদ্রুমমূলে ও তাহার নিকটে অবস্থিতি, চঙ্ক্রমণ; ধ্যান; মনে মনে অভিধর্ম্ম-পিটকের গঠন—পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন এবং তৃষ্ণা, অরতি ও রগা (রতি) নাম্নী মারকন্যাত্রয়ের প্রলোভনদমন—ষষ্ঠ সপ্তাহে মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ) বৃক্ষমূলে গমন—সপ্তম সপ্তাহে রাজায়তন (রাজাতন বা রাজাদন = পিয়াল) বৃক্ষমূলে গমন—উৎকল দেশীয় ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুইজন বণিকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ (ইঁহারা দ্বেবাচিক উপাসক হইলেন, কারণ তখনও সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই)।

অজপাল ন্যাগ্রোধ তরুমূলে পুনরাগমন—স্বীয়মত প্রচারের সঙ্কল্প—আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে পঞ্চবর্গীয়দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়—ঋষিপতনাভিমুখে প্রস্থান—মৃগদাবে গমন—পঞ্চবর্গীয়দিগের নিকট ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—মধ্যমপথের (মধ্যমা প্রতিপদার) মাহাত্ম্য বর্ণন—আর্য্যসত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা—অষ্টাঙ্গিক মার্গব্যাখ্যা[৩] কৌণ্ডিন্যের স্রোতাপত্তিমার্গলাভ—দ্বিতীয়

---

[১]। অর্থাৎ কোন প্রাণী পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল তাহা জানিবার ক্ষমতা।

[২]। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগতের মুখ হইতে নিম্নলিখিত উদান বিনিঃসৃত হইয়াছিল—

অনেকজাতিসংসারম, সন্ধাবিস্‌সং অনিব্‌সিসম্‌
গহকারকং গবেষন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনম্‌।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি; পুন গেহং ন কাহসি;
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসজ্ঞিতম্‌,
বিসঙ্ঘারগতং চিত্তম্‌ তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।

গৃহনির্ম্মাতারে করি অন্বেষণ করিলাম কত জনম গ্রহণ!
দেখা কিন্তু কভু পাই নাই তার! পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখের আগার।
পেয়েছি তোমার দেখা, গৃহকার; পারিবে না গৃহ নির্ম্মিতে আবার।
ভগ্ন তব এবে পার্শুকা সকল চূর্ণ গৃহকূট; কি করিবে বল?
নির্ব্বাণ-অমৃত পানে মম মন সর্ব্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেছে এখন।

[জীবদেহ গৃহ; সংস্কারাদি তাহার নির্ম্মাতা; এবং তৃষ্ণা তাহার উপাদান। যেমন পার্শুকা প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড ব্যতিরেকে গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ তৃষ্ণা না থাকিলে জীবকেও দেহ ধারণ করতে হয় না। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্ব্বাণলাভের উপায়। (পার্শুকা, পঞ্চরাস্থি; গৃহের এড়ো কাঠ। গৃহকূট বলিলে মট্‌কার নিম্নস্থ অবলম্বন কাষ্ঠখণ্ড বুঝিতে হইবে; এড়ো কাঠগুলি উহার সঙ্গে যোড়া থাকে।)]

[৩]। অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্মা দিট্‌ঠি (right view), সম্মা-সঙ্কপ্পো (right thoughts), সম্মা-বাচা (right speech), সম্মা-কম্মন্তো (right actions), সম্মা-আজীবো (right living), সম্মা-বায়ামো (right exertion), সম্মা-সতি (right recollection), সম্মা-সমাধি (right meditation), দিট্‌ঠি = দৃষ্টি; আজীবো = জীবিকা নির্ব্বাহ; বায়ামো = চেষ্টা, উদ্যোগ; সতি = স্মৃতি। এই সকল মার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়।

দিনে বাষ্পকে, এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে যথাক্রমে ভদ্রিক, মহানাম ও অশ্বজিৎকে প্রব্রজ্যাদান—পঞ্চম দিনে পঞ্চবর্গীয়দিগের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি।

বারাণসীবাসী যশ নামক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সংসারে বিরাগ, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্ত্বলাভ—(যশের পিতাও উপাসক' হইলেন। এই সময় সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল; অতএব যশের পিতা প্রথম 'তেবাচিক' হইলেন)। যশের মাতার ও পত্নীর দীক্ষা—যশের ৫৪ জন বন্ধুর দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্ত্বলাভ।

প্রবারণান্তে ধর্ম্মপ্রচারার্থ শিষ্যদিগকে নানা দেশে প্রেরণ :—'চরথ ভিক্‌খবে চারিকম্' অর্থাৎ 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও।' উরুবিল্বায় প্রত্যাবর্ত্তন—পথে 'ভদ্রবর্গীয়'দিগকে দীক্ষাদান।

উরুবিল্বা কাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপনামক অগ্নিহোত্রী সহোদরত্রয়কে দীক্ষাদান—গয়াশীর্ষে গমন—তথায় 'আদিত্ত পরিয়ায়' ভণন—রাজগৃহের নিকটস্থ লট্‌ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন—তথায় বিম্বিসারের আগমন ও স্রোতাপত্তি ফললাভ—মহানারদকাশ্যপ জাতক কথন (৫৪৪)—বিম্বিসারকর্ত্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে বেণুবন দান—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষাগ্রহণ।

বুদ্ধকে কপিলবাস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতদিগের পুনঃ পুনঃ আগমন—দূতদিগের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও অর্হত্ত্বলাভ।

বারাণসীর নিকট বর্ষাবাস—উরুবিল্বে প্রত্যাবর্ত্তন ও তিন মাস অবস্থিতি—পৌষী পূর্ণিমায় রাজগৃহে গমন এবং তথায় দুই মাস অবস্থিতি—ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে উদায়ীর অনুরোধে কপিলবাস্তু যাইবার জন্য যাত্রা (উদায়ী আকাশপথে গিয়া শুদ্ধোদনকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন)।

কপিলবাস্তুর সন্নিহিত ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি—সেখানে বুদ্ধের সংবর্দ্ধনার জন্য শাক্যদিগের আগমন—(শুদ্ধোদন অন্যান্য শাক্যের সহিত বুদ্ধকে প্রণিপাত করিলেন)—বুদ্ধের অনুভাববলে সভাস্থলে বৃষ্টিপাত (যাহারা ইচ্ছা করিল তাহারা সিক্ত হইল; যাহারা করিল না, তাহাদের শরীরে কিছুমাত্র জল লাগিল না।)

ভিক্ষার্থ কপিলবাস্তু নগরে প্রবেশ—বাতায়ন হইতে যশোধারার বুদ্ধদর্শন (রাজপুত্রের পক্ষে ভিক্ষা শোভা পায় না বলিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট নিজের আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু বুদ্ধ তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, ভিক্ষাই বুদ্ধের জীবনধারণোপায়)—মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) শ্রবণে শুদ্ধোদনের স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্তি (মৃত্যু সময়ে শুদ্ধোদন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন)।

শুদ্ধোদনের সঙ্গে রাজভবনে গিয়া ভোজন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া যশোধারার প্রকোষ্ঠে গমন—শুদ্ধোদনের মুখে যশোধারার পাতিব্রত্য

ধর্ম্মের প্রশংসা[১] চন্দ্র-কিন্নর জাতক (৪৮৫) কথন।

পরদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেকের এবং জনপদকল্যাণীর সহিত বিবাহের আয়োজন—নন্দকে লইয়া বুদ্ধের ন্যগ্রোধারামে গমন—তৃতীয় দিবসে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

সপ্তম দিবসে যশোধরার শিক্ষায় রাহুল কর্ত্তৃক পৈতৃক ধনপ্রার্থনা; বুদ্ধের আদেশে শারীপুত্রকর্ত্তৃক রাহুলকে শ্রামণের প্রব্রজ্যা দান—শুদ্ধোদনের আক্ষেপ—আর কখনও মাতা পিতার অনুমোদন ব্যতিরেকে সন্তানকে প্রব্রজ্যা দিবেন না বলিয়া বুদ্ধের অঙ্গীকার।

কপিলবাস্তু হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—পথে মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামকস্থানে অনিরুদ্ধ, ভদ্রিক, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যরাজপুত্র এবং উপালি নামক নাপিতকে প্রব্রজ্যা দান—রাজগৃহ নগরস্থ শীতবন নামক উদ্যানে বাস—এখানে শ্রাবস্তীবাসী সুদত্ত (অনাথপিণ্ডদ) নামক শ্রেষ্ঠীর সহিত পরিচয়—অনাথপিণ্ডদের স্রোতাপত্তিমার্গ-প্রাপ্তি—বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে যাইবার প্রস্তাব—জেতবনে মহাবিহার নির্ম্মাণ—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন—অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সেই বিহারদান (ইহার কয়েক বৎসর পর বিশাখা শ্রাবস্তীর নিকট পূর্ব্বারাম নামক আর একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও বৌদ্ধদিগকে দান করেন; তৎসম্বন্ধে বিশাখার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষায় রাজগৃহের নিকটস্থ বেণুবনে 'কলণ্ডক নিবাপে' বাস—জীবকের সহিত পরিচয়—জীবকের চিকিৎসাগুণে বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উপশম।

বৈশালীতে মহামারী—উহার উপশম করিতে তীর্থিকদিগের অক্ষমতা—লিচ্ছবিগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধের শরণ গ্রহণ—বুদ্ধের বৈশালীতে গমন—মড়ক শান্তি—লিচ্ছবিগণের বৌদ্ধশাসন গ্রহণ।

রাজগৃহে প্রত্যাগমন—উপর্যুপরি তিন বৎসর বেণুবনে বাস—পঞ্চম বর্ষায় বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কুটাগার শালায় বাস (মহাবন একটী প্রকাণ্ড শালবন; গোশৃঙ্গিনামক এক ব্যক্তি উহা বুদ্ধকে দান করেন)।

রোহিণী নদীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে মনোমালিন্য—যুদ্ধ

---

[১]। এই সময়ে শুদ্ধোদন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে অনেকে যশোধরার পাণি গ্রহণার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু যশোধারা এমনই পতিব্রতা ছিলেন যে তিনি কাহারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকালে পরাশরসংহিতার 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাম্ পতিরন্যো বিধীয়তে' এই ব্যবস্থানুসারে কাজ হইত। প্রাচীন গ্রীসেও পতি দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ থাকিলে পত্নীর পক্ষে প্রত্যন্ত গ্রহণ দোষাবহ ছিল না। পেনেলোপির উপাখ্যানই ইহার প্রমাণ।

হইবার সম্ভাবনা—ইহা জানিতে পারিয়া বুদ্ধের আকাশপথে বিবাদের স্থানে গমন—সদুপদেশে বিবদমান পঞ্চদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন [বৃক্ষধর্ম্ম জাতক (৭৪), স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এবং কুণাল-জাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।]

ইহার অল্পদিন পরে শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সানুচর বুদ্ধের আকাশপথে কপিলবাস্তুতে গমন—মুমূর্ষু পিতার নিকট অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা—তচ্ছ্রবণে শুদ্ধোদনের অর্হত্ত্ব লাভ এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রাপ্তি।

মহাগৌতমীর সংসারত্যাগের বাসনা—বুদ্ধের অনুমতিলাভার্থ তাঁহার ন্যগ্রোধারামে গমন—নারী জাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে বুদ্ধের অনিচ্ছা—বৈশালীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

মহাগৌতমী ও তাঁহার সহচরীগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ দৃঢ় সঙ্কল্প (তাঁহারা কেশ ছেদন করিয়া হীনবেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি পাইলেন।)—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন এবং তথায় ষষ্ঠবর্ষা যাপন—প্রবারণান্তে রাজগৃহে গমন ও বেণুবনে অবস্থিতি—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী ক্ষেমার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ (ক্ষেমা উত্তরকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন।)

তীর্থিকদিগের প্রতিযোগিতা—শ্রাবস্তী নগরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমক্ষে পরীক্ষা—তীর্থিকদিগের পরাভব—তীর্থিক পুরণকাশ্যপের জলনিমজ্জন দ্বারা আত্মহত্যা ও অবীচিতে গমন।

বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন এবং সেখানে মহামায়ার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা—স্বর্গে তিন মাস কাল অবস্থিতি—সাঙ্কাশ্য নগরের নিকট শক্রদত্ত সোপানের সাহায্যে অবরোহণ—জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন—তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক চিঞ্চা মাণবিকার সাহায্যে বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কারোপণ চেষ্টা—চিঞ্চার অবীচিতে গমন [মহাপদ্ম-জাতক (৪৭২)]।

অষ্টমবর্ষায় ভর্গদেশস্থ ভেসকলাবনে শিশুমার নামক স্থানে অবস্থিতি। অত্রত্য রাজা বোধির 'কোকনদ' নামক প্রাসাদে গিয়া ভোজন—শ্রাবস্তীতে গমন।

কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে নবমবর্ষা বাস—শিষ্যদিগের মধ্যে বিনয়সম্বন্ধে মতভেদ—মীমাংসার জন্য বৃথা চেষ্টা—বিরক্ত হইয়া বালকলোণকার নামক গ্রামে গমন—স্থবির ভৃগুর সহিত প্রাচীন বংশদায়ে গমন—অনিরুদ্ধ, নন্দিক ও কিম্বিলের সহিত মিলন—পারিলেষ্যক্ নামক স্থানে গমন এবং তথায় রক্ষিতারামে ভদ্রশালবৃক্ষমূলে অবস্থিতি।

শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন—কৌশাম্বীর বিবদমান ভিক্ষুদিগের অনুতাপ, শ্রাবস্তীতে গমন ও শাস্তার নিকট ক্ষমালাভ।

রাজগৃহের নিকট দশমবর্ষা বাস—দক্ষিণগিরিতে একনালা গ্রামে ভরদ্বাজ

নামক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় (ভরদ্বাজ বলিলেন, ‘আমি ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তল্লব্ধ শস্যে জীবন ধারণ করি; তুমিও সেইরূপ কর না কেন?’ ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, ‘আমিও ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তদ্দারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। আমি শ্রদ্ধারূপ বীজ বপন করি; ধ্যান আমার বৃষ্টি, বিনয় আমার লাঙ্গলীষা, মন আমার যুগ, ধারণা আমার ফলক; সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র; বীর্য্য আমার বলীবর্দ্দ, নির্ব্বাণ আমার শস্য।’ ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন)।

বৈরন্তী নগরের নিকট দ্বাদশ বর্ষা বাস—অনন্তর তক্ষশিলা পর্য্যন্ত পর্য্যটন—সেখান হইতে ফিরিবার কালে সাঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন—প্রথম বারাণসী, পরে বৈশালীতে পুনরাগমন এবং কূটাগার শালায় অবস্থিতি।

শ্রাবস্তী ও চালিকা নামক স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষাবাস—চতুর্দ্দশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থিতি এবং রাহুলকে উপসম্পদাদান—কপিলবাস্তুতে পুনর্ব্বার গমন—সুপ্রবুদ্ধের দুর্ব্ব্যবহার ও দণ্ড (সুপ্রবুদ্ধ-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

জেতবনে প্রত্যাগমন—আলবীতে গমন ও তত্রত্য যক্ষকে দমন—রাজগৃহে গমন এবং বেণুবনে সপ্তদশ বর্ষা বাস—চালিকার নিকটস্থ পর্ব্বতে অষ্টাদশ বর্ষাবাস—বেণুবনে ঊনবিংশবর্ষা বাস—জেতবনে বিংশবর্ষা বাস (এই সময়ে আনন্দ বুদ্ধের ‘উপস্থায়ক’ নিযুক্ত হইলেন)—অঙ্গুলিমালকে দীক্ষাদান—তীর্থিকগণকর্ত্তৃক বুদ্ধচরিত্রে পুনর্ব্বার কলঙ্কারোপ চেষ্টা। (তাঁহারা সুন্দরী নাম্নী বারাঙ্গনাকে নিহত করিয়া তাহার শব জেতবনস্থ বিহারের নিকট এক আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া যান এবং প্রকাশ করেন, গৌতমই নিজের কুকীর্ত্তি গোপন করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন)—তীর্থিকদিগের চাতুরীপ্রকাশ ও অপমান [মণিশূকর জাতক (২৮৫) দ্রষ্টব্য]।

অঙ্গদেশস্থ এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের কন্যার বিবাহ (ঐ কন্যার পতিকুলস্থ সকলে আজীবকদিগের শিষ্য ছিলেন) নববধূর চেষ্টায় তাঁহার পতিকুলস্থ সকলের বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাস্থাপন—শাস্তার পঞ্চশত শিষ্যসহ আকাশপথে গমন এবং সেই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষাদান—অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে রাখিয়া শ্রাবস্তীতে পুনরাগমন)।

[অতঃপর ২৩ বৎসরের ঘটনার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।]

বুদ্ধের ২৭ বৎসর—দেবদত্তের বিদ্রোহ—দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা—বুদ্ধের প্রাণসংহার চেষ্টা—দেবদত্তের চক্রান্তে কোকালিক প্রভৃতির সঙ্ঘত্যাগ—শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের চেষ্টায় কোকালিক ব্যতীত অপর সকলের পুনর্ব্বার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ—দেবদত্তের দণ্ড—অজাতশত্রুর অনুতাপ ও বুদ্ধের শরণগ্রহণ—বিরূঢ়ক কর্ত্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি এবং

কপিলবাস্তু-ধ্বংস।

বুদ্ধের বয়স ৭৯ বৎসর—রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূটে অবস্থিতি—রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী আম্রলট্‌কায় গমন—নালন্দায় গমন—তত্রত্য পাবারিক আম্রবনে অবস্থিতি—পাটলিগ্রামে গমন—এই স্থানের ভাবী উন্নতি ও ধ্বংসের কথা—শিষ্যগণসহ আকাশমার্গে গঙ্গার অপরপারে গমন—কোটিগ্রামে গমন—নাড়িকায় গমন—বৈশালীতে গমন—আম্রপালী নাম্নী বারাঙ্গনারা আম্রকাননে অবস্থিতি—আম্রপালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ—আম্রপালী কর্ত্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে ঐ উদ্যানদান—বৈশালীর নিকটবর্ত্তী বেলুব নামক স্থানে শেষ বর্ষা বাস—এখানে কঠিন পীড়া—বয়স ৮০ বৎসর—তিন মাস পরে পরিনির্ব্বাণলাভ করিবেন, চাপালতীর্থে মারের নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ—মহাবনস্থ কুটাগারশালায় গমন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি—পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবনে অবস্থিতি—চুন্দের গৃহে ভোজন—অতিসার—কুশিনগর যাইবার সময় সাতিশয় দুর্ব্বলতা—আরাড় কালামের শিষ্য পুক্কুসকে দীক্ষা দান—ককুত্থা নদীতে অবগাহন—হিরণ্যবতীর অপরপারে কুশিনগরের উপবর্ত্তনস্থ শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে অন্তিমশয্যায় উত্তরশীর্ষে শয়ন—আনন্দকে বিবিধ উপদেশদান—চতুস্তীর্থের (কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, বারাণসী ও কুশিনগরের) মাহাত্ম্যবর্ণন—সুভদ্র নামক তীর্থিককে দীক্ষাদান—সুভদ্রের নির্ব্বাণলাভ—অন্তিম উপদেশ : 'ব্যয়ধর্ম্ম, ভিক্‌খবে, সঙ্খারা; অপ্‌পমাদেন সম্পাদেথ'—ধ্যানবলে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি—ভূকম্প ও অশনিপাত—মল্লদিগের প্রযত্নে সৎকারের আয়োজন (কিন্তু সপ্তাহকাল কিছুতেই চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল না; অনন্তর মহাকাশ্যপ সেখানে উপস্থিত হইলে চিতা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল)—ভক্তদিগের মধ্যে শারীরিক ধাতুবিভাগ—ভক্তগণকর্ত্তৃক নানাস্থানে এই সকল ধাতুর উপর স্তূপনির্ম্মাণ।

গৌতম বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু (মার কৃষ্ণবন্ধু নামে অভিহিত), সূর্য্যবংশ, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, আঙ্গিরস, গৌতম। শুদ্ধ 'গৌতম' নাম কতকটা অবজ্ঞাসূচক। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে শ্রমণ গৌতম এই নামে সম্বোধন করিতেন।

● **বেণুবন**—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। বুদ্ধ প্রথমে যষ্টিবনে থাকিতেন। ঐ স্থান রাজগৃহ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। বিম্বিসার যখন বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'আমি বুদ্ধকে অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি যষ্টিবনে (লট্‌ঠিবনে) থাকিলে সর্ব্বদা দেখা শুনার অসুবিধা; অতএব তিনি রাজধানীর নিকট বেণুবন নামে আমার যে উদ্যান আছে সেখানেই অবস্থিতি করুন। ইহা আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিলাম।'

বুদ্ধ দান গ্রহণ করিলেন এবং এই সময় হইতে বেণুবনই মগধরাজ্যে তাঁহার প্রধান বাসস্থান হইল। বেণুবনের প্রাচীন নাম 'কলণ্ডক নিবাপ'।

● **বৈশালী**—(পালি 'বেসালী')—গঙ্গার উত্তরতীরস্থ নগর ও জনপদ। বৈশালী নগর বোধহয় হিরণ্যবাহু-সঙ্গমের ঠিক অপর পারে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে হাজিপুরের দশক্রোশ উত্তরে বেশার নামে যে স্থান আছে তাহাই প্রাচীন বৈশালী। বৈশালী রাজ্য বলিলে মোটামুটি বর্ত্তমান মতিহারী, ত্রিহুত, দ্বারাভাঙ্গা ও পূর্ণিয়া জেলাকে বুঝাইত। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে গণ্ডক এবং পূর্ব্বে মহানন্দা। প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে বিশালা নামে যে আর একটী নগরের উল্লেখ দেখা যায় তাহা মালব দেশের অন্তঃপাতী এবং অবন্তীর (উজ্জয়িনীর) নামান্তর।

বৈশালীর উৎপত্তিসম্বন্ধে পালি সাহিত্যে এই আখ্যায়িকা দেখা যায়—প্রাচীনকালে কাশীর কোন রাজ্ঞী একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করে এবং উহা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। এক মুনি এই ভাণ্ড পাইয়া নিজের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী পরমসুন্দর কুমার ও একটী পরমাসুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। ইহারা মাতৃস্তনের পরিবর্ত্তে মুনির অঙ্গুলি চুষিয়াছিল এবং তাহা হইতেই দুগ্ধ পাইয়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল বলিয়া তাহারা 'লিচ্ছবি' নাম পাইয়াছিল। ইহাদের পিতামাতা কে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায় আশ্রম-সন্নিহিত জনপদবাসীরা ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছিল। এইজন্য ইহাদের নামান্তর 'বৃজি'। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্তির পর স্বামি-স্ত্রী-ভাবে বাস করিত। ক্রমে ইহাদের ১৬টী পুত্র এবং ১৬টী কন্যা জন্মে। কালসহকারে এই সকল পুত্রকন্যার আবার বহু সন্তান সন্ততি হয় এবং তাহারা যে নগরে বাস করিত তাহা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এই জন্য ইহার নাম 'বৈশালী' হয়।

গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল [একপর্ণ জাতক (১৪৯) দ্রষ্টব্য]। লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই 'রাজ' নামে অভিহিত হইতেন। ফলত বৈশালীর শাসনপ্রণালী কুলতন্ত্র ছিল; রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হস্তে থাকিত না।

বুদ্ধের পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় অজাতশত্রু বৈশালী জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বোধহয় সত্য নহে (অজাতশত্রুর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। ইহার বহুকাল পরেও গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকুমারীর গর্ভজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিব্বুতের প্রথম রাজাও লিচ্ছবিকুলজাত ছিলেন (২৫০ খ্রীঃ পূঃ)।

বুদ্ধের সময় একবার বৈশালীতে মহামারী উপস্থিত হয় এবং লিচ্ছবিরা

অনন্যোপায় হইয়া বুদ্ধের শরণ লন। বুদ্ধ তাঁহাদের রাজ্যে পদার্পণ করিলেই মহামারী প্রশমিত হয়। এই জন্য লিচ্ছবিরা বৌদ্ধশাসনের পক্ষপাতী হন।

বৃজিগণ অষ্টকুলে বিভক্ত ছিল। ত্রিকাণ্ডশেষে লিচ্ছবি, বৈদেহ ও তীরভূক্তি এই শব্দত্রয় একার্থবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবত ইহারা উক্ত অষ্টকুলের তিনটী।

● **ভদ্রিক**—(১) একজন উপাসক; পঞ্চবর্গীয়দিগের অন্যতম; ইনি মৃগদাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (২) শাক্যরাজপুত্র; আনন্দ প্রভৃতির সহিত এক দিনে অনুপির নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (৩) অঙ্গ দেশস্থ একটী নগর; ইহার নামান্তর ভদ্রঙ্কর (বিশাখার পিতা ধনঞ্জয়ের আদি বাসস্থান)।

● **ভৃগু**—(পালি 'ভগু'); শাক্যবংশীয় রাজকুমার। ইনিও অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

● **মস্করিগোশালি-পুত্র**—(পালি 'মক্খলি গোশাল') ইনি একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইঁহারও জন্ম দাসীগর্ভে; গোশালায় প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'গোশালি-পুত্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। একদা ইনি নিজের প্রভুর জন্য এক ভাণ্ড ঘৃত মস্তকে লইয়া যাইবার সময় পিচ্ছিল পথে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যান এবং ঐ ঘৃত নষ্ট হয়। ইহাতে ইনি ভয়ে পলাইয়া যান এবং সন্ন্যাসী সাজিয়া লোককে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করেন।

● **মহানাম**—অমৃতোদনের পুত্র এবং অনিরুদ্ধের সহোদর। শুদ্ধোদন নির্ব্বাণ লাভ করিলে ইনিই কপিলবাস্তুর অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার উপপত্নী-গর্ভজাত কন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার বৃত্তান্ত প্রসেনজিৎ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

● **মহামায়া**—(মায়াদেবী) বুদ্ধের জননী। মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী গৌতমী উভয়েই শুদ্ধোদনের পিতৃব্বসৃসুতা ও ভার্য্যা। ইঁহার পিতা অনুশাক্য রোহিণী নদীর অপর পারবর্ত্তী দেবদেহ (দেবহ্রদ, ব্যাঘ্রপুর বা কোলি) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপবতী ছিলেন। তাঁহারা কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, মিথ্যা বলিতেন না এবং পিপালিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণনাশ করিতেন না।

সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই মহামায়া জীবলীলা সংবরণপূর্ব্বক তুষিতস্বর্গে পংদেবতা হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ জীবদ্দশায় সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

● **মহাপ্রজাপতী**—মহামায়ার সপত্নী এবং সহোদরা। মহামায়ার মৃত্যুর পর ইনিই সিদ্ধার্থকে পালন করিয়াছিলেন। নন্দ ইঁহার গর্ভজাত সন্তান। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ইনি বুদ্ধকে বলিলেন, 'নন্দ ও রাহুল প্রব্রাজক হইয়াছে; আমি এখন

বিধবা হইলাম। অতএব আমাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান কর।' কিন্তু বুদ্ধ নারীজাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না; তিনি কপিলবাস্তু ত্যাগ করিয়া বৈশালীনগরের নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রজাপতী ইহাতে নিরস্ত হইলেন না; তিনি শাক্যবংশীয় আরও অনেক মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পদব্রজে বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। যে কেবল অসূর্য্যস্পশ্যা রমণী কখনও গৃহের বাহির হয় নাই, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা এই কষ্ট স্বীকার করিতেন। দীর্ঘ পথ—৫১ যোজন—চলিতে চলিতে তাঁহাদের পদে স্ফোটক জন্মিল; কিন্তু তাঁহারা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া আনন্দের হৃদয় গলিয়া গেল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠনের জন্য তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের জন্য বুদ্ধ কয়েকটি কঠোর নিয়ম করিলেন; মহাপ্রজাপতী প্রভৃতি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎসমস্ত প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মহাপ্রজাপতী ধ্যানবলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে বুদ্ধের সমক্ষেই নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন।

● **মহাবন**—ইহা গোশৃঙ্গিনামক জনৈক উপাসককর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈশালীর অবিদূরস্থ একটী শালবন। বুদ্ধ কখনও কখনও অত্রত্য 'কূটাগারশালায়' বাস করিতেন।

● **মার**—(২৩০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত ভাষায় মার মদনের নামান্তর; বৌদ্ধ 'মারের' সহিত হিন্দু 'মারের' (স্মরের) কতকটা সাধর্ম্ম্যও আছে। বৌদ্ধ মারের বাহন 'গিরিমেখল' নামক হস্তী।

● **মৃগার**—(পালি 'মিগার') শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী এবং বিশাখার শ্বশুর। সবিস্তর বিবরণ বিশাখার বৃত্তান্তে দ্রষ্টব্য। (ইনি কোন কোন গ্রন্থে 'মৃগধর' নামেও বর্ণিত হইয়াছেন।)

● **মৌদ্‌গল্যায়ন**—(মহামৌদ্‌গল্যায়ন, পালি 'মোগ্গল্লান')। ইনি এবং শারীপুত্র বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইঁহার নামান্তর কোলিত। ইনি এবং শারীপুত্র উভয়েই প্রথম রাজগৃহ নগরে সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য ছিলেন। কিরূপে ইঁহারা শেষে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করেন তাহা শারীপুত্রের প্রসঙ্গে বলা হইবে।

মৌদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমন এবং অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত দেবলোকে ও নরকে যাইতে পারিতেন; কি কারণে দেবতারা সুখ এবং নরক বাসীরা দুঃখ ভোগ করেন তাহা জানিতেন এবং লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধশাসন গ্রহণ করিত। এই নিমিত্ত তীর্থিকেরা অনেক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট অপদস্থ হইতেন।

শেষে তীর্থিকেরা মৌদ্‌গল্যায়নের প্রাণবধের সঙ্কল্প করিলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিলেন মৌদ্‌গল্যায়ন নিহত হইলে বুদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে। তাঁহারা কতিপয় উপাংশুঘাতক নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, 'অমুক গুহায় মৌদ্‌গল্যায়ন থাকিবেন তোমরা তাঁহার প্রাণবধ করিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।' ঘাতকেরা গিয়া ঐ গুহা বেষ্টন করিল; কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন সেদিন কুঞ্চিকার রন্ধ্রপথে পলায়ন করিলেন। পরদিনও এইরূপ হইল এবং মৌদ্‌গল্যায়ন আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতীত এক জন্মে তিনি অন্ধ মাতাপিতাকে বনমধ্যে সিংহশার্দ্দুলাদির মুখে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন; এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; স্বয়ং বুদ্ধও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না; ঘাতকেরা গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং তিনি মরিয়াছেন স্থির করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন তখনও মরেন নাই। লোকে যেরূপ কর্দ্দমনির্ম্মিত ভগ্ন পাত্রের অংশগুলি যোড়ে, তিনিও ঋদ্ধিবলে সেইরূপ নিজের ভগ্নাস্থিগুলি জুড়িলেন এবং আকাশপথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভো, আমার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।' বুদ্ধ বলিলেন, 'বেশ, তুমি নির্ব্বাণ লাভ কর; তবে আমাকে একবার ভণন শুনাইয়া যাও; কারণ অতঃপর আর কাহারও মুখে এরূপ মধুর কথা শুনিতে পারিব না।' শারীপুত্রের পরিনির্ব্বাণ লাভের এক পক্ষ পরে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় মৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ ঘটে। [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫) দ্রষ্টব্য।]

● **যশোধারা**—কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা, দেবদত্তের অনুজা এবং গৌতমবুদ্ধের সহধর্ম্মিণী। সিদ্ধার্থ ও যশোধারা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ প্রব্র্যাজক হইবেন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল; এই জন্য যখন যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন সুপ্রবুদ্ধ সম্মত হন নাই। কিন্তু যশোধারা বলিয়াছিলেন, 'সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।' কোলিরাজ শুদ্ধোদনের সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কাজেই শুদ্ধোদন যখন নিজে কোলিতে গিয়া যশোধারাকে লইয়া আসিলেন তখন তিনি বাধা দিতে পারিলেন না। অতঃপর যখন যশোধারার অনুচরী হইবার জন্য পঞ্চশত রাজকন্যার প্রয়োজন হইল, তখন শাক্যরাজেরা বলিলেন, 'সিদ্ধার্থ বালক ও দুর্ব্বল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন বিদ্যালাভ ঘটে নাই; তিনি কিরূপে পরিবার রক্ষা করিবেন?' এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ নিজের বিদ্যার পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবদত্ত প্রভৃতি শত শত শাক্যরাজপুত্র তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর

হইলেন; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য, অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিতার নিকট সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইল।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধারা পতিব্রতা রমণীর ন্যায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন; যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ চীর বসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকৃষ্ট বসন পরিত্যাগ করিয়া চীরধারিণী হইলেন, যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ আর মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করেন না, তখন নিজেও ঐ সকল বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও একাহারী হইলেন। তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন এবং মৃৎপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেন নাই! বৌদ্ধেরা বলেন বিশ্বন্তর প্রভৃতি অতীত জন্মেও তিনি বোধিসত্ত্বের সহধর্ম্মিণী ছিলেন বলিয়া এ জন্মে পতির প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন।

কালক্রমে শুদ্ধোদন তনুত্যাগ করিলেন; নন্দ, রাহুল, দেবদত্ত ও মহাপ্রজাপতী সংসার ত্যাগ করিলেন। এ অবস্থায় পতিকুলের ও পিতৃকুলের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই যশোধারার হইল; কিন্তু মহাপ্রজাপতী যে পথে গিয়াছেন তিনিও সেই পথে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং এক সহস্র শাক্যরাজকন্যা পরিবৃত হইয়া কপিলবাস্তু ত্যাগ করিলেন। কোলি ও কপিলবাস্তুর লোকে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহারা তাঁহার বাহনের জন্য রথ ইত্যাদি দিতে চাহিল; তিনি তাহাও লইলেন না; ৪৫ যোজন পদব্রজে চলিয়া বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রজাপতীর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপসম্পদা দিলেন।

ইহার পর যশোধারা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রাবস্তীতেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে লোকে তাঁহাকে এত উপহার পাঠাইতে লাগিল যে তিনি পুনর্ব্বার বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেও এইরূপ ঘটিল; তখন তিনি রাজগৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যশোধারা ৭৮ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণলাভ করেন।

● **রাজগৃহ**—(বর্ত্তমান রাজগিরি; প্রাচীন নামান্তর গিরিব্রজ বা কুশাগারপুর; বুদ্ধগয়া হইতে বিহারে যাইবার পথে পাটনা জেলায় অবস্থিত)। মগধের প্রাচীন রাজধানী; বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এখানেই বাস করিতেন। রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চশৈলের নাম বিপুলগিরি (বৈপুল্য পর্ব্বত), রত্নগিরি, উদয়গিরি,

শোণগিরি ও বৈভারগিরি। বৈভারগিরিতে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। রাজগৃহের ২৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গৃধ্রকূট, ইহার বর্ত্তমান নাম শৈলগিরি।

● **রাহুল**—গৌতম বুদ্ধের পুত্র।[১] ইহার জন্মের অব্যবহিত পরেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করেন। রাহুলের যখন সাত বৎসর বয়স তখন গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কপিলবাস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যশোধারা পুত্রকে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বলিলেন, 'বৎস, ঐ যে তেজঃপূর্ণ ভিক্ষু দেখিতে পাইতেছ, উনি তোমার জনক। যাও, উঁহার নিকট গিয়া বল, 'পিতঃ, পুত্রে পিতার নিকট যে ধন পায়, আমায় তাহা দিন।' রাহুল নির্ভয়ে পিতার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করিলেন। তখন যশোধারার ভয় হইল পাছে তথাগত রাহুলকেও প্রব্রজ্যা দেন, কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি নন্দকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

যশোধারা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। বুদ্ধ শারীপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাহুল পৈতৃক ধন চাহিতেছে। যে ধন দুঃখের নিদান তাহা আমি ইহাকে দিতে পারিব না। অতএব ইহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।' অনন্তর শারীপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিলেন। ২০ বৎসর বয়সে রাহুলের উপসম্পদা হয়। কালে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যশোধারা এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেই রাহুলের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

● **রোহিণী**—নেপালের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদী। ইহা প্রথমে মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে; পরে এই সম্মিলিত প্রবাহ গোরক্ষপুরের নিকট রাপ্তীতে পড়িতেছে। রোহিণীর এক পারে কপিলবাস্তু এবং অন্য পারে কোলি (দেবহ্রদ) নগর অবস্থিত ছিল।

● **শুদ্ধোদন**—কপিলবাস্তুর রাজা, সিংহহনুর পুত্র। সিদ্ধার্থ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং পরিণামে বুদ্ধ হইবেন জানিয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে চারিবার প্রণিপাত করিয়াছিলেন—প্রথমবার যখন শিশু সিদ্ধার্থ অসিত দেবলের মস্তকে পদার্পণ করেন; দ্বিতীয়বার যখন সিদ্ধার্থ সমস্ত দিন জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের ছায়া নিশ্চল হইয়াছিল; তৃতীয়বার যখন বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; চতুর্থবার মৃত্যুকালে।

---

[১]। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাকি বলিয়াছিলেন, 'রাহুল জন্মিয়াছে' অর্থাৎ 'আমার একটী নূতন বন্ধন হইল।' বৌদ্ধেরা বলেন, এই জন্যই কুমারের নাম 'রাহুল' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, সেই জন্যই কুমারের নাম রাহুল হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থে 'রাতুল' এই নামও দেখা যায়। রাতুল সংস্কৃত শব্দ; সম্ভবত 'রাহুল' ইহার অপভ্রংশ।

বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগত যখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোদন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি তথাগতকে কপিলবাস্তুতে লইবার জন্য নয় বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূতগণ তথাগতের উপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কপিলবাস্তুর কথা ভুলিয়া যান। অতঃপর তিনি তথাগতের বাল্য সহচর কালোদায়ীকে প্রেরণ করেন। উদায়ীও প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজের দৌত্যের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তথাগতকে কপিলবাস্তুতে লইয়া গেলেন; শুদ্ধোদন ৭ বৎসর পরে পুনরায় সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। কপিলবাস্তুতে গিয়া যখন তথাগত প্রথম ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন তখন শুদ্ধোদন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগত নিবৃত্ত হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, 'পিতঃ, আপনি রাজবংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু আমি বুদ্ধবংশে জন্মিয়াছি; অতীত বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষা করিতেন।' অতঃপর শুদ্ধোদন তথাগতের উপদেশ এবং ধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭) শুনিয়া অনাগামীমার্গ-ফল লাভ করেন।

যখন তথাগত নন্দ ও রাহুলকে প্রব্রজ্যা দেন তখন শুদ্ধোদন দেখিলেন রাজবংশ প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইল। তিনি নিজের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিলে তথাগত অঙ্গীকার করিলেন যে অতঃপর মাতাপিতার অনুমোদন বিনা কেহই প্রব্রাজক হইতে পারিবে না।

ইহার কয়েকবৎসর পরে শুদ্ধোদন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন; তথাগত তখন বৈশালীর নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে গমন করিয়া কপিলবাস্তুতে উপনীত হইলেন এবং পিতাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন। তিনি শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

● **শ্রাবস্তী**—(বর্ত্তমান শেট মহেঠ; অযোধ্যা প্রদেশে গোণ্ডা জেলায়, বলরামপুর হইতে দশ মাইল দূরে)। উত্তরকোশলরাজ্যের রাজধানী। প্রবাদ আছে যে যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ইহা অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরবর্তীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

● **সঞ্জয় বৈরট্টীপুত্র**—(পালি 'সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত') একজন তীর্থিক। ইনিও দাসীগর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত। ইঁহার মস্তকে একটা বড় আব ছিল। ইনি বলিতেন পুনর্জন্মলাভ নীচ কিংবা উচ্চ যোনিতে হইবে না; এখন যে যে জীব, পরজন্মেও সে সেই জীব হইবে। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন প্রথমে ইহার শিষ্য ছিলেন।

● **সাকেত**—(নামান্তর অযোধ্যা বা বিশাখা)। ইহা বর্ত্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সরযূতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় অঙ্গদেশ হইতে গিয়া এখানেই বাস করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় চম্পা, রাজগৃহ,

শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী এবং বারাণসী এই ছয়টী নগর আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

● **সাঙ্কাশ্যা**—(পালি 'সঙ্কিস্‌স') ১৭১ পৃষ্ঠে মুদ্রিত টীকা দ্রষ্টব্য।

● **সারীপুত্র**—(শারীপুত্র, শারীসুত, পালি 'সারিপুত্ত')—অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম এবং 'ধর্ম্মসেনাপতি' নামে অভিহিত। ইঁহার নামান্তর উপতিষ্য। যে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় তাহারও নাম উপতিষ্য (বা কলাপিণাক বা নাল[১])। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী। শারীপুত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ; মাতার নাম 'শারী' বা 'সারী' বলিয়া 'শারীপুত্র' (সারীপুত্র) আখ্যা পাইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার সময় ইঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু ইনি এবং ইঁহার বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির আশায় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহ নগরস্থ সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য হন। সঞ্জয়ীর শিক্ষায় ইঁহারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কাজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পরিশেষে সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অতঃপর একদিন প্রাতঃকালে শারীপুত্র দেখিতে পাইলেন স্থবির অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া শারীপুত্রের মনে শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাহার শিষ্য?' অশ্বজিৎ উত্তর দিলেন, 'আমি শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণের শিষ্য। তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই; তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে—

> যে ধম্মা হেতুপ্‌পভবা, তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
> তেসঞ্চ যো নিরোধো এবং বদী মহাসমণো।

> কারণ হইতে এই বিশ্বমাঝে উৎপাদিত যাহা হয়,
> কারণ তাহার প্রভু তথাগত করেছেন সুনির্ণয়।
> সে কারণ পুনঃ কিরূপে নিরুদ্ধ করিবে মানবগণ,
> সে মহাশ্রমণ নিজ প্রজ্ঞাবলে করেছেন প্রদর্শন।'

উক্ত গাথা শুনিবামাত্র শারীপুত্র স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি এই কথা জানাইলে মোদ্‌গল্যায়নও বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তখনই উভয়েই সঞ্জয়ীর আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়ন সপ্তাহমধ্যে এবং শারীপুত্র এক পক্ষে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তখন বুদ্ধ ইঁহাদিগকে অগ্রশ্রাবকের পদ[২] প্রদান করেন। ইহাতে অন্যান্য

---

[১]। মহাসুদর্শন জাতকে (৯৫) নাল বা নালন্দা নামক স্থানই শারীপুত্রের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[২]। ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে অভিহিত হইতেন।

ভিক্ষুদিগের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে। কিন্তু তথাগত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে অতীত বুদ্ধেরাও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শারীপুত্র যেরূপ সুকৌশল বিরুদ্ধবাদীদিগের কূটতর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন, অন্য কোন স্থবির সেরূপ পারিতেন না।

ইহার অল্পদিন পরেই তথাগত নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গাথাটী বলিয়াছিলেন :

সব্ব পাপস্স অকরণম্, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরয়োদপনম্; এতং বুদ্ধানসাসনম্।

সর্ব্ববিধ পাপ হতে সতত বিরতি,
পুণ্যের সঞ্চয়ে সদা মনের আসক্তি,
স্বচিত্তের সযতনে নির্ম্মলীকরণ;
এই সারধর্ম্ম শিক্ষা দেন বুদ্ধগণ।

বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স সেই সময়ে শারীপুত্র বরক নামক গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় নির্ব্বাণলাভ করেন। ইহার এক পক্ষ পরে মৌদ্‌গল্যায়নেরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

● **সুপ্রবুদ্ধ**—দেবহ্রদরাজ অনুশাক্যের পুত্র, মহামায়ার ভ্রাতা এবং দেবদত্ত ও যশোধারার পিতা। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বিংশতি বর্ষ পরে শাস্তা কপিলবাস্তুর নিকটবর্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে সুপ্রবুদ্ধ প্রচুর মদ্যপান করিয়া তাঁহার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে যত আসিয়াছিল গালি দিয়াছিলেন। শাস্তা প্রশান্তভাবে আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'অহো! সুপ্রবুদ্ধ জানেন না যে, অদ্য হইতে সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিবে।' সুপ্রবুদ্ধ তখন এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তিনি সাত দিন গৃহ হইতে বাহির হন নাই। কিন্তু পাপী কি কখনও পাপের দণ্ড এড়াইতে পারে? নির্দ্দিষ্টদিনে তাঁহার পদতলে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং তিনি অবীচিতে গিয়া কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিলেন।

● **হিমবা**—(সংস্কৃত 'হিমবান')—হিমালয় পর্ব্বত। 'হিমবন্ত-প্রদেশ' বলিলে জম্বুদ্বীপের উত্তরস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চল বুঝায়। বর্ত্তমান তিব্বত, কাশ্মীর, পোল, ভোটান প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চল বৌদ্ধদিগের দেবভূমি—দেবতা, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির বাসস্থান এবং অর্হন, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতির ধ্যানস্থান। কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট এখানকার প্রধান পর্ব্বত এবং অনবতপ্ত, কর্ণমুণ্ড, রথকার, ষড়ুদন্ত, কুণাল, সিংহপ্রতাপ ও মন্দাকিনী এখানকার প্রধান সরোবর। এই সকল পর্ব্বতে কোথাও কাঞ্চনগুহা, কোথাও রজতগুহা প্রভৃতি বিচিত্র গুহা আছে।

যে অতিবিশাল বৃক্ষের নামানুসারে আমাদের এই মহাদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে সেই জম্বুবৃক্ষও হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিত। এই বৃক্ষ শত যোজন উচ্চ; শাখা-প্রশাখাসহ ইহার পরিধি তিনশত যোজন। ইহার ফল সুবর্ণময়; নদীর জলে ঐ সকল ফল পড়ে এবং স্রোতোবেগে চূর্ণীকৃত হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়।

হিমবন্ত সর্ব্ববিধ প্রাণীর আবাসভূমি। এখানে চারিপ্রকার সিংহ আছে—তৃণ, কাল, পাণ্ডু ও কেশরী। প্রথম দুইপ্রকার সিংহ উদ্ভিজ্জাশী। কেশরী সিংহের দেহ শ্বেতবর্ণ। তিন যোজন দূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত
ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

উৎসর্গ-পত্র

যিনি দরিদ্রের হাতে পড়িয়াও ক্ষণকালের জন্য বিষাদের চিহ্ন
প্রদর্শন করেন নাই, যিনি সৌভাগ্যের সময়েও অনুৎসেকিনী
ছিলেন এবং চিরদিন তপস্বিনী-বেশে দেবসেবায়,
পতিসেবায় ও সন্তান পালনে দেহপাত করিয়াছেন,
যিনি নিজের চরিত্রগুণে শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল পবিত্র
করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার বিরহে আমি এই
দশ বৎসর অর্ধমৃতভাবে জীবন বহন
করিতেছি, আমার সেই সহধর্ম্মিণী
পরলোকগতা শশিমুখীর তৃপ্তি-
সাধনার্থ আমার বহুশ্রমসাধ্য
জাতকের দ্বিতীয় খণ্ড
উৎসর্গ করলাম।

সূচিপত্র

দ্বি-নিপাত

ত্রি-নিপাত

বিজ্ঞাপন

এত দিনে জাতকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত এবং তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ হইল। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাই বিলম্বের প্রধান কারণ। এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃ আরও দুই বৎসর এ অসুবিধা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত ১৫০টী জাতক আছে; তৃতীয় খণ্ডে ১৩৮টি থাকিবে।

আমার অনভিজ্ঞতাবশত প্রথম খণ্ডে কোথাও কোথাও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। সমালোচকদিগের অনুগ্রহে এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অন্যতম অধ্যাপক বিনয়াচার্য্য শ্রীমান সিদ্ধার্থ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এ খণ্ডে সে সমস্ত যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। গাথার সংখ্যানুসারে জাতকগুলির যে সকল অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, childers সাহেবের অনুসরণ করিয়া আমি তাহাদিগকে প্রথম খণ্ডে "নিপাঠ" নামে অভিহিত করিয়াছিলাম; শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শ্রীমান সিদ্ধার্থের উপদেশে এ খণ্ডে তৎপরিবর্ত্তে "নিপাত" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এক নিপাত বলিলে যে সকল জাতকে একটি মাত্র গাথা আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাদের সমষ্টি বুঝায়; এইরূপ দ্বি-নিপাত, ত্রি-নিপাত ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি নিপাত এবং পনরটী বর্গ আছে। ১৫১ম হইতে ২৫০ম পর্য্যন্ত একশতটী জাতকে দুক-নিপাত এবং ২৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত পঞ্চাশটী জাতকে তিক-নিপাত। প্রতি নিপাতের দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটি বর্গ।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি জাতকের বীজ। খুদ্দকনিকায়ের যে অংশ 'জাতক' নামে অভিহিত, তাহাতে কেবল গাথাই আছে, গদ্য নাই। কিন্তু অনেক স্থানে, বিশেষতঃ সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হইলে, কেবল গাথাদ্বারা আখ্যায়িকাটী বুঝিতে পারা যায় না। অতএব গদ্য গল্প রচনা করিয়া তাহার সঙ্গে গাথাগুলি সংযোজিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপেই জাতকার্থকথা ও জাতকার্থবর্ণনার উৎপত্তি হয়। বিরুট ও সাঁচীর স্তূপে যখন কোন কোন জাতকের নাম এবং গদ্যময় অংশের ঘটনা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে গদ্যপদ্যাত্মক জাতকের রচনা খ্রীষ্টের অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

অনেক জাতকে [যেমন মূকপঙ্গু (৫৩৮), ভূরিদত্ত (৫৩৪), মহানারদকাশ্যপ (৫৪৪), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫), বিশ্বন্তর (৫৪৭)] গাথার ভাগ এত বেশী যে গদ্যাংশ

না থাকিলেও চলে; কোথাও কোথাও গদ্যাংশ গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। সম্ভবতঃ এই সকল প্রথমে কাব্যাকারেই রচিত হইয়াছিল।

সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক গ্রন্থে জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"বুদ্ধদেব তাঁহার বহুশিষ্যের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্নভাবে ধর্ম্মদেশনা করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে চিত্তরঞ্জক অথচ সদুপদেশমূলক গল্প করিতে হইত; লোকে তাহা শুনিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিত ও সন্নীতি-পরায়ণ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিত।" বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যগণও এই উপায় অবলম্বন করিতেন এবং গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সহিত ইচ্ছামত সাজাইয়া মনোহর গল্পের সৃষ্টি করিতেন। গল্পের সাহায্যব্যতিরেকে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গেলে বৌদ্ধেরা কখনও এত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য পারমিতাসমূহের মহিমা কীর্ত্তন। বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে দান, কোন জন্মে শীল, কোন জন্মে প্রজ্ঞা, কোন জন্মে সত্য, কোন জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলে তাঁহারাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন;—সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় মহাভারতের জাতক সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাসমূহের একটা তালিকা দিব, এবং পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়াও এইরূপ আলোচনা করিব। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ তালিকার উপযোগিতা তত অধিক নহে; পাঠকেরা নিজেরাই অনেক স্থানে সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারেন; অনুবাদকের যাহা বক্তব্য, তাহা পাদটীকাকারে দিলেও চলে। জাতকপাঠে পুরাকালীন সমাজ, আচার-ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদির সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা একত্র সন্নিবদ্ধ করিতে পারিলে বরং পাঠকদিগের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমি শেষে সেই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়াছি। কেহ হয়ত বলিবেন, সমস্ত জাতকের অনুবাদ শেষ হইবার পরেই এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু তত দিন পর্য্যন্ত নীরব কথা এ বয়সে আমার সাহসে কুলায় না। আমি এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৪০টী জাতকের অনুবাদ করিয়াছি; অবশিষ্ট শতাধিক জাতকও মোটামুটি পড়িয়াছি। ইহার ফলে আমার যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, এ খণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ভিত্তি স্থাপিত হইল; উত্তরকালে অন্য কেহ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে

ইহার উপর গঠন করিতে পারিবেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জাতকপ্রদত্ত সমাজ-চিত্র প্রধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডের; তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। অধিকাংশ জাতকেই কাশী, কোশল, বিদেহ, বৈশালী প্রভৃতি প্রাচ্য-রাজ্যসমূহের কথা; পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যার ও পূর্ব্বে অঙ্গের বাহিরে কোন অঞ্চলের রীতিনীতির বড় উল্লেখ নাই। গান্ধার, কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় দূরবর্ত্তী দেশের নাম আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গক্রমে; আয়্যায়িকার মূল অংশের সহিত সে উল্লেখের সম্বন্ধ খুব অল্প। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়, এবং প্রথম দুইশত বৎসর ইহা এই অঞ্চলেই নিবদ্ধ ছিল। কাজেই বৌদ্ধেরা জাতককথাগুলিকে সর্ব্বজনীন করিতে গিয়াও তাহাদিগকে উৎপত্তিস্থানগত বৈশিষ্ট্যহীন করিতে পারেন নাই। এই কারণেই জার্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার ফিক্ জাতকের প্রথম পাঁচ খণ্ডের আলোচনা করিয়া যে গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহার Social Organisation in North-east India in Buddha's Time এই নাম দিয়াছেন।[১] আমি এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহার অতিরিক্ত দুই একটি বিষয়েও হাত দিয়াছি, যেমন নারীজাতির অবস্থা, বিবাহের বয়স, বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ। ফিকের গ্রন্থ প্রথম ৫৩৭টি জাতক অবলম্বন করিয়া রচিত। আমি পরবর্ত্তী দশটি জাতক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। নিম্নে আরও কয়েকটি শব্দ প্রদত্ত হইল :

কুল—বদরি ফল। পালি 'কোল'; সংস্কৃত 'কাল' বা 'কুবল'। 'বদরি' হইতে পুর্ব্ববঙ্গের 'বরই'।

কুলো—শূর্পের (শূপের) প্রাদেশিক নাম ('ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো')। পালি 'কুল্লক'। গু—(বিষ্ঠা)। পালি ও সংস্কৃতে 'গুথ'। বাঙ্গলা 'ঘুটে' শব্দটি ইহারই রূপান্তর কি না, তাহা বিবেচ্য।

জুজু—পালি 'জূজক' বিশ্বন্তর-জাতকবর্ণিত এক নিষ্ঠুর (অতিবিয়ো ফরুসো) এবং বিষণাকায় ('অট্ঠারস পুরিসদোস'-যুক্ত) বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এ ব্যক্তি বিশ্বন্তরের পুত্র জালিকুমার এবং কন্যা কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া গিয়াছিল এবং পথে তাহাদিগকে বড় কষ্ট দিয়াছিল। এখন আমরা ছোট ছেলেদিগকে "জুজু আসিতেছে" বলিয়া ভয় দেখাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে এদেশের

---

[১]। সম্প্রতি ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, এমএ মহোদয় ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থের অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়াছেন।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশ্বন্তরের কাহিনী জানিত।

টাট—দেবপূজায় ব্যবহৃত তাম্রপাত্রবিশেষ। পালি ‘তট্টক’। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাই নাই।

থলি—পালি ‘থবিকা’; সংস্কৃত ‘স্থবিকা’(?)।

পলিতা—(পল্‌তে)-পালি ‘পিলোতিকা’, সংস্কৃত ‘প্লোতিকা’ বা ‘প্রোতিকা’।

বস্তা—পালি ‘ভস্তা’, সংস্কৃত ‘ভস্ত্রা’। সমুবস্ত্রা = ছাতুর বস্তা।

বাড়া (ভাত)—পালি ‘বড্‌ঢন’। রতন-পাত্র হইতে পরিবেশণের জন্য ভাত তোলার নাম ভাত বাড়া। ইহা ণিজন্ত বৃধ-ধাতুজ।

শাড়ী—পালি ‘শাটক’, সংস্কৃত ‘শাট’, ‘শাটক’।

পূর্ব্ব প্রচলিত কতকগুলি শব্দ এখন অচল হইয়াছে; সেগুলিকে আবার চালাইতে পারিলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এ কথাও প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদকালে আমি এইরূপ আরও কয়েকটি শব্দ পাইয়াছি। তন্মধ্যে ‘আজ্ঞাসম্পন্ন’ (of commanding presence—চেহারা দেখিলেই যাহার আদেশ মানিয়া চলিতে হয়), উত্তান (চিৎ), গণদান (চাঁদা তুলিয়া যে দান করা হয়), পন্থঘাতক (বাটপার, Highwayman), সংবহুল (করা) অর্থাৎ মতভেদ ঘটিলে Vote লইয়া মীমাংসা করা, সন্ধিচ্ছেদক (সিঁদেল চোর) প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যনাথ গ্রাম
৩০মে কার্ত্তিক ১৩২৭   শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

☞ ৭৪৩ পৃষ্ঠে ‘মন্ত্র’ শব্দে বেদ বুঝিতে হইবে।

☞ ৮০৭ পৃষ্ঠে ‘ভরু’-জাতক লেখা হইয়াছে। সংস্কৃত ‘ভৃগু’ শব্দ পালিতে ‘ভরু’। সংস্কৃত ‘ভৃগুকচ্ছ’; পালি ‘ভরুকচ্ছ’।

☞ ৯৬৭ পৃষ্ঠের পাদটীকায় ষষ্টিবৎসর বয়স্ক হস্তীর কথা বলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও ষষ্টিহায়ন কুঞ্জরের উৎকর্ষ বর্ণিত আছে (রামায়ণ, আযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭/২০)।

জাতকের পুরাতত্ত্ব

[এই অংশে মধ্যে মধ্যে যে সকল অঙ্ক আছে, সেগুলি জাতকের সংখ্যানির্দ্দেশক]

(ক) জাতিভেদ

পালি-সাহিত্যে জাতিভেদের উল্লেখ

বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলবাদী; তাঁহাদের মতে কর্মশুদ্ধিই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়; তাঁহাদের সঙ্ঘে নাপিতজাতীয় উপালি বিনয়ধর হইয়াছিলেন, কৈবর্ত্ত কুলজ লোসক (৪১) এবং দাসের ঔরসে শ্রেষ্ঠীকন্যার গর্ভজাত মহাপন্থক ও চুল্লপন্থক [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪)] অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়াছিলেন, "যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীসকল সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না; তখন তাহারা সকলেই 'শ্রমণ' পদবাচ্য হয়।" কিন্তু এ অবস্থা ছিল কেবল ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে; সঙ্ঘের বাহিরে, গৃহীদিগের মধ্যে, জাতিভেদ যে অপরিহার্য্য, বৌদ্ধেরাও তাহা মানিতেন এবং নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল বলিয়া মনে করিতেন।

ভিক্ষুরাও যে পুরুষ-পরম্পরাগত জাত্যাভিমান সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা নহে। ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, জেতবন বিহারের একজন ভিক্ষু আস্পর্দ্ধা করিতেন যে জাতি ও গোত্রে কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে, কেন না তাঁহার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। দেবদত্ত এবং কোকালিকও [জম্বুখাদক (২৯৪)] পরস্পরের সম্বন্ধে বিকত্থন করিয়া বেড়াইতেন, কোকালিক বলিতেন, "দেবদত্ত ইক্ষাকুকুলের ধুরন্ধর"; দেবদত্ত বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণ"। অদ্যাপি সিংহলের বিহারসমূহে উচ্চজাতীয় ভিক্ষুরা নিম্নজাতীয় ভিক্ষুদিগের সহিত সমানভাবে মিশেন না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য

যখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশে ব্রাহ্মণেরা সমাজে যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। জাতকের নিদানকথায় এবং ললিতবিস্তরে দেখা যায়, গৌতমবুদ্ধ ধরাধামে আবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কেন না তখন ক্ষত্রিয়েরাই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সংস্কারবশতঃ, পালিগ্রন্থসমূহে যেখানে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির নামোল্লেখ আছে, প্রায় সেই সেই খানেই প্রথমে 'ক্ষত্রিয়' পরে ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে [বিনয়পিটক (৯/১,৪); শীলমীমাংসা (৩৬২); উদ্দালক (৪৮৭) ইত্যাদি]। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডবাসী ক্ষত্রিয়েরা এমনই জাত্যভিমানী হইয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেও দেখিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দিতেন না [দীর্ঘনিকায় (৩/২৬)] শাক্যদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ তাঁহাদের সভাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কেবল আসন না দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা স্ব স্ব উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া এমন অট্টহাস্য করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণকে অপ্রতিভ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। বারাণসী রাজ অরিন্দম প্রত্যেকবুদ্ধ শোণককে "অয়ং ব্রাহ্মণো হীনজচ্চো" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন [শোণক (৫২৯)। প্রাচ্যক্ষত্রিয়েরা কি জন্য এইরূপ জাত্যভিমানী হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা

অতি প্রাচীনকালেও জ্ঞানে ও মর্য্যাদায় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের প্রায় তুল্যকক্ষ ছিল অবতার। ঊনপঞ্চাশৎ পবরপ্রবর্ত্তক ঋষির মধ্যে ২১ জন ব্রাহ্মণ, ১৯ জন ক্ষত্রিয় এবং ৯ জন বৈশ্য। যে সাবিত্রী দেবের মাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, তিনি প্রথমে এক ক্ষত্রিয় মহর্ষিকেই দেখা দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলটী এবং আরও বহু সূক্ত তাঁহার ও তদীয় বংশধরদিগের নামেই প্রচলিত হইয়াছে। যে উপনিষদগুলি আর্য্যজাতির প্রধান গৌরবের বিষয়, ক্ষত্রিয়েরাও তাহাদের আলোচনায় সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। যিনি উপনিষদরূপ কামধেনু দোহন করিয়াছিলেন এবং যিনি দোহনকালে বৎসরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয়। সমগ্র হিন্দুজাতি যাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তিনজনই ক্ষত্রিয়কুলজাত। আর্য্যেরা যতই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। মিথিলার ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক যে ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুস্থানীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরকালে যে দুই মহাপুরুষ মোক্ষলাভের যে দুইটি প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাও প্রাচ্য ক্ষত্রিয়-বৈশালীর লিচ্ছবিকুলজ মহাবীর এবং কপিলবস্তুর শাক্যকুলজ সিদ্ধার্থ।

ক্ষত্রিয়দিগের বেদাধ্যয়ন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন

জাতকপাঠেও দেখা যায়, বিদ্যাশিক্ষায় ও বেদাধ্যয়নে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজপুত্রেরা ষোড়শবর্ষ বয়সে বিদ্যালাভার্থ তক্ষশিলার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল অষ্টাদশ শিল্প বা বিদ্যা। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চতুর্ব্বেদের নাম আছে। কোন কোন জাতকে ইহার সঙ্গে বেদত্রয় (তয়ো বেদো) বিশিষ্টরূপেও উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্মেধোজাতকের (৫০) ব্রহ্মদত্তকুমার তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে পারগ হইয়াছিল বারাণসীরাজপুত্র অসদৃশকুমার [অসদৃশ (১৮১)] তক্ষশিলায় গিয়া তিনি বেদ ও অষ্টাদশ শিল্পে বুৎপন্ন হইয়াছিলেন; ধোনসাখ জাতকে (৩৫৩) যে অধ্যাপকের কথা আছে, তিনি জম্মুদ্বীপের বহু ক্ষত্রিয়-কুমার ও ব্রাহ্মণকুমারকে বেদত্রয় শিক্ষাদিতেন। গ্রামণিচণ্ড-জাতক বর্ণিত (২৫৭) রাজপুত্র আদর্শমুখ তক্ষশিলায় যান নাই, গৃহে থাকিয়াই পিতার নিকটে বেদত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ জাতকের বহু আখ্যায়িকায় ক্ষত্রিয়দিগের, বিশেষতঃ রাজপুত্রদিগের, এইরূপ বেদাধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহে ফিরতেন এবং পরিণত বয়সে প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতেন। ইহাতে বোধ হয়, ক্ষত্রিয়েরাও অক্ষরে অক্ষরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া চলিতেন। কেশ পলিত হইতেছে দেখিয়া মিথিলারাজ মখাদেব [মখাদেব (৯)] এবং বারাণসীরাজ শ্রুতসোম [চুল্লশ্রুতসোম (৫২৫)] সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কুদ্দালপণ্ডিতের [কুদ্দাল (৭০)] রিপুবিজয়োল্লাস দেখিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। জাতকের আরও অনেক আখ্যায়িকায় রাজাদিগের এইরূপ মুনিবৃত্তি আবলম্বনের কথা আছে। কোন কোন রাজকুমার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন না করিয়াও আরণ্যক হইতেন। যুবরাজ যুবঞ্জয় [যুবঞ্জয় (৪৬০)] পিতার জীবদ্দশাতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; তেমিয় কুমার ত জন্মাবধিই ভোগে অনাসক্ত ছিলেন এবং ষোড়শবর্ষ বয়সে প্রব্রাজক হইয়া ছিলেন [মূকপঙ্গু (৫৩৮)]।

পালি সাহিত্যে ক্ষত্রিয় শব্দে কি বুঝায়?

পালি সাহিত্যে যে ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে, কেবল যোদ্ধা বলিলে তাঁহদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ অন্যান্য বর্ণের লোকেও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিত এবং ‘যোধ’ নামে আভিহিত হইত। জাতকের ক্ষত্রিয়েরা ‘রাজন্য’, অর্থাৎ তাঁহারা রাজা না হইলেও রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় “রাজা” ও “ক্ষত্রিয়” শব্দ একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে [সোমদত্ত (২১১), রথলট্‌ঠি

(৩৩২), মণিকুণ্ডল (৩৫১), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫), সুমঙ্গল (৪২০), গণ্ডতিণ্ড (৫২০), ত্রিশকুন (৫২১)]। পালি অভিধানে 'রাজা' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাতেও এই প্রয়োগেরই সমর্থন হয়। "রাজানো নাম পঠব্যা রাজা পদেশরাজা মণ্ডলিকরাজা অন্তরভোগিকা, অক্খদস্সা মহামত্তা যে বা পন ছেজ্জভেজ্জং অনুসাসন্তি এতে রাজানো নাম" আর্থৎ 'রাজা' শব্দে পৃথিবীপতি, প্রদেশপতি, মণ্ডল, প্রত্যন্তের শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা মহামাত্র এবং যাঁহারা প্রাণদণ্ডবিধান করিতে পারেন, এই সকল ব্যক্তিকে বুঝায়। রাজা বা রাজন্যগণ দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বিদ্যার্জ্জনে ও শীলরক্ষণে পশ্চাৎপদ ছিলেন না; কাজেই তাঁহারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ন-সংস্থানের জন্য কোনরূপ হীনবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইত না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ব্রাহ্মণের অবনতি

এদিকে ব্রাক্ষণদিগের মধ্যে অনেক অনাচার দেখা দিয়াছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ অসিজীবি হইয়া সৈনাপত্য প্রভৃতি উচ্চ সৈনিকপদ লাভ করিতেন [শরভঙ্গ (৫২২)]। ইহা তত দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে দ্রোণাচর্য্য প্রভৃতি এ পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অসি লইয়াই জাতকবর্ণিত অনেক ব্রাহ্মণ অটবি-আরক্ষিকের কাজ করিতেন, অর্থাৎ সার্থবাহদিগের দস্যুভয় নিরাকরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন [দশব্রাহ্ম (৪৯৫), কখনও বা নিজেরাই পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও প্রাণান্ত করিতেন [মহাকৃষ্ণ (৪৬৯)]। তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন [শৃগাল (১১৩), সুসীম (১৬৩), জ্যোৎস্না (৪৫৬); কেহ কেহ বৈশ্যাদিগের ন্যায় স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতেন (সোমদত্ত (২১১), উরগ (৩৫৪)]; পণ্যভাণ্ড মাথায় লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়াইতেন [গর্গ (১৫৫)]; বিক্রয়ের জন্য ছাগ ও মেষ পালন করিতেন [ধূমকারী (৪১৩, দশ-ব্রাহ্মণ (৪৯৫)]; সূত্রধারের কাজ করিতেন [স্পন্দন (৪৭৫)], অহিতুণ্ডিক হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন [চাম্পেয় (৫০৬)], ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না (চুল্লনন্দিক (২২২)][1] তবে এই সকল হীনকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানকালের বর্ণব্রাহ্মণদিগের স্থানীয় ছিলেন কি না তাহা বিবেচ্য।

ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াও ব্রাহ্মণেরা ধনোপার্জ্জন করিতেন। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে বাস্তুবিদ্যাবলে বাস্তুভূমির কোন অংশে অমঙ্গলকর শল্য প্রোথিত আছে কি না জানিতে পারা যায় [গ্রামণিচণ্ড (২৫৭), সুরুচি (৪৮৯)], অসির আঘ্রাণ

---

[1]। মৃচ্ছকটিকে আমরা একজন চৌরবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাই।

লইয়া উহার ব্যবহারে শুভ বা অশুভ হইবে বলিতে পারা যায় [অসিলক্ষণ (১২৬)]; গ্রহাদির অবস্থান দেখিয়া কিংবা অঙ্গলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাগ্য গণিতে পারা যায় [পঞ্চায়ুধ (৫৫), অলীনচিত্ত (১৫৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিদ্যা শিখিতেন, কেহ কেহ উৎকোচ পাইলে, কিংবা অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা গণনা করিতেন [নক্ষত্র (৪৯), অসিলক্ষণ (১২৬), কুণাল (৫৩৬)], এবং ধনী লোকে দুস্বপ্ন দেখিলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ঘটা করিয়া প্রচুর অর্থ পাইতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লৌহকুম্ভি (৩১৪)]।[১] ব্রাহ্মণেরা যে সকল হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাও অর্থলোভে কিংবা ঈর্ষ্যাবশে সময়ে সময়ে নানারূপ দুষ্কার্য্য করিতেন [পদকুশল-মাণব (৪৩২), খণ্ডহাল (৫৪২), মহাউম্মার্গ (৫৪৬)]। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডে অনেক ব্রাহ্মণ ঘোর বিষয়ী হইয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা ঐহিক ঐশ্বর্য্যেই অধিক আসক্তি দেখাইতেন।

ব্রহ্মবন্ধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ; উদীচ্য ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ-চরিত্রের অপকর্ষসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বৌদ্ধদিগের হাতে অতিরঞ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অতিরঞ্জনের মধ্যেও যে সত্যের আভাস পাওয়া যায় না, এমন নহে। সম্ভবতঃ মগধ প্রভৃতি প্রাচ্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই এইরূপ চরিত্রভ্রংশ দেখা দিয়াছিল। ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া' ব্রহ্মবন্ধু' বলা উচিত। 'ব্রহ্মবন্ধুভূমি' বলিয়া প্রাচীনকালেই মগধের একটা দুর্নাম রটিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকেরা এই সকল ব্রহ্মবন্ধুরই চরিত্রহীতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-যুক্ত, তাঁহাদিগের নিন্দাবাদ করেন নাই, বরং প্রশংসাই করিয়াছেন। পালি সাহিত্যে প্রশংসার্হ ব্রাহ্মণদিগের অনেকে উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরদেশের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত [সত্যংকিল (৭৩), মহাস্বপ্ন (৭৭), ভীমসেন (৮০), সুরাপান (৮১), মঙ্গল (৮৭), পরসহস্র (৯৯), তিত্তির (১১৭), অকালরাবী (১১৯), আম্র (১২৪), লাঙ্গুষ্ঠ (১৪৪), একপর্ণ (১৪৯), শতধর্ম্মা (১৭৯), শ্বেতকেতু (৩৭৭), নলিনীকা (৫২৬) মহাবোধি (৫২৮)]। উত্তরদেশ বলিলে উত্তরের নহে, উত্তরপশ্চিমের অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি পবিত্র-ভূমির বুঝিতে হইবে। জাতকের উদীচ্য ব্রাহ্মণেরা কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া কাশী, কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন,

---

[১]। যাহারা স্বপ্নের ফলাফল গণণা করিত, তাহাদের নাম ছিল স্বপ্ন-পাঠক [কুণাল (৫৩৬)}।

এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণশ্রমধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করিতেন। বৌদ্ধেরা শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতেন; শ্রমণ, ব্রাহ্মণ উভয়েই তাঁহাদের নিকট সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন [মহিলামুখ (২৬), মৃদুলক্ষণা (৬৬)]। ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণবর্গে শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাতকে যত অধ্যাপকের বর্ণনা আছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; কোথাও কোন ক্ষত্রিয় আধ্যাপক দেখা যায় না।

গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড

পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের যে চারিটি বিশিষ্ট অধিকার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে একটির নাম 'অবধ্যতা।' জাতকে কিন্তু দেখা যায়, আপরাধ-বিশেষে ব্রাহ্মণদিগেরও প্রাণদণ্ড হইত [বদ্ধনমোক্ষ (১২০), পদকুশল-মাণব (৪৩২)]। ব্রাহ্মণদিগের এই অধিকারলোপ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল কি না ইহা বিবেচনার বিষয়। মৃচ্ছকটিকনায়ক চারুদত্তের বিচারকালে বিচারপতি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ অবধ্য; তথাপি রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন।

সবর্ণে বিবাহ

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন ছিল। অনেক আখ্যায়িকাতে অন্যান্য জাতির মধ্যেও সমজাতিকুল হইতে পাত্রীগ্রহণের প্রথা দেখা যায়। [শৃগাল (১৫২), অসিতাভূ (২৩৪), উরগ (৩৫৪), সুবর্ণমৃগ (৩৫৯), কাত্যায়নী (৪১৭) ইত্যাদি]। তবে অসবর্ণ-বিবাহ যে একেবারেই ছিল না, ইহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকের বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু উভয় অংশেই এই প্রথার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকাগর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন [উদ্দালক (৪৮৭)]; রাজারাও সময়ে সময়ে "স্ত্রীরত্নংদুষ্কুলাদপি" সংগ্রহ করিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মালাকার কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]; বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক কাষ্ঠহারিণীকে মহিষী করিয়াছিলেন [কাষ্ঠহারী (৭)]। বাহ্য (১০৮) ও সুজাত (৩০৬) জাতকেও রাজাদিগের এইরূপ খামখেয়ালির কথা আছে। কিন্তু লোকে যে এরূপ বিবাহ-জাত সন্তানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, ভদ্রশাল জাতকের (৪৬৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। শাক্যবংশীয় মহানামার ঔরসে নাগমুণ্ডা নারী দাসীর গর্ভে বাসভক্ষত্রিয়ার জন্ম হয় এবং প্রসেনজিৎ ঐ কন্যাকে শাক্যকুলজাতা মনে করিয়া বিবাহ করেন। বাসভ ক্ষত্রিয়ার পুত্র বিরূঢ়ক যখন কপিলবস্তুতে মাতুলকুলের সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখন তিনি যে আসনে বসিয়াছিলেন, তাহা অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া

শাক্যেরা উহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে ধৌত করাইয়াছিলেন[১]। বাসভক্ষত্রিয়া যে দাসীকন্যা, এই ঘটনা হইতেই প্রসেনজিৎ তাহা প্রথম জানিতে পারেন এবং তিনি বাসভক্ষত্রিয়া ও বিরূঢ়ক উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, "মহারাজ, মাতৃকুলের উৎকর্ষাপকর্ষে কিছু আসিয়া যায় না; পিতার জাতিগোত্রই অভিজাত্যের পরিচায়ক।" কিন্তু বুদ্ধদেবের এই উদারনীতি সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। যাঁহারা "অসম্ভিন্নক্ষত্রিয়বংশজাত" [শোণক(৫২৯)], অর্থাৎ যাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় (মাতাপিতুসু খত্তিয়), তাঁহারাই ক্ষত্রিয়সমাজে শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া বিদিত ছিলেন [কুক্কুর (২২), ত্রিশকুন (৫২১)]। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যাঁহাদের পিতৃকুলেও মাতৃকুলে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জাতিগত কোন কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন।

জাত্যাভিমান

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের জাত্যভিমান সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যায়িকা বেশ কৌতুকাবহ। উপসাঢ় নামক এক ব্রাহ্মণ, পাছে যেখানে কোন শূদ্রের শব দগ্ধ করা হইয়াছে, এমন কোথাও তাঁহার সৎকার হয়, এই ভয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকিতেন এবং পবিত্র শ্মশান খুঁজিয়া বেড়াইতেন [উপসাঢ় (১৬৬)]। শাক্যবংশীয় মহানামা যে কৌশলে নিজের ঔরসজাতা কন্যা বাসভক্ষত্রিয়ার সহিত একপাত্রে অন্ন গ্রহণ করা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহাও বেশ হাস্যজনক [ভদ্রশাল (৪৬৫)]।

গৃহপতি

কোন কোন জাতকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পর 'গৃহপতি' শব্দের প্রয়োগ আছে [দুর্মেধো (৫০), পঞ্চগুরু (১৩২), মহাপিঙ্গল (২৪০)]। যিনি গৃহস্থ-স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, 'গৃহপতি' শব্দের এই অর্থ ধরিলে সর্ব্ববর্ণের লোকেই গৃহপতি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পালি-সাহিত্যে গৃহপতি শব্দটি বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ

---

[১]। এইরূপে অপমানিত হইয়া বিরূঢ়ক যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি রাজা হইলে এই আসন তোমাদের কণ্ঠরক্তে আবার ধৌওয়াইব—তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। Tarentum নগরের গ্রীক অধিবাসীরা যখন রোমকদূত Postumius -এর শুভ্র বস্ত্রে মল নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই বীরপুরুষও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "এই পরিচ্ছদ তোমাদেরই রক্তস্রোতে ধৌত হইবে।" কিরূপে Beneventum-এর যুদ্ধে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তাহা পুরাবৃত্ত—পাঠকের সুবিদিত।

গৃহপতি। সৌমনস্য জাতকের (৫০৫) এক বণিক্ গৃহপতির পরিচয় পাওয়া যায়; সুতনো-জাতক-বর্ণিত গৃহপতি এমন দুঃস্থ ছিলেন যে তাঁহার পুত্রকে মজুর খাটিয়া সংসার চালাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় 'গৃহপতি' পদ কুলক্রমাগত ছিল এবং গৃহপতিদিগের মধ্যে ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সর্ব্বাবস্থার লোকই দেখা যাইত। যাঁহারা 'শ্রেষ্ঠী' নামে বিদিত, তাঁহারাই গৃহপতিসমাজে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইঁহারা যে বৈশ্যদিগের স্থানীয়, এ অনুমান ও অসঙ্গত নহে, কারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের পরেই 'গৃহপতিদিগের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বোধ হয় রাজকর দিতে হইত না; গৃহপতিরা কর দিতেন।

কুটুম্বিক

আর এক শ্রেণীর লোক 'কুটুম্বিক' নামে বর্ণিত। কুটুম্বিকেরা গৃহপতিদিগেরই স্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'যাঁহারা নগরবাসী, তাঁহারা সম্ভবতঃ কুসীদজীবী ছিলেন [শতপত্র (২৭৯), সুত্যজ (৩২০)]; এবং কেহ কেহ ধান্যাদি শস্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন [শ্যালক (২৪৯)]। মুনিক-জাতকে (৩০) দেখা যায় কোন নগরবাসী কুলপুত্র নিজের একপুত্রের সহিত এক পল্লীবাসী কুটুম্বিকের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পল্লীবাসী কুটুম্বিকেরা বোধ হয় বর্ত্তমানকালের তালুকদার বা যোর্ত্দারদিগের স্থানীয় ছিলেন।

শূদ্র

হিন্দুসমাজের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কথা বলা হইল। জাতকে 'বৈশ্য' প্রয়োগের ন্যায় 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগও নিতান্ত বিরল। যতদুর স্মরণ হয় তাহাতে কেবল দুইটি জাতকে 'বেশ্য' শব্দ পাইয়াছি : দশ ব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা কৃষি, বাণিজ্য ও ছাগ পালন করে এবং সুবর্ণ-লোভে আপনাদের কন্যাদিগকে অন্যের ভোগে নিয়োজিত করে এই কথা বলা হইয়াছে, এবং বিশ্বন্তর জাতকে (৫৪৭) একটা বৈশ্য-বীথির উল্লেখ আছে। শূদ্র শব্দের প্রয়োগ ত একেবারেই নাই, দুই একটি আখ্যায়িকায় [যেমন উপসাঢ়-জাতকে (১৬৬) 'বৃষল' শব্দ দেখা যায়। কিন্তু 'বৃষল' শব্দে শূদ্র এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিও বুঝায়। বেণ, পুক্কস, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি মনুর মতে শূদ্র নহে, বর্ণসঙ্কর। ফলতঃ খাঁটি শূদ্র বলিলে যে কি বুঝাইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখনও যাহারা শূদ্রপদবাচ্য, তাহারা প্রায় সকলেই 'অন্তরপ্রভব'।

নীচজাতি

সুত্তবিভঙ্গে নলকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় (পালি 'পেসকার'), চর্ম্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কস এই কয়েকটি অন্ত্যজ জাতির নাম আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি হীনশিল্পী এবং শেষের পাঁচটি হীনজাতি বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী আর্য্যেরা যখন সভ্য ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন ‘হীন’ ব্যবসায়গুলি অনার্য্যদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং লোকে সাধারণতঃ বংশানুক্রমে এক একটি ব্যবসায় করিত বলিয়া জাতিবিভাগ ব্যবসায়মূলক হইয়াছিল। কাজে কাজেই হীন জাতির ব্যবসায় হীন ব্যবসায় এবং হীনব্যবসায়ী হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন ব্যবসায়ই যে স্বভাবতঃ হীন, ইহা বলিবার কোন কারণ নাই, কারণ সমাজরক্ষার জন্য সকল ব্যবসায়েরই একটা না একটা উপযোগিতা আছে।

উল্লিখিত জাতিনিচয়ের মধ্যে নলকার, চর্ম্মকারও চণ্ডাল এখনও সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। কুম্ভকার তন্তুবায় ও নাপিত উন্নতিলাভ করিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অপর কয়েকটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিরূপণ করা বর্ত্তমান সময়ে সহজ নহে। মনুর মতে বেণদিগের বৃত্তি ‘ভাণ্ডবাদনম্’, অর্থাৎ ইহারা খোল, করতাল ইত্যাদি লইয়া বাদ্য করিয়া বেড়াইত। ভেরীবাদ (৫৯) ও শঙ্খধ্ম (৬০) জাতকে আমরা এই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। মনু বলিয়াছেন (১০/৪৯) পুক্কসেরা ‘বিলৌকবধবন্ধন’ দ্বারা, অর্থাৎ যে সকল জন্তু গর্ত্তে থাকে (যেমন গোধা, শল্লকী), তাহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা নিষাদ-বৃত্তিরই রূপান্তর। আমার মনে হয় বেণ, পুক্কস, নিষাদ ও চণ্ডাল বর্ত্তমানকালে এক সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া চণ্ডাল নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতায় এবং জাতকে চণ্ডালের স্থান অতি নীচ। ইহারা গ্রামের বাহিরে থাকিবে, সাধুরা ইহাদিগকে সাক্ষাৎ অন্ন দিবেন না, ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পাত্রে অন্ন দেওয়াইবেন, দৈবকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানকালে ইহাদের মুখদর্শন করিতে নাই; ইহারা রাত্রিকালে কদাচ গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহারা নগরাদি হইতে অনাথ শব বাহির করিবে, প্রাণদণ্ড-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শূলারোপণাদি করিবে—চণ্ডালের সম্বন্ধে মনুর এই সকল উৎকট ব্যবস্থা। জাতকেও দেখা যায় চণ্ডালেরা ‘বহিনগরে’ বাস করে [আম্র (৪৭৪), মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্তসম্ভূত (৪৯৮)]। চণ্ডারপুত্র চিত্তও সম্ভুত বাঁশ নাচান[১] দেখাইতে গিয়াছিল, তাহাও উজ্জয়িনীর প্রাকারের বাহিরে থাকিয়া। চণ্ডাল-স্পৃষ্টবায়ু স্পর্শ করিলে দেহ অপবিত্র হইবে, এই আশঙ্কায় উদীচ্য ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, “নস্‌স চণ্ডাল কালকণ্নি, আধোবাতং যাহি” [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াও চণ্ডালন্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণেরা মনের দুঃখে প্রাণ পর্য্যন্ত

---

[১]। বংশ-ধোপনং—ইহা একপ্রকার ক্রীড়া। ইহাতে এমন কৌশলে আঙ্গুলের আগায় বাঁশ দাঁড় করান হয় যে, এক আঙ্গুল হইতে আর এক আঙ্গুলে, কিংবা এক হাত হইতে অন্য হাতে লইবার কালে বাঁশখানি পড়িয়া যায় না, ঠিক সোজাভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে।

ত্যাগ করিতেন। বারাণসীর ষোল হাজার ব্রাহ্মণ একবার না জানিয়া চণ্ডালের উচ্চিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য সমাজচ্যুত করা হইয়াছিল [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। চণ্ডালন্নের এইরূপ দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বুদ্ধদেব শ্বেতকেতু-জাতকের প্রতুৎপন্ন বস্তুতে বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ ও চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট-ভোজন উভয়ই তুল্য।

চণ্ডালের সস্পর্শে আসা দূরে থাকুক, তাহার দর্শনেও মহা অমঙ্গল সূচিত হইত। দৃষ্টমঙ্গলিকা[১] শ্রেষ্ঠিকন্যা [মাতঙ্গ (৪৯৭) উদ্যানকেলির জন্য বাহিরে যাইবারকালে পথে চণ্ডালকুলজ মাতঙ্গকে দেখিয়া অমঙ্গল-নিরাকরণের জন্য গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচরেরা মাতঙ্গকে দারুণ প্রহার করিয়া নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল। এই মাতঙ্গই শেষে শ্রেষ্ঠীর দ্বারে ধরণা দিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা করিতে পারিয়াছিলেন কেবল তিনি বোধিসত্ত্ব বলিয়া, কেন না বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে বোধিসত্ত্বদিগের কোন সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয় না। চিত্ত ও সম্ভূতকে (৪৯৮) দেখিয়া ও উজ্জয়িনীর এক শ্রেষ্ঠীকন্যা ও এক পুরোহিতকন্যা গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়াছিলেন, এবং চণ্ডালে দেখিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের জন্য যে খাদ্য-পানীয় যাইতেছিল, তাহা অপবিত্র ও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আম্র-জাতকে (৪৭৪) লিখিত আছে, এক ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিখিবার জন্য কোন চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু শেষে লজ্জাবশত লোকের নিকট গুরুর নাম গোপন করায় তাহার সেই অধীত বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছিল। উপরে যে শ্বেতকেতুর কথা বলা হইয়াছে, তিনি চণ্ডালের নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহার দুই পায়ের ভিতর দিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়া বারাণসী ছাড়িয়া তক্ষশিলায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) কিন্তু দেখা যায়, চণ্ডালদিগের মধ্যেও পাণ্ডিত্য থাকিলে লোকে তাহাদের গুণ গ্রহণ করিত।

চণ্ডাল ভাষা

চণ্ডালেরা নগরের বাহিরে থাকিত, শিক্ষিত লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে

---

[১]। দৃষ্টমঙ্গলিক বা দৃষ্টমঙ্গলিকা প্রকৃত পক্ষে কোন নাম নহে। মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) দেখা যায়, যাহারা নিমিত্তের শুভাশুভ ফলে বিশ্বাস করে, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ– দৃষ্টমঙ্গলিক, শ্রুতমঙ্গলিকও মৃষ্টমঙ্গলিক, অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট পদার্থ হইতে শুভ আশা করে, যাহারা শ্রুত শব্দ হইতে শুভ আশা করে এবং যাহারা মৃষ্ট বা স্পৃষ্ট দ্রব্য হইতে শুভ আশা করে।

পারিত না; এই জন্য তাহাদের ভাষাও ভদ্র-সমাজের ভাষা হইতে পৃথক ছিল। চিত্ত ও সম্ভূত ব্রাহ্মণ সাজিয়া তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণাচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন অসাবধানতাবশত চণ্ডালভাষায় কথা বলায় ধরা পড়িয়াছিল।

কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত

কুম্ভকার-শিল্পের হীনতাসম্বন্ধে জাতকে কোন উল্লেখ নাই। ভীমসেন-জাতকে (৮০) বোধিসত্ত্ব তন্তুবায়শিল্পকে "লামক কম্ম" বলিয়াছেন। শৃগাল-জাতকে (১৫২) বৈশালীর এক নাপিত আপনাকে হীনজাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, নাপিত গঙ্গমাল প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াও রাজা উদয়কে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া রাজমাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং "হীন জচ্চো মলমজ্জনো নহাপিতপুত্তো" বলিয়া তাহাকে গালি দিয়াছিলেন। শৃগাল-জাতকে বর্ণিত নাপিতের এই সকল কাজ দেখা যায়;—সে রাজা, রাজায় অন্তঃপুরাচারিণী রাজপুত্র ও রাজকন্যা দিগের, কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। 'নাপিত' শব্দটি স্না ধাতু হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'স্না,' পালিতে 'নহা' (বাঙ্গালা নাওয়া)। ণিজন্ত করিলে ইহা হইতে 'নহাপিত' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ যে স্নান করায়। এখনও হিন্দু সমাজে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে স্নান করাইবার জন্য নাপিতের প্রয়োজন হয়; পশ্চিমাঞ্চলে 'নৌয়ারা' এখন ও লোকের গায়ে তেল মাখায় ও হাত পা টিপিয়া দেয়।

এই প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে জাতিভেদ গৃহীর পক্ষে; প্রব্রাজকদিগের মধ্যে জাতিবিচার ছিল না। পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রব্রাজকদিগের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

(খ) প্রব্রাজক—প্রব্রজ্যা

ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, এমনকি পুত্রকলত্রাদির মায়াবন্ধনচ্ছেদন প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই দেখা যায়। যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ কান্দিয়া উঠিত, তখন লোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্পৎ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিত। চিরজীবন গৃহে থাকিলে ধর্ম্মার্জ্জানে ব্যাঘাত ঘটে, ঘৃতসংযোগ অগ্নির ন্যায় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইয়া আত্মাকে অধোগামী করে, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের, জন্য শেষজীবনে বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১] জাতক-পাঠে

---

[১]। সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দিগের ও গৃহত্যাগ ও মুনিবৃত্তিগ্রহণের অনেক দৃষ্টন্ত আছে।

প্রতীতি হয়, চতুরাশ্রমাবলম্বন-প্রথা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নহে, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত বলবতী ছিল। ইহাদের অনেকে ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার পর বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতির অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতেন এবং দেবগণ, ঋষিঋণ ও পিতৃণ পরিশোধানন্তর গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে যাইতেন। বনমধ্যে আশ্রম নির্ম্মিত হইত, ঋষিরা কখনও একাকী, কখনও অনেকে এক সঙ্গে আশ্রমে থাকিতেন এবং তপস্যানিরত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। যাঁহারা ঋষিসমাজে প্রধান হইতেন, লোকে তাহাদিগকে কুলপতি বা "গণশাস্তা" বলিত। তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি ছিলেন এবং বন্য ফলমূলেই জীবনধারণ করিতেন। হিমালয় পর্ব্বতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানই আশ্রামনির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

নারীদিগের প্রব্রজ্যা

নারীরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন [ন্যগ্রোধ-মৃগ (১২), অনুশোচীয় (৩২৮) কুম্ভকার (৪০৮), চুল্লবোধি (৪৪৩), হস্তিপাল (৫০৯), শোণনন্দ (৫৩২), শ্যাম (৫৪০)]। শোণ-নন্দ জাতকে কথিত আছে যে এক অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণদম্পতি পুত্রদ্বয়কে প্রব্রজ্যাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সমস্ত ধন বিতরণপূর্ব্বক নিজেরাও তাহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন।

কিরৎপাল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন করিবার পর ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণের প্রথা দেখা যায়; ঋষিরা "লবণ ও অম্লসেবনার্থ" পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেন; এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসী প্রভৃতি নগরে উপনীত হইতেন। লোকালয় প্রব্রাজকের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহারা এই সময়ে সচরাচর নগর বা গ্রামের বহিঃস্থ কোন উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তপস্যা ও ধ্যানবলে ঋষিদিগের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিত, তাঁহারা ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে পারিতেন। কেহ কোন প্রত্যেক বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইলে তাহার রক্ষা ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ নিরয় গমন করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]।

মিগাস্থিনিসেয় বিবরণীতে সন্ন্যাসীদিগের উল্লেখ

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে অনেক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা হঠাৎ আরও বৃদ্ধি হয়। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ যে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, Sophistai অর্থাৎ পণ্ডিত সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। তিনি এই সম্প্রদায়কে

আবার 'ব্রাহ্মণ' ও 'শ্রমণ' এই দুই শাখায় পৃথক করিয়া যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

অল্পবয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ

পিতৃঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণে নিষিদ্ধ থাকিলেও সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত। কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমার যে অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শিক্ষাসমাপ্তির পরেই প্রব্রজ্যা গ্রহণের বহু উদাহরণ দেখা যায় [সমৃদ্ধি (১৬৭), লোমশকাশ্যপ (৪৩৩), কৃষ্ণ (৪৪০), শোণনন্দ (৫৩২)]। বংশধরদিগের মধ্যে কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয়, এই বিশ্বাসে মাতা, পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা, আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং কোন কোন সময়ে উৎসাহ দিয়া বালকদিগকে গৃহত্যাগে প্রবর্ত্তিত করিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪), অশাতমন্ত্র (৬১), সংস্তব (১৬২)]। সিংহলদ্বীপের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বংশের একটি সন্তানকে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করাইতে পারিলে গৃহস্থ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণে পুণ্য হয় বলিয়া লোকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইলে সময়ে সময়ে মানত করিত যে তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রাজক হইবে [কায়নির্ব্বিণ্ণ (২৯৩)]।

আচার্য্যগৃহেও সময়ে সময়ে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রব্রজ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। লাভগর্হ-জাতকে (২৮৭) দেখা যায় শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, লাভের উপায় কি? এবং আচার্য্য যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিল

ত্যাজি গৃহ, ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ,
নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যা-শরণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব; তাও ভাল বলি;
অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যান্য জাতিও প্রব্রজ্যা লইতেন। কল্যাণ ধর্ম্ম-জাতকের (১৭১) বোধিসত্ত্ব বারাণসী-শ্রেষ্ঠী ও বন্ধনাগার-জাতকের (২০১) বোধিসত্ত্ব একজন দরিদ্র গৃহপতি ছিলেন এবং ইহারা উভয়েই সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) মৎসরিশ্রেষ্ঠী মহাবিভস্পন্ন হইয়াও প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।

নীচজাতির প্রব্রজ্যা

জাতকবর্ণিত প্রব্রাজকদিগের মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরও অভাব নাই। কুদ্দল-পণ্ডিত (৭০) ছিলেন পর্ণিক; মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্ত ও সম্ভূত (৪৯৮)

ছিলেন চণ্ডাল এবং দুকুলক [(শ্যাম (৫৪০)] ছিলেন নিষাদ।

(গ) রাজা

রাজার অভিষেকে প্রজার অনুমোদন

পুরাবৃত্তবিদেরা বলেন অতি প্রাচীনকালে রাজপদ বংশগত ছিল না; লোকে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিত, সমাজরক্ষার জন্য তাঁহাকেই আপনাদের 'বিশ্‌পতি' বা 'বিশাম্পতি'রূপে নির্ব্বাচিত করিত। উলুক জাতকের (২৭০) অতীতবস্তুতে যে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এই মতেরই সমর্থন করে। তদনুসারে পৃথিবীর আদি রাজা "মহাসম্মত" অর্থাৎ যাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে ধরণ করিয়াছিল। উত্তরকালে রাজপদ বংশগত হইয়াছিল; রাজারা সময়ে সময়ে অত্যাচারও করিতেন; কিন্তু কি রামায়ণ ও মহাভারত, কি জাতকের আখ্যায়িকাবলী, হিন্দু, বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যে দেখা যায় নুতন রাজার অভিষেক-কালে প্রকৃতিপুঞ্জের, বিশেষতঃ অমাত্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, অনুমোদন আবশ্যক হইত।[১] পাদাঞ্জলি (২৪৭) এবং গ্রামণীচণ্ড (২৫৭) জাতকে বর্ণিত আছে যে অমাত্যেরা আভিষেকের পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাদাঞ্জলি এই পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা ভূতপূর্ব্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসককে রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজকুমার আদর্শমুখ শিশু হইলেও অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন; এজন্য তাঁহার অভিষেকে কাহার ও আপত্তি হয় নাই।

জাতকে রাজধর্ম্ম

ধার্ম্মিক রাজা দশবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন—দান, শীল, পরিত্যাগ,

---

[১]। সগর রাজার মৃত্যু হইলে প্রজারাই অংশুমান্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল (রামায়ণ, বাল, ৪২); দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্য দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি 'ব্রাহ্মণ, বলমুখ্য, পৌর ও জানপদবর্গের" মত লইয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, (২)। দশরথের মৃত্যু হইলে "রাজকর্ত্তৃগণ" সভাস্থ লইয়া তখনই ইক্ষাকুবংশীয় যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, (৬৭)। মহাভারতেও দেখা যায়, যযাতি প্রজার অভিপ্রায় বিনা পুরুষকে রাজ্য দান করিতে পারেন নাই। প্রজারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ যদু ও অন্যান্য অগ্রজ বিদ্যামান থাকিতে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরুষ রাজা হইতে পারেন না (মহাভারত, আদি, (৮৫); কিন্তু যযাতি পুরুষ গুণ ও অন্যান্য পুত্রদিগের দোষ প্রদর্শন করিয়া এবং শুক্রাচার্য্যের বয়ের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। প্রতীপের জোষ্ঠপুত্র দ্বেবাপি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার রাজ্যাভিষেকে যে আপত্তি করিয়াছিল, প্রভীপ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। (মহাভারত, উদ্যোগে, (১৪৬)।

অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন [দুর্মেধো (৫০), রাজাববাদ (১৫১), কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। যাঁহার এতগুলি গুণ থাকে, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কোন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজচরিতে বিশ্বাস নাই, সময়বিশেষে কোন রাজা হয়ত রাজা মহাপিঙ্গলের ন্যায় "অতি অধর্ম্মচারী ও অন্যায়পরায়ণ হইতেন, নিয়ত ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন-তাহাদিগের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদন করিতেন, এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন" [মহাপিঙ্গল (২৪০)]। গণ্ডতিন্দুজাতকে ও (৫২০) অধার্ম্মিক রাজা ও তাঁহার অধার্ম্মিক অমাত্যদিগের অতি হৃদয়বিদারক অত্যাচারের কথা আছে।

রাজশক্তি সীমাবদ্ধ

রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণেরও অনেক উপায় ছিল। ধর্ম্মাশাস্ত্রের নির্দেশ,[১] গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির উপদেশ- রাজাদিগকে এসমস্ত মানিয়া চলিতে হইত। তৈলপাত্র-জাতকে (৯৬) দেখা যায়, তক্ষশিলারাজ তাঁহার যক্ষীণী রাণীকে বলিয়াছিলেন, "ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই; আমি সমস্ত রাজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী বা দুরাচার, আমি কেবল তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান করিতে পারি।" কিন্তু সকল রাজা শাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলিতেন না, হিতৈষীর উপদেশেও কর্ণপাত করিতেন না। ইহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিবার লোকেরও অভাব ছিল না; কাজেই প্রজারা সময়ে সময়ে উৎপীড়িত হইত। বুদ্ধদেবের সময়েই কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে একদা তিনি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া নিরীহ স্থবির পিণ্ডোলভরদ্বাজকে যন্ত্রণা দিবার জন্য তাঁহার মস্তকে একটা তাম্রপিপীলিকার বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উৎকোচ পাইয়া বিচার করিতেন; তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধদেব উৎকোচগ্রাহী ভৃগুরাজের সমুদ্রপ্লাবনে বিনাশের কথা বলিয়াছিলেন [ভৃগু (২১৩)]। জাতকের অতীত বস্তুতেও আমরা অর্থলোভী [তণ্ডুলনালী (৫)], মদ্যাসক্ত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), ক্ষান্তিবাদী (৩১৩), চুল্লধর্ম্মপাল (৩৫৮)], মিথ্যাবাদী [চেদি (৪২২)] প্রভৃতি অনেক অধার্ম্মিক রাজার পরিচয় নাই। মন্ত্রীদিগের সৎপরামর্শে কাহারও

---

[১]। মনুসংহিতায় (৮/৩৩৬) অপরাধী রাজাকে দণ্ডদিবার ব্যবস্থা আছে। মনু বলেন, যে অপরাধে ইতর ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, সেই অপরাধে রাজা তাহার শতগুণ দণ্ড ভোগ করিবেন।

কাহারও চরিত্র সংশোধন হইত [তণ্ডুলনালী (৫), রথলট্‌ঠি (৩৩২), কুক্কু (৩৯৬), কিন্তু কখনও কখনও সর্ষপই ভূতাবিষ্ট হইত, কোন দুষ্ট আমাত্য বা পুরোহিত, সদুপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, রাজাকে বরং অধর্ম্মের পথই পরিচালিত করিতেন [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পাদকুশলমানব (৪৩২)]।

প্রজাবিদ্রোহ

রাজার অত্যাচার নিতান্ত দুর্ব্বহ হইলে প্রজারা কখনও কখনও বিদ্রোহী হইত এবং তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া নতুন রাজা নির্ব্বাচন করিত [সতংকিল (৭৩), মণিচোর (১৯৪), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। এ প্রসঙ্গে পাঠকেরা মৃচ্ছকটিক বর্ণিত "পালক" রাজার কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন।[১] সত্যংকিল ও পাদকুশলমানব জাতকে অত্যাচারীদিগের প্রাণনাশের পর যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ধার্ম্মিক রাজারা সময়ে সময়ে উত্তরকালীন বিক্রমাদিত্য ও হারুণ-উর-রসিদের ন্যায় ছদ্মবেশে প্রজার অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন এবং প্রজারা তাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে, স্বকর্ণে শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেন [রাজাববাদ (৫৫১), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]।

রাজ দর্শনে পুণ্য

লোকের বিশ্বাস ছিল, যে ধার্ম্মিক রাজদর্শনে পুণ্য হয় [দূত (২৬০)]; কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে "অকালে অতিবৃষ্টি হয়, অথচ যথাকালে বর্ষণ হয় না; রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করদিগের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া পড়ে [মণিচোর (১৯৪), কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]।

রাজপদ বংশগত উপরাজ

রাজপদ শেষে বংশগত (কুলসন্তক) হইয়াছিল [তৈলপাত্র (৯৬), চুল্লপম (৩৯৩) ইত্যাদি]। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে শিক্ষাসমাপ্তির পর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার জীবদ্দশায় 'উপরাজ' এবং দেহান্তে রাজা হইতেন [দুর্মেধো (৫০), তুষ (৩৩৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতাকেও 'উপরাজ' করিবার প্রথা ছিল [দেববধর্ম্ম (৬), অসদৃশ (১৮১), কামনীত (২২৮)]।[২]

---

[১]। বর্ত্তক-জাতকের (১১৮) বর্ত্তমানবস্তুতে বর্ণিত মধ্যভূমিতে নীয়মান শ্রেষ্ঠীপুত্রের আকস্মিক উদ্ধার এবং ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই উপায়ে মৃচ্ছকটিকনায়ক চারুদত্তের উদ্ধার স্মরণ করিলে অনুমান হয় যে শূদ্রক কবি জাতককারের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে ঋণী ছিলেন।

[২]। রাজার পুত্র না জন্মিলে প্রজারা কখনও কখনও বড় উদ্‌বিগ্ন হইত [সুরুচি (৪৮৯), কুশ (৫৩১)]। এ সম্বন্ধে কুশ-জাতকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা

জাতকের উপরাজ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের 'যুবরাজ' বোধ হয় এক।

রাজকুলে বহুবিবাহ

রাজারা বহুবিবাহ করিতেন; কোন কোন রাজার ষোড়শসহস্র পত্নীর উল্লেখ আছে [দশরথ (৫৬১), মহাপদ্ম (৪৭২), কুশ (৫৩১)]। ইহাঁদের মধ্যে যিনি প্রধানা (অগ্রমহিষী) ও ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা, সাধারণতঃ তাঁহারই গর্ভজাতপুত্র রাজপদ পাইতেন। কিন্তু সময়বিশেষে অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র বা অন্যান্য কারণে এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম না হইত তাহা নহে [দেবধর্ম্ম (৬), কাষ্ঠহারী (৭), দশরথ (৪৬১)]। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া সকল সময়ে অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইত না। মহাশীলবান (৫১), শ্রেয়ঃ (২৮২) প্রভৃতি জাতকে আমরা ভ্রষ্টা রাজপত্নীদিগকে দেখিতে পাই। রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার জামাতাকেও রাজপদ দেওয়া হইত [মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯]।

রাজকুলে মাতুল কন্যার বিবাহ

জাতকে এরূপ অবস্থায় রাজার ভাগিনেয়ের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের উল্লেখ আছে [অসিলক্ষণ (১২৬), মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯)। ইহাতে মনে হয়, 'অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ, সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে', মনুর এই ব্যবস্থা রাজকুলে অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া গৃহীত হইত না। কেবল অপুত্রক রাজার কন্যার সম্বন্ধে নহে, অন্যত্রও এরূপ বিবাহ হইত। বিশ্বন্তর তাঁহার মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩) এবং তক্ষকশূকরজাতকের (৪৯২) বর্ত্তমানবস্তুতে লিখিত আছে, অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার মাতুলকন্যা বজ্রা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল।[১]

প্রজাদিগের অনুরোধে রাণীদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া স্বচ্ছন্দবিহারের জন্য ছাড়িয়া দিতেন এবং এই উপায়ে কোন রাণীর গর্ভে যদি পুত্র জন্মিত, তাহা হইলে তাহাকেই রাজপদ দেওয়া হইত। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজেও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিবার প্রথা ছিল। কুশ-জাতকের বৃত্তান্ত বোধ হয় তাহারই অতিরঞ্জন।

[১]। কেহ কেহ বলেন অজাতশত্রু প্রসেনজিতের ভগিনীর সপত্নীপুত্র—এক লিচ্ছবিরাজ-কন্যার গর্ভজাত। কিন্তু পালি সাহিত্যে তিনি কোশলরাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়াই বর্ণিত। মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিবার আরও অনেক উদাহরণ আছে। যশোধরা বুদ্ধদেবের এক পক্ষে মাতুলকন্যা, অন্যপক্ষে পিতুস্ব সৃসুতা। মহামায়ার সহিত শুদ্ধোদনেরও এইরূপ একাধিক নিকট সম্বন্ধ ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে পুরাকালে হিন্দুসমাজে খুড়তত, জেঠতত, পিষতত ও মামাত ভাই ভগিনীর বিবাহ দোষাবহ ছিল না। উদয়-জাতকে (৪৫৮) বৈমাত্রেয় ভগিনীকে এবং দশরথ-জাতকে (৪৬২) সহোদরাকে বিবাহ করিবার

রমণীদিগের সিংহাসন-প্রাপ্তি

উদয়জাতকে (৪৫৮) বর্ণিত আছে, রাজা উদয়ের সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে এই রমণীই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাম যখন বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন বসিষ্ঠ সীতাকেই সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতা পতির অনুগমনে স্থিরপ্রতিজ্ঞা ছিলেন বলিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৭)। ইহাতে মনে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষে রমণীরাও সময়ে সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

বংশান্তর হইতে রাজনির্ব্বাচন; পুষ্পরথ। ক্ষত্রিয়েতর বর্ণের রাজ্যপ্রাপ্তি;

মৃতরাজা নির্ব্বংশ হইলে বংশান্তর হইতে রাজা নির্ব্বাচন করা হইত। কোন কোন জাতকে এ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়। মৃতরাজার সৎকার সমাপ্ত হইলে পুরোহিত ভেরি বাজাইয়া ঘোষণা করিতেন, "আগামী কল্য নূতন রাজার অনুসন্ধানে 'পুষ্পরথ' প্রেরিত হইবে" [দরীমুখ (৩৭৮); ন্যগ্রোধ (৪৪৫), শোণক (৫২৯), মহাজনক (৫৩৯)]। পরদিন রাজধানী অলঙ্কৃত হইত, পুষ্পরথে চারিটি কুমুদশুভ্র তুরঙ্গ যোজিত হইত, রথের মধ্যে খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর, এই পঞ্চরাজচিহ্ন স্থাপিত হইত; অনন্তর চতুরঙ্গিণী সেনা পরিবৃত হইয়া মহাবাদ্যধ্বনির সহিত রথ নগরের বাইরে যাইত। বর্ণনার ভঙ্গীতে মনে হয় অশ্বগণ যেন ইচ্ছমতই ছুটিত এবং যেখানে রাজপদ পাইবার উপযুক্ত কোন সুলক্ষণ পুরুষ থাকিত সেখানে থামিত। পুষ্পরথবৃত্তান্ত প্রকৃত হইলে এইরূপ রাজনির্ব্বাচনে পুরোহিতেরই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তিনিই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে আখ্যায়িকাকারের কল্পনাপ্রসূত, এ অনুমানও অসঙ্গত নহে। ক্ষত্রিয় না হইলেও যে লোকে রাজপদ পাইতে পারিত, এ প্রথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ন্যগ্রোধ-জাতকে যে ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন, তিনি এক অজ্ঞাতকুলা দুঃখিনী রমণীর শরণিনিক্ষিপ্ত পুত্র। পূর্ব্বে সত্যংকিল ও পাদকুশলমাণব জাতকবর্ণিত দুই জন ব্রাহ্মণের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গেও আমরা শূদ্রকুলজাত নন্দ এবং ব্রাহ্মণকুলজাত কাণ্নদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির দেখিতে পাই।

কথা আছে; কিন্তু ইহা বোধ হয় সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থায় স্মৃতিমূলক। ঐতিহাসিক সময়ে সহোদরাকে বিবাহ করার প্রথা কেবল মিশরদেশের গ্রীক রাজাদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

অত্যাচারী রাজপুত্রদিগের নির্ব্বাসন

এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য হইতে নির্ব্বসিত হইতেন। নির্ব্বাসনের একটি কারণ ছিল তাঁহাদের চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা। রাঢ়রাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়ের নির্ব্বাসন পুরাবৃত্তপাঠকের সুবিদিত। সূর্য্যবংশীয় সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ নগরবাসীদিগের সন্তানগুলি সরযুর জলে ফেলিয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ইহাতে নগরবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সগরকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, হয় আমাদিগকে, নয় অসমঞ্জকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন।" সগর প্রজাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য অসমঞ্জকে তদ্দণ্ডে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন; পাছে তিনি যাইতে বিলম্ব করেন, এই আশঙ্কায় সগর নিজেই রথ আনাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভার্য্যাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন; নির্ব্বাচিত রাজকুমার কন্দমূলাদি সংগ্রহের নিমিত্ত কেবল একখানি কোদালি ও একটা ঝুড়ি সঙ্গে লইতে পারিয়াছিলেন; তিনি এতভিন্ন অন্য কোন পাথেয় পান নাই (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৬; মহাভারত, বন, ১০৭)। জাতকেও অত্যাচারী রাজপুত্রের নির্ব্বাসনের কথা আছে [দদ্দর ৩০৪)]। সত্যংকিল-জাতকে (৭৩) দেখা যায়, প্রজারা এক দুষ্ট রাজকুমারকে গোপনে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজকুমার বিশ্বন্তর অতিদানে রাজভাণ্ডার শূন্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রজারা এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা রাজাকে বলিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত করাইয়াছিল [বিশ্বন্তর (৫৪৭)।]

রাজকুলে পিতৃদ্রোহ

নির্ব্বাসনের আর একটি কারণ ছিল রাজপুত্রদিগের পিতৃদ্রোহ। সংস্কৃত, পালি, উভয় সাহিত্য হইতেই বুঝা যায়, রাজাদিগকে গৃহশত্রুর ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। গৃহশত্রুর মধ্যে মহিষী ও পুত্রেরাই প্রধান ছিলেন। মহিষী দুষ্টা হইলে সময়ে সময়ে যে রাজার উপাংশুহত্যা হইত, কৌটিল্যেয় অর্থশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে; মেধাতিথিও মজুর ৭ম অধ্যয়ের ১৫তম শ্লোকের ভাষ্যে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।[১] পরন্তপজাতকে (৪১৬) অসতী মহিষীর চক্রান্তে এক সিংহাসনচ্যুত রাজার উপাংশু হত্যার কথা আছে; ইহা ছাড়া অন্য কোন জাতকে মহিষীকর্ত্তৃক রাজার প্রাণনাশের উল্লেখ নাই। কিন্তু রাজকুমারেরা যে সময়ে সময়ে সিংহাসনলাভের জন্য পিতৃহত্যা করিতেন, তাহার বেশ পরিচয়

---

[১]। দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জবান। লাজাম্বধুমেতি বিবেণ পর্য্যস্য দেবী কাশীরাজম্। বিবদিগ্ধেন নূপুরেণাবস্ত্যং মেখলামণিমা যৌবীরং জালুধমাদর্শেন বেণ্যাগুঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী বিডুরথং জমান [অর্থশাস্ত্র, ৪৫১ পৃঃ]।

পাওয়া যায়। অজাতশত্রুকর্ত্তৃক বিম্বিসারের নিধন [সঞ্জীব (১৫০)] এবং বিরূঢ়ককর্ত্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি [ভদ্রশাল (৪৬৫)] ঐতিহাসিক সত্য। সংস্কৃত্যজাতকের (৫৩০) অতীত বস্তুতে যে রাজকুমারের কথা আছে, তিনিও পিতৃহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তুষ-জাতকে (৩৩৮) এবং মুষিক-জাতকে (৩৭৩) দেখা যায়, রাজপুত্রেরা পিতার উপাংশু হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সকল কারণে রাজারা আত্মরক্ষার জন্য পুত্রদিগকে সময়ে সময়ে রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিতেন [চুল্লপদ্ম (১৯৩), অসিতাভু (২৩৪) ইত্যাদি]।[১] কোন কোন উপরাজেরও এই

---

[১]। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপুত্ররক্ষণ প্রকরণে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পাঠ করিলে মনে হয় জাতকের কথা অতিরঞ্জিত নহে, এবং পিতৃদ্রোহ কেবল মোগলদিগের মধ্যে নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজকুলসমূহেও নিতান্ত বিরল ছিল না। কৌটিল্য বলেন, "জন্মপ্রভৃতি রাজপুত্রান্ রক্ষেৎ, কর্কটসধর্ম্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ" –রাজপুত্রদিগকে জন্মাবধি রক্ষা করিতে হইবে, কারণ তাঁহারা কর্কটের ন্যায় পিতৃহন্তা। এইজন্য ভরদ্বাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন, "তেষামজাতস্নেহে পিতরি উপাংশুদণ্ডঃ শ্রেয়ান" অর্থাৎ পিতার মনে স্নেহ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই রাজপুত্রদিগকে গুপ্তভাবে নিহত করা বিধেয়। কিন্তু বিশালাক্ষ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন; তিনি বলেন, এ অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা এবং ইহাতে ক্ষত্রিয়দিগের কুলক্ষয় ঘটে। ইহা না করিয়া রাজপুত্রদিগকে একস্থানে আবদ্ধ রাখা ভাল। পরাশর বলেন, ইহাও সমীচীন নহে, এ যেন সাপ পুষিয়া রাখা। ইহার পরিবর্ত্তে রাজকুমারদিগকে কোন প্রত্যন্ত দুর্গের মধ্যে রক্ষিপরিবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পিশুন ইহাতেও আপত্তি করেন; তিনি বলেন এ হইবে যেন মেষপালের মধ্যে বৃক পুষিয়া রাখা, কারণ অবরুদ্ধ রাজকুমার অনায়াসে রক্ষীদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে পারেন; অতএব তাঁহাকে কোন সামন্তরাজার অধিকারস্থ দুর্গে রাখা উচিত। কৌণপদন্তের মতে ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ইহা করিলে সামন্তরাজ অবরুদ্ধ কুমারকে বৎসরূপে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার পিতার সর্ব্বস্ব দোহন করিতে পারেন। অতএব কুমারদিগকে মাতৃবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে রাখা ভাল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও বাতব্যাধির (উদ্ধরের) মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলেন, রাজপুত্রদিগকে অশিক্ষিত ও বিলাসপরায়ণ করা ভাল, কারণ এরূপ পুত্র কখনও পিতৃদ্রোহী হয় না। কৌটিল্য এরূপ কুটনীতির অনুমোদন করেন না; তিনি বলেন; ইহা ত জীবন্মরণম। রাজপুত্রেরা বিলাসী হইলে ঘুণজগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় রাজকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। ইহা না করিয়া কুমারদিগের দশবিধ সংস্কার যথাশাস্ত্র সম্পাদিত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাহাদের পাপে বিরাগ ও পুণ্যে অনুরাগ জন্মে, উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহের পরেই তাঁহাদের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাদিগকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যান (রামায়ণ, আদি)। ইহার ১২ বৎসর পরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন; কিন্তু এমন উৎসবের সময়েও তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার কথা উঠে নাই। যখন রামের নির্ব্বাসন হইল এবং দশরথ দেহত্যাগ করিলেন, তখনই

সন্দেহে নির্ব্বাসন হইত [অসদৃশ (২৮১), সুত্যজ্ব (৩২০), ভুরিদত্ত (৫৪৩)]। পরন্তপ-জাতকে (৪১৬) দেখা যায় এক রাজা তাঁহার পুত্রকে ঔপরাজ্য দিয়া শেষে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কুলতন্ত্র শাসন প্রণালী

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশেই রাজতন্ত্রশাসন ছিল বটে; কিন্তু কোথাও কোথাও কুলতন্ত্রশাসনও (oligarchy) প্রচলিত দেখা যায়। কুলতন্ত্রশাসনে এবং সাধারণতন্ত্র (গণতন্ত্র) শাসন পার্থক্য আছে। সাধারণতন্ত্রে জনসাধারণে যে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নির্ব্বাচন করে; কুলতন্ত্রশাসনে কোন কোন নির্দ্দিষ্টকুলজাত বহুলোকে সমবেত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যে সকল প্রদেশে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে বৈশালী প্রধান। লিচ্ছবিবংশীয় সাতহাজার সাতশত সাতজন ক্ষত্রিয় এই প্রদেশের শাসন করিতেন। ইহাঁদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'। [একপর্ণ (১৪৯), চুল্লকলিঙ্গ (৩০১)]। ভদ্রশালজাতকে (৪৬৫) ইহাদিগকে "গণরাজ বলা হইয়াছে। ইহারা নিতান্ত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না; সময়ে সময়ে মতভেদ ঘটিলে সভাগৃহে বেশ তর্কবিতর্ক উঠিত এবং শেষে অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই নিমিত্তই জাতককার বৈশালীরাজদিগকে 'পটিপুচ্ছাবিতকা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লিচ্ছবিরা যতদিন মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই; কিন্তু শেষে তাঁহারা একতাভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন।

বেশালী ভিন্ন আরও কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেণীদ্বয় "বার্ত্তা-শস্ত্রোপজীবী" এবং লিচ্ছবি, বৃজি, মল্ল, মদ্র, কুকুর, কুরুও পাঞ্চাল, এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণী "রাজশব্দোবজীবী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে শেষোক্ত শ্রেণীসমূহের কেহই জাত্যভিমানবশত কৃষিকর্ম্মাদি করিতেন না; সকলেই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্বলব্দ অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।[১] কপিলবস্তুর শাক্যদিগের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল নিশ্চয় বলা যায়

অমাত্যেরা ভরতকে অযোধ্যায় আনাইলেন। ভরত-শুত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবাস কি কৌণ পদন্তে নীতিমূলক?

মৌর্য্যরাজদিগের সময়েও রাজাদিগকে অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। মিগাস্থিনিস বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত উপাংশুহত্যার ভয়ে কখনও এক শয়নকক্ষে উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি যাপন করিতেন না।

[১]। এই প্রসঙ্গে! পৃষ্ঠবর্ণিত 'রাজন' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

না; বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শুদ্ধোদন তাঁহাদের রাজা ছিলেন বলিয়া দেখা যায়; কিন্তু শুদ্ধোদনই যে কপিলবস্তুর একাধীশ্বর ছিলেন, এরূপ নাও হইতে পারে। প্রসেনজিৎ যখন একজন শাক্যকুমারী চাহিয়া পাঠান [ভদ্রশাল (৪৬৫)], তখন কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য সমস্ত প্রধান শাক্যই সমবেত হইয়াছিলেন। বিরূঢ়কের অভ্যর্থনার জন্যও তাঁহাদের সকলকেই সংস্থাগারে সমবেত দেখা যায়। মহানামার কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াকে বুদ্ধদেব রাজকন্যা বলিয়াই পরিচিত করাইয়াছিলেন। রোহিণীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে, অমাত্যেরা গিয়া "রাজকুলদিগকে" এই সংবাদ দিয়াছিলেন। বুদ্ধ যখন এই কলহ মিটাইতে গিয়াছিলেন, তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলেই 'রাজা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন [কুণাল ৫৩৬]। ইহাতে মনে হয়, ভদ্রশাল-জাতকে যেমন একজন মহালিচ্ছবির উল্লেখ আছে, শুদ্ধোদনও সেইরূপ মহাশাক্য অর্থাৎ শাক্যকুলের প্রধান কিংবা সভাপতিস্থানীয় ছিলেন। সত্য বটে, শাক্যেরা কোশলপতির সমাপ্ত (আজ্ঞাপ্রবৃত্তিস্থ)-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্যই ভোগ করিতেন। ভদ্রশাল-জাতকেই দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষদ্বারা কোশল ও কপিলবস্তুর সাধারণ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তবে যে শাক্যেরা প্রসেনজিতের আদেশে বাসভক্ষত্রিয়াকে মহানামার ধর্ম্মপত্নীগর্ভসম্ভূত কন্যা সাজাইয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা কেবল প্রবল প্রতিবেশীর মনস্তুষ্টির জন্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, পল্লীবাসীরাও অনেক বিষয়ে স্ব স্ব পল্লীর শাসনকার্য্যে নির্ব্বাহ করিত। এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় গ্রীক্ দূত মিগাস্থিনিস্ মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষেরও অনেক স্থানে শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র ছিল।

(ঘ) রাজকর

রাজকর-সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখা যায়, রাজা ইচ্ছামত করবৃদ্ধি করিতেন [মহাশ্বরোহ (৩২০)]। লোকে যে সময়-বিশেষে নগদ টাকা না দিয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজকরস্বরূপ দিত, কুরুধর্ম্ম জাতকে (২৭৬) তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে এই শস্য মাপিয়া লইতেন, তাঁহার উপাধি ছিল দ্রোণমাপক। কুলায়কজাতকে (৩১) মাদক দ্রব্যের উপর শুল্কগ্রহণের কথা আছে। সম্ভবতঃ উহা রাজারই প্রাপ্য ছিল; তবে গ্রামভোজক নামক কর্ম্মচারী উহার কিয়দংশ

আত্মসাৎ করিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য ছিল [তৈলপাত্র (৯৬), মদীয়ক (৩৯০), হস্তীপাল (৫০৯)]। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে শুল্কসংগ্রহকারীদিগকে যমদূতের ন্যায় ভয় করিত। গর্গজাতকে (১৫৫) কথিত আছে যে একটা যক্ষের চরিত্র সংশোধন হইলে রাজা তাহাকে শুল্ক সংগ্রহকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(ঙ) রাজকর্ম্মচারী

জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার, বিনিশ্চয়ামাত্য, অর্ঘকার, সেনাপতি, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রস্থ, অসিগ্রহ, রজ্জুক (Survey-or), শ্রেষ্ঠী (Banker or treasurer), দ্রোণমাতা, (Measurer of corn), হিরণ্যক (খাজাঞ্চী বা পোদ্দার), সারথি, দৌবারিক, হস্তীমঙ্গলকারক, গর্জাচার্য্য, গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক (শুল্কসংগ্রাহক), নগর-গুপ্তিক, রাজবৈদ্য, প্রভৃতি বহু রাজকর্মচারীর নাম আছে [তণ্ডুলনালী (৫), তীর্থ (২৫), সুহনু (১৫৮), কূটবাণিজ (১১৮), কুরুধর্ম্ম (২৭৬), কণবের (৩১৮) ইত্যাদি]। ইঁহাদের মধ্যে গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক, গন্ধর্ব্ব ও নগরগুপ্তিক ব্যতীত প্রায় অন্য সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত। সারথি ও দৌবারিকের অমাত্য-পদবি কিছু বিস্ময়ের কথা; কিন্তু বোধ হয় প্রাচীনকালে বিচক্ষণ লোকেরাই এই দুই পদে নিযুক্ত হইতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ‘কঞ্চুকী’ নামধেয় যে অন্তঃপুরচর কর্ম্মচারীর কথা আছে, তিনি ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। সারথিরাও বর্ত্তমানকালের কোচম্যানের ন্যায় সামান্য ভৃত্য ছিলেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথির হইয়াছিলেন; দশরথও সারথি সুমন্ত্রকে বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিতেন। যুদ্ধকালে সারথির নৈপুণ্যের উপরেই রাজার জীবন মরণ নির্ভর করিত, কাজেই তিনি কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন।

পুরোহিত

পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার ও বিনিশ্চয়ামাত্য, ইহারাও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। রাজসংসারে পুরোহিতের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়েরা জাত্যভিমানী হইলেও পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারিতেন না। রাজা দুঃস্বপ্ন দেখিলে পুরোহিত শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭); রাজ্যে দুর্নিমিত্ত দেখা দিলে পুরোহিত তাহার প্রতিকার করিতেন [লৌহকুম্ভি (৩১৪); গর্ভাধানাদি সংস্কার পুরোহিতের দ্বারাই সম্পাদিত হইত; রাজার অভিষেকের ও সৎকারের সময়েও পুরোহিত না হইলে চলিত না; একটা হস্তীকে রাজার বাহকরূপে নির্দ্দিষ্ট করতে হইবে, তাহার জন্যও পুরোহিত আবশ্যক হইত [সুসীম (১৬৩)];

গ্রহসংস্থান দেখিয়া বা অঙ্গলক্ষণ পাঠ করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার ক্ষমতাও ছিল পুরোহিতের হাতে। ফলতঃ রাজার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে কোন দৈবকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতেই পুরোহিতের সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তৃক ছিল। তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত ও আচার্য্য। রাজা অনেক সময়ে তাঁহাকে আচার্য্য নামেই সম্বোধন করিতেন [কুধর্ম্ম (২৭৬), শরভমৃগ (৪৮৩), শরভঙ্গ (৫২২)]। তিলমুষ্টি-জাতকে (২৫২) দেখা যায়, যিনি পূর্ব্বে রাজার আচার্য্য ছিলেন, তিনি শেষে তাঁহার পুরোহিতপদে বৃত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) বারাণসী-রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পুরোহিতের নিকট বেদ (মন্ত্র) শিক্ষা করিতেন।

পুরোহিতের পদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল [বন্ধনমোক্ষ (১২০), সুসীম (১৬৩), সুসীম (৪১১), চেদি (৪২২)]। কাজেই রাজবংশের সহিত পুরোহিতবংশের কুলক্রমাগত প্রীতির বন্ধন থাকিত। রাজা ও পুরোহিত সমবয়স্ক হইলে তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিত। সহ্য-জাতকে (৩১০) দেখা যায়, রাজপুত্র ও পুরেহিতপুত্র রাজসংসারে সমান আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্তির পর একসঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; রাজপুত্র ঔপরাজ্যলাভ করিবার পরেও পুরোহিত-পুত্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন এবং একশয্যায় শয়ন করিতেন। অন্ধভূত-জাতকে (৬২) কথিত আছে, রাজা ও পুরোহিত এক সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেন। রাজা গজারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলে পুরোহিত অনেক সময়ে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া থাকিতেন। অধিকন্তু রাজবংশের সঞ্চিতধন কোথায় লুক্কায়িত থাকিত, পুরোহিতেরাই বোধ হয় তাহা জানিতেন [বন্ধনমোক্ষ (১২০)]। রাজা পুরোহিতকে নানা সময়ে গোহিরণ্যাদি দান করিতেন [কুরুধর্ম্ম (২৭৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯), সুসীম (১৬৩)]। কোন কোন জাতকে পুরোহিতদিগের ব্রহ্মোত্তরেরও (ভোগগ্রামের) উল্লেখ দেখা যায় [রথলট্ঠি (৩৩২), হস্তীপাল (৫০৯)]।

রাজকুলে এতদূরে প্রতিপত্তি থাকিলে সকল সময়ে লোভ সংবরণ করা কঠিন। এইজন্য আমরা দুষ্ট পুরোহিতেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। পাদকুশল-মাণব জাতকে (৪৩২) দেখা যায়, প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। পুরোহিত অর্থলালসায় রাজা অর্থ ধর্ম্মানুশাসকের পদও গ্রহণ করিতেন [খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উৎকোচ-লাভের জন্য বিচারকার্য্য হাত দিতেন। কিংছন্দ-জাতকের (৫১১) পুরোহিত পৃষ্ঠমাংসাদ, উৎকোচগ্রাহক ও অবিচারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; খণ্ডহালজাতকের পুরোহিত উৎকোচ পাইয়া অবিচার করিতেন; রাজকুমার চন্দ্র তাঁহার অসাধুতা প্রতিপন্ন করিলে তিনি

প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া চন্দ্রের ও অপর রাজপুত্রদিগের প্রাণনাশের আয়োজন করিয়াছিলেন, -রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে পুত্রবধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে তিনি স্বর্গলাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তিনি নিজেই নিহত হইয়ছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ অসাধু পুরোহিত কদাচিৎ দেখা যাইত; জাতকবর্ণিত অনেক পুরোহিতই রাজাদিগকে সুমন্ত্রণা দিতেন এবং সৎপথে চালাইতেন।

শ্রেষ্ঠী

গৃহপতি-প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠীদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ উত্তরকালীন ‘জগৎশেঠের’ ন্যায় রাজকীয় ধনাধ্যক্ষ (banker) হইতেন। জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগের উপাধির পূর্ব্বে রাজধানীর নাম সংযুক্ত দেখা যায়, যেমন রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী, বারাণসী-শ্রেষ্ঠী [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪), পীঠ (৩৩৭), ন্যগ্রোধ (৪৪৫)][১] শ্রেষ্ঠীস্থান বা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীর পদ সাধারণতঃ কুলক্রমাগত ছিল। চুল্ল-শ্রেষ্ঠী জাতকে দেখা যায়, বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র ছিল না বলিয়া তাঁহার জামাতাই শেষে শ্রেষ্ঠীস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগকে কি কি কাজ করিতে হইত, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই রাজার সাহায্য করিতেন, কোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে ঋণও দিতেন। তাঁহাদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত [পূর্ণপাত্রী (৫৩), ইল্লীশ (৭৮), পীঠ (৩৩৭) মদীয়ক (৩৯০)]। কেহ কেহ প্রতিদিন দুই তিনবারও রাজদর্শনে যাইতেন [অবস্থান (৪২৫)]। তাঁহাদের এক এক জন সহকারী থাকিতেন। সহকারী উপধি ছিল ‘অনুশ্রেষ্ঠী’ [সুধাভোজন (৫৩৫)]। কল্যাণধর্ম্ম-জাতকে (১৭১) দেখা যায়, শ্রেষ্ঠীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন।

গ্রামভোজক

অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল গ্রামভোজকের সহিত একটু পরিচয় আবশ্যক; কারণ প্রাচীন পল্লীসমিতিগুলির সহিত এই কর্ম্মচারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইনি মনুবর্ণিত ‘মণ্ডলস্থানীয়। গ্রামভোজকেরা রাজার আদেশে নিযুক্ত হইতেন, রাজকর সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন, সামান্য সামান্য বিবাদের বিচার করিতেন, অপরাধীর অর্থদণ্ড হইলে

---

[১] জাতকে ‘জনপদ-শ্রেষ্ঠী’ প্রভৃতি উল্লেখ আছে। ইহারা রাজকীয় শ্রেষ্ঠী ছিলেন না জনপদে বা প্রত্যন্ত প্রদেশে থাকিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ নিজেরা পাইতেন, মাদক দ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় হইত, তাহারও ভাগ লইতেন [কুলায়ক (৩১)]। ইহারা শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন এবং দস্যুতস্করাদির উপদ্রবনিবারণের ব্যবস্থা করিতেন। উৎকট অপরাধীদিগের বিচার রাজধানীতে হইত, গ্রামভোজকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চালান দিতেন। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চলের গ্রামভোজকেরা অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইতেন, এবং দস্যু দমন করা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বরং তাহাদের সহায়তাই করিতেন [খরস্বর (৭৯)]। তাহাদের আরও কোন কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় [গৃহপতি (১৯৯)]। কিন্তু গ্রামের শাসন সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগেরও কতক ক্ষমতা ছিল। পানীয়-জাতকে (৪৫৯) দেখা যায়, দুইজন গ্রামভোজক প্রাণীহত্যা ও সুরাপান নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে গ্রামবাসীদিগের আপত্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। কোন গ্রামভোজক নিতান্ত অত্যাচারী হইলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন। জাতকের নগরগুপ্তিক সম্ভবতঃ চণ্ডালজাতীয়।

রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইল। দেখা গেল যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখনও অবিচার ও অত্যাচার যে একেবারে হইত না এমন নহে। তখনও কর্ম্মচারীরা উৎকোচ লইতেন, অবিচার করিতেন এবং শান্তিরক্ষকেরা অপরাধী ধরিতে গিয়া সময়ে সময়ে ‘উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চাপাইতেন [মহাসার (৯২), কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ (৪৪৪)]। কণবের-জাতকের (৩১৮) নগরগুপ্তিক উৎকোচ পাইয়া প্রকৃত অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিল।

অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীর দণ্ড

রাজা অত্যাচারী হইলে বিদ্রোহ হইত; কর্ম্মচারীরা অত্যাচারী হইলে, কখনও কখনও প্রজারা এমন উত্তেজিত হইত যে রাজবিচারের অপেক্ষা না করিয়াই স্বহস্তে অত্যাচারীর প্রাণদণ্ড করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]। ফলতঃ পাশ্চাত্যখণ্ডে যাহাকে Lynch Law বলে, এ দেশেও প্রাচীনকালে তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না।

(চ) বিচার

রাজধানীতে রাজার প্রধান কর্ম্মছিল বিনিশ্চয় করা অর্থাৎ মকদ্দমা-মামলা-সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আরও অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের প্রতিবিচার অর্থাৎ আপিল হইত এবং কোন কোন বিবাদে লোকে রাজসমীপে গিয়াও প্রতিবিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বৈশালী রাজ্যে মন্যুকৃত ব্যবহারের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রথমে বিনিশ্চয়

মহামাত্রেরা তাহার বিচার করিতেন এবং তাঁহারা তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাকে দোষী মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে 'ব্যবহারিক' নামধেয় আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় বিনিশ্চয়-মহামাত্রগণ বর্ত্তমানকালের ঊর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের স্থানীয় ছিলেন।[১] ব্যবহারিকদিগের উপরে যথাক্রমে সূত্রধার, অষ্টকুলক (আটটি কুলের লোক লইয়া গঠিত অর্থাৎ বর্ত্তমান 'জুরী' স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা এই সমস্ত ঊর্দ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করিলে রাজারা প্রবেণিপুস্তকের (book of precedents) ব্যবস্থামত তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। জাতকে সূত্রধার ও অষ্টকুলক নামক কোন বিচারকের নাম নাই, কিন্তু সেনাপতিকে [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পুরোহিতকে [কিংছন্দ (৫১১), খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উপরাজকে বিচার করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মধ্বজ-জাতকের সেনাপতি অবিচার করিয়াছিলেন; তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন পুরোহিত; খণ্ডহাল-জাতকে পুরোহিত অবিচার করিয়াছিলেন; তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন উপরাজ। জাতকের বিচারকদিগের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থানে ছিলেন গ্রামভোজক [কুলায়ক (৩১), উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)]। ইনি গ্রামবাসীদিগের ছোটখাট মকদ্দমার বিচার করিতেন; এবং উৎকট অপরাধীদিগকে বিচারার্থ রাজধানীতে পাঠাইতেন। কখনও কখনও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অভিযোক্তা হইলে রাজা নিজেই প্রথম বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন [রথলট্‌ঠি (৩৩২)]। এই জাতকেই দেখা যায় রাজা যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহার দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন বিনিশ্চয়ামাত্য বলিয়াছিলেন, "কাজটা ভাল হইল না, লোকে অনেক সময়ে মিথ্যা আভিযোগও করিয়া থাকে। কাজেই অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েরই কথা শুনিয়া ও তথ্যানুসন্ধান করিয়া বিচার করা আবশ্যক।" অনন্তর রাজা এই পরামর্শানুসারে পুনর্ব্বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তক-জাতকে (১১৮) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতকে (৪৪৪) রাজা স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃষ্টরূপে বিনিশ্চয় করেন নাই বলিয়া অন্যায় দণ্ড দিয়াছিলেন।

অপরাধীকে গ্রামবাসীরা [অবাধ্য (৩৭৬)] কিংবা রাজকর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার করিত। গ্রামণীচণ্ড জাতকে (২৫৭) অপরাধীকে রাজদ্বারে লইয়া যাইবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে : লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপরা তুলিয়া

---

[১]। জাতকে 'বিনিশ্চয়ামাত্য' শব্দটি 'বিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে [কুটবাণিজ (২১৮), গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)]।

অপরাধীকে বলিত, "এই দেখ রাজার দূত; এস, তোমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে সে অতিরিক্ত দণ্ডভোগ করিত।

প্রাণদণ্ড

রাজা ভিন্ন অন্য কেহ বোধ হয় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিতেন না। অন্যান্য অপরাধীর মধ্যে কুসুম্ভপুষ্প-চোরের [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], মণিচোরের [মণিচোর (১৯৪), কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ (৪৪৪)][১] এবং ব্যভিচারিণীর [গ্রাণচণ্ড (২৫৭), কুণাল (৫৩৬)] প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়। যাহারা রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, যাহারা মণিহরণ করে, যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বারে দণ্ডভোগ করিয়াও আবার গাঁইট কাটিয়া সুবর্ণ চুরি করে, মনুও তাহাদিগকে বধদণ্ড দিতে বলিয়াছেন। মনুর এই বিধান স্মরণ করিয়াই বিদূষক বিক্রমোর্ব্বশী-নায়ক পুরুরবাকে মণিহারক শকুনের প্রাণনাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কখনও জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত [মহাশীলবান (৫১)] কখনও শূলে আরোপিত [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], কখনও ছিন্নমস্তক [কণবের (৩১৮)], কখনও বা ভৃগুস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত [কুণাল (৫৩৬)] করা হইত।[২] যম দক্ষিণদিক্‌পাল, এই জন্যই বোধ হয় বধ্যভূমি (মশান) নগরের দক্ষিণ দিকে থাকিত। প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির গলে রক্তকরবীরের মালা পরাইবার প্রথা ছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে এবং রামায়নেও (সুন্দরকাণ্ড, ২৭) এই প্রথার উল্লেখ আছে।

প্রবেণি-পুস্তক

বিচার-প্রসঙ্গে লিচ্ছবিরাজদিগের প্রবেণি-পুস্তকের কথা বলা হইয়াছে। জাতকের আরও কোন কোন অংশে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা দেখা যায় [তুণ্ডিল (৩৮৮), ত্রিশকুন (৫২১)]। 'প্রবেণি' বর্ত্তমানকালের 'নজির' স্বরূপ। এখন আইন যথেষ্টই আছে, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে নজিরের প্রয়োজন হয় এবং সেই নিমিত্ত 'নজির' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বেও সেইরূপ 'প্রবেণি' সংগ্রহ করিতে হইত।

---

[১]। শতবর্ষের অধিক হইবে না, ইংল্যাণ্ডে সামান্য চৌর্য্যেও লোকের প্রাণদণ্ড হইত। মনুসংহিতার ইহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর দণ্ড দেখা যায়, যেমন অপরাধীকে জলে ডুবাইয়া মারা (৯/২৭৯) বা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটা (৯/২৯২) ইত্যাদি।

[২]। প্রাচীন রোমেও প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে Tarpeian Rock হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

(ছ) যুদ্ধ

তখন দেশে ঘোর অশান্তি ছিল। অনেক জাতকের অতীতবস্তুতে কাশী ও কোশল রাজ্যের এবং বর্ত্তমানবস্তুতে কোশল ও মগধরাজ্যের মধ্যে বিবাদের কথা আছে। প্রত্যন্ত প্রদেশেও বিদ্রোহ হইত। প্রত্যন্তে শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল যোদ্ধা থাকিত, তাহারা কখনও বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত না; কাজেই রাজা স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেন এবং সময়বিশেষে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন [মহাশ্বরোহ (৩০২)]। রাজারা চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া রথে বা গজারোহণে যুদ্ধে যাইতেন এবং মনু-বর্ণিত প্রথানুসারে ব্যূহ রচনা করিতেন [বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩), তক্ষকশূকর (৪৯২)]

পুরাকালে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না, কাজেই নগর প্রাকার-বেষ্টিত থাকিলে কোন বহিঃশত্রু আসিয়া হঠাৎ উহা অধিকার করিতে পারিত না। বৈশালীর বর্ণনায় দেখা যায় [একপর্ণ (১৪৯)], ঐ নগরের চতুর্দ্দিকে এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটি প্রাকার ছিল এবং উহার গোপুরগুলি অট্টালক (watch tower) দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ সময়ে সময়ে রাজধানী অবরুদ্ধ করিত এবং আগমনিগম বন্ধ করিয়া নগরবাসীদিগের ক্লেশ জন্মাইত। নগরবাসীরাও সুবিধা পাইলে প্রাকারের বাহিরে গিয়া আততায়ীদিগকে হঠাইবার চেষ্টা করিত।

(জ) রাজভবন

রাজভবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন জাতকে [যেমন, কুশনালী (১২১)] একস্তম্ভ প্রাসাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বেও শৃঙ্গিশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের জন্য একস্তম্ভ প্রাসাদনির্ম্মাণের কথা দেখা যায়। যাঁহারা ফতেপুর শিকরির দরবার গৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করিতে পারিবেন যে এই একস্তম্ভ প্রাসাদগুলি কিরূপ ছিল। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই সকল প্রাসাদ কাষ্ঠময় ছিল; কিন্তু শেষে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কুশনালী ও ভদ্রশাল-জাতকে বারাণসীরাজের যে প্রাসাদের উল্লেখ আছে, তাহার স্তম্ভ দারুময় করিবার কথা ছিল। সম্প্রতি প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে ধ্বংসাবশেষ উৎখাত হইতেছে, তাহাতেও দেখা যায়, তখন প্রাসাদনির্ম্মাণে প্রধানতঃ কাষ্ঠের স্তম্ভই ব্যবহৃত হইত।

(ঞ) নারীজাতি—নারীচরিত্র

অনেকগুলি জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের স্ত্রীবর্গের প্রায় সমস্ত জাতকে, উদঞ্চনি (১০৬) বন্ধনমোক্ষ (১২০), ও

রাধজাতক (১৪৫)[১], দ্বিতীয় খণ্ডের চুল্লপদ্ম (১৯৩), উচ্ছিষ্টভক্ত (২১২) প্রভৃতি জাতকে, তৃতীয় খণ্ডের সমুদ্‌গ-জাতকে (৪৩৬)[২] এবং পঞ্চম খণ্ডের কুণাল-জাতকে (৫৩৬) এই ভাব বিশিষ্টরূপে প্রকটিত দেখা যায়। রমণীরা অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা, অকৃতজ্ঞা, মোক্ষলাভের অন্তরায়স্বরূপা, পুনঃ পুনঃ এইরূপ কটূক্তির প্রয়োগ দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়, বুদ্ধদেবও তাঁহার শিষ্যগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অতি অবিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যায়, ইঁহারাই মুক্তকণ্ঠে যশোধরা, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, বিশাখা প্রভৃতি রমণী-রত্নের গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এবং অনুতপ্তা আম্রপালী প্রভৃতি গণিকাকেও অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন মনে হয় ইঁহারা স্ত্রীজাতির অনাদর করিতেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের সাধনাকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলেন। যে হিন্দুর মনুসংহিতায় (৩য় অধ্যায়, ৫৫-৬২) রমণীগণ দেবতার ন্যায় পূজনীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই হিন্দুরাই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে (কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৩৮শ ও ৩৯শ অধ্যায়) ভগবান ব্যাসদেব ভীষ্মের মুখে নারীজাতির অশেষ দোষ কীর্ত্তন করাইয়াছেন। নারীচরিত্রের অপকর্ষ-সম্বন্ধে এই দুই অধ্যায়ের কোন কোন শ্লোকে এবং জাতকের কোন কোন গাথায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। ফলতঃ নারীর নিন্দাবাদ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদিগের উপকারার্থ, গৃহীদিগের বিরাগোৎপাদনের জন্য নহে, ইহা মনে করিলেই আর কোন বিরোধভাব থাকে না। ভিক্ষুর পক্ষে স্ত্রীমুখ-দর্শন ব্রহ্মচর্য্যহানিকর, এই আশঙ্কা করিয়াই বুদ্ধদেব নারী-দিগকে সঙ্ঘমধ্যে স্থান দিতে চান নাই; কিন্তু শেষে মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতির আগ্রহাতিশয়ে এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার পবিত্রতারক্ষার জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে নুতন নুতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, প্রাতিমোক্ষদ্বয়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীচরিত্রের নিন্দা এতদ্দেশীয় সাহিত্যেরই নিজস্ব নহে। ‘Frailty thy name is woman, প্রভৃতি বাক্যে পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের ধারণাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপখণ্ডে যে সকল পুস্তক রচিত হয়, তাহাদের অনেকগুলিতেই নারীদিগের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায় এক ব্যক্তি একটা শুকপক্ষীর উপর নিজের স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষার ভার দিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন।

২। সমুদ্‌গ-জাতকটি আরব্য নৈশোপাখ্যানমালায় প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে।

ব্যভিচারিণীর দণ্ড

“অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি” এইরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া চুল্লপদ্ম-জাতকের (১৯৩) গাথায় ব্যভিচারিণীর ‘না করিয়া প্রাণ অন্ত’ নাক-কান কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামণীচণ্ড-জাতকে (২৫৭) ও কুণাল-জাতকে (৫৩৬) ব্যভিচারিণীগিদগকে “ভর্ত্তারং লজ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতীগুণদপিতা, তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্ রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে,” ভগবান মনুর এই ব্যবস্থার অনুরূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন জাতকে দেখা যায়, ব্যভিচারিণীকে প্রহার করিয়া তারাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা ধিগ্‌দণ্ড বা বাগ্‌দণ্ড মাত্র যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এই সকল আখ্যায়িকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তত্তৎকালের প্রথা প্রদর্শন করিতেছে।

নারীদিগের বিবাহের বয়স

কন্যারা সাধারতঃ যৌবনোদয় পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪) পর্ণিক (১০২), অসিলক্ষণ (১২৬) সেগ্গু (২১৭), মৃদুপাণি (২৬২)]। মালাকার-কন্যা মল্লিকা যখন কোশরাজ প্রসেনজিতের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর [কুল্মষপিণ্ড (৪১৫)]। মহানামা শাক্যের কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াও ষোল বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন [ভদ্রশাল (৪৬৫)। কেবল ক্ষত্রিয়কুলে নহে, নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও বোধ হয় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও নায়িকারা বিবাহকালে প্রায় সকলেই যুবতী ছিলেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, “ত্রিংশদ্‌বর্ষোদ্‌বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং, ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবহর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ” মনুর এই বচনে (৯/৯৪) বরকন্যার বয়সের অনুপাতমাত্র নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কন্যাদিগকে যে আট হইতে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই। মেধাতিথি ও কুল্লুক এই অর্থেই উক্ত বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপ্রাপ্তবয়স্কার বিবাহ বিধিসঙ্গত বলা দূরে থাকুক, মনু বরং উপদেশ দিয়াছেন, “কামমামর নাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি, নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ” (৯/৮৯)। তবে উপযুক্ত পাত্র পাইলে কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তনয়ার বিবাহ না দিতেন এমন নহে। রামায়ণে দেখা যায় (বালকাণ্ড, ২০) বিবাহের সময়ে রামের বয়স “ঊনষোড়শ বর্ষ অর্থাৎ ষোল বৎসরের কিছু কম ছিল; সম্ভবতঃ সীতা তখন দ্বাদশবর্ষীয়া। পরিণয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার “স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মগ্নচুচুকৌ” হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮)। অতএব তখন যে তাঁহার যৌবনের উন্মেষ হইতেছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কৌটিল্যও তাঁহার অর্থশাস্ত্রে “দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি, ষোড়শবর্ষ;

পুমান্” এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন সময়ে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়সই কন্যাদানের প্রশস্ত কাল বলিয়া ধরা হইত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষের বিবাহ আরও অধিক বয়সে হইত; কারণ তাঁহারা সচরাচর ষোড়শ বর্ষে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত না হইলে দার পরিগ্রহ করিতেন না। বরের বয়সের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এরূপ একটা নিয়ম করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

পত্যন্তর-গ্রহণ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পভৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে”—পরাশর-সংহিতার এই বচনে কি কি অবস্থায় নারীরা প্রত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকে ভাষ্যে মেধাতিথি পরাশরের এই বচনও তুলিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখা যায়, “দীর্ঘপ্রবাসীনঃ, প্রব্রজিতস্য প্রেতস্য বা ভার্য্যা সপ্ততীর্থান্যাকাঙ্ক্ষেত। সংবৎসরং প্রজাতা। ততঃ পতিসোদর্য্যং গচ্ছেৎ, বহুষু প্রত্যান্নং ধার্ম্মিকং কনিষ্ঠমতার্য্যং বা। তদভাবেহপ্যসোদর্য্যং সপিণ্ডং তুল্যং বা।” “তীর্থোপরোধো হি ধর্ম্মবধ।”[১] জাতক রচনাকালে সমাজে যে এই সকল নিয়মই প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায় সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলে অনেকে যশোধরার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন। উৎসঙ্গ-জাতকে (৬৭) লেখা আছে এক জনপদবাসিনীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে সে সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, কেন না,—

কোন ছেলে, পথে পতি সহজেই পাই;
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই?

কোন কোন জাতকে এরূপও বর্ণনা আছে যে এক রাজা অন্য রাজাকে নিহত করিয়া তাহার সর্গভা মহিষীকে পর্য্যন্ত নিজের মহিষী করিয়াছিলেন [কুণাল (৫৩৬)]

---

[১]। কৌটিল্যের মতে কেবল প্রব্রাজকের বা প্রেতের পত্নী নহে, হ্রস্বপ্রবাসীর পত্নীও অবস্থাবিশেষে পুরুষান্তর আশ্রম করিতে পারে : হ্রস্বপ্রবাসিনাং শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বাহ্মণানাং ভার্য্যাঃ সংবৎসরোত্তরং কালং আকাঙ্ক্ষেরন্ অপ্রজাতাঃ; সংবৎসরাধিকং প্রজাতাঃ; প্রতিবিহিতা দ্বিগুণং কালং, অপ্রতিবিহিতাঃ সুখাবস্থা বিভৃয়ুঃ পরং চত্বারি বর্ষাণ্যষ্টৌ বা জ্ঞাতয়ঃ; ততো যথাদত্ত মাদায় প্রমুঞ্চেয়ুঃ (৫৯ প্র)।
মনুর নবম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকেও এই ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দু সাহিত্যেও উচ্চজাতীয়া রমণীদিগের মধ্যেও যে অবস্থাবিশেষে পত্যন্তর-গ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দয়মন্তী নলকে পাইবার জন্য স্বয়ংবরের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইক্ষাকুবংশীয় মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহাকে পাইবার লোভে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। প্রব্রাজক-পত্নীর পুনর্ব্বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইলে ঋতুপর্ণ একটা পণ্ডশ্রম করিতেন না, নলও এ সংবাদে দময়ন্তীর পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হইতেন না। যশোধরা ও দময়ন্তী উভয়েই পুত্রবতী ছিলেন। অতএব পত্যন্তরগ্রহণ প্রথা যে অক্ষতযোনিত্বরূপ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমনও বোধ হয় না। কৌটিল্যের ব্যবস্থায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এককালে একাধিক পতিগ্রহণ

জাতকের এক রমণীর একসঙ্গে একাধিক পতিগ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। কুণাল-জাতকে (৫৬৩) কৃষ্ণার সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে তাহা ত দ্রৌপদীর কাহিনীরই রূপান্ত। ঐ জাতকেই পঞ্চপাপা নাম্নী আর এক রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগপৎ দুইজন রাজার ভোগ্যা হইয়াছিল।

(ঠ) শিক্ষা—সাধারণ শিক্ষা

লোশক-জাতকে (১৪) কথিত আছে, বারাণসীবাসীদিগের এই প্রথা ছিল যে তাঁহার দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ ছাত্রেরা 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহিত হইত। গ্রামবাসীরাও স্ব স্ব সন্তানদিগের শিক্ষাবিধানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিত এবং তাঁহাকে বেতন ও বাসস্থান দিত [লোশক (৪১), তক্ক (৬৩)]। ইহাতে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে দেশের জনসাধারণে কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখিত। গর্ভদাস কটাহক [কটাহক (১২৫)] প্রভুপুত্রের ফলকাদি[১] বহন করিয়া পাঠশালায় যাইত এবং নিজেও লেখাপড়া শিখিত। অনীল-চিত্ত জাতকের (১৫৬) সূত্রধারেরা গৃহনির্ম্মাণকালে মিলাইয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিবার সুবিধার জন্য কাষ্ঠখণ্ডগুলিতে এক, দুই

---

[১] ফলক = তক্তি; ইহা পশ্চিমাঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়। একখানা ছোট তক্তায় কালি মাখাইয়া তাহার উপর খড়ি দিয়া লিখিতে হয়। ইহা শ্লেটের কাজ করে। তক্তিখানার একদিকে একটা ছিদ্র থাকে; তাহাতে দড়ি বান্ধিয়া ছেলেরা ঝুলাইয়া লইয়া যায়। জাতকে কাগজ, কলম, কালী প্রভৃতি কোন লেখনোপকরণের উল্লেখ পাই নাই। চিঠিকে 'পর্ণ' বলা হইয়াছে; আমারও পত্র বলি; কিন্তু ইহা দেখিয়া, তখন কাগজ ছিল কি না, বলা যায় না। রাজকীয় আদেশ প্রভৃতি ধাতুফলকে খোদিত হইত।

ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণ করিত।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চজাতীয় লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের, মধ্যে উচ্চশিক্ষার বেশ আদর ছিল। উচ্চশিক্ষার বিষয় ছিল "তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প।" জাতকে শিল্প শব্দটি 'বিদ্যা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শিল্প বলিলে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত; কিন্তু ঋক্‌, সাম ও যজুর্ব্বেদ প্রাধান্য-দোতনার্থ এই তিনটি আবার স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইত। উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসী, তক্ষশিলা প্রভৃতি বৃহৎ নগরসমূহে চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে তক্ষশিলার চতুষ্পাঠীগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তৎকালে তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কাহারও শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। বারাণসী প্রভৃতি নানা দেশের রাজপুত্রেরা ও ব্রাহ্মণপুত্রেরা প্রথমে গৃহে থাকিয়া মোটামোটি লেখাপড়া শিখিতেন; তাহার পর ষোল বৎসর বয়সে তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিতে যাইতেন [তিলমুষ্টি (২৫২), তুষ (৩৩৮) ইত্যাদি] এখন আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার বয়স ষোল বৎসর। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে উচ্চজাতীয় লোক বিবাহ করিতেন না এবং বিষয়কর্ম্মেরও হাত দিতেন না।

গুরুগৃহে বাস; গুরুদক্ষিণা

শিষ্যেরা সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাস করিত। যাহারা দরিদ্র, তাহারা কেবল শুশ্রূষাদ্বারাই গুরুকে সন্তুষ্ট করিত [বরুণ (৭১), লাঙ্গলাষা (১২৩)]। ইহাদিগকে 'ধর্ম্মান্তেবাসিক' বলা হইত। ধনী লোকের পুত্রেরা বিদ্যারম্ভের সময়েই আচার্য্যভাগ (গুরুদক্ষিণা) দিত [সুসীম (১৬৩), তিলমুষ্টি (২৫২)]। ইহাদের নাম ছিল 'আচার্য্যভাগদায়ক।' যাহারা দরিদ্র, তাহারা বরতন্তুশিষ্য কৌৎস্যের ন্যায়, শিক্ষাসমাপনান্তে ভিক্ষা করিয়াও গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিত [দূত (৪৭৮)]।

শিষ্যের শাসন; আচার্য্যমুষ্টি

শিষ্যেরা স্ব স্ব অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে গুরুগৃহে তিলতণ্ডুলতৈলবস্ত্রাদি লইয়া যাইত; তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধুগণ ও তণ্ডুলাদি পাঠাইতেন; অন্যান্য লোকেও কেহ তণ্ডুল, কেহ কাষ্ঠ, কেহ অন্য কোন উপকরণ, কেহ বা পয়স্বিনী গবী দিতেন [তিত্তির (৪৩৮)]। এই সকল উপায়ে চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

শিষ্য অবশিষ্ট আচরণ করিলে গুরু তাহাকে কখনও কখনও শারীরিক দণ্ড

দিতেন। [তিলমুষ্টি (২৫২)]।[১] পাছে শিষ্যের 'গুরুমারা বিদ্যা' জন্মে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় কোন কোন আচার্য্য সমস্ত বিদ্যা দান করিতেন না, একটা না একটা অংশ ব্যাসকুটের ন্যায় অব্যাখ্যাত রাখিতেন। এরূপ অব্যাখ্যাত অংশ 'আচার্য্যমুষ্টি' নামে বিদিত [উপানহ্ (২৩১), গুপ্তিল (২৪৩)]। প্রধান ছাত্রেরা অধ্যাপনকার্য্যে আচার্য্যদিগের সাহায্য করিতেন; তখন তাঁহাদের নাম হইত 'পৃষ্ঠাচার্য্য' [অনভিরতি (১৮৫), মহাশ্রুতশোম (৫৩৭)]। আচার্য্য বৃদ্ধ হইলে এরূপ ছাত্রকে সময়ে সমস্ত চতুষ্পাঠীরই অধ্যক্ষতা দান করিতেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিদ

শিক্ষাসমাপ্তির পর কেহ কেহ খ্যাতিলাভের আশায় নানা স্থানে গিয়া অপর পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। [পলায়ি (২২৯), বীতেচ্ছ (২৪৪)]। এরূপ বিচারে উভয় পক্ষেই সাধারণতঃ একটা না একটা পণে বন্ধ থাকিতেন। চুল্লকলিঙ্গ-জাতকের (৩০১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু-বর্ণিত বিদুষীরা পণ করিয়াছিলেন, গৃহীর নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার পত্নী হইবেন, আর প্রব্রাজকের নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার শিষ্যা হইবেন। উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্র ও তৎপত্নী উভয়ভারতীয় যে বিচার হইয়াছিল, তাহাতেও শেষোক্ত পণের কথা শুনা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৩২ম অধ্যায়) মিথিলাবাসী বাদবেত্তা বন্দী অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়কে বাদে পরাস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পণই এই ছিল যে বিচারে যিনি পরাস্ত হইবেন তাঁহাকেই এই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। জাতকে এরূপ কঠোর পণের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণবংশীয় শ্বেতকেতুকে এক চণ্ডালের নিকট পরাস্ত হইয়া তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে তাহার পাদদ্বয়ের ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে হইয়াছিল [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]।

স্ত্রী-শিক্ষা

নারীরাও যে বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইতেন, চুল্লকলিঙ্গ-জাতকের বর্ণিত বৈশালীর বিদুষীদিগের এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আম্রপালি, প্রভৃতি 'থেরী'দিগের জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

(ঠ) শিল্প—বস্ত্রবয়ন

জাতকে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি

---

[১]। বর্ত্তমান কালের কলেজের ছাত্রেরা হয়ত এই ব্যবস্থাকে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপমানকর বলিবেন।

প্রধান :

ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায় একজন ভিক্ষু বড়াই করিতেন যে তাঁহার গৃহে দাসদাসীরা পর্য্যন্ত বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে। গুণ-জাতকে (১৫৭) লিখিত আছে যে কোশলরাজ রাণীদিগকে যে শাড়ী দিয়েছিলেন, তাহার এক এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। এ মুদ্রা কোন মুদ্রা তাহা জানা যায় না। তাহা হইলে শাড়ীগুলি যে বহুমূল্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মদীয়ক-জাতকের (৩৯০) বর্ত্তমান বস্তুতেও কাশীর বস্ত্রের প্রশংসা আছে। এই বস্ত্র বোধ হয় কার্পাস নির্ম্মিত, কেননা তুণ্ডিল-জাতকে (৩৮৮) বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কার্পাস ক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বিনয়পিটকে (মহাবগ্গ ৮/১) শিবি রাজ্যের কার্পাস বস্ত্রও উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গজদন্ত-শিল্প

বারাণসীতে লোকে গজদণ্ড কাটিয়া বলয়, ক্রীড়নক প্রভৃতি প্রস্তুত করিত (শীলবন্‌নাগ (৭২), কাষায় (২২১)]। বারাণসীর একটা গলিতে কেবল এই ব্যবসায়ী লোকেরই বাস ছিল বলিয়া উহার 'দন্তকার-বীথি' নাম হইয়াছিল।

শৃঙ্গদ্বারা ধনু-নির্ম্মান

শৃঙ্গ দ্বারা চাপ নির্ম্মিত হইত বলিয়াই ধনুকের আর একটি নাম শার্ঙ্গ। প্রাচীন গ্রীসেও লোকে ibex নামক একপ্রকার পর্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ প্রস্তুত করিত। চাপ সন্ধিযুক্ত ছিল এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়তন থলির মধ্যে রাখা যাইত [অসদৃশ (১৮১), শরভঙ্গ (৫২২)]।

লৌহশিল্প

দশার্ণ দেশের তরবারি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। চাপের ন্যায় তরবারিও সন্ধিযুক্ত হইত এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়াতন কোষের মধ্যে রাখা যাইত। সূচী-জাতকে (৩৮৭) দেখা যায়, এক কর্ম্মকার এমন সূক্ষ্ম সূচীকোষ প্রস্তুত করিতে পারিত যে তাহাদের একটির মধ্যে একটি এইরূপে সাতটি কোষ সাজাইলেও বাহিরের কোষটি একটি সূক্ষ্ম সুচী বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। অথচ এই কোষগুলি এমন কঠিন ছিল যে হাতুড়ির আঘাতে লৌহপিণ্ডও বেধ করিয়া যাইত।

জাতকে কামার (কম্মার) শব্দটিতে লৌহকার ও স্বর্ণকার উভয় শ্রেণীর শিল্পকেই বুঝায়। কুশ-জাতকে (৫৩১) দেখা যায় এক কর্ম্মকার সোণা দিয়া অবিকল মানুষের মত এক প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সূত্রধারের কাজ

তখন অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল; এজন্য সূত্রধারের ব্যবসায় বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বারাণসীর নাতিদূরস্থ সূত্রধারেরা বনে গিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানেই একতালা, দোতালা ইত্যাদি ঘরের কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং প্রত্যেক খণ্ড এক, দুই ইত্যাদি অঙ্কদ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত করিত, যে সেগুলি গৃহনির্ম্মাণের সময়ে যথাস্থানে সাজাইতে কোন অসুবিধা হইত না। অনন্তর তাহারা সমস্ত কাঠ নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে নগরে ফিরিত এবং যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন, তাহার জন্য সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিত [অনীলচিত্ত (১৫৬)]। কাষ্ঠময় একস্তম্ভ প্রাসাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দূরদেশগামী অর্ণবপোত-নির্ম্মাণেও সূত্রধারেরা বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)]।

পাথরের কাজ

ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রাসাদও যে না ছিল এমন নহে। অশোকের সময়ে এদেশের লোকে প্রস্তরতক্ষণে যে অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, সাঁচী ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বভ্রু-জাতকে (১৩৭) এক পাষাণকুট্টকের কথা আছে; সে সুধাস্ফটিক পাষাণ দিয়া একটা গুহা প্রস্তুত করিয়াছিল। শূকর-জাতকের (১৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে জেতবনস্থ গন্ধকুটীর মণিসোপানে সুশোভিত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মণি-সোপান বলিলে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি বুঝায়। রাজমিস্ত্রীদের নাম ছিল 'ইষ্টকবর্দ্ধকী'।

চিত্রশিল্পও তক্ষণ

মহা উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) চিত্রশিল্পের উল্লেখ আছে। ঔষধকুমার ক্রীড়াশালা নির্ম্মাণের পর চিত্রকর ডাকাইয়া উহা রমণীয় চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ইন্দ্ররথবর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায় :

পশু পক্ষী কত

সর্ব্বাঙ্গে খচিত তার বিবিধ রতনে।
হেথা নৃত্যশীল শিখী; পুচ্ছে জ্বলে তার
বিবিধকরণ-মণি-বিন্যাসরচিত
চন্দ্রকসহস্র অই; নীলকণ্ঠ হোথা,
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানা জাতি-
বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদন্দ্বিসহ

রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

ইহা কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু কল্পনার মধ্যেও সত্যের আভাস আছে। যাঁহারা আগরার তাজমহলে প্রস্তরে ক্ষোদিত আফিমের ফুল দেখিয়াছেন এবং সাজাহানের ময়ূরতক্তের বর্ণন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উল্লিখিত বর্ণন দেখিয়া ভাবিতে পারেন যে বৌদ্ধযুগেও এদেশে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প অপরিজ্ঞাত ছিল না। সারনাথে অশোক স্তম্ভের চূড়ায় সিংহতুষ্টয়ের যে মুর্ত্তি ছিল, তাহাও এই অনুমানের সমর্থক।

(ড) বাণিজ্য

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবকালে প্রধানতঃ বণিকেরাই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।[১] বুদ্ধদেবের প্রথম দুইজন শিষ্য ত্রপুষ ও ভল্লিক উৎকলদেশীয় বণিক্। তাঁহার সপ্তম শিষ্য শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ। যশ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতাপিতাও বৌদ্ধশাসনে উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ, ধনঞ্জয়, মৃগধর প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অসাধারণ মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় অনেক জাতক বণিক ও বাণিজ্যের কথা লইয়া গঠিত।

পণ্যদ্রব্য

কোন দেশে কোন দ্রব্যের কাটতি হইত, জাতক পাঠে তাহা ভাল বুঝা যায় না। দশার্ণের তরবারি, শিবিও বারাণসীর কার্পাস বস্ত্র, বারাণসীর গজদন্তনির্ম্মিত বলয়াদি, এই সকল দ্রব্যের বোধ হয় সর্ব্বত্রই আদর ছিল। সিন্ধুদেশে উৎকৃষ্ট ঘোটক জন্মিত; উত্তরাপথ হইতে অশ্ববণিকেরা এই সকল আনয়ন করিয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিত [তণ্ডুলনালী (৫), সুহনু (১৫৮), কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব (২৫৪]। বাবেরুজাতকে (৩৩৯) লিখিত আছে, এদেশের লোকে ময়ূরাদি পক্ষী লইয়া ব্যাবিলনে বিক্রয় করিত। বাইবলেও দেখা যায়, য়িহুদিরাজ সলোমনের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য পালিষ্টাইনে যাইত, 'তুকেই' যা শিখী তাহাদের অন্যতম।

স্থলপথে বাণিজ্য

জলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা ছিল না; কাজেই অন্তর্ব্বাণিজ্যে

---

[১]। বাঙ্গালাদেশে তিলি, সাহা, সুবর্ণবর্ণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই চৈতন্য দেবের এবং গুজরাট অঞ্চলে প্রায় সমস্ত বণিকই বল্লভ স্বামীর শিষ্য। জৈনদিগেরও অনেকেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

পণ্যবহনের জন্য অনেক সময়ে গোশকট ব্যবহৃত হইত। শ্রাবস্তীবাসী অনাথপিণ্ডদ পঞ্চশত গোশকট লইয়া রাজগৃহে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বারাণসীর বণিকেরা গোশকটে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত [গুপ্তিল (২৪৩) এবং বিদেহের বণিকেরা গান্ধার পর্যন্ত [গান্ধার (৪০৬)] বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পথে দস্যুভয় ছিল; শক্তিগুল্মজাতকে (৫০৩) এক গ্রামের কথা আছে; সেখানকার পাঁচশ ঘর লোকে সকলেই দস্যুবৃত্তি করিত। দস্যুরা অনেকে দল বান্ধিয়া থাকিত এবং সুবিধা পাইলে পথিক ও বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, জীবনান্তও করিত [বেদব্‌ভ (৪৮), শতপত্র (২৭৯) ইত্যাদি] এজন্য বহু বণিক এক সঙ্গে যাত্রা করিতেন; যিনি দলের নেতা হইতেন, তাহার নাম ছিল সার্থবাহ। উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে মরুকান্তার অতিক্রম করিতে হইত। বনভূমির ও মরুকান্তারের ভিতর দিয়া যাইবারকালে বণিকেরা অটব্যারক্ষিক (forest guard) এবং স্থলনিয়ামক ("land pilot") নিযুক্ত করিতেন। আরক্ষিকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিত এবং দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বণিকদিগকে রক্ষা করিত [ক্ষুরপ্র (২৬৫)]। ইহাদের সর্দ্দারকে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠক বলা হইত। দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরাও এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। সার্থবাহগণ দিনমানে রৌদ্রের ভয়ে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্তব্য পথে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতেন। তখন স্থলনিয়ামকেরা নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত [বণ্ণুপথ (২)]।

ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কখনও গাধার পিঠে চাপাইয়া, কখনও নিজেরাই মোট লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়াইত [সেরিবাণিজ (৩), গর্গ (১৫৫), সিংহচর্ম্ম (১৮৯)।

সমুদ্রবাণিজ্য

জাতকে সমুদ্রবাণিজ্যের কথাও আছে। বণিকেরা অর্ণবপোতের সাহায্যে দ্বীপান্তরে যাইতেন। পোতগুলি ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি পট্টন (বন্দর)[১] হইতে পণ্য

---

[১]। জাতকে সমুদ্রতীরবর্তী আরও কয়টি নগরের উল্লেখ আছে। ঘট-জাতকে (৪৫৪) এবং মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) দ্বারাবতী এবং আদীপ্ত-জাতকে (৪২৪) সৌবীর রাজ্যস্থ রৌরব নগরের নাম দেখা যায়। দিব্যাবদানে রৌরবের নাম 'রোরুক'। কেহ কেহ বলেন সৌবীর এবং বাইবল-বর্ণিত ophir এক। পণ্ডর-জাতকে (৫১৮) করম্বিক পট্টন নামক এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের উল্লেখ আছে। এই নগর কাল্পনিক, কি প্রকৃত, ইহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, জাতক বর্ণিত কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর ও মেদিনীপুর জেলায় দাঁতন এক। কিন্তু কলিঙ্গরাজ্যেকে, কেবল গোদাবরীর নহে, উৎকলিঙ্গেরও উত্তরে টানিয়া আনা যুক্তি

লইয়া যাত্রা করিত এবং পণ্যের বিনিময়ে সুবর্ণরৌপ্যপ্রবালাদি লইয়া ফিরিয়া আসিত। জাতকে 'পট্টন' শব্দে নদীতীরবর্ত্তী এবং সাগরতীরবর্ত্তী উভয়বিধ বন্দরই বুঝায়। চুল্লশ্রেষ্ঠী-জাতকে (৪) নায়ক যে পট্টনে গিয়া জাহাজ কিনিয়াছিল, তাহা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ কোন নগর। বারাণসী, চম্পা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরের সমুদ্রবণিকেরা পোতারোহণে গঙ্গানদী দিয়া সাগরে অবতরণ করিত [মহাজনক (৫৩৯)]। প্রত্যেক পোতে এক জন নিয়ামক (pilot?) থাকিত। পথে ঝটিকার আক্রান্ত হইলে নাবিকেরা মনে করিত যে, আরোহীদিগের মধ্যে কাহারও দুরদৃষ্টবশত এই বিপদ ঘটিয়াছে। তখন তাহারা গুটিকাপাত করিত এবং ইহাতে যাহাকে 'কালকর্ণী' অর্থাৎ অপেয়ে বলিয়া বুঝা যাইত, তাহাকে একখানা ভেলায় চড়াইয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিত। এইরূপ হতভাগ্যেরা এবং ভগ্নপোত নাবিকেরা কখনও কখনও কোন জনহীন দ্বীপে উপনীত হইয়া উত্তরকালীন রবিন্সন ক্রুসোর ন্যায় দীর্ঘকাল একাকী বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিত এবং দৈবযোগে সেখানে কোন অর্ণবপোর্ত উপস্থিত হইলে উদ্ধার পাইত [লোশক (৪১), শীলানিশংস (১৯০), বালাহাশ্ব (১৯৬), ধর্ম্মধ্বজ

সঙ্গত কি, না, বলিতে পারি না; বিশেষতঃ দাঁতনের লুপ্তগৌরবেরও কোন নিদর্শন নাই। তবে জাতক রচকেরা যে রাষ্ট্রনগরাদির স্থাননির্দ্দেশে অভ্রান্ত ছিলেন, ইহাও বলা যায় না। কুরুধর্ম্ম-জাতকে (২৭৬) কথিত আছে, কলিঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ দূতেরা কতিপয় দিনের মধ্যে দন্তপুর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন! অশ্বক-জাতকে (২০৭) দেখা যায়, অশ্বকরাজ্য ও পোতলি নগর কাশীরাজ্যের অংশ; অথচ চুল্লকালিঙ্গ-জাতকে (৩০১) লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজকন্যাকে পোতলিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিচরণ করিতে হইয়াছিল। দক্ষিণাপথের কতদূর পর্য্যন্ত যে জাতকরচকদিগের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাও নিশ্চিত বলা কঠিন। আমরা দক্ষিণাপথ বলিলে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থ অঞ্চল বুঝি; কিন্তু শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) অবন্তীরাজ্যকে দক্ষিণাপথে স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ জাতকে গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যের নামও দেখা যায়। শঙ্খপাল-জাতকে (৫২৪) মহিংসক রাজ্য এবং তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণা নদীর নাম আছে। কৃষ্ণবর্ণা যদি কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে মহিংসক রাজ্যকে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) মহিংসক শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহিসর' এই পাঠান্তর আছে। এই পাঠ শুদ্ধ হইলে মহিংস, মহিসর এবং মহীশূর একই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। জাতকে ইহার রাজধানীর নাম 'সকুল' বা 'সাগল'। মহাভারতে শালক নগরের নাম আছে; কিন্তু তাহা মদ্রদেশে। কালিঙ্গবোধি-জাতকেও (৪৭৯) সাগল নগর মদ্রদেশস্থ বলিয়াই বর্ণিত। তবে এক নামের একাধিক নগর থাকা বিচিত্র নহে—যেমন মথুরা ও মদুরা। অকীর্ত্তি-জাতকে (৪৮০) দ্রাবিড় রাজ্যের, তত্রত্য কাবীরপট্টন নামক বন্দরের এবং তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভস্থ নাগদ্বীপ ও কারদ্বীপের নাম দেখা যায়। নাগদ্বীপ জাফনার নিকটবর্ত্তী। ইহা সিংহলেরই অংশ। কিন্তু শেষোক্ত স্থানটি কি, তাহা জানিতে পারা যায় না।

(৩৮৪), চতুর্দ্বার (৪৩৯), সুপ্‌পারক (৪৬৩), সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬), পণ্ডর (৫১৮) ইত্যাদি]। তখন লোকে সমুদ্রপথে কতদূর পর্য্যন্ত যাইত, তাহা বলা কঠিন। বালাহাশ্ব-জাতকে তাম্রপর্ণী দ্বীপের কল্যাণীগঙ্গার নাম আছে; সিংহল যক্ষদিগের বাসভূমি বলিয়া বর্ণিত। বাবেরু-জাতকে (৩৩৯) ব্যাবিলনের নাম পাওয়া যায়; শঙ্খ (৪৪২) ও মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) লিখিত আছে, বণিকেরা ধনপ্রাপ্তির আশায় সুবর্ণভূমিতে যাইত। সুবর্ণভূমি (Golden Chersonese) পূর্ব্ব উপদ্বীপের (অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় ও আনাম প্রভৃতি দেশের) নামান্তর। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে এদেশের বণিকেরা জলপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে মালয় এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ উপকূলের অনতিদূরে পোতচালন করিতেন এবং দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিতেন [বণ্ণুপথ (২)]। প্রতিকূল বায়ুবেগে উপকূল হইতে অধিক দূরে নীত হইলে, কোন দিকে স্থল পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পোষা কাক ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাক যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিতেন সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাককে 'দিশাকাক' অর্থাৎ দিকপ্রদর্শক কাক বলা হইত [বাবেরু (৩৩৯), ধর্ম্মধ্বজ (৩৮৪)]। ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া কখনও কখনও পোতগুলি সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও উপনীত হইত এবং নাবিকেরা তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভে বাড়বানল-দর্শনে ভয় পাইত [সুপ্পারক (৪৬৩)]।

আরব্য নৈশোপাখ্যানমালায় সিন্দবাদের কাহিনীতে এবং য়ুরোপবাসীদিগের প্রাচীন ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহে যেমন বিদেশের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখা যায়, জাতক-রচনাকালেও লোকের সেইরূপ নানাবিধ অলীক ধারণা ছিল।

অর্ণবপোত

অর্ণবপোতগুলির আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সমুদ্রবাণিজ-জাতকের যে পোতের কথা আছে, তাহাতে চড়িয়া এক সহস্র সূত্রধার-পরিবার দ্বীপান্তরে গিয়াছিল বলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত অত্যুক্তি। শীলানিশংস-জাতকে দেখা যায় অর্ণবপোতে তিনটি মাস্তুল থাকিত। য়ুরোপবাসীদিগের যে সকল জাহাজ পাল তুলিয়া সমুদ্র পার হয়, সেগুলিরও তিনটি মাস্তুল। মাস্তুলগুলি রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিত এবং পাল খাটাইবার জন্য উহাদের গায়ে অনেক এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ yard) যোড়া হইত।

সম্ভূয়সমুত্থান

বাণিজ্যে সম্ভূয়সমুত্থান প্রচলিত ছিল [সুহনু (১৫৮), জরুদপান (২৫৬))]।

কখনও দুই চারি জনে, কখনও বা বহুজনে সমবেত হইয়া মুলধন সংগ্রহপূর্ব্বক পণ্যক্রয় করিত, ইহা শকটে বা অর্ণবযানে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া যাইত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন করিয়া লইত। মনুসংহিতায় এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সম্ভুয়সমুত্থান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। কেহ কেহ নিজের বিষয়বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া বেশী লইতে চাহিত, কিন্তু সকল সময়ে সে দাবি টিকিত না। কুটবাণিজ-জাতকের (৯৮) অতিপণ্ডিত অতিবুদ্ধি দেখাইতে গিয়া ঠকিয়াছিল এবং শেষে সমান ভাগ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

ক্রয়বিক্রয়—মুদ্রা [১]

মনুসংহিতায় দেখা যায় (৮/৪০১, ৪০২) রাজা প্রতি পক্ষে বা প্রতি পঞ্চম দিবসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। জাতক বর্ণিতকালে কিন্তু এ প্রথার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন লোকে দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, সুলভতা অসুলভতা ইত্যাদি দেখিয়া মূল্য স্থির করিত; তজ্জন্য দর কষাকষিও বিলক্ষণ চলিত [অপণ্ণক (১), সেরিবাণিজ (৩), কৃষ্ণ (২৯), মৎস্যদান (২৮৮) ইত্যাদি]। রাজার 'অর্ঘকারক' নামক একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বোধ হয়, রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহাদেরই মূল্য স্থির করিতেন এবং উৎকোচের লোভে সময়ে সময়ে উপযুক্ত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতেন [তণ্ডুল নালী (৫)]।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও পাইকারী ও খূচরা উভয়বিধ ক্রয়বিক্রয়ই চলিত। খূচরা বিক্রয়ের জন্য দোকান থাকিত; কোন দোকানে বস্ত্র, কোথাও গন্ধ, কোথাও মাল্য ইত্যাদি বিক্রীত হইত; লোকে ফেরি করিয়াও বেড়াইত। ফেরিওয়ালারা পণ্যবস্ত্র কখনও নিজেরাই বহন করিয়া যাইত, কখনও বা গর্দ্দভাদির পৃষ্ঠে চাপাইত। পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। চুল্লশ্রেষ্ঠী-জাতকের (৪) বণিক্ ত এক পট্টনে গিয়া জাহাজসুদ্ধ সমস্ত মাল খরিদ করিয়াছিল। জনপদে যে সকল স্থানে পাইকারী ক্রয়বিক্রয় হইত, সেগুলির নাম ছিল 'নিগমগ্রাম'।

দ্রব্যের মূল্য স্থির হইলে লোকে বায়না (সত্যঙ্কার) দিত। বায়না লইলে সওদা ' পাকা' হইত। শেষে ঐ দ্রব্যের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি হইলেও সত্যঙ্কর গ্রহীতা কোন আপত্তি করিতে পারিত না [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪)]।

---

[১]। Journal of the Royal Asiatic Society নামক পত্রিকায় ১৯০১ অব্দে Mrs, Rhys Davids M. A নাম্নী বিদুষী Notes on Early Economic Conditions in Northern india নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই অংশের রচনাকালে তাহা হইতে কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি।

মুদ্রা

অতি প্রাচীনকালে মুদ্রা ছিল না। তখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান হইত। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন কোন অপরাধ করিলে রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক 'পশু' দণ্ড করিতেন, কারণ তখন পশুই বিনিময়ের প্রধান সাধন ছিল। এই কারণেই পশুবাচক pecus শব্দ হইতে উত্তরকালে ল্যাটিন ভাষায় ধনবাচক pecunia শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। অস্মদ্দেশেও বৈদিকযুগে অপরাধবিশিষে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক গোদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। জাতকের সময়ে দেখিতে পাই, তখন সমাজে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল; তবে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিবার প্রথাও যে না ছিল, এমন নহে।[১] তণ্ডুলনালী-জাতকে (৫) নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ তণ্ডুল দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিবার আভাস পাওয়া যায়। শুনক-জাতকে (২৪২) লিখিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র ও নগদ এক কাহণ দিয়া একটা কুকুর কিনিয়াছিল। রাজপুত্র বিশ্বন্তর (৫৪৭) এক ব্যাধকে যে একটা সুবর্ণ- সূচী দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বক্‌সিস্, ব্যাধদত্ত খাদ্যের মূল্য নহে।

জাতক রচনাকালে নির্দ্দিষ্ট ভারবিশিষ্ট ধাতু খণ্ডসমূহেই প্রধানতঃ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত, প্রদত্ত ও গৃহীত হইত, কড়িরও প্রচলন ছিল। তবে এই সকল ধাতুখণ্ড রাজকীয় আদেশে মুদ্রিত হইত, কিংবা যে কেহ ঐ সকল প্রস্তুত করিয়া গোরখপুরী ঢেপুয়ার ন্যায় চালাইত, তাহা বলা যায় না। বিনয়পিটকে 'রূপিয়' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ধাতুখণ্ডসমূহ মুদ্রিত করিবার প্রথা ছিল, কারণ কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'রূপিয়' বলিলে রূপাঙ্কিত (অর্থাৎ যাহাতে রাজাদির মুখ মুদ্রিত হইয়াছে) স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র- সর্ব্ববিধ ধাতুখণ্ডই বুঝাইত। জাতকে মুদ্রার বা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের এই নামগুলি পাওয়া যায় : নিক্‌খ (নিষ্ক), সুবণ্ণ (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাপণ (কার্ষাপণ), কংস (কের্ষ বা কাংস্য), পাদ, মাসক (মাষা), কাকণিকা (কাকিণী), সিপ্পিকা।

সিপ্পিকা = কপর্দ্দক [শৃগাল (১১৩)]। কাকণিকা = এক পণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২০ কপর্দ্দক। মাষা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ভারজ্ঞাপক। মনুর মতে (৮/১৩৪-১৩৭) ১ মাষা = ৫ রতি; ৪ মাষা = ১ পাদ। (অর্থাৎ এক কর্ষের চারি ভাগের এক ভাগ); ৪ পাদ বা ৮০ রতি = ১ কর্ষ। এ নিয়ম হইল তাম্রের সম্বন্ধে। মনু বলেন যে, তাম্র কার্ষিক, তাম্র কার্ষাপণ ও একার্থবাচক। রৌপ্যের সম্বন্ধে ১ মাষা = ২ রতি; ১৬ মাষা বা ৩২ রতি = ১ ধরণ। স্বর্ণের ভার নির্ণয়-পদ্ধতি তাম্রের সদৃশ। এক স্বর্ণ কর্ষ (৮০ রতি) = ১ সুবর্ণ; ৪ সুবর্ণ = ১ পল = ১ নিষ্ক =

---

[১]। এখনও সহরে পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে বাসন এবং পল্লীগ্রামে মোমের বিনিময়ে লবণ ও তণ্ডুলাদির বিনিময়ে তাম্বুলাদি ক্রয় করিবার প্রথা আছে।

৩২০ রতি। ১০ পল অর্থাৎ ৩২০০ রতি = ১ স্বর্ণ ধরণ। কিন্তু মনুর এই পদ্ধতি যে সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়েই পণ ও কাহণ শব্দদ্বয় ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়, কেন না ১ পণ = ৮০ কপর্দ্দক; ১৬ পণ = ১২৮০ কপর্দ্দক বা এক কাহণ। মনুর পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এবং স্বর্ণের মূল্য ২৪ টাকা ভরি ধরিলে ১ স্বর্ণ মাষা প্রায় ১। ০; এক সুবর্ণ প্রায় ২০ এবং এক নিষ্ক প্রায় ৮০ হয়। রৌপ্যের বর্ত্তমান মূল্য প্রতি ভরি এক টাকা ধরিলে এক রৌপ্যধরণের মূল্য। /৪ পাই হয়। কিন্তু তাম্র সম্বন্ধে এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া কঠিন, কারণ এ কর্ষ তাম্র এক ভরিরও কম এবং এক ভরি তাম্রের মূল্য প্রতি সের দুই টাকা ধরিলেও দুই পয়সার কম। এক কর্ষের মূল্য যখন এত অল্প, তখন এক মাষার মূল্য কিছুই থাকে না বলিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাম্র কর্ষের মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যদির আপেক্ষিক ছিল না; উহা কেবল বিনিময়ের সুবিধার জন্য নিদর্শন (token)-রূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়েও একটা পয়সার যে পরিমাণ তামা থাকে, শুদ্ধ ধাতুখণ্ড মাত্র মনে করিলে তাহার মূল্য এক পয়সা হয় না।[১] এখন আমাদের মুদ্রাগুলি রৌপ্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; পূর্ব্বে বোধ হয় স্বর্ণ-ভিত্তি ছিল, কারণ বৌদ্ধসাহিত্যে রৌপ্যর উল্লেখ অতি বিরল; পক্ষান্তরে বিনিময়ের জন্য সুবর্ণের ব্যবহার অনেক স্থানেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে রৌপ্যর খনি নাই বলিলেই হয়; কিন্তু স্বর্ণ বহুস্থানে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়েই পারস্যরাজ দ্বারা পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে যে কর পাইতেন, তাহা সুবর্ণে প্রদত্ত হইত। মনুও ধরণের অর্থাৎ ৩২ রতির ঊর্দ্ধে রৌপ্যের ভার-জ্ঞাপক অন্য কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই।

কার্ষাপণ

জাতকে 'কহাপণ' শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখা যায়; শতাদিক সংখ্যক হইলে ইহা উহ্য আছে বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু এ কহাপণ সোণার কি তামার, এবং রূপার কহাপণও ছিল কি না, সর্ব্বত্র তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যখন দেখা যায়, কোশলের এক ব্রাহ্মণ "হেরণ্নিকের" ফলক হইতে কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন, তখন মনে করিতে হইবে, তাহা সোণার [শীলমীমাংসা (৮৬)]। কিন্তু যখন দেখা যায়, রাজা একজন তীরন্দাজকে দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ বেতন দিতেন, কিংবা গ্রামভোজক এক ধীবরপত্নীর সামান্য অপরাধে আট কাহণ জরিমানা করিয়াছিলেন [উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)], তখন তাম্রকার্ষাপণ ধরাই

[১]। ইদানিং নিকেল নির্ম্মিত যে সকল আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে ও এই গাথা।

সুসঙ্গত। আবার যখন দেখি একজন দাসের মূল্য শত কার্ষাপণ ছিল [নন্দ (৩৯), দুরাজান (৬৪)], তখন সন্দেহ হয় সম্ভবতঃ রৌপ্যকার্ষাপণও চলিত। এই কার্ষাপণকে বর্ত্তমানকালের 'কাহণ' (ষোল পণ) বা এক টাকা মনে করিলে দাসের মূল্যসম্বন্ধে কিছুমাত্র অসঙ্গতি দোষ থাকে না।

আপেক্ষিক তারতম্য

মাষা, পাদ, কার্ষাপণ প্রভৃতির আপেক্ষিক মূল্যও সকল সময়ে সমান থাকিত না। শব্দের অর্থানুসারে ধরিতে ইহলে ৪ মাষায় ১ পাদ অর্থাৎ কার্ষাপণের সিকি। কিন্তু বিনয়পিটকে দেখা যায়, বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ নগরে ৫ মাষায় এক পাদ ধরা হইত। তাহা হইলে ২০ মাষায় এক কার্ষাপণ হয়। মনুর মতে ৪ সুবর্ণে এক নিষ্ক; কিন্তু পালিসাহিত্যে দেখা যায় ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক।[১] সুবর্ণকে মুদ্রা এবং নিষ্ককে ভারনির্দ্দেশক মাত্র মনে করিলে শেষোক্ত প্রভেদের একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ৪ সুবর্ণ এক নিষ্কের সমান হইলে সুবর্ণ গালাইয়া নিষ্কে পরিণত করার এবং ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক হইলে নিষ্ক গালাইয়া মেকী সুবর্ণ প্রস্তুত করার প্রলোভন অনিবার্য্য।

মুদ্রাসমূহের আপেক্ষিক মূল্য কত ছিল এবং একই নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার কোথায় কোনটী গ্রহণযোগ্য, এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গঙ্গামাল-জাতকে (৪২১) কাহাপণ, অর্দ্ধ, পাদ, চারি মাষা, মাষা এই মুদ্রাগুলির নাম আছে; কিন্তু লেখক ভাবিয়া দেখেন নাই যে পাদ ও চারি মাষা একই।

কংস

কর্ষ-ও কাংস্য উভয় শব্দই পালিতে 'কাংস'। Childers কৃত অভিধানে বলা হইয়াছে ১ কংস = ৪ কার্ষাপণ; কিন্তু জাতকার্থবর্ণনাকার 'কংস' ও 'কহাপণ' শব্দ একার্থবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [শৃগাল (১১৩)]।

হিরণ্য

অনাথপিণ্ডিক অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দ্বারা জেতবন ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হিরণ্য কি সুবর্ণের তুল্যার্থবাচক? কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে 'সুবর্ণ' বলিলে মুদ্রা এবং 'হিরণ্য' বলিলে অমুদ্রিত সুবর্ণ (স্বর্ণরেণু বা স্বর্ণপিণ্ড) বুঝাইতে; শেষে 'হিরণ্য' শব্দে 'সুবর্ণও' বুঝাইয়াছে। পরবর্ত্তী পালি সাহিত্যে

---

[১]। নিষ্কা শব্দটি বেদেও দেখা (ঋগ্বেদ ৪/৩৭৪)। কিন্তু উহা স্বর্ণমূদ্রা বা স্বর্ণনির্ম্মিত আভারণবিশেষ, তাহা বলা কঠিন।

দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদ জেতবনক্রয়ের জন্য অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দেন নাই, 'মসুরান' দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্থ-নিষ্পত্তির কোন সুবিধা হয় না, কেন না 'মসুরান' বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠীপুঙ্গব অষ্টাদশ কোটি তাম্রকার্ষাপণই দিয়াছিলেন; উত্তরকালে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। জাতকে যে সকল অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ধনকুবেরের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও, বোধ হয়, তাম্রকার্ষাপণকে পরিমাণের একক ধরিলে সম্ভব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

কতকগুলি দ্রব্যের মূল্যের তালিকা

বহু জাতকে বহু দ্রব্যের বহুরূপ মূল্যের উল্লেখ দেখা যায়। সহস্রকার্ষাপণ মূল্যের পাদুকা ইত্যাদি লেখকের কল্পনাসম্ভূতই বলা যাইতে পারে। পঞ্চশত, সহস্র, অশীতিকোটি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ পালি লেখকদিগের হাতে মামুলি বিশেষণ স্বরূপ। তবে নিম্নলিখিত তালিকার যথার্থ্যসম্বন্ধে বোধ হয় তত সন্দেহের কারণ নাই :

এক পাত্র সুরার মূল্য এক মাষা [ইল্লীশ (৭৮)]।

একটা বড় রুই মাছের মূল্য সাত মাষা [মৎস্যদান (২৮৮)]।

একটা কৃকলাসের ভোজনোপযোগী মাংসের মূল্য আধ মাষা [মহাউম্মর্গ (৫৪৬)]।

একটা গর্দ্দভের মূল্য আট কাহণ (রৌপ্য কি?) [ঐ]।

দুইটা বলদের মূল্য চব্বিশ কাহণ [গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)][১] [কৃষ্ণ (২৯)]।

গাড়ী টানিয়া নদী পার করিবার জন্য বলদের ভাড়া গাড়ী প্রতি ২ কাহণ (তাম্র কি?) [কৃষ্ণ (২৯)]।

একবার কামাইবার জন্য নাপিতের দক্ষিণা আট কাহণ (তাম্র?) সুপ্পারক ৪৬৩)]।

সুরা তীক্ষ্ণ ও উৎকৃষ্ট হইলে অধিক মূল্য বিক্রিত হইত। বারুণি-জাতকের (৪৭) বর্ত্তমান বস্তুতে লিখিত আছে, আনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক শৌণ্ডিক স্বর্ণের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ মদ্য বিক্রয় করিত। সুরাপান-জাতক-বর্ণিত (৮১) কাপোতিকা সুরাও বোধ হয় মহার্ঘ ছিল। পক্ষান্তরে পচুই, তাড়ি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খুব সুলভ ছিল এবং দরিদ্রেরা তাহাই পান করিয়া মত্ততাসুখ ভোগ করিত। শাকসবজি প্রভৃতি মূল্যও খুব কম ছিল। সৌমনস্য-জাতকে (৫০৫) দেখা যায়, এক ভণ্ড তপস্বী এই ব্যবসায়ে মাষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রায় তাহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছিল। চুল্লকশ্রেষ্ঠী-জাতকের (৪) নায়ক বারানসীতে (হোরা কি প্রহর

---

[১]। স্মার্ত্তদিগের মতে একটা পয়স্বিনী দেনরি পারিভাষিক মূল্য তিন কাহণ মাত্র।

হিসাবে বলা যায় না) আট কাহণে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। চন্দন অতি মহার্ঘ ছিল [মহাস্বপ্ন) (৭৭); কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। শেষোক্ত-জাতকে চন্দনসারের মূল্য লক্ষ মুদ্রা এবং কাঞ্চনহারের মূল্য সহস্র মুদ্রা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে!

গুরুদক্ষিণা

আচার্য্যভাগ অর্থাৎ অগ্রিম গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্রকার্ষাপণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। দূতজাতক (৪৭৮)-বর্ণিত ব্রাহ্মণকুমার গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া সাত নিষ্ক সংগ্রহ করিয়াছিল। সাত নিষ্ক = ২৮সুবর্ণ বা (স্বর্ণ কার্ষাপণ) অগ্রে দেয় সহস্রকার্ষাপণের তুলনায় অতি তুচ্ছ। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা দরিদ্রের শিষ্যের ভিক্ষোপার্জ্জিত অর্থ। আর যদি সহস্রকার্ষাপণকে সহস্র রৌপ্য কার্ষাপণ মনে করা যায়, তাহা হইলে উভয়বিধ দক্ষিণার অন্তর তত বেশি থাকে না।

দীনার

জাতকের দীনারের উল্লেখ দেখা যায় না। "দীনার" গ্রীক্ শব্দ এবং যখন গ্রীকেরা এ দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার পর এখানে এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। জাতকের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে দীনারের অনুল্লেখ একটি গৌণ প্রমাণরূপে ধরা যাইতে পারে।[১]

ধনরক্ষা

চোর, অরি, রাজা, জল ও অগ্নি এই উপদ্রবপঞ্চকে ধন নাশ হইত বলিয়া লোকে উদবৃত্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত [নন্দ (৩৯), খদিরাঙ্গার (৪০) সতংকিল (৭৩), বভ্রু (১৩৭) ইত্যাদি]। এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে টাকা খাটাইবার এত সুবিধা হইয়াছে; তথাপি কেহ কেহ এ অভ্যাস একেবারে ছড়িতে পারে নাই।

ঋণদান

পালি সাহিত্যে ঋণদান প্রথার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৃদ্ধির (সুদের) হার কি

---

[১]। মহাভারতে বিশ্বমিত্র, কণ্ব ও নারদের শাপে যদুবংশের ধ্বংস হইয়াছিল এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু ঘট জাতকের (৪৫৫) ইহাদের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও লেখা আছে, "বৃষ্ণিসজ্ঘশ্চ দ্বৈপায়নমত্যাসাদয়ন" (৩য় প্রঃ)। সম্ভবতঃ পুরাকালে দ্বৈপায়নের ক্রোধই যদুবংশের নাশের কারণ বলিয়া বিদিত ছিল; শেষে দ্বৈপায়নের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঋষির স্কন্ধে দোষারোপ করা হইয়াছে। জাতকের প্রাচীনত্বের ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

ছিল তাহা জানা যায় না। গৌতমের স্মৃতিশাস্ত্রে সাধারণ সুদের মাসিক হার বিশ কাহণে ৫ মাষা, অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক প্রায় ১৮%। যে ইহার অতিরিক্ত বৃদ্ধি গ্রহণ করিত, সে বার্দ্ধুষিক বা কুসীদ অর্থাৎ হীনকর্ম্মা বলিয়া নিন্দিত হইত। ঋণ দুইভাবে গৃহীত হইত পর্ণ অর্থাৎ খত বা handnote দিয়া এবং আধি অর্থাৎ বন্ধক রাখিয়া। থেরীগাথাতে দেখা যায়, কেহ ঋণ শোধ করিতে না পারিলে উত্তমর্ণ তাহার সন্তানদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করিতে পারিত। স্থবিরা ঋষিদাসী নিজের এক অতীত জন্মকাহিনীতে বলিয়াছেন :

শকটচালক দরিদ্রের

কন্যা হয়ে জন্মিলাম; ঋণগ্রস্ত বহুবণিকের।
অনেক সুদের দায়ে শ্রেষ্ঠী এক একদা বান্ধিয়া
ধরে নিয়ে গেল মোরে। ... ...[১]

ঋণ পরিশোধ করিবার কালে অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে লেখন অর্থাৎ রসিদ পাইত এবং পর্ণখানি ফিরাইয়া লইত [খদিরাঙ্গার (৪০)]।

ঋণদান বৌদ্ধদিগের মধ্যে দোষবহ ছিল না; রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) দেখা যায়, কৃতজ্ঞ রাজা ব্যাধকে কৃষি, বাণিজ্য, ঋণদান কিংবা উঞ্ছচর্য্যা, এই চারিটি শুদ্ধবৃত্তির যে কোন একটা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে বার্দ্ধুষিক সর্ব্ব সমাজেই ঘৃণার্হ। মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) কুসীদজীবী ভণ্ড তপস্বীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভিক্ষু হইতে পারে না। মনু একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধির পরিমাণ কখনও মূল ঋণের পরিমাণকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়েও বিচারকেরা সুদের পরিমাণ আসল টাকার বেশী হইতে দেন না। এব্যবস্থায় অর্থগৃধু উত্তমর্ণদিগের অত্যাচার যে অনেক পরিমাণে দমন হইত ও হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রুরু-জাতকে (৪৮২) বর্ণিত আছে, এক অধমর্ণ দেউলিয়া হইয়া উত্তর্ণদিগের নিকট ঋণমুক্ত হইবার এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। সে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উত্তমর্ণদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, আপনারা খতগুলি লইয়া অমুক সময়ে নদীতীরে অমুক স্থানে উপস্থিত হইবেন। সেখানে ভূগর্ভে আমার ধন প্রোথিত আছে, আমি তাহা উত্তোলন করিয়া আপনাদের সমস্ত প্রাপ্য চুকাইয়া দিব। উত্তমর্ণেরা তাহাই করিয়াছিল, এবং সে সকলের সমক্ষে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

---

[১]। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত থেরীগাথা হইতে উদ্ধৃত।

দুঃখের বিষয়, ইহাতেও তাহার প্রাণ যায় নাই; সে উদ্ধার পাইয়া আরও কত পাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

(ণ) ব্যবসায়ী সমিতি—শ্রেণী, গণ, সঙ্ঘ

সচরাচর একব্যবসায়ী বহুলোকে একস্থানে বাস করিত। অনীলচিত্ত (১৫৬) এবং সমুদ্রবাণিজ-জাতকে (৪৬৬) 'কুলসহস্রনিবাস' সূত্রধার-গ্রামের কথা আছে। সূচী-জাতকে (৩৮৭) যে 'কম্মার গ্রাম' দেখা যায় তাহাতে সহস্র ঘর কর্ম্মকার থাকিত। লোশক-জাতকের (৪১) 'কৈবর্ত্তগ্রামে হাজার ঘর কৈবর্ত্তের বসতি ছিল। বারাণসীর দন্তকারেরা একটা স্বতন্ত্র মহল্লায় থাকিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ চোরগ্রাম, চণ্ডালগ্রাম, নিষাদগ্রাম প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়।

একব্যবসায়ী এত লোক এক সঙ্গে থাকিত বলিয়া তাহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ের পরিচালনার্থ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালনপূর্ব্বক সমিতিবদ্ধ হইত। এই সকল সমিতির নাম ছিল শ্রেণী, গণ বা সঙ্ঘ। জাতকে 'শ্রেণী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্যেক সমিতির একজন নেতা থাকিতেন; তাঁহার উপাধি ছিল 'জেট্ঠক' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ।[১] যিনি কর্ম্মকারশ্রেণীর নায়ক, তাঁহাকে বলা হইত 'কম্মারজেট্ঠক' [সূচী (৩৮৭), কুশ (৫৩১)]। এইরূপ মালাকারজেট্ঠক [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)], বদ্ধকিজেট্ঠক [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)], সত্থবাহজেট্ঠক [জরূপান (২৫৬)][২], এমন কি চোরজেট্ঠক (চোরের সর্দ্দার) পর্য্যন্ত দেখা যায় [শতপত্র (২৭৯), শক্তিগুল্ম (৫০৩)]। যিনি শ্রেণীদিগের প্রধান, তাঁহাকে বর্ত্তক-জাতকে (১১৮) 'উত্তরশ্রেষ্ঠী বলা হইয়াছে।

সম্প্রদায়বিশেষের জ্যেষ্ঠেরা রাজসভায় বেশ প্রতিপত্তিভাজন ছিলেন। উরগ-জাতকের (১৫৪) শ্রেণীনায়কদ্বয় কোশলরাজের মহামাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সূচী-জাতকের কর্ম্মকারজ্যেষ্ঠ 'রাজবল্লভ' ছিলেন। রাজসবায় 'ভাণ্ডাগারিক' নামধেয় যে অমাত্য থাকিতেন, ন্যগ্রোধ-জাতকে (৪৪৫) তিনি 'সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন 'সেণিভণ্ডন' অর্থাৎ এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর কিংবা একই শ্রেণীর মধ্যে কলহ হইত [উরগ (১৫৪), নকুল (১৬৫)] সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ অমাত্য বোধ হয় তখন তাহা মিটাইয়া দিতেন। সর্ব্বশ্রেণী বলিলে কতটি শ্রেণী বুঝিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকে [মূকপঙ্গু (৫৩৮), মহাউন্মার্গ (৫৪৬)] অষ্টাদশ শ্রেণীর

---

[১]। কোন কোন স্থানে দেখা যায় 'মহা'ও 'চুল্ল' বিশেষণ দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহাশ্রেষ্ঠী, চুল্লশ্রেষ্ঠী, মহাবর্দ্ধকী ইত্যাদি।

[২]। এখানে 'সার্থবাহ' শব্দের অর্থ বণিক।

উল্লেখ আছে। এই ‘অষ্টাদশ শব্দটি একটা মামুলি বিশেষণ, কিংবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক, তাহা বলা কঠিন। মহাউন্মার্গ-জাতকে অষ্টাদশ শ্রেণীর বর্ণনায় “বদ্ধকি-কম্মার-চম্মকার-চিত্তকারাদিনানাশিপ্পকুসলা’ এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

‘শ্রেণী’ ছিল; কিন্তু তাহার মাহাত্ম্যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ধর্ম্মঘট হইয়া সমাজ ওলট পালট হইত বলিয়া মনে হয় না। কেবল সমুদ্র-বাণিজ জাতকে কথিত আছে, সূত্রধারেরা তাহাদের উত্তরকালীন বংশধরদিগের ন্যায় লোকের নিকট অগ্রিম টাকা লইয়াও কাজ দিত না। লোকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করার শেষে তাহারা গ্রামসুদ্ধ লোকে পলায়ণ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল।

সন্ন্যাসীজীবনে, বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের মধ্যে সঙ্ঘের নিয়মপালন-সম্বন্ধে খুব বান্ধবান্ধি দেখা যায়। বিহারগুলি বৌদ্ধসঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। কেহ উদ্যানাদি কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা ব্যক্তিবিশেষকে দিতেন না, ‘বুদ্ধপ্রমুখ’ সঙ্ঘকে দিতেন। ভাণ্ডারে ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য থাকিত; ভিক্ষুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজনমত তাহা হইতে পাত্র-চীবর-তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল দ্রব্য বণ্টন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী থাকিতেন। ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে ‘ভাণ্ডাগারিক’ বলা হইত। যিনি তণ্ডুল বণ্টন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল ‘ভক্তোদ্দেশক’। যাঁহারা কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান, নির্ভীক ও ধীরপ্রকৃতি, ঈদৃশ প্রবীণ ব্যক্তিরাই ভক্তোর্দ্দেশকের পদে বৃত হইতেন [তণ্ডুলনালী (৫)]। অনেক লোক একসঙ্গে থাকিলে মতভেদ ও বিবাদ অপরিহার্য্য। কৌশাম্বী-জাতকে (৪২৮) দেখা যায়, একবার তত্রত্য ঘোষিতারামে ভিক্ষুদিগের মধ্যে এমন কলহ ঘটিয়াছিল যে, স্বয়ং বুদ্ধদেবও তাহা মিটাইতে পারেন নাই।

পল্লীসমিতি

শিল্পী ও ভিক্ষুদিগের সমিতি বা সঙ্ঘের কথা বলা হইল। এতড্ভিন্ন পল্লীসমিতিও ছিল। গ্রামবাসীরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া সাধারণহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত হইয়াছে যে, গ্রামস্থ লোকেরা গ্রাম্যকর্ম্মসাধনার্থ একস্থানে সমবেত হইত, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি কতিপয় গ্রামবাসী মিলিত হইয়া ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করিতেন। লোশক (৪১) ও তক্কজাতকে (৬৩) দেখা যায়, গ্রামবাসীরা পাঠশালা স্থাপন করিত এবং শিক্ষকের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। রাজা মৃগয়ার সময়ে বেগার ধরিতেন বলিয়া লোকের অসুবিধা হইত; এই জন্য পল্লীবাসীরা কখনও কখনও সমবেত হইয়া নানা দিক হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া রাজার সুবিধার জন্য এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিত [ন্যাগ্রোধমৃগ (১২), নন্দিকমৃগ (৩৮৫)]। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) লিখিত

আছে; একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের সমস্ত লোকে গ্রামভোজকের নিকট হইতে যৌথ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। মহা-উন্মার্গ জাতকের (৫৪৬) ঔষধকুমার চাঁদা তুলিয়া ক্রীড়াশালা, পান্থশালা, বিচারগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে, যদিও গ্রামভোজক রাজার প্রতিনিধিভাবে করসংগ্রহ ইত্যাদি কতগুলি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি অনেক কার্য্য গ্রামবাসীরা আপনারাই সম্পন্ন করিত। ধর্ম্মশালা-প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

সমিতির মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সময়ে সময়ে সংবহুলিক দ্বারা অর্থাৎ vote লইয়া তাহার মীমাংসা হইত [সুনীল (১৬৩); কাষার (২২১)]। কোন বৃহদব্যাপারে অনুষ্ঠান করিলে কখনও এক একটি শ্রেণীর লোকে, কখনও সমস্ত নগরবাসী বা গ্রামবাসী চান্দা তুলিত এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিত।

অন্তেবাসিক

ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অন্তেবাসিক (অন্তেবাসী, apprentice) রাখিবার পদ্ধতি ছিল। সাধারণতঃ ব্যবসায়মাত্রই বংশগত হইলেও কেহ কেহ নৈপুণ্যলাভের জন্য কোন না কোন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর অন্তেবাসী হইত এবং তাহার তত্ত্বাবধানে খাটিয়া কাজ শিখিত। বারুণি-জাকতকে (৪৭) আনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক সুরাবিক্রেতার অন্তেবাসিকের কথা আছে এবং আপানস্বামীকে ‘আচার্য্য’ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই আখ্যায়িকায় অন্তেবাসিক ও আচার্য্য শব্দে একটু শ্লেষ, একটু বিদ্রূপের ভাব আছে, কারণ তাঁহাদের মতে, এই শব্দদ্বয় কেবল বিদ্যাদাতা ও বিদ্যার্থীর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কুশ-জাতক (৫৩১) পাঠ করিলে দেখা যায়, এ অনুমান ভিত্তিহীন। ইক্ষাকুরাজ কুশ নিজের পত্নী প্রভাবতীকে পাইবার জন্য শ্বশুরালয়ে ছদ্মবেশে একে একে মদ্ররাজের কুম্ভকার, নলকার, মালাকার ও পাচক, এই সকলের ‘অন্তেবাসিক’ হইয়াছিলেন এবং ইহাদের সকলকেই ‘আচার্য্য’ বলিয়াছিলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংগ্রহ করিলে মনে হয়, অন্তেবাসীরা স্ব স্ব প্রভুর গৃহেই বাস করিত।

(৩) দাসত্ব—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দাস। দাসদিগের অবস্থা

পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও দাস রাখিবার প্রথা ছিল। মনুসংহিতায় (৮/৪১৫) সপ্তবিধ দাসের উল্লেখ আছে—ধ্বজাহৃত (অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে দাসীকৃত), ভক্তদাস (অর্থাৎ যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে), গৃহজ [অর্থাৎ দাসীর গর্ভজ; ইহাদিগকে গর্ভদাসও (born slaves)

বলা যায়], দণ্ডদাস (অর্থাৎ যাহারা রাজাদিষ্ট ধনদণ্ড শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া দাসত্ব করে), ক্রীত, দত্ত্রিম ও পৈতৃক। শেষের তিনটিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে মনুর গ্রন্থে আমরা পাঁচ প্রকার দাস দেখিতে পাই। বিদূরপণ্ডিত-জাতকে (৫৪৫) কিন্তু চারিপ্রকার দাসের নাম আছে : (১) আমায় দাস অর্থাৎ গর্ভদাস, (২) ক্রীত দাস, (৩) যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক দাসত্ব করে এবং (৪) যাহারা দস্যুভয়ে অন্যের আশ্রয় লইয়া তাহার দাস হয়। বলা বাহুল্য শেষোক্ত দুই প্রকার দাস ভক্তদাসের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত আছে, রাজা এক অত্যাচারী গ্রামভোজককে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ দাসকে মনুর 'দণ্ডদাসের' মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। আবার তক্ক (৬৩), চুল্লনারদ (৪৭৭) প্রভৃতি কয়েকটি জাতকে দেখা যায়, দস্যুরা প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে লইয়া যাইত। পালিসাহিত্যে এইরূপ ধৃত হতভাগ্যেরা 'করমর' নামে অভিহিত। ইহারা মনুর 'ধ্বজাহৃত'দিগেরই অনুরূপ।

মনুর মতে দাসেরা 'অধন'[১]। নামসিদ্ধিক-জাতকে (৯৭) দেখিতে পাই, ধনপালী নাম্নী এক দাসীর প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে অপরের গৃহে খাটাইয়া ধনোপার্জ্জন করাইত এবং একদিন সে কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে দাসদাসী যে সম্পূর্ণ 'অধন', তাহা বুঝা যায় না। কারণ প্রভুর আদেশে অন্যের বাড়ীতে খাটা এবং প্রভুর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া অবসরকালে অর্থ অর্জ্জন করা এক নহে। কৌটিল্যের মতে দাস "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মাবিরুদ্ধং লভেত, পিত্র্যং চ দায়ং" অর্থাৎ স্বামীর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া বিত্ত উপার্জ্জন করিতে পারে, পৈতৃক সম্পত্তিও প্রাপ্ত হয়। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "দাসস্য বিত্তাপহারিণোহর্দ্ধদণ্ডঃ" অর্থাৎ দাসস্বামী দাসের বিত্তহরণ করিলে অর্দ্ধদণ্ড ভোগ করিবেন। তিনি বলেন, "দাসদ্রব্যস্য জ্ঞাতয়ো দায়াদাঃ, তেষামভাবে স্বামী" অর্থাৎ দাসের জ্ঞাতিরা তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী, জ্ঞাতি না থাকিলেও স্বামী। ফলতঃ দাসের অবস্থা যে মনুর সময় অপেক্ষা কৌটিল্যের সময়ে অনেক ভাল ছিল, অর্থশাস্ত্র পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়।[২]

---

[১]। ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম। (মনু, ৮/৪১৬)

[২]। "প্রেতবিন্মুত্রোচ্ছিষ্টগ্রাহিণামাহিতস্য নগ্নস্তাপনং দণ্ডপ্রেষণমতিক্রমণং চ স্ত্রীণাং মুল্যনাশকরম"—কেহ দাসের দ্বারা শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও উচ্ছিষ্ট বহন করাইলে, তাহাদিগকে নগ্ন অবস্থায় রাখিলে, প্রহার করিলে বা অযথা গালি দিলে, কিংবা কোন দাসির সতীত্ব নাশ

জাতক-পাঠেও প্রতীতি হয় যে, দাসস্বামীরা দাসদাসীদিগকে সাধারণতঃ সদয়ভাবেই পালন করিতেন। নন্দদাস [নন্দ (৩৯)] তাহার প্রভুর এত বিশ্বাসভাজন ছিল যে, কোথায় তাঁহার ধন প্রোথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি নন্দকেই তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন। কটাহক-জাতকের (১২৫) নায়ক গর্ভদাস ছিল; সে প্রভুপুত্রের সহিত পাঠশালায় যাইত এবং এইরূপে বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইত বটে যে, কোনদিন সামান্য একটু দোষ পাইলেই হয়ত প্রভু তাহাকে প্রহার করিবেন, দাগা দিবেন বা বন্দী করিয়া রাখিবেন, এবং এজন্যই সে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন ধরা পড়িয়াছিল, তখন প্রভু তাহাকে কোন দণ্ড দেন নাই, তাহাকে পুনর্ব্বার দাসত্বেও নিয়োজিত করেন নাই। নানাচ্ছন্দ-জাতকের (২৭৯) ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কি বর চাহিবেন ইহা স্থির করিবার জন্য, যেমন নিজের পুত্রকলত্রের, সেইরূপ পূর্ণানাম্নী দাসীরও সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। উরগ-জাতকে (৩৫৪) যে ব্রাহ্মণের কথা আছে, তিনি পত্নী, পুত্র, পুত্রবধু ও একজন দাসী লইয়া গৃহস্থালী করিতেন। ইহাদের সকলের মধ্যেই বেশ প্রীতির বন্ধন ছিল; অন্য সকলের ন্যায় দাসীও পঞ্চশীল পালন করিত এবং যথালব্ধ-নিয়মে দান করিত। এই ব্রাহ্মণের পুত্র যখন সর্পদংশনে মারা যায়, তখন ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুণে কেহই অশ্রুপাত করে নাই। ইহা দেখিয়া ছন্দবেশী শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই মৃতব্যক্তি বোধ হয় তোমার উপর অত্যাচার করিত। তাই আপদ্ গিয়াছে ভাবিয়া কান্দিতেছ না।" দাসী উত্তর দিয়াছিল, "এমন কথা বলিবেন না, মহাশয়! আমি বাছাকে কোলে পিঠে মানুষ করিয়াছিলাম। তাহার মত লোকে কি কখনও অত্যাচার করিতে পারে? তবে যে কান্দিতেছি না, তাহার কারণ এই যে, যেমন জলের কলসী ভঙ্গিয়া গেলে তাহা যোড়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ যে মরিয়াছে, কান্দিয়া কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারে না।" শ্রীকালকর্ণী (৩৮২) এবং গঙ্গমাল-জাতকেও (৪২১) দেখা যায়, শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর গৃহে দাসকর্ম্মকারাদি পরিজন সুখে স্বচ্ছন্দ বাস করিত ও ধর্ম্মপথে চলিত।

দাসের মূল্য

পূর্ব্বকালে একজন দাস বা দাসীর মূল্য কত ছিল, বলা যায় না। সম্ভবতঃ

করিলে, তিনি যে মূল্যে ঐ দাস বা দাসিকে ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইবে, অর্থাৎ উৎপীড়িত দাস নিস্ক্রয় না দিয়াই মুক্তি লাভ করিবে। "স্বামিনস্তস্যাং দাস্যাং জাতং সমাতৃকম অদাস; বিদ্যাৎ"—দাসস্বামীর ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে দাসী ও তাহার সন্তান উভয়েই অদাস হইবে। যে প্রকার দাসই হউক না কেন, নিস্ক্রয় দিলে তৎক্ষণাৎ আর্য্যত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা পাইবে (অর্থশাস্ত্র, ৬৫ প্রকরণ)।

বয়স, কার্য্যক্ষমতা ইত্যাদির তারতম্যানুসারে মূল্যেরও তারতম্য ঘটিত। নন্দ-জাতক (৩৯) এবং দুরাজান-জাতকে (৬৪) দেখা যায়, শতকার্ষাপণ যেন খুব উচ্চ মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। শক্তুভস্ত্রা-জাতকে (৪০২) কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণ দাসক্রয়ের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন এবং যখন সাত শত কার্ষাপণ পাইয়াছিলেন, তখন ভাবিয়াছিলেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) আছে, জূজক এক দাসী ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট একশত কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছিল; কিন্তু ঐব্রহ্মণ ধন নিজে খরচ করে এবং জূজক যখন উহা ফেরত চায়, তখন উহার বিনিময়ে তাহাকে নিজের কন্যা অমিত্রতাপনাকে দান করে। বিশ্বন্তর নিজের পুত্র ও কন্যাকে জূজকের দাসত্বে নিয়োজিত করিবারকালে পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে সহস্র কার্ষাপণ নিষ্ক্রয় দিলে দাসত্বমুক্ত হইবে; তোমার ভগিনী সুন্দরী ও রাজকুমারী; দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, গো ও নিষ্ক, এই সমস্ত প্রত্যেকটি শতপরিমাণে না দিলে তাহার নিষ্কয় পর্য্যাপ্ত হইবে না। রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও এত মূল্য দিবার সাধ্য নাই, কাজেই মুক্তি লাভ করিতে পারিলে সে রাজমহিষী হইবে।" রাজপুত্র ও রাজকন্যার মূল্য যত ইচ্ছা তত বেশী বলা যাইতে পারে; কিন্তু অন্য দাসদাসীর সম্বন্ধে কি মূল্য অনুমান করা সঙ্গত? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কার্ষাপণ বলিলে যে কি বুঝায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রৌপ্যকার্ষাপণে ১২৮০ কড়া—এক টাকা। যদি উল্লিখিত জাতকগুলির কার্ষাপণ এই অর্থে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে প্রাচীনকালে সাধারণতঃ কোন দাসদাসীর মূল্য একশত টাকার অধিক ছিল না।

কর্ম্মকার

যাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইয়া জন খাটিত, তাহাদের নাম ছিল ভৃতিক (পালি 'ভাতক') ও কর্ম্মকর। কর্ম্মকরেরা নগদ বেতন লইত [সুতনো (৩৯৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫); কখনও বা পেটভাতে খাটিত [গঙ্গমাল (৪২১)]। কোন কোন জাতকে দাস ও কর্ম্মকর উভয় শ্রেণীর শ্রমজীবীরই উল্লেখ দেখা যায়। মনুর সপ্তম অধ্যায়ে (১২৬) কর্ম্মকরদিগের বেতন নির্দ্দেশ করা আছে। যাহারা অপকৃষ্ট ভৃত্য অর্থাৎ গৃহাদির সম্মার্জ্জনকারী ও জলবাহক, তাহারা প্রতিদিন একপণ, প্রতিমাসে এক দ্রোণ ধান্য এবং প্রতি ছয় মাসে এক যোড়া কাপড় পাইত। আট মুষ্টি ধানে এক কুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢ়ক এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। যদি এক মুষ্টিকে এক ছটাক ধরা যায়, তাহা হইলে ১ কুঞ্চি = আধ সের; ১ পুষ্কল=/৪; ১ আঢ়ক=।৬ এবং ১ দ্রোণ=১।।৪। ইহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে তুলনা করিলে সে কালে শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অপকৃষ্ট ছিল না।

(থ) আমোদ, উৎসব

জাতক নক্‌খত্ত (নক্ষত্র) এবং ছণ (ক্ষণ) এই দুইটি শব্দে পর্ব্ব বা উৎসব বুঝায়। ইহাতে মনে হয়, নির্দ্দিষ্ট মাসে বার তিথিনক্ষত্রাদিবিশেষের সংযোগে অর্দ্ধোদয়াদি যোগসংঘটনের ন্যায় উৎসবেরও সময় নির্দ্ধারিত করিবার রীতি ছিল; উহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য ভেরীবাদনাদি দ্বারা ঘোষণা করা হইত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব হইত কার্ত্তিকী মাসে। উন্মাদয়ন্তী-জাতকে (৫২৭) লিখিত আছে যে, এই উৎসব কার্ত্তিক পূর্ণিমায় আরব্ধ হইত এবং বর্ত্তকজাতক (১১৮)-পাঠে বুঝা যায় ইহা সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা হইয়া থাকে; জাতকবর্ণিতকালে তদানীন্তন ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত কার্ত্তিকোৎসবের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না।

কার্ত্তিকোসৎব

কার্ত্তিকোৎসব ব্যতীত সময়ে সময়ে আরও অনেক উৎসব হইত। উৎসবে নৃত্য, গীত, ও বাদ্য হইত [ভেরীবাদক (৫৯), গুপ্তিল (২৪৩), পাদকুশলমাণব (৪৩২)], এবং সাপুড়েরা সাপ ও বানর লইয়া খেলা দেখাইত [শ্যালক (২৪৯), অহিতুণ্ডিক (৩৬৫)]। অতি দরিদ্রলোকেও সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও গন্ধমাল্যদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দিত [পুষ্করক্ত (১৪৭), গঙ্গমাল (৪২১)]। উৎসবের একটা প্রধান উপসর্গ ছিল সুরাপান [তুণ্ডিল (৩৮৮), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। সুরাপান-জাতকে (৮১)

সুরাপান

এক উৎসব সরোৎসব (সুরানক্‌খত্ত) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন গ্রীকদিগের Dionysia এবং রোমকদিগের Bacchanalia নামক বীভৎস উৎসবের কথা মনে পড়ে। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, এক মজুরের ও তাহার রক্ষিতা স্ত্রীর এক মাষক মাত্র সম্বল ছিল, অথচ তাহারা স্থির করিয়াছিল যে উৎসবে গিয়া ইহারই এক অংশে মাল্য, এক অংশে গন্ধ ও এক অংশে সুরা ক্রয় করিবে। মাষক বলিলে কার্ষাপণের ষোল ভাগের এক ভাগ বুঝায়। যদি রৌপ্যকার্ষাপণও ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসুদ্ধ এক আনা মাত্র পুঁজি লইয়াই তাহাদের এতদূর স্ফুর্ত্তি হইয়াছিল! কুর্ম্মি, কাহার, বাউরি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এখনও দারিদ্র্য ও অপরিণামদর্শি-বিলাসের এইরূপ অদ্ভুত সমবায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালের শৌণ্ডিকালয়ের ন্যায় তখনও নানা স্থানে পানাগার (আপান) ছিল। সুরাপায়ীরা সেখানে গিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিত।

নট : ঐন্দ্রজালিক

উৎসব ব্যতীত অন্যত্রও লোকে ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চণ্ডালেরা বাঁশ নাচাইতে [চিত্তসম্ভুত (৪৯৮)], লঙ্ঘননটেরা শক্তি লঙ্ঘনাদি ক্রীড়া দেখাইত [দুর্ব্বচ (১১৬)] এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি গিলিয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইত [দর্শাণক (৪০১)]। জাতকের যে সকল নটের উল্লেখ আছে, তাহারা নৃত্যগীত ও ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভৃতিতে বেশ নিপুণ ছিল। মনুর মতে (১০/২২) নটেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়; কিন্তু জাতক বর্ণিত সময়ে ইহাদের ব্যবসায় জাতিগত হইয়াছিল কি না বলা যায় না। যাহারা 'ভবঘূরে', তাহারা ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া দিনপাত করিয়া বেড়াইত।[১] তিত্তির-জাতকে (৪৩৮) একটা ভবঘুরের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে :

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্যভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক গেল দেশ দেশান্তরে।
*   *   *   *   *   *
মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ডযুদ্ধ দর্শকসমাজে।
আবার ব্যাধের সঙ্গে মিলিত হইয়া
ধরিল বনের পশু বিস্তারি বাগুরা।
*   *   *   *   *   *
আজীবক হ'ল শেষে; প্রব্রজ্যারকালে
তপ্তপিণ্ডে হস্ত দগ্ধ হ'ল পাপাত্মার।

উচ্ছৃঙ্খল ধনিপুত্রদিগকে 'কাপ্তেন ধরা' এবং অল্পে অল্পে তাহাদের স্বর্ব্বস্ব শোষণ করা—ইহাও নটদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একটা সহজ উপায় ছিল। ভদ্রঘট-জাতকে (২৯১) লিখিত আছে, বোধিসত্ত্বের পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর মদ্যাসক্ত হইয়াছিল; সে লঙ্ঘননট, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য, উন্মত্তের ন্যায় অবিরত কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইত এবং এইরূপে অচিরে চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও নটেরা বোধ হয় সঙ্গতিশালী হইতে পারিত না। উচ্ছিষ্টভক্ত (২১২) জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্ব যে নটকুলে জন্মগ্রহণ

---

[১]। রত্নাবলী নাটকে যে ঐন্দ্রজালিকের কথা আছে, বিদুষক তাহাকে একাধিক বার দাস্যাঃ পুত্র বলিয়াছে।

করিয়াছিলেন, তাহা ভিক্ষোপজীবী ছিল।

জাতকে নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই; কিন্তু নটেরা যে হস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি দ্বারা দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জক করিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) দেখিতে পাই, তাহারা বর্ত্তমান যাত্রার দলসমূহের 'কালুয়া ভুলুয়ার' ন্যায় বিকট নৃত্যাদি দ্বারা রাজকুমার মহাপ্রণাদকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এতাদৃশ অনুষ্ঠানের বিবর্ত্তন হইতে উত্তরকালে দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তাদিগের বিবেচ্য।

দুইটি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া

প্রাগুক্ত সুরুচি-জাতকে ভণ্ডুকর্ণ ও পণ্ডুকর্ণ নামক দুইজন নটের দুইটি অতি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। ভণ্ডুকর্ণ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা বিশাল আম্রবৃক্ষ জন্মাইয়া তাহার কোন শাখা লক্ষ্য করিয়া একটা সূত্রপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল; সূত্রের একপ্রান্ত ঐ শাখায় সংলগ্ন হইলে সে উহা ধরিয়া উপরে উঠিল; সেখানে যক্ষেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিয়ে ফেলিয়া দিল; অন্যান্য নটেরা ঐ খণ্ডগুলি যথাস্থানে রাখিয়া জল ছিটাইল; এবং ভণ্ডুকর্ণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার পর পণ্ডুকর্ণ অনুচরগণসহ জলন্ত কাষ্ঠস্তূপের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং যখন কাষ্ঠগুলি নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন ভগ্নরাশির উপর জল ছিটাইবা মাত্র তাহার পুষ্পাবরণে ভূষিত হইয়া পুনর্ব্বার দেখা দিল ও নাচিতে লাগিল। শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তুতেও লিখিত আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব লোকোত্তর শক্তির প্রভাবে নিমিষের মধ্যে একটা বিশাল ও ফলবান আম্রবৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাটিকে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ফলরূপে গ্রহণ না করিলেও সুরুচিজাতক-বর্ণিত উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয় হইতে বুঝা যায়, তৎকালে নটেরা ভোজবাজিতে বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। এরূপ বাজিকর যে এখনও আছে এরূপ শুনা যায়; কিন্তু আমার ভাগ্যে এখনও তাহাদের দর্শনলাভ ঘটে নাই।[১] ফিক্ সাহেব বলেন, দেহচ্ছেদ ও আম্রবৃক্ষোৎপত্তি প্রভৃতি দেখাইতে হইলে ন্যুব্জপৃষ্ঠ দর্পণের সাহায্যে দর্শকদিকের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে হয়। অতএব জাতকরচনাকালে এ দেশে যে তাদৃশ দর্পণ প্রচলিত ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

---

[১]। মায়া বলে অগ্নিদাহের উৎপত্তি কথা রত্নাবলী নাটকেও বর্ণিত আছে; কিন্তু রত্নাবলী জাতকের বহুশত বর্ষ পরে রচিত।

অক্ষক্রীড়া

জাতকে অক্ষক্রীড়ার বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় [অন্ধভূত (৬২), লিপ্ত (৯১), বিদুর পণ্ডিত (৫৪৫)]। লোকের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করিলে ক্রীড়ায় জয়লাভ হয় [অন্ধভূত (৬২)]। লোকে পণ রাখিয়া খেলিত; এবং পণে হারিয়া সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইত [রুরু (৪৮২), বিদূরপণ্ডিত (৫৪৫)]।

(দ) খাদ্যাখাদ্য

জাতক পাঠ করিলে বোধ হয় 'যাগুভত্ত'ই (যবাগূ ও ভক্ত) তখন জনসাধারণের প্রধান আহার ছিল। পূপ (পিষ্টক), পায়স ইত্যাদি উৎসবাদির সময় প্রস্তুত হইত; পায়সে প্রচুর ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিবার রীতি ছিল [সংস্তব (১৬২)]। 'ভোজ্য' ও 'খাদ্য' এই শব্দ দুইটি একার্থবোধক ছিল না। যাহা নরম- বেশী না চিবাইয়াই গিলিতে পারা যায়, তাহার নাম ছিল 'ভোজ্য', যেমন ভাত; মোদকাদির নাম ছিল খাদ্য (পালি 'খজ্জ')।[১] যবাগূ বা যাউক বলিলে বহুফেনযুক্ত গলাভাত বুঝায়, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইহাদের আদৌ যবের মণ্ডই বুঝাইত। জাতকে পুনঃ পুনঃ 'যাগুভত্ত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'ব্রীহিযব' পদ সুপরিচিত। পঞ্চশস্যের মধ্যে যব ও ধান স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গোধূমের অস্তিত্ব নাই; শ্রাদ্ধেও যব লাগে, কিন্তু গোধূমের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বে এদেশে যব ও ধানই-প্রধান খাদ্য ছিল এবং গোধূম অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রচলিত হইয়াছে। জাতকে যেখানে যেখানে পিষ্টক প্রস্তুত করিবার কথা আছে [ইল্লীস (৭৮), সুধাভোজন (৫৩৫)]। সেই সেই খানেই দেখা যায় তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে; কুত্রাপি গোধূমচূর্ণের নাম নাই। লোকের আর একটি প্রিয় খাদ্য ছিল কাঞ্জিক বা আমানি।

মাংসভক্ষণ

বৌদ্ধেরা অহিংসাপরায়ণ হইলেও মৎস্যমাংস গ্রহণ করিতেন। বুদ্ধদেব বলিতেন, ভিক্ষুরা ভিক্ষালব্দ অন্ন গ্রহণ করিবেন, গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই খাইবেন; তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচারে অধিকার নাই। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গ্রহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনের জন্য সময়বিশেষে এমন স্থানে যাইবে, যেখানে মাংস না খাইলে

---

[১]। বাঙ্গালা 'খাজা' শব্দ খজ্জ শব্দের রূপান্তর। 'খাজা' এক প্রকার শুষ্ক মিষ্টান্ন এবং বিশেষণভাবে নিরেট, কঠিন বা চর্ব্ব্য, যেমন 'খাজা মূর্খ; 'খাজা কাঁটাল'। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩২ম পৃষ্ঠের ৪র্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

জীবনরক্ষাই অসম্ভব হইবে। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া শুনিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে পাপ হইবে [চুল্লবগ্গ, (৭); তেলোবাদ (২৪৬)]। মনুসংহিতাতেওঃ দেখা যায়।, আপনার জন্য পশু মারিয়া খাওয়া রাক্ষসী প্রবৃত্তির লক্ষণ (৫/৩১)।

কুক্কুট-মাংস

মনুর মতে পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষীর মাংস নিষিদ্ধ; তিনি গ্রাম্য কুক্কুটও গ্রাম্য বরাহের মাংস একেবারে নিষেধ করেন নাই; কেবল বলিয়াছেন যে এই সকল এবং লশুন ও পলাণ্ডু ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার খাইলে পাতিত্য জন্মে (৫/১৯)। এ ব্যবস্থা কেবল দ্বিজাতির পক্ষে। জাতকে দেখা যায়, কুক্কুট মাংস নিষিদ্ধ ছিল না; কুক্কুট অস্পৃশ্য প্রাণী বলিয়াও গণ্য হইত না। বারাণসীর এক অধ্যাপকের ছাত্রেরা প্রত্যুষে প্রবোধিত হইবার জন্য একটা কুক্কুট পুষিয়াছিল [অকালরাবী (১১৯)]; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের গৃহে সুবর্ণপঞ্জরে ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত একটা কুক্কুট ছিল [শ্রী (২৮৪)]।[১] এই শ্রী জাতকেই দেখা যায়, এক গজাচার্য্য, তাহার পত্নী ও এক তপস্বী একটা বন্য কুক্কুটের মাংস খাইয়াছিলেন; ন্যাগ্রোধজাতকে (৪৪৫) দুইজন শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বন্য কুক্কুটের মাংস খাইতে দেখা যায়। রোমক-জাতকের (২৭৭) তপস্বী যে পারাবত-মাংস খাইয়া ছিল, তাহা গ্রাম্য কি আরণ্য ছিল বলা যায় না।

শূকর-মাংস

মুনিকজাতকে (৩০) ও শালূকজাতকে (২৮৬) মাংসের জন্য শূকর পুষিবার এবং তুণ্ডিল-জাতকে (৩৮৮) গ্রাম শুকরের মাংস খাইবার কথা আছে। এই মুনিজাতকের শূকর পালক এক জন 'কুটুম্বিক' অর্থাৎ গ্রাম্য ভূস্বামী ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, গ্রাম্য শূকরের মাংস ভক্ষণ যে কেবল অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে।

অনেক ভিক্ষুণী লশুনভক্ত ছিলেন। সুবর্ণহংস-জাতকের (১৩৬) বর্ত্তমান বস্তুতে কথিত আছে, তাঁহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া শেষে বুদ্ধদেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ লশুন খাইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মহাকপি-জাতকে (৪০৭) দেখা যায়, বারাণসীরাজ আম্রের সহিত বানরমাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহাবোধি-জাতকেও (৫২৮) মর্কটমাংস খাইবার কথা আছে। কিন্তু মনুর মতে (৫/১৭) বানরাদি সমুদয় পঞ্চনখ জীবের মাংস অভক্ষ্য। শুষ্কমাংস (বল্লূর) মনু নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতকে

---

[১]। মার্কণ্ডেয় পুরানে ভগবতী ভবানী 'ময়ূরকুক্কুটবৃতা' রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(২৪১) লিখিত আছে যে, প্রাচীনকালে লোকে ইহা অখাদ্য মনে করিত না।

গোমাংস

ব্যাধ প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকে গোমাংস খাইত। লাঙ্গুষ্ঠ-জাতকের (১৪৪) ব্যাধেরা এক তপস্বীর গরু মারিয়া খাইয়াছিল। তপস্বী ইহাতে অগ্নির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেই গরুর লাঙ্গুলটা আহুতি দিয়াছিলেন। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) দেখা যায়, একবার কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা দুই মাস পরে ধান্য দিয়া মূল্য শোধ করিবে এই অঙ্গীকারে গ্রামভোজকের নিকট হইতে একটা বুড়া গরু ধার করিয়া উহার মাংসে কয়েকদিন জীবনধারণ করিয়াছিল। যজ্ঞবিশেষে গোবধ করা হইত, একথা পরে বলা হইবে; কিন্তু গোমাংসভক্ষণ যে অন্ত্যজ জাতিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই।

নরমাংস

মহাশ্রুতসোমজাতকে (৫৩৭) এক নৃমাংসাশী রাজার কথা আছে। এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত-বর্ণিত কল্মাষপাদ রাজার বৃত্তান্ত তুলনীয়। কল্মাষপাদ ঋষিশাপে নরমাংসভুক হইয়াছিলেন (আদিপর্ব্ব, ১৭৬ম অধ্যায়)।

(ধ) বিবিধ—নিমিত্ত

ব্রাহ্মণেরা ফলিতজ্যোতিষ প্রভৃতি শিখিয়া কিরূপে ধনোপার্জ্জন করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে শুভশংসী নিমিত্তসমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে—প্রভাতে উঠিবার পর সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য, পূর্ণঘট, নব সর্পিঃ, নব-বস্ত্র, পায়স প্রভৃতি দেখিলে শুভফল প্রাপ্তি হইবে, লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। চণ্ডালের মুখদর্শন যে অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। মঙ্গল-জাতকে (৮৭) দেখা যায়, লোকে মনে করিত যে, কেহ মূষিক-দষ্ট বস্ত্র পরিধান করিলে সপরিবারে মারা যাইবে। যাঁহারা এই সকল নিমিত্ত ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল নিমিত্ত-পাঠক। আর এক শ্রেণীর লোকে অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহারা অঙ্গলক্ষণ দেখিয়া লোকের ভাবী শুভাশুভ গণিয়া বলিতেন। এইরূপ বহুবিধ সংস্কার সকল দেশে এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই ছিল এবং এখনও যে না আছে, এমন বলা যায় না। বুদ্ধদেব কিন্তু নিজে এ সমস্ত মানিতেন না। তিনি নক্ষত্র-জাতকে (৪৯) স্পষ্ট বলিয়াছেন :

মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনারঃ

আকাশের তারাতার শক্তি কোন ছায়?

মঙ্গল-জাতকে (৮৭) এবং মহামঙ্গল-জাতকেও নিমিত্তাদির অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মঙ্গল-জাতকে দেখা যায় :

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ নেহারি ভীত নয় যার মন,
উল্কপাত আদি উৎপাদ নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না ক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার জাল ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।

তবে কোন কোন লোকাচার অযৌক্তিক বুঝিলেও বুদ্ধদেব সেগুলির বিরুদ্ধে যাইতেন না। গর্গজাতকে (১৫৫) তিনি ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিন ধর্ম্মসভায় হাঁসিলে ভিক্ষুরা চতুর্দ্দিক হইতে 'জীবতু সুগত' বলিয়া এমন মহা চীৎকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, "কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই কি উহার আয়ু ক্ষয় হয়?" ইহার পর তিনি আদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা এখন অবধি কাহাকেও হাঁচিতে শুনিলে 'জীব' বলিও না, কিংবা তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'জীব' বলিলেও তোমরা 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ কারিও না।" কিন্তু এই আদেশ পালন করিতে গিয়া ভিক্ষুরা লোকসমাজে অসভ্য বলিয়া নিন্দিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন, গৃহীরা ইষ্টমঙ্গলিক (অর্থাৎ তাহারা নিমিত্তাদি হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে); অতএব আমি অনুমতি দিলাম, তোমরা হাঁচিলে যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিবে।[১]

স্বস্ত্যয়ন

জাতকে গ্রহবৈগুণ্য-শান্তির কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু দুঃস্বপ্ন-দর্শনের নানারূপ প্রতীকার চেষ্টা দেখা যায়। ধনী লোকের পক্ষে দুঃস্বপ্নকে সুস্বপ্নে পরিণত করিবার প্রধান উপায় ছিল সর্ব্বচতুষ্ক-যজ্ঞসম্পাদন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লৌহকুম্ভি (৩১৪), অষ্টশব্দ (৪১৮)]। লৌহকুম্ভি-জাতকের বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, এই যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মনুষ্য হইতে চটক পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর চারি চারিটি বধ করিয়া আহুতি দেখা হইত।

১। কৌতুকের বিষয় এই যে, হাঁচি আমাদের দেশে 'বাধা' বলিয়া গণ্য; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের লোকে ইহাকে ইষ্টলাভের সূচক মনে করিত।

নরবলি

সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞে নরবলি দিবার কথা বলা হইল। খণ্ডকাল-জাতকেও (৫৪২) দেখা যায়, পুরোহিত রাজার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র ও মহিষীদিগের পর্য্যন্ত নিধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তর্কারি-জাতকে (৪৮১) কথিত আছে, রাজধানীর দক্ষিণদ্বার নির্ম্মাণকালে মঙ্গলাচরণের জন্য পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "পিতৃকুলে মাতৃকুলে বিশুদ্ধ, পিঙ্গলবর্ণ ও দন্তহীন, কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তে ভূতবলী দিতে হইবে এবং দেহটা গর্ত্তে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ত্তকার্য্যে বিঘ্ননিবারণের জন্য যে নরবলি আবশ্যক, লোকের এ ধারণা নূতন নহে। ইতর লোকের মধ্যে এই ধারণা এখনও চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহারা বৃহৎ সেতু প্রভৃতির নির্ম্মাণসময়ে কোথাও কোথাও এমন ভয়বিহ্বল হয় যে, নিরীহ লোককেও 'ছেলেধরা' মনে করিয়া তাহাদের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করে।

মন্ত্রের ক্ষমতা; বিষ-বৈদ্য; ভূত-বৈদ্য

আর একটি ভ্রমাত্মক সংস্কার ছিল সর্পবিষচিকিৎসায় মন্ত্রপ্রয়োগের উপযোগিতা। এ বিশ্বাসও এখন পর্য্যন্ত চলিযা আসিতেছে। বিষবান্ত-জাতকে (৬৯) দেখা যায়, বিষবৈদ্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঔষধপ্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না, যে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া বিষ চুষাইয়া লইব? অনন্তর তিনি মন্ত্রবলে সাপটাকে আনিয়া বিষ চুষিয়া লইতে বলিলেন; কিন্তু সাপটা কিছুতেই সম্মত হইল না; কাজেই শেষে তিনি মন্ত্র ও ঔষধপ্রয়োগ করিয়া বিষ বাহির করিলেন। কামনীত-জাতকেও (২২৮) কথিত আছে, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ভূতাবিষ্ট লোকে মন্ত্রবলে নিরাময় হইত। লোকে মনে করিত, মন্ত্রবলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়। মন্ত্রবলে আকাশ হইতে রত্ন বর্ষিত হইত বেদব্ভ-জাতকে (৪৮)] পৃথিবী জয় করা যায় [সর্ব্বদংষ্ট্র (২৪১)], গুপ্তধনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইত [বৃহচ্ছত্র (৩৩৬)], ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইত [খরপুত্র (৩৮৬), পরন্তপ (৪১৬)]।

চিকিৎসা

চিকিৎসা-প্রসঙ্গে, পাণ্ডুরোগে দধি-সেবনের ব্যবস্থা [দাধবাহন (১৮৬)], কেহ বিষ খাইলে তাহাকে বমন করাইবার এবং বমনানন্তর ঘৃত, মধু, ও শর্করা খাওয়াইবার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রিয়ঙ্গু (পিপ্পলি) মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করান হইত, [লিপ্ত (৯১), শালিত্তক (১০৭)]।

মহামারীর সময়ে গ্রামত্যাগ

কোথাও কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে আর একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন। কচ্ছপ-জাতকে (১৭৮) ও আম্র-জাতকে (৪৭৪) যে অহিবাতরোগের বর্ণনা আছে, তাহা সম্ভবতঃ তরাই অঞ্চলের 'প্লেগ'। লোকে মনে করিত, ভিত্তিতে সুরঙ্গ খনন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলায়ণ করাই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও ইতর লোকে ভাবিত যে, সংক্রামক ব্যাধি অপদেবতারই কার্য্য; অপদেবতা গৃহের দ্বার আশ্রয় করিয়া থাকিত; কাজেই সুরঙ্গ খনন করিয়া পশ্চাদভাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে নিস্তার ছিল না। এ বিশ্বাস যতই ভ্রমাত্মক হউক না কেন, মহামারীর সময়ে গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করার যে সুফল হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্রোড়পত্র

ইতঃপূর্ব্বে ১২ পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণদিগের বিষয়শক্তির কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শৃগাল-জাতকের (১১৩) "ব্রাহ্মণা ধনলোলা" এই প্রবাদবাক্যটি দ্রষ্টব্য। এমনও লোকে বলে "হাজার টাকার বামুণ ভিখারী।"

১৩ পৃষ্ঠে রাজকুলে অসবর্ণ বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মহাউন্মার্গজাতকে (৫৪৬) একটা অদ্ভুত কিংবদন্তী দেখা যায়। জাতককার বলেন, বাসুদেব এক চণ্ডালকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র শিবি রাজা হইয়াছিলেন। শূদ্র প্রকরণে ১৪ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে, জাতকে "বৈশ্য শব্দের প্রয়োগের ন্যায় শূদ্র শব্দের প্রয়োগ ও নিতান্ত বিরল।" আম্র-জাতকে (৪৭৪) একটি গাথায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুক্কশ এই কয়েকটি জাতির নাম পাওয়া যায়। ভূরিদত্ত-জাতকেও (৫৪৩) দুইটি গাথায় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সম্বন্ধে নীচবর্ণধর্ম্ম নির্দ্দিশ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই 'শূদ্র' শব্দে দ্বিজেতর জাতিকে বুঝাইতেছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, খাঁটি শূদ্র কাহারা তাহা বুঝা যায় না; কারণ মন্বাদির গ্রন্থে যাহারা বর্ণসঙ্কর, তাহারাই এখন শূদ্র নামে অভিহিত।

কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয় (১৯০ পৃষ্ঠে), এ বিশ্বাস হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে। বিশ্বন্তর বলিয়াছিলেন, "ভাল হইল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।"-চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৫।

২৬ পৃষ্ঠে রাজকর প্রসঙ্গে সুরুচি-জাতক বর্ণিত (৪৮৯) "খারমূলের" কথা উল্লেখযোগ্য। 'খীরমূল' শব্দের অর্থ দুগ্ধের মূল্য। পুরোহিতের পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহার জন্য সহস্র কার্ষাপণ ক্ষীরমূল্য দিয়াছিলেন [শরভঙ্গ

(৫২২)]। কিন্তু সুরুচি-জাতকে দেখা যায়, যখন রাজা সুরুচির পুত্র জন্মিয়াছিল, তখন প্রজারা আনন্দিত হইয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গনে এক একটি কার্ষাপণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছিল, “মহারাজ, নবজাত শিশুর জন্য এই ক্ষীরমূল্য গ্রহণ করুন।” যদিও সুরুচি উহা গ্রহণ করিতে চান নাই, তথাপি মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে জমিদারেরা যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রের বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রজাদিগের নিকট চাঁদা আদায় করেন, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ প্রথা ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন নগরে চুঙ্গী (octroi) কর আছে, মহাউন্মার্গ (৫৪৬)-জাতকে এই করেরও উল্লেখ আছে। ঐ আখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক রাজা কোন পণ্ডিতের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে সংগৃহীত শুল্ক দান করিয়াছিলেন।

৩০ পৃষ্ঠে গ্রামভোজকের মাদকদ্রব্যের উপর সংগৃহীত শুল্কপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐ শুল্কের নাম ছিল “ছাটিকহাপণ” অর্থাৎ প্রতি কলসের উপর যে কাহণ শুল্করূপে নির্দ্দিষ্ট হইত।

৩৩ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে যে, পুরাকালে প্রাসাদগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদও অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশ্বকর্ম্মা রাজকুমার মহাপ্রণাদের জন্য সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা রত্নময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও (৪/৩০/২০) দেখা যায়, ইন্দ্র দিবোদাসকে শতসংখ্যক পাষাণময়ী পুরী প্রদান করিয়াছিলেন। জাতকে “বর্দ্ধকী” শব্দে সূত্রধার এবং রাজমিস্ত্রী উভয়কেই বুঝায়।

☞ “জাতকে পুরাতত্ত্ব” প্রকরণ মূদ্রিত হইবার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাবৃত্তের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী রহিলাম। প্রায় সমস্ত জাতক কথাই তাঁহার নখদর্পণে আছে।

-❖-

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

দ্বি-নিপাত

১৫১. রাজাববাদ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ ত্রিশকুন-জাতকে (৫২১) প্রদত্ত হইবে।]

একদা কোশলরাজকে অগতি-সংক্রান্ত[২] একটি অতি জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিলম্ব ঘটায় তিনি প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ধৌত হস্তের জল শুকাইতে না শুকাইতে অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া শাস্তার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি শাস্তার নিকট প্রফুল্লকমল-রমণীয় পাদবন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে আজ এ সময়ে আগমন করিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভগবান, অদ্য অগতি-সংক্রান্ত একটি জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল বলিয়া অবকাশ পাই নাই; অনন্তর যেমন বিচার শেষ করিলাম, অমনি আহারান্তে প্রক্ষালিত হস্ত শুষ্ক হইতে না হইতেই আপনার অর্চ্চনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" "মহারাজ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিলে রাজার কুশল হয়, তিনি স্বর্গলোকের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি যে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু পুরাকালে রাজাগণ অসর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়াও যে নিরপেক্ষভাবে যথাধর্ম্ম বিবাদনিষ্পত্তি করিতে পারিতেন, চতুর্ব্বিধ অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনে[৩] সমর্থ হইতেন এবং শাস্ত্রানুসারে রাজ্যপালনপূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোক

---

[১]। অববাদ—উপদেশ।

[২]। চতুর্ব্বিধ অগতি, যথা ছন্দ (অতিলোভ ইত্যাদি), দ্বেষ, মোহ (অবিদ্যা) এবং ভয়। 'অগতি-সংক্রান্ত' বলিলে 'চরিত্রদোষমূলক' বুঝা যাইতে পারে।

[৩]। দশবিধ রাজধর্ম্ম; যথা : দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব,

লাভ করিতেন, ইহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।” অতঃপর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা মহিষীর গর্ভরক্ষার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেন; এবং বোধিসত্ত্ব যথাকালে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইলেন। নামকরণ দিবসে আত্মীয় বান্ধবেরা তাহার “ব্রহ্মদত্ত-কুমার” এই নাম রাখিলেন। তিনি কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলানগরে গমনপূর্বক সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিচার করিবার সময় তিনি কখনও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইতেন না।

রাজা যথাধর্ম্ম শাসন করিতেন বলিয়া তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যায়ানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন; আবার অমাত্যেরা সূক্ষ্মবিচার করিতেন বলিয়া কূটার্থকারক[১]ও দেখা যাইত না। কাজেই রাজাঙ্গণে আর অর্থিপ্রতার্থীর কোলাহল শুনা যাইত না; অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু বিচারপ্রার্থী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলতঃ এইরূপ সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্ম্মাধিকরণ জনহীন স্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেছি বলিয়া এখন আর কোন বিচারপ্রার্থী দেখা যায় না; অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না; ধর্ম্মাধিকরণ নির্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু আমার কি কি দোষ আছে, তাহা একবার দেখিতে হইতেছে। আমার কি কি দোষ ইহা জানিতে পারিলে সেগুলি পরিহারপূর্ব্বক অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন গুণেরই আশ্রয় লইতে পারিব।’ তদবধি কে তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবে, সর্ব্বদা তিনি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহারা রাজভবনে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি নিজের অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না; পক্ষান্তরে সকলের মুখেই আপনার গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, ‘এই সকল লোক হয়ত ভয়বশতঃ আমার দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণই গান করিতেন।’ অতঃপর তিনি প্রাসাদের বহিঃস্থ লোকদিগের

মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন।

[১]। কূটার্থকারক—যাহারা মিথ্যা মকদ্দমা করে।

মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজের নিন্দাকারক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি ক্রমে নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা নগরের চতুর্দ্বারের বাহিরে, উপকণ্ঠভাগে, বাস করে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে নিজের দোষ শুনিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন তিনি একবার জনপদ অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া একমাত্র সারথিসহ রথারোহণে অজ্ঞাতবেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি এইরূপে প্রত্যন্ত ভূমি পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কুত্রাপি অগুণবাদী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; পরন্তু সকলের মুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিলেন। কাজেই তিনি রাজপথ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোশলপতি মল্লিকও যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন, এবং কেহ তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করে কি না, ইহা জানিবার জন্য তিনিও রাজভবনাদি কুত্রাপি অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া এবং সর্ব্বত্র নিজের প্রশংসাবাদই শুনিয়া পরিশেষে জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দুই নরপতি বিপরীত দিক হইতে অগ্রসর হইতে হইতে শকটমার্গের এক নিম্ন অংশে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। সে স্থান এত অপ্রশস্ত যে রথদ্বয়ের পাশাপাশি যাইবার উপায় ছিল না।

কোশল রাজের সারথি বারাণসীরাজের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ ফিরাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে বলিল, "তোমারই রথ ফিরাও; আমার রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।" "আমার রথেও কোশলরাজ মল্লিক আছেন। তোমার রথ ফিরাইয়া ইহার রথ যাইতে দাও।"

বারাণসী সারথি ভাবিল, 'তাই ত; ইনিও যে একজন রাজা। এখন উপায় কি করি? আচ্ছা, কোশলরাজের বয়স কত জানিয়া উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট তাঁহার রথ খোলা যাউক, এবং যিনি বড় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অবসর দেয়া হউক।" ইহা স্থির করিয়া সে কোশল সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার বয়স কত?" সে যে উত্তর দিল তাঁহাতে দেখা গেল উভয়রাজাই সমবয়স্ক। অতঃপর বারাণসীরাজের সারথি কোশলপতির রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিল এবং জানিতে পারিল, দুইজনেরই রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তীর্ণ; এবং দুইজনেরই সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, গোত্র, কুল প্রভৃতি তুল্যরূপ। তখন সে স্থির করিল, ইহাদের মধ্যে যিনি চারিগুণে মহত্ত্বর, তাহাকেই পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।' এতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার শীলাচার কীদৃশ?" 'ইহার উত্তরে

"আমাদের রাজা অতীব শীলবান" এই বলিয়া কোশল সারথি নিম্ন লিখিত গাথা দ্বারা স্বীয় প্রভুর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল :

"কঠোরে কঠোর, কোমলে কোমল, কোশলরাজের রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার, শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার? সংক্ষেপে বলিনু তাই;
অতএব রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার কি কেবল এই সকল গুণ?" "হাঁ, আমাদের রাজার এই সকল গুণ।" "এই সকল যদি গুণ হয়, তবে দোষ কাহাকে বলে?" "এগুলি যদি অগুণ হয়, তবে না জানি, তোমাদের রাজার কেমন গুণ!" "বলিতেছি শুন।" অনন্তর বারাণসীর সারথি নিম্মলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তের গুণগান করিল :

"অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে, অসাধুরে সাধুতায়;
কৃপণ যে জন, হেরি তাঁর দান, মানে নিজ পরাজয়;
সত্যের প্রভাবে মিথ্যারে দমিতে এমন দ্বিতীয় নাই;
তাই বলি রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ এবং তাঁহার সারথি উভয়ে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্ব খুলিয়া লইলেন এবং রথ ফিরাইয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর বারাণসীরাজ কোশলরাজকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জীবনান্তে স্বর্গলাভ করিলেন। কোশলরাজ ও তদীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জনপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে কোন অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক তিনিও জীবনাবসানে স্বর্গবাসী হইলেন।

* * *

[**সমবধান :** তখন মৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন কোশল-সারথি; আনন্দ ছিলেন কোশল-রাজ। সারিপুত্র ছিলেন বারাণসীর সারথি এবং আমি ছিলাম বারাণসীর-রাজ]।

☞এই জাতকের সহিত মহাভারত-বর্ণিত কুরুবংশীয় সুহোত্র এবং উশীনরের পুত্র শিবি, এই নৃপতিদ্বয় সংক্রান্ত আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যায় [বনপর্ব্ব ১৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ; ১৯৭ম অধ্যায়, South Indian Text]। ইহাদের রথদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে উভয়েই পরস্পরের বয়ঃক্রমানুরূপ সম্মান রক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে উভয়েই তুল্য মনে করিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে চাহিলেন না। তখন নারদ সেখানে উপস্থিত

হইয়া শিবিকেই গুণসম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কেননা তিনি "জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, সত্যেনানৃতবাদিনম্, ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উত্তম নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন।

---

১৫২. শৃগাল-জাতক

[শাস্তা কুটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীবাসী জনৈক নাপিতের পুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই নাপিত বৈশালীর রাজগণ, রাজাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ, রাজকুমারগণও রাজকুমারীগণ- ইহাদের কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। ফলতঃ নাপিতে যে যে কাজ করে সে তাহার সমস্তই করিত। অধিকন্তু সে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান, ত্রিরত্নের শরণাগত ও পঞ্চশীলপরায়ণ ছিল[১] এবং অবসর পাইলে মধ্যে মধ্যে শাস্তার নিকট গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

একদা কোন রাজভবনে কাজ করিতে যাইবার সময় এই নাপিত তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। নাপিত পুত্র সেখানে নানালঙ্কার পরিশোভিতা বিদ্যাধরীসদৃশী এক লিচ্ছবী কুমারীকে[২] দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রাসাদ হইতে বহির্গমনকালে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "এই কুমারীকে লাভ করিতে পারিলেই আমি জীবন ধারণ করিব; ইহাকে না পাইলে আমার মরণ নিশ্চিত।" সে গৃহে ফিরিয়া আহার ত্যাগ করিল এবং মঞ্চের উপর শুইয়া রহিল। তাহার পিতা তাহার নিকট গিয়া অনেক বুঝাইল বলিল, "বাবা, দুর্লভ পদার্থে লোভ করিও না; তুমি নাপিতের পুত্র—অতিহীন জাতীয়; কিন্তু এই লিচ্ছবীকুমারী সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়কুল সম্ভবা। তুমি কোন অংশেই ইহার অনুরূপ নহ। আমি তোমাকে জাতিগোত্রে তুল্যরক্ষা কোন কন্যা অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিতেছি।" কিন্তু যুবক পিতার এই হিতগর্ভ কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার মাতা, ভগিনী, খুড়ী, খুড়া প্রভৃতি জ্ঞাতিবন্ধুগণ যে প্রবোধ দিলেন তাহাও বিফল হইল। সে ক্রমে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

নাপিত যথাকালে পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিল এবং শোকবেগ মন্দীভূত

---

[১]। প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। লিচ্ছবীরা বৈশালীর রাজকুল; ইহাদের নামান্তর বৃজি। মনুবর্ণিত 'নিচ্ছিবি' ও বৌদ্ধ সাহিত্যের লিচ্ছবি বোধ হয় এক। উভয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়। বৈশালীর শাসন প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল এবং শাসনকর্তারা সকলেই 'রাজা' নামে অভিহিত হইতেন।

হইলে শাস্তাকে বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রচুর গন্ধমাল্যবিলেপন-সহ মহাবনে[১] গমন করিল। যেখানে সে পূজান্তে প্রাণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দেও নাই কেন?" নাপিত তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, তোমার পুত্র কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দুর্লভ বস্তু কামনা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর নাপিতের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সন্তানগুলি লইয়া এক কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। ঐ গুহার অবিদূরে রজতপর্ব্বতে এক স্ফটিক গুহা ছিল; সেখানে এক শৃগাল থাকিত।

কালসহকারে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতার বিয়োগ হইল। তদবধি সিংহেরা ভগিনীকে গুহায় রাখিয়া মৃগয়ায় যাইত এবং মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিয়া দিত।

সেই শৃগাল তরুণসিংহীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল; কিন্তু যতদিন সিংহীর মাতাপিতা জীবিত ছিল ততদিন কিছু বলিবার অবসর পায় নাই। সে এখন দেখিল বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একদিন সিংহসহোদরগণ মৃগয়ায় বাহির হইলে যে স্ফুঠিকগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাঞ্চানগুহায় গমনপূর্ব্বক সিংহকুমারীর মন ভুলাইবার নিমিত্ত এবংবিধ চাতুর্য্যপূর্ণ মিষ্ট বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল : সিংহকন্যে, আমিও চতুষ্পদ, তুমিও চতুষ্পদ; এস, তুমি আমার পত্নী হও, আমি তোমার পতি হই। তাহা হইলে আমরা পরম সুখে বাস করিব; তুমি এখন হইতে আমার প্রণয়িনী হইবে।"

শৃগালের কথা শুনিয়া সিংহকন্যা ভাবিল, 'এই শৃগাল চতুষ্পদদিগের মধ্যে অতি হীন, জঘন্য ও চণ্ডাল সদৃশ। পক্ষান্তরে আমি রাজকুল বলিয়া সমাদৃতা। এ যে আমার সঙ্গে এরূপ বাক্যলাপ করিতেছে ইহা কিন্তু অসভ্য ও অনুপযুক্ত। এরূপ কথা শুনিয়া আমি কি আর প্রাণধারণ করিতে পারি? আমি নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' কিন্তু ইহার পরেই সে আবার চিন্তা করিল, 'এরূপে প্রাণত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত। আমার সহোদরেরা শীঘ্রই ফিরিয়া

---

[১]। বৈশালী নিকটস্থ শালবন। কূটাগার শালা এই বনে অবস্থিত ছিল। প্রথম খণ্ডের ৫৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আসিবে, তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিয়া মরিব।' শৃগাল সিংহকুমারীর নিকট কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিল, 'ইহার দেখিতেছি আমার প্রতি কোন অনুরাগ নাই।' সে নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া স্ফটিক গুহায় ফিরিয়া গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

এদিকে একটা তরুণ সিংহ মহিষ অথবা হস্তী বা অন্য কোন প্রাণী বধ করিয়া নিজে তাহার কিছু মাংস আহার করিল এবং এক অংশ ভগিনীর জন্য লইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি এই মাংস খাও।" সে বলিল, "না ভাই মাংস খাইব না, আমি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছি।" "কেন, কি হইয়াছে?" সিংহকুমারী তখন ভ্রাতার নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিল। তরুণসিংহ জিজ্ঞাসিল, "সে শৃগাল এখন কোথায়?" সিংহকুমারী সে স্ফটিক গুহায় শয়ান শৃগালকে দেখিয়া ভাবিল সে বুঝি আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। সে উত্তর দিল, "দেখিতে পাইতেছ না, ভাই? ঐ যে রজত পর্ব্বতের উপর আকাশে শুইয়া রহিয়াছে।" সিংহ বুঝিল না যে শৃগাল স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে।" সে ভাবিল শৃগাল প্রকৃতই আকাশে রহিয়াছে; অতএব তাহাকে বধ করিবার জন্য সিংহ বেগে লম্ফ দিল এবং স্ফটিক গুহার উপর গিয়া পড়িল। সেই আঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল। তাহার পর আর একটা তরুণসিংহ মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে সিংহকুমারী তাহাকেও নিজের অপমান-বার্তা জানাইল; এবং সেও উল্লিখিতরূপে শৃগালকে আক্রমণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল।

এইরূপে একে একে ছয়টি তরুণ সিংহের প্রাণত্যাগ ঘটিল, সর্ব্বশেষে বোধিসত্ত্ব গুহায় আসিলেন। সিংহকুমারী তাঁহাকেও নিজের দুঃখকাহিনী জানাইল। বোসিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৃগাল এখন কোথায়?" সিংহী বলিল, "রজতপর্ব্বতের শিখরোপরি আকাশে।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শৃগাল আকাশে, এ যে বড় অদ্ভুত কথা! শৃগাল স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে।' অনন্তর তিনি পর্ব্বতপথে অবতরণপূর্ব্বক সোদরদিগের মৃতদেহ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহারা নির্ব্বোধ এবং বিচারমূঢ় বলিয়া স্ফটিক গুহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সেই জন্য তাহার উপর নিপতিত হইয়া হৃৎপিণ্ড বিদারণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রাণ হারাইয়াছে। যাহারা, অসমীক্ষ্যতা-হেতু সহসা কোন কাজ করে তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :

না ভাবিয়া পরিণাম কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয়
অকস্মাৎ, মূর্খ যেই জন;
স্বকার্য্যে দহিবে সেই, মুখ দহে যে প্রকার
তপ্ত খাদ্য করিলে গ্রহণ।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার সহোদরগণ শৃগালকে মারিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কি কৌশলে মারিতে হইবে তাহা বুঝে নাই; কাজেই অতি বেগে লম্ফ দিয়া নিজেরাই মারা গিয়াছে। আমি কিন্তু সেরূপ করিতেছি না। আমি স্ফটিক গুহাশায়ী শৃগালেরই হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিবার উপায় দেখিতেছি।" অনন্তর তিনি শৃগালের আরোহণের ও অবরোহণের পথ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন; তিনবার এমন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন যে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহা শুনিয়া ভয়ে সেই স্ফটিক গুহাশায়ী শৃগালের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া গেল। এইরূপে শৃগাল সেখানেই পরিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শৃগাল উক্তরূপে সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এই কথা বলিবার পর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

কাঁপায়ে দর্দ্দর ভূমি[১] সিংহ করে ভীমনাদ;
শুনি সে নির্ঘোষ শিবা গণে মনে পরমাদ;
কাঁপে অঙ্গ থর থর মরণের ভয়ে হায়।
হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে' শৃগাল পঞ্চত্ব পায়।]

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শৃগালের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সহোদরগণের মৃতদেহগুলি একস্থানে সমাহিত করিয়া ভগিনীকে তাহাদের মরণবৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি যাবজ্জীবন সেই সুবর্ণগুহাতেই বাস করিয়া মৃত্যুর পর কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

* * *

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উপাসকগণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

[**সমবধান :** তখন এই নাপিত পুত্র ছিল সেই শৃগাল, এই লিচ্ছবীকুমারী ছিলেন সেই তরুণসিংহী; বর্ত্তমান সময়ের প্রধান স্থবির ছয়জন ছিলেন সেই ছয়টি তরুণসিংহ এবং আমি ছিলাম তাহাদের জ্যেষ্ঠ।]

---

[১]। দর্দ্দর—পর্বত বা পর্ব্বতীয় নালায় পথ।

১৫৩. শূকর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবির' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা রাত্রিকালে ধর্ম্মদেশন হইতেছিল। শাস্তা গন্ধকুটীর-দ্বারস্থ মণিসোপানফলকে[১] অবস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিবার পর কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের পরিবেণে[২] চলিয়া গেলেন। মহামৌদগলায়নও স্বীয় পরিবেণে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার স্থবির সারিপুত্রের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। ধর্ম্মসেনাপতি উহার উত্তর দিলে মহামৌদগলায়ন পুনঃ পুনঃ আরও প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ধর্ম্মসেনাপতিও অতি বিশদরূপে সে সমুদয়ের উত্তর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন- বোধ হইল যেন তিনি গগনতলে চন্দ্রমার আবির্ভাব ঘটাইলেন।

চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধগণ[৩] তদ্‌গতচিত্তে এই ধর্ম্ম কথা শুনিতে ছিল। তাহা দেখিয়া এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবির' চিন্তা করিলেন, 'আমি যদি এই সভায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সারিপুত্রের ধান্ধা লাগাইতে পারি, তাহা হইলে সকলে আমাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিবে; আমার মানমর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইবে।' ইহা ভাবিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সারিপুত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলেন, "বন্ধু সারিপুত্র, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমাকে বলিতে অবকাশ দিবে কি? আবেধিকও নির্ব্বেধিক, নিগ্রহ ও প্রতিনিগ্রহ, বিশেষ ও প্রতিবিশেষ ইহাদের মধ্যে কোনটি কি তাহার মীমাংসা করিয়া দাও।[৪] প্রশ্ন শুনিয়া সারিপুত্র অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন,

---

[১]। মণিসোপান বলিলে বোধ হয় 'মার্বল' প্রস্তরের সোপান বুঝাইত। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'স্পটিকমণি সোপান', 'মণিহর্ম্মতল' মণিময়ভূ' ইত্যাদির বর্ণনা দেখা যায়। মার্বল প্রস্তর এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, অথচ সংস্কৃত ভাষায় যে ইহার একটা নাম ছিল না ইহা অসম্ভব নয় কি? অধুনা 'মম্মর' শব্দ মার্বল অর্থে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে মর্ম্মর শব্দের এ অর্থে প্রয়োগ নাই। ল্যাটিন ভাষায় কিন্তু marmor শব্দের অর্থ মার্বল। 'রুচি প্রস্তর', চারু প্রস্তর' প্রভৃতি প্রতি শব্দ হাতগড়া বলিয়া মনে হয়।

[২]। ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (Cell).

[৩]। উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী।

[৪]। এই প্রশ্নের কোনই অর্থ নাই। Vicar of Wakefield নামক উপাখ্যানেও Mr, Thornhill নামক এক চরিত্র হীন যুবক moses এইরূপ শব্দাড়ম্বর বিশিষ্ট নিরর্থক তর্কদ্বারা নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

'এই বৃদ্ধ এখনও বিজিগীষু, অথচ ইনি অজ্ঞান ও অন্তঃসারশূন্য।' তিনি বৃদ্ধের ধৃষ্টতায় নিজেই অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, হস্ত হইতে ব্যঞ্জনখানি নামাইয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। স্থবির মহামৌদগলায়নও তাহাই করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ অপর সকলে এক সঙ্গে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "এই নির্লজ্জ বৃদ্ধকে ধরত! ইহার জন্য আমরা মধুর ধর্ম্মকথা-শ্রবণে বঞ্চিত হইলাম।" তাহারা তাড়া করিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ পলায়ণ করিলেন।

বিহারের বাহিরে একটা পায়খানার উপরিস্থ তক্তা ভাঙ্গা ছিল। দৌড়াইয়া যাইবার সময় বৃদ্ধ সেই রন্ধ্র দিয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন এবং সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠালিপ্ত হইয়া উপরে উঠিলেন। অনুসরণকারীরা তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুতপ্ত হইল এবং সকলে শাস্তার নিকট গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, এই বৃদ্ধ যে কেবল এই জন্মেই গর্ব্বভরে নিজের শক্তি না জানিয়া বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াছে এবং লাভের মধ্যে বিষ্ঠালিপ্তদেহে সকলের হাস্যাস্পদ হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্ব এক জন্মেও দর্পবশত নিজের ক্ষমতা না বুঝিয়া মহাবলশালীদিগের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠা মাখিয়াছিল।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে একটা গুহার মধ্যে বাস করিতেন। অদূরে এক সরোবরের ধারে এক পার্শ্বে এক পাল শূকর থাকিত এবং অপর পার্শ্বে কতিপয় তপস্বী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

একদিন সিংহ একটা মহিষ, হস্তী বা অন্য কোন বৃহৎ পশু বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিল এবং জলপান করিবার জন্য সরোবরে অবতরণ করিল। ঐ সময়ে একটা স্থূলকায় শূকর উহার তীরে চরিতেছিল। সিংহ জল পান করিয়া উপরে উঠিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল 'ইহাকেও একদিন খাইতে হইবে।' কিন্তু পাছে তাহাকে দেখিতে পাইলে শূকর আর কখনও সেখানে না আইসে এই আশঙ্কায়, সিংহ সঙ্গোপনে তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। শূকর কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল এবং মনে করিল 'সিংহ আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; কাজেই আমার কাছে আসিতেছে না, পলাইয়া যাইতেছে। আজ আমাকে ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া শূকর মাথা তুলিয়া নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা সিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করিল :

চতুস্পদ আমি, চতুস্পদ তুমি; তবু কেন ভয় পাও?
ফের, সিংহবর, ফের এই দিকে, পলাইয়া কেন যাও?

সিংহ গাথা শুনিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তোমার সহিত অদ্য আমার যুদ্ধ হইবে না। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমরা এই স্থানেই আসিয়া যুদ্ধ করিব।" ইহা বলিয়া সিংহ প্রস্থান করিল। সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবে ইহা ভাবিয়া শূকরের বড় হর্ষ জন্মিল এবং সে জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে এই কথা জানাইল। কিন্তু তাহারা ইহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি দেখিতেছি, নিজেও মরিলে, আমাদিগকেও মারিলে। তুমি নিজের বল না বুঝিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। সিংহ আসিয়া আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবে। তুমি এমন দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইও না।" তখন সেই নির্ব্বোধ শূকরেরও বড় ভয় হইল। সে জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি?" তাহারা বলিল, "তুমি এই তপস্বীদিগের মলত্যাগভূমিতে গিয়া গলিত বিষ্ঠায় সাত দিন গড়াগড়ি দাও এবং বেশ করিয়া শরীর শুকাও। অনন্তর সপ্তম দিনে শিশিরজলে শরীর ভিজাইয়া সিংহের আসিবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে; সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোন দিক হইতে বায়ু বহিতেছে, এবং এমন স্থানে দাঁড়াইবে যেন বায়ু প্রথমে তোমার গায়ে লাগিয়া পরে সিংহের দিকে যায়।[১] সিংহ অতি শুচিপ্রিয়; সে তোমার শরীরগন্ধ অনুভব করিয়াই পরাজয় স্বীকার করিবে।"

শূকর এই পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সপ্তম দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। সিংহ তাহার দেহবিনির্গত পূতিমল-গন্ধ অনুভব করিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তুমি অতি সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছ। তুমি যদি সর্ব্বাঙ্গে মললিপ্ত না হইতে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণান্ত করিতাম। কিন্তু এখন তোমার যে অবস্থা, তাহাতে আমি তোমাকে মুখ দিয়া দংশন করিতে পারি না, পাদ দ্বারাও প্রহার করিতে পারি না। অতএব তোমারই জয় হইল।" অনন্তর সিংহ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

মলেতে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়েছে তোমার,
দুর্গন্ধে নিকটে তব তিষ্ঠা হল ভার।
হেন বেশে যুদ্ধে যদি হও অগ্রসর,
মানিলাম পরাজয়, শুন হে শূকর।

১। মূলে "উপরিবাতে তিট্ঠ" এইরূপ আছে। 'উপরিবাতে' ইংরেজী 'to the windward' এই পদসমষ্টির অনুরূপ। 'অধোবাত' বলিলে Leeward বুঝাইবে। 'প্রতিবাত' এবং 'অনুবাত' শব্দও যথাক্রমে 'উপরিবাত' এবং 'অধোবাত' শব্দের সদৃশ।

অনন্তর সিংহ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল এবং ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া ও সরোবর হইতে জল পান করিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। শূকরও "সিংহকে পরাজিত করিয়াছি" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু সকল শূকরেরই ভয় হইল, পাছে সিংহ পুনর্ব্বার সেখানে আসিয়া প্রাণসংহার করে। সেই জন্য তাহারা পলায়ণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

* * *

[**সমবধান :** তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই শূকর এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

---

১৫৪. উরগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রেণীভণ্ডন[১]-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের মহামাত্র-পদবীভুক্ত দুইজন শ্রেণীমুখ্য পরস্পরের প্রতি এরূপ জাতবিদ্বেষ ছিলেন যে, দেখা হইবামাত্রই তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিতেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাদের এই বৈরভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি রাজা, কি জ্ঞাতিবন্ধুগণ, কেহই তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

একদিন শাস্তা প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কে কে বুদ্ধশাসনে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়াছেন ইহা পর্য্যবলোকন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, উল্লিখিত মহামাত্রদ্বয় অচিরেই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিবেন। তদনুসারে পরদিন তিনি পিণ্ডচর্য্যার্থ একাকী শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের একজনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ মহামাত্র বাহিরে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। শাস্তা আসনগ্রহণানান্তর ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রী-ভাবনা-সম্বন্ধে[২]

---

[১]। শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ী-সমিতি (Guild)। শ্রেণীভণ্ডন এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাদ।

[২]। মৈত্রীভাবনা অর্থাৎ আমি শত্রুহীন হই, আমার আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র. সকল প্রাণী সুখে থাকুক এইরূপ চিন্তা। ইহা দ্বারা একাদশবিধ ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ (১) সুখনিদ্রা হয়, (২) সুখজাগরণ হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় না, (৪) মনুষ্যের প্রিয় হওয়া যায়, (৫) ভূতপ্রেতাদির প্রিয় হওয়া যায়, (৬) দেবতাগণের রক্ষাভাজন হওয়া যায়, (৭) অগ্নি, বিষ বা অস্ত্রে দেহের কোন ক্ষতি হয় না, (৮) সত্বর সমাধি লাভ করা যায়, (৯) মুখমণ্ডল প্রসন্ন

উপদেশ দিলেন এবং যখন দেখিলেন তাঁহার চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এই মহামাত্র স্রোতাপন্ন হইয়াছেন জানিয়া শাস্তা তাঁহার হস্তে পাত্র দিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক অপর মহামাত্রের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনিও গৃহের বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। প্রথম মহামাত্রও পাত্র লইয়া শাস্তার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর শাস্তা দ্বিতীয় মহামাত্রের নিকট মৈত্রীর একাদশবিধ সুফল বর্ণনা করিলেন এবং যখন দেখিলেন, তাঁহারও চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে এই ব্যক্তিও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে উভয় মহামাত্রই স্রোতাপন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন এবং বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন; তাঁহাদের মতি গতি এখন একবিধ হইল। তাঁহারা সেই দিনই ভগবানের সম্মুখে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন।

আহারান্তে শাস্তা বিহারে ফিরিয়া গেলেন; মহামাত্রদ্বয়ও প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন এবং ঘৃতমধুগুড় লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্ন সময়ে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শাস্তা অদম্য-দমক; যে মহামাত্রদ্বয় চিরকাল বিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন, জ্ঞাতিবন্ধুগণ, এমন কি রাজা পর্য্যন্ত যাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাগত এক দিনেই তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছেন!" ভিক্ষুগণ এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্ব এক জন্মেও আমি এই দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

*　　*　　*

থাকে, (১০) সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, এবং (১১) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকবাসীদের কেবল মৈত্রী, করুনা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চতুর্ব্বিধ ভাবনার বস্তু, তাঁহাদের অন্য চিন্তা নাই। ইহলোকেও কোন কোন মহাত্মা মৈত্রী প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা "ব্রহ্মবিহারী" নামে অভিহিত।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে একদা কোন উৎসবোপলক্ষ্যে বারাণসীতে মহাসমারোহ হইয়াছিল; তাহা দেখিবার জন্য সেখানে বহু মনুষ্য, দেবতা, নাগ ও সুপর্ণ[১] সমবেত হইয়াছিল এবং এক পার্শ্বে এক নাগ ও এক সুপর্ণ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমারোহ দেখিতেছিল। নাগ সুপর্ণকে সুপর্ণ বলিয়া জানিতে পারে নাই; সেই জন্য সে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়াছিল। কে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিল তাহা দেখিবার জন্য সুপর্ণ মুখ ফিরাইল এবং দেখিয়াই তাহাকে নাগ বলিয়া চিনিতে পারিল। নাগও তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, সে সুপর্ণ; সুতরাং সে মরণ ভয়ে পলায়ণ করিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সুপর্ণ তাহাকে ধরিবার জন্য অনুধাবন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব তাপসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নদীর তীরে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে রৌদ্রের উত্তাপ নিবারনার্থ বল্কল ত্যাগ করিয়া স্নানবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নদীতে অবগাহণ করিতেছিলেন। নাগ বিবেচনা করিল, 'দেখি, এই তপস্বীর আশ্রয় লইয়া যদি প্রাণ বাঁচাইতে পারি'। অনন্তর সে নিজের প্রকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া মণির আকার ধারণপূর্ব্বক তপস্বীর বল্কলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুপর্ণ তখন তাহার অনুধাবন করিতেছিল। সে তাহাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পাছে তপস্বীর গৌরব-হানি হয়, এই আশঙ্কায় বল্কল স্পর্শ না করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন "প্রভু, আমি ক্ষুধার্ত্ত; আপনার বল্কল গ্রহণ করুন; আমি এই নাগকে খাইব।" সে মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

প্রাণভরে নাগরাজ মণির আকারে
প্রবিষ্ট হয়েছে তব বল্কলমাঝারে।
ব্রাহ্মণ, বল্কল আমি স্পর্শ যদি করি,
অপমান হবে তব এই মনে ডরি।
সে হেতু গ্রাসিতে এরে না হয় শকতি,
যদিও হয়েছি আমি ক্ষুধাতুর অতি।

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াই সুপর্ণরাজের মনস্তুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

ব্রহ্মার কৃপায় চিরজীবী হও, করি এই আশীর্ব্বাদ;
যত ইচ্ছা হয়, দিব্য খাদ্য লভি পূরাও মনের সাধ।
যদিও ক্ষুধার্ত্ত, তথাপি, সুপর্ণ, রাখ ব্রাহ্মণের মান;

---

[১]। পুরাণবর্ণিত গরুড়জাতীয় পক্ষীবিশেষ।

নাগমাংস-লোভে নিষ্ঠুর-হৃদয়ে হ'রো না ইহার প্রাণ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে জলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াই সুপর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি তীরে উঠিয়া বল্কল পরিধান করিলেন এবং সুপর্ণ ও নাগ উভয়কেই আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে মৈত্রীভাবনার গুণ বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া উভয়েই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং তদবধি নির্ব্বিবাদে ও পরমসুখে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

[**সমবধান :** তখন এই দুই মহামাত্র ছিলেন সেই নাগ ও সেই সুপর্ণ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

----

১৫৫. গর্গ-জাতক

[রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনের সমীপে রাজকারাম নামে একটি উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময় শাস্তা হাঁচির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলন।

একদিন শাস্তা রাজাকারামে বসিয়া ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা, এই চতুর্ব্বিধ শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হাঁচিলেন। অমনি ভিক্ষুগণ "জীবতু ভন্তে ভগবা, জীবতু সুগতো" বলিয়া মহা চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধর্ম্মকথার অন্তরায় ঘটিল। তখন ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই উহার আয়ুঃক্ষয় হয় কি?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "না, ভগবান, তাহা কখনই হইতে পারে না।" শাস্তা বলিলেন, "হাঁচি শুনিয়া কাহারও 'জীব' বলা উচিত নহে। যে বলে, তাহার বিনয়ভঙ্গজনিত পাপ হয়।"

তৎকালে ভিক্ষুরা হাঁচিলে লোকে 'জীবথ ভন্তে' এইরূপ বলিত। কিন্তু ভিক্ষুরা শাস্তার উল্লিখিত আদেশ স্মরণ করিয়া পাপের ভয়ে ইহার কোন উত্তর দিতেন না। ইহাতে লোকে বড় বিরক্ত হইতে লাগিল এবং বলাবলি আরম্ভ করিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা কি অসভ্য? আমরা তাহাদিগকে 'জীব' বলিলেও তাহারা ইহার উত্তরে আমাদিগের সহিত বাক্যলাপ পর্য্যন্ত করে না।"

ক্রমে এই বৃত্তান্ত ভগবানের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গলকামী।[১] অতএব আমি অনুমতি দিলাম যে, তোমরা

---

[১]। ইট্ঠমঙ্গলিকা (ইষ্টমঙ্গলিক)—অর্থাৎ তাহারা মঙ্গলকামনায় নানারূপ কুসংস্কারের

হাঁচিলে, যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে তখন তোমরাও 'চিরংজীব' এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিবে।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কেহ 'জীব' বলিলে যে তাহাকে 'চিরজীবি হও' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতে হইবে, এ প্রথা কখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, 'এই প্রথা অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিতেছে।" "অনন্তর তিনি এতৎসংক্রান্ত অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যস্থ এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কেনা বেচা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা একদিন তাহার মাথায় একটা ঘটের মোট দিয়া অনেক গ্রামে ও নিগমে ফেরি করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দৌবারিকের গৃহে অন্নপাক করিয়া আহার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাত্রিযাপনের জন্য স্থান পাইলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "যে সকল আগন্তুক অবেলায় উপস্থিত হয়, তাহারা কোথায় অবস্থান করে?" বারাণসীবাসীরা বলিল, "নগরের বাহিরে একটা বাড়ী আছে; কিন্তু উহাতে যক্ষ থাকে; যদি ইচ্ছা কর, তবে সেখানেই আজকার মত রাত কাটাইতে পার।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "চলুন বাবা" সেখানেই যাই; যক্ষের ভয় করিবেন না। আমি যক্ষকে দমন করিয়া আপনার চরণের দাস করিয়া দিব।" বৃদ্ধ পুত্রের কথায় সম্মতি দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই যক্ষ সেবিত গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজে একখানি ফলকাসনে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঐ গৃহে যে যক্ষ থাকিত, সে বার বৎসর কুবেরের সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুবের বলিয়া দিয়াছিলেন, "এই গৃহে কাহারও হাঁচি শুনিয়া যদি কেহ 'জীব' বলে, এবং যে হাঁচিবে সেও যদি 'জীব' এই উত্তর দেয়, তাহা হইলে তুমি এইরূপ জীব প্রতিজীববাদীদিগকে খাইতে পারিবে না। তদ্‌ভিন্ন অপর যে সকল লোক এই গৃহে থাকিবে তাহারা তোমার ভক্ষ্য।" এই নিয়মে গৃহের অধিকার লাভ করিয়া সেই যক্ষ উহার পৃষ্ঠবংশ স্থূণায় বাস করিত।[১]

বশীভূত।

[১]। গৃহের মট্‌কার নিম্নদেশস্থ মধ্যভাগের দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড; ইহা হইতে দুইদিকে পাশাপাশি

যক্ষ বোধিসত্ত্বের পিতাকে হাঁচাইবার জন্য নিজের প্রভাব বলে চারিদিকে সুক্ষ্ম চূর্ণ বিকিরণ করিল। ঐ কণাগুলি ফলকাসন-শয়ান বৃদ্ধের নাসিকায় প্রবেশ করিবামাত্র তিনি হাঁচিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়াও 'জীব' বলিলেন না। তখন যক্ষ তাঁহাকে খাইবার জন্য স্থূণা হইতে অবতরণ করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই যক্ষই আমার পিতাকে হাঁচাইয়াছে; শুনিয়াছি কেহ হাঁচিলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি 'জীব' না বলে, তাহা হইলে এক যক্ষ, যে 'জীব' না বলে খাইয়া ফেলে। এ বোধ হয় সে যক্ষ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :

শত কিংবা বিংশত্যধিক শত বর্ষ
থাকিয়া জীবিত যেন এই মহীতলে
অন্তিমে লভেন স্বর্গ গর্গ পিতা মম—
করিনু কামনা এই। নাহি পারে যেন
গ্রাসিতে আমারে হেথা যক্ষ দুরাচার।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া যক্ষ বিবেচনা করিল, 'এ লোকটা যখন 'জীব' বলিল, তখন আমি ইহাকে খাইতে পারিব না; অতএব ইহার পিতাকেই খাওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভাবিলেন, 'এই যক্ষ বোধ হয়, যাহারা "জীব" এই বাক্যের উত্তরে 'জীব' না বলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব 'জীব' এই প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতেছি।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

করি আশীর্ব্বাদ, বৎস, হও আয়ুষ্মান্;
শত কিংবা বিংশত্যধিক-শত বর্ষ
থাকিয়া জীবিত তুমি হও কীর্ত্তিমান।
হউক যক্ষের ভক্ষ্য বিষ হলাহল,
জীবিত থাকহ তুমি শতবর্ষ কাল।

বৃদ্ধের বচন শুনিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই দুই জনের কেহই আমার ভক্ষ্য নহে;' কাজেই সে নিবৃত্ত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গৃহে যে সকল লোক প্রবেশ করে, তুমি যে তাহাদিগকে খাইয়া ফেল ইহার কারণ কি?" যক্ষ উত্তর দিল, "আমি দ্বাদশ বৎসর কুবেরের পরিচর্য্যা করিয়া এই অধিকার লাভ করিয়াছি।" "তুমি কি সকলকেই খাইতে পার?" "যাহারা জীবপ্রতিজীববাদী কেবল তাহাদিগকে খাইতে পারি না। তদ্ভিন্ন অপর সকলেই

আড়কাঠ বা পার্শুকা দেওয়া হয়।

আমার ভক্ষ্য।” “দেখ যক্ষ, তুমি পূর্ব্বজন্মের পাপাচারবশতঃ এইরূপ ভীষণ, নিষ্ঠুর ও পরবিহিংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি এ জন্মেও তুমি পূর্ব্ববৎ পাপরত হও, তাহা হইলে তুমি তমস্তমঃপরায়ণ[১] হইবে। অতএব অদ্যাবধি তুমি প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হও।” এইরূপে সেই যক্ষকে দমন করিয়া তিনি তাহার মনে নরকের ভয় জন্মাইলেন এবং তাহাকে পঞ্চশীলে[২] প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। ফলতঃ তাঁহার উপদেশের গুণে সে প্রেষণকারকের[৩] ন্যায় আজ্ঞাবহ হইল।

পরদিন লোকে যাতায়াত করিবার সময় যক্ষকে দেখিয়া জানিতে পারিল, বোধিসত্ত্ব তাহাকে দমন করিয়াছেন। তাহারা এই কথা রাজার কর্ণগোচর করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, “মহারাজ, এক ব্রাহ্মণলোক সেই যক্ষকে দমন করিয়া তাহাকে এখন প্রেষণকারকের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার পিতাকেও যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। তিনি সেই যক্ষকে শুল্কসংগ্রাহকের পদ দিলেন এবং তাহাকে বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতে শিক্ষা দিলেন। এইরূপে চিরদিন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই রাজা জীবনান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, কাশ্যপ ছিলেন বোধিসত্ত্বের পিতা, এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

☞এই জাতকপাঠে দেখা যায় বুদ্ধদেব যথাসম্ভব লোকাচার মানিয়া চলিতেন; ইহাতে সঙ্ঘের উপকার হইত, ধর্ম্মপ্রচারেরও সুবিধা ঘটিত। কোন কোন সংস্কারক কিন্তু এরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন না; যাহা অযৌক্তিক তাঁহাই তাঁহাদের মতে পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে সমাজ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কাজেই এরূপ সংস্কারকের সহিত সমাজের অহিনকুল-সম্বন্ধ জন্মে।

হাঁচির সম্বন্ধে এই জাতকে যাহা দেখা যায়, বিনয়পিটকেও ঠিক সেইরূপ বর্ণনা আছে।

---

[১]। প্রথম খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠে ‘চতুর্ব্বিধমনুষ্য’ সংক্রান্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]। প্রেবণকারক—যে বালকভৃত্য সংবাদাদি লইয়া যায়—Errand boy.

১৫৬. অলীনচিত্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে সংবর জাতকে (৪৬২) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিল "হ্যাঁ ভগবন্।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সে কি কথা! তুমিই না পূর্ব্বে নিজ বীর্য্যবলে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীরাজ্য রক্ষা করিয়া সদ্যঃপ্রসূত মাংসপিণ্ডসদৃশ রাজকুমারকে উহা দান করিয়াছিলে? তবে এখন কেন এবংবিধ নির্বাণপ্রদ শাসনে প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়াও বীর্য্যপ্রদর্শনে পরাঙ্‌মুখ হইলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। তখন বারাণসীর অতিদূরে এক সূত্রধার-গ্রাম ছিল। সেখানে পঞ্চশত সূত্রধার বাস করিত। তাহারা নৌকায় চড়িয়া নদী উজাইয়া[১] বনে যাইত; সেখানে কাঠ কাটিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানে একতালা, দোতালা প্রভৃতি ঘরের[২] কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং খুঁটি, আড়া ইত্যাদি সমস্ত কাঠে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া রাখিত। অনন্তর তাহারা সে সমস্ত নদীতীরে লইয়া যাইত, নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে[৩] নগরে ফিরিয়া আসিত এবং সেখানে যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন হইত, তাহার জন্য সেইরূপগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মূল্য গ্রহণ করিত। তাহার পর সূত্রধারেরা আবার বনে গিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত। এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত।

একবার ঐ সূত্রধারেরা বনমধ্যে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে, এমন সময়ে একদিন একটা হাতি বনের ভিতর দিয়া যাইবারকালে খয়ের কাঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল। তাহাতে উহার পায়ের তলদেশ বিদ্ধ হইল; ক্রমে পা ফুলিয়া উঠিল, মধ্যে পূঁজ জন্মিল এবং দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই অবস্থায় হস্তী একদিন সূত্রধারদিগের কাঠ কাঠিবার শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "ইহাদিগের সাহায্যেই আমি স্বস্তিলাভ

১। উপরিসোতং গন্ত্বা।

২। একভূমিক। দ্বিভূমিক।

৩। অনুসোতেন আগন্ত্বা।

করিব।” অনন্তর সে তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহাদিগের নিকট গিয়া শুইয়া পড়িল। সূত্রধারেরা তাহার ফোলা পা দেখিয়া নিকটে গেল এবং মাংসের মধ্যে খয়ের কাঠের কুচিখানি দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তীক্ষ্ণধার শস্ত্র লইয়া যেখানে কুচিখানি বিন্ধিয়াছিল তাহার চারিদিকে চিরিয়া দিল, সূতা দিয়া উহা বান্ধিয়া টানিয়া বাহির করিল, পূঁজ বাহির করিয়া গরম জলে ঘা ধুইল এবং অবস্থার অনুরূপ ঔষধ লাগাইল। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া গেল।

হস্তী আরোগ্য লাভ করিয়া চিন্তা করিল, ‘এই সূত্রধারেরাই আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এখন ইহাদের প্রত্যুপকার করা আবশ্যক।’ ইহা স্থির করিয়া সে তদবধি সূত্রধারদিগের সহিত কাঠ টানিয়া আনিত, যখন তাহারা কাঠ ছিলিত, তখন গুড়িগুলি প্রয়োজনমত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিত, তাহাদিগের যন্ত্রপাতি বহিয়া আনিত। সে সমস্ত দ্রব্যই শুণ্ডদ্বারা এমন বেষ্টন করিয়া ধরিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না।[১] সূত্রধারেরাও হস্তীর ভোজনবেলায় এক এক জনে এক একটি অন্নপিণ্ড দান করিত। এইরূপে সেই হস্তী প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড আহার করিত।

এই হস্তীর আজানেয় ও সর্ব্বশ্বেত এক পুত্র ছিল।[২] একদিন সে চিন্তা করিল, ‘আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন আমার পুত্রকেই সূত্রধারদিগের কর্ম্মসম্পাদনে নিয়োজিত করা যাউক। তাহা হইলে আমি নিজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব।’ এই সঙ্কল্প করিয়া সে একদিন সূত্রধারদিগকে কিছু না জানাইয়া বনে চলিয়া গেল এবং পুত্রকে সঙ্গে আনিয়া বলিল, “এইটি আমার পুত্র। আপনারা চিকিৎসা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমি বৈদ্যবেতনস্বরূপ আপনাদিগকে এই পুত্রটি দান করিলাম। এ অদ্যাবধি আপনাদের পরিচর্য্যা করিবে।” অনন্তর সে পুত্রকেও উপদেশ দিল, “বৎস, আমি এতদিন ইহাদের যে যে কাজ করিতাম, আজ হইতে তুমিও সেই সকল করিবে।” ইহা বলিয়া সে পুত্রকে সূত্রধারদিগের নিকট রাখিয়া বনে চলিয়া গেল। তদবধি সেই হস্তী পোতক সূত্রধারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহাদের যাবতীয় কর্ম্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল, তাহারাও উহার ভোজনার্থ প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড দান করিতে লাগিল। যখন সমস্ত কাজ শেষ হইত, তখন হস্তীপোতক নদীতে গিয়া জলকেলি করিয়া আসিত। সূত্রধারদিগের ছেলে মেয়েরা তাহার

---

[১]। কালসুত্তকোটিয়ং গণ্হাতি অর্থাৎ যমের সূত্রের ন্যায় ধরিত—এমনভাবে ধরিত যে কিছুতেই ফসকিয়া যাইত না।

[২]। আজানেয়—উৎকৃষ্ট কুলজাত (২৩শ জাতক দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বশ্বেত অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণ।

শুড়, কান, লেজ, প্রভৃতি ধরিয়া টানিত এবং জলে স্থলে তাহার সহিত নানারূপ খেলা করিত। সৎকুলজাত হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্য কেহই জলে মলমূত্র ত্যাগ করে না। এই হস্তীপোতকও মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে জল হইতে উঠিয়া উপরে আসিত, কখনও জল অপবিত্র করিত না।

একদিন নদীর উচ্চতর অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছিল। উক্ত হস্তীর একখণ্ড অর্দ্ধশুষ্ক মল এই বৃষ্টির জলে ধুইয়া নদীগর্ভে আসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভাসিতে বারাণসীর ঘাটে গিয়া এক গুল্মে সংলগ্ন হইল। ঐ সময়ে রাজার হস্তীপালেরা স্নান করাইবার জন্য পঞ্চশত হস্তী আনয়ন করিয়াছিল। আজানেয় হস্তীর মলগন্ধ পাইয়া ইহাদের একটা হস্তীও ভয়ে নদীতে অবতরণ করিতে চাহিল না; সকলেই ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন আরম্ভ করিল। মাহুতেরা গজাচার্য্যদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা বলিলেন, "জলের বোধ হয় কোন দোষ ঘটিয়াছে; জল শোধন কর।" জল শোধন করিতে গিয়া মাহুতেরা দেখিতে পাইল গুল্মের ভিতর আজানেয় হস্তীর সেই মলখণ্ড রহিয়াছে। তখন তাহারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিল, একটা কলসী আনিয়া তাহাতে জল পূরিল এবং তাহাতে সেই মলখণ্ড গুলিয়া হস্তীদিগের গায়ে ছিটাইয়া দিল। ইহাতে তাহাদের শরীর সুগন্ধ হইল এবং তাহারা নদীতে অবতরণ করিয়া স্নান করিল। গজাচার্য্যেরা রাজাকে এই ব্যাপার জানাইয়া পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই আজানেয় হস্তীটী অনুসন্ধান করিয়া আনাইয়া আপনার ব্যবহারে লাগাইলে ভাল হয়।"

এই পরামর্শানুসারে রাজা যত শীঘ্র পারিলেন নৌকারোহণে[১] যাত্রা করিলেন এবং নদী উজাইতে উজাইতে সূত্রধারদিগের কর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন। হস্তীপোতক তখন জলকেলি করিতেছিল। সে ভেরীর শব্দ শুনিয়া সূত্রধারদিগের নিকট গিয়া দাঁড়াইল; সূত্রধারেরা রাজার প্রত্যুদ্গমন করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, যদি কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে এত কষ্ট পাইয়া এখানে আসিলেন কেন? আপনি লোক পাঠাইলেই ত রাজধানীতে বসিয়া পাইতেন।" রাজা বলিলেন, না হে, আমি কাষ্ঠের জন্য আসি নাই; এই হস্তীর জন্য

---

[১]। মূলে "নাবসঙ্ঘাটেহি" এই পদ আছে। Childers সাহেব নাবসঙ্ঘাট শব্দের অর্থ ভেলক (raft) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্ঘাট শব্দে সমূহ অর্থও বুঝায় এবং তাহা হইলে নাবসঙ্ঘাটো বলিলে পোতমালা বা পোতসমূহ বুঝাইতে পারে। অথবা দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি যুড়িলে এক একটা নাবসঙ্ঘাট হইতে পারে, যেমন কয়েকখানা বস্ত্র যুড়িলে সঙ্ঘাটী হয়। এরূপ নৌকা সহসা টলে না। রাজার পক্ষে ভেলকে আরোহণ করা সম্ভপর নহে।

আসিয়াছি।”

“এ হস্তী ত আপনারই; স্বচ্ছন্দে লইয়া যান।”

সূত্রধারেরা রাজাকে হস্তী দান করিল বটে, কিন্তু হস্তী রাজার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তখন রাজা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কি হে হস্তীপোতক, তুমি আমায় কি করিতে বল?” হস্তী বলিল, “এই সূত্রধারেরা এত দিন আমার জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছে, ইহাদিগকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করুন।” রাজা বলিলেন, “বেশ, তাহাই করিতেছি।” অনন্তর তিনি হস্তীর শুণ্ড, পাদচতুষ্টয় ও লাঙ্গুলের নিকট এক এক লক্ষ কার্ষাপণ রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও হস্তী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল না। অতঃপর রাজা প্রত্যেক সূত্রধারকে এক এক যোড়া কাপড় দিলেন, তাহাদের পত্নীদিগের ব্যবহারার্থ এক একখানি শাড়ি দিলেন, সূত্রধারদিগের যে সকল সন্তানসন্ততি হস্তীপোতকের সহিত ক্রীড়া করিত, তাহাদেরও ভরণপোষণের ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তখন হস্তীবর, সূত্রধারগণ, তাহাদের পত্নীগণ ও সন্তানসমূহের সহিত দেখা করিয়া রাজার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

রাজা হস্তী লইয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত রাজধানী ও হস্তীশালা সুশোভিত হইল। তিনি হস্তীকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া সর্ব্বালঙ্কারভূষিত হস্তীশালায় প্রবেশ করাইলেন, এবং তাহাকে বিচিত্রভূষণে বিভূষিত করিয়া নিজের প্রধান বাহনের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি উহাকে নিজের বন্ধুর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং উহার জন্য অর্দ্ধরাজ্য নিয়োজিত করিয়া দিলেন। ফলতঃ তিনি নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেন, হস্তী সম্বন্ধেও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না। আজানেয় হস্তী আসিবার পর তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। যখন মহিষীর প্রসবকাল আসন্ন হইল তখন রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আজানেয় হস্তী যদি রাজার মৃত্যুসংবাদ পায় তাহা হইলে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় কেহ উহাকে এ কথা জানাইল না। রাজভৃত্যগণ পূর্ব্ববৎ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এদিকে বারাণসীর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন, ‘বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বারাণসী অধিকার করা ত এখন অতি তুচ্ছ কার্য্য।’ অনন্তর তিনি বিপুলসেনাসহ বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। অধিবাসীরা নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইল, “আমাদের মহিষী এখন

পরিপূর্ণগর্ভা; অঙ্গবিদ্যাপাঠকেরা[১] বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তিনি এক পুত্র প্রসব করিবেন। যদি বাস্তবিক তিনি পুত্র প্রসব করেন তাহা হইলে আমরা সপ্তদিনে আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; নচেৎ আপনাকে এই রাজ্য দিব। আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই কয় দিন অপেক্ষা করুন।" কোশলরাজ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সাত দিন পরে মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া বহুলোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে রাজপুরুষেরা তাঁহার "অলীনচিত্ত" এই নাম রাখিলেন।

কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নগরবাসীরা কোশলরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বিপুল সেনাসম্পন্ন হইয়াও কেবল অধিনায়কের অভাবে তাহারা অল্পে অল্পে পরাভূত হইতে লাগিল। তখন অমাত্যেরা মহিষীকে এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, "আমরা যখন হঠিতেছি, তখন ভয় হইতেছে পাছে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হই। স্বর্গীয় মহারাজের প্রিয় সুহৃৎ মঙ্গলহস্তী তাঁহার দেহত্যাগ, কুমারের জন্ম এবং কোশলরাজের আক্রমণ ইহার কোন সংবাদই এপর্য্যন্ত পায় নাই; তাহাকে এই সকল কথা জানাইব কিনা, আপনার নিকট শুনিতে আসিলাম।"

মহিষী বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া ও ক্ষৌমবস্ত্রের স্থূলাস্তরণের উপর ধরিযা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া হস্তীশালায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার সখা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, পাছে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এই ভয়ে আমরা এতদিন আপনাকে এ দুঃসংবাদ জানাই নাই। এই শিশুটি আপনার সখার পুত্র; কোশলরাজ আসিয়া নগর অবরোধপূর্ব্বক আপনার এই পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। আমাদের সৈন্যগণ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছে; এখন হয় আপনি নিজেই আপনার পুত্রকে মারিয়া ফেলুন, নয় রাজ্য রক্ষা করিয়া ইহাকে দান করুন।"

মঙ্গলহস্তী তখনই স্নেহবশে শুঁড় দিয়া আস্তে আস্তে বোধিসত্ত্বের গা চাপড়াইল, তাঁহাকে নিজের মস্তকোপরি তুলিয়া লইল, কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিবেদনের পর তাঁহাকে নামাইয়া মহিষীর হস্তে দিল এবং 'আমি কোশলরাজকে এখনই ধরিয়া আনিতেছি' বলিয়া হস্তীশালা হইতে বাহির হইল। অমাত্যেরা তাহাকে বর্ম্ম ও অলঙ্কার পরাইলেন, নগরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিজেরাও বহির্গত হইলেন। নগরের বাহির হইবামাত্র

---

[১]। যাহারা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের ভাবী শুভাশুভ বলিতে পারে।

হস্তী ক্রৌঞ্চের ন্যায় বৃংহণ করিল; তাহা শুনিয়া কোশলরাজের সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সে শিবির ভেদ করিয়া কোশলপতির কেশ ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া বোধিসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া দিল। তখন কেহ কেহ কোশলরাজের প্রাণসংহারে উদ্যত হইল; কিন্তু হস্তী ইহা নিষেধ করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিল : "মহারাজ এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিবেন। কাশীরাজকুমার শিশু বলিয়া মনে করিবেন না যে এই রাজ্য আপনি অধিকার করিতে পারিবেন।"

অতঃপর সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য বোধিসত্ত্বের হস্তগত হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে পারে এমন কেহই রহিল না। তখন তাঁহার নাম হইল "অলীনচিত্তরাজ"। তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিয়া জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

কুমার অলীনচিত্ত, আশ্রয় তাঁহার
লভি হৃষ্টমতি অতি কাশীসৈন্যগণ
কোশলরাজেরে আনে জীয়ন্ত ধরিয়া—
অতৃপ্ত আপন রাজ্যে ছিল যাঁর মন।
এইরূপ দৃঢ়বীর্য ভিক্ষু বিচক্ষণ
লভিয়া সৌভাগ্যবলে ত্রিরত্নশরণ,
নির্ব্বাণ লাভের তরে সর্ব্বদা ভাবনা করে
কুশল ধর্ম্মের কথা, হ'য়ে একমন;
ক্রমে ছিন্ন হয় তার সংসার-বন্ধন।

এইরূপে ভগবান ধর্ম্মদেশনার জন্য অমৃতকল্প মহানির্ব্বাণরূপ উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : এখন যিনি মহামায়া, তখন ছিলেন তিনি সেই জননী; শুদ্ধোদন ছিলেন সেই জনক; এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই হস্তী, যে রাজ্য জয় করিয়া কুমারকে দান করিয়াছিল; সারিপুত্র ছিলেন সেই হস্তীর জনক এবং আমি ছিলাম অলীনচিত্ত কুমার।

---

১৫৭. গুণ-জাতক

[একবার স্থবির আনন্দ বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের জন্য এক সহস্র শাটক[১] উপহার পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

আনন্দ কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন করিতেন। তদ্‌বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে মহাসার-জাতকে (৯২) বলা হইয়াছে। যখন আনন্দ পূর্ব্বকথিতরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন রাজার নিকট একসহস্র শাটক আনীত হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। রাজা সেগুলি হইতে পঞ্চশত রাজ্ঞীকে পঞ্চশত শাটক দান করিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীরা সে সমুদয় ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলেন এবং পরদিন আনন্দকে দান করিলেন। প্রাতরাশের সময় রাজ্ঞীরা পুরাতন শাটক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি? আমি তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক একখানি শাটক দিলাম; তোমরা তাহা পরিয়া আসিলে না কেন?" রাজ্ঞীরা বলিলেন, "স্বামিন্, আমরা সেগুলি স্থবিরকে দিয়াছি।" "স্থবির কি সবগুলিই লইয়াছেন?" "হাঁ প্রভু।" "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের পক্ষে কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে স্থবির আনন্দ রীতিমত বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইতেছেন।" ফলতঃ আনন্দ অতিবহ শাটক গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসে কোশলরাজ একটু বিরক্ত হইলেন এবং প্রাতরাশ সমাপনান্তে বিহারে গিয়া পরিবেণ-মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি স্থবিরকে প্রণিপাত করিয়া আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আপনার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন ত?" "হাঁ মহারাজ; তাঁহারা যাহা শিক্ষিতব্য তাহা শিক্ষা এবং যাহা শ্রোতব্য তাহা শ্রবণ করেন।" "কেবল শুনেন, না আপনাকে মধ্যে মধ্যে নিবাসন, প্রাবরণ[২] প্রভৃতিও দান করেন?" "মহারাজ, তাঁহারা অদ্য আমাকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছেন; তাহাদের এক একখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা।" "আপনি কি সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন?" "আমি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি।" "শাস্তা না ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "একজন ভিক্ষু নিজের জন্য ত্রিচীবরমাত্র ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু কেহ কিছু দান করিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না এমন কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। যে সকল ভিক্ষুর চীবর

---

[১]। শাটক বস্ত্র, বড় জামা বা ঘাগরা। এখানে বোধ হয় ইহা 'শাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শাড়ী' শব্দটি শাটকেরই অপভ্রংশ।

[২]। নিবাসন ও প্রবারণ—পরিচ্ছদ-বিশেষ; প্রবারণ সজ্ঘাটীস্থানীয় এবং নিবাসন অন্তরবাসক-স্থানীয়।

জীর্ণ হইয়াছে, আমি তাদেরই জন্য এই শাটকগুলি গ্রহণ করিয়াছি।" ''এই ভিক্ষুরা যখন আপনার নিকট শাকট পাইবেন, তখন জীর্ণ চীবরগুলি দিয়া কি করিবেন?" "তাহারা পুরাতন চীবরদ্বারা উত্তরাসঙ্গ প্রস্তুত করিবে।'' "পুরাতন উত্তরাসঙ্গগুলি দিয়া কি হইবে? সেগুলি দিয়া অন্তরবাসক প্রস্তুত হইবে।" "পুরাতন অন্তরবাসকগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া শয্যার আস্তরণ হইবে।" "পুরাতন শয্যাস্তরণ দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া মাটিতে বসিবার আসন প্রস্তুত হইবে" "পুরাতন আসনগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া পা-পোষ[১] হইবে।" "পুরাতন পা-পোষগুলি দিয়া কি হইবে?" "মহারাজ! লোকে যাহা দান করে, তাহা নষ্ট করা যায় না। সেই জন্য আমরা পুরাতন পা-পোষগুলি বাসী দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া লই এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহা দিয়া লেপ দিই।" "ভদন্ত, আপনাদিগকে কোন বস্তু দান করিলে কখনও কি তাহা বিনষ্ট হয় না? পুরাতন পা-পোষগুলি পর্য্যন্ত কাজে লাগে?" "মহারাজ, আমরা যাহা পাই, তাহার কিছুই নষ্ট করি না; সমস্তই কোন না কোন কাজে লাগাই।"

স্থবিরের এই উত্তরে রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, গৃহে যে পঞ্চশত শাটক ছিল তাহাও আনাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। অনন্তর অনুমোদন বাক্য শুনিয়া এবং স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আনন্দ প্রথমে যে পঞ্চশত শাটক পাইয়াছিলেন সেগুলি, যে সকল ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছিল তাহাদিগকে দান করিলেন। তাঁহার সার্দ্ধবিহারিকদিগের সংখ্যাও ঠিক পঞ্চশত ছিল। তাহাদের মধ্যে এক দহর ভিক্ষু আনন্দের বড় সেবা করিত। সে তাহার পরিবেণ সমার্জ্জন করিত, খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিত, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিত, বর্চঃকুটীর, স্নানাগার ও শয়নগৃহের তত্ত্বাবধান করিত, এবং তাঁহার হাত, পা ও পিঠের আরামের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সমস্ত করিত। "এই বালক আমার বড় উপকারক" ইহা বিবেচনা করিয়া স্থবির শেষের পঞ্চশত শাটক সমস্তই তাহাকে দান করিলেন। সে আবার ঐ সমস্ত নিজের সহাধ্যায়ী দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। তাহারা সেগুলি কাটিয়া কর্ণিকারপুষ্পবর্ণে[২] রঞ্জিত করিল, তদ্দ্বারা নব চীবর প্রস্তুত করিল, তাহা পরিধান-পূর্ব্বক শাস্তার নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তাঁহার পক্ষে পাত্রের মুখাবলোকন করিয়া দানের তারতম্য করা উচিত কি?" শাস্তা

---

[১]। মূলে "পাদপুঞ্ছনং" এই পদ আছে।

[২]। কর্ণিকার—কনক চাঁপা। ইহা পীতবর্ণ পুষ্প।

বলিলেন, "না, ভিক্ষুগণ, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তিনি দানসম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে পারেন না।" "ভদন্ত, আমাদের উপাধ্যায় ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির মহাশয় এক দহর ভিক্ষুকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছিলেন; উহাদের প্রত্যেক শাটকের মূল্য সহস্র মুদ্রা। সেই ব্যক্তি কিন্তু তৎসমস্ত আমাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।" "ভিক্ষুগণ, তোমরা মনে করিওনা যে আনন্দ সেই ভিক্ষুর মুখাবলোকন করিয়া দান করিয়াছিলেন। সে আনন্দের বহু সেবা করে; তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, তাহার গুণে বশীভূত হইয়া, সেই পাইবার উপযুক্ত ইহা ভাবিয়া, উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া আনন্দ তাহাকে শাটকগুলি দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ইচ্ছায় তাঁহাকে এই দানে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রাচীনকালেও পণ্ডিতেরা উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া গিয়াছেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহ-জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কোন পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ পর্ব্বতপাদ বেষ্টন করিয়া এক বৃহৎ সরোবর ছিল। তাহার তটবর্ত্তী এক উন্নত ভূখণ্ডের উপরিভাগস্থ কর্দ্দম এতটুকু কঠিন হইয়াছিল যে সেখানে হরিদ্বর্ণ কোমল তৃণ জন্মিত এবং শশক, হরিণ ও অন্যান্য লঘুকায় পশু বিচরণপূর্ব্বক ঐ তৃণ খাইত। সেদিনও সেখানে একটা হরিণ চরিতেছিল।

সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব ঐ হরিণকে ধরিবার জন্য পর্ব্বতশিখর হইতে সিংহবেগে ধাবিত হইলেন। হরিণটা মরণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ণ করিল; বোধিসত্ত্ব বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কর্দ্দমে নিপতিত হইলেন এবং সেখানে তাঁহার বিশালদেহ এমনভাবে প্রোথিত হইল যে তাঁহার আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। তিনি পদচতুষ্টয় স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া সপ্তাহকাল অনাহারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর এক শৃগাল আহারান্বেষণে বাহির হইয়া বোধিসত্তকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উপক্রম করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে শৃগাল, তুমি পলায়ণ করিও না। আমি এখানে কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া আছি; তুমি আমার প্রাণরক্ষার উপায় কর।" এই কথা শুনিয়া শৃগাল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারি বটে, কিন্তু ভয় হয় উদ্ধার পাইলেই পাছে আপনি আমাকে খাইয়া ফেলেন।" "তুমি কোন ভয় করিও না, আমি তোমায় খাইব না; খাওয়া দূরে

থাকুক, আমি বরং তোমাকে যথেষ্ট উপকার করিব। যে কোন উপায়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।”

এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শৃগাল সিংহের পদচতুষ্টয়ের চারিদিকে যে কর্দ্দম ছিল তাহা অপনয়ন করিল, প্রত্যেক পদ যেখানে প্রোথিত হইয়াছিল সেখান হইতে জল পর্য্যন্ত কুল্যা খনন করিল এবং তাহা দিয়া জল আনিয়া কাদা নরম করিল। তাহার পর বোধিসত্ত্বের পেটের নীচে গিয়া “প্রভু! এইবার উঠিতে চেষ্টা করুন ত” বলিয়া উচ্চরব করিতে করিতে নিজের মস্তক দিয়া তাঁহার পেটে আঘাত করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইলেন এবং এক লম্ফে শুষ্ক ভূমির উপর গিয়া পড়িলেন। সেখানে মূহুর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি সরোবরে অবরোহণপূর্ব্বক গাত্র হইতে কর্দ্দম প্রক্ষালন করিলেন এবং অবগাহনান্তে উঠিয়া গিয়া একটা মহিষ বধ করিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণদন্ত দ্বারা উহার কিয়ৎপরিমাণ মাংস ছেদনপূর্ব্বক শৃগালের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “বন্ধু, তুমি আহার কর।” যতক্ষণ শৃগালের আহার শেষ না হইল, ততক্ষণ তিনি নিজে আহার করিলেন না।

উভয়ের আহার হইলে শৃগাল একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু! এ মাংস দিয়া কি করিবে?” “আপনার এক দাসী আছে, তাহাকে দিব।” “বেশ, তাঁহাকে দাও গিয়া।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিজেও সিংহীর জন্য একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, “চল বন্ধু, আমাদের পর্ব্বতশিখরস্থিত বাসস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আমরা উভয়েই সখীর নিকট যাইব।” ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে নিজেই শৃগালীর নিকট গিয়া তাহাকে মাংস খাওয়াইলেন। তিনি শৃগাল ও শৃগালী উভয়কেই আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “অদ্য হইতে আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলাম,” এবং নিজের গুহাদ্বারের নিকটবর্ত্তী অন্য একটি গুহায় তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মৃগয়ায় যাইবার সময় শৃগালকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; সিংহী ও শৃগালী গুহায় থাকিত। তাঁহারা নানা মৃগ বধ করিতেন এবং ভোজনব্যাপার সমাধানপূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর জন্য মাংস লইয়া ফিরিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সিংহী ও শৃগালী উভয়েরই দুই দুইটি পুত্র জন্মিল এবং সকলে এক সঙ্গে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে একদিন সিংহীর মনে হঠাৎ ভাবান্তর জন্মিল। সে ভাবিল, ‘সিংহ শৃগাল-শৃগালী ও তাহাদের শাবকদ্বয়কে বড় ভালবাসে। নিশ্চিত এ শৃগালীর প্রেমাসক্ত হইয়াছে, নচেৎ এরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিবে কেন? ‘অতএব ইহাদিগকে পীড়ন করিয়া ও ভয় দেখাইয়া এখান হইতে তাড়াইতে হইবে।’ এইরূপ স্থির

করিবার পর, একদিন যখন বোধিসত্ত্ব শৃগালকে লইয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন, সেই সময়ে সিংহী শৃগালীকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, "তোরা এখানে রহিয়াছিস কেন রে? পলাইয়া যা না!" সিংহীর শাবক দুইটিও শৃগাল শাবকদিগকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালী ভীত হইয়া শৃগালকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, "বোধ হয় সিংহের পরামর্শেই সিংহী এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে। আমরা এখানে অতি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছি; এখন বোধ হয় ইহারা আমাদের প্রাণবধ করিবে। চল, আমরা পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।"

ইহা শুনিয়া শৃগাল সিংহের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু! আমরা দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি। যাহারা অতি দীর্ঘকাল আশ্রয় ভোগ করে, তাহারা গলগ্রহ হয়। আজ আমরা যখন মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, তখন সিংহ শৃগালীকে বলিয়াছিলেন, "তোরা এখানে রহিয়াছিস কেন? পলাইয়া যা না!" আপনার পুত্রেরাও আমার পুত্রদিগকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাহারও অবস্থিতি অপ্রীতিকর হইলে তাহাকে 'চলিয়া যাও' বলিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য, উৎপীড়ন করিবার প্রয়োজন কি?" ইহা বলিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিল :

বলীর স্বভাব এই করি দরশন,
ইচ্ছামত আশ্রিতের করে উৎপীড়ন।
বিকটদশনা তব পত্নী, মহাশয়,
জানেন এ বলিধর্ম্ম নাহিক সংশয়।
লভেছিনু এতকাল যাহার শরণ,
ভাগ্যদোষে সেই হ'ল ভয়ের কারণ।

শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহীকে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার মনে পড়ে কি, অমুক সময় আমি মৃগয়ায় গিয়া সপ্তম দিবসে এই শৃগাল ও শৃগালীর সহিত গুহায় ফিরিয়াছিলাম?" সিংহী বলিল, "হ্যাঁ, তাহা আমার মনে আছে।" "আমি সপ্তাহকাল ফিরিতে পারি নাই, তাহার কারণ জান ত?" "না, তাহা আমি জানি না।" "ভদ্রে! আমি একটা মৃগ ধরিবার অভিপ্রায়ে প্রমাদবশত কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়াছিলাম; সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া এক সপ্তাহ অনাহারে ছিলাম; পরে এই শৃগালের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম।

বন্ধুবর এই শৃগালই আমার প্রাণদাতা। দুর্ব্বল হউক, কিংবা সবল হউক, যে মিত্রধর্ম্ম পালন করে সেই প্রকৃত মিত্র। সাবধান, অদ্য হইতে আমার সখা, সখী ও তাঁহাদের পুত্রদিগকে এরূপ অবমানিত করিও না।" পত্নীকে এইরূপে শাসন করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

বিপদের কালে, মিত্রধর্ম্ম পালে,
মিত্রে করে সংরক্ষণ,
হউক সবল, অথবা দুর্ব্বল,
প্রকৃত মিত্র সে জন।
সেই জ্ঞাতি মোর, সেই প্রিয়বন্ধু,
মিত্র, সখা তারে বলি;
তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভ্রমেও কখন,
নাহি তারে আমি চলি।
প্রাণদাতা এই শৃগাল আমার,
জানিও তীক্ষ্ণদশনে।[১]
দিও না আঘাত, হৃদয়ে ইহার
কখন(ও) রুষ্ট বচনে।

সিংহের কথা শুনিয়া সিংহী শৃগালীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তদবধি তাহার ও তাহার পুত্রদিগের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে লাগিল। তাহার শাবকদ্বয়ও শৃগাল শাবকদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিত। মাতাপিতার প্রাণবিয়োগের পরেও তাহারা এই বন্ধুত্ব বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরস্পর সখ্যভাবে বাস করিয়াছিল। শুনা যায় এই পরিবারদ্বয়ের মধ্যে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত মৈত্রীভাব স্থায়ী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ প্রথম মার্গে, কেহ দ্বিতীয় মার্গে, কেহ তৃতীয় মার্গে, কেহ বা চতুর্থ মার্গে প্রবেশ করিল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

---

১৫৮. সুহনু-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দুইজন কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

তখন জেতবনে একজন অতি কোপন, নিষ্ঠুর ও উগ্র ভিক্ষু থাকিতেন; জনপদেও ঠিক ঐ প্রকৃতির একজন ভিক্ষু থাকিত। একদা জনপদবাসী ভিক্ষু

---

[১]। গাথা দুইটিতে সিংহী-সম্বন্ধে যথাক্রমে উন্নদন্তী এবং 'দাঠিনী' এই দুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উভয় পদই সিংহীর সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক,—মানবী সম্বন্ধে 'কুন্দদশনা' বিশেষণের তুল্য।

কোন কার্য্যবশত জেতবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রামণের ও দহরগণ তাহাদের উভয়েরই উগ্র স্বভাবের কথা জানিত। পরস্পরের দেখা পাইলে এই দুই ব্যক্তি কিরূপ ঝগড়া করে, এই মজা দেখিবার জন্য তাহারা জনপদবাসী ভিক্ষুকে জেতবনবাসী ভিক্ষুকে জেতবনবাসী ভিক্ষুর পরিবেণে লইয়া গেল। কিন্তু ঐ উগ্রস্বভাব ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরের দেখা পাইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিল এবং উভয়ে উভয়ের হস্ত, পাদ ও পৃষ্ঠ সংবাহন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইবার পরেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখিলে, এই কোপন-স্বভাব ভিক্ষুদ্বয় অন্যের সম্বন্ধে ক্রোধান্বিত, পরুষ ও উগ্র; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ইহাদের কেমন প্রীতি, সৌহার্দ্দ ও অভিন্নভাব!' এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছ?" এবং তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব জন্মেও ইহারা অপরের সম্বন্ধে কোপন, পরুষ ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিত, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অভিন্নহৃদয়ে, উভয়ে উভয়ের সুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া সম্প্রীতভাবে বাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বার্থচিন্তকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত বড় অর্থলোলুপ ছিলেন। তাঁহার মহাশোণ নামক একটা অতি দুষ্টপ্রকৃতি অশ্ব ছিল।

একদা উত্তরাপথ হইতে অশ্ব-বণিকেরা পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। রাজপুরুষেরা ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন।

এত দিন বোধিসত্ত্ব অশ্বাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগকে সমস্ত চুকাইয়া দিতেন; কখনও কিছু বাদ দিতেন না। কিন্তু এখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া অশ্বগুলির মূল্য স্থির কর। তাহার পর মহাশোণকে এমনভাবে ছাড়িয়া দিবে যেন সে ঐ সকল অশ্বের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং উহাদিগকে দংশন দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে। তাহা হইলে অশ্বগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, আমরাও সেই জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিবার সুবিধা পাইব। অমাত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ করিল। অশ্ব-বণিকেরা ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের দেশে কি এমন দুষ্ট ঘোড়া নাই?" তাহারা উত্তর দিল, "আছে বৈ কি, মহাশয়! আমাদের নগরে সুহনু নামে একটা বড় ঘোড়া আছে।

সে অতি উগ্র ও উদ্ধত।” বোসিত্ত্ব বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, তোমরা আবার যখন আসিবে, তখন ঐ ঘোড়াটাকে সঙ্গে আনিও।”

“অশ্ব-বণিকেরা “যে আজ্ঞা” বলিয়া দেশে ফিরিয়া গেল এবং পুনর্ব্বার যখন বারাণসীতে আসিল, তখন সেই কূটাশ্বকে সঙ্গে আনিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া নূতন ঘোড়াগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং মহাশোণকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। অশ্ব-বণিকেরাও মহাশোণকে আসিতে দেখিয়া সুহনুকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এই অশ্বদ্বয় পরস্পরকে দেখিবামাত্র গা-চাটাচটি আরম্ভ করিল।

ইহা দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বয়স্য! ইহার কারণ কি? এই কূটাশ্ব দুইটি অন্য অশ্বসম্বন্ধে ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে; তাহাদিগকে দংশন দ্বারা অবসন্ন করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইহাদের কেমন সম্প্রীতভাব! ইহারা কেমন শান্ত হইয়া পরস্পরের গাত্রলেহন করিতেছে! ইহার কারণ কি বল ত ।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “মহারাজ, এই অশ্বদ্বয়ের প্রকৃতগত পার্থক্য নাই। ইহারা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট—একই ধাতু দ্বারা গঠিত। অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটি বলিলেন :

মহাশোণে সুহনুতে ভেদ কিছু নাই,
একের প্রকৃতি যাহা অপরের(ও) তাই।
উভয়েই উগ্র অতি, উভয়েই দুষ্টমতি,
স্যন্দনের রজ্জু নিত্য উভয়েই খায়;
সমানে সমানে প্রীতি, সর্ব্বস্থানে এই রীতি,
পাপে পাপ, দুষ্টে দুষ্ট সাম্যভাব পায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, “মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে অতিলোভী হওয়া, কিংবা পরের বিত্ত বিনষ্ট করা নিতান্ত গর্হিত।” রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অশ্বগুলির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন এবং বণিকদিগকে তাহা দেওয়াইলেন। তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিতেন এবং জীবনাবসানে যথাধর্ম্ম গতিলাভ করিয়াছিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই দুষ্ট ভিক্ষু দুইজন ছিল সেই কূটাশ্বদ্বয়; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

১৫৯. ময়ূর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর করিল, "হাঁ ভদন্ত!" "কাহাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে?" "নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া।'' "রমণীরা তোমার ন্যায় ব্যক্তির চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? পুরাকালে পণ্ডিতেরা, শত শত বর্ষকাল নিষ্পাপভাবে জীবন যাপন করিয়াও রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রমণীর কুহকে পুণ্যশীল ব্যক্তিও পাপরত হন, উত্তম যশস্বীরাও কলঙ্কিত হইয়া থাকেন। যাহারা পাপমতি তাহাদের ত কথায় নাই।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অণ্ডের মধ্যে ছিলেন, তাহার বর্ণ কর্ণিকার-কোরকের ন্যায় ছিল। যখন তিনি অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার মনোহর কান্তি দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল এবং পক্ষদ্বয়ের নিম্নে পরম রমণীয় লোহিত রেখা বিরাজ করিত। তিনি জীবনরক্ষার্থ তিনটি পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক চতুর্থ পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত দণ্ডকহিরণ্য নামক শৈলের অধিক্যতা প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রি প্রভাত হইলে শৈল-শিখরে উপবেশন করিয়া উদীয়মান সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং গোচরক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ 'উদিলেন ওই' ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :

উদিলেন ওই দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
সুবর্ণ কিরণে স্নাত হ'য়ে যাঁর
হাসিছে ধরণীতল।
প্রণমি তোমারে, হে হেমবরণ!
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
লভিব বাঞ্ছিত ফল।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উল্লিখিত গাথা দ্বারা সূর্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথায় অতীত বুদ্ধগণকে[১] প্রণাম ও তাঁহাদের গুণগান করিতেন :

---

[১]। অতীত বুদ্ধগণ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বেদ পারদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পায় করি নমস্কার; পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার;
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।
এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
শিখি সেথা ইচ্ছামত আহার খুঁজিত।[১]

সমস্ত দিন বিচরণের পর বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে শৈলশিখরে ফিরিয়া আসিতেন, সেখানে উপবেশনপূর্ব্বক অস্তগামী সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া, নিবাসস্থানে আত্মরক্ষার্থ "অস্তমিত হন" ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :

অস্তমিত হন দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
উদ্ভাসিত ধরা পাইয়া যাঁহার
সোণার কিরণভাতি।
প্রণমি তোমারে, হে হেমবর!
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
নিঃশঙ্কে যাপিব রাতি।
বেদ পারদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পদে করি নমস্কার; পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার;
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।
এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
ময়ূর আবাসে গিয়া যামিনী যাপিত।[২]

একদা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন নিষাদ-গ্রামবাসী এক নিষাদ হিমবন্ত প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে দণ্ডকহিরণ্য-পর্ব্বতশিখরে সমাসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের পুত্রকে এই কথা জানাইল। ইহার পর একদিন বারাণসী-রাজের ক্ষোমানাম্নী পত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটি সুবর্ণময়ূর ধর্ম্মদেশন করিতেছে। তিনি রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, সেই ময়ূরের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করি।" রাজা

---

[১]। এই দুই পঙক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।
[২]। এই দুই পঙক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (সুবর্ণ ময়ূর কোথায় পাওয়া যায়?)। অমাত্যেরা বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা জানেন।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "সুবর্ণ ময়ূর আছে বটে।" কিন্তু "কোথায় আছে" জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, "নিষাদেরা বলিতে পারে।" ইহা শুনিয়া রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই নিষাদপুত্র বলিল, "মহারাজ, হিমবন্তপ্রদেশে দণ্ডকহিরণ্য নামে এক পর্ব্বত আছে; সেখানে একটা সুবর্ণময়ূর বাস করে।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া এখানে আনয়ন কর, কিন্তু সাবধান, তাহার প্রাণবিনাশ করিও না।"

নিষাদপুত্র গিয়া বোধিসত্ত্বের গোচর-ভূমিতে ফাঁদ পাতিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব ঐ ফাঁদে পা দিলেও উহা তাঁহাকে আবদ্ধ করিল না, নিশ্চল হইয়া রহিল। নিষাদপুত্র বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য একাদিক্রমে সাত বৎসর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতঃপর সে হিমবন্ত দেশেই প্রাণত্যাগ করিল। রাণী ক্ষেমাও অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একটা ময়ূরের জন্য রাণীর প্রাণ গেল দেখিয়া রাজার বড় ক্রোধ হইল। তিনি সুবর্ণ পট্টে এই বাক্য ক্ষোদিত করাইলেন যে হিমবন্তের অন্তঃপাতী দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে এক সুবর্ণ ময়ূর বাস করে। যে তাহার মাংস খাইবে সে অজর ও অমর হইবে। অনন্তর তিনি পট্টলিপি খানি একটা মঞ্জুষার ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন।

কালক্রমে এই রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুবর্ণ পট্ট পাঠ করিয়া অজর ও অমর হইবার আশায় অন্য এক নিষাদকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রথম নিষাদের ন্যায় এ ব্যক্তিও বোধিসত্ত্বকে ধরিতে পারিল না। সেও কিয়ৎকাল পরে হিমবন্তে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয়জন রাজার রাজত্ব কাল অতিবাহিত হইল।

সপ্তম রাজাও সিংহাসন লাভের পর এক নিষাদ প্রেরণ করিলেন। সে দেখিল, বোধিসত্ত্ব ফাঁদে পা দিয়াও আবদ্ধ হইতেছেন না; যন্ত্র নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; অপিচ তিনি খাদ্যানুসন্ধানে বাহির হইবার পূর্ব্বে একটি মন্ত্র পাঠ করেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সে প্রত্যন্তপ্রদেশে অবতরণপূর্ব্বক একটা ময়ূরী ধরিল; তাহাকে হাততালি দিলে নাচিতে এবং তুড়ি দিলে শব্দ করিতে শিখাইল এবং সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার দণ্ডকহিরণ্যকে গেল। একদিন সে অতি প্রত্যূষে, বোধিসত্ত্ব মন্ত্রপাঠ করিবার পূর্ব্বেই, ফাঁদের খুঁটিগুলি পুতিল এবং জাল ফেলিয়া ময়ূরী দ্বারা শব্দ করাইতে লাগিল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব রমণী-কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়া বোধিসত্ত্ব কামাতুর হইলেন এবং মন্ত্রপাঠ না করিয়াই যেমন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন নিষাদ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া

বারাণসীরাজকে দান করিল।

রাজা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার জন্য আসন দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমাকে ধরাইয়া আনিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "শুনিতে পাই যাহারা তোমার মাংস খাইবে তাহারা নাকি অজর ও অমর হইবে। আমি অজর ও অমর হইবার আশায় তোমার মাংস খাইব। সেইজন্য তোমায় ধরাইয়া আনিয়াছি।" "আচ্ছা মহারাজ, স্বীকার করিলাম যে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা অজর ও অমর হইবে। কিন্তু আমার ত প্রাণ যাইবে?" "তোমার প্রাণ যাইবে বৈ কি।" "যদি আমিই মরিলাম, তবে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা কিরূপে অজর ও অমর হইবে?" "তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; সেই জন্যই না কি তোমার মাংস খাইলে অজর ও অমর হইতে পারা যায়।"[১] "মহারাজ, আমি বিনা কারণে সুবর্ণবর্ণ হই নাই। পুরাকালে আমি এই নগরেই চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলাম। তখন আমি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতাম এবং পৃথিবীর অপর লোকের দ্বারাও সেগুলি রক্ষা করাইতাম। তাহার পর দেহত্যাগ করিয়া আমি ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যতদিন পরমায়ু ছিল ততদিন অতিবাহিত করিবার পর আমাকে পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে ময়ূরজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে পূর্ব্ব জন্মের শীলপালনজনিত পুণ্যবলে আমার সুবর্ণবর্ণ হইয়াছে।" "বল কি? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী ছিলে, শীলপালন করিতে এবং সেই পুণ্যে সুবর্ণবর্ণ হইয়াছ, এসব কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? ইহার কোন সাক্ষী আছে কি?" "সাক্ষী আছে, মহারাজ।" "কে সাক্ষী?" "মহারাজ, যখন আমি চক্রবর্ত্তী ছিলাম তখন এক রত্নময় রথে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতাম। আপনার মঙ্গল পুষ্করিণীর[২] তলদেশে ভূগর্ভে সেই রথ প্রোথিত আছে। আপনি পুষ্করিণীর তলভাগ খুঁড়িয়া সেই রথ তুলিতে আদেশ দিন। তাহাই আমার সাক্ষী।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা।" অনন্তর তিনি পুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া দিলেন এবং তাহার তলদেশ খনন করাইয়া সেই রথ পাইলেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের কথা বিশ্বাস করিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, অমৃতকল্প মহানির্ব্বাণ ব্যতীত সংসারের যাবতীয় পদার্থ অসার, অনিত্য ও ক্ষয়ব্যয়-ধর্ম্মশীল।" এইরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া

---

[১]। চীন দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে সুবর্ণ ভোজন করিলে, যতকাল দেহে সুবর্ণ থাকিবে, ভোক্তারা ততকাল জীবিত থাকিবেন। —ইংরাজী অনুবাদক লিখিত টীকা।

[২]। রাজার নিজ ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী। এইরূপ, মঙ্গলাশ্ব, মঙ্গল হস্তী ইত্যাদি।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বের মহাসংবর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহার চরণে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং কতিপয় দিন অবস্থিতি করিয়া "মহারাজ, সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে চলিবেন," এই উপদেশ দিয়া আকাশে উড্ডীন হইয়া দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে প্রতিগমন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আয়ুঃশেষে যথাকর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ ময়ূর।]

---

১৬০. বিনীলক-জাতক

[দেবদত্ত সুগতের অনুকরণ করিতেন (অর্থাৎ তাঁহার মত চালচলন ধরিয়াছিলেন)। তদুপলক্ষে, শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অগ্রশ্রাবকদ্বয়[১] গয়শিরে গমন করিলে দেবদত্ত তাঁহাদিগের সমক্ষে সুগতের ন্যায় চালচলন দেখাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পতন ঘটে। অগ্রশ্রাবকেরা ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আপনাদের শিষ্যদিগকে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন করেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, তোমাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত কি করিয়াছিল?" সারিপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তিনি সুগতের অনুকরণ করিতে গিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুক্রিয়া দ্বারা পতিত হইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এই দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বিদেহরাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহানে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঐ সময়ে এক সুবর্ণ হংস তাহার গোচরভূমিতে একটা কাকীর সহবাস

---

[১]। মৌদ্গাল্যায়ন ও সারিপুত্র। লক্ষণ জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

করিত। তাহাতে কাকীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ শাবকটি না হইয়াছিল মাতার ন্যায়, না হইয়াছিল পিতার ন্যায়। তাহার দেহের নীলকৃষ্ণ বর্ণ দেখিয়া সকলে তাহার 'বিনীলক' এই নাম রাখিয়াছিল। হংসরাজ বার বার এই পুত্রকে দেখিতে আসিত।

হংসরাজের আরও দুইটি পুত্র ছিল; তাহারা হংসীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। পিতাকে পুনঃ পুনঃ লোকালয়ে যাইতে দেখিয়া তাহারা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আপনি বার বার লোকালয়ে যান কেন?" হংসরাজ বলিল, "বৎসগণ, কোন কাকীর সহবাসে আমার একটি পুত্র জন্মিয়াছে; তাহার নাম বিনীলক; আমি তাহাকে দেখিতে যাই।" সে কোথায় থাকে?" "বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরের অনতিদূরে অমুকস্থানে একটা তালবৃক্ষের অগ্রভাগে।" "পিতঃ, লোকালয়ে (আমাদের) নানাভয় ও বিপদের সম্ভাবনা। আপনি সেখানে আর যাইবেন না। আমরা গিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিতেছি।"

ইহা বলিয়া হংসপোতকদ্বয় পিতার নির্দ্দেশানুসারে সেখানে গেল, বিনীলককে একখানি যষ্টির উপর বসাইল এবং চঞ্চুদ্বারা দুই ভ্রাতা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া মিথিলা নগরের উপর দিয়া চলিল। ঐ সময়ে বিদেহরাজ সর্ব্বশ্বেত-তুরগচতুষ্টয়যুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিনীলক ভাবিতে লাগিল, "বিদেহরাজে এবং আমাতে কি প্রভেদ? ইনি অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথে নগর ভ্রমণ করিতেছেন; আমিও হংসযুক্ত রথে উপবেশন করিয়া যাইতেছি।" অনন্তর সে আকাশমার্গে যাইতে যাইতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

মিথিলা নিবাসী বিদেহ-রাজে উৎকৃষ্ট অশ্বে করে বহন;
তেমনি আমারে যাইতেছে বহি সুবর্ণ হংস-পোতক দু'জন।

বিনীলকের কথা শুনিয়া হংস-পোতকেরা ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা একবার ভাবিল 'এখনই ইহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই।' কিন্তু আবার ভাবিল, তাহা করিলে পিতা কি বলিবেন? শেষে ভৎর্সনার ভয়ে তাহারা বিনীলককে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইল। তাহাতে হংসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সে কি কথা, বিনীলক! তুমি কি আমার পুত্রদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যে তুমি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে গিয়েছিলে এবং তাহারা যেন তোমার রথবাহী অশ্ব এইরূপ মনে করিয়াছিলে? তুমি নিজের ওজন বুঝিয়া চল না! তুমি এস্থানে বিচরণ করিবার উপযুক্ত নও; নিজের মাতৃবাসস্থানে ফিরিয়া যাও।" এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন করিয়া হংসরাজ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

বিনীলক, তব পক্ষে এ অতি কঠোর
স্থান; উপযুক্ত নহ থাকিতে এখানে
কভু; যাও ত্বরাকরি গ্রামপ্রান্তে, যথা
মাতার আলয় তব; শব মাংস আদি
খাও গিয়া সেথা যত ইচ্ছা মনে লয়।

এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন করিয়া হংসরাজ পুত্রদিগকে আজ্ঞা দিল, "ইহাকে মিথিলা নগরের মলস্তূপসন্নিধানে রাখিয়া আইস।" পুত্রেরা তাহাই করিল।

[তখন দেবদত্ত ছিল বিনীলক; অগ্রশ্রাবকদ্বয় ছিলেন হংসপোতক দুইটি; আনন্দ ছিলেন তাহাদের পিতা; এবং আমি ছিলাম সেই বিদেহরাজ।]

---

১৬১. ইন্দ্রসমানগোত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নব নিপাতে গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বেও অবাধ্যতাবশত পণ্ডিতদিগের বচনে কর্ণপাত না করিয়া মত্তহস্তীর পাদনিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষির আচার্য্য হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে ইন্দ্রসমানগোত্র নামে এক ব্যক্তি অতি অবাধ্য ছিল। সে কোনরূপ উপদেশে কর্ণপাত করিত না।

ইন্দ্রসমানগোত্র একটা হস্তী শাবক পুষিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া একদিন তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একটা হস্তীপোতক পুষিয়াছ, একথা সত্য কি? ইন্দ্রসমানগোত্র বলিল, "হাঁ আচার্য্য, একথা মিথ্যা নহে। আমি একটা মাতৃহীন হস্তী শাবকের লালনপালন করিতেছি।" "শুনা যায় হস্তী শাবকেরা বড় হইলে পোষককে পর্য্য মারিয়া থাকে; অতএব তুমি উহাকে আর পুষিও না।" "কিন্তু আচার্য্য, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।" "বেশ, না পার ত শেষে টের পাইবে।"

হস্তী শাবক ইন্দ্রসমানগোত্রের লালনপালনে ক্রমে একটা মহাকায় মাতঙ্গে

পরিণত হইল।

একদা ঋষিগণ বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদূরে গমন করিলেন এবং বহুদিন আশ্রম হইতে অনুপস্থিত রহিলেন। এদিকে দক্ষিণবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সংস্পর্শে হস্তীটার মদস্রাব হইল। সে স্থির করিল, 'এই পর্ণশালা ধ্বংস করিব, জলের কলসী চূর্ণ বিচূর্ণ করিব, পাষাণ ফলকখানি দূরে নিক্ষেপ করিব; শয্যাফলকখানি উৎপাদিত করিব। এই তাপসের প্রাণসংহার করিব, তাহার পর বনে চলিয়া যাইব।' এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া সে বনমধ্যে একস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাপসদিগের আগমনপথ দেখিতে লাগিল।

এদিকে ইন্দ্রসমানগোত্র হস্তীর জন্য খাদ্য লইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিয়া সে হস্তীকে দেখিতে পাইয়া মনে করিল সে পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। কাছে সে (নিঃশঙ্কভাবে) তাহার নিকটবর্তী হইল। কিন্তু হস্তী তাহাকে দেখিবামাত্র গহনস্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তাহাকে শুণ্ডদ্বারা ভূতলে ফেলিল, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে প্রাণনাশ করিল, বারংবার তাহার দেহ মর্দ্দিত করিল এবং ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। অন্যান্য তাপসেরা গিয়া আচার্য্যকে এই সংবাদ জানাইলেন। "দুর্জ্জনদিগের সংসর্গ নিতান্ত অকর্ত্তব্য" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

হিতাহিত জ্ঞানবান যেই সাধুজন,
মিত্রতা দুর্জ্জনসঙ্গে করে না কখন।
অনর্থ ঘটায় দুষ্ট অগ্রে বা পশ্চাতে,
হস্তী যথা মারে ইন্দ্রে শুণ্ডের আঘাতে।
বিদ্যায়, প্রজ্ঞায় আর চরিত্রে যে জনে
তুল্যকক্ষ তব ইহা বুঝিয়াছ মনে,
কর মৈত্রী তার সঙ্গে হ'য়ে নিঃসংশয়;
সাধুসঙ্গ সুখাবহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন যে গুরুজনের কথায় অবহেলা করা অন্যায় এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া চলা কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি ইন্দ্রসমানগোত্রের সৎকার সম্পাদন করাইলেন এবং ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই অবাধ্য ব্যক্তি ছিল ইন্দ্রসমানগোত্র এবং আমি ছিলাম সেই ঋষিগণ-শাস্তা।]

☞ এই জাতকের সহিত বেণুক-জাতকের (৪৩) সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রের

ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসর্প এবং ঈষপের কৃষক ও তুষারক্লিষ্ট সর্প এই আখ্যায়িকাদ্বয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যও বিবেচ্য।

---

১৬২. সংস্তব-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অগ্নিবহন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু ইতঃপূর্ব্বে লাঙ্গুষ্ঠ-জাতকে (১৪৪) বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রীদিগকে দেখিয়া একদিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, জটিলেরা নানাপ্রকার মিথ্যা তপস্যা করে; এরূপ তপস্যার কি কোন ফল আছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, এরূপ তপস্যা নিষ্ফল। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা, অগ্নিবহনে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাসে, বহুদিন অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে যখন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে উহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই, তখন অগ্নি জলে নির্ব্বাপিত এবং যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; আর কখনও অগ্নির দিকে ফিরিয়াও চান নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তদীয় প্রগল্‌ভাগ্নি[২] সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি প্রগল্‌ভাগ্নি লইয়া বনগমনপূর্ব্বক সেখানে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে, না বেদাধ্যয়নের পর পরিজনসহ সংসারধর্ম্ম পালন করিবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "গৃহবাসে আমার প্রবৃত্তি নাই; আমি অরণ্যে গিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।" অনন্তর তিনি প্রগল্‌ভাগ্নি লইয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যার নিরত হইলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব নিমন্ত্রণে গিয়া ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল এই পায়স দ্বারা মহাব্রহ্মের তৃপ্তিসাধনার্থ যজ্ঞ করা যাউক। তিনি পায়স লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন, সেখানে অগ্নি জ্বালিলেন এবং "অগ্নিং তাবৎ ভগবন্তং সর্পির্যুক্তং পায়সং পায়য়ামি"। এই মন্ত্র দ্বারা উহা আহুতি

---

[১]। সংস্তব—বন্ধুত্ব।

[২]। সংস্তব—বন্ধুত্ব।

দিলেন। ঐ পায়সে প্রচুর ঘৃত মিশ্রিত ছিল; কাজেই ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অত্যুগ্র শিখা নির্গত হইয়া পর্ণশালা দগ্ধ করিল। বোধিসত্ত্ব ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্জনের সহিত সংসর্গ রাখা অকর্ত্তব্য; দেখ, অগ্নি আমার অতিকষ্টে নির্ম্মিত পর্ণশালাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

দুর্জনসংসর্গ তুল্য বিপত্তি-আকর
অন্য কিছু নাই দেখি সংসার ভিতর।
ঘৃতযুক্ত পরমান্নে হয়ে সন্তর্পিত
অগ্নি দেখ কত মোর করিল অহিত।
বহুকষ্টে পর্ণশালা করিনু নির্ম্মাণ,
দহিলেক অগ্নি তাহা ঘৃত করি পান!

অনন্তর "তোমার মত মিত্রদ্রোহীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন, বৃক্ষশাখাদ্বারা অঙ্গারগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন এবং হিমাচলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এক শ্যামা মৃগী, এক সিংহ, এক ব্যাঘ্র ও এক দ্বীপী পরস্পরের মুখাবলেহন করিতেছে। তখন তাঁহার মনে হইল সৎপুরুষের সহিত বন্ধুত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন বন্ধুত্ব নাই। তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটীতে এই ভাব ব্যক্ত করিলেন :

সকল বন্ধুত্ব হতে শ্রেষ্ঠ বলি তারে,
সৎপুরুষ-সঙ্গ যাহা সংসার মাঝারে।
সিংহ, ব্যাঘ্র দ্বীপী হিংস্র, তবু এই তিনে
বেন্ধেছে শ্যামারে কিবা মিত্রতা বন্ধনে!
তাই সে নিঃশঙ্কভাবে করিছে লেহন
স্বভাব-নিষ্ঠুর এই তিনের বদন।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব হিমালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

১৬৩. সুসীম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে ছন্দক দান[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে কখনও এক একটি পরিবার কোন দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে, কোন দিন বা তীর্থিকদিগকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেন। কখনও বহু নগরবাসী সম্মিলিত হইয়া দান করিতেন, কখনও কোন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা এই উদ্দেশ্যে একত্র হইতেন, কখনও বা নগরের সমস্ত অধিবাসী এক সঙ্গে চাঁদা তুলিয়া দানের ব্যবস্থা করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন সমস্ত নগরবাসীই একত্র হইয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং দানের জন্য নানারূপ দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দলের লোকে বলিতে লাগিলেন 'সমস্ত দ্রব্য তীর্থিকদিগকে দিব'; অপর দলের লোকে বলিতে লাগিলেন, 'বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দিব।' এইরূপে পুনঃপুন বাদানুবাদ হইতে লাগিল; কিন্তু সঞ্চিত দ্রব্য সমস্ত তীর্থিকদিগকে দেওয়া হইবে, অথবা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেওয়া হইবে ইহার কিছুই মীমাংসা হইল না। তাহা দেখিয়া শেষে স্থির হইল যে "সংবহুল"[২] করা হউক।

অতঃপর সর্ব্বসাধারণের মত লইয়া গেল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করাই অধিক লোকের ইচ্ছা। তদনুসারে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংবাদ প্রেরিত হইল; তীর্থিক-শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের অন্তরায় হইতে পারিল না।

শ্রাবস্তীবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর দান করিলেন। সপ্তাহকাল এই দান চলিল। সপ্তম দিনে দানক্রিয়া সমাপ্ত হইলে শাস্তা যথারীতি অনুমোদন করিয়া সমবেত জনসমূহকে মার্গফল বুঝাইয়া দিলেন এবং জেতবন-বিহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক গন্ধকুটীরাভিমুখে চলিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। শাস্তা গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুগতোচিত উপদেশ প্রদানান্তর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্নে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিক শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের ব্যাঘাত ঘটাইতে কত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; সমস্ত দাতব্য বস্তুই বৌদ্ধদিগের পাদমূলে আসিয়া পড়িল। অহো! বুদ্ধদেবের কি অপূর্ব্ব শক্তি!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া

---

[১]। ছন্দক, ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয়, অর্থাৎ চাঁদা। সম্ভবতঃ 'ছন্দক' হইতেই 'চাঁদা'র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ দান করা সম্বন্ধে ১০৯ম ও ২২১ম জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

[২]। 'সংবহুল', 'সংবহুলিক' বলিলে সমস্ত লোকের মতামতগ্রহণ করা বুঝায়। সংবহুলং করিস্সাম = we shall put it to the vote, (তুং 'যেভূয্যসিকা')।

বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বকালেও তীর্থিকেরা আমার প্রাপ্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে চেষ্টার ক্রুটি করে নাই; কিন্তু দাতব্য বস্তুসমূহ আমারই পাদমূলে আসিয়া পড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে সুসীম নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। বোধিসত্ত্বের পিতা জীবদ্দশায় রাজার হস্তীমঙ্গলকারক ছিলেন।[১] মঙ্গলকরণ স্থানে যে সমস্ত উপকরণ আনীত হইত এবং হস্তীদিগকে যে সমস্ত আভরণ প্রদত্ত হইত, সেগুলি তাঁহার প্রাপ্য ছিল। এইরূপে এক একটি মঙ্গলকার্য্যে তিনি কোটি কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন হস্তীমঙ্গল যোগ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত বারাণসীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ রাজসমীপে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, হস্তীমঙ্গল যোগ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করুন। আপনার পুরোহিত-পুত্র নিতান্ত বালক; সে তিন বেদ ও হস্তীসূত্র[২] জানে না। অতএব এবার আমরাই মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। ইহা শুনিয়া রাজা উত্তর দিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।" 'পুরোহিত-পুত্রকে মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দিলাম না; আমরাই উহা নির্ব্বাহ করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিব' ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের মাতা শুনিতে পাইলেন তিন দিন পরে হস্তীমঙ্গলোৎসব হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'সাত পুরুষ পর্য্যন্ত মঙ্গল কার্য্যের সম্পাদন-ভার আমাদের কুলগত ছিল। এখন দেখিতেছি বংশের গৌরব বিলুপ্ত হইল; ক্রমে ধনক্ষয়ও হইবে।' এই দুঃখে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন?" অনন্তর মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আমিই হস্তীমঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব।" "বাবা, তুমি ত তিন বেদ ও হস্তীসূত্র জান না। তুমি কিরূপে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে?"

---

[১]। হস্তীমঙ্গল—গজোৎসববিশেষ; ইহাতে সুশোভিত হস্তীসমূহের শোভাযাত্রা বাহির হইত। হস্তীসূত্রবিশারদ ব্রাহ্মণেরা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

[২]। হস্তীসূত্র—গজশাস্ত্র। রঘুবংশে (৬ষ্ঠ সর্গ, ২৭শ শ্লোক) অঙ্গরাজ "বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় 'সূত্রকারৈঃ = গজশাস্ত্রকৃদভিঃ পালকাদিভির্মহর্ষিভি'।

"হস্তীমঙ্গলকার্য্য কবে হইবে মা?" "আজ হইতে তিন দিন পরে।" "তিন বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং হস্তীসূত্র জানেন এমন আচার্য্য কোথায় থাকেন মা?" "বাবা, এরূপ একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য গান্ধাররাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বাস করেন; কিন্তু ঐ স্থান এখান হইতে দুই হাজার যোজন দূর।" "তা যাহাই হউক, মা, কিছুতেই আমাদের বংশগৌরব নষ্ট হইতে দিব না। আমি কল্য এক দিনেই তক্ষশিলায় যাইব, এক রাত্রির মধ্যে তিন বেদ ও হস্তীসূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া পরদিন এখানে ফিরিব এবং চতুর্থ দিবসে মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব। কোন চিন্তা নাই, তুমি আর চোখের জল ফেলিও না।"

মাতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষেই আহার শেষ করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন; এক দিনেই তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া সেই আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি বারাণসী হইতে আসিতেছি।" "কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" "আপনার নিকট বেদত্রয় ও হস্তীসূত্র কণ্ঠস্থ করিতে।" ''বেশ, বৎস, কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ কর।" "কিন্তু, প্রভু, আমার বিলম্ব করিলে চলিবে না।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আমি এক দিনেই দ্বি-সহস্র যোজন চলিয়া আসিয়াছি; অদ্য রাত্রিকালটা দয়া করিয়া আমার শিক্ষার্থ নিয়োজিত করুন। আর দুই দিন পরেই হস্তীমঙ্গল কার্য্য হইবে। একবার পাঠ দিলেই আমি সমস্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারিব।"

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের সম্মতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক দক্ষিণার্থ সহস্র-মুদ্রা-পূর্ণ একটি থলি[১] রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, প্রণিধানের সহিত পাঠগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই বেদত্রয় ও হস্তীসূত্রসমূহ আয়ত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আমার আর কিছু শিক্ষণীয় আছে কি?" আচার্য্য কহিলেন, "না বৎস, তুমি সমস্তই শিক্ষা করিয়াছ।" "অমুক গ্রন্থে অমুক শ্লোকটি পূর্ব্বে না বলিয়া পরে বলা হইয়াছে, অমুক শ্লোকটি আদৌ আবৃত্তি করা হয় নাই, ভবিষ্যতে শিষ্যদিগকে এই এইভাবে শিক্ষা দিবেন," ইত্যাদি বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিলেন, এবং প্রাতঃকালেই আহার শেষ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এক দিনের মধ্যে বারাণসীতে প্রতিগমন

---

[১]। পালি 'থবিকা'; সংস্কৃত স্থবি বা স্থবিকা।

করিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি ঈপ্সিত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে পারিয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, মা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরদিন হস্তীমঙ্গলোৎসবের আয়োজন হইল। একশত হস্তী সুবর্ণালঙ্কারে, সুবর্ণধ্বজে, সুবর্ণযানে সুসজ্জিত হইল এবং রাজপ্রাঙ্গণ পতাকাপুষ্পমালাদিতে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। "আজ আমরাই হস্তীমঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিব" এই বিশ্বাসে ব্রাহ্মণেরা উৎকৃষ্ট বেশ ধারণ করিয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। মহারাজ সুসীমও সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আভরণভাণ্ডসহ উপনীত হইলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বও রাজকুমারের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক নিজের অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সত্য সত্যই কি আপনি আমার বংশগত বৃত্তি বিলুপ্ত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন করাইতে এবং তদুপলক্ষ্যে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইবে সে সমস্ত তাঁহাদিগকে দিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাটি বলিলেন :

শ্বেত দন্ত কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা পায়,
মণ্ডিত সুবর্ণজালে শতাধিক করী;
অন্য বিপ্রে এ সকল, দিবে কি? সুসীম, বল;
কুলপ্রথা আমাদের দেখত বিচারি।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া মহারাজ সুসীম নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

শ্বেত দণ্ড কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা পায়,
মণ্ডিত সুবর্ণ-জালে শতাধিক করী।
অন্য বিপ্রে সমুদয়, দিব আমি নিঃসংশয়,
কুলপ্রথা, মাণবক, যদিও বিচারি।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদের উভয়েরই কুলক্রমাগত রীতি জানিতেছেন; অথচ আমাকে ত্যাগ করিয়া হস্তীমঙ্গল কার্য্য করাইবেন!" রাজা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি তুমি বেদত্রয় ও হস্তীসূত্রগুলি জান না; সেই জন্যই অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা এই উৎসব সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, এই যে এখানে এত ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, ইহাদের মধ্যে যে কেহ, বেদত্রয় ও হস্তীসূত্রসমূহের একাংশও আবৃত্তি করিতে আমার সঙ্গে প্রতিযোগক্ষম, তাঁহাকে উঠিতে বলুন। ইঁহাদের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত জম্বুদ্বীপেও আমা ব্যতীত এমন কেহ নাই যিনি বেদত্রয় ও হস্তীসূত্রসমূহের সাহায্যে এই মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন

করিতে পারেন।” সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একপ্রাণীও বোধিসত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। কাজেই বোধিসত্ত্ব নিজের বংশগত অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিলেন এবং মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনান্তর প্রচুর ধনলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী, কেহ কেহ বা অর্হৎ পর্য্যন্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন মহামায়া ছিলেন সেই জননী, শুদ্ধোদন ছিলেন বোধিসত্ত্বের জনক, আনন্দ ছিলেন রাজা সুমীম, সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

---

১৬৪. গৃধ্র-জাতক

[জেতবনে এক ভিক্ষু তাঁহার মাতার ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যাম-জাতকে (৫৩২) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি প্রকৃতই গৃহীদিগকে পোষণ করিতেছ?” ভিক্ষু উত্তর দিলেন হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।” “যাঁহাদিগকে পোষণ কর, তাঁহাদের সহিত তোমার কি সম্পর্ক?” “তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা”। ইহা শুনিয়া শাস্তা “সাধু সাধু” বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে সাধুবাদ দিলেন এবং অপর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা ইহার উপর রাগ করিও না। পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিঃসম্পর্কীয়দিগেরও সাহায্য করিয়াছিলেন; ঐ ব্যক্তি ত নিজের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেছে।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গৃধ্রপর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতে হইত।

একবার একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। শকুনেরা ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিতে অশক্ত হইল। তাহারা শীতে অবসন্ন হইয়া বারাণসী নগরে উড়িয়া গেল এবং সেখানে প্রাকার ও পরিখার নিকট পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী স্নানার্থ নগরের বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি শকুনদিগের দুর্দশা দেখিয়া তাহাদের সেবার জন্য এক শুষ্ক স্থানে আগুন জ্বালাইলেন,

ভাগাড়ে[১] লোক পাঠাইয়া গোমাংস আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিলেন এবং তাহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ লোক নিয়োজিত করিয়া গেলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিলে শকুনেরা শরীরে আবার বল পাইল এবং পর্ব্বতে ফিরিয়া গেল। সেখানে সমবেত হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "বারাণসীশ্রেষ্ঠী আমাদের বড় উপকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে, উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য; অতএব এখন হইতে আমরা কেহ কোন বস্ত্র বা আভরণ পাইলে তাহা লইয়া বারাণসীশ্রেষ্ঠীর খোলা উঠানে[২] ফেলিয়া দিব।"

ঐ দিন হইতে লোকে কোথাও রৌদ্রে বস্ত্র শুকাইতে দিয়া বা আভরণ খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছে দেখিলেই শকুনেরা, বাজপাখীতে যেমন ছোঁ মারিয়া মাংস লইয়া যায়, সেইমত সে সমস্ত নিমেষের মধ্যে লইয়া যাইত এবং শ্রেষ্ঠীর উঠানে ফেলিয়া দিত। শকুনেরা ফেলিয়া দিয়াছে জানিয়া শ্রেষ্ঠী সেগুলি পৃথক করিয়া রাখাইতেন।

ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল যে শকুনেরা নগর লুঠ করিতেছে। তিনি আদেশ দিলেন, "একটা শকুন ধর। তাহা করিলেই আমি যাহার যে দ্রব্য হারাইয়াছে সমস্ত আনাইয়া দিব।" ইহা শুনিয়া লোকে নানাস্থানে ফাঁদ ও জাল পাতিল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্ব ইহার একটায় আবদ্ধ হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "চল, ইহাকে রাজার নিকট লইয়া যাই"। এই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন লোকে শকুনটিকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে। পাছে, তাহারা উহার প্রাণবধ করে এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই না নগর হইতে বস্ত্র ও আভরণ লুন্ঠন করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ!" "ঐ সকল দ্রব্য কাহাকে দিতেছ?" "বারাণসী-শ্রেষ্ঠীকে দিতেছি।" "তাঁহাকে দিবার কারণ কি?" "তিনি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য; সেইজন্য দিতেছি।" "গৃধ্রেরা নাকি একশত যোজন দূর হইতেও শব দেখিতে পায়; অথচ তোমাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না, ইহার কারণ কি?" এই কথা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিলেন :

শতেক যোজন দূরে শব যদি থাকে,
তবু নাকি পারে গৃধ্রে দেখিতে তাহাকে।

---

[১]। মূলে "গো-সুসান" এই শব্দ আছে।

[২]। মূলে "আকাসঙ্গণ" এই শব্দ আছে।

কি মোহে পড়িলে পাশে, বুঝিতে না পারি,
বিস্তৃত আছিল যাহা নিকটে তোমারি।[১]

রাজার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

মরণ আসন্ন যবে, শিয়রে শমন,
নয়ন থাকিতে অন্ধ হয় জীবগণ।
রয়েছে সম্মুখে কত জাল আর পাশ,
তবু না দেখিতে পায় নিয়তির দাস।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন্! শকুনেরা আপনার গৃহে বস্ত্রাদি আনয়ন করে এ কথা সত্য কি?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ! একথা সত্য।" "সে সব কোথায়?" "মহারাজ! আমি সে সমুদয় পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। যাহার যে দ্রব্য, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব। আপনি দয়া করিয়া এই শকুনকে মুক্তি দিন।" অনন্তর গৃধ্রের মুক্তি লাভ করাইয়া মহাশ্রেষ্ঠী, যাহার যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী, এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক গৃধ্র।]

----

১৬৫. নকুল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে একই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বিরোধ-সম্বন্ধে[২] এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উরগজাতকে (১৫৪) যে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিবৃত হইয়াছে ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও তৎসদৃশ। এসময়েও শাস্তা পূর্ব্ববৎ বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে এবারই এই মহামাত্রদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলাম তাহা নহে; পূর্ব্বেও আমি ইহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

---

[১]। যোহধিকাৎ যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগ
সএব প্রাপ্তকালত্বাৎ পাশবান্ধং ন পশ্যতি। –হিতোপদেশ।

[২]। মূলে 'সেণিভণ্ডনং' এই পদ আছে। একই ব্যবসায়ের লোক একটি শ্রেণী (guild.)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন এবং উঞ্ছশিল দ্বারা বন্য ফলমূল আহার করিতেন।

বোধিসত্ত্ব পাদচারণ-পথের একপ্রান্তে একটা বল্মীক ছিল; তাহার মধ্যে এক নকুল থাকিত; এবং উহারই নিকটে বৃক্ষেরমূলে একটা সর্প অবস্থিতি করিত। এই অহি ও নকুলের মধ্যে নিয়ত কলহ হইত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে কলহের অপকারিতা এবং মৈত্রীর উপকারিতা বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা কলহ না করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত বাস কর।" এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহারা বৈরভাব পরিহার করিল।

একদিন সর্প বাহিরে চরিতে গিয়াছে এমন সময় নকুল পাদচারণ-পথপ্রান্তবর্ত্তী বল্মিকবিবরের ভিতর দিয়া মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইল এবং মুখব্যাদান-পূর্ব্বক নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সেই অবস্থায় নিদ্রা যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কিসের ভয় কর।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

জরায়ুজ, একি তব হেরি ব্যবহার?
বিকাশি সুতীক্ষ্ণ দন্ত নিদ্রা কেন আর?
অণ্ডজ যে শত্রু, তারে সন্ধির বন্ধনে
বান্ধিয়া এখন তব ভয় কিবা মনে?

বোধিসত্ত্বের এই প্রশ্ন শুনিয়া নকুল বলিল, "আর্য্য, যে পূর্ব্বে শত্রু ছিল, তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে নাই, সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা উচিত।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল ঃ

অমিত্র যেজন সেই শঙ্কার ভাজন;
মিত্রেও বিশ্বাস নাহি করিবে স্থাপন।
যা' হতে নাহিক ভয় জান তুমি সুনিশ্চয়,
সে যদি কখন হয় ভয়ের কারণ।
সমূলে হইবে তব বিনাশ-সাধন।[১]

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না হে, তোমার কোন ভয় নাই; আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে সর্প কখনও তোমার অনিষ্ট করিবে না। তুমি এখন তাহা

---

[১]। শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা; সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্। —হিতোপদেশ।

হইতে কোন আশঙ্কা করিও না।” নকুলকে এইরূপ উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন; সর্প ও নকুল কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[**সমবধান :** তখন এই মহামাত্র দুইজন ছিলেন সেই সর্প ও নকুল এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

১৬৬. উপসাঢ়-জাতক

[উপসাঢ় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন শ্মশান পবিত্র, কোন শ্মশান অপবিত্র ইহা লইয়া তিনি বড় মাথা ঘামাইতেন।[১] তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অতীব সঙ্গতিপন্ন ও মহাবিভবশালী, কিন্তু নিতান্ত পাষণ্ড ছিলেন, সেইজন্য বিহারের পুরোভাগে বাস করিয়াও তিনি কখনও বৌদ্ধদিগের প্রতি দয়ামায়া দেখাইতেন না। ইহার পুত্র কিন্তু পণ্ডিত ও জ্ঞানবান ছিলেন।

ব্রাহ্মণের যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তখন একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, “দেখ বৎস, যে শ্মশানে কোন বৃষলের[২] শব দগ্ধ করা হইয়াছে, সেখানে যেন আমার সৎকার করা না হয়। তুমি কোন অনুচ্ছিষ্ট শ্মশানে আমার শবদাহ করিও।” ব্রাহ্মণের পুত্র বলিলেন, “পিতঃ, কোন স্থান যে আপনার শবদাহের উপযুক্ত, তাহা আমি জানি না; এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিন কোন স্থানে আপনার সৎকার হইবে।” “বেশ বৎস, তাহাই করিতেছি” বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে গেলেন এবং গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, “এই স্থানে কোন বৃষলের শবদাহ হয় নাই; এইখানেই আমার সৎকার করিও।” অনন্তর তিনি পুত্রের সহিত পর্ব্বত হইতে অবতরণ আরম্ভ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষে শাস্তা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞান নেত্রে ইহা অবলোকন করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের পথ অনুসরণপূর্ব্বক ব্যাধ যেমন মৃগের জন্য বসিয়া থাকে সেইভাবে, গৃধ্রকূটের পাদদেশে বসিয়া

---

[১]। মূলে ‘সুসানসুদ্ধিক’ এই বিশেষণ পদ আছে।

[২]। শূদ্র; অন্ত্যজ জাতি।

রহিলেন এবং শিখরদেশ হইতে তাঁহাদের অবতরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইলেন। শাস্তা অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন, ঠাকুর?" ব্রাহ্মণকুমার শাস্তার নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে এস; তোমার পিতা যে স্থান দেখাইয়াছেন, আমি সেখানে যাইব।" তিনি পিতাপুত্র উভয়কেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে স্থান কোথায়?" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, "ভদন্ত, এই যে তিনটি পর্ব্বতের মধ্যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, পিতা এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "মাণবক, তোমার পিতা যে কেবল এজন্মেই শ্মশানশুদ্ধিক তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইনি এইরূপ ছিলেন; আর ইনি যে কেবল এবারই বলিয়াছেন, আমাকে এখানে দাহন করিও, তাহা নহে; পূর্ব্বেও নিজের সৎকারার্থ এই স্থানই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর ব্রাহ্মণকুমারের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে এই ব্রাহ্মণই উপসাঢ় নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন এবং এই মাণবকই তাঁহার পুত্র ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন ছিলেন; শেষে লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য (হিমালয় ত্যাগ করিয়া) গৃধ্রকূটে এক পর্ণশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় ছিলেন না এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ, তুমি এখন যেমন বলিলে সেইভাবে, পুত্রকে নিজের সৎকার-সম্বন্ধে শ্মশান-নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্রও তোমারই ন্যায় বলিয়াছিল, "পিতঃ আপনি নিজেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তখন ব্রাহ্মণ এই স্থানই নির্দ্দেশ করিয়া পুত্রের সহিত অবতরণ করিতেছিলেন এমন সময় বোধিসত্ত্বের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সপুত্র ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তোমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ প্রশ্ন দ্বারা মাণবকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "এস তবে, দেখা যাউক, তোমার পিতা যেস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উচ্ছিষ্ট কি অনুচ্ছিষ্ট।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মাণবক বলিল, "এই যে তিনটি পর্ব্বতের মধ্যে স্থান রহিয়াছে ইহা অনুচ্ছিষ্ট।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, এখানে যে কত নরদেহের দাহন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একা

তোমারই পিতা এই রাজগৃহনগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপসাঢ়ক নাম ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র জন্মে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এস্থান বলিয়া কেন, সমগ্র পৃথিবীতে কুত্রাপি এমন স্থান পাইবে না, যেমন কখনও শবদাহ হয় নাই, যেস্থান শ্মশানভূমি নহে, যেস্থান নরকপালে আবৃত হয় নাই।” বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়াছিলেন :

চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ এইখানে—
বিদিত যাহারা ছিল উপসাঢ় নামে—
কত যুগযুগান্তরে শ্মশান-অনলে
হয়েছিল ভস্মীভূত তাহারা সকলে।
বারেক শ্মশানভূমি হয়নি কখন
হেন স্থান ধরাতলে পাবে কোন জন?
সত্যচতুষ্টয় যথা জানে সর্ব্বজন,
সতত ধর্ম্মের পথে করে বিচরণ,
যেখানে সংযম, দম দেখিবারে পাই,
যেখানে প্রাণীর হিংসা কোন কালে নাই,
হেন দেশে শমনের নাহি অধিকার;
আর্য্যেরা করেন সেথা আনন্দে বিহার।

বোধিসত্ত্ব পিতা-পুত্রকে এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া ব্রহ্মবিহার চারিটি ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া পিতাপুত্র উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই পিতাপুত্র ছিলেন সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

----

১৬৭. সমৃদ্ধি-জাতক

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী তপোদারামে অবস্থিতি-কালে সমৃদ্ধি-নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি একদা রিপু দমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয়কালে অবগাহনপূর্ব্বক নিজের হেমবর্ণ শরীর রৌদ্রে শুকাইতেছিলেন, তাঁহার পরিধানে তখন কেবল অন্তর্বাসখানি ছিল; তিনি উত্তরাসঙ্গখানি হস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সমৃদ্ধির দেহ অতি সুগঠিত সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় ছিল এবং এই জন্যই তিনি

'সমৃদ্ধি' নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এক দেবকন্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি তরুণবয়স্ক-যুবক—তোমাকে বালক বলিলেও চলে। তোমার কি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশ! তোমার নবযৌবনসম্পন্ন সুগঠিত দেহ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। এ অবস্থায় তুমি কেন ভোগলালসা পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? অগ্রে কামাদি-বৃত্তি চরিতার্থ কর, তাহার পর প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবে।" ইহা শুনিয়া স্থবির বলিলেন, "দেবকন্যে, কখন আমার মরণ হইবে তাহা জানি না; আমি বলিতে পারি না যে অমুক দিনে মরিব। মৃত্যুকাল আমার জ্ঞানের অগোচর। সেই জন্যই তরুণবয়সে শ্রমণধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক আমাকে দুঃখের অবসান করিতে হইবে।"

দেবকন্যা স্থবিরের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্থবিরও শাস্তার সমীপে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সমৃদ্ধে, দেবকন্যাকর্ত্তৃক মনুষ্যকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা কেবল যে তোমাতেই প্রথম হইল তাহা নহে; পুরাকালে দেবকন্যারা তপস্বীদিগকেও লোভ দেখাইয়াছিলেন।" অনন্তর সমৃদ্ধির অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে এক দেবখাতের অদূরে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব একদা রিপুদমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয়কালে অবগাহনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেহের জল শুকাইতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে একখানি মাত্র বল্কল ছিল; অপর বল্কলখানি তিনি হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ দেখিয়া এক দেবকন্যা তাঁহাতে আসক্তচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

ইন্দ্রিয়ের সুখ না করি সেবন
যৌবনে সন্ন্যাস!—এ বুদ্ধি কেমন?
ভুঞ্জি সুখ, শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ,
না দেখি তোমাতে তাহার লক্ষণ।

অগ্রে সুখ, শেষে জপ, তপ, ধ্যান,
ইহাই ত করে যারা বুদ্ধিমান।
অস্থায়ী যৌবন, গেলে একবার
ফিরিয়া কখন(ও) আসিবে না আর।

দেবকন্যার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় নিজের স্থির সঙ্কল্প ব্যাখ্যা করিলেন :

জানি না কখন আসিবে শমন,
মরণের কাল প্রচ্ছন্ন আমার।
না ভুঞ্জিয়া সুখ তেঁই সে কারণ
হয়েছি সন্ন্যাসী ত্যজিয়া সংসার।
অদ্য বিদ্যমান করতলে মোর,
কল্য যে পাইব সে সংশয় ঘোর।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই দেবকন্যা ছিলেন সেই দেবকন্যা; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

১৬৮. শকুনঘ্নী-জাতক[১]

[শকুনাবাদ সূত্রের[২] কি অভিপ্রায় তৎসম্বন্ধে, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়, এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া, "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাচর্য্যার সময় তোমরা স্ব স্ব পৈতৃক চক্রের[৩] বাহিরে যাইও না" মহাবর্গ হইতে বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী এই সূত্রান্ত আবৃত্তিপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমাদের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত প্রাণীরাও স্ব স্ব পৈতৃক চক্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের

---

[১]। পালি "সকুণগ্ ঘি"—শ্যেন পক্ষী অন্য পক্ষী মারে বলিয়া এই নামে অভিহিত। Childers সাহেব এই শব্দ ঈকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই জাতকে ইহা ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা "এবং সো ভিন্নেন হৃদয়েন ... জীবতক্খয়ং পাপুণি।)

[২]। এই সূত্র কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করা গেল না। ইংরাজী অনুবাদক বলেন, সম্ভবতঃ এতদ্বারা, বুদ্ধদেব কোন অতীত জন্মে শকুন হইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যেমন গৃধ্র-জাতকে) তাহাই বুঝাইতেছে। এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

[৩]। এখানে পৈতৃক বলিলে 'নিজের' অর্থাৎ 'বুদ্ধানুমোদিত' এই অর্থ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।

অধিকারে চরিতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে নিজবুদ্ধিবলে ও উপায়কুশলতায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক ক্ষেত্রে লোকে লাঙ্গল দিয়া চাষ দিয়াছিল, তাহাতে মাটি ভাঙ্গিয়া বড় বড় ঢিল হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ক্ষেত্রে বাস করিতেন। তিনি একদিন নিজের বিচরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের বিচরণক্ষেত্রে খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য বনের ধারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে খাদ্যগ্রহণ করিতে দেখিয়া একটা বাজপাখী হঠাৎ ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শ্যেনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমার কি কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে? আমি পরের অধিকারে কেন চরিতে আসিলাম? আমি যদি আজ নিজের পৈতৃক অধিকারে চরিতাম, তাহা হইলে এই বাজপাখীটা, 'এস, যুদ্ধকর' বলিয়া আসিলেও আমার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না।"

ইহা শুনিয়া শ্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "অরে বর্ত্তক-পোতক, তোর চরিবার স্থান কোথায়? তোর পৈতৃক অধিকার কোথায় বল্‌ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "একখানা চষা জমি; সেখানে কেবল বড় বড় ঢিল।" ইহা শুনিয়া শ্যেন নিজের বল সংবরণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা তুই তোর পৈতৃক অধিকারে; সেখানেও তোর নিষ্কৃতি নাই।"

বোধিসত্ত্ব উড়িয়া সেই চষা ক্ষেতে গেলেন এবং সেখানে খুব একটা বড় ঢিলের উপর বসিয়া, "এখন এস দেখি, একবার," বলিয়া বাজ পাখীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্যেন পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ত্তককে ধরিবার জন্য সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছোঁ মারিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, শ্যেন সত্যসত্যই ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তিনি ডিগ বাজি খাইয়া সেই ঢিলটার আড়ালে গেলেন। এদিকে শ্যেন নিজের বেগ সামলাইতে না পারিয়া উহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহাতে তাহার বুকে এমন আঘাত লাগিল যে হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তখনই মারা গেল।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ, নিজের চক্র ছাড়িয়া গিয়া পশুপক্ষীরাও শত্রুহস্তে পড়ে; কিন্তু স্ব স্ব পৈতৃক অধিকারের মধ্যে থাকিলে তাহারা শত্রুদমনে সমর্থ হয়। অতএব তোমরাও কখনও অপরের চক্রে ভিক্ষা

করিতে যাইও না। ভিক্ষুরা পরাধিকারে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলে মার প্রবেশের দ্বার পায়, তাহার দাঁড়াইবার সুবিধা ঘটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ভিক্ষুদের পক্ষে পরচক্র কাহাকে বলা যাইবে? কোন স্থানে ভিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? যদি বল সেই স্থান, যেখানে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়া যায়[১] তবে সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ কি কি? চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ, কর্ণের বিজ্ঞেয় শব্দ ইত্যাদি। এই সমস্তই ভিক্ষাচর্য্যার পক্ষে পরকীয় বিষয় এবং পরিত্যাজ্য স্থান।" অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :]

বর্ত্তকের বাসস্থানে ধরিবারে তায়
এসেছিল ভীমবেগে শ্যেন দুরাশয়;
বর্ত্তক অক্ষত দেহে করে বিচরণ;
বুক ফাটি হল কিন্তু শ্যেনের মরণ।

শ্যেনকে পঞ্চত্বগত দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মৃৎপিণ্ডের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং "আজ আমি ভাগ্যবলে শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম"[২] ইহা বলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণপূর্ব্বক হর্ষের আবেগে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

বুদ্ধির কৌশলে নিজ অধিকারে ফিরিতে পারিনু, তাই
শত্রুহীন এবে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অপার আনন্দ পাই।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেনপক্ষী এবং আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক।]

---

১৬৯. অরক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মৈত্রীসূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাঁহারা চিত্তবিমুক্তির সহিত[৩] মৈত্রীর অনুষ্ঠান, ধ্যান ও উপচয়সাধন করেন, মৈত্রীই যাঁহাদের নির্ব্বাণলাভের যানস্বরূপ এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহারা

১। অর্থাৎ আমার শত্রু নিপাত হইল।

২। "পঞ্চকামগুণা"। যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রলোভন-বস্তু আছে, সে স্থান ভিক্ষুদিগের পরিত্যাজ্য, এই অর্থ।

৩। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে।

প্রকৃষ্টরূপে মৈত্রীর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং প্রকৃষ্ঠরূপেই উহার অনুষ্ঠান করিয়া চলেন, তাঁহারা একাদশবিদ কুশলভাজন হইয়া থাকেন। সেই একাদশ কুশল এই : তাঁহারা সুষুপ্তি ভোগ করেন এবং সুখে নিদ্রাত্যাগ করেন, তাঁহারা কখনও দুঃসপ্ন দেখেন না; তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয়, দেবতারা তাঁহাদের রক্ষাবিধানে নিরত, অগ্নি, বিষ ও শস্ত্র তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; তাঁহারা নিমিষের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে শান্তির ছবি; তাঁহারা সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন এবং আর কিছু লাভ না করুন, অন্ততঃ ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান।[১] নিষ্কামভাবে ও উল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করিলে এই একাদশ সুফল পাওয়া যায়। এবংবিধ একাদশ সুফলপ্রদ মৈত্রীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং কেহ উপদেশ দিউক না দিউক, সর্ব্বভূতে মৈত্রী-প্রদর্শন ভিক্ষুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে হিতকামী তাহার হিতসাধন করিবে, যে অহিতকামী তাহারও হিতসাধন করিবে; যে হিতকামীও নয়, অহিতকামীও নয়, অর্থাৎ মধ্যম ভাবাপন্ন তাহারও হিতসাধন করিবে। ফলতঃ শাস্ত্রের বিধান থাকুক বা না থাকুক, পাত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মনুষ্যকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহা পারিলে মার্গ ও ফললাভ না করিয়াও ব্রহ্মলোক গমন করা যায়। পুরাকালেও পণ্ডিতেরা সপ্তবর্ষ মৈত্রী-ভাবনা করিয়া সপ্তসংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প[২] ব্রহ্মলোক বাস করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

এক অতীতকল্পে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় লাভ করিয়া অরক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়া বহু শত ঋষিকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি ঋষিদিগকে উপশে দিবার সময় বলিতেন, "মৈত্রীর ভাবনা করিবে, করুনা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা করিবে; যে দৃঢ়চিত্তে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করে সে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হয়।" তিনি মৈত্রীর

---

[১]। মৈত্রী ভাবনার একাদশবিদ ফল-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে দশটি মাত্র ফল দেওয়া হইয়াছে, অমনুষ্য অর্থাৎ যক্ষাদির প্রিয় হওয়া যায় এই ফলটির উল্লেখ নাই।

[২]। সংবর্ত্তকল্প—বিশ্বের ধ্বংসকাল। এই সময়ে অগ্নি, জল বা বায়ুর প্রভাবে সমস্ত পদার্থের বিনাশ হয়। বিবর্ত্তকল্পে পুনর্ব্বার সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। অনাদি কাল হইতে এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সুফল বুঝাইবার সময় এই গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন :

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেখানে যে আছে,
অপার করুনালাভ করে যাঁর কাছে;
কিরূপে জীবের হিত অনুষ্ঠিত হয়,
এ শুভ চিন্তায় পূর্ণ যাঁহার হৃদয়।
হেন মহাত্মার মনে অনুদারতার
কস্মিনকালেও কোন নাহি অধিকার।

বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপে মৈত্রীভাবনার সুফল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া সপ্ত সংবর্ত্তবিবর্ত্ত কল্প ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহাকে আর ইহলোকে ফিরিতে হয় নাই।

[**সমবধান :** তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ এবং আমি সেই শাস্তা অরক।]

---

১৭০. ককণ্টক-জাতক[১]

[মহা উম্মার্গ-জাতকে (৫৩৮) ককণ্টক-জাতকের বৃত্তান্ত বলা হইবে।]

১৭১. কল্যাণ-ধর্ম্ম-জাতক

[এক ব্যক্তির এক বধিরা শ্বশ্রূ ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী নাকি প্রসন্নচিত্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। একদিন তিনি প্রচুর ঘৃত প্রভৃতি ভৈজষ্য[২] এবং পুষ্পগন্ধাদি বস্তু লইয়া শাস্তার উপদেশ-শ্রবণার্থ জেতবনে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূ কন্যাকে দেখিবার মানসে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যসহ জামাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বৃদ্ধা কানে একটু কম শুনিতেন।

বৃদ্ধা কন্যার সহিত একত্র আহার করিলেন এবং আহারজনিত তন্দ্রা দূর করিবার অভিপ্রায়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জামাতার সঙ্গে নির্ব্বিবাদে ঘরকন্না করিতেছিস্ ত? তোদের মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ হয় না ত?" কন্যা

---

[১]। ককণ্টক = বহুরূপ (Chameleon)।

[২]। ভৈজষ্য –ঔষধ; কিন্তু সর্পি: নবনীত, তৈল, মধু এবং গুড় ও পঞ্চভৈজষ্য নামে অভিহিত হয়।

উত্তর দিল, "কি বলিতেছ, মা? অপরের কথা দূরে থাকুক, প্রব্রাজকদিগের মধ্যেও তোমার জামাতার ন্যায় শীলবান ও সদাচারসম্পন্ন লোক দুর্লভ।" বৃদ্ধা উপাসিকা কন্যার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন না, কেবল 'প্রব্রাজক' শব্দটি তাঁহার কানে গেল এবং "বলিস্ কি? জামাই প্রব্রাজক হইল কেন?" বলিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া বাড়ীর অপর সকলেও চীৎকার করিতে লাগিল, "শুনিয়াছ কি, আমাদের প্রভু প্রব্রাজক হইয়াছেন।" ইহাতে দরজায় অনেক লোক জমিল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের মুখে সেই এক কথা—"এ বাড়ীর কর্ত্তা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।"

এদিকে ভূম্যধিকারী দশবলের মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। পথে এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞেসা করিল, "সৌম্য, তুমি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? গৃহে তোমার পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজন কত বিলাপ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূম্যধিকারী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, অথচ লোকে বলিতেছে যে আমি প্রব্রাজক হইয়াছি। কল্যাণজনক শব্দ উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য। অতএব অদ্যই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া আবার শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, তুমি না এই মাত্র বুদ্ধের অর্চ্চনা করিয়া গেলে; এখনই আবার ফিরিলে কেন?" ভূম্যধিকারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, যখন কল্যাণজনক কথা উঠিয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা বিহিত নহে; সেই জন্যই প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন, এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভিক্ষুধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অচিরে অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

ভূস্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণাদির কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রচারিত হইল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভূম্যধিকারী, কল্যাণজনক কোন কথা শুনিতে পাইলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিশ্বাসে, প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক এখন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালেও পণ্ডিতেরা, কোন কল্যাণজনক কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত ইহা ভাবিয়া, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি একদিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূ কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই রমণী ঈষৎ বধির ছিলেন। প্রত্যুপন্ন বস্তুতে যেরূপ বলা হইল বোধিসত্ত্বের গৃহেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। রাজদর্শনান্তে বোধিসত্ত্ব যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন? আপনার বাড়িতে সেজন্য অত্যন্ত বিলাপ পরিতাপ হইতেছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'মঙ্গলজনক কোন কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।' অতএব তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া পুনর্ব্বার রাজার সকাশে উপনীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মহাশ্রেষ্ঠীন, এখনই গেলে, আবার এখনই যে ফিরিয়া আসিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, তথাপি না কি আমার বাড়ির লোকে, আমি প্রব্রাজক লইয়াছি বলিয়া বিলাপ করিতেছে। মঙ্গলজনক কোন কথা উঠিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত। এই জন্য প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিন। তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি দ্বারা নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিলেন :

পুণ্যবান বলি খ্যাতি হইলে রটন
পুণ্যশীল হয় লোকে, শুণ হে রাজন।
সুবুদ্ধির সুযশ কখন(ও) যদি রটে,
সন্মার্গস্খলন তার কদাপি না ঘটে।
ইচ্ছায় না হোক, লোক-লজ্জার কারণ,
পুণ্যভার সযতনে করে সে বহন।
পুণ্যাত্মার প্রাপ্য যশ লভিয়াছি আজ,—
সবে মোরে প্রব্রাজক বলে, মহারাজ।
প্রব্রজ্যা সে হেতু আমি করিব গ্রহণ,
কামভোগে রত আর নহে মোর মন।

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী]

জাতকমালায় এই গল্পটী শ্রেষ্ঠীজাতক নামে অভিহিত।

১৭২. দর্দ্দর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেক বহুশাস্ত্রবিশারদ ভিক্ষু মনঃশিলাতলে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা যখন তরুণসিংহ-নিনাদ-সদৃশ গম্ভীরস্বরে সঙ্ঘমধ্যে পদ পাঠ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন আকাশগঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে। কোকালিক নিজের অসারতা জানিত না; সে ভিক্ষুদিগের পদপাঠ শুনিয়া মনে করিল, "আমিও ইহাদের ন্যায় পাঠ করিব।" অনন্তর সে সঙ্ঘমধ্যে গিয়া ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, "আমি যে কেমন পদপাদ করিতে পারি, তাহা ত কেহ শুনে নাই; যদি শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমিও পাঠ করি।" সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুগণ এই কথা শুনিতে পাইলেন এবং পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন বলিলেন, "ভাই কোকালিক, আজ তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট পদ পাঠ কর।" সে নিজের শক্তি বুঝিত না; কাজেই স্বীকার করিল, "বেশ কথা, অদ্যই পাঠ করিব।"

অনন্তর কোকালিক নিজের রুচির অনুরূপ যবাগূ পান করিল, খাদ্য ভোজন করিল এবং সুরস সূপ আহার করিল। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল, ধর্ম্মশ্রবণের সময় ঘোষিত হইল এবং ভিক্ষুগণ সমবেত হইলেন। তখন কোকালিক কণ্টকুরণ্ড[১] পুষ্পবর্ণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং কর্ণিকার-পুষ্পবর্ণ প্রাবরণ গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশ করিল, সেখানে স্থবিরদিগকে অভিবাদন-পূর্ব্বক অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপস্থ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাসনে অধিরোহণ করিল এবং বিচিত্র বীজনহস্তে পদপাঠার্থ উপবেশন করিল। কিন্তু তখনই তাহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল; সে, 'পাছে অপদস্থ হই, এই ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে প্রথম গাথার প্রথম পদ আবৃত্তি করিল বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী পদগুলি ভুলিয়া গেল। কাজেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আসন হইতে অবতরণ করিল এবং সলজ্জভাবে সঙ্ঘ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরিবেণে চলিয়া গেল। বহুশাস্ত্রবিৎ একজন ভিক্ষু ধর্ম্মাসনে গিয়া সে দিন পদপাঠ করিতে লাগিলেন। তদবধি সকল ভিক্ষুই কোকালিকের অসারতা জানিতে পারিলেন।

ইহার পর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় কোকালিকের এই কাণ্ডের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখিলে ভাই, কোকালিক যে নিতান্ত অপদার্থ ইহা ত আমরা প্রথমে সহজে বুঝিতে পারি নাই। এখন কিন্তু সে নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন,

---

[১]। কাটা জাতী (কাঁটা কুমুরে?), ইহার উজ্জ্বল নীলবর্ণ।

"কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িয়াছে তাহা নহে, অতীত জন্মেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসিংহের উপর রাজত্ব করিতেন এবং বহুসিংহ-পরিবৃত হইয়া রজত গুহায় বাস করিতেন। তাহার অদূরে অন্য একটি গুহায় এক শৃগাল থাকিত।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ সিংহরাজের গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সিংহক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা খেলিবার সময় যে নিনাদ করিতেছিল তাহা শুনিয়া সেই শৃগালও ডাকিতে আরম্ভ করিল। সিংহগণ শৃগালরব শুনিয়া বলিল, "তাই ত, এই শৃগালও দেখিতেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিনাদ করিতে লাগিল।" অনন্তর তাহারা লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। তাহারা সিংহনাদ হইতে বিরত হইলে বোধিসত্ত্বের পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহগণ এতক্ষণ নিনাদ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিল, কিন্তু ঐ গুহাবাসী প্রাণীর রব শুনিয়া এখন লজ্জায় নীরব হইয়াছে। ও কোন প্রাণী, পিতঃ, যে এইরূপ বিকট রব দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেছে?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সিংহ-পোতক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

কে বিকট রব করি কাঁপায় দর্দ্দর ভূমি,[১]
মৃগরাজ, শুধাই তোমায়।
কেন বল, হে রাজন, নীরব কেশরিগণ
প্রতিনাদে তোষে না তাহায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

পশুকুলাধম শিবা রয়েছে ওখানে,
নিকৃষ্ট ইহার জাতি সকলেই জানে।
এর সঙ্গে সখ্য করা লজ্জার কারণ;
নীরবে বসিয়া তাই আছে সিংহগণ।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অতএব বুঝিতে পারিলে যে কোকালিক যে কেবল এখনই নিনাদ করিতে গিয়া নিজের অসারতার পরিচয় দিল তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এই কাণ্ড করিয়াছিল।"

সমবধান : তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগাল; রাহুল ছিল সেই

---

[১]। দর্দ্দর = পর্ব্বত (৬৫৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

সিংহপোতক এবং আমি ছিলাম সেই সিংহরাজ।]

এই গল্পের সহিত পঞ্চতন্ত্রের সিংহশাবক শৃগালশাবক নামক আখ্যায়িকার ঈষৎ সাদৃশ্য আছে।

---

১৭৩. মর্কট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু প্রকীর্ণক নিপাতে উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এখনই যে ভণ্ড হইয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নির জন্য ভণ্ড সাজিয়াছিল।" অতঃপর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন।

বোধিসত্ত্বের ব্রাহ্মণী এক পুত্র প্রসব করেন; কিন্তু ঐ শিশুটি যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিল, সেই সময়েই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব পত্নীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এখন আমার সংসারশ্রমে প্রয়োজন কি? আমি পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া জ্ঞাতি বন্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রসহ হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর বন্যফলমূলে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল; বোধিসত্ত্ব খদিরকাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া এক ফলকাসনে শুইয়া তাপসেবন করিতে ছিলেন; তাঁহার পুত্র একপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পা টিপিতেছিল, এমন সময়ে এক বন্য মর্কট শীতে কাতর হইয়া সেই কুটীরের মধ্যে অগ্নি দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, 'আমি যদি কুটীরে প্রবেশ করি তাহা হইলে 'মর্কট', 'মর্কট' বলিয়া ইহারা আমাকে তাড়াইয়া দিবে; আমি অগ্নিসেবন করিতে পারিব না। তবে একটা উপায় আছে। আমি তাপসের বেশ গ্রহণ করি এবং সেই ছলে কুটীরের ভিতর যাই।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সে এক মৃত তপস্বীর বল্কল পরিধান করিল, তাহার ভিক্ষার ঝুড়ি ও অঙ্কুশকযষ্টি[১] হাতে

---

[১]। সন্ন্যাসীরা যে আঁকা বাঁকা লাঠি ব্যবহার করেন তাহা।

লইল এবং কুটীরদ্বারে একটা তালগাছে ঠেঁস দিয়া নিতান্ত জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বোধিসত্ত্বের পুত্র তাহাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে যে মর্কট তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, 'কোন বৃদ্ধ তাপস বুঝি শীতে কাতর হইয়া অগ্নিসেবা করিতে আসিয়াছেন। অতএব পিতাকে বলিয়া ইহাকে কুটীরের ভিতর আনি এবং ইহার অগ্নিসেবার সুবিধা করিয়া দিই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

তালমূলে শীতে কাঁপে বৃদ্ধ একজন;
নিকটে রয়েছে এই বাসের ভুবন।
বৃদ্ধের দেখিলে দুখ বুক ফেটে যায়,
দিব কি আশ্রয়, পিতঃ, উহারে হেথায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীরদ্বারে গেলেন এবং সেখান হইতে দেখিয়াই বুঝিলেন, তালমূলে মর্কট দাঁড়াইয়া আছে, মনুষ্য নহে। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, মানুষের কখনও এমন মুখ হয় না; এ মর্কট; ইহাকে কুটীরের মধ্যে আনা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

পশিতে কুটীরে এরে বলো' না কখন;
পশিলে এ হবে ঘোর অনর্থ-ঘটন।
সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ যে হবে,
হেন কদাকার মুখ তার কি সম্ভবে?

পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নি হইতে একখণ্ড জলৎকাষ্ঠ তুলিয়া লইলেন এবং "তুই এখানে দাঁড়াইয়া কেন" এই বলিয়া উহা মর্কটকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মর্কট পলায়ন করিল, বল্কল ফেলিয়া দিল, বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং নিবিড়বনে প্রবেশ করিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মালোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপস কুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

এই জাতকে এবং কপি জাতকে (২৫০) কেবল গাথার পার্থক্য দেখা যায়; উপাখ্যানাংশ উভয়ত্রই এক।

---

১৭৪. দ্রোহি-মর্কট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা ও মিত্রদ্রোহিতার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের প্রধান রাজপথের ধারে একটা গভীর কূপ ছিল; উহাতে অবতরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। ঐ পথে যে সকল লোক যাতায়াত করিত তাহারা পুণ্যকামনায় দীর্ঘ রজ্জু ও ঘটের সাহায্যে জল তুলিয়া পশুদিগের পানার্থ একটা দ্রোণি পূর্ণ করিয়া রাখিত; ইহা হইতে পশুরা জলপান করিত। ঐ কূপের চতুর্দ্দিকের বিশাল অরণ্য ছিল; তাহাতে বহু মর্কট বাস করিত।

একবার ঘটনাক্রমে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত, ঐ পথ দিয়া কোন মনুষ্য যাতায়ত করিল না; কাজেই পশুরাও পানের জন্য জল পাইল না। তখন এক মর্কট পিপাসাতুর হইয়া জলের অন্বেষণে সেই কূপের ধারে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে কোন কারণে ঐ পথে যাইতেছিলেন; তিনি কূপ হইতে জল তুলিয়া পান করিলেন, হাত পা ধুইলেন এবং তাহার পর উক্ত মর্কটকে দেখিতে পাইলেন। মর্কট পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি কূপ হইতে আবার জল তুলিয়া দ্রোণিতে ঢালিয়া দিলেন এবং বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে একটা বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন।

এদিকে মর্কট জল পান করিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য মুখ ভেঙ্গ চাইতে লাগিল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অরে দুষ্ট মর্কট, তুই পিপাসায় কষ্ট পাইতেছিলি দেখিয়া আমি তোর পানের জন্য প্রচুর জল দিলাম; আর তুই এখন আমাকে মুখ ভেঙ্গ চাইতেছিস! এখন বুঝিলাম যাহারা খল তাহাদের উপকার করা নিরর্থক"। অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

রৌদ্রে পুড়ি পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ
হয়েছিলি, দেখি তাই করি বারিদান
রাখিনু জীবন তোর; এখন আমারে

'কিকি কিকি' শব্দে চাস্ ভয় দেখাবারে।
বুঝিলাম, হেরি তোর দুষ্ট আচরণ,
পাপীর সংসর্গে সুখ না হয় কখন।

ইহা শুনিয়া সেই মিত্র দ্রোহী মর্কট বলিল, "তুমি মনে করিও না যে আমি কেবল মুখভঙ্গী করিয়াই নিরস্ত হইব; আমি তোমার মস্তকে মলত্যাগ করিয়া যাইব।" এই উদ্দেশ্য সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ব্যক্ত করিল :

শুনেছ, দেখেছ কিংবা জীবনে কখন
মর্কটে হইয়া থাকে শীলপরায়ণ?
কবির মস্তকে তব মলত্যাগ এবে
মর্কটের ধর্ম্ম এই; জানে ইহা সবে।

এই কথা শুনিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মর্কট বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক শাখায় বসিল, সেখান হইতে তাঁহার মস্তকোপরি মালার আকারে মলরাশি নিক্ষেপ করিল এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে বনমধ্যে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দেবদত্ত মৎকৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই।"

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই মর্কট এবং আমি সেই ব্রাহ্মণ।]

---

১৭৫. আদিত্যোপস্থান-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তিনি ইহাদের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করিতেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব একবার লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে এক পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহিরে যাইতেন, তখন এক দুষ্ট মর্কট আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পর্ণশালার তৃণ তুলিয়া ফেলিত, কলসীগুলি হইতে জল ফেলিয়া দিত, কমণ্ডলুগুলি ভাঙ্গিত এবং অগ্নিশালায় মলত্যাগ করিত।

বর্ষাবসানে তাপসেরা ভাবিলেন, 'এখন হিমালয় পুষ্পফলাদিতে রমণীয়

হইয়াছে; অতএব সেখানেই ফিরিয়া যাই।, তাঁহারা প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তাহারা বলিল, "প্রভুগণ, আমরা কল্য ভিক্ষা লইয়া আপনাদের আশ্রমে আসিব; আপনারা তাহা ভক্ষণ করিয়া যাইবেন।"

পরদিন গ্রামবাসীরা প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া সেই মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কুহকদ্বারা এই লোকগুলোকে প্রসন্ন করিতেছি। তাহা হইলে আমাকেও ইহারা এই সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্যের অংশ দিবে।' ইহা স্থির করিয়া, সে পুণ্যশীল তপস্বীর বেশ ধারণ করিল এবং যেন সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিতেছে এইভাবে তপস্বীদিগের অবিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামবাসীরা ভাবিল, 'আহা, পুণ্যাত্মাদিগের সংসর্গে থাকিলে সকলেই পুণ্যবান হয়!' তাহারা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিল :

বহুবিধ জীব বাস করে ধরাতলে,
প্রত্যেক জাতির মাঝে কোন কোন প্রাণী আছে,
প্রশংসার যোগ্য যারা নিজ শীলবলে।
প্রমাণ ইহার ভাই, কর দরশন,
নির্ব্বোধ মর্কটে করে সূর্য্যের অর্চ্চন।

গ্রামবাসীরা এইরূপে মর্কটের গুণ গান করিতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা এই দুষ্ট মর্কটের প্রকৃত চরিত্র জান না; কাজেই এই অপাত্রকে প্রশংসা করিতেছ।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

জান না কিরূপ দুষ্ট প্রকৃতি ইহার;
কাজেই প্রশংসা এত কর বার বার।
মলত্যাগ করে পাপী অগ্নির শালায়,
কমণ্ডলু ভাঙ্গি সব পলাইয়া যায়।

গ্রামবাসীরা তখন মর্কটের ভণ্ডতা বুঝিতে পারিয়া লোষ্ট্র ও যষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে প্রহার করিল এবং ঋষিদিগকে ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। ঋষিরাও অতঃপর হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই ভণ্ড ছিল সেই মর্কট, বুদ্ধশিষ্যরা ছিল সেই সমস্ত ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

---

১৭৬. কলায়মুষ্টি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে এই কথা বলিয়াছিলেন। একবার বর্ষাকালে কোশলরাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সেই অঞ্চলে যে সৈন্য ছিল তাহারা দুই তিন বার যুদ্ধ করিয়াও যখন বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিল না, তখন রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল। বর্ষাকাল যুদ্ধযাত্রার পক্ষে অনুপযোগী; তাহাতে আবার অবিরত বর্ষণ হইতেছিল; তথাপি রাজা রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেতবনসমীপে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি অকালে যুদ্ধযাত্রা করিলাম; খাল বিল সমস্ত এখন জলে পূর্ণ, পথ অতি দুর্গম হইয়াছে। আচ্ছা, শাস্তার সঙ্গে দেখা করা যাউক; তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, মহারাজ কোথায় যাইতেছেন? তখন আমি তাঁহার নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। তিনি যে কেবল পারলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহা নহে; ইহলোকে যে কেবল বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসম্বন্ধেও সদুপদেশ দিয়া থাকেন। যদি এই যুদ্ধযাত্রায় কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, মহারাজ, এখন অকাল; আর যদি মঙ্গলের আশা থাকে তাহা হইলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবেন।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জেতবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "একি মহারাজ, এই অসময়ে কোথা হইতে আসিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আমি প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহদমনার্থ যাত্রা করিয়াছি। তাই ভাবিলাম, একবার আপনাকে প্রণাম করিয়া যাই।" "পূর্ব্বকালেও মহারাজগণ সসৈন্যে অভিযান করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অসাময়িক অভিযান হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বার্থক অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিতেন। একবার রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে তত্রত্য রাজসৈনিক পুরুষেরা রাজাকে সংবাদ দিলেন। তখন বর্ষাকাল, তথাপি রাজা রাজপুরী ত্যাগ করিয়া উদ্যানের ভিতর স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। এখানে, বোধিসত্ত্ব রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে, অশ্বপালেরা অশ্বদিগের জন্য কলায় সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্রোণির মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

উদ্যানে বহু মর্কট বাস করিত। তন্মধ্যে একটা মর্কট বৃক্ষ হইতে অবতরণ

করিয়া সেই দ্রোণি হইতে কলায় লইয়া মুখে পূরিল, দুই হাতেও যত পারিল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে গাছে চড়িল এবং সেখানে বসিয়া কলায় খাইতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে তাহার হাত হইতে একটি কলায় ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে সে মুখের ও হাতের সমস্ত কলায় ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কলায়টি খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু তাহা না পাইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং নিতান্ত বিষণ্নমুখে শাখার উপর বসিয়া রহিল—যেন উহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজা এতক্ষণ মর্কটের কাণ্ড দেখিতেছিলেন; এখন বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বয়স্য, উহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইতেছে?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা নির্ব্বোধ ও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

মূর্খ শাখামৃগ, এর বুদ্ধি কিছু মাত্র নাই;
মুষ্টিপ্রমাণ কলায়ফেলি একটি দানা খোঁজে তাই।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গেলেন[১] এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অতিলোভী জন,
অল্প হেতু করে তারা বহু বিসর্জ্জন।
খুজিবার তরে মাত্র একটি কলায়
এক মুষ্টি কলায় ফেলিল কপি, হায়!
আমরাও তার(ই) মত নির্ব্বোধ, রাজন;
দুরন্ত বর্ষায় করি যুদ্ধ-আয়োজন।[২]

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে বিদ্রোহী দস্যুরা শুনিতে পাইয়াছিল যে রাজা তাহাদিগের দমনার্থ রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন; কাজেই তাহারা (তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই) প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে পলাইয়া গেল।

[কোশলের প্রত্যন্তবাসী দস্যুরাও, রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে

১। অর্থাৎ এত কাছে গেলেন যে কথাগুলি যেন রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়।

২। অর্থাৎ প্রত্যন্তপ্রদেশ-রক্ষার্থ এখন যুদ্ধযাত্রা করিলে পথের দুর্গমতা হেতু হস্তী, অশ্ব রথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা।

যাইতেছেন শুনিয়া পলায়ণ করিয়া গেল। রাজা শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

---

১৭৭. তিন্দুক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাবোধি জাতকের (৫২৮) এবং উম্মার্গজাতকের (৫৩৮) ন্যায় এই জাতকেও তিনি নিজের প্রজ্ঞার প্রশংসা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এজন্মেই প্রজ্ঞাবান হইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি প্রজ্ঞাবান ও উপায়-কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক অশীতি সহস্র বানরপরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল। সেখানে কখনও লোকে বাস করিত, কখনও বাস করিত না। এই গ্রামের মধ্যে শাখা-পল্লবযুক্ত মধুর ফলবিশিষ্ট একটি তিন্দুক বৃক্ষ ছিল। যখন গ্রামে লোক থাকিত না, তখন বানরেরা আসিয়া উহার ফল খাইত।

একবার তিন্দুকের যখন ফল হইয়াছিল, সেই সময়ে অনেক লোকে ঐ গ্রামে বাস করিতেছিল। তাহারা বৃক্ষটির চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া দ্বারদেশে প্রহরী রাখিয়া দিয়াছিল। বৃক্ষে তখন এত ফল হইয়াছিল যে, তাহাদের ভারে শাখাগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে বানরেরা চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমরা অমুক গ্রামে গিয়া তিন্দুক ফল খাইয়া থাকি। সেই বৃক্ষে এখন ফল হইয়াছে কি না, আর সেই গ্রামেই বা এখন লোক আছে কি না?' এইরূপ ভাবিয়া তাহারা বৃক্ষের ও গ্রামের অবস্থা জানিবার জন্য একটা বানরকে প্রেরণ করিল। সে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল

---

[১]। তিন্দুক—গাবগাছ অথবা আবলুশ গাছ। 'গাব' শব্দটি 'গালব' শব্দ-জাত কি?

বৃক্ষে ফল হইয়াছে এবং গ্রামে বহু লোক বাস করিতেছে। বৃক্ষে ফল হইয়াছে শুনিয়া বানরেরা বলিয়া উঠিল, "আমরা ঐ মধুর ফলগুলি খাইব" এবং অনেকে গিয়া মহোৎসাহে বানরেন্দ্রকে ঐ কথা জানাইল। বানরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামে এখন লোক আছে কি না?" তাহারা উত্তর দিল, "গ্রামে এখন লোক আছে।" ইহা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "অতএব আমাদিগের সেখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; মনুষ্যের মায়ার শেষ নাই।" বানরেরা বলিল, "নিশীথকালে মনুষ্যেরা যখন শয়ন করিতে যাইবে আমরা তখন গিয়া খাইব।" এইরূপে বহু বানরে বানরেন্দ্রের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিল, মনুষ্যদিগের শয়নকালে প্রতীক্ষায় সেই গ্রামের অবদূরে একটা প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর শুইয়া রহিল এবং নিশীথ সময়ে লোকে যখন নিদ্রাভিভূত হইল, তখন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে একটা লোক শৌচের জন্য[১] গৃহ হইতে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যভাগে গেল এবং বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে জানাইল। তখন বিস্তর লোক ধনু, তূণীর, যষ্টি, লোষ্ট্র প্রভৃতি, যে যাহা হাতে পাইল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া গেল এবং সেই বৃক্ষ পরিবেষ্টনপূর্বক বলিতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত হইলে বানরগুলোকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই অশীতি সহস্র বানর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, 'বানরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহই আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না।' তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

ধনু, তূণ, খড়্গ হস্তে লয়ে অগণন,
শত্রু আসি করিয়াছে চৌদিকে বেষ্টন।
মুক্তির উপায় এবে দেখিতে না পাই;
সেই হেতু শরণ লইনু তব ঠাঁই।

তাহাদিগের কথা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই; মানুষের কত কাজ রহিয়াছে। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর মাত্র; লোকগুলা দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, 'বানরদিগকে মারিয়া ফেলিব।' কিন্তু আমরা ইহাদের জন্য এমন একটি কাজের ব্যবস্থা করিব, যাহা এই কাজের অন্তরায় হইবে।' বানরদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

মানুষের বহুকাজ; কার্য্যান্তর তরে
অন্যত্র এখন(ই) এরা ছুটে যেতে পারে।

---

[১]। মূলে 'সরীরকিচ্চেন (শরীরকৃত্যেন) এই পদ আছে। 'শরীরকৃত্য বলিলে মৃতদেহের সৎকারও বুঝায়।

এখনও রয়েছে ফল পড়ি শত শত,
খাওগে তোমরা তাহা, যার ইচ্ছা যত।

মহাসত্ত্ব কপিদিগকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। তাহারা যদি এই আশ্বাসটুকু না পাইত তাহা হইলে সকলেই বিদীর্ণহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিত। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার পর বলিলেন, "বানরদিগকে এক স্থানে সমবেত হইতে বল।" যখন বানরেরা সমবেত হইল, তখন দেখা গেল, তাঁহার ভাগিনেয় সেনক নামক বানর সেখানে নাই। তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেনক যদি নাই আইসে, তথাপি তোমরা ভীত হইও না। সে এখনই তোমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় করিবে।"

বানরেরা যখন গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখন সেনক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে বানরদিগের মার্গ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল। সেই সময়ে সে দেখিতে পাইল মনুষ্যেরা ছুটিয়া যাইতেছে। সে বুঝিল যে বানরযূথের মহা বিপত্তির আশঙ্কা। সে দেখিতে পাইল গ্রামপ্রান্তে এক কুটিরের ভিতর এক বৃদ্ধা অগ্নি জ্বালিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন, সে যেন ঐ গ্রামেরই বালক, মাঠে (শস্য রক্ষা করিতে) যাইতেছে এইভাবে, একখণ্ড দহ্যমান কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, যে দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছিল সেই দিকে গিয়া, গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। কাজেই মনুষ্যেরা মর্কটদিগকে ছাড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। বানরেরাও পলাইবার সময় সেনকের জন্য প্রত্যেকে এক একটি ফল লইয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন মহানাম নামক শক্র ছিলেন বোধিসত্ত্বের ভাগিনেয় সেই সেনক; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বানর এবং আমি ছিলাম তাহাদের রাজা।]

---

১৭৮. কচ্ছপ-জাতক

[একব্যক্তি অতিবাহক রোগে[১] আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ

---

[১]। অতিবাহক রোগ যে কি তাহা বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন যে ইহা এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, কারণ তরাই অঞ্চলের লোকের নাকি বিশ্বাস যে বিষধর সর্পের নিঃশ্বাস হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। অহি শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে; যথা—মেঘ, জল, নাভি ইত্যাদি। অতএব 'অহিবাতক' রোগে হয় বর্ষাকালীন কোনপ্রকার জ্বর, নয় ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক পীড়া, বুঝাইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। ধর্ম্মপদার্থকথায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—''ইহা আবির্ভূত হইলে প্রথমে মক্ষিকা মরে, তাহার পর ক্রমে মুষিক, কুক্কুট, শূকর, গো ও দাসদাসী এবং সর্ব্বশেষে গৃহস্বামী

করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীনগরের এক পরিবারে এই রোগ দেখা দেয়। বাড়ীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এ বাড়ীতে আর থাকিও না; গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়া[১] যেখানে পার পলাইয়া প্রাণ বাচাও; শেষে ফিরিয়া আসিবে। এখানে প্রভূত ধন প্রোথিত আছে; তাহা তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম করিবে।" পুত্র তাঁহাদের আদেশানুসারে ভিত্তিভেদপূর্ব্বক পলায়ণ করিল এবং যখন তাহার রোগ প্রশমিত হইল, তখন ফিরিয়া সেই প্রোথিত বিপুল ধন উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহবাস করিতে লাগিল।

এই ব্যক্তি একদিন সর্পিঃ, তৈল, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনগ্রহণ করিল। শাস্তা তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, তোমাদের বাড়ীতে অহিবাতক রোগ হইয়াছিল; কি উপায়ে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিলে বল।" ইহার উত্তরে সে যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বেও কোন কোন প্রাণী ভয় উপস্থিত দেখিয়াও অত্যন্ত আসক্তিবশত বাসস্থান পরিত্যাগ করে নাই; তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে যাহারা তাদৃশ আপৎকালে অন্যত্র গিয়াছিল, তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।"[২] অনন্তর সেই উপাসকের অনুরোধে শাস্তা উক্ত অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুম্ভকারের ব্যবসা করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মহানদীর অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ[৩] ছিল। যখন জল অধিক হইত তখন এই সরোবর নদীর সহিত এক হইয়া যাইত; জল কমিলে কিন্তু পৃথক হইয়া পড়িত।

আক্রান্ত হয়। ভিত্তিতে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলাইয়া যাওয়াই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়।" তবে কি বুঝিতে হইবে ইহা প্লেগ বা তৎদৃশ কোন মহামারী?

১। এই উপদেশ কুসংস্কারমূলক। লোকে সংক্রামক পীড়া অপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে; অপদেবতা যেন গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে; কাজেই তাহার অগোচরে পলায়ণ করিবার জন্য ভিত্তিভেদ করিয়া যাইবার ব্যবস্থা।

২। ইহাতে বোধ হয় যে মহামারীর সময় বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলে যে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অতি প্রাচীন সময়েও লোকের এ সংস্কার ছিল।

৩। জাতস্‌সরো—স্বাভাবিক সরোবর; দেবখাত।

মৎস্য ও কচ্ছপগণ বুঝিতে পারে কোন বৎসর সুবৃষ্টি, কোন বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিবে। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন, যে সকল মৎস্য ও কচ্ছপ উক্ত সরোবরে জন্মিয়াছিল তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে; অতএব যখন সরোবরের ও নদীর জল মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে তাহারা সরোবর হইতে বাহির হইয়া নদীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। সকলেই গিয়াছিল, কেবল যায় নাই একটা কচ্ছপ। সে ভাবিয়াছিল, এই স্থানেই আমার জন্ম হইয়াছে, এখানেই আমি বড় হইয়াছি, এখানেই আমার মাতা পিতা বাস করিয়া গিয়াছেন; এস্থান আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

অতঃপর গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, সেই সরোবরের সমস্ত জল শুকাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব যেখান হইতে মাটি তুলিয়া লইতেন, কচ্ছপ সেখানে এক গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে একদিন মাটি লইতে আসিলেন। তিনি বৃহৎ এক খণ্ড কুদ্দাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলেন; তাহার আঘাতে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন হইল; বোধিসত্ত্ব কুদ্দাল দ্বারা যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড তুলিতে ছিলেন, কচ্ছপকেও এখন তেমনিভাবে তুলিয়া গর্ত্তের উপরে ফেলিলেন। কচ্ছপ তখন দারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া ভাবিল, 'হায়, আমি বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম।' সে নিম্নলিখিত দুইটি গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশ করিল :

হেথা জন্ম লভিলাম, হেথা বড় হইলাম,
অতি প্রিয় সেই হেতু এই সরোবর;
শুকাইয়া গেল বারি, তবু এরে নাহি ছাড়ি!
কর্দ্দম-আশ্রয়ে থাকি ঢাকি কলেবর।
এবে কিন্তু সে কর্দ্দম নাশিল জীবন মম;
ছিল না অন্যত্র মোর যাইতে শকতি।
হেরি মোর পরিণাম, হও নিজে সাবধান;
শুনহে ভার্গব,[১] তুমি আমার যুকতি :
গ্রাম কিংবা বনভূমি, যেথা সুখ পাও তুমি,
সেই জন্মস্থান, সেই যোগ্য বাসস্থান;
প্রাণ যথা রক্ষা পাবে, সেখানেই চলি যাবে;
না গেলে হইবে তব অতি অকল্যাণ।
নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা, স্থানের মায়ায়
পৈতৃক আবাসে থাকি মৃত্যুমুখে যায়।

১। 'ভার্গব' কুম্ভকাররূপী বোধিসত্ত্বের নাম।

বোধিসত্ত্বের সহিত এইরূপ কথা বলিতে বলিতে কচ্ছপের প্রাণবিয়োগ হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সকল গ্রামবাসীকে এক স্থানে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "এই মৃত কচ্ছপটা দেখিতেছ; যখন অন্য সমস্ত মৎস্য ও কচ্ছপ মহানদীতে চলিয়া গিয়াছিল, তখন এ নিজের বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহাদের অনুগামী হয় নাই; আমি যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করি, সেখানে গিয়া, মৃত্তিকার মধ্যে শরীর প্রোথিত করিয়াছিল। আজ আমি মৃত্তিকা আনিতে গিয়া প্রকাণ্ড কুদ্দালের আঘাতে ইহার পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন করিয়াছিলাম, এবং গর্ত্ত হইতে কুদ্দাল দ্বারা যেরূপ মৃত্তিকা উত্তোলন করি, ঠিক সেইভাবেই ইহাকে গর্ত্তের উপরে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এ নিজের কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুইটি গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে নিজের বাসভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতই, এ জীবলীলা সংবরণ করিল। সাবধান, তোমরা কেহই এ কচ্ছপের ন্যায় আচরণ করিও না। আমার রূপ দেখিবার জন্য চক্ষু আছে, শব্দ শুনিবার জন্য কর্ণ আছে, গন্ধ অনুভব করিবার জন্য নাসিকা আছে, রস আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বা আছে, স্পর্শ করিবার জন্য ত্বক আছে, আমার পুত্র আছে, কন্যা আছে, আমার দাসদাসী ও অন্যান্য পরিজন আছে, আমার সুবর্ণ আছে, এইরূপ ভাবিয়া কখনও তৃষ্ণাবশত এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইও না। প্রাণীমাত্রেই ত্রিবিধ জীবন ভোগ করে।"[১] এইরূপে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত সেই সমবেত বৃহৎ জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া সপ্ত সহস্র বৎসর বলবান ছিল। সমস্ত লোকেও বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া পরিণামে স্বর্গগামী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন; তাহা শুনিয়া সেই কুলপুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুম্ভকার।]

---

[১]। অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে।

১৭৯. শতধর্ম্মা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে একবিংশতিবিধ অবৈধ উপায়-সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু বৈদ্যকর্ম্ম, দৌত্য, বার্ত্তাবহন, পদাতিকত্ব, পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড[২] প্রভৃতি একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সাকেত-জাতকে (২৩৭) এই সকল নিষিদ্ধ উপায়ের সবিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইবে।[৩]

ভিক্ষুরা এরূপ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'বহু ভিক্ষু অসদুপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে; যাহারা এইভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা দেহান্তে হয় যক্ষ বা প্রেত হইবে, নয় ধুরবাহী গো হইবে বা নরকে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাদের হিতকামনায় ও সুখকামনায় একবার এমন ধর্ম্মদেশনা আবশ্যক যেন সহজেই ইহারা তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনও একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায় দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিও না। নিষিদ্ধ উপায়ে লব্ধ অন্ন উত্তপ্ত লৌহগোলকসদৃশ। ইহা হলাহলের ন্যায় অনিষ্টকর। যাঁহারা বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধদিগের শ্রাবক, তাঁহারা সকলেই এই সমস্ত নিষিদ্ধ উপায় অতীব গর্হিত ও হীন বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করে, তাহার মুখে হাস্য দেখা যায় না, অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি থাকে না। আমার শাসনে থাকিয়া এবংবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন-সদৃশ। শতধর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিষিদ্ধোপায়লব্ধ অন্নগ্রহণ করিলে তোমরাও সেইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

---

[১]। "একবিশতিবিধং অনেসনম'। অনেসন = (অনেষণ) অবৈধ; বিধিবিরুদ্ধতা। এই কুশলটি কি কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

[২]। পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নের বিনিময়। সময়ে সময়ে ভিক্ষুরা ভিক্ষাচর্য্যার কষ্ট কমাইবার জন্য দুই তিন জনে মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন যে, এক এক দিন এক এক জন ভিক্ষায় যাইতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, অপরে বিহারে বসিয়া থাকিয়াও সে দিন তাহার অংশ লাভ করিতেন। এইরূপ ভিক্ষা-বিনিময় শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ ছিল।

[৩]। সাকেত জাতকে কিন্তু কোন সবিস্তর বিবরণ নাই। উহাতে শুদ্ধ প্রথম সাকেত-জাতকের (৬৮) উল্লেখ দেখা যায়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন কোন কারণে তিনি একটা পাত্রে কিছু পাথেয় তুণ্ডুল[১] লইয়া পথ চলিতেছিলেন।

তৎকালে বারাণসীতে কোন বিপুলবিত্তশালী উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে শতধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণকুমার ছিল। সেও কোন কারণে উক্ত সময়ে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে তণ্ডুল বা কোন অন্নপাত্র ছিল না। বোধিসত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণকুমারের এক প্রশস্ত রাজপথে দেখা হইল। ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন জাত?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি চণ্ডাল" এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন জাত? সে উত্তর দিল, আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ। তোমাকে পাইয়া ভালই হইল; চল আমরা এক সঙ্গে যায়।" অনন্তর তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, হাত ধুইয়া পাত্র খুলিয়া বলিলেন, "খাইবে, এস"। ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "তবে রে বেটা চাঁড়াল! তোর ভাত আমি খাইতে যাইব কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, নাই খাইলে।" অনন্তর পাত্রের অন্ন উচ্ছিষ্ট না করিয়া তিনি একটি পাতায় নিজের যতটা আবশ্যক সেই পরিমাণ লইলেন, আহারান্তে জল খাইলেন ও হাত পা ধুইলেন এবং অন্নপাত্রটি হস্তে লইয়া বলিলেন, "তবে উঠ ঠাকুর, এখন যাওয়া যাউক।" অনন্তর তাঁহারা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পথ হাটিয়া দুইজনে সায়ংকালে একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বোধিসত্ত্ব এক পরিস্কৃত স্থানে বসিয়া পাত্র খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন; এবার তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে খাইতে অনুরোধ করিলেন না। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল; ক্ষুধার জ্বালায় তাহার পেট পুড়িয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ লোকটা এখন যদি আবার অন্ন দিতে চায়, তাহা হইলে খাই।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন না, নীরবে ভোজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, "চাঁড়াল বেটা কোন কথা না বলিয়া সমস্ত অন্নই খাইয়া ফেলিল। এখন দেখিতেছি, কিছু চাহিয়া না লইলে চলিবে না। যাহা দিবে তাহার উপরের ভাতগুলি ইহার স্পর্শদোষ অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিব, ভিতরে যাহা থাকে তাহা খাইব।"

১। 'পাথেয় তুণ্ডুল' বলিলে ভাত কিংবা চিড়া মুড়ি এইরূপ কিছু বুঝাইবে। শেষে কিন্তু ভাতেরই উল্লেখ দেখা যায়।

অনন্তর ক্ষুধার তাড়নে সে তাহাই করিল— চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল। কিন্তু উহা উদরস্থ হইবার পরেই তাহার মনে হইল, “হায়, কি করিলাম, আজ নিজের জাতি, গোত্র, বংশ সকলের মুখে কালি দিলাম! ছি! ছি! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইলাম!’ তখন তাহার ভয়ানক নির্ব্বেদ জন্মিল; সে ভূক্ত অন্নের সহিত রক্ত বমন করিয়া ফেলিল, “হায়, আমি তুচ্ছ দুটা অন্নের লোভে আজ কি গর্হিত কাজই করিলাম” এইরূপে পরিবেদন করিতে লাগিল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

মুষ্টিমাত্র অন্ন, তাহাও উচ্ছিষ্ট, অনিচ্ছায় তাহা দিল;
বিপ্রবংশে জন্মি খাই আমি তাহা—তাও পেটে না রহিল!

এইরূপে পরিবেদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমার স্থির করিল, “যখন এমন গর্হিত কাজ করিয়াছি, তখন এ প্রাণ আর রাখিব না।” সে অরণ্যে চলিয়া গেল, যতদিন জীবিত রহিল কাহাকেও মুখ দেখাইল না এবং শেষে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শাস্তা এইরূপে অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণকুমার শতধর্ম্মা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ‘অখাদ্য খাইলাম’ এই জ্ঞানে অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাহার মুখে হাস্য ছিল না, মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না। সেইরূপ, যাহারা আমার শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ ও চীবরাদি উপকরণ ভোগ করিবে, তাহারা বুদ্ধকর্ত্তক নিন্দিত ও গর্হিত উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ-হেতু চিরদিন ম্রিয়মাণ ও স্ফূর্ত্তিহীন রহিবে।” অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

ধম্মপথ পরিহরি অধর্ম্মের পথে চরি
করে যেবা জীবন ধারণ,
লব্ধ দ্রব্য ভোগ করি সুখের কণিকামাত্র
কভু নাহি পায় সেইজন।
তার সাক্ষী শতধর্ম্মা, কুলধর্ম্ম পরিহরি,
চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল;
সেই পাপে পরিণামে পুড়ি অনুতাপানলে
বনে গিয়া প্রাণ তেয়াগিল।

কথান্তেশাস্তা সত্য-সতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

---

১৮০. দুর্দ্দদজ্জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে গণদান-সম্বন্ধে[২] এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় একবার শ্রাবস্তীবাসী সম্ভ্রান্তকুলজাত দুই বন্ধু চাঁদা তুলিয়া দানের জন্য ভিক্ষু-ব্যবহার্য্য পাত্রচীবরাদি সর্ব্ববিধ দ্রব্য সজ্জীভূত করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সপ্তাহকাল মহাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল যে সপ্তম দিনে ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য প্রদত্ত হইবে। ঐ দিন দাতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, এই দান কর্ম্ম কেহ বহু অর্থ দিয়াছে; কেহ বা অল্প দিয়াছে; কিন্তু দানের ফল যেন সকলেই তুল্যরূপে পায়।" এই প্রার্থনা করিয়া তিনি দানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে এই সমস্ত দান করিয়া মহাপুণ্যের কাজ করিলে। পুরাকালে পণ্ডিতেরাও বহুদান করিয়াছিলেন এবং এইরূপেই দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ঋষিকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন।

দীর্ঘকাল হিমবন্তে বাস করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার্থ অনুচরবর্গসহ নগরদ্বারের বাহিরে কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল। তৃতীয় দিনে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে ভিক্ষা করিতে গেলেন। নগরবাসীরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং দলে দলে চাঁদা তুলিয়া ঋষিদিগকে মহাদান দিবার আয়োজন করিল। এখন তোমাদের অগ্রণী যে কথা বলিলেন, তখন তাহাদের অগ্রণীও দানীয় দ্রব্য নিবেদন করিবার সময় সেইরূপ

---

[১]। প্রথম গাথার প্রথম শব্দ 'দুদ্দদং' হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। টীকাকার, 'দুদ্দদ' শব্দের 'দান' এই অর্থ করিয়াছেন, কারণ কৃপণেরা দানে কাতর।

[২]। গণদান—অর্থাৎ দুই বা ততোধিক লোকে একত্র (চাঁদা তুলিয়া) যে দান করে।

বলিয়াছিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিয়াছিলেন, "ভাই, যেখানে চিত্তপ্রসাদ আছে, সেখানে কোন দানই অল্প হইতে পারে না।" অনন্তর দান অনুমোদন করিবার সময় তিনি এই গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন :

সাধুজন যেই পথে করে বিচরণ,
অসতের গম্য তাহা নহে কদাচন।
সাধু যথা করে দান, কিংবা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
অসতে সেরূপ কভু পারে না করিতে;
দান-জাত ফল তারা না পারে লভিতে।
সাধু আর অসাধুর হয় এ কারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।
ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়;
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে অনুমোদন করিয়া বর্ষার চারি মাস সেখানেই বাস করিলেন এবং বর্ষান্তে হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি; এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

---

১৮১. অসদৃশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! তথাগত যে কেবল এজন্মেই মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি শ্বেতচ্ছত্র পরিহার-পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর জঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহিষী সুপ্রসবা হইবার পর বালকের নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'অসদৃশ-কুমার'। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন মহিষী আবার অপর এক পুণ্যবান সত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিলেন। এবারও তিনি সুপ্রসবা হইলেন, এবং নামকরণ-দিবসে নবজাত পুত্রটির 'ব্রহ্মদত্ত কুমার' এই নাম রাখা হইল।

অসদৃশ-কুমার ষোড়শবর্ষে উপনীত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন

করিলেন। সেখানে তিনি এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের শিষ্য হইয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা[১] আয়ত্ত করিলেন এবং ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন, 'অসদৃশ কুমার রাজপদ এবং ব্রহ্মদত্ত কুমার ঔপরাজ্য পাইবেন।" রাজার অমাত্যেরা অসদৃশ কুমারকে রাজপদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' কাজেই ব্রহ্মদত্ত কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অসদৃশ-কুমার যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; কোন বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না।

কনিষ্ঠ রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, জ্যেষ্ঠও রাজোচিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজভৃত্যেরা ক্রমশঃ বোধিসত্ত্বকে রাজার বিরাগভাজন করিতে লাগিল; তাহারা বলিত, "অসদৃশ-কুমার রাজপদের প্রার্থী।" তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজার মন ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ভ্রাতাকে বন্দী করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্বের একজন অনুচর এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক রাজার অধিকারে চলিয়া গেলেন। তিনি তত্রত্য রাজাকে সংবাদ দিলেন, "একজন ধনুর্দ্ধর আসিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "সে কত বেতন চায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "প্রতিবৎসর লক্ষমুদ্রা।" রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ, তাহাই দেওয়া যাইবে?" তাহাকে আসিতে বল।"

অসদৃশ-কুমার রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমিই কি ধনুর্দ্ধর?" অসদৃশ কুমার বলিলেন, "হাঁ মহারাজ!" "বেশ; তুমি এখন হইতে আমার কাজে প্রবৃত্ত হও।" অসদৃশ-কুমার ধনুর্দ্ধরের পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ জানিতে পারিয়া রাজার প্রাচীন ধনুর্দ্ধরেরা অসন্তোস প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিত, "লোকটা বড় বেশী বেতন পাইতেছে।"

একদিন রাজা উদ্যানদর্শনে গেলেন। একটা আম্রবৃক্ষের মূলে মঙ্গল-শিলাপট্টের নিকট পর্দ্দা খাটান ছিল। তিনি সেখানে মহার্হ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান

---

[১]। সচরাচর বিদ্যাস্থান চৌদ্দটি বলিয়া প্রসিদ্ধ—অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। ইহার সঙ্গে উপবেদ ৪টি অর্থাৎ আয়ূর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র (কিংবা স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) যোগ করিলে ১৮টি পাওয়া যায়। 'তিন বেদ' অষ্টাদশ বিদ্যারই অন্তর্ভুত।

অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে এক থলো আম[১] দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ফলগুলি এত উচ্চে আছে যে কেহ ওখানে উঠিয়া পাড়িতে পারিবে না।' অনন্তর তিনি ধনুর্দ্ধরদিগকের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তীরধারা ছেদন করিয়া ঐ আম্রপিণ্ডতা পাড়িতে পার কি?' তাহারা বলিল, "মহারাজ! এ যে আমাদের পক্ষে বড় কঠিন কাজ তাহা নহে; আপনিও বহুবার স্বচক্ষে আমাদের শরনিক্ষেপ-নেপুণ্য দেখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি যে ধনুর্দ্ধর আসিয়াছেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা বহু অধিক বেতন পান; অতএব বোধ হয়, মহারাজ, তাঁহা দ্বারাই ফলগুলি পাড়াইতে পারিবেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অসদৃশ কুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি ঐ ফলগুলি পাড়িতে পারিবে কি?" অসদৃশ কুমার বলিলেন, "মহারাজ, যদি দাঁড়াইবার জন্য উপযুক্ত স্থান পাই তাঁহা হইলে পারিব।" "কোথায় দাঁড়াইতে চাও?" "যেখানে আপনার শয্যা রহিয়াছে।" রাজা তখনই শয্যা সরাইয়া তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের ধনু তখন তাঁহার হস্তে ছিল না; তিনি উহা পরিচ্ছদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া যাতায়াত করিতেন। কাজেই তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার জন্য একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিন। "করিতেছি" বলিয়া রাজা তখনই পর্দ্দ আনাইয়া তাহা সেখানে খাটাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্দ্দার আড়ালে গিয়া শ্বেতবর্ণ বহির্ব্বাস ত্যাগ করিলেন, রক্তবস্ত্র ও কটিবন্ধ[২] পরিধান করিলেন, আর একখানি রক্তবস্ত্র দ্ধারা পেট বান্ধিলেন, চামড়ার থলি[৩] হইতে সন্ধিযুক্ত খড়ুগ বাহির করিলেন, উহা কটিবন্ধের সহিত বামদিকে বদ্ধ করিলেন, সুবর্ণরঞ্জিত কঞ্চুক পরিধান করিলেন, পৃষ্ঠোপরি তূণীর[৪] রাখিলেন, মেষশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত মহাধনু গ্রহণ করিলেন[৫] তাহাতে প্রবালবর্ণ জ্যা আরোপণ করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ পরিধান করিলেন, তীক্ষ্ণ শরগুলি নখদ্বারা ঘূরাইতে লাগিলেন এবং পর্দ্দাটা তুলিয়া, বিদীর্ণ ভূগর্ভোত্থিত সালঙ্কার নাগকুমারবৎ

---

[১]। অম্বপিণ্ড (আম্রপিণ্ড বা আম্রস্তবক)।

[২]। মূলে 'কচ্ছং বন্ধিত্বা' আছে। 'কচ্ছ' কটিবন্ধন হইতে পারে, কাছাও হইতে পারে। শেষের অর্থে 'কোমর বান্ধিয়া' বা মালকাছা পরিয়া বুঝা যাইতে পারে।

[৩]। মূলে 'পসিব্বকতো' আছে। প্রসেবক—থলি (bag); চর্ব্বপ্রসেবক = চামড়ার ব্যাঘ্র।

[৪]। মূলে 'চাপনালি' আছে। এখনও দেখা যায় লোকে বাঁশের পাবে তীর রাখিয়া থাকে।

[৫]। ইলিয়ডে দেখা যায় গ্রিকেরা আইবেক্স্ (ibex) নামক এক প্রকার পার্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ নির্ম্মাণ করিতেন। ধনুঃ, খড়ুগ প্রভৃতি অনেক সময়ে সন্ধিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধের সময় পর্ব্বগুলি যুড়িয়া লওয়া হইত; অন্য সময়ে খুলিয়া শস্ত্রখানি ছোট করিয়া খলির মধ্যে রাখা হইত।

আবির্ভূত হইয়া শরনিক্ষেপ স্থানে গমন করিলেন। তিনি ধনুকে শরস্থাপন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! শর যখন ঊর্দ্ধে উঠিবে, তখনও ঐ আম্রপিণ্ড কাটা যাইতে পারে, আবার শর যখন নিম্নে পড়িবে তখনও কাটা যাইতে পারে। আপনি উহা কিভাবে কাটাইতে ইচ্ছা করেন বলুন।" রাজা বলিলেন, "বৎস! শর ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় লক্ষ্য কাটিয়া পাড়িয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু নিম্নে পড়িবার সময়ও যে এরূপ করিতে পারে তাহা কখনও দেখি নাই। অতএব তুমি নিম্নপাতন-ক্রমেই নৈপুণ্য প্রদর্শন কর।" "মহারাজ! এই শর অতি ঊর্দ্ধে উঠিবে; ইহা চতুর্মহারাজদিগের[১] ভবন পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে আপনিই অবতরণ করিবে; আপনাকে ইহার অবতরণ কাল পর্য্যন্ত দয়া করিয়া এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন অসদৃশ-কুমার আবার বলিলেন, "মহারাজ! এই শর ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় আম্রপিণ্ডের বৃন্তটির ঠিক মধ্যভাগ বেধ করিয়া যাইবে; আর যখন অবতরণ করিবে, তখন কেশাগ্র মাত্রও এদিকে ওদিকে না গিয়া ঠিক সেই রন্ধ্র দিয়া পড়িবে এবং পড়িবার সময় আম্রপিণ্ডটা গ্রহণ করিয়া ভূতলে আসিবে। এখন অনুগ্রহণপূর্ব্বক দেখুন।" ইহা বলিয়া অসদৃশ-কুমার সবেগে শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা আম্রপিণ্ডের বৃন্তটার ঠিক মধ্যভাগ বেধ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন যে উহা চতুর্মহারাজের ভবন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আরও একটি শর নিক্ষেপ করিলেন। এই শরটা প্রথম শরের পুঙ্খে আঘাত করিয়া উহাকে ফিরিয়া দিল এবং নিজে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ পর্যন্ত উত্থিত হইল। সেখানে দেবতারা ধরিয়া রাখিয়া দিলেন।

এদিকে প্রথম শরটা বায়ু ভেদ করিয়া পড়িবার সময় বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। সমবেত জনসঙ্ঘ তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কিসের শব্দ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যে শরটা ফিরিয়া আসিতেছে, উহা তাহারই শব্দ।" তখন সকলেরই ভয় হইল পাছে উহা তাহাদের শরীরে আসিয়া পড়ে। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে মহাভীত দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি ঐ শরটাকে ভূমিতে পড়িতে দিব না।"

পতনশীল শরটা কেশাগ্র মাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া নিম্নাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং আম্রপিণ্ডের বৃন্তটীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে কাটিল। বোধিসত্ত্ব তখন এক হস্তে শরটা এবং অপর হস্তে আম্রপিণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন। কাজেই ফলগুলি এবং শরটা ভূতলে পড়িতে পারিল না। উপস্থিত

---

[১]। চতুর্মহারাজ বৌদ্ধদিগের লোকপাল। উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ এবং পূর্ব্বে বৈশ্রবণ।

জনসঙ্ঘ এই বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং বলিল, "আমরা জীবনে কখনও এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখি নাই।" তাহারা শত মুখে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল; আনন্দের বেগে মহা কল ধ্বনি করিয়া উঠিল, অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল এবং শত শত বস্ত্রখণ্ড আকাশে দোলাইতে লাগিল। তাহারা বোধিসত্ত্বকে যে ধন দান করিল, তাহার পরিমাণ প্রায় এক কোটি হইবে। রাজাও তাঁহার উপর দান বর্ষণ করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব বিপুল ধন ও মহাযশ প্রাপ্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ রাজসম্মান ভোগ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসী রাজ্যের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। 'অসদৃশ-কুমার এখন বারাণসীতে নাই' এই সুবিধা দেখিয়া সাতজন রাজা আসিয়া ঐ নগর অবরোধ করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত কুমারকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মদত্ত কুমার মরণভয়ে ভীত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ এখন কোথায় আছেন?" এবং যখন শুনিলেন তিনি কোন সামন্তরাজের ধনুর্দ্ধর-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন দূতদিগকে বলিলেন, "দাদা না আসিলে আমার প্রাণ রক্ষার উপায় নাই, তোমরা এখনই যাও; আমার হইয়া তাঁহার পায়ে পড় গিয়া; ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" দূতেরা তাঁহার আদেশানুসারে বোধিসত্ত্বের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন সেই রাজার নিকট বিদায় লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং "কোন ভয় নাই" বলিয়া ব্রহ্মদত্তকুমাকে আশ্বাস দিলেন। তিনি একটা শরের ফলকে এই অক্ষরগুলি ক্ষোদিত করাইলেন, "আমি অসদৃশ-কুমার ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি একটি মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তোমাদের প্রাণ সংহার করিব। যাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহারা এখনই পলায়ন কর।" অনন্তর তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন উক্ত সাতজন রাজা একটা স্বর্ণপাত্রে এক সঙ্গে ভোজন করিতেছিলেন; শরটা গিয়া ঠিক সেই পাত্রের উপর পড়িল। তাঁহারা ঐ উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া সকলেই মরণভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ণ করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আততায়ী সাতজন রাজাকে দূরীভূত করিলেন; ক্ষুদ্র একটি মক্ষিকায় যে রক্তটুকু পান করিতে পারে, তাঁহাকে সে টুকু পর্য্যন্ত পাত করিতে হইল না! অনন্তর কনিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অসদৃশ কুমার সাতজন রাজাকে পরাভূত করিয়া ও সংগ্রামজয়ী হইয়া শেষে নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ

করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা দুইটী বলিলেন :

রাজপুত্র, ধনুর্দ্ধর, অসদৃশ বীরবর
দূরবেধী, অব্যর্থসন্ধান,
বজ্রসম বাণ যাঁর দেখি মহারথিগণ
প্রাণভয়ে পলাইয়া যান।
দমিলেন শত্রুগণে নাহি বধি একজনে;
ধন্য ধনুর্ব্বেদশিক্ষা তাঁর;
সোদরে নিঃশঙ্ক করি দিব্যজ্ঞান পরিশেষে
লভিলেন ছাড়িয়া সংসার।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই অনুজ এবং আমি ছিলাম সেই অগ্রজ।

---

১৮২. সংগ্রামাবচর-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির নন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর) শাস্তা যখন প্রথমে কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র নন্দকে[২] প্রব্রজ্যা দান করেন এবং তৎপরে কপিলবস্তু হইতে বাহির হইয়া যথাসময়ে শ্রবস্তীতে ফিরিয়া যান ও সেখানে অবস্থিতি করেন। আয়ুষ্মান নন্দ যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তথাগতের সঙ্গে কপিলবস্তু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী[৩] তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় অর্দ্ধবিন্যস্তকেশে বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আর্য্যপুত্র নন্দকুমার, অপিনিও শাস্তার সহিত চলিলেন। আপনি শীঘ্রই যেন ফিরিয়া আসেন।” জনপদকল্যাণীর এই কথা স্মরণ করিয়া নন্দ নিয়তবিষণ্ন থাকিতেন; কিছুতেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও রুচি দেখা যাইতনা; তাঁহার শরীর ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং ধমনিগুলি চর্ম্মের উপর ভাসিয়া উঠিল।

নন্দের এই দশা জানিতে পারিয়া শাস্তা স্থির করিলেন, ‘নন্দকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।’ তিনি নন্দের পরিবেণে গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন

---

[১]। সংগ্রাম—যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র; অবচর—বাসস্থান। সংগ্রামাবচর—যে নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে।

[২]। গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—গৌতমীর গর্ভজাত।

[৩]। এই রমণীর সহিত নন্দের বিবাহ হইবার কথা ছিল। বিবাহের রাত্রিতেই নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, এই শাসনে প্রবেশ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ ত?" নন্দ উত্তর করিলেন, "ভদন্ত, আমার চিন্তা জনপদকল্যাণীতে নিবদ্ধ; সেই জন্য আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না।" "নন্দ, তুমি কখনও হিমালয় প্রদেশে তীর্থদর্শন করিতে গিয়াছিলে কি?" "না, ভদন্ত, আমি সেখানে কখনও যাই নাই।" "তবে এখন চল না কেন?" "আমার ত ঋদ্ধিবল নাই, ভদন্ত! আমি সেখানে কিরূপে যাইব?" "আমিই তোমাকে নিজের ঋদ্ধিবলে সেখানে লইয়া যাইব।" ইহা বলিয়া শাস্তা নন্দের হস্ত ধারণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

পথে একটা দগ্ধারণ্য ছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেখানে একটা দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের উপর এক মর্কটী বসিয়া আছে। তাহার নাসিকা ও লাঙ্গুল ছিন্ন, রোম দগ্ধ, চর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, ঐ মর্কটীটা দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত!" "বেশ করিয়া দেখিয়া রাখ।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া হিমালয়, ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ মনঃশিলাতল, অনবতপ্তহ্রদ, সপ্তমহাসরোবর, পঞ্চমহানদী,[১] সুবর্ণপর্ব্বত, রজতপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত এবং শত শত রমণীয় স্থান প্রদর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, তুমি কখনও ত্রয়স্ত্রিংশস্বর্গ দেখিয়াছ কি?" নন্দ বলিলেন, "না ভদন্ত, তাহা আমি কখনও দেখি নাই।" "আচ্ছা এস, আমি তোমাকে ত্রয়স্ত্রিংশভবন দেখাইতেছি।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসনে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ শক্র উভয় দেবলোকের[২] দেবগণসহ সেখানে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সার্দ্ধদ্বিকোটি পরিচারিকা এবং পঞ্চশত কপোতপাদা[৩] অপ্সরাও আসিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তার প্রভাবে আয়ুষ্মান্ নন্দ এই পঞ্চশত অপ্সরার দিকে পুনঃ পুনঃ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে নন্দ, এই কপোতপাদা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "বল দেখি ইহারাই সুন্দরী, না জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" "জনপদকল্যাণীর তুলনায় সেই বিকলাঙ্গী মর্কটী যেরূপ, ইহাদের তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।" "এখন তবে তুমি কি

---

[১]। মনঃশিলাতল—হিমবন্তের অংশবিশেষ। সপ্ত মহাসরোবরের জন্য প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট এবং পঞ্চ মহানদীর জন্য ২৪৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। অনবতপ্ত সপ্ত মহাসরোবরেরই একটি।

[২]। অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক।

[৩]। কপোতপাদা—সংস্কৃত ভাষাতেও এই শব্দ দেখা যায়। ইহার সার্থকতা কি তাহা বুঝা যায় না।

করিতে চাও?" "বলুন ত ভদন্ত, কি কর্ম্ম করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করিতে পারা যায়?" "শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করা যাইতে পারে।" "ভগবান যদি প্রতিভূ হন, তাহা হইলে আমি শ্রমণ-ধর্ম্মই পালন করিব।" "আচ্ছা, আমি প্রতিভূ হইলাম; তুমি শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর।" দেবসঙ্ঘমধ্যে এইরূপে তথাগতের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া নন্দ বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন এখান হইতে—আমি অতঃপর শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিব।"

তখন শাস্তা তাঁহাকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন; নন্দও শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা ধর্ম্মসেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রয়স্ত্রিংশলোকে দেবগণের সভায় অপ্সরা-লাভের জন্য[১] আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে।" অতঃপর একে একে তিনি মৌদগল্যায়ন, স্থবির মহাকাশ্যপ, স্থবির অনুরুদ্ধ, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ প্রভৃতি অশীতি মহাস্থবির এবং অন্যান্য বহু ভিক্ষুকেও এই কথা জানাইলেন। ধর্ম্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্র নন্দের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নন্দ, তুমি নাকি ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে অপ্সরা লাভ করিবার ইচ্ছায় শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবসভামধ্যে দশবলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? যদি তাহা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য কি স্ত্রীভোগেচ্ছাসম্ভূত ও কামজনিত নহে? যদি তুমি শুদ্ধ রমণীর জন্য শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে তোমাতে এবং একজন বেতনভোগী ভৃত্যে কি পার্থক্য রহিল?" সারিপুত্রের কথায় নন্দ লজ্জিত হইলেন, তাঁহার কামানলও মন্দীভূত হইল। অশীতি মহাস্থবির এবং অপর সমস্ত ভিক্ষুও এইরূপে আয়ুষ্মান নন্দকে লজ্জা দিতে লাগিলেন। "আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি" ইহা ভাবিয়া নন্দের লজ্জা ও অনুতাপ জন্মিল; তিনি চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হইলেন এবং পরিশেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্ আমি আপনাকে সেই প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিতেছি।" শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, তুমি যদি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া থাক, তবেই আমি প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।"

এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমাদের বন্ধু নন্দস্থবির উপদেশগ্রহণে এমনই পটু যে একবার মাত্র উপদেশ শুনিতে পাইয়াই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রমণ-ধর্ম্ম

---

[১]। সংস্কৃত ভাষায় অপ্সরস্ ও অপ্সরা উভয় শব্দই দেখা যায়।

পালনপূর্ব্বক অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছেন।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নন্দ উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীরাজের শত্রু অপর একজন রাজার রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐ রাজার মঙ্গলহস্তীকে অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। অনন্তর ঐ রাজার ইচ্ছা হইল যে, বারাণসীরাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গলহস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক সুবৃহৎ সেনাসহ বারাণসীতে গমন করিলেন এবং নগর অবরোধ করিয়া তত্রত্য রাজার নিকট পত্র পাঠাইলেন, “হয় যুদ্ধ করুন, নয় রাজ্যত্যাগ করুন।” ব্রহ্মদত্ত উত্তর দিলেন, “যুদ্ধই করিব।” তিনি প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, গোপুর[১] প্রভৃতিতে বলবিন্যাসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অবরোধকারী রাজা বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া ও মঙ্গলহস্তীকে বর্ম্ম পরাইয়া তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ গ্রহণপূর্ব্বক উহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন, এবং নগরদ্বার ভেদ করিয়া শত্রুর প্রাণনাশ এবং তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্তীকে নগরাভিমুখে চালাইলেন। কিন্তু নগররক্ষকেরা উষ্ণ কর্দ্দম ও নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে এবং যন্ত্রবলে বড় বড় পাষাণ ছুঁড়িতেছে দেখিয়া মঙ্গলহস্তী মরণভয়ে ভীত হইয়া অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, পশ্চাৎপদ হইল। ইহা দেখিয়া গজাচার্য্য তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি বীর; যুদ্ধক্ষেত্রই তোমার বিচরণ-স্থান; এরূপ স্থান হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না।” ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি পাঠ করিলেন :

বলী তুমি, বীর্য্যবান; তব বিচরণ-স্থান
যুদ্ধক্ষেত্র, জানে সর্ব্বজনে;
তবে কেন, হে বারণ, পৃষ্ঠভঙ্গ এই ক্ষণ
দেও তুমি আসিয়া তোরণে?
কর স্তম্ভ ভূমিসাৎ অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেল,
বিলম্ব না সয়, গজবর।
মস্তক-আঘাতে তুমি ভাঙ্গি ফেল দ্বার যত,

---

[১]। অট্টালক = watch tower। গোপুর = পুরদ্বার।

পশ শীঘ্র নগর ভিতর।

মঙ্গলহস্তী গজাচার্য্যের এই কথা শুনিল; তাহাকে ফিরাইবার জন্য দ্বিতীয়বার উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইল না। সে স্তম্ভগুলি শুণ্ডদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, সেগুলি যেন অহিচ্ছত্রক[1] মাত্র, এইভাবে অবলীলাক্রমে উৎপাটিত করিল, অর্গলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তোরণ ভূমিসাৎ করিল, নগরদ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং রাজ্য অধিকার করিয়া প্রভুকে দান করিল।

[**সমবধান :** তখন নন্দ ছিল সেই হস্তী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

---

১৮৩. বালোদক-জাতক[2]

[শাস্তা জেতবনে পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। গৃহবাস করা ধর্ম্মচয্যার অন্তরায় মনে করিয়া শ্রাবস্তী নগরের পঞ্চশত উপাসক পুত্রকন্যাদিগের উপর সংসারের ভার দিয়া, শাস্তার ধর্ম্মদেশনা-শ্রবণার্থ জেতবনে অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইয়াছিলেন; কেহই পৃথগজন ছিলেন না।[3] যাহারা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা ইহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করিত। দন্তকাষ্ঠ, মুখপ্রক্ষালনের জল, গন্ধমাল্য প্রভৃতি আনিয়া দিবার জন্য ইহাদিগের পঞ্চশত বালকভৃত্য ছিল। তাহারা ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত। তাহারা প্রাতরাশের পর ঘুমাইত; তাহার পর অচিরবতী নদীর তীরে গিয়া মল্লদিগের ন্যায়[4] ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইত এবং সেই সময়ে ভয়ানক চীৎকার করিত। কিন্তু তাহাদের প্রভু সেই পঞ্চশত উপাসক অতি শান্তশিষ্ট ছিলেন; কোনরূপ গন্ধগোল করিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন।

একদিন শাস্তা সেই উচ্ছিষ্টভোজীদিগের চীৎকার শুনিয়া স্থবির আনন্দকে

---

[1]। ব্যাঙ্গের ছাতা। এক প্রকার ব্যাঙ্গের ছাতা, বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয় এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

[2]। বাল—চুল; কেশনির্ম্মিত ছাকনি দিয়া রস ছাঁকিয়া গর্দ্দভদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

[3]। অর্থাৎ সকলেই মুক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন।

[4]। তৎকালে মল্লনামে একটি জাতি ছিল। ডন ফেলা, কুস্তি করা প্রভৃতি ব্যায়ামে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। মল্লদেশের একটি নগরের নাম পাবা।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের গোল।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, উচ্ছিষ্টভোজীরা গণ্ডগোল করিতেছে।" "দেখুন, উচ্ছিষ্টভোজীরা যে এজন্মেই উচ্ছিষ্ট-ভোজনের পর এরূপ চীৎকার করে তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপই করিয়াছিল; আর এই উপাসকগণ যে শুধু এখনই এমন শান্তশিষ্ট তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও ইহারা শান্তশিষ্ট ছিল।" অনন্তর আনন্দের অনুরোধক্রমে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর, তিনি রাজার অর্থ ধর্ম্ম উভয়েরই অনুশাসকের পদে নিযুক্ত হইলেন।[১] একবার প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত পঞ্চশত অশ্ব সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন এবং চতুরক্ষৌহিণী সেনাসহ প্রত্যন্তপ্রদেশে গিয়া সেখানে শান্তিস্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া ব্রহ্মদত্ত আদেশ দিলেন, "দেখ, অশ্বগুলি বড় ক্লান্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে কিছু সরস খাদ্য, কিছু দ্রাক্ষারস দাও।" ঘোটকগুলি সুগন্ধি রস পান করিল; তাহার পর অশ্বশালায় গিয়া স্ব স্ব স্থানে নীরব হইয়া রহিল।

ঘোটকদিগকে দ্রাক্ষারস দিবার পর, বহুপরিমাণ অল্পরসযুক্ত দ্রাক্ষাফলের ছোব্‌ড়া রহিয়া গেল। উহা দিয়া কি করা হইবে, রাজভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ সমস্ত পদার্থে জল মিশাইয়া মর্দ্দিত কর এবং ছাঁকনিতে[২] ছাঁকিয়া, সেই রস, যে সকল গর্দ্দভ অশ্বের খাদ্য বহন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পান করিতে দাও।" গর্দ্দভেরা এই জঘন্য রস পান করিল; পরে উন্মত্ত হইয়া রাজাঙ্গণের সর্ব্বত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল।

রাজা মহাবাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটেই ছিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন দেখি, এই গাধাগুলি কষায় রস পান করিয়াই উন্মত্ত হইয়াছে এবং বিকট

---

[১]। অর্থাৎ কি করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজার পুণ্যসঞ্চয় হয় তিনি সেই উপদেশ দিতেন।

[২]। মূলে 'মক্‌খি পিলোতিকাহি' এই পদ আছে; কিন্তু ইহার অর্থ ভাল বুঝা যায় না। হয়ত ইহা মক্ষিকা ইত্যাদি কীট পতঙ্গ ছাঁকিয়া লইবার জন্য বস্ত্রখণ্ড। পাঠান্তরে 'মক্‌খি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মকচি' দেখা যায়। মকচি একপ্রকার শণ; ইহার পলিতা অর্থাৎ ছাঁকনি। পলিতার সাহায্যে দুধছাঁকা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

চীৎকার, ছুটাছুটি ও লাফালাফি করিতেছে। কিন্তু সৈন্ধবঘোটকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়াও নিঃশব্দে ও শান্তভাবে রহিয়াছে; কিছুমাত্র লাফালাফি করিতেছে না! ইহার কারণ কি বলুন ত?" ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিলেন :

অতি-অল্পরসযুক্ত পরিস্রুত জল,
পান করি হয় মত্ত গর্দ্দভের দল;
রসের সারাংশ কিন্তু করিয়া গ্রহণ
সিন্ধু-অশ্ব অপ্রমত্ত রয়েছে কেমন!

অতঃপর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :

নীচকুলে জন্ম যার, অল্পেই তাহার
হয়ে থাকে, নরনাথ, মস্তক-বিকার।
উচ্চবংশে জাত যেই, কুল-ধুরন্ধর,
অপ্রমত্ত, নির্ব্বিকার রহে নিরন্তর।
রসের সারাংশ যদি করে সে গ্রহণ,
তথাপি না দেখাইবে মত্ততা-লক্ষণ।

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া গর্দ্দভদিগকে অঙ্গন হইতে দূর করাইয়া দিলেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজী ছিল সেই পঞ্চশত গর্দ্দভ; এই পঞ্চশত উপাসক ছিল সেই পঞ্চশত উৎকৃষ্টজাতীয় অশ্ব; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

---

১৮৪. গিরিদন্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বিপক্ষসেবী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মহিলামুখ-জাতকে (২৬) বলা হইয়াছে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি যে কেবল এজন্মেই বিপক্ষসেবী হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে শ্যামরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার

ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বারাণসীরাজের পাণ্ডব নামে এক মঙ্গলাশ্ব ছিল; গিরিদন্ত নামে এক খঞ্জ ইহার সহিসের কাজ করিত। গিরিদন্ত যখন উহার মুখরজ্জু ধরিয়া অগ্রে অগ্রে যাইত, তখন পাণ্ডব ভাবিত, এ বুঝি আমাকে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতেছে। এই বিশ্বাসে সহিসের অনুকরণ করিতে করিতে অশ্বও খঞ্জ হইল। লোকে রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব খঞ্জ হইয়াছে।" রাজা অশ্ববৈদ্য পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা অশ্বের শরীরে কোন রোগ দেখিতে না পাইয়া রাজাকে জানাইল, 'আমরা উহার কোন রোগ দেখিলাম না।' তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, 'বয়স্য, তুমি গিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া আইস।" বোধিসত্ত্ব গিয়া বুঝিতে পারিলেন খঞ্জ অশ্বনিবন্ধিকের সংসর্গে থাকিয়াই অশ্বটা খঞ্জ হইয়াছে। সংসর্গ দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে, রাজাকে ইহা বুঝাইয়া দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

খঞ্জ গিরিদন্ত, তার সংসর্গে থাকিয়া
পাণ্ডব গিয়াছে নিজ প্রকৃতি ভুলিয়া;
তাহার চলন দেখি শিখেছে চলন;
বিনা রোগে খঞ্জ তাই হয়েছে এখন।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এখন কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবিকলাঙ্গ অশ্বনিবন্ধিক পাইলে মঙ্গলাশ্বটি পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, আবার সেইরূপ হইবে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

যেমন সুন্দর অশ্ব, অনুরূপ তার
অশ্ব-নিবন্ধিক এক দিন নিয়োজিয়া।
মুখরজ্জু ধরি সেই চালনা ইহার
করুক কয়েক দিন; তুরগমণ্ডলে
ঘুরাইয়া চক্রে চক্রে প্রদর্শন এরে
করুক সে কিরূপে মঙ্গল অশ্ব চলে।
তাহ'লে, রাজন, শীঘ্র যাইবে ভুলিয়া
মঙ্গলাশ্ব খঞ্জভাব, অনুসরি তারে।

রাজা এইরূপই ব্যবস্থা করিলেন; অশ্বও তাহার স্বাভাবিক গতি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব ইতর প্রাণীদিগেরও স্বভাব জানেন দেখিয়া রাজা অতিমাত্র বিস্মিত ও তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মহাসম্মান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই গিরিদন্ত, এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

---

১৮৫. অনভিরতি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্রাহ্মণকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালককে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে তিনি গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস, দাসী, ভূমি, সম্পত্তি, গো, মহিষ, পুত্রদ্বারাদির চিন্তায় রাগ[১] দ্বেষ, ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এই কারণে তিনি মন্ত্রসমূহ আর পরিপাটিক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন না; মধ্যে মধ্যে সেগুলি স্মরণ করিতেও সমর্থ হইতেন না। তিনি একদিন বহু গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চ্চনা করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "কিহে মাণবক, তুমি কি মন্ত্র শিক্ষা দেও? মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ আছে ত!" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, মন্ত্রগুলি পূর্ব্বে আমার কণ্ঠস্থই ছিল, কিন্তু যেদিন হইতে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইয়াছি, তদবধি আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; সেই নিমিত্ত মন্ত্রগুলিও আর আমার কণ্ঠস্থ নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, কেবল এজন্মেই নহে, পূর্ব্বজন্মেও প্রথমে চিত্তের অনাবিলতাবশত মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু রাগাদির ছায়ায় তোমার চিত্ত যখন আবিল হইয়াছিল, তখন তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারিতে না।" অনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া মন্ত্র শিক্ষা করেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়া বারাণসীনগরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুমারদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন।

এক ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের নিকট বেদত্রয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; বেদ আবৃত্তি করিবার সময় একটিমাত্র পদেও তাহার ভ্রম হইত না। তিনিও আচার্য্যের সহকারী হইয়া অন্যান্য ছাত্রদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে এই ব্যক্তি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সংসার-চিন্তায় তাঁহার

---

[১]। আসক্তি। দ্বেষ ও মোহ অগতিচতুষ্টয়ের দুইটি।

চিত্তের আবিলতা জন্মিল বলিয়া, তিনি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন।

একদিন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে মাণবক, মন্ত্রগুলি ত কণ্ঠস্থ আছে;" গুরুদেব, সংসার গ্রহণ করিবার পর হইতে আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; এখন আর আমি মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতে পারি না।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, চিত্ত আবিল হইলে কণ্ঠস্থ মন্ত্রও স্মৃতিপথে প্রকটিত হয় না; কিন্তু চিত্তের অনাবিলভাব থাকিলে কিছুতেই বিস্মরণ ঘটিতে পারে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি পাঠ করিলেন :

মীন-গুক্তি-শম্বুকাদি জলচরগণ
বারিমধ্যে করে তারা সদা বিচরণ;
বালুকা, উপলখণ্ড থাকে জলতলে;
কিন্তু কি দেখিতে কেহ পারে এ সকলে
সলিলের আবিলতা ঘটে যে সময়?
অপ্রসন্ন জলে কিছু দুষ্ট নাহি হয়।
সেইরূপ চিন্তাবিল চিত্তে মানবের,
শুভ যাহা আপনার কিংবা অপরের
প্রতিভাত নাহি হয়; সংসার চিন্তায়
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব লয় পায়।
অনাবিল সুপ্রসন্ন সলিল-ভিতর
শুক্তি, মৎস্যগণ হয় দৃষ্টির গোচর।
অনাবিল চিত্তে তথা আত্মপরহিত
সর্ব্বদা সুস্পষ্টভাবে হয় প্রতিভাত।

[শাস্তা অতীত কথার এইরূপ উপসংহার করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই মাণবক ছিল সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য]

---

১৮৬. দধিবাহন-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার সময় কুসংসর্গ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে (১৮৪) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা কুসংসর্গী ভিক্ষুকে বলিলেন, "দেখ, অসাধুর সহিত বাস পাপজনক ও

অনর্থকর। কুসংসর্গের প্রভাব যে কেবল লোক-চরিত্রের উপরি পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে। পুরাকালে অমধুর নিম্ববৃক্ষের সংসর্গে পড়িয়া দেবভোগ্য-সুমধুর ফলবিশিষ্ট অচেতন আম্রবৃক্ষও তিক্তরসযুক্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কাশীবাসী চারিজন ব্রাহ্মণ সহোদর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমাচলের পাদদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। কালসহকারে ইহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু শক্র হইয়াও তিনি মর্ত্ত্যজন্মবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাত আট দিন অন্তর এক এক বার নরলোকবাসী ভ্রাতাদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন।

একদিন শক্র জ্যেষ্ঠ তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অভিভাষণানন্তর একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি কি চাও বল।" ঐ তপস্বী তখন পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি অগ্নি চাই।" তচ্ছ্রবণে শক্র তাঁহাকে একখানি বাসী-পরশু[১] দিলেন। তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা দিয়া আমি কি করিব? কে আমার কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া দিবে?" শক্র বলিলেন, "তোমার যখন কাষ্ঠের ও অগ্নির প্রয়োজন হইবে, তখন এই কুঠারে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া বলিবে, 'কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত কর।' তাহা হইলেই কুঠার কাষ্ঠ আনয়ন করিবে ও অগ্নি জ্বালিয়া দিবে।"

জ্যেষ্ঠ তপস্বীকে বাসী-পরশু দিয়া শক্র মধ্যম তপস্বীর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও?" এই তপস্বীর পর্ণশালার নিকট দিয়া হস্তীদিগের যাতায়াতের পথ ছিল। হস্তীরা সময় সময় বড় উপদ্রব করিত বলিয়া তিনি বলিলেন, "হস্তীরা আমায় বড় দুঃখ দেয়; যাহাতে তাহারা পলাইয়া যায় তাহার উপায় করুন।" শক্র তাঁহাকে একটি ভেরী দিয়া বলিলেন, "ইহার এই তলে আঘাত করিলে তোমার শক্রগণ পলায়ণ করিবে; অপর তলে আঘাত করিলে সেই শক্ররাই পরম মিত্র হইবে এবং চতুরঙ্গসেনার পরিণত হইয়া

---

[১]। ইহা ফলক খুলিযা দণ্ডে একভাবে পরাইলে বাসীর, অন্যভাবে পরাইলে পরশুর কাজ করে বলিয়া ইহাকে বাসী-পরশু বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের সুত্রধরদিগের বা'স বাসীপরশু।

তোমায় পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে।”

মধ্যম সহোদরকে ভেরী দিয়া শক্র কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চাও বল।” এই ব্যক্তিও পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন “আমি দধি চাই।” শক্র তাঁহাকে একটা দধিভাণ্ড দিয়া বলিলেন, “যখন ইচ্ছা এই ভাণ্ড উল্টা করিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে (দধির) মহানদী নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিবে। ইহার প্রভাবে তুমি রাজ্য লাভ করিতে পারিবে।” ইহা বলিয়া শক্র অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি জ্যেষ্ঠ তপস্বী বাসী-পরশু দ্বারা আগুন জ্বালাইতেন, মধ্যম তপস্বী ভেরী বাজাইয়া হাতি তাড়াইতেন এবং কনিষ্ঠ তপস্বী মনের সুখে দই খাইতেন।

এই সময় একটা বন্যবরাহ একদিন কোন প্রাচীন গ্রামে বিচরণ করিবার সময় অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন একখণ্ড মণি পাইয়াছিল। সে মণি মুখে তুলিয়া লইবামাত্র উহার অনুভাববলে আকাশে উত্থিত হইল, এবং সমুদ্রগর্ভে একটি দ্বীপ দেখিতে পাইয়া ‘অদ্যবধি এখানেই বাস করিব’ এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক উহার এক রমণীয় অংশে উডুম্বর বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন সে মণিখণ্ড রাখিয়া তরুমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

তৎকালে কাশীরাজ্যে একজন নিতান্ত অকর্ম্মা লোক ছিল। তাহাদ্বারা সংসারের কোন উপকার হইবে না দেখিয়া তাহার মাতা পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পট্টনে[১] উপস্থিত হয় এবং সেখানে নাবিকদিগের ভৃত্য হইয়া সমুদ্র যাত্রা করে। কিন্তু সমুদ্রমধ্যে পোতভঙ্গ ঘটায় সে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঐ দ্বীপে উপনীত হয়। আহারার্থে বন্যফল অন্বেষণ করিতে করিতে সে ঐ নিদ্রিত শূকরকে দেখিতে পাইল এবং নিঃশব্দে উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া মণিখণ্ড গ্রহণ করিল। মণির ঐন্দ্রজালিক গুণে সে তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সে উডুম্বর বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, “এই মণির প্রভাবেই শূকরটা আকাশ চর হইতে শিখিয়াছে এবং তাহাতেই বোধ হয় এই দ্বীপে আসিতে পারিয়াছে। আমি অগ্রে ইহাকে মারিয়া মাংস খাইব, পরে এখান হইতে চলিয়া যাইব।” ইহা স্থির করিয়া সে একখানি ডাল ভাঙ্গিয়া শূকরের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। শূকর প্রবুদ্ধ হইয়া দেখে মণি নাই। তখন সে কম্পমানদেহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল; লোকটা বৃক্ষোপরি বসিয়া হাসিতে লাগিল। অনন্তর শূকর তাহাকে দেখিতে পাইয়া এমন বেগে মস্তক দ্বারা বৃক্ষে আঘাত করিল যে তাহাতে নিজেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন

---

[১]। বন্দর।

লোকটা অবতরণ করিয়া অগ্নি জ্বালিল, শূকরের মাংস পাক করিয়া আহার করিল এবং আকাশে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চলিয়া সেই ব্যক্তি হিমালয়ের পাদদেশস্থ পূর্ব্ববর্ণিত আশ্রমগুলি দেখিতে পাইল। তখন সে জ্যেষ্ঠ তপস্বীর আশ্রমে অবতরণ করিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিল। জ্যেষ্ঠ তপস্বী তাহার যথাযোগ্য সৎকার করিলেন; সেও নানারূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। অনন্তর সে বাসী-পরশুর গুণ জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিল, 'যেরূপে পারি ইহা হস্তগত করিতে হইবে।' সেও তপস্বীকে মণির প্রভাব দেখাইল এবং উহার সহিত বাসী-পরশুর বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিল। তপস্বীর অনেকদিন হইতেই আকাশমার্গে বিচরণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন এবং মণির পরিবর্ত্তে বাসী-পরশু দান করিলেন। লোকটা পরশু লইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই উহাতে আঘাত করিয়া বলিল, "পরশু, তুমি ঐ তপস্বীর মাথা কাটিয়া মণিখণ্ড লইয়া আইস।" পরশু তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া জ্যেষ্ঠ তপস্বীর মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক মণিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

লোকটা তখন কোন প্রতিচ্ছন্নস্থানে কুঠার খানি লুক্কায়িত রাখিয়া মধ্যম তপস্বীর কুটীরে উপস্থিত হইল। এখানেও কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া সে তাঁহার ভেরীর অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিল; মণির পরিবর্ত্তে উহা হস্তগত করিল এবং পূর্ব্ববৎ তপস্বীর শিরশ্ছেদ করাইল। সর্ব্বশেষে সে কনিষ্ঠ তপস্বীর কুটীরে গিয়া দধিভাণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিল এবং মণির বিনিময়ে দধিভাণ্ড লইয়া ঐ তপস্বীরও মস্তক ছেদন করাইল। এইরূপে সে একে একে মণি, বাসীপরশু, ভেরী ও দধিভাণ্ড এই চারিটি দৈবশক্তিসম্পন্ন পদার্থই আত্মসাৎ করিল।

অনন্তর সে আকাশে উঠিয়া বারাণসীর নিকট গমন করিল এবং 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও' এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া উহা রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজা এই আস্পর্দ্ধাসূচক কথায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, 'চোর বেটাকে বন্দী কর' বলিয়া তৎক্ষণাৎ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ভেরীর এক তল বাজাইয়া নিমিষের মধ্যে আপনাকে চতুরঙ্গবলে পরিবেষ্টিত করিল। তদনন্তর রাজা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন দেখিয়া সে দধিভাণ্ড বিপর্য্যস্তভাবে ধরিল; অমনি মহানদী নিঃসৃত হইল এবং সহস্র লোক সেই দধিস্রোতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে সে পরশুতে আঘাত করিয়া বলিল, 'রাজার মাথা কাটিয়া ফেল।' এই কথায় পরশু ছুটিয়া গেল এবং রাজার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার পাদমূলে রাখিয়া দিল,—কাহারও সাহস হইল না যে তাহাকে বাধা দেয় বা তাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে। সে বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং অভিষেককালে 'দধিবাহন' নাম

গ্রহণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন রাজা দধিবাহন নদীগর্ভে জাল ফেলিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে একটা আম্রফল আসিয়া তাঁহার জালে সংলগ্ন হইল। ঐ ফলটি দেবতাদিগের ভোগ্য; উহা কর্ণমুণ্ড হ্রদ[১] হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। উহার আকার ঘটের ন্যায় বৃহৎ; বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল। রাজভৃত্যেরা জাল তুলিয়া ফল দেখিতে পাইল এবং রাজাকে দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" অনুচরেরা বলিল, "মহারাজ, এটা আম্র ফল।" তখন রাজা ইহা ভক্ষণ করিয়া অষ্ঠিটী নিজের উদ্যানে রোপণ করিলেন এবং প্রতিদিন উহাতে দুগ্ধমিশ্রিত জলসেচন করাইতে লাগিলেন।

ক্রমে অষ্ঠি হইতে বৃক্ষ জন্মিল এবং তৃতীয় বৎসরে ঐ বৃক্ষ ফলবান হইল। রাজা বৃক্ষটির নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি উহার মূলে ক্ষীরোদক সেচন করাইতেন, কাণ্ডে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক[২] এবং শাখায় পুষ্পমাল্য পরাইতেন। তিনি রেশমীবস্ত্রের পর্দ্দা দিয়া উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং রাত্রিকালে উহার মূলে গন্ধ তৈলের প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহার ফলগুলি অতীব মধুর হইয়াছিল। অন্য রাজাদিগকে এই ফল উপহার পাঠাইবার সময়, পাছে তাঁহারা অষ্ঠিরোপণপূর্ব্বক বৃক্ষ জন্মান এই আশঙ্কায়, রাজা দধিবাহন অষ্ঠিগুলিকে অঙ্কুরোদগমস্থানে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আম্র ভোজন করিয়া অষ্ঠি রোপণ করিতেন বটে; কিন্তু তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিত না। ইহার কারণ কি জানিবার জন্য তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন একজন রাজা নিজের উদ্যানপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন উপায়ে দধিবাহনের আম্রফল বিরস ও তিক্ত করিতে পার কি?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, আমি এরূপ করিতে পারি।" তাহা শুনিয়া ঐ রাজা তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া এই কার্য্য সাধন কর।" সে বারাণসীতে গিয়া দধিবাহনকে জানাইল, 'একজন সুনিপুণ উদ্যানপাল আসিয়াছে।' দধিবাহন তাহাকে ডাকাইলে সে তাঁহার সমীপে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। দধিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি

---

[১]। হিমবন্ত দেশস্থ সপ্ত মহাসরোবরের অন্যতম।

[২]। গন্ধপঞ্চঙ্গুলিক শব্দের অর্থ কি তৎসম্বন্ধে মতবেদ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার "সুবাসিত পঞ্চপল্লবযুক্ত মাল্য" এই ব্যখ্যা করেন। নন্দিবিলাস জাতকে (২৮সংখ্যক) "গন্ধেন পঞ্চঙ্গুলিকং দত্বা' এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয় চন্দনাদির দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ দেওয়া। মৃতকভক্ত-জাতকে (১৮) ছাগকে "মালাং পরিক্খিপিত্বা পঞ্চাঙ্গুলিকং দত্বা মণ্ডেত্বা" আনিবার কথা আছে। সেখানে ইংরেজী অনুবাদক 'একমুষ্টি খাবার দিয়া' এই অর্থ করিয়াছেন। ইহাও সমীচীন নহে।

উদ্যানপাল?” সে হ্যাঁ মহারাজ,” এই উত্তর দিয়া নিজের নৈপুণ্যখ্যাপনে প্রবৃত্ত হইল। দধিবাহন বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি আমার উদ্যানপালের সহকারী হও।” তদবধি এই দুই ব্যক্তি দধিবাহনের উদ্যানের রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

নূতন উদ্যানপালের কৌশলে অকালপুষ্প ও অকালফল জন্মিয়া রাজোদ্যানের পরম রমণীয়তা সম্পাদন করিল। ইহাতে দধিবাহন পরমপ্রীতি লাভ করিয়া প্রথম উদ্যানপালকে কার্য্যচ্যুত করিলেন এবং নবাগত ব্যক্তির উপর উদ্যানের সমস্ত ভার দিলেন। সে উদ্যান সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে পাইবামাত্র পূর্ব্বকথিত আম্রতরুর চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ ও অগ্রবল্লী[১] রোপণ করিল।

যথাকালে নিম্ববৃক্ষগুলি বড় হইয়া উঠিল; তাহাদের মূলের সহিত আম্রতরুর মূল এবং শাখার সহিত আম্রতরুর শাখা সংলগ্ন হইল। এইরূপে নিম্বসংসর্গে পড়িয়া সেই মধুর আম্র নিম্বপত্রসদৃশ তিক্ত হইয়া উঠিল। উদ্যানপাল যখন দেখিল আম্রফল তিক্তরসাপন্ন হইয়াছে, তখন সে ঐস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর দধিবাহন একদিন উদ্যানে গিয়া আম্র মুখে দিয়া দেখিলেন উহার রস নিম্বরসের ন্যায় তিক্ত। তিনি উহা গলাধঃকরণে অসমর্থ হইয়া “থু থু” করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই সময় বোধিসত্ত্ব দধিবাহনের ধর্ম্মার্থানুশাসক[২] ছিলেন। দধিবাহন তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “পণ্ডিতবর, এই বৃক্ষের পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন করা হইত, এখনও সেইরূপ করা হইতেছে; অথচ ইহার ফল তিক্ত হইল কেন?” ইহা বলিয়া তিনি প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :

সুরস, সুগন্ধি ছিল এই আম্র ফল;
কাঞ্চনের মত ছিল বরণ উজ্জ্বল।
পূর্ব্বাপর হইতেছে সমান যতন;
তবু তিক্ত হ'ল ফল, না বুঝি কারণ।

বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়া ইহার কারণ বুঝাইয়া দিলেন :

নিম্ব-পরিবৃত, নৃপ, তরু-সহকার।
নিম্ব-মূলে এর মূল, নিম্বশাখে এর শাখা,
সংযুক্ত হইয়া এবে ঘটায় বিকার!

---

[১]। পাঠান্তর “পগ্গ-বল্লী।” পালি অভিধানে ইহার কোন শব্দেরই উল্লেখ নাই। ইংরেজী অনুবাদক ইহার অর্থ শুদ্ধ “লতা” ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় ইহা গুলঞ্চ বা তৎসদৃশ কোন তিক্তরসযুক্ত শঙ্কা হইবে।

[২]। অর্থাৎ তিনি একাধারে গুরু পুরোহিত ও মন্ত্রীর কাজ করিতেন।

জগতের এই রীতি জানিবে, রাজন,
অসৎ সংসর্গে হয় সতের পতন।

এই কথাগুলি শুনিয়া রাজা সমস্ত নিম্ববৃক্ষ ও অগ্রলতা ছেদন করাইলেন, তাহাদের মূল উৎপাটিত করাইয়া ফেলিলেন, চতুর্দ্দিকের দূষিত মৃত্তিকা তুলাইয়া মধুর মৃত্তিকা দেওয়াইলেন এবং উহাতে ক্ষীরোদক, শর্করোদক ও গন্ধোদক সেচন করাইলেন। তরুবর এই সমস্ত মধুর রস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার মধুর ফল দান করিতে আরম্ভ করিল। দধিবাহন সেই পুরাণ উদ্যানপালকে পুনরায় উদ্যানের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞ এই জাতকের সহিত গ্রীম ভ্রাতদ্বয়ের সঙ্কলিত জার্ম্মাণ উপাখ্যানাবলীর The Table, the Ass and the Stick এবং The Knapsack, the Hat and the Horn (৩৬ ও ৫৪ সংখ্যক গল্প) এই আখ্যারিকদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে। টেবল পাতিয়া আদেশ করিবামাত্র উহা নানাবিধ ভোজ্য সুশোভিত হইত, কেহ ঐন্দ্রজালিক শব্দবিশেষ উচ্চারণ করিবামাত্র গর্দ্দভ সুবর্ণমুদ্রা উদগিরণ করিত। যষ্টিকে আদেশ দিবামাত্র উহা থলি হইতে বাহির হইয়া আদেষ্টার শত্রুদিগকে প্রহার করিত; ঝোলায় আঘাত করিবামাত্র সশস্ত্র যোদ্ধা আবির্ভূত হইত, টুপিতে চাপ দিলে কামানের গোলা ছুটিত, শৃঙ্গনিনাদ করিলে দুর্গপ্রাকারাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইত।

----

১৮৭. চতুর্মৃষ্ট-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন নাকি অগ্র শ্রাবকদ্বয়[২] উপবেশন করিয়া পরস্পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর দিতেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তৃতীয় আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "ভদন্তদ্বয়, আমারও আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনাদেরও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" স্থবিরদ্বয় বৃদ্ধের এই কথায় বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহাদের মুখে

১। শরীর, জাতি, স্বর, গুণ এই চারি বিষয়ে মার্জিত, শুদ্ধ ও সুন্দর।

২। সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়ন।

ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য বসিয়াছিল তাহারাও সভাভঙ্গ হইল বলিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা যে অসময়ে আসিলে?" তাহারা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন যে কেবল এখনই এই ব্যক্তির উপর বিরক্ত হইয়া এবং কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, অতীতজন্মেও তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আরণ্যপ্রদেশে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইটি হংসপোতক চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে চরায় যাইবার সময় ঐ বৃক্ষে বিশ্রাম করিত এবং ফিরিবার সময়েও সেখানে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া চিত্রকূটে যাইত। কিয়ৎকাল এইরূপে অতীত হইলে বোধিসত্ত্বের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল; যাইবার ও আসিবার সময় তাহারা পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ করিত এবং বোধিসত্ত্বের সহিত ধর্ম্মকথা বলিয়া কুলায়ে ফিরিয়া আসিত।

একদিন হংসপোতকদ্বয় বৃক্ষাগ্রে বসিয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময় এক শৃগাল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিম্নলিখিত গাথায় সম্বোধন করিল :

উচ্চ তরুশাখে বসি কি আলাপ সঙ্গোপনে
করিতেছ তোমরা দুইজন;
নামি এস তরুতলে; মধুর আলাপ কর,
মৃগরাজ করুক শ্রবণ।

এই কথা শুনিয়া হংসপোতকদ্বয় অত্যন্ত ঘৃণার সহিত সেস্থান হইতে উত্থিত হইয়া চিত্রকূটে চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

সুপর্ণ সুপর্ণসনে, দেবসঙ্গে দেবগণে
সদালাপ করে চমৎকার;
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি; কি কাজে আসিলে হেথা?
পশ গিয়া বিবরে তোমার।

[**সমবধান :** তখন এই বৃদ্ধ ছিল সেই শৃগাল; সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন সেই হংসপোতকদ্বয় এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

১৮৮. সিংহক্রোষ্টুক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন বহু বিজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মকথা বলিতেছেন দেখিয়া কোকালিকও নাকি ধর্ম্মকথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে[২] বলা হইয়াছে। শাস্তা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই কথা বলিতে গিয়া নিজের বিদ্যা ধরা দিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে নিজের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ঔরসে এক শৃগালীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। এই শাবকটি অঙ্গলি, নখ, কেশর, বর্ণ ও আকার এইগুলির সম্বন্ধে পিতৃসদৃশ, কিন্তু রবে মাতৃসদৃশ হইয়াছিল।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ নিনাদ করিয়া সিংহকেলি করিতেছিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের শৃগালীগর্ভজাত শাবকটি তাহাদের মধ্যে গিয়া নিনাদ করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু সে সিংহনাদ করিতে পারিবে কেন? তাহার মুখ হইতে শৃগাল-রব নির্গত হইল। তাহার শব্দ শুনিয়া সিংহগণ তৎক্ষণাৎ নীরব হইল। বোধিসত্ত্বের সিংহীগর্ভজাত আর এক পুত্র ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহ বর্ণাদিতে আমাদেরই মত; কিন্তু ইহার শব্দ অন্যরূপ। এ কে, বলুন ত।" এই প্রশ্ন করিবার সময় সে নিম্নলিখিত গাথাটি বলিল :

আকার, নখর, চরণ ইহার সকলি সিংহের ন্যায়;
কণ্ঠস্বর কেন সিংহের সমাজে অন্যরূপ শুনা যায়?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন "বৎস, তোমার এই ভ্রাতা শৃগালীর গর্ভজাত;—দেখিতে আমার মত, কিন্তু শব্দে মাতার ন্যায়।" অনন্তর তিনি শৃগালীপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছাধন, তুমি যতদিন এখানে থাকিবে, বেশী ডাক হাঁক করিও না; তুমি ফের যদি ডাকিবে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে শেয়াল বলিয়া জানিবে।" এই উপদেশ দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

---

[১]। ক্রোষ্টু, ক্রোষ্টুক—শৃগাল।

[২]। দর্দ্দর-জাতক (১৭২)। কোকালিক-সম্বন্ধে ১১৭, ১৮৯ এবং ৪৮১ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

নিনাদে তোমার নাহি প্রয়োজন,
অল্পস্বর হয়ে থাক, বাছাধন।
নিনাদ তোমার করিলে শ্রবণ
বুঝিবে কে তুমি, হেথা সর্ব্বজন।
সিংহতুল্য বটে দেহের আকার,
পিতৃস্বর কিন্তু না আছে তোমার।

এই উপদেশ শুনিবার পর সেই শৃগালশাবকের পুনর্ব্বার কখনও নিনাদ করিতে সাহস হয় নাই।

[**সমবধান :** তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগালী-পোতক, রাহুল ছিল সেই সিংহশাবক এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

☞ চুল্লবগ্গে কাকের ঔরসে এবং কুক্কুটীর গর্ভে জাত একটি পক্ষীর সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প আছে।

---

১৮৯. সিংহচর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিক এই সময়ে স্বরসংযোগে ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কর্ষককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে এক বণিক একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া পণ্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সে যেখানে যাইত, সেখানে বোঝা নামাইয়া গাধাটাকে একখানা সিংহচর্ম্ম পরাইত এবং লোকের ধান, যব প্রভৃতির ক্ষেতে ছাড়িয়া দিত। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত না।

একদিন এই বণিক কোন গ্রামদ্বারে বাসা লইয়া প্রাতরাশ পাক করিবার সময় গর্দ্দভকে সিংহচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিল না, গ্রামের ভিতর গিয়া লোকজনকে সংবাদ দিল। গ্রামবাসীরা নানানরূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বিকট কোলাহল করিতে লাগিল।

গর্দ্দভ তখন প্রাণভয়ে ডাকিয়া উঠিল। তখন সে যে (সিংহ নহে), গর্দ্দভ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

এ নহে সিংহের নাদ, অথবা ব্যাঘ্রের,
অথবা দ্বীপীর; কিবা ভয় আমাদের?
সিংহচর্ম্মে বটে মূর্খ দেহ আবরিল,
স্বরে কিন্তু শেষে আত্ম-পরিচয় দিল।

গ্রামবাসীরা যখন দেখিল সে গর্দ্দভ, তখন তাহারা প্রহার দ্বারা তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিল এবং সিংহচর্ম্মখানি লইয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সেই বণিক্ আসিয়া গর্দ্দভের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

সিংহচর্ম্ম পরি পাইতে খাইতে
কাঁচা যব চিরদিন;
করিলে নিনাদ, হল পরমাদ,
তুমি বড় বুদ্ধিহীন।

বণিকের কথা শেষ হইতে না হইতেই গর্দ্দভ প্রাণত্যাগ করিল; বণিক্ তাহাকে সেইখানেই ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন কোকালিক ছিল সেই গর্দ্দভ, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ষক।]

☞ তন্ত্রাখ্যায়িকায় দ্বীপিচর্ম্মের এবং পঞ্চতন্ত্রে (লব্দপ্রণাশ তন্ত্রে) ব্যাঘ্রচর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয় প্রথম গ্রন্থখানি কাশ্মীর বা তন্নিকটস্থ কোন অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণস্থ কোন স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই জাতকের প্রথম গাথাটীতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপী এই তিন প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রের গর্দ্দভ রজকপালিত—বণিকের নহে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে এই আখ্যায়িকার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

---

১৯০. শীলনিশংস-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শ্রদ্ধাবান উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় এই উপাসক একজন অতি ভক্তিশ্রদ্ধাবান আর্য্যশ্রাবক ছিলেন। একদিন তিনি জেতবনে যাইবার সময় অচিরবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন পারঘাটে নৌকা নাই; কারণ তখন পাটনি ধর্ম্মকথা শুনিতে

---

[১]। আনিশংস = সুফল।

গিয়াছিল এবং যাইবার পূর্ব্বে খেয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধচিন্তায় উপাসকের মনে এমনই স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইয়াছিল তিনি নৌকার অপেক্ষা না করিয়া নদীতে অবতরণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহার পাদদ্বয় জলে মগ্ন হইল না; যেন ভূপৃষ্ঠেই হাঁটিতেছেন এইভাবে তিনি নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখানে তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ মন্দীভূত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদদ্বয়ও জলমগ্ন হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ আবার দৃঢ় করিলেন এবং জলপৃষ্ঠের উপর দিয়াই চলিয়া নদী অতিক্রম করিলেন।[১]

উপাসক জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা তাঁহার সহিত মধুরবচনে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, আসিবার সময় পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?" উপাসক বলিলেন, "ভদন্ত, বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দে আজ আমি উদকপৃষ্ঠে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছি এবং লোকে যেমন শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া চলিয়া যায়, সেইভাবে নদী পার হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, বুদ্ধগুণ ধ্যান করিয়া কেবল তুমিই যে একা রক্ষা পাইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রগর্ভে ভগ্নপোত হইয়াও বুদ্ধগুণস্মরণদ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় কোন স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক এক সঙ্গতিপন্ন নাপিতের সহিত পোতারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যাত্রার সময় নাপিতের ভার্য্যা তাহার স্বামীকে উপাসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিল, "আর্য্য, আপনি সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় আমার স্বামীর ভার গ্রহণ করিবেন।"

সপ্তম দিবসে তাঁহাদের পোতখানি সমুদ্রগর্ভে ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা দুই জনে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া একটি দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নাপিত সেখানে কয়েকটা পাখী মারিয়া রন্ধন করিল এবং আহার করিবার সময় উপাসককে তাহার এক অংশ দিল। উপাসক বলিলেন, "আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।" তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এখানে ত্রিশরণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অবলম্বন নাই।' অনন্তর তিনি ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উপাসক যখন বারংবার ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন, তখন ঐ

---

[১]। এই উপাসকের পদব্রজে নদী পার হওয়া এবং সেন্ট পিটারের পদব্রজে গ্যালিলী হ্রদ পার হওয়া, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

দ্বীপে জাত নাগরাজ নিজের দেহকে মহানৌকায় পরিণত করিলেন। এক সমুদ্রদেবতা উহার নিয়ামক হইলেন এবং উহা সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ হইল। উহার মাস্তুল তিনটি[১] ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা, বাতপট্টদণ্ড[২] সুবর্ণদ্বারা, রজ্জুগুলি রৌপ্যদ্বারা এবং ফলকগুলি সুবর্ণ দ্বারা গঠিত হইল। সমুদ্রদেবতা উহাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ জম্বুদ্বীপে যাইতে চাও কি?" উপাসক বলিলেন, "আমরা জম্বুদ্বীপে যাইব।" "তবে এস, এই পোতে আরোহণ কর।" উপাসক পোতে উঠিয়া নাপিতকে ডাকিলেন। সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "তুমি আসিতে পার; কিন্তু ও আসিতে পারিবে না।" "কেন, ইহার কারণ কি?" "ও ত শীলগুণসম্পন্ন নয়; কাজেই উহাকে উঠিতে দিব না। আমি এ নৌকা তোমারই জন্য আনিয়াছি, উহার জন্য নহে।" "যদি তাহাই হয় তবে আমি যে দান করিয়াছি, যে শীল রক্ষা করিয়াছি, যে ধ্যানবল লাভ করিয়াছি, সে সমুদয়ের ফল ইহাকে দান করিলাম।" নাপিত বলিল, "স্বামিন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার এই দান গ্রহণ করিলাম।" তখন সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "এখন আমি উহাকে নৌকায় তুলিতে পারি।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই নৌকায় তুলিলেন এবং সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি নিজের অনুভাব-বলে তাঁহাদের উভয়েরই গৃহে ধন স্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "পণ্ডিতদিগের সংসর্গে থাকাই কর্ত্তব্য; যদি এই নাপিত এই উপাসকের সংসর্গে না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিত ইহার বিনাশ ঘটিত।" পণ্ডিতসংসর্গের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে সমুদ্রদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি পাঠ করিলেন :

দেখ কি আশ্চর্য্য ফল লভেন তাঁহারা,
শ্রদ্ধা-শীল-ত্যাগে হন অলঙ্কৃত যাঁরা।
নাগরাজ নৌকারূপ করিয়া ধারণ—
শ্রদ্ধাবান উপাসকে করেন বহন।
সাধুর সঙ্গেতে বাস, মৈত্রী সাধুসহ,
বুদ্ধিমান যারা, তারা করে অহরহ।
সাধুসঙ্গে ছিল, তাই বিষম সঙ্কটে
নাপিতের পরিত্রাণ অনায়াসে ঘটে।

---

[১]। কূপক। ইহাতে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে এদেশেও বড় বড় জাহাজে তিনটা মাস্তুল থাকিত।

[২]। মূলে 'লকার' (পাঠান্তর লঙ্কার)। Cowell সাহেব এই শব্দটিকে লঙ্গর (নঙ্গর) শব্দের সহিত একার্থক মনে করেন। কিন্তু ইহা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। পর্য্যায়ক্রমে মাস্তুলও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের উল্লেখই অধিক সঙ্গত।

সমুদ্রদেবতা আকাশে থাকিয়া এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সকলকে উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজকে লইয়া নিজের বিমানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক সকৃদাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন সেই স্রোতাপন্ন উপাসক পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্র-দেবতা।]

---

১৯১. রুহক-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার পূর্ব্বতন পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদবলম্বনে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রতুৎপন্ন বস্তু অষ্টম নিপাতে ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বকালেও তুমি ইহারই চক্রান্তে রাজাধিষ্ঠিত সভার মধ্যে লজ্জা পাইয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল এবং তিনি স্বয়ং রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

রুহক নামক এক ব্যক্তি বোধিসত্ত্বের পুরোহিত ছিলেন। এক প্রাচীনা রমণী রুহকের ব্রাহ্মণী ছিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব পুরোহিতকে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ সজ্জাসহ একটি অশ্ব দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে অলঙ্কৃত অশ্বের পৃষ্ঠে যাইতে দেখিয়া যেখানে সেখানে লোকে বলিতে লাগিল, "বা, ঘোড়াটার কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর সাজসজ্জা! ফলতঃ তাহারা অশ্বেরই প্রশংসা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক ভার্য্যাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের অশ্বটি অতি সুন্দর হইয়াছে। পথের দুই ধারে লোকে কত যে ইহার প্রশংসা করিয়াছে তাহা কি বলিব?" ব্রাহ্মণী অতি নির্লজ্জা ও ধূর্ত্তস্বভাবা ছিলেন। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, কি জন্য যে অশ্বটির এরূপ

শোভা হইয়াছে তাহা আপনি জানেন না। রাজা যে সাজসজ্জা দিয়াছেন তাহাই ইহার শোভার কারণ। আপনি যদি এইরূপ শোভাসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিজে অশ্বের সজ্জা পরিধান করিয়া এবং অশ্বের ন্যায় পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে পথ চলিয়া রাজার সহিত দেখা করিবেন। তাহা হইলে রাজাও আপনার প্রশংসা করিবেন, অপর সকলেও আপনার প্রশংসা করিবে।"

ব্রাহ্মণ মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যার বচনানুসারে তাহাই করিলেন; ঐ দুষ্টা রমণী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে এই অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন তাহা বুঝিলেন না; ব্রাহ্মণীর কথাই তাহার বেদমন্ত্র হইল। পথে যে যে তাঁহাকে দেখিল, সকলেই পরিহাসপূর্ব্বক বলিল, "কি চমৎকার! আচার্য্যের কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে!" "আপনার কি পিত্ত কুপিত হইয়াছে? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন?" ইত্যাদি বলিয়া রাজাও তাঁহাকে লজ্জা দিলেন। তখন ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল যে তিনি অতি অযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত লজ্জা পাইয়া ব্রাহ্মণীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। 'এই রমণীই আমাকে আজ রাজা ও সেনার সম্মুখে লজ্জা দিল; যাই, এখনই গিয়া ইহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিই; এই চিন্তা করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ধূর্ত্তা ভার্য্যাও বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন; কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই তিনি খিড়ুকির দরজা দিয়া পলায়ণপূর্ব্বক রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং চারি পাঁচ দিন সেই খানে অতিবাহিত করিলেন। এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, স্ত্রীলোকেরা নিয়তই দোষ করিয়া থাকে; আপনি ব্রাহ্মণীর অপরাধ ক্ষমা করুন।" ক্ষমা প্রার্থনার্থ রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :

জ্যা যদি ছিঁড়িয়া যায়, ঘোড়া তারে লোকে দেয়,
কভু নাহি ত্যাজে শরাসন;
প্রাচীনা ভার্য্যার দোষ ক্ষম তুমি, বিপ্রবর,
ক্রোধবশ হও না কখন।

ইহা শুনিয়া রুহক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

থাকে যদি উপাদান[১] যে করে জ্যার নির্ম্মাণ
থাকে যদি হেন লোক আর,
জীর্ণ জ্যারে পরিহরি নব জ্যা পাইতে পারি,
অনায়াসে আমি পুনর্ব্বার।

---

[১]। পাঠান্তরে 'মূদূসু' এই শব্দ আছে। 'মূদূ' শব্দের অর্থ উদ্ভিজ্জের টাটকা ছাল। তদ্বারা ধনুর ছিলা প্রস্তুত হইত।

প্রাচীনা ব্রাহ্মণী, মোর অতি দুষ্টমতি,
লভেছি তাহার তরে অশেষ দুর্গতি।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণীকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই প্রলুব্ধ ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই রমণী ছিল সেই রমণী, এই ভিক্ষু ছিল রুহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ, ৬) দেখা যায় রাজা মন্দ তাঁহার ভার্য্যার মনস্তুতির জন্য তাঁহাকে নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সচিব বররুচিও পত্নীর আদেশে নিজের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন।

---

১৯২. শ্রীকালকর্ণী-জাতক

এই শ্রীকালকর্ণী-জাতক মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৩৮) প্রদত্ত হইবে।

১৯৩. চূল্লপদ্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু উন্মদন্তী—জাতকে-(৫২৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভগবান। আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" ইহাতে শাস্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার উৎকণ্ঠার হেতু কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "ভদন্ত, আমি নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া ক্লেশভাবাপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" অনন্তর শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভিক্ষু, রমণীরা অকৃতজ্ঞা এবং মিত্রদ্রোহিণী; পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় আপনাদের দক্ষিণ জানু হইতে রক্ত বাহির করিয়া স্ত্রীদিগকে পান করাইয়াছিলেন; তাহাদিগকে চিরজীবন কত উপহার দান করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাদের মন পান নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাকরণ-দিবসে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার "পদ্মকুমার" এই

নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্বের ছয়টি কনিষ্ঠভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সাতজন রাজকুমার ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক রাজার সহচররূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন কুমারেরা বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হইল, "ইহারা ত আমাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পারে!"[১] এই আশঙ্কায় তিনি কুমারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগের এই নগরে বাস করা হইবে না; এখন তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাও; আমার মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া পিতৃ-পৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।"

কুমারেরা পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং "চল, যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাউক" ইহা বলিয়া স্ব স্ব ভার্য্যা সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অন্ন, পানীয় কিছুই পাওয়া যাইত না। কুমারেরা ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, 'আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভার্য্যার অভাব হইবে না।' অনন্তর তাঁহারা কণিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস তের অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক জনে এক এক ভাগ লইলেন। বোধিসত্ত্ব নিজেও তাঁহার ভার্য্যা যে দুইভাগ পাইলেন তাহার একভাগ রাখিয়া দিয়া তাঁহারা দুইজনে একভাগ মাত্র আহার করিলেন।

এইরূপে ছয় দিনে ছয় জন স্ত্রীর প্রাণবধ দ্বারা কুমারদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন এক একভাগ সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়ভাগ রাখিয়া দিলেন। সপ্তম দিনে প্রস্তাব হইল, 'আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণবধ করা যাউক।' তখন বোধিসত্ত্ব অনুজদিগকে পূর্ব্বসঞ্চিত ছয় ভাগ দিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা এই ভাগগুলি খাও, ইহার পর কি কর্ত্তব্য, তাহা কল্য স্থির করা যাইবে।" অনন্তর অনুজগণ মাংসভোজনান্তে যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ভার্য্যাকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইবার পর বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন, আমি ত আর চলিতে পারিতেছি না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন এবং অরুণোদয়-কালে সেই ভীষণ কান্তার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্যোদয় হইলে

---

[১]। পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজ্যলোভবশতঃ পুত্রকর্ত্তৃক পিতার প্রাণবধ নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ছিল বলিয়া মনে হয় না। 'বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু এইরূপ রোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ রমণী বলিলেন, "স্বামীন, বড় পিপাসা পাইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে কোথাও জল নাই।" কিন্তু রমণী পুনঃপুনঃ পিপাসার কথা বলায় শেষে তিনি খড়্গ দ্বারা নিজের দক্ষিণ জানুতে আঘাত করিয়া বলিলেন, "জল যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বসিয়া আমার দক্ষিণ জানুর রক্ত পান কর।" রমণী তাহাই করিলেন।

অবশেষে স্বামী স্ত্রী দুইজনে মহানদীর গঙ্গার তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা গঙ্গার জল পান করিলেন, গঙ্গাজলে স্নান করিলেন, নানাবিধ ফল আহার করিলেন, একটি মনোরম স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং নদী-নিবর্ত্তনস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উপরি গঙ্গাতটে রাজদ্রোহাপরাধে এক দস্যুর হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করা হইয়াছিল এবং লোকে তাহাকে একটা ডোঙ্গায় তুলিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটা বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এবং ভাসিতে ভাসিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রমসন্নিকটে উপনীত হইল।

বোধিসত্ত্ব তাহার করুণ স্বর শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আমি জীবিত থাকিতে এই দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ হইতে দিব না। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া লোকটাকে উপরে তুলিলেন, তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া ক্ষতস্থানগুলি কাষায় ক্বাথ দ্বারা[১] ধৌত করিলেন এবং সেই সেই অংশে ব্রণোপশমক প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা হইতে এ আবার কি আপদ তুলিয়া আনিল! এখন এই অলস ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে!' ঐ লোকটাকে তিনি এত ঘৃণা করিতে লাগিলেন, যে তাহাকে যখন দেখিতেন, তখনই "ছ্যা ছ্যা" করিয়া থুৎকার ফেলিতেন।

ক্রমে লোকটার ক্ষতগুলি যখন শুকাইতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের ভার্য্যা সহিত আশ্রমে রাখিয়া ফলমূল সংগ্রহার্থ পুনর্ব্বার বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি নিজের ভার্য্যা এবং সেই উপায়হীন ব্যক্তির পোষাণ করিতে লাগিলেন।

একত্রবাস-নিবন্ধন বোধিসত্ত্বের পত্নী ক্রমে সেই ছিন্নাঙ্গ লোকটার প্রণয়াসক্ত হইলেন, তাহার সহিত অনাচার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ একদিন এইরূপ বলিলেন : "স্বামীন, আমি যখন আপনার স্কন্ধে উপবেশন করিয়া কান্তার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন ঐ পর্ব্বত দেখিয়া মানত করিয়াছিলাম, আর্য্যে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রি দেবতে![২] যদি আমার স্বামী ও আমি নিরাপদে ও

---

[১]। মূলে 'ধোপন' (Lotion). এবং 'লেপন' (ointment) এই দুই শব্দ আছে।

[২]। মূলে 'পর্ব্বতে নিব্বত্ত-দেবতে' এই পদ আছে। ইহার প্রকৃত অর্থ যিনি পর্ব্বতে

বিনারোগে জীবিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আপনাকে পূজা দিব। পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এখন আমায় ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে।” বোধিসত্ত্ব তাঁহার ভার্য্যার মায়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানাইলেন এবং পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি চারিটা বৃহৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।

পর্ব্বতশিখরে গিয়া বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, “স্বামীন, আমাদের আবার দেবতা কি? স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান দেবতা। আমি প্রথমে আপনাকে বনপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিব। তৎপরে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব।” ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রপাতের অভিমুখে স্থাপন করিয়া বনপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বন্দনা করিবার ছলে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে প্রপাতে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর “আজ আমার শত্রুর শেষ হইল”[১] এই ভাবিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে তিনি সেই অকর্ম্মা লোকটার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ব্বত হইতে প্রপাতাভিমুখে পতিত হইবার সময় এক উড়ুম্বর বৃক্ষের মস্তকস্থিত পত্রসমাচ্ছন্ন অকণ্টক গুল্মের উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সেখান হইতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারিলেন না; কাজেই উড়ুম্বর ফল খাইয়া ঐ বৃক্ষেরই শাখান্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক বৃহৎকায় গোধারাজ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আরোহণ করিয়া ঐ উড়ুম্বর বৃক্ষের ফল খাইত। সে উক্ত দিবসে বোধিসত্ত্বেকে দেখিয়া পলায়ণ করিল এবং পরদিন আসিয়া একপার্শ্ব হইতে ফল খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করায় বোধিসত্ত্বের সহিত শেষে তাহার বন্ধুত্ব জন্মিল। সে একদিন জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি হেতু এমন স্থানে আসিয়াছ?” বোধিসত্ত্ব তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। গোধারাজ বলিল, “আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নাই।” সে বোধিসত্ত্বকে নিজের পৃষ্ঠোপরি লইয়া অবতরণ করিল, অরণ্যের বাহিরে গিয়া তাঁহাকে এক রাজপথে নামাইয়া দিল এবং বলিল “তুমি এই পথে চলিয়া যাও।” অনন্তর সে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিল।

বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে গিয়া বাস কলিেন এবং কিয়ৎকাল পরে জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি বারাণসীতে গিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং “পদ্মরাজ” এই উপাদি লইয়া দশবিধ রাজধর্ম পালনপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের

দেবতারূপে পুনর্জ্জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

[১]। মূলে ‘আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিলাম’ এই ভাব আছে।

দ্বারচতুষ্টয়ে, মধ্যভাগে এক প্রাসাদ সমীপে ছয়টি দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দান করিতেন।

এদিকে সেই পাপিষ্টা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটকে স্কন্ধে অরণ্য হইতে বর্হিগত হইল এবং লোকালয়ে ভিক্ষা করিয়া যবাগূ, অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্ব তাহার পোষণ করিতে লাগিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'বাছা, এ লোকটা কে হয়!" তাহা হইলে সে বলিত, "আমি ইহার মামাত বোন, ইনি আমার পিষতুত ভাই। বাপ মা ইহারই সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়-স্বজনেরা ইহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।[১] কিন্তু তাঁহারা উৎপীড়নই করুন, আর ইহাকে মারিবারই ব্যবস্থা করুন, আমি নিজের স্বামীকে কিরূপে ত্যাগ করিব? আমি ইহাকে স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি এবং ইহার জীবন রক্ষা করিতেছি।"

এই কথায় লোকে তাহাকে, 'আহা, কি সতী' বলিয়া ধন্য ধন্য করিত এবং তাহাকে প্রচুর পরিমানে যবাগূ ও অন্ন দিত। কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিত, 'এত কষ্ট করিয়া বেড়াইবে কেন? পদ্মরাজ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার অজস্র দানে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তোমায় দেখিলে তিনি নিশ্চিত সন্তুষ্ট হইবেন, তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিবেন; তুমি স্বামীকে এই ঝুড়ির মধ্যে লইয়া তাঁহার নিকট যাও।' ইহা বলিয়া তাহারা ঐ রমণীকে একটা বেতের ঝুড়ি দিল।

দুষ্টা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটাকে ঐ ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া এবং উহা মস্তকে লইয়া বারণসীতে গেল। সেখানে এক দানশালায় আহার করিয়া তাহারা উভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া সেই দানশালায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে আট দশ জন লোককে দান দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত পাপিষ্টা রমণী তখন ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়িতে ফেলিয়া তাহাকে মস্তকে তুলিয়া তাঁহার গমনপথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" "মহারাজ, এই রমণী অতি পতিব্রতা।" রাজা ঐ রমণীকে ডাকাইয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার কে হয়?" "মহারাজ, ইনি আমার পিষতুত ভাই; বাপ মা ইহারই সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন।" উপস্থিত লোকেরা ভিতরের কথা জানিত না। তাহারা "অহো পতিব্রতা!" ইত্যাদি বলিয়া সেই পাপিষ্ঠার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা

---

[১]। এই বাক্যটি ইংরাজী অনুবাদক পাঠান্তরে পাইয়াছেন। ইহা না হইলে লোকটার ছিন্নাঙ্গ হইবার কারণ থাকে না।

পাপিষ্ঠাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছিন্নাঙ্গ লোকটা তোমার স্বামী? তোমার বাপ মা ইহারই সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছে বটে?" সে রাজাকে চিনিতে না পারিয়া নির্ভয়ে বলিল, "হাঁ মহারাজ!" তখন রাজা বলিলেন, "তবে এই ব্যক্তি কি বারাণসীরাজের পুত্র? তুমি না পদ্মকুমারের ভার্য্যা, অমুক রাজার কন্যা? তোমার না অমুক নাম? তুমি আমার দক্ষিণ জানুর রক্তপান করিয়াছিলে? তুমিই না শেষে এই বিকলাঙ্গ ব্যক্তির প্রেমে আসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়েছিলে? তুমি ভাবিয়াছিলে আমি মরিয়াছি। সেই জন্য নিজের ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।" অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'হে অমাত্যগণ, তোমরা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তখন কি উত্তর দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি? আমার কনিষ্ঠ ছয় জন ভ্রাতা তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে মারিয়া খাইয়াছিল; আমি কিন্তু আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং গঙ্গাতীরে গিয়া সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। তাহার এক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যঙ্গিত ব্যক্তিকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া আমি তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার পাপিষ্ঠা স্ত্রী সেই ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিরই প্রণয়াসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমি নিজের মৈত্রীভাবাপন্ন চিত্তের প্রভাবে প্রাণলাভ করিয়াছিলাম। যে আমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া এই দুঃশীল রমণী সেই, অন্য কেহ নহে। সেই প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিও আর কেহ নহে, এই লোকটা।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :

সেই আমি, সেই এই নারী, অন্য কেহ নয়,
ছিন্নহস্তপাদ সেই ব্যক্তি নিঃসংশয়।
অম্লানবদনে দুষ্টা বলে এবে সর্ব্বজনে,
বিবাহিতা হয়েছিল যৌবনে ইহার সনে।
সত্য কথা বলে কারে না জানে রমণী-জাতি,
প্রাণদণ্ড ইহাদের অতি উপযুক্ত শাস্তি।
অচল শবের মত, হরিবারে পরদার
অথচ লোলুপ পাপী; কি আশ্চর্য্য ব্যবহার।
দাও দণ্ড সবে এরে মূষল-প্রহারে মারি;
'পতিব্রতা' বল যারে, সেও অতি দুষ্টা নারী।
তাহার উচিত দণ্ড কি যে দিব বুঝা ভার;
না করিয়া জীবনান্ত নাসা কর্ণকাট তার।[১]

---

[১]। পঞ্চতন্ত্রেও (১/৪) দেখা যায় পরপুরুষাভিলাষ, প্রাণদ্রোহ, চৌর্য্যকর্ম্ম প্রভৃতি দোষে

বোধিসত্ত্ব ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া তাহাদের এই রূপ দণ্ডাদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করিলেন না। ক্রোধ মন্দীভূত হইলে তিনি সেই ঝুড়িটা পাপিষ্ঠার মস্তকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়া দিলেন যে সে শতচেষ্টা করিলেও তাহা ফেলিতে না পারে। অনন্তর সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষটাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন অত্রত্য ছয়জন স্থবির ছিলেন সেই ভ্রাতা; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই পাপিষ্ঠা রমণী; দেবদত্ত ছিল সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষ, আনন্দ ছিলেন সেই গোধারাজ, এবং আমি ছিলাম পদ্মরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধ প্রণাশতন্ত্র, ৫ম আখ্যায়িকা) এবং কথাসরিৎসাগরেও দেখা যায় স্বামী নিজের জীবনার্দ্ধ দিয়া পত্নীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই পত্নীই শেষে ব্যাভিচারিণী হইয়াছিল।

---

১৯৪. মণিচোর-জাতক

[দেবদত্ত যখন শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করে, সেই সময়ে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টায় আছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এই জন্মেই আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও সে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

* * *

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নগরের অনতিদূরস্থ কোন পল্লীবাসী গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহার্থ আত্মীয়-স্বজন বারাণসী হইতে এক কুলকন্যা আনয়ন করিলেন। এই কন্যার নাম সুজাতা। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, পরমরূপবতী, অপ্সরার ন্যায় প্রিয়দর্শনা, পুষ্পলতার ন্যায় সুললিতা, এবং কিন্নরীর ন্যায় হৃদয়োম্মাদিনী ছিলেন। তিনি যেমন পতিব্রতা, তেমনি শীলাচারসম্পন্না ও কর্ত্তব্যপরায়ণা

নারীদিগকে নাসাকর্ণাদিচ্ছেদন দ্বারা ব্যঙ্গিত করিবার প্রথা ছিল। অবোধ্য ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিত তেবামপরাধে মহত্যপি।

ছিলেন এবং নিয়ত পতিসেবা, শ্বশ্রূসেবা ও শশুরসেবা করিতেন। কাজেই তিনি বোধিসত্ত্বের অতীব প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষের পরম সুখে একচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন সুজাতা বলিলেন, আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হয় যে একবার মা ও বাবাকে দেখিয়া আসি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, ইহাতে আর আপত্তি কি? তুমি পথের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত কর।" তিনি নানাবিধ খাদ্য পাক করাইয়া শকটে তুলিলেন, নিজে শকট চালাইবার জন্য সম্মুখে বসিলেন এবং সুজাতাকে পশ্চাতে বসাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বারাণসীর নিকটে গিয়া যান খুলিয়া দিলেন এবং স্নানান্তে আহার করিলেন।

আহারান্তে বোধিসত্ত্ব আবার গাড়ী যুতিলেন, নিজে সম্মুখে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলেন এবং সুজাতা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ও অলঙ্কার পড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে বারাণসীরাজ অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আহোরণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বোধিসত্ত্বের শকট যখন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তখন রাজাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজাতা সেই সময় অবতরণ করিয়া পদব্রজে শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তদীয় রূপলাবণ্যে রাজার চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইল যে তিনি জনৈক অমাত্যকে বলিলেন, "যাও ত, অনুসন্ধান করিয়া জান, এই রমণীর স্বামী আছে কি না।" অমাত্য গিয়া জানিতে পারিলেন, রমণীর স্বামী আছে। তিনি রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ঐ রমণী সধবা; শকটে যে পুরুষ বসিয়া আছে, সেই উহার পতি।

সুজাতার রূপে রাজার চিত্ত এতই প্রতিবন্ধ হইয়াছিল যে তিনি কিছুতেই উহা দমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'যে উপায়েই হউক এই পুরুষটাকে মারিয়া রমণীকে হস্তগত করিতে হইবে।' তিনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই চূড়ামণি লও; তুমি যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছ এইভাবে গিয়া ইহা ঐ লোকটার শকটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আইস।" এই বলিয়া তিনি উহাকে চূড়ামণি দিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চূড়ামণি লইয়া গেল এবং উহা শকটের মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক রাজাকে আসিয়া জানাইল, 'মহারাজ, চূড়ামণি শকটের ভিতর রাখিয়া আসিলাম।' তখন রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া লোকে মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "সমস্ত দ্বার রুদ্ধ কর, যাতায়তের পথ বন্ধ কর এবং চোর ধরিবার উপায় দেখ।" রাজ, কিঙ্করেরা তাহাই করিল। তাহাতে সমস্ত নগরের সংক্ষোভ

উপস্থিত হইল। যে লোকটা চূড়ামণি রাখিয়া আসিয়াছিল সে এখন আর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "ওহে বাপু, গাড়ী থামাও, রাজার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে; তোমার গাড়ী খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।" অনন্তর সে গাড়ী খুজিবার ভাণ করিল এবং লুক্কায়িত মণি বাহির করিয়া "তবে রে মণি-চোর!" বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্বকে হস্ত ও পাদদ্বরা প্রহার করিতে লাগিল এবং পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া টানিতে টানিতে রাজার নিকট লইয়া বলিল, "মহারাজ, মণিচোর ধরিয়াছি।" রাজা আদেশ দিলেন, "ইহার শিরশ্ছেদ কর।" তখন রাজকিঙ্করেরা বোধিসত্ত্বকে লইয়া নগরের প্রত্যেক চতুষ্কে কশাঘাত করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরে বাহির করিল।

এদিকে সুজাতা শকট ত্যাগ করিয়া দুই হাত তুলিয়া, "প্রভু আমার জন্যই এত দুঃখ পাইতেছেন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চৎ ছুটিলেন। রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বের ছিরশ্ছেদের অভিপ্রায়ে তাহাকে চিৎ[১] করিয়া ফেলিল, তখন সুজাতা নিজের শীলগুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, যাহারা শীলবানাদিগের অনিষ্ট করে, তাদৃশ দুরাচারদিগকে নিষেধ করিতে সমর্থ কোন দেবতা কি এ জগতে নাই?' অনন্তর তিনি বিলাপ করিতে করিতে এই প্রথমগাথা পাঠ করিলেন :

দেবগণ নাহি হেথা, নাহি লোকপালগণ,
প্রবাসে নিশ্চয় তাঁহা গিয়াছেন সর্ব্বজন।
দুঃশীল কুকর্ম্মী যারা সেই হেতু অনায়াসে,
কুপ্রবৃত্তি সাধিবারে ধার্ম্মিকের প্রাণ নাশে।

শীলসম্পন্না সুজাতা এইরূপে বিলাপ করিলে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে ইন্দ্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে?' অনন্তর সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি দেখিলেন, বারণসীরাজ অতি নিষ্ঠুর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন এবং শীলসম্পন্না সুজাতাকে ক্লেশ দিতেছেন। এতএব, 'আমাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি দেবলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক গজপৃষ্ঠারূঢ় পাপিষ্ঠ রাজাকে নামাইয়া ধর্ম্মগণ্ডিকার[২] উপর উত্তানভাবে রাখিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া ও রাজবেশ পরাইয়া গজস্কন্ধে বসাইলেন। এদিকে ঘাতুক শিরশ্ছেদের জন্য যে পরশু উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া সে রাজার মস্তক ছেদন করিল—মস্তক ছিন্ন হইবার পর

১। উত্তান।

২। যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া প্রাণীদিগের চিরশ্ছেদ করা হয় তাহার নাম ধর্ম্মগণ্ডিকা।

সকলে জানিতে পারিল উহা তাহাদের রাজারই মস্তক।

তখন শক্র পরিদৃশ্যমান শরীর গ্রহণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সুজাতাকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। বারাণসীরাজ্যের অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি সমস্ত লোক দেবরাজ শক্রকে দেখিয়া মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, "অধার্ম্মিক রাজা নিহত হইয়াছেন; এখন আমরা শক্রদত্ত ধার্ম্মিক রাজা লাভ করিলাম।" অতঃপর শক্র আকাশে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের এই শক্রপ্রদত্ত রাজা অদ্যাবধি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিবেন। রাজা অধার্ম্মিক হইলে অকালে প্রভূত বর্ষণ হয়, কিন্তু যথাকালে বর্ষণ ঘটে না; রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে বিব্রত হইয়া পরে। জনসঙ্ঘকে এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে শক্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :

নৃপতি যেখানে হন অধর্ম্ম আচারী,
যথাকালে মেঘ নাহি বর্ষে বারি;
অকাল প্লাবনে ঘটে শস্যের বিনাশ;
প্রকৃতিপুঞ্জের মনে সদা মহাত্রাস।
থাকুক না স্বর্গে কেন হেন নরপতি,
পাপভারে ধ্রুব তাঁর হবে অধোগতি।
তার সাক্ষী দেখ এই রাজা পাপাচার
নিহত হইল কর্ম্মদোষে আপনার।

সমবেত জনবৃন্দকে এইরূপ উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্বও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসনপূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল অধার্ম্মিক রাজা, অনিরুদ্ধ[১] ছিলেন শক্র, সুজাতা ছিলেন রাহুল-জননী এবং আমি ছিলাম সেই শক্রাভিষিক্ত রাজা।]

----

১৯৫. পব্বতূপত্থর-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক অমাত্য নাকি রাজার অন্তঃপুরচারিণীদিগের একজনের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন। রাজা যখন অনুসন্ধান

---

[১]। ইনিই গৌতমের পিতৃব্য-পুত্র।

[২]। পব্বতপাদে পত্থায়িত্ব থিতে তি অত্থো। প্রথম গাথা প্রথম পদ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। (প্র-স্থ-ধাতুজ)

করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অমাত্যের অপরাধসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন ভাবিলেন, 'এ বৃত্তান্ত শাস্তাকে জানান যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমার এক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতায় নষ্ট করিয়াছে; তৎসম্বন্ধে এখন কি করা যায়।" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ সেই অমাত্য আপনার উপকারক কি? আর সেই রমণীও আপনার প্রণয়পাত্রী কি না?" রাজা বলিলেন, "হাঁ ভগবন, সেই অমাত্য আমার অতীব উপকারক—সমস্ত রাজকুলে ধুরন্ধর; সে রমণীও আমার প্রণয়ের পাত্রী।" "মহারাজ, যে পুরুষ নিজের উপকারী সেবক এবং যে রমণী নিজের প্রণয়ের পাত্রী, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেও রাজারা পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে এরূপ ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসক হইয়াছিলেন। একদা এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিলেন। রাজা যখন তাহার অপরাধসম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেন, তখন ভাবিতে লাগিলেন, 'এই অমাত্য আমার অতীব উপকারক; এ রমণীও প্রীতির পাত্রী; আমি কিছুতেই এ দুইজনের প্রাণনাশ করিতে পারিব না। একবার পণ্ডিতামাত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; যদি সহ্য করিবার হয় তবে সহ্য করিব, নচেৎ সহ্য করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে আসন দিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ। আমি উত্তর দিতেছি।" তখন রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :

পর্ব্বতের পাদে শীতলসলীল
সরোবর মনোরম;
সিংহে রক্ষে তায় জানি তবুতারে
দুষিল শৃগালাধম।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নিশ্চিত কোন অমাত্য ইহার কোন অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছে।' এইজন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

দ্বিপদ, শ্বাপদ, মৎস্য আদি প্রাণীগণ
নদীজলে করে সবে পিপাসা দমন।
নদীর নদীত্ব তাতে প্রণষ্ট কি হয়?
যদি সোরমণী প্রিয়া, ক্ষম, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাজা সেই উপদেশানুসারে উভয়কেই "আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্ম করিও না" বলিয়া সতর্ক করিয়া ক্ষমা করিলেন। তদবধি তাহারা অনাচার হইতে বিরত হইলেন; রাজাও দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া জীবনান্তে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কোশলরাজও এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের অপরাধ-সম্বন্ধে মধ্যম ভাব অবলম্বন করিলেন (অর্থাৎ কোন দণ্ডবিধান করিলেন না)।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

১৯৬. বালাহাশ্ব-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়ছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত!" "কি জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত।" "দেখ, রমণীরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং নারীসুলভ কুটবিলাসাদি দ্বারা পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আপনাদের বশ করিয়া লয়। যখন দেখে পুরুষ বশীভূত হইয়াছে, তখন তাহারা হতভাগ্যদের চরিত্র ও ধন বিনাশ করে। এই জন্যই লোকে রমণীকে যক্ষিণী বলিয়া থাকে। পূর্ব্বেও যক্ষিণীরা একদল সার্থবাহকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল; কিন্তু যখন অন্য পুরুষদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল, তখন প্রথমোক্ত হতভাগ্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন তাহারা দন্তদ্বারা মুর্মুর করিয়া সার্থবাহদিগের অস্থিচূর্ণ করিয়াছিল, তখন রক্তে তাহাদের হনুপার্শ্বদ্বয়

---

[১]। 'বালাহ' বৌদ্ধসাহিত্য-বর্ণিত এক প্রকার অদ্ভুত শক্তিশালী অশ্ব। বিদ্যাবদানে (অষ্টম ও ষটত্রিংশ আখ্যায়িকায়) বালাহ অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। বালাহ বা বালাহক শব্দটি 'বলাহক' (মঘ) শব্দজ কি? বলাহককাশ্ব—যে অশ্ব মেঘলোকে বা মেঘের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে—'পক্ষিরাজ' ঘোড়া এইরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিষ্ণুর ঘোটকচতুষ্টয়ের একটার নাম 'বলাহক'। গ্রীকপুরাণেও Pegasos নামধেয় ব্যোমচর অশ্বের বর্ণনা আছে।

রঞ্জিত হইয়াছিল। “ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

তাম্রপর্ণীদ্বীপের শিরীষবস্তু নামে এক যক্ষ নগর আছে। সেখানে যক্ষিণীরা বাস করে। যখন কোন পোতভঙ্গ হয়, তখন যক্ষিণীরা নানা অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া দাসীপরিবৃত হইয়া এবং সন্তানগুলি কোলে লইয়া বণিকদিগের নিকটে গমন করে। তাহারা যে লোকালয় হইতে আসিয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা মায়াবলে ইতস্ততঃ কৃষি-গোবৃক্ষাদি কার্য্যে নিরত মনুষ্য ও গো এবং কুক্কুর প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনন্তর বণিকদিগের নিকট গিয়া বলে, “আপনারা এই যবাগূ পান করুন, এই অন্ন ভক্ষণ করুন, এই খাদ্যগুলি আহার করুন।” বণিকেরা তাহাদের যক্ষিণীভাব জানে না। কাজেই ঐ সকল ভোজ্য পানীয় উদরস্থ করে। যখন তাহারা পানাহারান্তে বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন যক্ষিণীরা জিজ্ঞাসা করে, “আপনাদের নিবাস কোথায়? কোন স্থান হইতে আসিতেছেন? কোথায় যাইবেন? এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?” বণিকেরা উত্তর দেয়, পোতভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি।” যক্ষিণীরা বলে “মহাশয়েরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল, আমাদেরও স্বামীরা পোতারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনারাও দেখিতেছি বণিক; আমরা এখন হইতে আপনাদের পাদপরিচারিকা হইব।” এইরূপে স্ত্রীজাতিসুলভ ভাববিলাস দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাহারা বণিকদিগকে যক্ষনগরে লইয়া যায়; এবং পূর্ব্বে যাহাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিয়া অনিয়াছিল, তাহাদের কেহ যদি তখনও জীবিত থাকে, তবে তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগৃহে নিক্ষেপ করে। স্বকীয় বাস ভূমিতে যদি ভগ্নপোত লোকের অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে, তাহারা কল্যাণী[১] হইতে নাগদ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকুলভাগে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। উক্ত যক্ষিণীদিগের এইরূপই ব্যবহার।

একদিন পঞ্চশত ভগ্নপোত বণিক যক্ষিণীদিগের নগরসমীপে অবতরণ করিয়াছিল। যক্ষিণীরা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নগরের মধ্যে লইয়া গেল; পূর্ব্বে যে হতভাগ্যদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগারে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী আগন্তুক জ্যেষ্ঠ বণিককে, কণিষ্ঠ যক্ষিণী আগন্তুক কনিষ্ঠ বণিককে এইরূপে পঞ্চশত যক্ষিণী পঞ্চশত আগন্তুক বণিককে স্ব স্ব স্বামী করিয়া লইল। অনন্তর রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী

---

[১]। কল্যাণী গঙ্গা।

জ্যেষ্ঠ বণিককে নিদ্রিত দেখিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং যন্ত্রনাগারে গিয়া কয়েক জন লোককে নিহত করিয়া তাহাদের মাংসভোজনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিল। অন্যান্য যক্ষিণীরাও এইরূপ করিল। মনুষ্য মাংস ভোজন করিয়া আসিবার পর জ্যেষ্ঠা যক্ষিণীর দেহ অতি শীতল হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ বণিক তাহাকে আলিঙ্গন করিবারকালে বুঝিল সে মানবী নহে, যক্ষিণী। সে ভাবিল, 'এই পাঁচশত স্ত্রীই যক্ষিণী; না পলাইলে আমাদের নিস্তার নাই।' সে পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র মুখ ধুইতে গিয়া সহচর বণিকদিগকে বলিল, "এই রমণীগণ মানবী নহে, যক্ষিণী; যখন ভগ্নপোত অন্য বণিক এখানে আসিবে, তখন ইহারা তাহাদিগকে স্বামী করিবে এবং আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। এস, আমরা পলায়ন করি।"

সার্দ্ধদ্বিশত বণিক বলিল, "আমরা এই রমণীদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইচ্ছা হয়, তোমরা যাইতে পার; কিন্তু আমরা পলাইব না।"

যে সার্দ্ধদ্বিশত বণিক জ্যেষ্ঠ বণিকের পরামর্শ গ্রহণ করিল, সে তাহাদিগকে লইয়া যক্ষিণীদিগের ভয়ে পলায়ন করিল।

এই সময় বোধিসত্ত্ব বালাহ ঘোটকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মস্তক কাক-মস্তকের ন্যায় এবং কেশর মুঞ্জসদৃশ ছিল। তিনি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারিতেন। তিনি উড্ডীন হইয়া হিমবন্ত হইতে তাম্রপর্ণী দ্বীপে যাইতেন এবং তত্রত্য সরোবর ও পল্বলসমূহের নিকটে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে বিচরণ করিবার সময় তিনি করুণাবশে মনুষ্যভাষায়, "কেহ জনপদে যাইতে চাও কি?" তিনবার এই বাক্য বলিতেন। বণিকেরা ইহা শুনিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "প্রভো, আমরা জনপদে যাইতে অভিলাষী।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর।" তখন কেহ কেহ তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল, কেহ কেহ তাঁহার আঙ্গুল প্রভৃতি ধরিল, কেহ কেহ বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহারা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইল ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকেও অর্থাৎ সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিকের সকলকেই স্বীয় অনুভাব বলে জনপদে লইয়া গেলেন এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব গৃহে রাখিয়া দিয়া নিজের বাসভূমিতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যক্ষিণীরা যখন অপর মনুষ্য পাইল, তখন সেই অবশিষ্ট সার্দ্ধদ্বিশত বণিককে নিহত করিয়া ভক্ষণ করিল।

[কথান্তে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, যেমন যক্ষিণীদিগের বশীভূত বণিকেরা নিহত হইয়াছিল এবং বালাহাশ্বরাজের আজ্ঞাপালক বণিকেরা স্ব স্ব গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ, যে সকল

ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা বুদ্ধদিগের উপদেশ কর্ণপাত করিবে না, তাহার চতুর্ব্বিধ অপায়[১] এবং পঞ্চবিধ বন্ধন স্থানে[২] অশেষ দুর্গতি ভোগ করিবে; কিন্তু যাহারা ঐ সকল উপদেশানুসারে পরিচালিত হইবে, তাহারা ত্রিবিধ কুশল সম্পত্তি,[৩] ষড়বিধ কামস্বর্গ[৪] এবং বিংশতি ব্রহ্মালোক লাভ করিয়া ও পরিশেষে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখ অনুভব করিবে।" অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :]

বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ ছাড়ে যেই বুদ্ধিদোষে,
হয় তার নিশ্চিত ব্যসন;
বিনষ্ট হইল যথা যক্ষিণীকুহকে পড়ি
বুদ্ধিহীন সার্থবাহকগণ।
বুদ্ধপ্রদর্শিত পথে চলে যারা সাবধানে
হয় তারা স্বস্তির ভাজন;
লভিল জীবন যথা বালাহক তুরগের
বুদ্ধিবলে স্বার্থবাহকগণ।

অতঃপর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন, অন্য অনেকেও, কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ সকৃদাগামী কেহ অনাগামী মার্গ প্রাপ্ত হইলেন, কেহ কেহ বা অহর্ত্ত্বে উপনীত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন বুদ্ধ শিষ্যেরা ছিল সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিক, যাহারা বালাহাশ্বের পরামর্শ মত চলিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল; তখন আমি ছিলাম সেই বালাহাশ্ব।]

☞ যক্ষিণীদিগের উপাখ্যানের সহিত হোমার বর্ণিত Circe ও Siren দিগের উপাখ্যান তুলনা করিবার বিষয়।

---

[১]। চতুর্ব্বিধ অপায়; যথা : নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

[২]। পঞ্চবিধ বন্ধনকম্মকরণট্‌ঠানাদিসু—দুই হস্তে, দুই পায়ে ও বুকের উপর তপ্ত অয়ঃকিল রাখিয়া বান্ধা হইত।

[৩]। মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকসম্পত্তি ও নির্ব্বাণসম্পত্তি।

[৪]। কামলোক এগারোটি—ছয় দেবলোক (এইগুলি কামস্বর্গ); মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগযোনি ও নরক। কামলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোকের দুই প্রধান অংশ—রূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ১৬টি); অরূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ৪টি)। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা কামের অতীত।

১৯৭. মিত্রামিত্র-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুর নিকট তাহার উপাধ্যায় বিশ্বাস করিয়া এক খণ্ডবস্ত্র রাখিয়াছিলেন। ভিক্ষু মনে করিলেন, 'আমি যদি এই বস্ত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হইবেন না।' এই বিশ্বাসে তিনি উহা দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিলেন এবং উপধ্যায়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার বস্ত্র লইয়া যাইতেছ কেন?" ভিক্ষু বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি এই বস্ত্র গ্রহণ করিলে আপনি রাগ করিবেন না।" "আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কি হেতু আছে?" ইহা বলিয়া উপাধ্যায় লাফাইয়া উঠিয়া ভিক্ষুকে প্রহার করিলেন। উপাধ্যায়ের এই কথা ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রকাশ হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে অলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক দহর ভিক্ষু উপাধ্যায়কে এত বিশ্বাস করিত যে তাঁহার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার সম্বন্ধে তোমারা এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কোন কারণ নাই।' তিনি ক্রোধবশে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা বসিয়া কি কথার আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ, এই উপাধ্যায় স্থানীয় ভিক্ষু যে কেবল এ কল্পেই নিজের সার্দ্ধবিহারিকের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হন এবং শিষ্যগণসহ হিমবন্ত প্রদেশে বাস করেন। ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে একজন বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত না করিবার এক মাতৃহীন হস্তীপোতককে পালন করিয়াছিলেন। এই হস্তীপোতক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পালকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক বনে পলাইয়া গিয়াছিল। ঋষিগণ মৃত পালকের শারীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, মিত্রভাব ও শত্রুভাব নির্ণয় করিবার উপায় কি"? "বলিতেছি শুন" বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :

হাসে না আমারে করি দরশন,
না করে আমার প্রত্যভিনন্দন,
মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চায়,
'না' ভিন্ন উত্তর কখনো না দেয়,—
এই সব জানি অমিত্র লক্ষণ;
দেখে শুনে বুঝে বুদ্ধিমান জন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মিত্রামিত্রভাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই সার্দ্ধবিহারিক ছিল সেই হস্তীপোষক; তাহার উপাধ্যায় ছিল সেই হস্তী; বুদ্ধশিষ্যরা ছিল সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ প্রথম খণ্ডের বেণুক জাতকের (৪৩) এবং প্রথম খণ্ডের ইন্দ্রসমানগুপ্ত জাতকের (১৬১) আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ।

---

১৯৮. রাধ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কারণ কি?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছি।" "দেখ রমণীদিগের শত চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে লোকে দৌবারিক নিযুক্ত করিয়াও রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এরূপ রমণীতে তোমার কি প্রয়োজন? উহাকে পাইলেও তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'রাধ'; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। তাঁহারা উভয়েই যখন শাবক ছিলেন, তখন এক ব্যাধ তাহাদিগকে ধরিয়া বারাণসীবাসী এক বাহ্মণকে দান করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ব্রাহ্মণের পত্নী অতি অরক্ষণীয়া ও দুঃশীলা ছিলেন। একদা ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্যত্র যাইবারকালে শুকদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ,

আমি বিষয়কার্য্যে অন্যত্র যাইব; সময়ে অসময়ে তোমাদের মাতার কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিও; তাঁহার নিকট অন্য কোন পুরুষ সমাগমন করে কিনা তাহা লক্ষ্য করিও।" এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকশাবকদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া ব্রাহ্মণ বিদেশ যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেই ব্রাহ্মণী অনাচার আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র তাহার নিকট কত লোক যাতায়াত আরম্ভ করিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইহা দেখিয়া প্রোষ্ঠপাদ রাধকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ইহাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছেন; আর ইনি এইরূপ পাপাচারে রতা হইয়াছেন। আমি ইহাকে এই কথা বলিতেছি।" রাধ বলিলেন, "ইহাকে কিছুই বলিও না।" কিন্তু প্রোষ্ঠপাদ নিষেধ না শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "মা, পাপকর্ম্ম করিতেছ কেন?" ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদকে প্রাণসংহারের ইচ্ছায় বলিলেন, "বাবা, তুই আমার ছেলে; এখন হইতে আমি আর কোন কুকর্ম্ম করিব না; আয় বাপ, আমার কাছে আয়।" এইরূপ আদর দিয়া ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদকে ডাকিলেন এবং সে যখন তাঁহার নিকটে গেল, তখন তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "তবেরে পাজি, তুই অমার উপদেশ দিতে চাস্! নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস না।" অনন্তর তিনি প্রোষ্ঠপাদের ঘাড় ভাঙ্গিলেন এবং তাহাকে উননের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলেন এবং বিশ্রামের পর বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধ, তোমার মাতা কোন অনাচার করিয়াছেন, কি না করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিলেন :

প্রবাস হইতে এই মাত্র আমি ফিরিয়াছি নিজালয়ে;
জানিনা আমার অসাক্ষাতে গৃহে যে সব ঘটনা হয়।
শুধাই তোমায় সেই হেতু আমি; বলহে নির্ভয় মনে,
মাতা কি তোমার সুযোগ পাইয়া সেবিল অপর জনে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, যাহা হইয়াছে বা হইবে, তাহা মঙ্গলজনক না হইলে পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

নহে নরাপদ পিতঃ সত্যের কথন,
সত্য বলি হল প্রোষ্ঠপাদের নিধন।
ভস্মে আচ্ছাদিত তার দগ্ধ কলেবর;
আমি কেন সেই দণ্ড ঘটাব আমার?

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিলেন, "আমারও আর এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর, ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বনে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধা।]

☞ প্রথম খণ্ডের রাধজাতকের সহিত (১৪৫) এই জাতকের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিবেচ্য। শুকসপ্ততিতে এবং তুতিনামায় এইটি বীজকথা।

----

১৯৯. গৃহপতি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীরা অরক্ষণীয়া; তাহারা পাপ করিয়া যে সে উপায়ে স্বামীদিগকে প্রতারিত করে।" অতঃপর তিনি এতৎসম্বন্ধে একটি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গৃহপতি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অতি দুঃশীলা ছিলেন; তিনি গ্রাম-ভোজনকের[১] সহিত অনাচার করিতেন। বোধিসত্ত্ব ইহার আভাস পাইয়া তথ্যনির্ণয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঐ সময়ে বর্ষাকালে সমস্ত সঞ্চিত শস্য বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ক্ষেতে যে ফসল ছিল তাহা কেবল ফুলিয়া উচিতেছিল, পাকিতে আরও দুমাস বাকি ছিল। গ্রামবাসী সকলে একত্র হইয়া গ্রামভোজনকের নিকট গিয়া সাহার্য্য প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল, "দুই মাস পরে আমরা ফসল কাটিব; তখন আপনাকে ধান দিয়া যাইব।" গ্রামভোজনক তাহাদিগকে একটি বৃদ্ধ গো দিল; তাহারা দুই এক দিন উহার মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিল।

ইহার পর এক দিন গ্রামভোজনক সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে জানিতে পারিল বোধিসত্ত্ব গৃহে নাই। তখন সে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে যেমন ঐ দুষ্টা রমণীর সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল অমনি বোধিসত্ত্ব গ্রামদ্বার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহাভিমুখী হইলেন। তাহার পত্নী নগরদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; তিনি পতিকে দেখিয়া বলিলেন, "তাই ত, এ আবার কে

[১]। গ্রামভোজক বা গ্রামভোজনক—গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান পুরুষ।

আছিতেছে?” অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন দেহলীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পতিই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি গ্রাম ভোজনককে এই বিপদের কথা জানাইলেন; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

তখন ঐ দুষ্ট রমণী বলিলেন, “ভয় কি? আমি এক উপায় করিতেছি। আমরা তোমার নিকট হইতে ধারে গো মাংস খাইয়াছিলাম; তুমি যেন সেই মাংসের দাম আদায় করিতে আছিয়াছ। আমি গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিব, ‘গোলায় ধান নাই’; তুমি মাঝখানে থাকিয়া বার বার বলিও, ‘আমাদের বাড়ীতে কয়েকটি ছেলে হইয়াছে; মাংসের মূল্য না দিলে চলিবে না।’

ইহা বলিয়া রমণী গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে বসিলেন। তাঁহার উপপতি গৃহের মধ্যে থাকিয়া ‘মাংসের দাম দাও’ বলিতে লাগিল। রমণীও গোলার দরজায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন” “গোলায় ধান নাই; ফসল ঘরে আসিলে সব চুকাইয়া দিব। এখন আপনি ফিরিয়া যান।”

বোধিসত্ত্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া উহাদের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পাপিষ্ঠা স্ত্রীই এই কৌশল করিয়াছে। তিনি গ্রামভোজনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মণ্ডল মহাশয়, আমরা যখন তোমার বুড়া গরুটার মাংস খাইয়াছিলাম, তখন কথা হইয়াছিল, যে দুইমাস পরে উহার দামের পরিবর্ত্তে ধান দিব। এখন পনর দিন ও যায় নাই; তবুও দাম চাহিতে আসিয়াছ ইহার অর্থ কি? তুমি দামের জন্য আইস নাই, তোমার আগমনের জন্য কোন কারণ আছে। ফলকথা তোমার ব্যবহারটা আমার ভাল লাগিতেছে না। আর এই দুষ্টা পাপিষ্ঠা নারীও জানে গোলায় কিছুমাত্র ধান নাই, তথাপি গোলায় উঠিয়া ‘ধান নাই’ বলিতেছে। অতএব তোমাদের দুজনেরই ব্যবহার নিতান্ত সন্দেহজনক।” এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

তোমাদের উভয়ের এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।
গোলায় নাহিক ধান, জানে বিলক্ষণ,
তবু দুষ্টা উঠিয়াছে সেথা কি কারণ?
তোমাকেও বলি, গ্রামপতি মহাশয়,
অল্প বিত্তে কষ্টে মোর দিনপাত হয়।
সেই হেতু গরু এক অস্থি চর্ম্মসার
কিনিনু তোমার ঠাঁই, করি অঙ্গীকার
দিব মূল্য দুই মাস হইলে অতীত;
এখন করিতে চাও তার বিপরীত!
পঞ্চদশ দিনমাত্র গিয়াছে চলিয়া,

এরই মধ্যে আসিয়াছ মূল্যের লাগিয়া
তোমার বিস্ময়কর এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।

এই কথা বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্ব গ্রামভোজনকের টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিলেন এবং "অমি গ্রামভোজনক; তুই অপরের রক্ষিত সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছিস, অতএব তাহার ক্ষতিপূরণ দে', এইরূপ পরিহাস করিতে করিতে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকটা যখন প্রহারের চোটে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন তিনি তাহাকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং নিজের দুষ্টা পত্নীকে চুল ধরিয়া গোলা হইতে নামাইয়া মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন, "সাবধান, "আবার যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবি, তাহা হইলে এমন সাজা দিব যে জন্মে ভুলিবি না।" তদবধি সেই গ্রামভোজনক ভ্রমেও বোধিসত্ত্বের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; সেই রমণীও পাপাচারের ইচ্ছা মনে স্থান দিতে পারিতেন না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই গৃহপতি, যিনি উক্ত গ্রামভোজনকের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।]

---

২০০. সাধুশীল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাকি চারিটি কন্যা ছিল। চারিজন পুরুষ এই কন্যাদিগের বিবাহার্থী হইয়াছিল; তন্মধ্যে একজন দেখিতে সুন্দর, একজন পৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সদবংশজাত এবং একজন সাধুশীল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'বিবাহার্থীদিগের মধ্যে একজন রূপবান, একজন পৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সৎকুলজ ও একজন সচ্চরিত্র। কন্যাদিগকে পাত্রস্থাও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠাপিতা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে কাহাকে নির্ব্বাচন করা যায়?' কিন্তু পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়াও ব্রাহ্মণ কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'এ সম্বন্ধে সম্যকসম্বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। তিনি ইহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুপাত্র মনে করেন, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গেলেন, শাস্তাকে বন্দনা করিলেন, একান্তে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন

এবং প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্ত, বলুন, এই চারিজনের মধ্যে কাহাকে কন্যাদান করা যায়?" শাস্তা বলিলেন, "পণ্ডিতেরা অতীতকালেও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু জন্মান্তর-গ্রহণহেতু তাহা তুমি সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারিতেছ না।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; এবং বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন।

তখন এক ব্রাহ্মণের চারিটি কন্যা ছিল এবং এইরূপ চারি ব্যক্তিই ঐ কন্যাদের বিবাহার্থী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যে দানের উপযুক্ত তাহারই সহিত কন্যাদিগের বিবাহ দিব।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট গিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :

একের সুন্দর কান্তি দেখি ভুলে মন;
বয়সে প্রবীণ এক অতি বিচক্ষণ;
কুলের গৌরবে এক বড় সবাকার;
একজন সুশীল, ধর্ম্মিক সদাচারঃ-
বলহে, আচার্য্য, তাই জিজ্ঞাসা তোমায়,
কার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উত্তর দিলেন, "দেখ, শীলহীন ব্যক্তি রূপাদি থাকিলেও ঘৃণার্হ; অতএব রূপাদি দ্বারা কখনও মনুষ্যের গৌরব পরিমিত হয় না। আমি শীলবান ব্যক্তিদিগেরই পক্ষপাতী।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আচার্য্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

রূপ বাঞ্জনীয়, প্রণম্য প্রবীণ,
কৌলিন্য গৌরবাকর
চরিত্র রতনে বিভূষিত যেই,
সেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ নর।

বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণ সেই শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞ এক কন্যার পাণীগ্রহণার্থী বহুবরের কথা বেতালপঞ্চবিংশতিতেও (২য় আখ্যায়িকায়) দেখা যায়।

---

২০১. বন্ধনাগার-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বন্ধনাগার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন কোশলরাজের নিকট বহুসংখ্যক সন্ধিচ্ছেদক[২], পন্থঘাতক[৩] নরহন্তা আনীত হইয়াছিল। রাজার আদেশে তাহাদের কেহ কেহ শৃঙ্খলে, কেহ রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ হইল।[৪] এই সময়ে জনপদবাসী ত্রিশ জন ভিক্ষু শাস্তার দর্শনলাভার্থ জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তার অর্চ্চনাদি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন এবং বন্ধনাগারে গিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দেখিতে পাইলেন।

সন্ধ্যাকালে উক্ত ভিক্ষুগণ তথগতের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অদ্য আমরা ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া দেখিলাম, বন্ধনাগারে বহু চৌর শৃঙ্খলাদিতে নিবদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে। হতভাগ্যদের সাধ্য নাই যে ঐ বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যায়। এই সকল বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর অন্য কোন বন্ধন আছে কি, প্রভু?"

শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা যে সমস্ত দেখিয়াছ সেগুলি বন্ধন বটে; কিন্তু ধনধান্য পুত্রকলত্রাদির জন্য যে দুর্দ্দম্য বাসনা, তাহা উহাদের অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে দৃঢ়তর বন্ধন। তথাপি পুরাকালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবংবিধ দুশ্ছেদ্য বন্ধনকেও ছিন্ন করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা বলিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসী ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্র গৃহস্থের বংশে

১। বন্ধানাগার—কারাগৃহ (Gaol)।

২। সিন্ধেল চোর (Burglar)

৩। যাহারা রাহাজানী করে (Highway men)

৪। মূলে অন্দু, রজ্জু ও শৃঙ্খল এই ত্রিবিধ বন্ধনের কথা আছে। 'অন্ধু' বোধ হয় বেড়ী।

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তিনি মজুর খাটিয়া মাতার ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদীয় জননী, এককুল কন্যা আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। এই সময়ে বোধিসত্ত্বের পত্নী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রথমে ইহা জানিতেই পারেন নাই; তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এখন নিজে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ কর; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আমি এখন গর্ভধারণ করিতেছি; আমার প্রসবান্তে সন্তানের মুখ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের পত্নী যথাকালে সন্তান প্রসব করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি নিরাপদে প্রসব করিয়াছ; এখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি ত?" তাঁহার পত্নী উত্তর দিলেন, পুত্রটি যখন স্তন্যপান ত্যাগ করিবে, তখন আপনি প্রব্রজ্যা লইবেন।" কিন্তু ঐ সময় অতীত হইতে না হইতে তিনি পুনর্ব্বার গর্ভিণী হইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব; অতএব ইহাকে কিছু না বলিয়াই পলায়ণপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইব।" অনন্তর স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি পলায়ন করিলেন। নগর রক্ষকেরা[১] তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন, "দোহাই প্রভুদের, আমার ছাড়িয়া দিন। আমাকে জননী ভরণ-পোষণ করিতে হয়" (অর্থাৎ আমি অবরুদ্ধ থাকিলে আমার মাতার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইবে না। এইরূপে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তিনি কোন স্থানে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন এবং শেষে প্রধান তোরণ দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্ব অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যান-সুখভোগে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থিতি করিবার সময় একদা তিনি হৃদয়ের আবেগে বলিলেন :

> লৌহময়, দারুময় কিংবা তৃণময়,
> সামান্য বন্ধন কিন্তু এই সমুদয়।
> বিষয়ে অত্যন্তসক্তি, দারাপুত্রে গাঢ় প্রীতি,
> প্রকৃত বন্ধন এরা বলে সুধীজন,
> দৃঢ়ভাবে বন্ধ যাহে মানবের মন।

---

[১]। মূলে 'নগরগুত্তিকা' এই পদ আছে। গুত্তিক, গুপ্তিক, গোপ্তা।

আশ্চর্য্য বন্ধন এরা; বান্ধে যারে,হায়,
নিরন্তর নিম্নদিকে টানি তারে লয়।
সুদৃঢ় দুশ্ছেদ্য অতি; কে আছে,' ধরে শকতি,
লভিতে মুকতি কাটি এ হেন বন্ধন?
অথচ যন্ত্রণা এর না বুঝে কখন!
সেই সে প্রকৃত জ্ঞানী, যে পারে লভিতে
পরিত্রাণ হেন দৃঢ় বন্ধন হইতে।
বাসনা কামনা আদি করি পরিহার,
সদানন্দ-ধামে সদা করে সে বিহার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তারা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী, এবং কেহ কেহ অর্হত্ত্ব হইলেন।

সমবধান : তখন মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, শুদ্ধোধন ছিলেন সেই পিতা, রাহুল জননী ছিলেন সেই ভার্য্যা, রাহুল ছিলেন সেই পুত্র এবং আমি ছিলাম সেই গৃহস্থ, যিনি দারাপুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ছিলেন।]

----

২০২. কেলিশীল-জাতক

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান লকুন্টক[১] ভদ্রিকের সম্বন্ধে এই গাথা বলিয়াছিলেন। এই মহাত্মা বুদ্ধ-শাসনে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলী কাহারও অবিদিত ছিল না। তিনি মধুরভাষী ছিলেন, অতি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন; তিনি প্রতিসম্ভিদা-সম্পন্ন ছিলেন[২] এবং সর্ব্ববিধ বাসনাকে পরিক্ষীণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আকারে তিনি অশীতি স্থবিরের মধ্যে সর্ব্বপেক্ষা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে শ্রামণের বলিয়া বোধ

---

[১]। 'লকুন্টক' শব্দটির অর্থ বামন। বোধ হয় স্থবিরের নাম ভদ্রিক এবং তিনি খর্ব্বকায় ছিলেন বলিয়া 'লকুন্টক' তাহার আখ্যা।

[২]। প্রতিসম্ভিদা—তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন ক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ—অর্থ প্রতিসম্ভবিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিজ্ঞানপ্রতিসম্ভিদা (অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের অর্থজ্ঞান, পালিগ্রন্থসমূহে ব্যুৎপত্তি, শব্দসমূহের উৎপতিজ্ঞান, এবং এই ত্রিবিধ উপায়ে লব্ধ ধ্রুবজ্ঞান)।

হইত। ফলতঃ লোকে ক্রীড়ার্থ যেরূপ বামন রাখিয়া থাকে, দেহের আয়তনে তিনিও তৎসদৃশ প্রতীয়মান হইতেন।

একদিন লকুণ্টক তথাগতকে বন্দনাপূর্ব্বক বিহার দ্বারকোষ্ঠকে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনপদ হইতে আগত ত্রিশজন ভিক্ষু 'দশবলকে অর্চ্চনা করিব' এই সঙ্কল্পে জেতবনে প্রবেশ করিবার সময় লকুণ্ঠককে দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন, 'এ ব্যক্তি শ্রামণের'। তাঁহারা স্থবিরের চীবরপ্রান্ত ধরিয়া টানিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া টানিলেন, নাক মলিলেন, কান ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন। ফলতঃ হস্তদ্বারা এক ব্যক্তি অপরকে যতদুর পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত করিতে পারে, তাঁহারা তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। অনন্তর স্ব স্ব পাত্র চীবর যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহার শাস্তার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তাও মধুর বচনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, শুনিয়াছি আপনার শিষ্যদিগের মধ্যে লকুণ্ঠক ভদ্রিক নামক এক স্থবির আছেন; তিনি নাকি অতি মধুরভাবে ধর্ম্মকথা বলিয়া থাকেন? তিনি এখন কোথায় আছেন?" শাস্তা জিজ্ঞাসাছিলেন, "কেন? তোমরা দ্বারকোষ্ঠকে যাঁকাকে চীবর ও কান ধরিয়া টানিয়া এবং অন্য বহুরূপে নিগৃহীত করিয়া আসিয়াছ, তিনিই লকুণ্ঠক।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, যে ব্যক্তি এমন উপাসনাপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তিনি দেখিতে এতাদৃশ হীনাকার হইলেন কেন?" "পূর্ব্বজন্মকৃত স্বীয় পাপফলে।" এই বলিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শক্র হইয়া দেবলোকে রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মদত্তের এক মহাদোষ ছিল,- তিনি জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি দেখিতে পারিতেন না। তিনি ইহাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য নানারূপ নিষ্ঠুর আমোদ-প্রমোদ করিতেন—জীর্ণ হস্তী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেন, জীর্ণ শকট দেখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদিগকে নিকটে ডাকাইতেন, তাহাদিগের উদরে প্রহার করিয়া ভূমিতে পাতিত করিতেন এবং পুনর্ব্বার উঠাইয়া নানারূপ ভয় দেখাইতেন। যদি এরূপ নরনারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত না হইত, তথাপি অমুক গৃহে একজন বৃদ্ধ আছে ইহা শুনিতে পাইলেও তিনি তাহাকে ডাকাইয়া নানারূপে তাহার বিরম্বনা করিতেন।

রাজার এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারে লোকে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব মাতা

পিতাকে রাজ্যের বাহিরে প্রেরণ করিত। তাহারা আর গৃহে থাকিয়া মাতৃপূজা বা পিতৃপূজা করিতে পারিত না। যেমন রাজা, তাঁহার পাত্রমিত্রগণও সেইরূপ নিষ্ঠুর কেলিশীল ছিলেন। কাজেই (পিতৃপূজারূপ ধর্ম্ম পালন করিতে না পারায়) লোকে মৃত্যুর পর অপায়-চতুষ্টয়েরই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল এবং দেবলোকের অধিবাসীসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল।[১]

শক্র দেখিলেন, দেবলোকে আর অভিনব দেবপুত্রের আর্বিভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি অনুন্ধান করিতে গিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'এই রাজাকে দমন করিতে হইতেছে'। একদিন কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে বারাণসী নগরী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত এক অলঙ্কৃত হস্তী আহোরণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় শক্র স্বীয় অনুভাববলে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিলেন, শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে দেহ আবৃত করিলেন এবং এক জীর্ণ শকটে জীর্ণ বলীবর্দ্দদ্বয় যোজনা করিয়া ও তাহাতে দুইটি তক্রপূর্ণ কলসী রাখিয়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে তাঁহার অভিমুখী হইলেন। জীর্ণ শকট দেখিয়াই রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ জীর্ণ শকটকানা শীঘ্র অপসারিত কর।" শক্র নিজের অনুভাববলে উহা কেবল রাজাকেই দেখাইতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অনুচরেরা বলিল, "কোথায় মহারাজ? আমরা ত কোন জীর্ণ শকট দেখিতে পাইতেছি না।" এদিকে শক্র বহুবার রাজার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে রাজার মস্তকোপরি একটা ঘোলের কলসী ভাঙ্গিলেন। ইহাতে রাজা যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি শক্র তাঁহার মস্তকোপরি দ্বিতীয় কলসীটাও ভাঙ্গিলেন। রাজার মাথা হইতে চারিদিকে ঘোলের স্রোত বহিতে লাগিল। এবম্প্রকারে শক্রের চক্রান্তে রাজা নিতান্ত উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইলেন।

শক্র রাজার দুর্দ্দশা দেখিয়া শকটাদি অন্তর্দ্ধাপিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার শক্ররূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক বজ্রহস্তে আকাশে আসীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভো পাপিষ্ঠ নৃপকুলাপসাদ! তুমি কি কখনও বৃদ্ধ হইবে না, তোমার দেহ কি জরাগ্রস্ত হইবে না, যে তুমি বৃদ্ধব্যক্তির দিগের প্রতি উৎপীড়ন কর? এক তোমারই দোষে, শুদ্ধ তোমারই গর্হিত আচরণে লোকে মৃত্যুর পর এখন দুঃখকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে; তোমরা স্ব স্ব মাতা-পিতার সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিতেছে না। তুমি যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত না হও, তবে এই বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। সাবধান, এখন হইতে আর যেন এমন কাজ না কর।"

---

[১]। মনুষ্য সৎকার্য্য করিলে মৃত্যুর পর দেবলোকে যায়; অসৎকার্য্য করিলে মৃত্যুর পর হয় নরকে, নয় তির্য্যগ্‌যোনিতে, নয় প্রেতলোকে, নয় অসুরলোকে গমন করে।

রাজাকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া শক্র মাতা-পিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন এবং বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মান করিলে কি উপকার হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তদবধি ঐরূপ অশিষ্ট আচরণ করিবার কথা মনেও স্থান দিলেন না।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :

হংস, ক্রৌঞ্চ ক্ষুদ্র প্রাণী; হরিণ, পৃষৎ,
মাতঙ্গ ধারণ করে শরীর বৃহৎ,
কিন্তু এরা সকলেই সিংহেরে দেখিয়া
শশব্যস্তে প্রাণভয়ে যায় পলাইয়া।
তেমনি যদ্যপি প্রজ্ঞা বালকের(ও) থাকে,
মহৎ বলিয়া পূজে সর্ব্বজনে তাকে;
বিশাল শরীর, কিন্তু প্রজ্ঞাহীন জন,
হয় শুধু সকলের হাস্যের ভাজন।

এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ কেহ অর্হত্ত্ব হইলেন।

সমবধান : তখন লকুন্টক ভদ্রিক ছিলেন সেই রাজা, যিনি অপরকে উপহাসাস্পদ করিতে গিয়া শেষে নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। তখন আমি ছিলাম শক্র।]

----

২০৩. খন্ধবত্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা জীর্ণ বৃক্ষ হইতে একটা সর্প বাহির হইয়া তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে দংশন করে এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা বিহারস্থ সকলেই জানিতে পারিল এবং ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'অমুক ভিক্ষু অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিবার সময় সর্পদংশনে মারা গিয়াছেন।' অনন্তর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত জানিয়া বলিলেন, "দেখ, সেই ভিক্ষু যদি সর্পরাজকুল চতুষ্টয়ে মৈত্রী প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে উহাকে কখনও সর্পে দংশন করিত না। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও তাপসেরা এই চতুর্ব্বিধ সর্পরাজকুলে মৈত্রী দেখাইয়া সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিধ রিপু দমনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া যান। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তিনি অভিজ্ঞা সমাপ্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গানদীর নিবর্ত্তন স্থানে আশ্রম নিম্মাণপূর্ব্বক ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন।

এই সময়ে গঙ্গাতীরে নানাজাতীয় সর্প ছিল। তাহারা ঋষিগণের তপশ্চর্য্যার ব্যাঘাত ঘটাইত এবং অনেককে দংশনে নিহত করিত। ঋষিরা শেষে বোধিসত্ত্বকে এই ব্যাপার জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঋষিকে এক স্থানে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি চতুর্ব্বিধ অহিরাজকুলে মৈত্রী প্রদর্শন কর, তাহা হইলে সর্পেরা তোমাদিগকে দংশন করিবে না। অতএব এখন হইতে অহিরাজকুল চতুষ্টয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিবে।" এই উপদেশ দিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

বিরূপাক্ষ, এলাপত্র, শৈব্যাপুত্র আর
কৃষ্ণ-গৌতমক এই নাগরাজ চার।
সকলেই মিত্র এরা জানিবে আমার;
কারো সঙ্গে নাহি মম শত্রু-ব্যাবহার।[১]

এইরূপ চারি নাগরাজকুলের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তোমরা এই ইহাদিগকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন কর, তাহা হইলে সর্পজাতীয় কোন প্রাণী কখনও তোমাদিগকে দংশন করিবে না; তোমাদের অন্য কোন অনিষ্টও করিবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ,
কিংবা বহুপদ যারা বিচরে ভূতলে,
সকলেই হয় মম প্রীতির আস্পদ;
মৈত্রীভাব সদা আমি দেখাই সকলে।

এবম্প্রকারে নিজের মৈত্রীভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :

বহুপদ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ জীবগণ,
পদহীন কিংবা যারা কর বিচরণ,

---

[১]। সম্ভবতঃ ইহা এইটি সাপুড়ের মন্ত্র। মহাভারতের আদিপূর্ব্বে (৩৫শ অধ্যায়) বহুজাতীয় সর্পের নাম আছে; তাহাদের মধ্যে এক জাতির নাম এলাপত্র। ইহাই বোধ হয় পালি—'এরপথো'। এই গাথার অপর তিন জাতীয় নাম মহাভারতে নাই।

তোমা সবাকার কাছে, যুড়ি দুই কর,
করিও না হিংসা মোরে, মাগি এই বর।

ইহার পর তিনি প্রাণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আধারণভাবে এই গাথা বলিলেন :

ধরাধামে জন্ম যারা করেছে বিচরণ,
যত প্রাণী বিশ্বমাঝে করে বিচরণ,
সর্ব্বজীব হোক সুখী এই আমি চাই;
নাহি পশে দুঃখ যেন কভু কারো ঠাঁই।[১]

সর্ব্বভূতে সমভাবে মৈত্রী প্রদর্শন করিতে হইবে এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষিদিগের দ্বারা ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করাইবার জন্য বলিলেন, "বুদ্ধ অপ্রমাণ, ধর্ম্ম অপ্রমাণ, সঙ্ঘ অপ্রমাণ। তোমরা এই ত্রিরত্নের গুণ সর্ব্বদা মনে রাখিবে।" রত্নত্রয় অপ্রমাণ, কিন্তু জীবগণ সপ্রমাণ ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "সরীসৃপ, বৃশ্চিক, শতপদী, "উর্ণনাভ, গোধিকা, মূষিক ইত্যাদি সপ্রমাণ। ইহাদিগের দেহে দ্বেষানুরাগাদি যে সকল প্রবৃত্তি আছে সেইগুলি উহাদের সপ্রমাণতার কারণ। অতএব অপ্রমাণ রত্নত্রয়ের মাহাত্ম্যবলে আমাদিগকে দিবারাত্র এই সকল সপ্রমাণ জীব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি তোমরা ত্রিরত্নের মহাত্ম্য ভুলিও না।" অনন্তর অন্যান্য কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশার্থ তিনি এই গাথা বলিলেন :

সুরক্ষিত এবে আমি, লভিয়াছি পরিত্রাণ;
হিংসারত প্রাণিগণ, যাও ছাড়ি এই স্থান।
অপ্রমাণ ভগবান, লইলাম নাম তার,
সপ্তবুদ্ধে[২] স্মরি আমি; ভয় কিবা আছে আর?

ঋষিগণ সপ্তবুদ্ধকে স্মরণ করিয়া যখন নমস্কার করিতেছিলেন, বোধিসত্ত্ব

---

[১]। এই গাথা চারিটিকে প্রকৃতপক্ষে একটি গাথা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের চতুর্থটির সঙ্গে Coleridge প্রণীত Rime of the Ancient Nariner নামক কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় তুলনীয় :—

He prayeth well,who loveth well
Both man and bird and beast,
He prayeth best who loveth best
All things both great and small;
For the bear God, who loveth us;
He made and loveth all.

[২]। সপ্তবুদ্ধ—বিদর্শী (বিপস্‌সী) হইতে গৌতম পর্য্যন্ত সাত জন বুদ্ধ বিশিষ্টভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন (প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

তখন তাঁহাদিগকে এই রক্ষাকবচ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঋষিরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া মৈত্রীভাবনা ও বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতেন। তাঁহারা বুদ্ধগুণস্মরণ করিতেন বলিয়া সর্পজাতীয় সর্ব্ব প্রাণী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে শেষে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

[**সমবধান :** তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতকের নাম খন্ধবত্ত হইল কেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলাম না। 'বিরূপক্‌খেহি' ইত্যাদি মন্ত্রটি সূত্রপিটকে 'খন্ধ পরিত্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ ইহা পাঠ করিলে খন্ধের (স্কন্ধের) অর্থাৎ শরীরের পরিত্রাণ বা রক্ষা হয়। 'বত্ত' শব্দের বহু অর্থের মধ্যে, 'শ্লোক' 'কত্তর্ব্য' ইত্যাদি দেখা যায়। অএব 'খন্ধবত্ত' বলিলে, যে শ্লোক পাঠে বা যাহার অনুষ্ঠানে সর্পাদির ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এরূপ, কিছু বুঝা যাইতে পারে। 'খন্ধবট্ট' একটি স্বতন্ত্র শব্দ।

----

২০৪. বীরক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে বুদ্ধলীলানুকরণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া ছিলেন। যখন স্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন) দেবদত্তের শিষ্যদিগকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন[১] তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত তোমাদিগকে দেখিয়া কি করিল?" "তিনি বুদ্ধের অনুকরণ করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বাররাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদককাক যোনিতে[২] জন্মগ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক সরোবরের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বীরক।

---

[১]। লক্ষণ-জাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

[২]। উদককাক = পানিকৌড়ি।

একবার কাশীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে তখন কাকবলি[১] দিতে পারিত না; যক্ষনাগ প্রভৃতিকেও পূজা দিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্য হইতে কাকগণ দলে দলে বনভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বারাণসীবাসী সবিষ্ঠক নামক এক কাক নিজের ভার্য্যাকে লইয়া বীরকের বাসস্থানে গমন করিল এবং সেই সরোবরেরই এক পার্শ্বে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সরোবরের তীরে আহারার্থ বিচরণ করিবার সময় সবিষ্ঠক দেখিতে পাইল যে বীরক জলে অবতরণ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করিল এবং তীরে উঠিয়া পক্ষ শুষ্ক করিতে লাগিল। ইহাতে সে মনে করিল যে 'এই উদককাকের আশ্রয়লাভ করিতে পারিলে বহু মৎস্য পাইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহারই উপাসনা করা যাউক।' এই স্থির করিয়া সে বীরকের সমীপবর্ত্তী হইল। বীরক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, তুমি কি চাও?" সবিষ্ঠক বলিল, "আমি আপনার সেবক হইতে ইচ্ছা করি।" বীরক বলিলেন, "বেশ! তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" তদবধি সবিষ্ঠক বীরকের সেবা করিতে লাগিল। বীরক মৎস্য তুলিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা নিজে খাইতেন, অবশিষ্ট সবিষ্ঠককে দিতেন। সবিষ্ঠকও যাহা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আবশ্যক তাহা নিজে খাইত; অবশিষ্ট তাহার ভার্য্যাকে দিত।

ক্রমে সবিষ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। সে ভাবিল, 'এই উদককাক কৃষ্ণবর্ণ, আমিও কৃষ্ণবর্ণ, অক্ষি, তুণ্ড, পাদ প্রভৃতিতে ও ইহাতে আমাতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এখন হইতে আর ইহার গৃহীত মৎস্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই মৎস্য ধরিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া সবিষ্ঠক বীরকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "সৌম্য, এখন হইতে আমিও সরোবরে অবতরণ করিয়া মাছ ধরিব।" বীরক বলিলেন, "দেখ ভাই, যাহারা জলে নামিয়া মাছ ধরিতে পারে, তুমি সে কুলে জন্ম নাই; এরূপ চেষ্টা করিয়া মরিবে কেন?"

বীরকের নিষেধসত্ত্বেও তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবিষ্ঠক সরোবরে অবতরণ করিল; কিন্তু শৈবাল ভেদ করিয়া অগ্রসর বা নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না; সে শৈবালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল; তাহার তুণ্ডের অগ্রভাগ মাত্র জলের উপরে রহিল। কাজেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

সবিষ্ঠকের ভার্য্যা স্বামীর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাহার সংবাদ লইবার জন্য বীরকের নিকট গেল এবং বলিল, "স্বামিন্, সবিষ্ঠককে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কোথায়?"

---

[১]। কাকবলি-সম্বন্ধে মনু-তৃতীয় অঃ ৯২ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই প্রশ্ন করিবার সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিয়াছিল :

কলকণ্ঠ শিখিগ্রীব পতি মম সবিষ্ঠক;
কোথা তিনি, বল মোরে, দয়া করি, হে বীরক।

বীরক বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীর গতিস্থান জানি।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

জলে স্থলে চরে, মৎস্য ধরি খায়, পক্ষী আমাদের মত।
অনুকরণের চেষ্টায় তাদের সবিষ্ঠক হ'ল হত।
করিনু নিষেধ, না শুনি সে কথা পশিল সে সরোবরে,
শৈবালে জড়িত হল পক্ষপাদ; স্বামী তব ডুবি মরে।

ইহা শুনিয়া কাকী বিলাপ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সবিষ্ঠক এবং আমি ছিলাম বীরক।]

---

২০৫. গাঙ্গেয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে দুইজন দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের ভদ্রবংশোদ্ভব। ইহারা বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও জীবদেহের অশুভভাব[১] উপলব্ধ করিতে না পারিয়া নিজেদের রূপের প্রশংসা করিতেন এবং রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন।

রূপ লইয়া একদিন ইহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন "তুমি সুরূপ বটে; কিন্তু আমিও সুরূপ।" অনন্তর ইহারা অনতিদূরে এক বৃদ্ধ 'স্থবিরকে' উপবিষ্ট দেখিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তি বলিতে পারিবেন, আমাদের মধ্যে কে সুরূপ, কে কুরূপ।" ইহারা ঐ ব্যক্তির নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বলুন ত আমাদের মধ্যে কে সুরূপ।" স্থবির উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক রূপবান।" ইহাতে দহরদ্বয় ঐ স্থবিরের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তাহারা বলিলেন, "এ বুড়া আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহায় উত্তর দিল না; যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না, তাহার উত্তর দিল।"

তাঁহাদের এই কীর্ত্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের গোচর হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,

---

[১]। অর্থাৎ ইহা মল, মূত্র, রক্ত, রস ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ [ন্যগ্রোধ মৃগ জাতকের (১২)]—প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

"অমুক বৃদ্ধ স্থবির সেই রূপগর্ব্বিত দহরদ্বয়কে বড় লজ্জা দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, এই দহর দুইটি যে এজন্মেই রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহাদের এই রূপই প্রকৃতি ছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। সেই সময়ে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে এক গাঙ্গেয় মৎস্য ও এক যামুনেয় মৎস্য নিজেদের রূপের কথা লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। প্রত্যেকেই বলিয়াছিল, 'তুমি সুরূপ বটে, কিন্তু আমিও সুরূপ।" অদূরে গঙ্গাতটে এক কচ্ছপ শুইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া উভয়েই বলিল, "আমাদের মধ্যে কে সুরূপ বা কুরূপ এই কচ্ছপ বিচার করিবে।" অনন্তর তাহারা কচ্ছপের নিকট গিয়া বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, বলত গাঙ্গেয় মৎস্যই সুরূপ, না যামুনেয় মৎস্য সুরূপ।" কচ্ছপ উত্তর দিল, "গাঙ্গেয় মৎস্য সুরূপ, যামুনেয় মৎস্যও সুরূপ; কিন্তু আমি উভয়ের অপেক্ষাও সুরূপ।" এই উত্তর দিবার সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিয়াছিল :

গঙ্গাজাত মৎস্য সুশ্রী, সুশ্রী মৎস্য যমুনার,
কিন্তু এরা সমকক্ষ কিছুতে নহে আমার।
চতুষ্পদ জীব আমি, কে আছে আমার সম?
ন্যগ্রোধের কাণ্ডতুল্য গোলাকার দেহ মম।
সুপ্রশস্ত গ্রীবা মোর, ক্রমসূক্ষ্ম, ঈষা যথা;
সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী আমি, বলিলাম সত্য কথা।

কচ্ছপের কথা শুনিয়া মৎস্যদ্বয় বলিল, "দেখ, এই পাপ কচ্ছপ আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলিতেছে।" ইহা বলিবার সময় তাহারা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিল :

জিজ্ঞাসিনু যাহা, উত্তর তাহার দিলনা কচ্ছপ খল;
জিজ্ঞাসা না করি, এ হেন প্রশ্নের উত্তরে বল কি ফল?
নিজের প্রশংসা নিজ মুখে সদা; লোক-লজ্জা নাহি ডরে;
এ হেন লোকের সংসর্গে থাকিতে মন নাহি কভু সরে।

[**সমবধান :** তখন এই দহর ভিক্ষু দুই জন ছিল সেই মৎস্য দুইটি; এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই কচ্ছপ; এবং আমি ছিলাম গঙ্গাতীরবাসী সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি ইহাদের উক্ত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

---

২০৬. কুরঙ্গ মৃগ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সরোবরতীরস্থ এক গুল্মে বাস করিতেন। ঐ সরোবরের অদূরে কোন বৃক্ষের অগ্রে এক শতপত্র[১] এবং সরোবরের জলে এক কচ্ছপ থাকিত। এই প্রাণীত্রয় পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতিভাবে কালযাপন করিত।

একদিন এক ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে সেই সরোবরের ঘাটে বোধিসত্ত্বের পদাঙ্ক দেখিয়া লৌহনিগড়সদৃশ দৃঢ় চর্ম্মপাশ বিস্তৃত করিয়া চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব রাত্রির প্রথম যামে জলপান করিতে গিয়া ইহাতে বদ্ধ হইলেন এবং বন্ধনসূচক আর্ত্তনাদ করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া বৃক্ষাগ্র হইতে শতপত্র এবং জল হইতে কচ্ছপ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শতপত্র কচ্ছপকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সৌম্য, তোমার দন্ত আছে, তুমি এই পাশ ছেদন কর; আমি গিয়া, যাহাতে ব্যাধ না আসিতে পারে, তাহার উপায় করি। আমরা উভয়ে এইরূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিলে আমাদের বন্ধুর জীবন রক্ষা হইবে।" পরামর্শ দিবার সময় শতপত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

এস কূর্ম্ম, তীক্ষ্ণদন্তে কাট এই চর্ম্ম পাশে;
আমি গিয়া করি ব্যাধ যাতে না এখানে আসে।

তখন কচ্ছপ গিয়া চর্ম্মরজ্জুগুলি কাটিতে আরম্ভ করিল; এবং শতপত্র ব্যাধের বাসস্থানে উড়িয়া গেল। ব্যাধ প্রত্যূষেই শক্তি হস্তে লইয়া বাহির হইল। কিন্তু সে যেমন সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইতেছে, অমনি শতপত্র বিরাব ও পক্ষসঞ্চালন করিতে করিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ ভাবিল, কোন দুর্লক্ষণ পক্ষী তাহার মুখে আঘাত করিয়াছে। সে গৃহে ফিরিয়া অল্পক্ষণ শুইয়া রহিল এবং পুনর্ব্বার শক্তিহস্তে শয্যাত্যাগ করিল। শতপত্র ভাবিল, 'এ প্রথমবার সামনের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিল; এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইবে।' অতএব সে পশ্চাতের দ্বারেই গিয়া বসিয়া রহিল। ব্যাধও ভাবিল,

---

[১]। শতপত্র, বক। সংস্কৃতে কিন্তু এই শব্দে কাষ্ঠকুট্ট, শুক প্রভৃতি অনেক পক্ষীকে বুঝায়।

'সামনের দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় অপেয়ে পাখীটা বাধা দিয়াছে; এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হই।' কিন্তু সে যেমন পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইল, অমনি শতপত্র পূর্ব্বের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ এবারও দুর্লক্ষণ পক্ষীদ্বারা প্রহত হইয়া ভাবিল, 'আজ দেখিতেছি এ পাখীটা আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না।' সে ফিরিয়া গিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত শুইয়া রহিল এবং অরুণোদয়ের পর শক্তি লইয়া বাহির হইল। এবার শতপত্র বেগে উড়িয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ব্যাধ আসিতেছে।" তখন কচ্ছপ একটি রজ্জু ব্যতীত অন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু রজ্জু ছেদন করিতে করিতে তাহার দাঁতে এমন ব্যথা হইয়াছিল যে সে সময়ে তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন দন্তগুলি তখনই পড়িয়া যাইবে। তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ব্যাধপুত্র শক্তিহস্তে অশনিবেগে আগমন করিতেছে; তিনি সমস্ত বল-প্রয়োগপূর্ব্বক সেই অবশিষ্ট বন্ধনটি ছিন্ন করিয়া বনে পলাইয়া গেলেন। শতপত্র গিয়া বৃক্ষাগ্রে বসিল; কিন্তু কচ্ছপ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে সে ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিল। ব্যাধ তাহাকে তুলিয়া এক থলিতে পূরিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে বান্ধিয়া রাখিল।

বোধিসত্ত্ব পশ্চাতে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে। তখন বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তিনি যেন অতি দুর্ব্বল হইয়াছেন এইভাবে, ব্যাধের দৃষ্টিগোচর হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ অতি দুর্ব্বল হইয়াছে; অক্লেশে ইহাকে মারিতে পারিব।' এই আশায় সে শক্তি লইয়া তাঁহার অনুধাবন করিল; বোধিসত্ত্ব তাহা হইতে অতিদূরেও না, তাহার অতি নিকটেও না, এইরূপে যাইতে যাইতে তাহাকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন অনেক পথ যাওয়া হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে বঞ্চনা করিয়া বাতবেগে অন্যপথে সেই গুঁড়ির কাছে গেলেন, শৃঙ্গ দ্বারা থলিটাকে তুলিলেন, উহা মাটিতে ফেলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং কচ্ছপকে বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া শতপত্রও বৃক্ষাগ্র হইতে অবতরণ করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব বন্ধুদ্বয়কে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমাদের সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে; তোমরা আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছ। ব্যাধ আসিয়া এখনই তোমাদের ধরিয়া ফেলিবে; অতএব, তুমি, ভাই শতপত্র, নিজের সন্তান সন্ততি লইয়া অন্যত্র যাও; তুমি, ভাই কচ্ছপও, জলে প্রবেশ কর।" শতপত্র ও কচ্ছপ তাহাই করিল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :

কচ্ছপ সলিলে পশে, কুরঙ্গ কাননে,
বৃক্ষাগ্র করি বর্জ্জন, লয়ে পুত্র পরিজন
শতপত্র দূর দেশে যায় হৃষ্টমনে।]

ব্যাধ ফিরিয়া আসিয়া দেখে সেখানে কেহই নাই; ছেঁড়া থলিটা মাত্র পড়িয়া আছে। সে উহা লইয়া বিষণ্ন চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। সেই বন্ধুত্রয় যাবজ্জীবন অনবচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ্যে থাকিয়া পরিণামে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ; সারিপুত্র ছিলেন সেই শতপত্র; মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গমৃগ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের মিত্রসংপ্রাপ্তি এবং হিতোপদেশের মিত্রলাভ প্রকরণে কাক লঘুপতবক, মূষিক হিরণ্যক, কুর্ম্ম মন্থর এবং মৃগ চিত্রাঙ্গ, এই প্রাণীচতুষ্টয়ের কথার সহিত এই জাতকের সৌসাদৃশ্য আছে।

---

২০৭. অশ্বক-জাতক

[জেতবনের এক ভিক্ষু তাহার পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু! তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিল, "হাঁ, প্রভু!" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" "আমার পত্নী (যাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ভিক্ষু হইয়াছি)।" "তুমি যে কেবল এ জন্মে এই রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছ তাহা নহে; পূর্ব্ব জন্মেও ইহার প্রণয়ে পড়িয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কাশীরাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি উর্ব্বরী[১] নাম্নী প্রধানা মহিষীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই রমণী দেহের কান্তিতে দিব্যাঙ্গনাদিগের তুল্যকক্ষ না হইলেও অপর সমস্ত নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নয়নাভিরাম রূপলাবণ্য দেখিলে সকলেই মোহিত হইত।

কিয়ৎকাল পরে উর্ব্বরীর মৃত্যু হইল। তখন রাজা নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং বিষণ্নবদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মহিষীর মৃতদেহে

[১]। যে স্ত্রী অন্য আরও কয়েকজন স্ত্রীর সহিত পত্নীরূপে প্রদত্ত হইত, তাহাকে উর্ব্বরী বলা যাইত।

প্রলেপ দিয়া উহা তৈলপূর্ণ দ্রোণির[১] মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ দ্রোণি নিজের খট্টার নিম্নে রাখিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিরত রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন, মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! শোক করিবেন না; উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেই অনিত্য।" কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। মৃত মহিষীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে তিনি এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন।

তৎকালে বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া দিব্যচক্ষুদ্বারা[২] জম্বুদ্বীপ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহারাজ অশ্বক শোকবিহ্বল হইয়া পরিদেবন করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির সান্ত্বনাবিধান করিব।'[৩] এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং তত্রত্য মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় সমাসীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে পোতলি নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার রাজার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত প্রসন্নভাবে আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, তোমাদের রাজা ধার্ম্মিক ত?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "হাঁ ভদন্ত, আমাদের রাজা পরমধার্ম্মিক; কিন্তু তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পত্নীর দেহ দ্রোণির মধ্যে রাখিয়া অবিরত শুইয়া আছেন ও বিলাপ করিতেছেন। আপনি দয়া করিয়া রাজার দুঃখাপনোদন করুন না কেন? ভবাদৃশ শীলসম্পন্ন মহাপুরুষেরা তাঁহার দুঃখ অনুভব না করিলে আর কে করিবে?" "দেখ মাণবক, আমার সঙ্গে রাজার পরিচয় নাই; তবে যদি তিনি নিজে আসিয়া আমার জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি মৃতমহিষী এখন কোথায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে পারি; এমন কি, তাঁহাদ্বারা রাজার সঙ্গে কথা বলাইতেও পারি।" "যদি এরূপ হয়, ভদন্ত, তবে আমি যতক্ষণ রাজাকে লইয়া না আসি, আপনি ততক্ষণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে

---

[১]। 'ডোঙ্গা,' 'নাদা' 'কলসী' ইত্যাদি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দ্রুম, দারু প্রভৃতি শব্দ এবং দ্রোণি শব্দ বোধ হয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে 'দ্রোণি' শব্দে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রই বুঝাইত।

[২]। চক্ষু ত্রিবিধ—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও প্রজ্ঞাচক্ষু।

[৩]। মূলে 'আশ্রয়স্থানীয় হইব' এই ভাব আছে।

সম্মতি প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণকুমার রাজার নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এখন সেই দিব্যচক্ষু মহাপুরুষের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য।"

উর্ব্বরীকে দেখিতে পাইব ইহা ভাবিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে রথারোহণে উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি প্রকৃতই দেবীর পুনর্জ্জন্মস্থান জানিতে পারিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ।" "তিনি কোথায় জন্মিয়াছেন?" "ঐ রমণী সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিলেন; কোনরূপ সৎকার্য্য সম্পাদন করেন নাই, কাজেই এই উদ্যানেই গোময়কীট-যোনিতে[১] জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" "এ কথা ত আমার বিশ্বাস হয় না।" "বিশ্বাস না হয় ত আমি তাঁহাকে দেখাইতেছি এবং তাঁহারদ্বারা কথা বলাইতেছি।" "বেশ, তাঁহারদ্বারা কথা বলান ত।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হে কীটদ্বয়, যাহারা গোময়পিণ্ড গড়াইতে গড়াইতে লইয়া যাইতেছ, তোমরা একবার রাজার সম্মুখে এস ত।" তাঁহার তপোবলে কীট দুইটি তখনই সেখানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের একটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে কীটটী গোময়পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া দ্বিতীয় কীটটীর পশ্চাতে আসিতেছে, উহাই আপনার উর্ব্বরী দেবী। একবার দেখুন উহার এখন কি দশা হইয়াছে!" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, উর্ব্বরী যে গোময়কীট হইয়াছেন ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" "মহারাজ, আমি উহা দ্বারা কথা বলাইতেছি।" "আচ্ছা, ভদন্ত, একবার কথা বলান ত।" বোধিসত্ত্ব নিজের তপোবলে ঐ কীটকে বাক্‌শক্তি দিয়া বলিলেন, "উর্ব্বরী!" উর্ব্বরী মনুষ্যভাষায় উত্তর দিল, "কি আজ্ঞা করিতেছেন, ভদন্ত।" "পূর্ব্বজন্মে তোমার নাম কি ছিল?" "তখন আমার নাম ছিল উর্ব্বরী। আমি অশ্বক রাজার মহিষী ছিলাম।" "এখন তোমার প্রণয়ের পাত্র কে? অশ্বক রাজা, না এই গোময়কীট?" "ভদন্ত, সে যে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা। তখন আমি এই উদ্যানেই রাজার সহিত রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-জনিত সুখভোগ করিয়া বিচরণ করিতাম। কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণে আমার পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইয়াছে; অতএব সে রাজা এখন আমার কে? এখন আমি পারি ত অশ্বক রাজাকে মারিয়া ফেলি এবং তাহার কণ্ঠের রক্তে আমার বর্ত্তমান স্বামী এই গোময়কীটের পাদ রঞ্জিত করিয়া দিই।" ইহা বলিয়া সে সর্ব্বজনসমক্ষে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিল :

"অশ্বক নৃপতি পতি ছিলেন আমার;
কতই প্রণয় ছিল আমা দু'জনার;

---

[১]। গোময়কীট—গোবুরে পোকা।

ভালবাসিতেন তিনি, বাসিতাম ভাল,
এক সঙ্গে সুখে মোরা যাপিতাম কাল।
এবে কিন্তু সুখ দুঃখ নতুন প্রকার;
পুরাতন সুখ দুঃখ মনে নাই আর।
অশ্বকে আমার আর নাই প্রয়োজন;
হৃদয় গোময়কীটে করেছি অর্পণ।”

ইহা শুনিয়া অশ্বকের মনে পূর্ব্বকৃত পরিদেবনের জন্য অনুতাপ জন্মিল। তিনি সেখানে থাকিয়াই শয্যার নিম্ন হইতে রাজ্ঞীর শব বাহির করাইবার আদেশ দিলেন, অবগাহনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, নগরে প্রতিগমন করিয়া অপর এক রমণীকে অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন, এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও রাজাকে এইরূপে উপদেশ দিয়া ও শোকবিমুক্ত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান : তখন তোমার পত্নী ছিল উর্ব্বরী; যে তুমি এখন এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, সেই তুমি ছিলা রাজা অশ্বক; সারিপুত্র ছিলেন সেই মাণবক; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২০৮. শিশুমার-জাতক[১]

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ভিক্ষুগণ! দেবদত্ত যে কেবল এজন্মে আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু প্রাণবধ করা দূরে থাকুক, সে আমার ভীতি পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি যেমন পৌরুষবান, তেমনই সৌভাগ্যশালী ছিলেন এবং গঙ্গার নিবর্ত্তন-

---

[১]। শিশুমার—জলকপি (শুশুক); কিন্তু এখানে ইহা ‘কুম্ভীর’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থানে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। ঐ সময়ে গঙ্গাতে এক শিশুমার ছিল। তাহার ভার্য্যা বোধিসত্ত্বের শরীর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের মাংস আহার করিতে সাধ করিল এবং শিশুমারকে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ কপিরাজের হৃদয়ের মাংস খাই।" শিশুমার বলিল, "ভদ্রে, আমি জলচর, সে স্থলচর; আমি কিরূপে তাহাকে ধরিব বল?" "যেভাবে পার ধর; উহার হৃদয়ের মাংস না পাইলে আমি মারা যাইব।" "আচ্ছা, কোন চিন্তা নাই; একটা উপায় আছে, যাহা দ্বারা আমি তোমাকে তাহার হৃদয়ের মাংস খাওয়াইতে পারিব।"

ভার্য্যাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া শিশুমার গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল। তিনি তখন গঙ্গার জলপান করিয়া সেখানে বসিয়াছিলেন। শিশুমার বলিল, "বানররাজ, চিরকাল এই এক স্থানে থাকিয়া বিস্বাদ ফল খাইয়া কষ্ট পান কেন? গঙ্গার অপর পারে আম্র, লবুজ[১] প্রভৃতি সুমধুর ফলের অন্ত নাই; সেখানে গিয়া ঐ সমস্ত আহার করিলে কি ভাল হয় না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুম্ভীররাজ, গঙ্গা অতি বিস্তীর্ণা, ইহার জলও অগাধ; আমি ইহা পার হইব কিরূপে?" "যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "বেশ; চলুন তবে, যাওয়া যাউক!" কুম্ভীর বলিল, "আসুন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।"

তখন বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কুম্ভীর কিয়দ্দুর গিয়া জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বলিল, "সৌম্য, আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন? এ কিরূপ কাজ?" কুম্ভীর বলিল, "তুমি ভাবিয়াছ আমি তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার ভাল করিবার জন্য লইয়া যাইতেছি! তাহা নহে। আমার ভার্য্যার সাধ হইয়াছে যে, তোমার হৃদয়ের মাংস খাইবে; তাহাকে সেই মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" "সৌম্য, কথাটা খুলিয়া বলিয়া ভালই করিলে। আমার বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে ডালে ডালে লাফালাফি করিবার সময় উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইত।" "তবে তোমরা হৃদয়টা কোথায় রাখ?" অদূরে সুপক্ক ফলপিণ্ডসম্পন্ন একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছিল; বোধিসত্ত্ব তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"দেখনা, আমাদের হৃদয়গুলি ঐ উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে।" "দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তাহা হইলে আমি তোমায় মারিব না।" "তবে আমায় ওখানে লইয়া চল; বৃক্ষে যে হৃদয় ঝুলিতেছে, তাহা তোমাকে দিব।" তখন কুম্ভীর বোধিসত্ত্বকে লইয়া

---

[১]। সংস্কৃত 'লকুচ'। ইহা কাঁটাল জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার নামান্তর 'ডহু' (ডহুয়া বা বন কাঁটাল)।

সেই বৃক্ষের নিকট গেল; বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং শাখায় বসিয়া বলিলেন, "মূর্খ শিশুমার! তুমি বিশ্বাস করিলে যে প্রাণীদিগের হৃদয় বৃক্ষাগ্রে থাকে! তুমি নিতান্ত বোকা; আমি তোমায় ঠকাইয়াছি বুঝিতে পারিলে? তোমার মধুর ফলগুলি তুমিই ভোগ কর। তোমার দেহটী প্রকাণ্ড, কিন্তু বুদ্ধি ত আদৌ নাই।" এই ভাবপ্রকাশার্থ বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

সাগরের পারে আছে, মধুর ফলের বন,
আম্র-জম্বু পনসাদি-নাহি তাহে প্রয়োজন।
উড়ুম্বর বৃক্ষ এই—এই ভাল মোর কাছে,
যাহার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
বিশাল দেহটা তব, বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি;
ঠকিয়াছ, শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।

সহস্র মুদ্রা নষ্ট হইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়, শিশুমারও সেইরূপ হইল এবং সাতিশয় মানসিক যাতনা ভোগ করিতে করিতে স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার, চিঞ্চা মাণবিকা ছিল তাহার ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞ চরিয় পিটকে, মহাবস্তুতে এবং পঞ্চতন্ত্রেও এই গল্প দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রে শিশুমারের পরিবর্তে মকরের উল্লেখ আছে। ইংরাজী অনুবাদক রুশদেশ-প্রচলিত আর একটি গল্পেরও তাৎপর্য্য দিয়াছেন। তাহাতে বানরের পরিবর্তে উল্কামুখী স্থান পাইয়াছে—পাইবারই কথা, কারণ শীতপ্রধান দেশে বানর অপরিচিত; পরন্তু ধূর্ত্ততার জন্য 'শৃগাল' সর্ব্বত্র সুবিদিত।

ঈষপের এবং প্লেটোর গ্রন্থেও এই মর্ম্মের গল্প আছে। বানরেন্দ্র-জাতকে (৫৭) হৃৎপিণ্ডের কথা নাই; বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলাখণ্ডের উল্লেখ আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলার কথা পড়িলে পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বাক্‌শক্তিসম্পন্ন গহ্বরের কথা মনে পড়ে। প্রথম খণ্ডের কুরঙ্গমৃগজাতকে (২১) মৃগ সপ্তপর্ণী বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিল।

----

২০৯. কক্কর-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধর্ম্ম-সেনাপতি সারিপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক জনৈক দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নিজের দেহরক্ষাবিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। পাছে শরীরের কোন অসুখ হয় এই আশঙ্কায় তিনি কখনও অতি শীতল বা অতি উষ্ণ কোন বস্তু সেবন করিতেন না; শীতে বা উত্তাপে শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে বাহিরে পর্য্যন্ত যাইতেন না, চাউল বেশী গলিয়া গেলে কিংবা সুসিদ্ধ না হইলে সে ভাতও খাইতেন না। ক্রমে তাঁহার শরীরগুপ্তি-কুশলতার কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভ্রাতৃগণ, অমুক দহর ভিক্ষু নাকি শরীররক্ষায় বড় নিপুণ।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ভিক্ষু যে কেবল বর্ত্তমান জন্মে দেহরক্ষা-সম্বন্ধে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও ইহার এইরূপ প্রকৃতি ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বনভূমিতে বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক শাকুনিক একটা "কোট্‌না" কক্কর,[২] পশমের দড়ি, ও লাঠি লইয়া কক্কর ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিল। একটা বৃদ্ধ কক্কর লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া বনে আসিয়াছিল; শাকুনিক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ কক্করটা পশমের পাশ চিনিত, কাজেই ধরা দিল না, এক একবার উড়িয়া এবং এক একবার মাটিতে নামিয়া পলাইতে লাগিল। তখন শাকুনিক নিজের দেহ শাখাপল্লবদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুনঃ পুনঃ যষ্টি ও পাশ স্থাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহাকে লজ্জা দিবার অভিপ্রায়ে কক্কর মানুষী ভাষায় নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

---

[১]। childers "প্রণীত' অভিধানে 'কক্কর' শব্দ দেখা যায় না। সিংহলী অক্ষরে মুদ্রিত অভিধানে দেখা যায় ইহা তিত্তির জাতীয় এক প্রকার পক্ষী। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম 'ক্রকর', 'ক্রকণ' বা কৃকণ। 'কক্কর' শব্দের পরিবর্তে 'কুক্কুট' এই পাঠান্তরও আছে।

[২]। মূলে 'দীপক কক্করং' এই পদ দেখা যায়। 'দীপক' শব্দের অর্থ ইংরাজী অনুবাদক 'decoy bird' করিয়াছেন। অভিধানে এতদ্বারা শ্যেনজাতীয় এক প্রকার মাংসাশী পক্ষীও বুঝায়।

অশ্বকর্ণ, বিভীতক,[১] দেখিয়াছি বৃক্ষ কত;
পারে না চলিতে তারা কিন্তু হে তোমার মত।

শাকুনিককে এই কথা বলিয়া সেই কক্কর পুনর্ব্বার অন্যত্র চলিয়া গেল। তাহার পলায়ন করিয়া যাইবার সময় ব্যাধ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

পুরাতন 'ঘাগি' এই খাঁচাভাঙ্গা পাখী;
চেনে ভাল, তাই আজ দিল মোরে ফাঁকি।
পলাইল, আরও দু'টা শুনাইল কথা;
আজকার চেষ্টা মোর সব হ'ল বৃথা।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ঐ বনে পর্য্যটন করিয়া যাহা পাইল তাহাই লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ; এই শরীররক্ষা-নিপুণ ভিক্ষু ছিল সেই পুরাণ কক্কর; আর আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

---

২১০. কন্দগলক-জাতক

[শাস্তা সুগতের অনুক্রিয়াসম্বন্ধে বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে দেবদত্ত বুদ্ধলীলার অনুকরণ করিতেছে, তখন বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল একালে আমার অনুকরণের চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এই দুদ্দর্শা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খদিরবনে বিচরণ করিতেন বলিয়া 'খদিরবণীয়' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্দগলক নামক এক পক্ষীর সহিত বোধিসত্ত্বের বন্ধুত্ব ছিল; ঐ পক্ষী একটি সুস্বাদুফলবহুল বনে বিচরণ করিত।

একদিন কন্দগলক বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। "আমার বন্ধু আসিয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে লইয়া খদিরবনে প্রবেশ করিলেন এবং তুণ্ডের আঘাতে বৃক্ষ হইতে কীট বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন।

---

[১]। অশ্বকর্ণ—শাল। বিভীতক—বহেড়া।

বোধিসত্ত্ব এক একটি কীট দিতে লাগিলেন, কন্দগলক সেগুলি অতি তৃপ্তির সহিত উদরস্থ করিতে লাগিল,—তাহার বোধ হইল যেন সে মধুমিশ্রিত পিষ্টক খাইতেছে। এইরূপে খাইতে খাইতে তাহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। সে ভাবিল "এও কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মিয়াছে, আমিও কাষ্ঠকুটযোনিতে জন্মিয়াছি; কেন তবে ইহার অনুগ্রহান্নভোজী হই? আমিও এখন হইতে খদিরবনে বিচরণ করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বন্ধু, তোমার আর কষ্ট পাইতে হইবে না; আমিও খদিরবনে বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্র, তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ, তাহারা অসার শাল্মলীর ও সুস্বাদুফলবান বৃক্ষের বনে খাদ্য, সংগ্রহ করিয়া থাকে। খদির কাষ্ঠ সারবান ও অতি কঠিন। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।" কন্দগলক কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; সে বলিল, "আমি কি কাষ্ঠকূটকুলে জন্মি নাই?" অনন্তর সে বেগে ধাবিত হইয়া তণ্ডুদ্বারা খদিরকাষ্ঠে আঘাত করিল। কিন্তু তখনই তাহার তুণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল, চক্ষুদ্বয় ছুটিয়া কোটর হইতে নিষ্ক্রমনোন্মুখ হইল এবং মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে বৃক্ষের উপর থাকিতে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

সূক্ষ্মপত্রধর এই সকণ্টক কোন বৃক্ষ?
বলবন্ধু; কি নাম ইহার;
একটি আঘাতে মাত্র চূর্ণ হল, হায়, হায়,
তুণ্ড আর মস্তক আমার!

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বরূপী খদিরবণীয় দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

যে বনে কেবল আছে অসার কাষ্ঠের গাছ
করিয়াছ চিরকাল সেথা বিচরণ;
সারবান খদিরের কাষ্ঠেতে আঘাত করি
গরুড়ের[১] তুণ্ড, শির চূর্ণ হয় সে কারণ।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "ভাই কন্দগলক, যে বৃক্ষে আঘাত করিতে গিয়া তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইল ইহার খদির; ইহা অতি সারবান।" অনন্তর কন্দগলক অবিলম্বে সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই কন্দগলক; এবং আমি ছিলাম খদিরবণীয়।]

---

[১]। টীকাকার বলেন 'গরুড়' শব্দটি এখানে গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গৌরবার্থ অপেক্ষা শ্লেষার্থই বোধ হয় অধিক সঙ্গত।

২১১. সোমদত্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অধিক লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন স্থানে দুই তিন জন উপস্থিত থাকিলেও এই স্থবির তাহাদের সমক্ষে একটি মাত্র বাক্যও গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না। তাঁহার এমনই সলজ্জভাব ছিল[১] যে তিনি এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথা বলিয়া ফেলিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া লালুদায়ীর এই দোষসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কোন বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছ?" ভিক্ষুরা এই প্রশ্নের উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, লালুদায়ী যে কেবল এ জীবনে এইরূপ সলজ্জ হইয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পর তিনি দেখিলেন তাঁহার মাতাপিতা নিতান্ত দীনদশায় উপনীত হইয়াছেন। তখন তিনি সেই দুঃস্থ পরিবারের উন্নতি করিবার সঙ্কল্পে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজার কর্ম্মচারী হইলেন এবং বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

বোধিসত্ত্বের পিতা দুইটি গরুদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার একটি গরু মরিয়া গেল। তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, একটা গরু মারা গিয়াছে;—চাষবাস করা অসম্ভব হইয়াছে। তুমি গিয়া রাজার নিকট একটা গরু চাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি! এখনই আবার গিয়া গরু চাহিলে ভাল দেখাইবে না। আপনি বরং নিজেই গিয়া তাহার নিকট একটা গরু যাচঞা করুন।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বাছা তুমি জাননা আমি কত লজ্জাশীল। এক স্থানে দুই তিন জন লোক দেখিলেই আমার মুখ হইতে কথা বাহির হয় না।

---

[১]। মূলে তিনি 'সারজ্জবহুল' ছিলেন এইরূপ আছে। সারজ্জ = শারদ্য = লজ্জাশীলতা (shyness, nervousness &c.)।

আমি যদি রাজার কাছে গরু চাহিতে যাই, তাহা হইলে যে গরুটা জীবিত আছে তাহাও বোধ হয় তাঁহাকে দান করিয়া আসিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, যাহা হয় হউক, আমি কিছুতেই রাজার নিকট গরু চাহিতে পারিব না। রাজার নিকট কিরূপে কথা বলিতে হইবে তাহা বরং আপনাকে শিখাইয়া দিতেছি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ বাছা, তাহাই শিখাও।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পিতাকে লইয়া এক শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে বেণা ঘাস ছিল। তিনি উহার কয়েকটি আঁটি বান্ধিয়া স্থানে স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং এক একটিকে লক্ষ করিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন, "এই যেন রাজা, এই মনে করুন উপরাজ, আর এই সেনাপতি। আপনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে বলিবেন, 'মহারাজের জয় হউক', তাহার পর, যে গাথা শিখাইতেছি তাহা পাঠ করিয়া গরু চাহিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইয়া পিতাকে এই গাথা শিক্ষা দিলেন :

দু'টি গরু লয়ে করিতাম চাষ,
একটি তাহার গিয়াছে মরি।
যোড়াটি পুরায়ে দিন, মহারাজ,
করযোড়ে এই মিনতি করি।

ব্রাহ্মণ এক বৎসর চেষ্টা করিয়া এই গাথা অভ্যাস করিলেন এবং তদন্তর পুত্রকে বলিলেন, "বৎস সোমদত্ত, গাথাটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। এখন আমি যার তার কাছে ইহা আবৃত্তি করিতে পারি। অতএব আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল।"

বোধিসত্ত্ব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজদর্শনোপযোগী উপঢৌকন-সহ পিতাকে রাজ-সমীপে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া রাজাকে সেই উপঢৌকন দান করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সোমদত্ত, এ ব্রাহ্মণ কে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইনি আমার পিতা।" "ইনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" এই প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ গরু চাহিবার অভিপ্রায়ে গাথাটি পাঠ করিলেন :

দু'টি গরু লয়ে করিতাম চাষ;
একটি তাহার গিয়াছে মরি।
দ্বিতীয়টি, ভূপ, করুন গ্রহণ
করযোড়ে এই মিনতি করি।

রাজা বুঝিলেন ব্রাহ্মণ শ্লোক আবৃত্তি করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "সোমদত্ত, তোমার বাড়ীতে বোধ হয় অনেক গরু আছে।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ যদি দিয়া থাকেন, তবে অনেক আছে বৈকি।" এই উত্তরে রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে যেভাবে দান করা উচিত সেইভাবে বোধিসত্ত্বের পিতাকে সাজসজ্জাসুদ্ধ ষোলটি গরু ও বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্বেত-তুরগযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ সেই গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বও উক্ত রথে পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি সংবৎসর ধরিয়া আপনাকে কি বলিতে হইবে শিখাইলাম, কিন্তু যখন অবসর উপস্থিত হইল, তখন আপনি কি না নিজের অবশিষ্ট গরুটাও রাজাকে দিয়া ফেলিলেন!" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিলেন :

লইয়া বেণার আঁটি সংবৎসর কাল খাটি
শিখাইনু সযতনে; পণ্ড সমুদয়!
সভামধ্যে প্রবেশিয়া অর্থ দিলে উল্টাইয়া;
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে অভ্যাসে কি হয়?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া তাহার পিতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

যাচকের ভাগ্যে ফলে দুই ফল
অলাভ অথবা লাভ আশাতীত;
যাচঞার ফল, বৎস সোমদত্ত,
এই জেন তুমি সর্ব্বত্র বিদিত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মে শারদ্যবহুল হইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ স্বভাব ছিল।

সমবধান : তখন লালুদায়ী ছিল সোমদত্তের পিতা এবং আমি ছিলাম সোমদত্ত।]

---

২১২. উচ্ছিষ্টভক্ত-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যক্তা স্ত্রীর বিরহে বড় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই বিরহব্যথায় কাতর হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, হাঁ প্রভু, এ কথা মিথ্যা নহে।" "তোমার বিরহের কারণ কে বলত।" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন।" "দেখ ভিক্ষু, এই রমণী বড় অনর্থকারিকা। পূর্ব্বজন্মে সে তোমাকে নিজের জারের উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই কথা বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি দীনদশাগ্রস্ত ভিক্ষোপযোগী নটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা ছিল না। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন।

এই সময়ে কাশীরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণের এক অতি দুঃশীলা ও দুষ্টপ্রকৃতি পত্নী ছিল। সে নিয়ত পাপপথে বিচরণ করিত। একদিন কোন কারণে ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বর্হির্গত হইলে ব্রাহ্মণীর জার অবসর পাইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী তাহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিল; তাহার পর সেই ব্যক্তি বলিল, "আরও মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করি, কিছু আহার করিয়া যাইব।" তখন ব্রাহ্মণী তাহার জন্য সূপ, ব্যঞ্জন ও গরম ভাত প্রস্তুত করিল, 'খাও' বলিয়া গরম ভাত বাড়িয়া তাহার সম্মুখে দিল[১] এবং ব্রাহ্মণ আছে কিনা দেখিবার জন্য নিজে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণীর উপপতি যেখানে বসিয়া ভোজন করিয়াছিল, তাহার নিকটেই বোধিসত্ত্ব একমুষ্টি অন্ন পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গৃহে যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, ব্রাহ্মণ তখন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাতে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং "উঠ, ব্রাহ্মণ আসিয়াছে" বলিয়া উপপতিকে ভাণ্ডার গৃহে নামাইয়া দিল, অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সে তাঁহাকে বসিবার জন্য পিড়ি ও হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং উপপতি উচ্ছিষ্ট যে ভাত একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল, তাহার উপর কিছু গরম ভাত দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে বলিল।

ব্রাহ্মণ ভাতে হাত দিয়া দেখেন উপরে গরম, নিচে ঠাণ্ডা। ইহাতে সন্দেহ হইল, 'এই অন্ন সম্ভবতঃ অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট।' তখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্ন লিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

ভিতরে ঠাণ্ডা বাহিরে গরম
বাড়া ভাত কভু না হয় এমন।
বল ত, ব্রাহ্মণী, তোমায় শুধাই,
বিপরীত কেন দেখিবারে পাই?

ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে নিজের কৃতকর্ম্ম বাহির হইয়া পড়ে, এই আশাঙ্কায় ব্রাহ্মণী নিরুত্তর রহিলেন। তখন নটপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, 'ভাণ্ডারে যে পুরুষটিকে রাখিয়া দিয়াছে, সম্ভবতঃ সে

---

[১]। মূলে 'উণ্হভত্তং বডচেত্বা' আছে। নিজন্ত বুধ ধাতুর এইরূপ হয়। ইহা হইতে আমাদের 'ভাত বাড়িয়া' হইয়াছে।

ব্রাহ্মণীর জার; আর এই ব্যক্তি গৃহস্বামী; ব্রাহ্মণী নিজের দুষ্কার্য্য প্রকাশ হইবে এই ভয়ে কোন উত্তর দিতেছে না। অতএব আমিই ব্রাহ্মণকে ইহার দুষ্কার্য্যর কথা বলি এবং ইহার উপপতি যে ভাণ্ডারে আছে তাহা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, কিরূপে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, কিরূপে তাঁহার পত্নী উহার সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াছিল, কিরূপে সে আগভাত খাইয়াছিল, কিরূপে ব্রাহ্মণী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিরূপে উপপতিকে শেষে ভাণ্ডারের মধ্যে নামাইয়া দিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত কথাই তাহাকে জানাইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

নট আমি, ভিক্ষাহেতু আসিয়াছি তব দ্বারে।
ভাণ্ডারে রয়েছে সেই, খুঁজিতেছি তুমি যারে।

অনন্ত বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তিকে টীকি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং 'এবারকার কথা যেন মনে থাকে, আর কখনও এইরূপ পাপকর্ম্ম না কর' এইরূপ সাবধান করিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহারা যেন আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণও দুইজনকেই বিলক্ষণ তর্জ্জন ও প্রহার করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য দেহ ত্যাগ করিলেন।

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মদেশন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পত্নীরবিরহ বিধুর ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ভিক্ষুর গৃহস্থাশ্রম-পত্নী ছিল সেই ব্রাহ্মণী এই বিরহকাতর ভিক্ষু ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই নটপুত্র।]

----

২১৩. ভরু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবানের এবং ভিক্ষুগণের প্রচুর উপহার প্রাপ্তি ঘটিত। কথিত আছে যে "ভগবান সৎকৃত সমাদৃত, সম্মানিত, পূজিত, নিমন্ত্রিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-পথ্যৌষধ-ভৈষজ্য পরিষ্কারাদি[২] দ্বারা অর্চ্চিত হইতেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও

---

[১]। পাঠান্তরে ইহার নাম 'কুরুজাতক'। কথারম্ভেও 'ভরুরট্‌ঠে ভরু রাজা' না থাকিয়া 'কুরুরট্‌ঠে কুরুরাজা' দেখা যায়।

[২]। পালি সাহিত্যে ভৈষজ্য বলিলে ঔষধকে বুঝায়; ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চদ্রব্যও বুঝায়। পরিষ্কার বলিলে, পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধ, বাসি, সূচী ও পরিস্রাবণ (জল

সৎকৃত, সমাদৃত...ইত্যাদি।[১] কিন্তু অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকেরা সমাদৃত... ইত্যাদি হইতেন না। লাভ ও সম্মানের হানি ঘটিতেছে দেখিয়া তাঁহারা অহোরাত্র গোপনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা বলাবলি করিতেন, "শ্রমণ গৌতমের আবির্ভাবকাল হইতে আমাদের প্রাপ্তি ও মানমর্যদার ব্যাঘাত হইতেছে; শ্রমণ গৌতমই এখন যাহা কিছু ভাল তাহা পাইতেছেন। তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভোগ করিতেছেন। তাঁহার এ সৌভাগ্যের কারণ কি বলিতে পার।" একদা তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "শ্রমণ গৌতম জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমস্থানে বাস করিতেছেন; সেইজন্যই তাঁহার বহুপ্রাপ্তি ও সম্মান হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া অপর সকল বলিলেন, "এই যদি কারণ হয়, তবে আমরাও জেতবনে একটা আশ্রম নির্ম্মাণ করিব; তাহা হইলে আমাদেরও বিলক্ষণ প্রাপ্তি হইবে।" তখন সকলেই একবাক্যে এই যুক্তি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, 'আমরা যদি রাজাকে না জানাইয়া জেতবনে আশ্রম নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে ভিক্ষুরা বাধা দিবে। কিন্তু এমন লোকেই নাই যাহাকে উৎকোচ দিয়া বিপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনিতে পারা যায় না। অতএব রাজাকে উৎকোচ দিয়া আশ্রম নির্ম্মাণের স্থান গ্রহণ করা যাউক।'

এই পরমর্শ করিয়া তীর্থিকেরা রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যস্থতায় রাজাকে লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আমরা জেতবনে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিব। যদি কোন ভিক্ষু আপনাকে আসিয়া বলে যে আশ্রাম নির্ম্মাণ করিতে দিব না, তাহা হইলে আপনি যেন তাহাদিগের অনুকূলে কোন উত্তর না দেন।" রাজা উপঢৌকনের লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাইবে।"

রাজাকে এইরূপে বশীভূত করিয়া তীর্থিকেরা স্থপিত ডাকাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য সারাদিন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। শাস্তা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত হট্টগোল হইতেছে কেন হে?" আনন্দ বলিলেন, "ভগবান, তীর্থিকেরা জেতবনে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছেন; সেইজন্য এত

ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট দ্রব্য বুঝায়।

[১]। দানের ব্যখ্যা করিতে হইলে এইরূপ কোন একটি সূত্রই বোধ হয় আবৃত্তি করা হইত। দিব্যাবদানে (৮) দেখা যায় : "সৎকৃতো গুরুকৃতো মানিতো পূজিতো রাজভীরাজ-মাত্রৈর্ধনিভিঃ পৌরে ব্রাহ্মণৈ গৃহপতিভিঃ শ্রেষ্ঠিভিঃ সার্থবাহৈ র্দেবৈ র্নাগৈ র্যক্ষৈ রসুরৈ র্গরুড়ৈঃ কিন্নরৈ র্মহোরগৈ রিতি দেবনাগযক্ষাসুরগরুড়কিন্নরমহোরগাভ্যর্চ্চিতো বুদ্ধে ভগবান লাভী চীবরপিণ্ডপাত-শয়নাসন-গ্লানপ্রত্যয়-ভৈষজ্যপরিষ্কারাণাম্ সশ্রাবক সঙ্ঘঃ। গ্লানপ্রত্যয় (পালি'গিলানপচ্চয়')= রোগীর জন্য পথ্য ইত্যাদি।

গোল হইতেছে।" "আনন্দ, এস্থান তীর্থিকদিগের আশ্রমোপযোগী নহে; তীর্থিকেরা গণ্ডগোল ভালবাসে; তাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিব না।" অনন্তর সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া রাজাকে বলিয়া তীর্থিকদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ বন্ধ কর।"

ভিক্ষুরা রাজভবনে গিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা শুনিলেন যে ভিক্ষুরা আসিয়াছেন, বুঝিলেন যে তীর্থিকদিগের আশ্রম নির্ম্মাণে বাধা দেওয়াই তাঁহাদের আগমনের হেতু; কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভিক্ষুদিগের বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা এখন গৃহে নাই।" ভিক্ষুরা বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন যে রাজা উৎকোচপরতন্ত্র হইয়াই এরূপ করিতেছেন। অনন্তর তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে রাজার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন শুনিয়াও রাজা পূর্ব্ববৎ জানাইলেন যে তিনি গৃহে নাই। কাজেই তাঁহারাও বিফলপ্রযত্ন হইয়া শাস্তাকে এই সংবাদ দিলেন। শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দুই দুইবার এইরূপ মিথ্যা সংবাদ দিয়া রাজা কখনই গৃহে বসিয়া থাকিবেন না; তাঁহাকে শীঘ্রই প্রাসাদের বাহির হইতে হইবে।"

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শাস্তা চীবর পরিধান করিয়া ও পাত্র হস্তে লইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সহ রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে যাগূও খাদ্য দান করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন শাস্তা রাজাকে সুমতি দিবার জন্য ধর্ম্মদেশন আরম্ভ করিলেন : "মহারাজ, পুরাকালে রাজারা উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক সাধু ও শীলবানদিগকে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে রাজ্যচ্যুত ও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে ভরুদেশে ভরু নামে একরাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। বহু তাপস তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর তিনি একদা লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ পঞ্চশত শিষ্যসহ পর্ব্বত হইতে আরোহণ করিলেন এবং পথে নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে পরিশেষে ভরুনগরে উপনীত হইলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উত্তর দ্বারের সন্নিকটে শাখাপল্লবসমন্বিত একটা বট বৃক্ষের মূলে আহার করিয়া

সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ সেখানে অর্দ্ধমাস অবস্থিতি করিলে পর অন্য এক তাপস-নায়কও পঞ্চশত শিষ্যসহ ভরুনগরে আসিয়া ভিক্ষা করিলেন এবং বাহিরে গিয়া দক্ষিণদ্বার-সন্নিকটে তাদৃশ অপর একটি বটবৃক্ষের মূলে ভোজন শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঋষিনায়কদ্বয় স্ব স্ব স্থানে যথাবিরুচি কালযাপন করিয়া হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন।

ইহারা চলিয়া গেলে দক্ষিণদ্বারের নিকটস্থ বটবৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া গেল। অতঃপর ঋষিরা পুনর্ব্বার ভরুনগরে আগমন করিলেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে দক্ষিণদ্বার-সন্নিহিত বটবৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রথমে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যান্তে বাহির হইয়া উত্তরদ্বার সন্নিহিত বটবৃক্ষমূলে আহার শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপর দল দেখা দিলেন এবং তাঁহারাও নগরে ভিক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া উত্তরদ্বার সন্নিহিত সেই বটবৃক্ষের মূলেই উপনীত হইলেন—ইচ্ছা যে সেখানেই আহারাদি করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, "এ গাছ তোমাদের নয়, আমাদের।" এইরূপে বৃক্ষ লইয়া দুইদলে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া মহা কলহ উপস্থিত হইল। একদল বলিতে লগিলেন, "এ স্থানে আমরাই প্রথম বাস করিয়াছিলাম; ইহা তোমরাই গ্রহণ করিতে পারিবে না।" অপর দল উত্তর দিলেন, "এবার আমরাই প্রথম অধিকার করিয়াছি।" বৃক্ষমূলের জন্য এইরূপ কলহ করিতে করিতে শেষে দুইদলেই রাজভবনে গমন করিলেন।

রাজা আদেশ দিলেন যাঁহারা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃত অধিকারী। ইহাতেই অপর দল ভাবিলেন, "আমরা যে ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়াছি একথা কিছুতেই বলা হইবে না।" তাঁহারা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে একস্থানে রাজচক্রবর্ত্তীদিগের ভোগোপযোগী একটা রথপঞ্জর রহিয়াছে। তাঁহারা উহা আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকেও ঐ বৃক্ষমূলের অধিকার দান করুন।" রাজা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দুই দলেই ঐ বৃক্ষমূলে বাস করুন।" কাজেই দুই দলেই উহার অধিকারী হইলেন।

তখন অপর দল সেই রথপঞ্জরের চক্র আহরণ করিয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, কেবল আমাদিগকেই ঐ বৃক্ষের স্বামিত্ব প্রদান করুন।" রাজা তাহাই করিলেন।

অনন্তর দুইদল তাপসই অনুতপ্ত হইলেন। তাহারা ভাবিতে লগিলেন, 'অহো! আমরা বিষয় ভোগবাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছি, অথচ

একটা বৃক্ষমূলের জন্য কলহ করিতেছি, উৎকোচ দিতেছি! ধিক আমাদিগকে, আমরা কি অন্যায় কাজই করিয়াছি!' 'এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অতিবেগে পলায়নপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

ভরুরাজ্যে যে সকল দেবতা বাস করিতেন, তাঁহারা রাজার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যাঁহারা শীলবান তাঁহাদের মধ্যে কলহ ঘটাইয়া রাজা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা সমুদ্র উদবর্ত্তন করিয়া ত্রিশতযোজনব্যাপী ভরুরাজ্য নিমগ্ন করিলেন; তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইরূপে এক ভরুরাজের দোষে তাঁহার রাজ্যব্যাপী সকলেই বিনষ্ট হইল।

[এইরূপে অতীত বস্তু বর্ণনা করিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধভাব ধারণপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :

শুনি লোকে ভরু মুখে নরপতি
ঋষিদের মধ্যে ঘটায়ে কলহ
প্রাণত্যজে সেই পাপের কারণ;
উচ্ছিন্ন হইলা প্রজাগণসহ।
এই হেতু, যবে কুপ্রবৃত্তি আসি
মনের ভিতর প্রবেশিতে চায়,
পণ্ডিতমণ্ডলী ঘৃণাসহকারে
অকল্যাণ বলি বাধা দেয় তায়।
সত্যপথে চলে পুণ্যাত্মা যে জন,
সত্যবাক্য সদা করে উচ্চারণ।

এই ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে: দুই প্রব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করাও অসঙ্গত।"

সমবধান : আমি তখন ছিলাম সেই সর্ব্ব প্রধান ঋষি।

কোশলরাজ তথাগতকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি যখন ফিরিয়া গেলেন তখন লোক পাঠাইয়া তীর্থিকদিগের আশ্রম ভাঙ্গিয়াদিলেন। তীর্থিকেরা কাজেই নিরাশ্রয় হইল।]

---

২১৪. পূর্ণনদী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় তথাগতের প্রজ্ঞার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ, সম্যকসম্বুদ্ধের কি অসাধারণ প্রজ্ঞা; ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী; যেমন রসবতী তেমনি

প্রত্যুৎপন্না; যেমন তীক্ষ্ণা তেমনই অন্তস্তলদর্শিনী ও উপায়কুশলা[১]।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর পৌরোহিত্যে নিয়োজিত হইয়া রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের[২] পদ প্রাপ্ত হন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা কর্ণেজপদিগের[৩] বাক্য বিশ্বাস করিয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং "আমার কাছে আর থাকিও না" বলিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে নির্ব্বাচিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীপুত্র লইয়া কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিন অতীত হইলেই রাজা বোধিসত্ত্বের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন আচার্য্যকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে ভাল দেখাইবে না। একটা গাথা রচনা করিয়া[৪] উহা বৃক্ষপত্রে লেখা যাউক; কাকমাংস পাক করাইয়া তাহা এবং ঐ পত্র শ্বেতবস্ত্র দ্বারা বান্ধা যাউক; পরে পুটুলিটাকে রাজমুদ্রিকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইব। যদি তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হন, তাহা হইলে পত্র পাঠ করিয়াই, তৎসহ যে মাংস পাঠাইব তাহা কাকমাংস বলিয়া বুঝিতে পারিবেন এবং এখানে চলিয়া আসিবেন; নচেৎ আসিবেন না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা বৃক্ষপত্রে নিম্নলিখিত গাথাটি লিখিয়া দিলেন :

বারিপূর্ণা স্রোতস্বতী পেয় যার হয়,
তরুণ যবের ক্ষেত্রে যে লুকায়ে রয়,
দূরস্থ বান্ধব জন করিবে কি আগমন
যার রবে বুঝে লোকে, শুনহে ব্রাহ্মণ,

---

[১]। আরও কথিপয় জাতকে তথাগতের প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। তত্তৎস্থলেও এই বিশেষণগুলি প্রায় অবিকল একই রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। [মহা-উন্মার্গজাতক (৫৪৬) ইত্যাদি]।

[২]। এই কর্ম্মচারী রাজার ঐহিক (আর্থিক) এবং পারলৌকিক উভয় বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন।

[৩]। "পরিভেদকানং"—অর্থাৎ যাহারা মনোমালিন্য ঘটায় তাহাদিগের।

[৪]। গাথাং বন্ধিত্বা—গাথা বান্ধিয়া অর্থাৎ রচনা করিয়া। বাঙ্গালাতেও আমরা 'গান বান্ধা' বলি।

প্রেরিণু তাহার(ই) মাংস; করহ ভোজন।[১]

রাজা বৃক্ষপত্রে এই গাথা লিখিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে রাজা তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন। তখন তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

কাক মাংস পেয়ে, মোরে করিয়া স্মরণ;
পাঠাইলা রাজা মম ভোজনকারণ।
ইহাতেই মনে হয় আশার উদয়,
স্মরিবেন রাজা মোরে আবার নিশ্চয়।
হংসক্রৌঞ্চময়ূরের মাংস যদি পান,
আমারে তাহার(ও) অংশ করিবেন দান।
আশ্রিত জনের শুভ প্রভুর স্মরণে;
বিস্মরণে নানাবিধ অকল্যাণ আনে।

অনন্তর তিনি যান সজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাও তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

---

২১৫. কচ্ছপ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু মহাতক্কারিজাতকে[২] বলা যাইবে। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এজন্মে কথা বলিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

---

[১]। অর্থাৎ কাকমাংস। পূর্ণ নদীকে 'কায়পেয়া' (পালি 'কাকপেয়া') বলে, কারণ কাক তীরে বসিয়াই গলা বাড়াইয়া উহার জল পান করিতে পারে। তরুণ শস্যক্ষেত্র 'কাকগুহ্য' নামে অভিহিত, কারণ তাহার মধ্যে কাক লুকাইয়া থাকিতে পারে। কাকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কাকের ডাক শুনিয়া দূরস্থ প্রিয়জন শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে কি না তাহা নির্ণয় করিয়া থাকে।

[২]। তক্কারিয়-জাতক (৪৮১)।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগের অবধারণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটি হংসপোতক সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের বাসস্থান হিমবন্তপ্রদেশে চিত্রকূট শৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। ইহা অতি রমণীয়; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি? কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটি দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চুদ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিলেন। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রাম্যবালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "আরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কি রে?" তাহার মনে যখন এই ভাবের উদয় হইল, তখন হংসদ্বয়ের অতি দ্রুতবেগবশত তাহারা বারাণসী নগরস্থ রাজভবনের ঠিক উপরিদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল; সকলেই চিৎকার করিতে লাগিল উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্তপ্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল

এবং সম্ভবত সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়া ছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া আকাশ হতে পড়িয়া গিয়াছে এবং কচ্ছপলীলা সংবরণ করিয়াছে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারে না তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটি বলিলেন :

নির্ব্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ;
কিন্তু নিজবাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হ'তে শিখুক মানব।
সময় না বুঝি যেই কথা বলে, মুখ সেই;
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্ব্বজন;
বাচালতা দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন।

রাজা বুঝিলেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনিই হউন বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

[**সমবধান :** তখন কোকালিক ছিল সেই কচ্ছপ, মহাস্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন) ছিলেন সেই হংসপোতক দুইটি, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

☞ এই জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত আকাশচরকুর্ম্মের কথা অবিকল একরূপ। ঈষপের আখ্যায়িকাবলীতেও ইহার অনুরূপ একটি কথা দেখা যায়। কিংবদন্তী আছে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ নাট্যকার এস্কিলাস উৎক্রোশমুখভ্রষ্ট একটি কচ্ছপের পতনজনিত আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কচ্ছপ আকাশে উঠিয়াছিল উৎক্রোশের সহিত বন্ধুতবশত নহে, তাহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য।

----

২১৬. মৎস্য-জাতক[১]

[জনৈক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। ইহা জানিতে পাড়িয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষু তুমি কি সত্য সত্যই নারীর প্রেমে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভগবন, এ কথা মিথ্যা নহে।" "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ বল ত?" "আমার পূর্ব্বে পত্নী।" "দেখ, এই রমণী বড় অনর্থকারিণী; পূর্ব্বেও তুমি ইহার জন্য শূলে বিদ্ধ, আঙ্গারে পক্ক এবং ভক্ষিত হইতে যাইতেছিলে, কেবল একজন পণ্ডিত পুরুষের অনুগ্রহে তোমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্তদিগের জালে একটা মাছ পড়িয়াছিল। তাহারা মাছটাকে তুলিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর রাখিল এবং "অঙ্গারে পাক করিয়া খাইব" ইহা বলিয়া তাহারা শূলে ধার দিতে লাগিল। তখন মৎস্য মৎস্যর কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে এই গাথা বলিল :

অগ্নির উত্তাপ, তীক্ষ্ণ শূলের যাতনা—
এ ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়;
মৎস্যীর মনেতে পাছে হয় এ ধারণা
অন্য মৎস্যী সনে মোর ঘটেছে প্রণয়—
ভাবি ইহা কি যে কষ্ট পাইতেছি আমি,
জানেন কেবল তিনি যিনি অন্তর্য্যামী।
কামরূপ অগ্নি দহে আমার অন্তর;
ছাড়ি দাও, পড়ি পায়, হে ধীবরবর।
প্রেমিকের প্রাণ নাশ করে কি কখন
কোন দেশে, কোন কালে, যারা সাধুজন?

এই সময় বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া কৈবর্ত্তদিগের নিকটে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত

---

[১]। এই জাতকে এবং প্রথম খণ্ডোক্ত বৎস-জাতকে (৩৪) প্রভেধ অতি অল্প।

ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপত্নী ছিল সেই মৎস্যী; এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই মৎস্য; এবং আমি ছিলাম রাজার অমাত্য।]

----

২১৭. সেগৃগু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক পর্ণিক জাতীয় উপাসকের সম্বন্ধে এই গাথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু এক নিপাতে সবিস্তর বলা হইয়াছে [পর্ণিক-জাতক (১০২)]। শাস্তা এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, এতদিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন?" উপাসক বলিল, "আমার কন্যাটি সর্ব্বদা হাস্যমুখী; তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি তাহাকে একটি ভদ্রবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই কর্ত্তব্যবশত এতদিন আপনার দর্শনলাভের অবকাশ পাই নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমার কন্যাটি কেবল এজন্মেই যে শীলবতী হইয়াছে তাহা নহে, সে পূর্ব্বজন্মেও শীলবতী ছিল এবং তুমি এবার যেমন করিয়াছ, পূর্ব্বেও সেইরূপ তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই পর্ণিকজাতীয় উপাসকই কন্যার চরিত্র-পরীক্ষার্থ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং কামমোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া সেখানে তাহার হাত ধরিয়াছিল। কন্যাটি ইহাতে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন পর্ণিক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই নরনারীগণ
ইচ্ছামত হয় ভোগবিলাসে মগন।
তুমি কিলো সেগগু একা এতবড় সতী,
না জান বৃষলীধর্ম্ম হইয়া যুবতী?
বনে ধরিয়াছি হাত, কান্দ সে কারণ,
রয়েছে কুমারী যেন সারাটি জীবন।

---

[১]। এই জাতক এবং প্রথম খণ্ডোক্ত পর্ণিক-জাতক (১০২) প্রায় একরূপ। দ্বিতীয় গাথাটিও উভয় জাতকেই দেখা যায়।

তাহা শুনিয়া সেগগু বলিল, “বাবা, আমি সত্যসত্যই এখন পর্য্যন্ত কুমারীই রহিয়াছি; কখনও কোন পাপবাসনা আমার মনে স্থান পান নাই।” অনন্তর সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

যে জন রক্ষার কর্ত্তা, সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয় কে শুনেছে কবে?

পর্ণিক এইরূপে কন্যার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল এবং এক ভদ্রবংশীয় যুবকের হস্তে তাহাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পর্ণিক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান : তখন এই কন্যা ছিল সেই কন্যা, এই পিতা ছিল সেই পিতা; এবং আমি ছিলাম তাহার কার্য্যপ্রত্যক্ষকারিণী সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

২১৮. কূট বাণিজ (বণিক)-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কূটবণিককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে একজন সাধুবণিক এবং একজন ধূর্ত্তবণিক ছিল। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া পণ্যদ্রব্য পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বাণিজ্যার্থ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিল, এবং প্রচুর লাভ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অনন্তর সাধুবণিক ধূর্ত্তবণিককে বলিল, “এস বন্ধু, এখন আমরা পূজিপাটা ভাগ করিয়া লই।” ধূর্ত্ত বণিক ভাবিল, ‘এ লোকটা দীর্ঘকাল কুখাদ্য খাইয়া ও কুস্থানে শয়ন করিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন বাড়ীতে ফিরিয়া নানাবিধ মধুর খাদ্য খাইয়া অজীর্ণ দোষে মারা যাইবে। তাহা হইলে যাহা কিছু পূঁজিপাটা আছে, সমস্তই আমার হইবে।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে উত্তর দিল, “আজ নক্ষত্র ভাল নাই; দিনটা নিতান্ত অশুভ; হয় কাল নয় পরশু, যাহা হয় করা যাইবে।” কিন্তু এইরূপ একটা না একটা ছল করিয়া সে ক্রমাগত বিলম্ব করিতে লাগিল। তাহার পর সাধুবণিক নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের অংশ ভাগ করিয়া লইল এবং একদিন মাল্যগন্ধাদি লইয়া শাস্তার সহিত দেখা করিতে গেল। সে শাস্তার অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি দেশে ফিরিলে কবে?” সে উত্তর দিল, “আজ পনর

দিন হইল ফিরিয়াছি।" তবে বুদ্ধের পূজার জন্য আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন?" তখন সাধুবণিক শাস্তাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, এই বণিক যে কেবল এ জন্মে ধূর্ত্ত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ব জন্মেও ইহার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ছিল।" অনন্তর সাধুবণিকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিনিশ্চয়ামাত্যের[১] পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক গ্রামবাসী ও এক নগরবাসী বণিকের মধ্যে সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামবাসী বণিক নগরবাসী বণিকের নিকট পঞ্চশত লাঙ্গল-ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিল। নগরবাসী ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিল, এবং যে স্থানে ঐগুলি ছিল, সেখানে মুষিকবিষ্ঠা ছড়াইয়া রাখিল। অতঃপর গ্রামবাসী বণিক একদিন গিয়া বলিল, "বন্ধু আমার ফালগুলি[২] দাও ত।" ধূর্ত্ত বলিল, "ভাই, তোমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে" এবং নিজের উক্তি সমর্থনার্থ গ্রামবাসীকে ভিতরে লইয়া মুষিকবিষ্ঠা দেখাইল। গ্রামবাসী বলিল, "বেশ, খেয়েছে ত খেয়েছে; ইন্দুরে খাইলে তাহা কি করা যায়?" অনন্তর স্নানের সময় সে ধূর্ত্তের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেল, পথে এক বন্ধুর গৃহে বালকটিকে অভ্যন্তরস্থ একটি প্রকোষ্ঠে বসাইয়া বন্ধুকে বলিল, "দেখ ভাই, এই ছেলেটিকে আটকাইয়া রাখ, কোথাও যাইতে দিওনা।" তাহার পর সে নিজে স্নান করিয়া ধূর্ত্তের গৃহে ফিরিয়া গেল। ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলেকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" গ্রামবাসী বলিল, "ভাই, ছেলেটিকে তীরে বসাইয়া আমি জলে নামিয়াছি, এমন সময়ে একটা বাসপাখী আসিয়া তাহাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া গেল; আমি জলে প্রহার করিলাম, চীৎকার করিলাম, কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার পুত্রের উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; বাজপাখীতে কি কখনও একটা ছেলে লইয়া যাইতে পারে"? নাও পারিতে পারে, ভাই; কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই তাহা হইলে কি করা করা যায়? তবে কথাটি কি জান, তোমার ছেলেটিকে বাজপাখীতেই লইয়া গিয়াছে।"

তখন ধূর্ত্ত বণিক গ্রামবাসীকে 'দুষ্ট, 'চোর', 'নরহন্তা; ইত্যাদি বলিয়া গালি

---

[১]। বিনিশ্চয়ামাত্য, বিচারক (Judge)

[২]। এখনে 'ফালম' এই এক বচনান্ত পথ আছে। বোধ হয় আদৌ একটি ফলক লইয়াই গল্পটি রচিত হইয়াছিল। জাতককার শেষে একটির পরিবর্তে পঞ্চশত উল্লেখ করিয়াছেন। জাতককার যে পঞ্চশত সংখ্যাটির বড় পক্ষপাতী তাহা পাঠক বহুবার দেখিয়াছেন।

দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমি বিচারপতির নিকট যাইতেছি; তেমাকেও সেখানে লইয়া যাইব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইল। গ্রামবাসী বলিল, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, ভাই, তাহাই কর"; এবং সেইও ধূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে বিচারালয়ে উপস্থিত হইল।

ধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, এই লোকটা আমার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। এখন আমার ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসিলে বলে যে তাহাকে বাজপাখীতে লইয়া গিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার বিচার করুন।"

বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "কি হে, প্রকৃত ব্যাপার কি?" "হাঁ ধর্ম্মাবতার, কথাটা সত্যই বটে। আমি ছেলেটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। পথে একটা বাজপাখীতে ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "বাজপাখীতে ছোঁ দিয়া কি ছেলে লইয়া যাইতে পারে? একথা ত কোথাও শুনি নাই।"

গ্রামবাসী বলিল, "আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। বাজপাখীতে যদি একটা ছেলে লইয়া আকাশে উড়িতে না পারে তবে মূষিকেই কি লোহার ফাল খাইতে পারে?" "একথা বলিতেছ কেন?" "ধর্ম্মাবতার, আমি ইহার বাড়ীতে পাঁচশ ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। ইনি বলিতেছেন সেগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে এবং ইন্দুরগুলোর বিষ্ঠা পর্য্যন্ত আমায় দেখাইয়াছেন। তবেই দেখুন ধর্ম্মাবতার, ইন্দুরে যদি লাঙ্গলের ফাল খায়, তবে বাজপাখীতেই বা ছেলে লইয়া যাইবে না কেন? আর ইন্দুরে যদি ফাল খাইতে না পারে, তবে বাজপাখীতেও ছেলে লইয়া যাইতে পারে না। ইনি বলিতেছেন আমার ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়াছে। খেয়েছে কি না খেয়েছে আপনিই তাহারও বিচার করুন।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, এ ব্যক্তি "শঠে শাঠ্যং" এই নীতি প্রয়োগ করিয়া জয়লাভের উপায় করিয়াছে। অনন্তর "বা! অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছি।" বলিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :

শাঠ্যের প্রয়োগ শঠে; এ অতি উপায় ভাল
করিয়াছ তুমি নির্দ্ধারণ;
ধূর্ত্তকে আবদ্ধ করি তাহার(ই) ধূর্ত্ততা-জালে,
লভিবে নিজের নষ্ট ধন!
মুষিকে যদ্যপি পারে খাইতে লাঙ্গল-ফাল,
সুকঠিন, লৌহবিনির্ম্মিত,
শ্যেন শূন্যে উড়ি যায় ধূর্ত্তের কুমারে লয়ে,
ইহা আমি বুঝিনু নিশ্চিত।

ধূর্ত্তের উপরে ধূর্ত্ত, বঞ্চকের প্রবঞ্চক!
কি সুন্দর বলিহারি যায়!
নষ্টফালে ফাল দাও নষ্টপুত্র পুত্র পাও;
অন্য কোন বিনিশ্চয় নাই।

এইরূপে নষ্টপুত্র পুত্র এবং নষ্টফাল ফাল লাভ করিয়া জীবনাবসানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপগতি প্রাপ্ত হইল।

[**সমবধান :** তখন এই কূটবণিক ছিল সেই কূটবণিক্; ঐ সাধুবণিক ছিল সেই সাধুবণিক এবং আমি ছিলাম সেই বিনিশ্চয়ামাত্য।]

☞ **পঞ্চতন্ত্রেও (১/২১)** ইহার অনুরূপ একটি গল্প দেখা যায়। তাহাতে কূটবণিকের পরিবর্ত্তে এক শ্রেষ্ঠী, সাধুবণিকের পরিবর্ত্তে জীর্ণধন নামক এক বণিকপুত্র এবং লাঙ্গলফালের পরিবর্ত্তে একটা তুলাদণ্ড দেখা যায়।

---

২১৯. গর্হিত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অসন্তুষ্ট ও উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারিত না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও অসন্তুষ্ট থাকিত। এইজন্য ভিক্ষুরা তাহাকে একদিন শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি সত্য সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? "ইন্দ্রিয় তাড়নায়।" "দেখ, ইন্দ্রিয়সুখভোগেচ্ছা পূর্ব্বকালে পশুরা পর্য্যন্ত নিন্দনীয় মনে করিয়াছিল আর তুমি কি না এতাদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উহাতে অভিভূত হইয়াছ—যে ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনা পশুদিগেরও নিন্দনীয়, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাভোগ করিতেছ!" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বনেচর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজভবনে থাকিয়া সদাচারপরায়ণ হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যলোকের রীতিনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার শিষ্টব্যবহারে প্রীত হইয়া সেই বনেচরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "যেখানে এই বানরটাকে ধরিয়াছিলে, সেখানে গিয়া ইহাকে ছাড়িয়া

দিয়া আইস।” বনেচর রাজার আদেশমত কার্য্য করিল।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছেন জনিতে পারিয়া বানরগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক বিশাল শিলাতলে সমবেত হইল এবং তাহাকে অভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বন্ধু, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আমি বারাণসীর রাজভবনে ছিলাম।”

“কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?

“রাজা আমাকে কেলিমর্কট করিয়াছিলেন; আমার শিষ্ট ব্যাবহারে প্রীত হইয়া এখন আমায় ছাড়িয়া দিয়াছেন।

“তুমি, তাহা হইলে মনুষ্যলোকের রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছ। বলত তাহারা কি করে? আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

“মনুষ্যের চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

“বলনা। আমাদের যে শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

“মনুষ্য ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, সকলেই কেবল ‘আমার’ ‘আমার’ বলে। এই আছে, এই নাই এ অনিত্যত্বজ্ঞান তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। সেই জ্ঞানান্ধ মূর্খদিগের চরিত্র শুন” ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটি পাঠ করিলেন :

“সোণা আমার”, “রতন আমার” বলে সর্ব্বক্ষণ:
মূর্খ মানুষ আর্য্যধর্ম্ম করেছে বর্জ্জন।
এক ঘরে দুই কর্ত্তা তাদের; বিশ্রী একজন;
দাড়ি গোঁপ তার নাইক মুখে লম্ব দুটি স্তন।
মাথায় রাখে চুলের বেণী, ছেঁদা দুটী কান,
কথার চোটে করে সবার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মূর্খ মানুষ এমন রতন কিনে আনেন ঘরে
বহুধনে; সারাজীবন সুখী হবার তরে![১]

ইহা শুনিয়া বানরেরা একবাক্যে বলিল, “আর বলিতে হইবে না, আর বলিতে ইবে না, যাহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিতে হয়, আমরা তাহাই শুনিলাম।” ইহা বলিয়া তাহারা দুই হস্তে স্ব স্ব কর্ণ দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিল। যে স্থানে বসিয়া এই গাথা শুনিয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেরও নিন্দা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। শুনা যায় তদবধি ঐ স্থানের নাম ‘গর্হিত পৃষ্ঠপাষাণ’ হইয়াছে।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু

---

[১]। ইহাতে দেখতে পাই পূর্ব্বকালে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পাত্রী সংগ্রহ করিত।

স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই বানরগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।]

---

২২০. ধর্ম্মধ্বজ-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হই নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে যশঃপাণি নামে এক রাজা ছিলেন। কালক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন রাজার পুরোহিত; তিনি ধর্ম্মধ্বজ নামে অভিহিত হইতেন। ছত্রপাণি-নামক অপর এক ব্যক্তি রাজার জন্য মুকুটাদি মস্তকাভরণ নির্ম্মাণ করিত।

যশঃপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন; কিন্তু তাঁহার সেনাপতি উৎকোচলোভী ছিলেন। তিনি বিচারকালে উৎকোচ লইয়া একের সম্পত্তি অপরকে দিতেন। অধিকন্তু পৃষ্ঠমাংসাদ[১] ছিলেন।

একদিন একব্যক্তি বিনিশ্চয়ে[২] পরাজিত হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিচারালয় হইতে যাইতেছিল, এমন সময় সে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। বোধিসত্ত্ব তখন রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। সে বোধিসত্ত্বের পায়ে পড়িয়া নিজের পরাজয় বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, "মহাশয়! আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকেরা রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে পরামর্শদানে নিযুক্ত আছেন, অথচ সেনাপতি কালক উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক রামের ধন শ্যামকে দিতেছে।"

এই কথায় বোধিসত্ত্বের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "চল ভদ্র, আমি তোমার জন্য পুনর্ব্বিচার করিতেছি।" অনন্তর তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিচার গৃহে গেলেন; সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিবিনিশ্চয় করিয়া যাহার সম্পত্তি তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত

১। যে পরোক্ষে পরকুৎসা করে।

২। বিনিশ্চয়—মোকদ্দমা।

জনসমূহ "সাধু, সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিল। তাহারা এত উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল যে সেই শব্দ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কোলাহলের কারণ কি?" ভৃত্যেরা জানাইল, "মহারাজ, পণ্ডিতবর ধর্ম্মধ্বজ দুর্ব্বিচারের প্রতিবিচার করিয়াছেন; সেইজন্য লোকে সাধুকার দিতেছে।"

রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি নাকি একটা বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হ্যাঁ, মহারাজ, কালক অন্যায় বিচার করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবিচার করিয়াছি।" "অদ্য হইতে আপনিই বিচারকের পদ গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আমার কর্ণের তৃপ্তি হইবে, লোকেও সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকিবে।" এই প্রস্তাবে বোধিসত্ত্বের নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল; কিন্তু রাজা কিছুতেই ছাড়িলেন না; তিনি বলিলেন, "সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য আপনাকেই বিচারপতি হইতে হইবে।" কাজেই বোধিসত্ত্ব রাজার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

তদবধি বোধিসত্ত্ব বিচারকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন; যাহার যে সম্পত্তি, সে তাহাই পাইতে লাগিল; কালকের উৎকোচ লাভ বন্ধ হইয়া গেল। লাভের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া কালক তখন রাজার নিকট বোধিসত্ত্বের নিন্দা আরম্ভ করিল। সে বলিত, "মহারাজ, আমার বোধ হয় ধর্ম্মধ্বজ পণ্ডিতের মনে এই রাজ্য লাভ করিবার লোভ জন্মিয়াছে?" রাজা প্রথম প্রথম ইহা বিশ্বাস করেন নাই; তিনি বলিতেন, "আর কখনও এমন কথা মুখে আনিও না।" অনন্তর একদিন কালক বলিল, "মহারাজ, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে ধর্ম্মধ্বজের আগমনকালে বাতায়নপথ দিয়া লক্ষ্য করিবেন, দেখিতে পাইবেন সমস্ত রাজধানীই তাহার অনুগত।" এই কথানুসারে রাজা একদিন বাতায়ন হইতে দেখিলেন, বিচারগৃহের মধ্যে বহু অর্থীপ্রত্যর্থী রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, ইহারা সকলেই ধর্ম্মধ্বজের অনুচর।' এই অমূলক আশঙ্কায় তিনি কালকের কথা বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি, এখন উপায়?" কালক বলিল, "মহারাজ, ইহাকে বধ করিতে হইবে।" "কোন গুরুতর দোষ না পাইলে বধ করা যায় কিরূপে?" "আমি এক উপায় বলিতেছি।" "কি উপায়?" ইহাকে কোন অসাধ্য সাধন করিতে বলুন; তাহাতে অশক্ত হইলে সেই দোষেই ইহার প্রাণদণ্ড করা হইবে।" "ইহার অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে?" "মহারাজ, সারবতী ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া বহুযত্ন করিলেও দুই চারি বৎসরের কমে উদ্যানে ফল জন্মে না। আপনি ধর্ম্মধ্বজকে ডাকাইয়া বলুন, 'কল্য কেলি করিবার জন্য আমার একটি নতুন উদ্যান আবশ্যক। তুমি উদ্যান প্রস্তুত কর।'

ধর্ম্মধ্বজ ইহা করিতে পারিবে না; আমরা সেই ছলে তাহার প্রাণবধ করিব।"

রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি চিরদিন পুরাতন উদ্যানে কেলি করিয়া আসিতেছি; এখন কিন্তু একটা নতুন উদ্যানে কেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কালই কেলি করিব; আপনি উদ্যান প্রস্তুত করুন; যদি না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণান্ত করিব।" এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'কালক উৎকোচলাভে বঞ্চিত হইয়া রাজাকে প্রতিকূল করিয়াছে।' অনন্তর, "দেখি, মহারাজ, পারি কি না পারি", এই উত্তর দিয়া তিনি গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং পরিতোষসহকারে ভোজনপূর্ব্বক চিন্তান্বিত মনে শয়ন করিয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের আসন্ন বিপদে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল[১] শক্র ভাবিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তখন তিনি দ্রুতবেগে অবতরণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কি চিন্তা করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "রাজা আমাকে একটা উদ্যান প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই বিষয় ভাবিতেছি।" "পণ্ডিত তুমি কোন চিন্তা করিও না; আমি তোমার জন্য নন্দনকাননের বা চিত্রলতা বনের সদৃশ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। কোথায় প্রস্তুত করিব বল।" "অমুক স্থানে।" তখন শক্র নির্দ্দিষ্টি স্থানে উদ্যান রচনাপূর্ব্বক দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যান প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, উদ্যান প্রস্তুত; আপনি গিয়া কেলি করুন।" রাজা দেখিলেন বিচিত্র উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা মনঃশিলাবর্ণের, অষ্টদশহস্তপ্রমাণ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বার-তোরণপরিশোভিত এবং পুষ্পফলাবনত নানাবৃক্ষ-পরিপূর্ণ। তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কালককে বলিলেন, "পণ্ডিত আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন; এখন কি কর্ত্তব্য?" কালক বলিল, "মহারাজ! যে একরাত্রির মধ্যে এইরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারে, সে কি আপনার রাজ্যেও গ্রহণ করিতে পারে না?" "এখন করা যায় কি? "আমরা ইহাকে আর একটি অসাধ্য কাজ করিতে বলিব।" "কি কাজ?" "সপ্তরত্নময়ী পুষ্করিণী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিব।" "বেশ, তাহাই করা যাউক।" অনন্তর রাজা বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! আপনি উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন; এখন ইহার উপযুক্ত সপ্তরত্নময়ী একটি পুষ্করিণী প্রস্তুত করুন। তাহা না পারিলে আপনার প্রাণদণ্ড

---

[১]। বৌদ্ধ সাহিত্যে ধার্ম্মিকের বিপদে শক্রের আসন বা ভবন উত্তপ্ত হয় এইরূপ দেখা যায় (জাতক ২৯২, ৩১৬ ইত্যাদি)। হিন্দুদিগের মতে ভক্তের বিপদে দেবতারর আসন টলে।

হইবে।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “যে আজ্ঞা, মহারাজ, পারি ত করিব।”

শক্র বোধসত্ত্বের হিতার্থ অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্না, শততীর্থ ও সহস্রবঙ্কবিশিষ্টা এবং পঞ্চবিধ পদ্মপরিশোভিতা নন্দনসরোবরসদৃশী এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব পরদিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট বলিলেন, “মহারাজ, আপনার পুষ্করিণী প্রস্তুত।” তাহা দেখিয়া রাজা কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন করা যায় কি?” “মহারাজ, অনুমতি দিন যে উদ্যানের অনুরূপ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।” তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “আচার্য্য, এই উদ্যানের ও পুষ্করিণীর অনুরূপ সর্ব্বত্র গজদন্তময় একটি গৃহ নির্ম্মাণ করুন; তাহা না পারিলে আপনার প্রাণ যাইবে।”

শক্র গৃহও প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা গৃহ দেখিয়া কালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করিতে বল?” কালক বলিল, “আজ্ঞা দিন যে গৃহের অনুরূপ একটা মণি চাই।” রাজা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন; “আচার্য্য, এই গজদন্তময় গৃহের অনুরূপ এমন একটা মণি চাই, যাহার আলোকে আমি বিচরণ করিতে পারিব। আপনি যদি ইহা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণ যাইবে।”

শক্র রাজার আদেশমত মণিও আনিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব পরদিন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা মণি দেখিয়া কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন উপায়?” “মহারাজ! আমার বোধ হইয়াছে যে ধর্ম্মধ্বজব্রাহ্মণের ঈপ্সিতার্থদায়িনী কোন দেবতা আছেন। অতএব ইহাকে এমন কোন কাজ দিন, যাহা দেবতাদিগের ও সাধ্যাতীত। চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত মনুষ্য দেবতারাও সৃষ্টি করিতে পারেন না।[১] অতএব আপনি বলুন চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত এক উদ্যানপালক আবশ্যক।” তদনুসারে রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, “আচার্য্য, আপনি আমার জন্য উদ্যান, পুষ্করিণী ও গজদন্তময় প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে আলোক দিবার জন্য মণির ব্যবস্থা করিয়াছেন; এখন উদ্যানরক্ষার্থে চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত এক উদ্যানপাল দিন, নচেৎ আপনার প্রাণ থাকিবে না।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “বেশ যদি সাধ্য হয়, দিব।” অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া পরিতোষসহকারে আহার করিলেন এবং প্রত্যুষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; দেবরাজ শক্র আত্মশক্তিবলে যাহা পারেন, তাহা ত সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত উদ্যানপাল

---

[১]। Cf. `The king can make a belted knight,
A marquis, duke and a’ that,
But an honest man’s aboon his might,
Guid faith, he manna fa that–Burns.

সৃষ্টি করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। অতএব পরের হাতে পড়িয়া জীবন দেওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে বরং অরণ্যে গিয়া অনাথ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শ্রেয়স্কর।' অনন্তর তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সাধুদিগের সমাচরিত ধর্ম্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। শক্র এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বনেচরবেশে বোধিসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি সুকুমার; তুমি এই অরণ্যে বসিয়া কি করিতেছ? তোমার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তুমি পূর্ব্বে কখনও দুঃখ ভোগ কর নাই।" এই প্রশ্ন করিবার সময় শক্র নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

"সুখ-সম্বর্দ্ধিত তুমি হেন মনে লয়
গৃহ ছাড়ি বনে কেন লয়েছ আশ্রয়?
দীনভাবে তরুমূলে একাকী বসিয়া
কি চিন্তায় মগ্ন আছে বল তব হিয়া।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

"সুখ-সম্বর্দ্ধিত আমি, নাহিক সংশয়,
রাজ্য ছাড়ি তবু বনে লয়েছি আশ্রয়।
একাকী তরুরমূলে দীনভাবে বসি
সদ্ধর্ম্ম লক্ষণ[১] আমি ভাবি দিবানিশি।"

তখন শক্র বলিলেন, "যদি সদ্ধর্ম্মচিন্তাই তোমার উদ্দেশ্য, তবে এখানে বসিয়া কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজা চতুর্ব্বিধ গুণবিশিষ্ট একজন উদ্যানপাল নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু আমি ঈদৃশ কোন লোক দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ভাবিলাম রাজধানীতে থাকিয়া মনুষ্যহস্তে প্রাণত্যাগ করি কেন? অরণ্যে গিয়া একাকী প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। সেই কারণেই এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।" "ব্রাহ্মণ, আমি দেবরাজ শক্র। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার জন্য উদ্যাপাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত উদ্যানপাল সৃষ্টি করা কাহারও সাধ্য নহে। কিন্তু তোমাদের দেশে ছত্রপাণি নামে এক ব্যক্তি আছেন; তিনি রাজার শিরোভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ঐ মহাত্ম চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত। তুমি গিয়া তাঁহাকেই উদ্যানপালের পদে নিযুক্ত করাও।" শক্র বোধিসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া এবং অভয় দিয়া দেবনগরে

---

[১]। সাধুজন-সমাচরিত ধর্ম্ম অর্থ লাভ, অলাভ, যশ; অযশ; নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ—এই অষ্টবিধ লোকধর্ম্ম হইতে মুক্তি।

প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিয়া প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন এবং ছত্রপাণিকে সেখানেই দেখিতে পাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি চতুর্ব্বিধগুণ বিশিষ্ট?" ছত্রপাণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট এ কথা আপনাকে কে বলিল?" "দেবরাজ শক্র বলিয়াছেন।" "কেন বলিলেন?" ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ছত্রপাণি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার চতুর্ব্বিধ গুণ আছে বটে।" তখন বোধিসত্ত্ব হাত ধরিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, এই ছত্রপাণি চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট; যদি উদ্যানপালের প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাকেই নিযুক্ত করুন। রাজা ছত্রপাণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি চতুর্ব্বিধগুণসম্পন্ন?" ছত্রপাণি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তোমার কি কি চারিগুণ আছে?"

"অসূয়ার বশ হয় নাই কখন,
করি নাক আমি মাদক সেবন;
স্নেহ কিংবা ক্রোধ কিছুই আমার
না পারে করিতে চিত্তের বিকার।"

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছত্রপাণি! তুমি কি বলিতেছ যে তুমি অসূয়া শূন্য?" ছত্রপাণি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আমি অসূয়াশূন্য।" "কি দেখিয়া তুমি অসূয়া ত্যাগ করিয়াছ?" "বলিতেছি, মহারাজ।" অনন্তর ছত্রপাণি নিজের অসূয়াত্যাগের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম নৃপতি, কামিনীকুহকে পড়ি
নিজ পুরোহিতে চাহিনু দণ্ডিতে নিগড়ে নিবদ্ধ করি।
কিন্তু সেই সাধু তত্ত্বজ্ঞান দিয়া ফিরাইলা মোর মন;
তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন![১]

---

[১]। এই গাথা প্রাচীন কথা জানিবার জন্য ১২০ সংখ্যক (বন্ধনমোক্ষ) জাতকের অতীতবস্তু দ্রষ্টব্য। পালি টীকাকার ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—

পূর্ব্বজন্মে আমি এই বারাণসী নগরেই আপনার ন্যায় রাজা ছিলাম এবং এক কামিনীর চক্রান্তে পড়িয়া নিজের পুরোহিতকে বন্দী করিয়াছিলাম।

আবদ্ধ যে জন, তাহার(ও) বন্ধন হয় সংঘটন তথা,
মূর্খের বচনশুনি সর্ব্বজন পাপে রত থাকে যথা।
পণ্ডিতের বাণী অদ্ভুত এমনি তাহার মহিমবলে
নিগড়নিবদ্ধ মুক্তিলাভ করি চলি যায় অবহেলে!"

এই জাতকে যেমন যশঃপাণি বারাণসী রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেইরূপ

অতপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “সৌম্য ছত্রপাণি, কি দেখিয়া তুমি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছ?” ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

সুরাপানে মত্ত হয়ে পুত্রমাংস করিনু ভক্ষণ;
সেই লোকে, মহারাজ, করিয়াছি সুরারে বর্জ্জন।[১]

পুরাকালে এক সময়ে এই ছত্রপাণিই বারাণসী রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী চতুঃষষ্টি রাজভৃত্যের সহিত পাপাচরণ করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না করায় তিনি তাহার বিনাশসাধনার্থ রাজার নিকট মিথ্যা পরীবাদ করেন, তজ্জন্য রাজা বোধিসত্ত্বকে বন্দী করেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিয়া মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে সেই চতুঃষষ্টি ভৃত্য ও মহিষী পর্য্যন্ত ক্ষমা প্রাপ্ত হন। এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন :

“পূর্ব্বে জন্মে অমি ছিলাম নৃপতি’ ইত্যাদি।

আমি তখন ভাবিয়াছিলাম ষোড়শ সহস্র রমণী ত্যাগ করিয়া এই এক রমণীতে আসক্ত হইয়াছি, অথচ ইহার প্রবৃত্তি পরিতুষ্ট করিতে পারিতেছি না! রমণীদের ক্রোধ দুর্দ্দমনীয়। পরিহিত বস্ত্র মলিন হইলে ‘ইহা কেন মলিন হইল’ ভাবিয়া, কিংবা ভুক্ত অন্ন মলে পরিণত হইলে ‘ইহা কেন মল হইল’ ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াও যেমন অকারণ, রমণীদিগের ক্রোধও সেইরূপ অকারণ। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কখনও ক্রোধে বা অসূয়ার বশীভূত হইব না, কারণ তাহা হইলে অর্হত্বলাভের ব্যাঘাত ঘটিবে।” এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন, ‘তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন।”

[১]। পালিটীকাকার এই অতীত কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

“আমি পুরাকালে আপনারই মত বারাণসীরাজা ছিলাম। তখন আমি মদ্যপান বিনা থাকিতে পারিতাম না, মাংস বিনা আহার করিতে পারিতাম না। তখন বারাণসীতে উপোসথ দিনে পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য আমার পাচক শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন কিছু মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু রাখিবার অসাবধানতাবশত কুকুরে ঐ মাংস খাইয়া ফেলে। উপোসথ দিবসে পাচক দেখিল মাংস নাই; কাজেই অন্যান্য দিন যেমন নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রাসাদে গিয়া থাকে, সেদিন সেরূপ করিবার উপায় দেখিল না। সে রমণীর নিকট গিয়া বলিল, “দেবি, আজ মাংস পাইলাম না; রাজার সম্মুখে মাংসহীন খাদ্যও লইতে সাহস হইতেছে না; বলুন এখন আমি করি কি?’ রাণী বলিলেন, “দেখ বাপু, রাজা আমার ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন; ছেলে দেখিলে তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিবার সময় তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। আমি তাহাকে সাজাইয়া রাজার কোলে দিব; তিনি তাহার সঙ্গে খেলা করিতে থাকিবেন। সেই সময়ে তুমি খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইবে।” অনন্তর রাণী পুত্রটিকে সুন্দররূপে সাজাইয়া আমার কোলে দিয়া আসিলেন এবং আমি তাহার সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে পাচক খাদ্য লইয়া উস্থিত হইল। আমি তখন সুরামদে মত্ত ছিলাম; পাত্রে মাংস দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, “মাংস কোথায়?” পাচক বলিল, “মহারাজ, অদ্য উপোসথ দিন; পশুবধ করিবার নিয়ম নাই বলিয়া মাংস সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” “বটে, আমার খাবার জন্য মাংস দুর্লভ!” ইহা বলিয়া আমি ক্রোড়স্থিত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম এবং পাচকের

তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্নেহবর্জ্জনের হেতু কি?" ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা স্নেহবর্জ্জনের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :

ছিনু পূর্ব্বে রাজা আমি, কৃতবাসা নাম;
অখণ্ড প্রতাপে আমি রাজ্য পালিতাম।
প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র করিয়া ভঞ্জন
পুত্র মোর চলি গেল শমন-সদন।
তদবধি, মহারাজ, স্নেহত্যাগ করি,
জন্মজন্মান্তরে আমি সর্ব্বত্র বিচরি।[১]

সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "যা, এখনই পাক করিয়া আন!" পাচক তাহাই করিল; আমি পুত্র মাংসের সহিত অন্ন আহার করিলাম। আমার ভয়ে কেহ কান্দিতে বিলাপ করিতে বা একটিমাত্র কথাও বলিতে পারিল না।

আমি ভোজনান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম এবং প্রত্যূষে নেশা ভাঙ্গিলে, "আমার ছেলে কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস" এই কথা বলিলাম। তাহা শুনিয়া রাণী কাঁদিকে কাঁদিতে আমার পায়ে পড়িলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভদ্রে, কাঁদিতেছ কেন বল।" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কল্য পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।" তখন আমি পুত্রশোকে বহু রোদন ও বিলাপ করিলাম; বুঝিলাম সুরাপানই আমরা সর্ব্বনাশের মূল। অনন্তর আমি ছাই লইয়া মুখে ঘসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও এরূপ সর্ব্বনাশিনী সুরাকে স্পর্শ করিব না, কারণ সুরাপানে আসক্ত থাকিলে আমি কখনও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না।"

এই অতীত কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন, 'সুরাপানে মত্ত হ'য়ে ইত্যাদি।

[১]। পালি টীকাকার এই অতীত কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "মহারাজ, আমি পূর্ব্বে এই বারাণসীতেই রাজত্ব করিতাম। তখন আমার নাম ছিল কৃতবাসা। আমার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। দৈবজ্ঞেরা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে পানীয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল দুষ্টকুমার। সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর উপরাজের কাজ করিত; আমি তাহাকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম, পাছে পানীয়ের অভাবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, এই আশঙ্কায় নগরের চতুর্দ্বারে ও মধ্যভাগে নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলাম, প্রতি চতুষ্কে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে জলপূর্ণ কলসী রাখাইয়াছিলাম। সে একদিন বিচিত্র বেশভূষা গ্রহণ করিয়া নিজেই উদ্যানে যাইতেছিল; এমন সময় পথে একজন প্রত্যেক বুদ্ধ দেখিতে পাইল। বহুলোকের প্রত্যেকবুদ্ধের দর্শন পাইয়া কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিল, কেহ তাঁহার গুণগান করিতেছিল, এবং কেহ বা তাঁহাকে দূর হইতেই কৃতাঞ্জলীপুটে প্রণাম করিতেছিল। আমার পুত্র ভাবিল, 'মাদৃশ ব্যক্তি যাইতে দেখিয়াও লোকে এই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুকে প্রণাম করিতেছে ও প্রশংসা করিতেছে!' সে কুপিত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল এবং প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভিক্ষা পাইয়াছ কি?' প্রত্যেকবুদ্ধ

পরিশেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক্রোধহীন হইলে কিরূপে?" ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

"পূর্ব্বে এক জন্মে আমি ধরিয়া "অরক" নাম
সপ্তবর্ষ মৈত্রী চিন্তা করিছিনু অবিরাম;
সেই ফলে সপ্তকল্প ব্রহ্মলোকে বাস করি;
ক্রোধ আমি ত্যজিয়াছি মৈত্রীর মহিমা স্মরি।"

ছত্রপাণি এইরূপে নিজের চতুর্ব্বিধ গুণ ব্যাখ্যা করিলে রাজা অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; অমনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অরে উৎকোচখাদক, দুষ্ট চৌর কালক! তুই উৎকোচলাভ করিতে না পারিয়া পরীপাদ দ্বারা এই পণ্ডিতের প্রাণ সংহার করিতে চা'স!" অনন্তর তাহারা কালকের হাত-পা ধরিয়া ফেলিল, তাহাকেই প্রাসাদ হইতে নামাইয়া আনিল, পাষাণ, মুদগর প্রভৃতি যে যাহা পাইল, তদ্দ্বারা প্রহার করিয়া তাহার মস্তক ভগ্ন করিল এবং, যখন সে মরিয়া গেল, তখন পা ধরিয়া টনিতে টানিতে তাহার দেহটা আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

অতঃপর যশপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেনপতি কালক; সারিপুত্র ছিলেন কল্পক

বলিলেন, 'হাঁ কুমার, ভিক্ষা পাইয়াছি।' তখন কুমার তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষা পাত্র লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল; পাদাঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং ভোজ্যের সহিত ভগ্নপাত্রখণ্ডগুলি পদমর্দ্দিত করিতে লগিল। 'অহো, এই জীব বিনষ্ট হইল!' ইহা বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কুমার বলিল, 'দেখিতেছ কি? আমি মহারাজ কৃতবাসার পুত্র; আমার নাম দুষ্টকুমার। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া ও বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করিয়া আমার কি অনিষ্ট হইবে?'

ভোজ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং উত্তর হিমবন্তের অন্তঃপাতী নন্দপর্ব্বতের মূলদেশস্থ এক গুহায় চলিয়া গেলেন। এদিকেই সেই মুহূর্ত্তেই কুমারের পাপপরিণাম দেখা দিল; সে 'পুড়ে গেল', 'পুড়ে গেল', বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে পথের উপরই পড়িয়া গেল। নিকটে যেখানে সেখানে জল ছিল সমস্ত শুকাইয়া গেল, পয়ঃপ্রণালী [মূলে 'মাতিকা' (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।] পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইল; কুমার নিমিষের মধ্যে সেখানেই বিনষ্ট হইয়া অবীচিতে প্রস্থান করিল।

আমি সংবাদ শুনিলাম, শোকে অভিভূত হইলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম, আমার এই শোক প্রিয়বস্তু হইতে উৎপন্ন; আমি যদি স্নেহপরায়ণ না হইতাম, তাহা হইলে শোকও পাইতাম না। তদবধি আমি চেতনাচেতন কোন পদার্থেই সঞ্জাতস্নেহ হই না।"

ছত্রপাণি[১], এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মধ্বজ।]

☞ কাহারও অনিষ্ট কামনায় বা কাহারও প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে তাহাকে অসাধ্য সাধন করিতে বলা অনেক প্রাচীন থেকেই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ গ্রীক সাহিত্যের Thesus, Herakles প্রভৃতির কথা এবং Grimm- সংগৃহীত ২৯ সংখ্যক আখ্যায়িকা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

----

২২১. কাষায়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রত্যুৎপন্নবস্তু বর্ণিত ঘটনা কিন্তু রাজগৃহে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। একদা ধর্ম্মসেনাপতি পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দেবদত্ত তখন নিজের অনুরূপ দুঃশীল অনুচরগণসহ গয়াশিরে ছিলেন।

ঐ সময় রাজ গৃহবাসীরা চান্দা তুলিয়া সাধুদিগকে দান করিবার আয়োজন করিয়াছিল। তখন এক বণিক বাণিজ্যার্থ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি মহামূল্য গন্ধকাষায়[২] বস্ত্র লইয়া বলিলেন "আপনারা এই শাটকখানি বিক্রয়পূর্ব্বক[৩] সেই অর্থ দান করিয়া আমাকেও পুণ্যের ভাগী করুন।" নগরবাসীরাও দানের জন্য বহুবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিল। চান্দা তুলিয়া যে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহাতেই দান নির্ব্বাহ হইয়াছিল। কাজেই সেই শটকখানি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইল না। দানকালে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারা বলিতে লাগিল "এই গন্ধকাষায় বস্ত্রখানি উদবৃত্ত হইয়াছে; ইহা কাহাকে দেওয়া যায়-স্থবির সারিপুত্রকে, না দেবদত্তকে?" কেহ কেহ উত্তর দিল, "সারিপুত্রকেই দেওয়া হউক।" আবার কেহ কেহ বলিল, "স্থবির সারিপুত্র এখানে দুইদশ দিন থাকিয়াই ইচ্ছামত অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; কিন্তু স্থবির দেবদত্ত চিরদিনই আমাদের এই নগরে অবস্থিতি করিবেন। সম্পদ বিপদ সর্ব্বাবস্থাতেই আমরা তাহার শরণ লই; অতএব শাটকখানি তাঁহাকেই দিতে হইবে।" অনন্তর তাহারা সংবহুলিক[৪] করিল। তাহাতেই দেবদত্তকে দান

---

[১]। কল্পক—শিল্পী।

[২]। গন্ধকাষায় বস্ত্র কি তাহা ভাল বুঝা যায় না। বোধ হয় ইহা কাষায় বর্ণে রঞ্জিত এবং কস্তুরি প্রভৃতির যোগে সুগন্ধীকৃত কোনরূপ বস্ত্র হইতে পারে।

[৩]। 'বিস্সজ্জেত্বা'—খরচ করিয়া অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা।

[৪]। জাতকে আরও দুই একস্থানে 'সংবহুলিক' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেখানে বহুলোকের মধ্যে মতভেদ ঘটে, সেখানে কোন পক্ষের সংখ্যা অধিক তাহা নির্ণয় করিবার

করিবার পক্ষপাতীদিগেরই সংখ্যা অধিক হইল। কাজেই লোকে তাঁহাকে ঐ শাটক দান করিল। দেবদত্ত দশা কাটাইয়া এবং মুড়ি সেলাই করাইয়া ঐ শাটকখানিকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করাইলেন এবং বহির্বাসরূপে পরিধান করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে ত্রিশজন ভিক্ষু রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া শাস্তার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহারা শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন, শাস্তাও মধুর বচনে তাঁহাদের স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শাস্তার নিকট সেই শাটকদান বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, যে কাষায় বস্ত্র কেবল অর্হতদিগেরই চিহ্ন, দেবদত্ত এখন তাহা পরিধান করিতেছেন, অথচ তিনি এরূপ পবিত্র পরিচ্ছেদ ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে বর্ত্তমান জন্মেই নিজে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াও অর্হৎ পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অশীতি সহস্র হস্তীর যূথপতি হইয়া বনভূমিতে বিচরণ করিতেন।

বারাণসীবাসী একটা দুস্থলোক দন্তকার-বীথিতে[১] গিয়া দেখিতে পাইল দন্তকারেরা বলয়াদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি হাতির দাঁত লইয়া আইসি, তবে তোমরা তাহা কিনিবে কি? "তাহারা বলিল কিনিব বৈ কি?"

অনন্তর সেই ব্যক্তি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল, মস্তকে উষ্ণীষ গ্রহণ করিল এবং প্রত্যেকবুদ্ধের বেশে অস্ত্র লইয়া, বনভূমিতে যে পথে হস্তীরা যাতায়াত করিত, সেখানে গমন করিল। অতঃপর সে হস্তী মারিত এবং তাহাদের দন্ত সংগ্রহ করিয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিত। এইরূপ তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে সে, বোধিসত্ত্বের অনুচর হস্তীদিগের

জন্য এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইত। অতএব ইহা ইংরেজী putting to vote এই বাক্যাংশের অর্থবাচক এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

[১]। যে শাস্তার ধারে লোকে গজদন্তদ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে (প্রথম খণ্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মধ্যে এবং যখন যেটি সর্ব্বপশ্চাতে থাকিত তাহাকেও মারিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন নিজেদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া হস্তীরা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সংখ্যা কমিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক ব্যক্তি প্রত্যেকবুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া হস্তীদিগের গমনাগমন পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে; সেই হস্তীদিগকে নিহত করিতেছে কি? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইতেছে। অনন্তর একদিন তিনি দলস্থ সমস্ত হস্তী অগ্রে দিয়া নিজে পশ্চাতে রহিলেন। লোকটা বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া অস্ত্র তুলিল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মারিবার অভিপ্রায়ে শুণ্ড বিস্তার করিলেন। কিন্তু তাহার পরিহিত কাষায় বস্ত্র দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহার না হউক, এ যে সাধুজনচিহ্ন কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' ইহা ভাবিয়া তিনি শুণ্ড প্রতিসংহার করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এই সাধুজন পরিধেয় বস্ত্র তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি কেন এ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ?" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটি বলিলেন :

পারে নাই করিতে যে রিপুর দমন,
সে চায় কাষায় বস্ত্র করিতে ধারণ।
সত্যদ্বেষী অসংযমী নরাধম যারা,
কভু নহে কাষায়ের উপযুক্ত তারা।
রিপুগণে করেছেন যাঁহারা দমন,
দান্ত, শীলবান, সদা সত্যপরায়ণ।
এহেন ত্রিলোক পূজ্য সাধুজন যাঁরা,
কাষায়ের উপযুক্ত কেবল তাঁহারা।

বোধিসত্ত্ব সেই লোকটাকে এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "আবার কখনও এ অঞ্চলে, আসিও না; আসিলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।" ইহাতে ভয় পাইয়া সে তখনই পলায়ন করিল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই হস্তীহন্তা পুরুষ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

---

২২২. চুলনন্দিক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভা সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি নিষ্ঠুর, পুরুষ ও নির্ম্মম; সে সম্যকসম্বুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলা নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে[২] নিয়োজিত করিয়াছিল। তথাগতের সম্বন্ধে তাহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ারভাব দেখা যায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দেবদত্তের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্ম্মম ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহানন্দিক। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লনন্দিক হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। অশীতি সহস্র বানর তাঁহাদের অনুচর ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে নিজের অন্ধ গর্ভধারিণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।

তাঁহারা মাতাকে শয়নগুল্মে রাখিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং মধুর ফল পাইলে তাহা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যাহারা ফল লইয়া আসিত, তাহারা অন্ধ বারনরীকে তাহা দিত না; কাজেই ক্ষুধায় পীড়িতা হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষা হইয়াছিল। একদিন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা প্রতিদিন তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল পাঠাইয়া থাকি; অথচ তুমি ক্রমে ক্ষীণ হইতেছ, ইহার কারণ কি?" বানরী বলিল, "কৈ বাপ? আমি ত কোন ফল পাই না।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি যদি যূথের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত থাকি, তবে মার প্রাণ রক্ষা হইবে না; অতএব যূথ ত্যাগ করিয়া এখন হইতে কেবল মায়েরই সেবাশুশ্রূষায় নিরত থাকিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চুল্লনন্দিককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি যূথ রক্ষার ভার লও, আমি মায়ের সেবাশুশ্রূষা করিব।" সে বলিল, "দাদা, আমার যূথরক্ষার প্রয়োজন নাই, আমিও মায়ের সেবা করিব।" এইরূপে দুই সহোদরে একই সঙ্কল্প করিয়া যূথ

---

[১]। চুল = চুল = ক্ষুদ্র। এই 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে ' খুল্ল' এবং বাঙ্গালা 'খুড়া' শব্দ হইয়াছে।

[২]। নালাগিরির সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ত্যাগ করিলেন, মাতাকে লইয়া হিমালয় হইতে নামিয়া আসিলেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এক বটবৃক্ষতলে, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণপুত্র তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আচার্য্য অঙ্গবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, পারুষ্যও নির্ম্মমতা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্ম্মম; এরূপ প্রকৃতির লোকের চিরদিন কখনও ভাল যায় না; কোন না কোন সময়ে তাহাদের মহাদুঃখ ও মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি নিষ্ঠুর স্বভাব পরিহার কর; যাহাতে অনুতাপ জন্মে কখনও সেরূপ কাজ করিও না।" এই উপদেশ দিয়া আচার্য্য তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়াছিল এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিল। কিন্তু অন্য কোন বিদ্যায় জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা না পাইয়া সে স্থির করিয়াছিল, যে ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভাবেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইব।

ব্যাধবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সঙ্কল্প করিয়া সে বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল। সে ধনু ও তূণীর লইয়া বনে বনে বিচরণ করিত এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বনে কিছুই না পাইয়া ফিরিবার সময় অঙ্গন প্রান্তস্থিত[১] সেই বটবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'দেখা যাউক, এই গাছে কিছু পাওয়া যায় কি না।' অনন্তর সে ঐ বটবৃক্ষের অভিমুখে গেল।

ঐ সময় মহানন্দিক ও চুল্লনন্দিক মাতাকে ফলমূলাদি ভোজন করাইয়া তাহার পশ্চাতে বিটপ্রান্তরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা ব্যাধকে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ব্যাধ যদি মাকে দেখিতেই পায়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নেই।' এই বিশ্বাসে তাঁহারা শাখাসমূহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তি অন্ধা জরাজীর্ণা বানরীকে দেখিয়া ভাবিল, 'খালি হাতে ফিরি কেন? এই বানরীকে মারিয়া লইয়া যাই।' তখন সে বানরীকে বিদ্ধ করিবার জন্য ধনু উত্তোলন করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, চুল্লনন্দিক, লোকটা দেখিতেছি আমাদের মাকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আমি

---

[১]। "অঙ্গনপরিয়ন্তে ঠিতং"। এখানে 'অঙ্গন' শব্দে অরণ্যমধ্যস্থ 'খোলা জায়গা' অর্থাৎ যেখানে কোন গাছপাল নাই এরূপ স্থান বুঝিতে হইবে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে Glade শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মায়ের প্রাণরক্ষা করিতেছি। আমার মৃত্যু ঘটিলে তুমি মায়ের সেবাশুশ্রূষা করিও।” ইহা বলিয়া তিনি শাখান্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং ব্যাধকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না। ইনি অন্ধা ও জরাজীর্ণা। আমি ইহার জীবন রক্ষা করিব, আপনি ইহাকে না মারিয়া আমাকে মারুন।”

ব্যাধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহার শরপথে উপবেশন করিলেন। নিষ্ঠুর ব্যাধ তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পতিত করিল এবং তাঁহার মাতাকে মারিবার জন্য পুনর্ব্বার ধনু তুলিল। তাহা দেখিয়া চুল্লনন্দিক ভাবিল, ‘এ আমার মাকে মারিতে চাহিতেছে। এক দিনের জন্যও যদি মাতা জীবিত থাকেন তাহা হইলেও মনে করিব তাঁহাকে জীবন দান করিলাম। এতএব মাতার প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।’ এই সঙ্কল্প করিয়া সেও শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না; আমি নিজেই প্রাণ দিয়া মাকে প্রাণদান করিব। আপনি আমায় শরবিদ্ধ করুন এবং আমাদের দুই সহোদরকে লইয়া আমাদের মাতার প্রাণ ভিক্ষা দিন।”

ব্যাধ এবারও সম্মতি দান করিল এবং চুল্লনন্দিক তাহার শরপথে আসিয়া বসিল। ব্যাধ তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিল এবং ভাবিল, ইহাতে ছেলেদের আহারের যোগাড় হইবে। অনন্তর সে তাহাদের মাতাকেও মারিল এবং তিনটা প্রাণীরই মৃত্রদেহ বাঁকের শিকার তুলিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

কিন্তু এই সময়ে সেই পাপাত্মার গৃহে বজ্রপাত হইল; বজ্রাগ্নিতে তাহার স্ত্রী এবং দুই পুত্র গৃহের সহিত দগ্ধ হইল। গৃহখানির পৃষ্ঠবংশ এবং খুঁটিগুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

ব্যাধ গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইয়া এই সংবাদ জানাইল। সে দারাপুত্র-শোকে অভিভূত হইয়া সেখানেই মাংসের বাঁক ও ধনু ফেলিয়া দিল; পরিহিত বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিল এবং নগ্নদেহে বাহু বিস্তারপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময়ে একটা খুঁটি ভাঙ্গিয়া তাহার মস্তকে পড়িল এবং সেই আঘাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল; পৃথিবীও বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে জ্বালা উত্থিত হইল। তক্ষশিলার আচার্য্য তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এতদিন পরে, পৃথিবীর গ্রাসে পতিত হইবার সময়, পাপাত্মা তাহা স্মরণ করিল। সে ভাবিল, “আহো, পরাশরগোত্রজ ব্রাহ্মণ ত আমাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।” সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উদেশ
দিলা মম মঙ্গল কারণ :—

"যাতে অনুতাপ হয় এমন পাপের কাজ
করিওনা কভু বাছাধন।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল— শুভে শুভ, পাপে পাপ
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম।
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন ফল পায়,
জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি নামক মহানরকে শরীর পরিগ্রহ করিল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এজন্মে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে অতি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ছিল।"

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণবংশজ ব্যাধ; সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য; আনন্দ ছিলেন চুলনন্দিক, মহাপ্রজাপতী গৌতমী ছিলেন তাহার মাতা এবং আমি ছিলাম মহানন্দিক।]

---

২২৩. পুটভক্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরবাসী এক ভূম্যধিকারী নাকি এক জনপদবাসী ভূম্যধিকারীর সহিত কারবার করিয়াছিলেন। জনপদবাসী তাঁহার নিকট অর্থ ধারিতেন। তিনি একদা অর্থ আদায় করিবার জন্য জনপদে গিয়াছিলেন। জনপদবাসী "এখন আমার দিবার শক্তি নাই" বলিয়া তাহাকে কিছুই দেয় নাই; তাহাতে শ্রাবস্তীবাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র আহার না করিয়াই গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। কতিপয় পথিক তাহাকে পথিমধ্যে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া একমাত্র অন্ন দিয়া বলিল, "ইহা হইতে আপনার ভার্য্যাকে দিন, নিজেও ভোজন করুন।"

ভূম্যধিকারী সেই অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাকে উহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে দস্যুদিগের বড় উপদ্রব, অতএব তুমি অগ্রসর হইতে থাক।" ভার্য্যাকে এইরূপে অগ্রে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজেই সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করিলেন এবং পরে ঐ রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া শূন্যপাত্র দেখাইয়া বলিলেন, "ধূর্ত্তেরা অন্নহীন শূন্যপাত্র দিয়া গিয়াছে।" তাঁহার স্বামী একাই সমস্ত অন্ন খাইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া রমণী মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়ে জেতবন বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় ভাবিলেন,

"এখানে গিয়া জল পান করা যাউক।" এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগের পথ লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, এইরূপ শাস্তাও সস্ত্রীক ভূম্যধিকারীর আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের ছায়ায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা শাস্তাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলেন। শাস্তা মধুর বচনে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসিকে, তোমার ভক্ত তোমার সম্বন্ধে হিতকামী ও স্নেহশীল কি?" রমণী উত্তর দিল, "ভদন্ত, আমি ইহাকে ভালবাসি বটে, কিন্তু ইনি আমায় ভালবাসেন না। অন্য দিনের কথা থাকুক, আজই পথে অন্নপুট পাইয়া নিজে সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছেন, আমাকে কণামাত্র দেন নাই।" শাস্তা বলিলেন, "ভদ্রে, তোমাদের মধ্যে চিরদিনই এই ভাব দেখা গিয়াছে; তুমি সর্ব্বদাই ইহার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি নিঃস্নেহ। কিন্তু যখন ইনি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে তোমার গুণ বুঝিতে পারেন, তখন তোমাকে সমস্ত প্রভুত্ব প্রদান করেন।" ইহা বলিয়া ভূম্যধিকারীর ও তাঁহার ভার্য্যার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র হয়ত তাঁহার অনিষ্ট করিবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র নিজের ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং কাশীরাজ্যস্থ এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পিতৃ পৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁহাকে একপাত্র অন্নদিয়া বলিল, "আপনার ভার্য্যাকে এক অংশ দিয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভক্ষণ করুন;" কিন্তু রাজপুত্র ভার্য্যাকে কণামাত্র না দিয়া নিজেই সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করিলেন। 'অহো, এই ব্যক্তি কি নিষ্ঠুর' ইহা ভাবিয়া তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন।

রাজপুত্র বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ রমণীকে অগ্রমহিষীর পদ প্রদান করিলেন; কিন্তু 'যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিয়াছি তাহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট' এইরূপ মনে করিয়া তিনি মহিষীকে কখনও কিছু উপহার দিতেন না, তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, এমন কি, 'তুমি কেমন আছ' ইহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতেন না।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন মহিষী রাজার হিতকারিণী;—তিনি রাজাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; অথচ রাজা তাঁহাকে একবার ও মনে করেন না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, রাজা যাহাতে মহিষীর প্রতি তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, আপনার সেবা করিয়া কি লাভ হইবে বলুন। আপনার পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ সাধুপুরুষদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্নও দিতে হয় না, মা?" "বাবা, আমি নিজেই কিছু পাই না, আপনাদিগকে কি দিব বলুন। যখন নিজে পাইতাম, তখন দানও করিতাম। এখন রাজা আমাকে কিছুই দেন না; অন্য দানের কথা দূরে থাকুক, যখন রাজ্য গ্রহণ করিতে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একপাত্র অন্ন পাঠাইয়া সমস্তই নিজে আহার করিয়াছিলেন, আমায় এক মুষ্টিও দেন নাই।" "মা, আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" "পারিব না কেন?" "বেশ, তবে অদ্য আমি যখন রাজার নিকট উপস্থিত থাকিব, তখন জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপ বলিবেন। আপনি কেমন গুণবতী রমণী, রাজা অদ্যই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

এইরূপ পরামর্শ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্রেই রাজার নিকটে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহিষীও রাজার নিকট গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "রাণী-মা, আপনি অতি নির্দ্দয়া; পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত দান করেন না।" মহিষী উত্তর দিলেন, "বাবা, আমিও ত রাজার নিকট কিছুমাত্র পাই না; আপনাদিগকে কি দিব বলুন?" "সে কি, মা, আপনি না অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন?" "যদি পদোচিত সম্মান লাভ না করিলাম, বাবা তবে শুধু পদ পাইলে কি হইবে বলুন। আপনাদের রাজা আমাকে এখন একটি কপর্দ্দকও দান করেন না; একবার পথে একমাত্র অন্ন পাইয়াছিলেন; তাহাও সমস্ত নিজেই আহার করিয়াছিলেন, আমায় কণামাত্র দেন নাই।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" রাজার আকারপ্রকারে বুঝা গেল কথাটা মিথ্যা নহে। বোধিসত্ত্ব তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজা যখন আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, তখন এখানে থাকিয়া লাভ কি, মা? জগতের অপ্রিয়ের সংসর্গ দুঃখকর। আপনি এখানে থাকিলে প্রতিকুল রাজার সংসর্গে দুঃখই ভাগ করিবেন। যে সম্মান করে, লোকে তাহারই প্রতিসম্মান করিয়া থাকে। যে সম্মান করে না, তাহার বিরূপ ভাব বুঝিবামাত্র

অন্যত্র গমন করা বিধেয়। পৃথিবীতে লোকের অভাব নাই।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা দুইটি বলিলেন :

নমস্কার করে যেই, কর তারে নমস্কার;
সেবে যে, সেবিবে তারে-এই লোক-ব্যবহার।
প্রতি-উপকারে তুষ্ট রাখে উপকারী জনে;
হিতৈষীর হিতচেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে।
ভুলেও যে করে না ক সাহায্য কারো কখন,
অপরের সহায়তা লভিবে সে কি কারণ?
যে তোমারে ত্যাগ করে, তুমি ত্যাগ কর তায়;
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন, কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।

[এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতি স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই দম্পতি ছিল সেই দম্পতি এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

----

২২৪. কুম্ভীর-জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার ক্ষমতা এই চারি গুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।
সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার-ক্ষমতা এইচারি গুণ নাই,
হেন জন পারে শত্রুকে দমিতে,— কভু না শুনিতে পাই।

[**সমবধান :** বানরেন্দ্র-জাতকের (৫৭) **সমবধান**সদৃশ।]

----

[১]। প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বানরেন্দ্র-জাতকে দ্রষ্টব্য। প্রথম গাথাটি উভয় জাতকেই এক।

২২৫. ক্ষান্তিবর্ণক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক কার্য্যকুশল অমাত্য অন্তঃপুরস্থ কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয় করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কাজের লোক বলিয়া জানিতেন; কাজেই এই অপরাধ সহ্য করিয়া একদিন শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে আরও অনেক রাজা এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশল রাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছিলেন; সেই অমাত্যের এক ভৃত্য আবার নিজের প্রভুর অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। অমাত্য ভৃত্যের অপরাধ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে লইয়া রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, এই ভৃত্য আমার সব কাজকর্ম্ম দেখে; কিন্তু এ আমার গৃহের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" এই প্রশ্ন করিয়া অমাত্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

সর্ব্বকার্য্য পটু মম ভৃত্য একজন
সতত সেবায় রত করি প্রাণপণ;
এক অপরাধে এবে দোষী দেখি তারে;
কি দণ্ড করিব দান, বলুন আমারে।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

আমার(ও) এরূপ ভৃত্য আছে একজন।
এখানেই অবস্থিতি করিছে এখন।
সর্ব্বগুণযুত লোক দুর্লভ ধরায়;
তাই আমি লইয়াছি ক্ষান্তির আশ্রয়।

অমাত্য বুঝিতে পারিলেন যে রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। কাজেই তদবধি রাজান্তঃপুরে কোনরূপ দুষ্টাচার করিতে সাহস করিলেন না; তাঁহার ভৃত্যও, রাজার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিয়া, আর কখনও দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না।

[কোশলরাজের অমাত্য জানিতে পারিলেন যে রাজা শাস্তার নিকট তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতএব তদবধি তিনি ইহা হইতে বিরত হইলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম বারণসীর সেই রাজা।]

২২৬. কৌশিক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনার্থ অকালে[২] যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।[৩] শাস্তা রাজাকে এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীরাজ অকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়া উদ্যানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় একটা পেচক বেণুগুল্মে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়াছিল। তাহা দেখিয়া দলে দলে কাক আসিয়া ঐ স্থান ঘিরিয়া ফেলিল-তাহারা ভাবিল পেচক বাহির হইলে উহাকে ধরিব। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কি না তাহা না দেখিয়াই পেচক অকালে গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাকগুলো তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তুণ্ডের আঘাতে তাহাকে ভূপাতিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, কাকগুলো এই পেচকটাকে ভূপাতিত করিল কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা অকালে বাসস্থান হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাহারা এইরূপ দুর্গতিই ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্যেই অকালে বাসস্থান হইতে বাহির হইতে নাই।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :

যথাকালে[৪] নিষ্ক্রমণ সুখের কারণ।
অকালে নিষ্ক্রমে দুঃখ, শুনহে রাজন।
হউক একাকী কিংবা সেনা-পরিবৃত,
অকাল-নিষ্ক্রমে দুঃখ পাইবে নিশ্চিত।
অকালে-নিষ্ক্রান্ত হল পেচক দুর্ম্মতি,
কাকসেনা হস্তে তাই এমন দুর্গতি।
কালাকাল জ্ঞানযুত, যিনি বুদ্ধিমান,
ব্যূহাদি রচনে যাঁর জন্মিয়াছে জ্ঞান,
বিপক্ষের ছিদ্র অগ্রে জানি লন যিনি,
দমিয়া অরাতিগণে সুখী হন তিনি।
যথাকালে পেচক বাহিরে যদি আসে,

১। কৌশিক—পেচক।

২। অকালে অর্থাৎ বর্ষকালে; (পক্ষান্তরে) দিবাভাগে।

৩। কলায়মুষ্টি-জাতকে (১৭৬)।

৪। বর্ষাপগমে; (পক্ষান্তরে) রাত্রিকালে, যখন কাক দেখিতে পায় না, কিন্তু পেচক দেখিতে পায়।

কাককুল নির্মুল সে করে অনায়াসে।

[রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

২২৭. গূথপ্রাণ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জেতবন হইতে এক বা দুই ক্রোশ মাত্র দূরে[২] এক নিগমগ্রামে মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা তণ্ডুল বিতরিত হইত,[৩] প্রতিপক্ষেও ভিক্ষুরা প্রচুর অন্ন পাইতেন।

উক্ত নিগমগ্রামে এক স্থুলবুদ্ধি অশিষ্ট ব্যক্তি বাস করিত; সে প্রকৃতিগত দোষবশত পুনঃপুন প্রশ্নদ্বারা লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। যে সকল দহর ভিক্ষু ও শ্রামণের শলাকাভক্ত ও পাক্ষিকভক্ত পাইবার আশায় ঐ নিগম গ্রামে উপস্থিত হইত, সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, "বল ত কে কঠিন দ্রব্য খাইবে, কাহারাই যা শুদ্ধ তরল দ্রব্য পান করিবে বা ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে।[৪] যাহারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিত, উক্ত অশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদিগকে লজ্জা দিত। শেষে এমন হইল যে তাহার ভয়ে কেহ শলাকাভক্ত ও

---

[১]। গূথপ্রাণ—বিষ্ঠাভোজী কীটবিশেষ—গোবুরে পোকা। 'গূথ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা ও সিহলী 'গূ' (বিষ্ঠা) এবং বাঙ্গালা 'ঘুটা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

[২]। 'গাবুতাদ্ধযোজনমত্তে' অর্থাৎ হয় এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধযোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি = $\frac{১}{৪}$ যোজন বা এক ক্রোশ।

[৩]। তণ্ডুলনালী-জাতক (৫) দ্রষ্টব্য। শলাকা বর্ত্তমান সময়ের টিকেট স্থানীয়। ভিক্ষুরা এক একজনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত শলাকা পাইতেন। এই নিদর্শন দেখাইলে ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে তণ্ডুলাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে লব্ধ অন্ন 'শলাকাভক্ত' নামে অভিহিত হইত।

[৪]। 'কে খাদন্তি কে পিবন্তি কে ভুঞ্জন্তি'—এখানে খাদ্যও ভোজ্যের মধ্যে কি প্রার্থক্য তাহা দেখা আবশ্যক। ভাবপ্রকাশে দেখা যায়—"আহারং ষড়বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈবচ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ যথোত্তরং'। ভোজ্যং, যথা ভক্তসূপাদি; ভক্ষ্যং, যথা মোদকাদি; চব্ব্যম যথা চিপিটচণকাদি। এই 'চর্ব্ব্যং' ও 'ভক্ষ্যং এবং বৌদ্ধদিগের 'খজ্জ' (খাদ্য) এক।

পাক্ষিকভক্ত পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ গ্রামের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিত না।

একদা ভিক্ষু শলাকাগৃহে[১] প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই অমুক গ্রামে আজ শলাকাভক্ত বা পাক্ষিকভক্ত বিতরণের কোন ব্যবস্থা আছে কি?" একজন উত্তর দিল, "আছে বটে, কিন্তু সেখানে এক অশিষ্ট ব্যক্তি থাকে; সে পুনঃপুন প্রশ্ন করিয়া ভিক্ষুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে এবং যাহারা উত্তর দিতে না পারে, তাহাদিগকে গালি দেয় ও দুর্বাক্য বলে। তাহার ভয়ে কেহই সেখানে যাইতে চায় না।" ইহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "সেখানেই আমাকে ভক্ত দিবার আদেশ দিন। আমি সেই অশিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপে দমন করিব যে অতঃপর সে বিনয়ী হইবে এবং আপনাদিগকে দেখিয়া পলাইবার পথ পাইবে না।" ভিক্ষুরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে উক্ত গ্রামে ভক্ত দিবার আদেশ দিলেন। তিনি গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইয়া চীবর পরিধান করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি উন্মত্ত মেষের ন্যায় অতিবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "ভো শ্রমণ! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" ভিক্ষু বলিলেন, "ভো উপাসক, আমাকে গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিতে এবং সেখান হইতে যবাগূ সংগ্রহপূর্ব্বক আসনশালায় ফিরিতে দাও, (তাহার পর তোমার প্রশ্ন শুনিব)।"

ভিক্ষু যখন যবাগূ লইয়া আসনশালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি আবার গিয়া সেই কথা উত্থাপিত করিল। ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "অগ্রে যবাগূ পান করিতে, আসনশালা সম্মার্জ্জন করিতে ও শলাকাভক্ত আনিতে দাও, তাহার পর প্রশ্ন শুনা যাইবে। অতঃপর তিনি শলাকাভক্ত আনিয়া ঐ লোকটার হাতেই পাত্রটি দিয়া বলিলেন, 'চল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি উহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং উহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও ঐ অশিষ্ট ব্যক্তি বলিল, "শ্রমণ, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" "দিচ্ছি তোমার প্রশ্নের উত্তর," বলিয়া ভিক্ষু উহাকে এক আঘাতে তুণ্ডলে ফেলিয়া দিলেন, পুনঃপুন প্রহার করিয়া উহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিলেন, উহার মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন, "সাবধান, ভিক্ষুরা এই গ্রামে অসিলে তুই আর কখনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিস না।" এই ঘটনার পর ঐ ব্যক্তি ভিক্ষু দেখিলেই পলাইয়া যাইত।

কিয়ৎকাল পর উক্ত ভিক্ষুর এই কীর্ত্তি সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশিত হইল এবং

---

[১]। বিহারের যে গৃহে ভিক্ষুদিগকে শলাকা অর্থাৎ টিকেট দেওয়া হইত। উহা দেখাইলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তণ্ডুলাদি পাইতেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি সেই অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে মল নিক্ষেপ করিয়াছেন।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?” ভিক্ষুরা তাঁহাকে উক্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, ‘এই ভিক্ষু যে ঐ অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে কেবল এ জন্মেই মল নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীরা এক অপরের দেশে গমন করিবার সময় উভয় রাজ্যের সীমান্তবতী কোন পান্থশালায় এক রাত্রি বিশ্রাম করিত এবং সেখানে মদ্যপান ও মৎস্যমাংস আহার করিয়া প্রাতঃকালে গাড়ী যুতিয়া যাইত। একদা এইরূপ কতিপয় পথিক পান্থশালা হইতে প্রস্থান করিলে একটি গূথকীট মলগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং আপানভূমিতে নিক্ষিপ্ত সুরা দেখিতে পাইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত উহা পান করিল। ইহাতে মত্ত হইয়া সে মলস্তূপের উপর আরোহণ করিল। মলস্তূপ তখনও কঠিন হয় নাই; কাজেই তাহার ভরে উহার এক অংশ ঈষৎ অবনত হইল। তাহাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, “অহো! ধরিত্রী দেখিতেছি আমার ভারবহনে অক্ষমা!” এই সময়ে এক মদমত্ত হস্তী ‘ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে মলগন্ধে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গূথকীট ভাবিল, ‘হস্তী আমায় দেখিয়া পলায়ণ করিতেছে। ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।’ অনন্তর সে নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া হস্তীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল :

তুমি বীর, আমি বীর উভয়ে বিক্রমশালী,
উভয়েই প্রহারে নিপুণ;
ভাগ্যে যদি হল দেখা কেন নাহি করি, সখা,
প্রদর্শন নিজ নিজ গুণ!
ফির তুমি, গজবর; হও যুদ্ধে অগ্রসর;
ভয়ে কেন কর পলায়ন?
অঙ্গ-মগদের লোক দেখুক সকলে আজি
আমাদের বিক্রম কেমন।

হস্তী কর্ণ উত্তোলন করিয়া গূটকীটের স্পর্দ্ধাসূচক এই বাক্য শ্রবণ করিল এবং প্রত্যবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা ভৎর্সনা করিল :

পদ, দন্ত কিংবা শুণ্ড করিয়া প্রয়োগ
জীবনান্ত যদি তোর করিবে, অধম,
রটিবে কুকীর্ত্তি মম; মলভারে তোরে
নিষ্পেষি বধিব তাই, করিলাম স্থির।
পূর্তির প্রয়োগে নাশ হইবে পূতির।

ইহা বলিয়া হস্তী গূথকীটের মস্তকোপরি এক প্রকাণ্ড মলপিণ্ড ত্যাগ করিল এবং তদুপরি মূত্র বিসর্জ্জন করিয়া তখনই তাহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সমবধান : তখন এই অশিষ্ট প্রশ্নকারক ছিল সেই গূথকীট; ইহার দমনকর্ত্তা ছিলেন সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম পূর্ব্ববর্ণিত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারী বনদেবতা।

---

২২৮. কামনীত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কামনীত নামক এক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু কাম-জাতকে (৪৬৭) সবিস্তর বর্ণিত হইবে।[১]

বারাণসীরাজের দুইপুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বারাণসীতে গিয়া রাজা হইলেন; যিনি কনিষ্ঠ তিনি উপরাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন, তিনি অতীব বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোলুপ হইলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন স্বর্গ হইতে জম্বুদ্বীপ অবলোকনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, তত্রত্য রাজা দ্বিবিধ কুপ্রবৃত্তিতে আসক্ত। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি এই রাজাকে এমন নিগ্রহ করিব, যে তাহাতে ইনি নিজের নীচাশয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জাবোধ করিবেন।' অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে আবির্ভূত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ব্রাহ্মণ কুমার, তুমি কি জন্য আছিয়াছ?" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি সমৃদ্ধিশালী, শস্যসম্পত্তিসম্পন্ন, অশ্ব-গজ রথযুক্ত এবং সুবর্ণালঙ্কারাদি পূর্ণ তিনটি নগরের কথা জানি। অতি অল্প সেনা

---

[১]। কামজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যে ব্রাহ্মণ বন কাটিয়া শস্য বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন নাম দেওয়া নাই। সম্ভবতঃ 'কামনীত' নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

দ্বারাই এই নগরত্রয় জয় করিতে পারা যায়। আমি সেগুলি অধিকার করিয়া আপনাকে দান করিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছি।" "আমাদিগকে কখন যাত্রা করিতে হইবে?" "আগামীকল্য"। "তবে তুমি এখন যাইতে পার; কল্য প্রাতঃকালে আসিও।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ; আপনি শীঘ্র শীঘ্র সেনা সুসজ্জিত করুন।" এই কথা বলিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন রাজা ভেরীবাদনপূর্ব্বক সেনা সুসজ্জিত করাইলেন এবং অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কাল এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া বলিয়াছিল, উত্তর পঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কেকয় এই নগরত্রয় জয় করিয়া আমায় দান করিবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমরা ঐ সকল নগর জয় করিতে যাই। তোমরা তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ঐ ব্রাহ্মণ- কুমারের জন্য কোথায় বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন?" "আমি ত তাহার বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করিয়া দিই নাই।" "আপনি তাহার আহারের ব্যয় দিয়াছিলেন ত?" "না, তাহাও দিই নাই।" "তবে আমরা কোথায় তাহার দেখা পাইব?" "নগরের পথে পথে অনুসন্ধান কর।"

অমাত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজাকে গিয়া জানাইলেন, "মহারাজ, আমরা কোথাও সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলাম না।

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'হায় আমি নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় বহু ঐশ্চর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম!' তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; কল্পিত অর্থ-শোকে তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া গেল; রক্ত কুপিত হইল; তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা বিস্তর চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না।

এইরূপে তিন চারি দিন গত হইলে শক্র চিন্তা দ্বারা রাজার পীড়ার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন, 'রাজাকে রোগমুক্ত করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি রাজদ্বারে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজ, আমি বৈদ্য ব্রাহ্মণ; আপনাকে চিকিৎসা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "কত বড় বড় রাজবৈদ্য আসিয়া আমার ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেন না! যাহা হইক, ইহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।" তাহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "আমি পাথেয় লইব না, দর্শনীও লইব না; আমি রাজার চিকিৎসা করিবই করিব। তোমরা আমাকে একবার রাজার সহিত দেখা করাইয়া দাও।" ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে আসিতে

বল।”

শক্র রাজসমীপে প্রবেশ করিয়া “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “তুমিই কি আমায় চিকিৎসা করিবে!” “হাঁ, মহারাজ!” “তবে চিকিৎসা কর।” “যে আজ্ঞা। আপনি আমাকে ব্যাধির লক্ষণ বলুন। কি কারণে, কি খাইয়া বা পান করিয়া, কি দেখিয়া বা শুনিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।”

“বাপু, আমার এই পীড়া শ্রবণ-জাত।” “আপনি কি শুনিয়াছিলেন?” “এক ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে তিনটি নগর জয় করিয়া আমায় দান করিবেন; আমি কিন্তু তখন তাঁহার বাসস্থানের বা আহারের কোন ব্যবস্থা করি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অন্য কোন রাজার নিকট গিয়া থাকিবেন। তাহার পর, বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম এই চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি। আপনি কি দুরাকাঙ্খাজনিত ব্যাধির উপশম করিতে পারেন?[১] ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :

এক রাজ্য আছে মোর, তাহে তুষ্ট নহে মন;
তিনটি নূতন রাজ্য তরে সদা উচাটন।
পঞ্চাল, কেকয়, কুরু রাজ্য করি অধিকার,
অতুল প্রভুত্ব পাব এ আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার।
অতি দুরাকাঙ্ক্ষ আমি, বলিতে সরম হয়;
ব্যাধি-মুক্ত অধমেরে কর তুমি, দয়াময়।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, “মহারাজ, আপনার চিকিৎসা করিতে হইবে জ্ঞানরূপ ঔষধ প্রয়োগদ্বারা, উদ্ভিজ্জমুলাদিজাত ঔষধ দ্বারা নহে।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

কৃষ্ণসর্প-দুষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রৌষধিবীর্য্য-বলে
হয় নিরাময়;
ভুতাবিষ্ট যেই জন, পণ্ডিতের সুকৌশলে
সেও সুস্থ হয়।
কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা-দাস বুদ্ধি-দোষে হয় যেবা,

১। Cf, “Canst thou not minister to the mind diseased.
pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff’d bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?”—Shakespeare.

উপায় কি তার?
মনেরে ধরিলে রোগে ভৈষজ্য সেবন করি
না হয় উদ্ধার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মনে করুন, আপনি সেই নগরত্রয় লাভ করিলেন; কিন্তু আপনি যখন চারিটি নগরের অধিপতি হইবেন, তখন কি যুগপৎ বস্ত্রযুগল-চতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিবেন? তখন কি আপনি এক সঙ্গে চারিখানি সুবর্ণ পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিবেন, কিংবা চারিটি রাজশয্যায় শয়ন করিবেন।[১] মহারাজ, বাসনা-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, বাসনাই সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর। বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অষ্ট মহানরকে, ষোড়শ উৎসাদ নরকে,[২] এবং সর্ব্ববিধ অপায়ে পতিত করে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে নিরয়-গমনের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন; তাহা শুনিয়া রাজার মনের বেগ অপনীত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। শক্র তাঁহাকে উপদেশবলে শীলাচারসম্পন্ন করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন; তিনিও তদবধি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনাবসানে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই কামনীত ব্রাহ্মণ ছিল সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

২২৯. পলায়ি-জাতক

[এক পরিব্রাজক জেতবনের দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই পরিব্রাজক নাকি বিচারার্থ সমস্ত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি উপযুক্ত প্রতিবাদী না পাইয়া শেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ, এমন কোন লোক এখানে আছেন কি?" শ্রাবস্তীবাসীরা উত্তর দিয়াছিল," জানেন না কি যে এখানে মনুজশ্রেষ্ঠ মহাগৌতম অবস্থিতি করিতেছেন? তিনি ভবাদৃশ সহস্র ব্যক্তির সঙ্গে

---

[১]। Cf. "lf the man gets meat and clothes, what matters it wbether he buy those necessaries with seven thousand a year, or with seven million, could that be, or with seven pounds a year? He can get meat and clothes for that; and he will find intrinsically, if he is a wise man, wonderfully little differance," Carlyle.

[২]। অষ্টমহানরক; যথা : সঞ্জীব, কালসূত্র, সজ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। প্রথম খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তর্ক করিতে সমর্থ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মেশ্বর এবং বিরুদ্ধবাদ-প্রমর্দ্দক। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন তার্কিক নাই, যিনি তাঁহাকে বিচারে অতিক্রম করিতে পারেন। যেমন উর্ম্মিসমূহ বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধবাদ তাঁহার পাদমূলে আসিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।" শ্রাবস্তীবাসীরা এইরূপে বুদ্ধের গুণ কীর্ত্তন করিলে পরিব্রাজক জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি এখন কোথায় আছেন?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "জেতবনে"। তাহা শুনিয়া পরিব্রাজক বলিলেন, "এখনই গিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেছি"; এবং তৎক্ষণাৎ বহুজন-পরিবৃত হইয়া জেতবনাভিমুখে চলিলেন। জেতরাজকুমার নবতিকোটি ধন ব্যয় করিয়া মহাবিহারের যে দ্বারকোষ্ঠক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি শ্রমণ গৌতমের বাসস্থান?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "ইহা তাঁহার বাসস্থান নহে, দ্বারকোষ্ঠক মাত্র।" "যদি দ্বারকোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে বাসস্থান না জানি কীদৃশ!" "বাসস্থানের নাম গন্ধকুটীর; জগতে তাহার তুলনা নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এবংবিধ শ্রমণের সঙ্গে কাহার সাধ্য তর্ক করিতে পারে?" অতঃপর তিনি আর অগ্রসর না হইয়া সেখান হইতেই পলায়ন করিলেন।

নগরবাসীরা তখন আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে জেতবনে প্রবেশ করিল। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, কেবল এখন বলিয়া নয়, পূর্ব্বেও একবার এই ব্যক্তি আমার বাসভবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠমাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। 'তক্ষশিলা জয় করিব' এই দুরাকাঙ্ক্ষায় তিনি মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া উহার অভিদূরে উপস্থিত হইলেন এবং "এই নিয়মে হস্তী, এই নিয়মে অশ্ব, এই নিয়মে রথ, এই নিয়মে পদাতি পরিচালিত হইবে, মেঘে যেমন বারি বর্ষণ করে, তোমরাও তেমনি অজস্র শরবর্ষণ করিবে," যোদ্ধাদিগকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ দিতে দিতে বলবিন্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন :

প্রমত্ত মাতঙ্গ মম প্রলয়ে মেঘ-সম,
উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্ব অসংখ্য আমার;
মহোর্ম্মিসদৃশ রথ আনিয়াছি শত শত;

বাণ বর্ষি করিবেক শত্রুর সংহার।
বজ্রমুষ্টি পদাতিক ছুটিবেক নানাদিক,
প্রহারিবে শত্রুবক্ষে তীক্ষ্ণ তরবারি;
ল'য়ে চতুর্ব্বিধ বল, চল সবে, শীঘ্র চল,
ঘিরিব চৌদিকে মোরা তক্ষশিলাপুরী।
চল সবে পড়ি গিয়া শত্রুর উপর
ভীমনাদে পূর্ণ করি দিক, দিগন্তর;
কাট কাট মার মার শব্দকর আনিবার,
গজগণ ক্রৌঞ্চনাদে করুক গর্জ্জন;
হ্রেষা, তুর্য্যধ্বনি আর সঙ্গে যোগ দিক তার
সে নির্ঘোষে কম্পমান হো'ক শত্রুগণ।
বজ্রনাদে মেঘ যথা ঘিরে নভস্তলে,
সেইরূপে তক্ষশিলা বেষ্টিব সকলে।

বারাণসীরাজ এইরূপে গর্জ্জন করিতে করিতে সেনা পরিচালনপূর্ব্বক নগরদ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারকোষ্ঠক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তক্ষশিলারাজের প্রাসাদ?" কিন্তু যখন শুনিলেন উহা নগরদ্বার-কোষ্ঠক মাত্র, তখন তিনি বলিলেন, "তাই ত, যাদি দ্বার-কোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে না জানি প্রাসাদ কিরূপ হইবে।" কেহ কেহ উত্তর দিল 'মহারাজ, তক্ষশিলাপতির প্রাসাদ বৈজয়ন্ত-সদৃশ।"[১] তখন ব্রহ্মদত্ত বলিলেন," এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ।" এই বলিয়া তিনি তক্ষশিলায় দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখায়াই প্রতিবর্ত্তন ও পলায়ন করিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[**সমবধান** : তখন এই পলায়িত ভিক্ষু ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তক্ষশিলায় সেই রাজা।]

---

২৩০. দ্বিতীয় পলায়ি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক পলায়িত পরিব্রাজক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেই পরিব্রাজক বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বহুজন পরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, মনঃশিলাতল-সমাসীন হিংসপোতক যেরূপ নিনাদ করিতে থাকে, সেইরূপ গম্ভীরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতেছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মকায়, পূর্ণচন্দ্রনিভ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং

---

[১]। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রভবন।

সুবর্ণপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাটদর্শনে সেই পরিব্রাজক ভাবিলেন, 'কাহার সাধ্য এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করিতে পারে?' অনন্তর তিনি মুখ ফিরাইয়া সভাস্থ জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে পালাইয়া গেলেন। বহুলোক তাঁহার অনুধাবন করিল এবং শেষে ফিরিয়া গিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি আমার হেমাভ মুখমণ্ডল দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে এবং জনৈক গান্ধাররাজ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। একদা গান্ধাররাজ সঙ্কল্প করিলেন যে বারাণসী রাজ্য জয় করিতে হইবে। তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজধানী পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নগরদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিজের বল-বাহন দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, 'কাহার সাধ্য এত বল ও বাহন পরাজয় করিতে পারে?" তিনি নিজের সেনা বর্ণনপূর্ব্বক প্রাসাদস্থিত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

অসংখ্য পতাকা, বিশাল বাহিনী
পারাবার-সম, পার নাহি জানি।
কাকে কি পারিবে সাগরে রোধিতে?
মলয়-অনিল গিরি উৎপাটিতে?
দুর্জ্জয় এ সেনা, শুনহে রাজন্
বিনাযুদ্ধে কর আত্মসমর্পণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নিজের পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "মূর্খ, বৃথা প্রলাভ করিও না; মত্ত মাতঙ্গে যেমন নলবল লণ্ডভণ্ড করে, আমিও সেইরূপে এই মুহূর্ত্তেই তোমার বলবাহন প্রমর্দ্দিত করিতেছি।" এরূপ তর্জ্জন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

করো' না প্রলাপ, নির্ব্বোধ রাজন।
জয়ী তুমি যুদ্ধে হবে না কখন।
বিকারে বিকৃত মস্তক তোমার;
বিক্রম আমার দেখিবে এবার।
প্রমত্ত বারণ যবে একচর,
কে তার নিকটে হয় অগ্রসর?
মাতঙ্গ মর্দ্দন করে নলবন

পদাঘাতে যথা, সেরূপ রাজন,
মর্দ্দিব তোমায়, বলিনু নিশ্চয়,
পলাও, যদি হে থাকে প্রাণভয়।

বোধিসত্ত্বের এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া গান্ধাররাজ প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার কাঞ্চনপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি নিজেই বা বন্দী হন। এই ভয়ে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিবর্ত্তন ও পলায়নপূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন এই পলায়িত পরিব্রাজক ছিলেন সেই গান্ধাররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

---

২৩১. উপানজ্জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী হইয়া নিজের মহাবিনাশ ঘটাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ও তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীগ্রামবাসী এক মাণবক তাঁহার নিকট গজশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। যিনি বোধিসত্ত্ব, তিনি বিদ্যাদানে কৃপণতা করেন না, নিজে যাহা জানেন, শিষ্যদিগকে সমস্তই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য উক্ত মাণবক বোধিসত্ত্বের নিকট নিরবশেষে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া বলিল, "গুরুদেব, আমি রাজাসেবা করিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা।" তিনি রাজার নিকট গিয়া শিষ্যের প্রার্থনা জানাইলেন,—বলিলেন, "মহারাজ, "বেশ কথা।" আমার অন্তেবাসী আপনার

---

[১]। উপানহ = পাদুকা।

সেবা করিতে চায়।" রাজা উত্তর দিলেন, "ভালই ত, তাহাকে আসিতে বলিবেন।" "তাহাকে কি বেতন দিবেন, স্থির করিলেন, মহারাজ?" "আপনার অন্তেবাসী ত আপনার সমান বেতন পাইতে পারে না; আপনি একশত মুদ্রা পাইলে; সে পঞ্চাশ মুদ্রা পাইতে পারে; আপনি দুই মুদ্রা পাইলে সে এক মুদ্রা পাইবে।" বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অন্তেবাসীকে কে রাজার আদেশ জানাইলেন।

অন্তেবাসী বলিল, "গুরুদেব, আপনি যাহা জানেন, আমিও ত তাহাই জানি। অতএব আপনার সমান বেতন পাইলেই রাজার সেবা করিব, নচেৎ করিব না।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন, "সে যদি আপনার তুল্য বিদ্যা নৈপুণ্য দেখাইতে পারে তবে আপনার সমান বেতন পাইবে।" বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া গিয়া অন্তেবাসীকে এই কথা বলিলেন। সে উত্তর দিল, "আপনার তুল্য নৈপুণ্যই দেখাইব।" বোধিসত্ত্ব আবার গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে কা'লই আপনার স্ব স্ব নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিন।" "যে আজ্ঞা মহারাজ; আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরে এই সংবাদ প্রচার করুন।"

তখন রাজা ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া অনুমতি দিলেন, "ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা কর, আগামীকল্য আচার্য্য ও তাঁহার অন্তেবাসী স্ব স্ব গজবিদ্যার পরিচয় দিবেন। যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ইহা দেখিতে পারে।"

বোধিসত্ত্ব গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অন্তেবাসী আমার উপায়কুশলতার সম্যক পরিচয় পায় নাই।" অনন্তর তিনি একটা হস্তী বাছিয়া লইয়া এক রাত্রির মধ্যেই তাহাকে বিলোম-ক্রিয়া শিক্ষা দিলেন। ইহাতে সে 'চল' বলিলে পিছনে হঠিতে, 'পিছনে হঠ' বলিলে অগ্রসর হইতে 'উঠ' বলিলে শুইতে, 'শোও' বলিলে উঠিতে (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও বলিলে রাখিয়া দিতে, 'রাখিয়া দাও, বলিলে তুলিয়া লইতে শিখিল। অনন্তর পর দিন সেই হস্তীরইঃপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। অন্তেবাসীও একটি সুন্দর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। উভয়েই প্রথমে তুল্যরূপ স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু শেষে বোধিসত্ত্ব নিজের হস্তীর দ্বারা বিলোম-ক্রিয়া করাইতে লাগিলেন। তিনি 'চল' বলিলে সে হঠিয়া গেল, 'হঠ' বলিলে অগ্রসর হইল, 'উঠ' বলিলে শুইয়া পড়িল, 'শোও' বলিলে উঠিয়া দাঁড়াইল, (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও' বলিলে রাখিয়া দিল, 'রাখিয়া দাও' বলিলে তুলিয়া লইল। ইহা দেখিয়া সেই সমবেত মহাজনসঙ্ঘ বলিয়া উঠিল, "অরে দুষ্ট অন্তেবাসিন, তুমি আচার্য্যকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছিস্; নিজের ওজন বুঝিস্ না!

তুই আপনাকে আচার্য্যের তুল্যকক্ষ মনে করিস।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদির প্রহারে সেখানেই তাহার প্রাণান্ত করিল। বোধিসত্ত্ব হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, লোকে নিজের সুখের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু একজনের পক্ষে অধীতবিদ্যা অপকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত উপানহের ন্যায় মহাদুঃখের কারণ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি আবৃত্তি করিলেন :

আরামের তরে ক্রীত পাদুকাযুগল
নির্ম্মাণের দোষে দেয় যন্ত্রণা কেবল।
বিষম উত্তাপে, ব্রণে ক্লিষ্ট পদতল;
ছেন পাদুকায় মোর, বল, কিবা ফল?
নীচকুলে জন্ম যার, অনার্য্যচরিত,
তব পাশে লভি বিদ্যা তোমারই অহিত
করে সে বিদ্যার বলে; এই হেতু তারে
ক্লেশদ পাদুকা তুল্য লোকে মনে করে।

বোধিসত্ত্বের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান করিলেন।

[**সমবধান : ত**খন দেবদত্ত ছিল সেই অন্তেবাসীক এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

---

২৩২. বীণাস্থূণা-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন। এই কুমারী শ্রাবস্তীনগরের এক আঢ্য শ্রেষ্ঠীর কন্যা। শ্রেষ্ঠীর গৃহে একটা প্রকাণ্ড যণ্ড ছিল। লোকে তাহার অত্যধিক যত্ন করিত দেখিয়া সে একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাই মা, লোকে এই ষাড়টার এত যত্ন করে কেন?' ধাত্রী উত্তর দিল, "এটা বৃষরাজ, সেই জন্য।"

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রাসাদে বসিয়া রাজপথে কি হইতেছে দেখিতেছিল। সেই সময়ে পথ দিয়া একজন কুব্জ যাইতেছে দেখিয়া সে ভাবিল, "গোজাতির মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার পৃষ্ঠে ককুদ্ থাকে; যে মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ তাহারও সেইরূপ কিছু থাকিবে। অতএব এই লোকটিও মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ; আমি গিয়া ইহার পদ সেবা করিব।" তখন সে দাসী পাঠাইয়া ঐ লোকটাকে

---

[১]। স্থূণা-স্তম্ভ। বীণা স্থূণা বলিলে বীণার কাঠামটা বুঝিতে হইবে।

জানাইল, 'শ্রেষ্ঠীকন্যা আপনার সঙ্গে যাইতে চান; আপনি অমুক স্থানে গিয়া অপেক্ষা করুন।" অনন্তর সে অলংকারাদি লইয়া ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কুব্জটার সহিত পলাইয়া গেল।

ক্রমে লোকে এই কাণ্ড জানিতে পারিল; ভিক্ষুসঙ্ঘেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ অমুখ শ্রেষ্ঠীকন্যা নাকি এক কুব্জের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই কুমারী এক কুব্জের প্রণয়পাশে বন্ধা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রপ্তির পর তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন এবং বহু পুত্র কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার একপুত্রের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত বারাণসীবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর এক কন্যা মনোনীত করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন।

বারাণসীশ্রেষ্ঠীর ঐ কন্যা পিতৃ গৃহে একটা যণ্ডকে আদর যত্ন পাইতে দেখিয়া একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লোকে এই ষাঁড়টার এত আদর যত্ন করে কেন?" ধাত্রী বলিয়াছিল, "এটা বৃষরাজ, সেইজন্য।" ইহা শুনিয়া সে একদা রাজপথে এক কুব্জকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, "এই লোকটি নিশ্চয় পুরুষপুঙ্গব।" অনন্তর সে অলঙ্কারাদি লইয়া সেই কুব্জের সহিত পলায়ন করিল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকন্যাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাইতেছিলেন এবং যে পথে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ কুব্জের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই চলিতেছিলেন।

শ্রেষ্ঠীকন্যা ও কুব্জ সমস্ত রাত্রি পথ চলিল; কুব্জ রাত্রিকালে বড় শীতভোগ করিয়াছিল; সূর্য্যোদয়ের সময় বাত কুপিত হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, সে বেদনার মত্তপ্রায় হইয়া রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক পার্শ্বে হাত পা গুটাইয়া বীণাদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল; শ্রেষ্ঠীকন্যা তাঁহার পাদমূলে বসিয়া থাকিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কুব্জের পাদমূলে শ্রেষ্ঠীকন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

এ আমার নিজ বুদ্ধি; জিজ্ঞাসিলে অন্যজনে
আসিতে কি কভু তুমি এ হেন বামন-সনে?

একে মূর্খ তাহে কুব্জ, নাহিক শকতি এর
যাতায়াত করিবারে বিনা সাহায্যে অন্যের।
এর সঙ্গে ভব বাস? ছি ছি এ কেমন কথা?
তোমার এ ব্যবহার দেখি মনে পাই ব্যাথা।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

পুরুষ পুরুষ হবে ভাবি এই মনে মনে
প্রণয়পাশেতে বদ্ধ হয়েছিনু এর সবে।
এবে কিন্তু দেখি এরে মানবের কুলাধম,
নিপতিত পথপার্শ্বে ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম।

বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে শ্রেষ্ঠীকন্যা ছদ্মবেশে পিতৃগৃহ হইতে বহির্গতা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে স্নান করাইলেন, আভরণ পরাইলেন এবং রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

সমবধান : তখন এই শ্রেষ্ঠী কন্যা ছিল সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই নিগমগ্রামবাসী শ্রেষ্ঠী।

----

২৩৩. বিকর্ণক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় আনিত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ইহাতে সেই ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন "হাঁ প্রভু, আমি সত্য সত্যেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।' "কি জন্য তোমার উৎকণ্ঠা?" "কামরিপুবশত।" "দেখ, কামরিপু বিকর্ণক শল্যসদৃশ; বিকর্ণকবিদ্ধ শিশুমার যেমন বিনষ্ট হইয়ছিল, কামরিপু যে হতভাগ্যের হৃদয়ে একবার লব্দ প্রবেশ হয়, তাহারও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে অরাম্ভ করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণী তটে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেখানে নৃত্যগীত-কুশল লোকে তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়াছিল।

---

[১]। বিকর্ণ—একপ্রকার শল্য।

ঐ পুষ্করিণীবাসী মৎস্যকচ্ছপগণ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি-শ্রবণলালসায় দলে দলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তালস্কন্ধ প্রমাণ মৎস্যগুলি দেখিয়া পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৎস্যগুলি আমার কাছে আসিয়া জুটিয়াছে কেন?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "দেব, মৎস্যগণ আপনাকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছে।"

মাছগুলা তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে দৈনিক আহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এজন্য প্রতিদিন চারি দ্রোণ[১] চাউল পাক করা হইত। মাছগুলা ভাতের বেলা এক দল আসিয়া জুটিত; এক দল আসিত না; কাজেই অনেক ভাত নষ্ট হইত। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "এখন হইতে ভাতের বেলা ভেরী বাজাইবে। ভেরীর শব্দ শুনিয়া সমস্ত মাছ একস্থানে আসিয়া জুটিবে; তখন ভাত দিবে।" যাহার উপর ভাত দিবার ভার ছিল, রাজার আদেশ মত সে তদবধি ভেরী বাজাইয়া মাছগুলাকে একত্র জড় করিত এবং ভাত দিত। মাছগুলাও ভেরীর শব্দ শুনিয়া একস্থানে আসিয়া জুটিত ও ভাত খাইত। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে সেখানে এক শিশুমার দেখা দিল। মাছগুলা একস্থানে সমবেত হইয়া যখন ভাত খাইত, সে তখন মাছ খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, "শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিবে, তখন তাহাকে বিকর্ণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ধরিবে।" ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিল, তখন নৌকায় চড়িয়া তাহাকে বিকর্ণবিদ্ধ করিল। শল্যটা শিশুমারের পৃষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; সে বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বিকর্ণ লইয়াই পলায়ণ করিল। শিশুমার বিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া রাজভৃত্য তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

যথা ইচ্ছা যাও চলি, নাহিক নিস্তার;
মর্ম্মস্থানে শল্যবিদ্ধ হয়েছ এবার।
শুনিয়া ভেরীর বাদ্য আসে পাইবারে খাদ্য
মৎস্য হেথা; তাহাদের পশ্চাতে ধাবন
করি, লোভী, প্রাণ ত্যজিলে এখন।

শিশুমার নিজের বাসস্থানে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[শাস্তা এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

---

[১]। ১ দ্রোণ = $\frac{১}{৪}$ আঢ়ক। (বঙ্গদেশে) ১আঢ়ক—২ মণ।

নিজ চিত্ত বশে চলে, না মানে অন্যে যা বলে,
রিপু প্রলোভনে মত্ত হেন মূঢ়জন,
ইহামুত্র উভয়ত্র দুঃখের ভাজন।
জ্ঞাতিমিত্র পরিবৃত, থাকুক সে অবিরত,
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, নাহিক অন্যথা,
লোভবশে, শল্যবিদ্ধ শিশুমার যথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমিই ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

২৩৪. অসিতাভূ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কোন সেবকের এক রূপবতী ও সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সে নিজের অনুরূপকুলে পাত্রস্থা হয়। কিন্তু তাহার স্বামী কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজের ইচ্ছামত অন্যত্র ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া বেড়াইত। পতির অনাদরে দৃক্‌পাত না করিয়া ঐ রমণী মধ্যে মধ্যে অগ্রশ্রাবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত, তাঁহাদিগকে প্রচুর উপহার দান করিত, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ শুনিত। এইরূপে সে ক্রমে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল এবং মার্গসুখের ও ফলসুখের আস্বাদ পাইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিল, 'স্বামী যখন আমায় চান না, তখন গৃহে থাকিয়া আমার কি কাজ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে মাতাপিতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইল এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত ভিক্ষুদিগের জ্ঞানগোচর হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন : "দেখ ভাই, অমুক বাড়ীর কন্যাটি নাকি পরমার্থ-লাভের জন্য বড় আয়াসবতী। তাহার স্বামী তাহাকে আদর করে না বুঝিয়া সে প্রথমে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করে ও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হয়; তাহার পর মাতাপিতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ত্ব

---

[১]। 'অসিতাভূ' নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। পাঠান্তরে 'অসিকাভূ,' 'অসীতানুভূতা' ইত্যাদি রূপও দেখা যায়।' অসিতাভা' পাঠ থাকিলে অর্থগ্রহে তত অসুবিধা হইত না।

লাভ করিয়াছে। পরমার্থ লাভের জন্য কন্যাটির এতই আগ্রহ হইয়ছিল!"

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই কুলকন্যা যে কেবল এ জন্মেই পরমার্থান্বেষিণী তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে পরমার্থান্বেষণ-পরায়ণা ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বারাণসীরাজ নিজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত কুমারের অনুচরবাহুল্য ও অস্ত্রশস্ত্র-বেশভূষণাদির আড়ম্বর দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং এই জন্য পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।[১] নির্ব্বাচিত রাজকুমার এবং তাহার পত্নী অসিতাভূ, ইহারা দুইজনে হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মৎস্যমাংস ও বন্যফলাদি ধারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকুমার এক কিন্নরীকে দেখিতে পাইয়া কামমোহিত হইলেন এবং 'ইহাকে আমার পত্নী করিব' এই উদ্দেশ্যে অসিতাভূকে উপেক্ষা করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। স্বামীকে কিন্নরীর অনুসরণ করিতে দেখিয়া অসিতাভূর বিরাগ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'ইহার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি? এই ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কিন্নরীর অনুধাবন করিল।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন, নিজের উপযুক্ত কৃৎস্ন[২] জানিয়া অনন্যমনে তাহা দেখিতে লাগিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন, বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং নিজের পর্ণশালাদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে ব্রহ্মদত্ত কুমার কিন্নরীর অনুধাবন করিতে গিয়া তাহার দেখা পাওয়া দূরে থাকুক, সে কোন পথে গমন করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।

---

[১]। "পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীভি;" বিশেষতঃ "পুত্রাদপি নরপতীনাং ভীতিঃ" এই নীতির যাথার্থ্য অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র হইতে কোন বিপত্তি না ঘটে এই নিমিত্ত রাজারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, কৌটিল্য প্রভৃতির নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু ও বিরুঢ়ক স্ব স্ব পিতার প্রতি যে পাশব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের সুবিদিত।

[২]। প্রথম খণ্ডের ২৬৯ পৃষ্ঠের পাদটীকার দ্রষ্টব্য।

কাজেই তিনি হতাঁশ হইয়া পর্ণশালাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। অসিতাভূ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং মণিবর্ণ গগনতলে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, তোমার অনুগ্রহেই আমি এই ধ্যানসুখ লাভ করিয়াছি।" অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

কিন্নরীর প্রেমলোভে, দেখিলাম যবে তুমি, গেলা ছুটি, ফেলিয়া আমায়,
তব প্রতি অনুরাগ ছিল যাহা এতদিন সেইক্ষণে পাইল বিলয়।
ক্রকচে[১] দ্বিখণ্ডীকৃত গজদন্ত পুনর্ব্বার যুড়িতে কি পারে কোন জন?
ছিন্ন হ'লে একবার, চিরদিন তরে তথা ঘুচে যায় প্রণয়বন্ধন।

ইহা বলিয়া, কুমার তাঁহাকে দেখিতে না দেখিতেই, তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কুমার পরিদেবন করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

যা দেখে তা পেতে ইচ্ছা,—অতিশয় লোভ
মত্ত করি জীবগণে দেয় বড় ক্ষোভ।
দুষ্প্রাপ্য পাইতে গিয়া আমি মূঢ়মতি
হারাইনু, হায় হায়, অসিতাভূ সতী।

এইরূপ পরিদেবন করিয়া ঐ রাজপুত্র একাকী অরণ্যেবাস করিতে লাগিলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

সমবধান : তখন এই দুই ব্যক্তি ছিল রাজপুত্র ও রাজদুহিতা (অসিতাভূ), এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৩৫. বচ্ছনখ-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লবংশীয় রোজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপাসক নাকি আয়ুষ্মান আনন্দের বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন স্থবিরকে তাঁহার গৃহে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া

---

[১]। করাত।

[২]। মূলে এইরূপ আছে; 'বচ্ছ' শব্দ সংস্কৃতে 'বৎস'; কিন্তু 'বৎসনখ' পদে কোন অর্থ হয় না। যদিও এই শব্দটি উপাখ্যান-বর্ণিত তপস্বীর নাম, তথাপি 'জরদ্গব', 'ভাসুরক' প্রভৃতির নামের ন্যায় ইহারও একটা অর্থ থাকা সম্ভবপর। তবে কি অনুমান করিতে হইবে যে লিপিকর-প্রমাদবশত 'বঙ্ক' (বক্র) শব্দের স্থানে 'বচ্ছ' হইয়াছে? তপস্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নখাদি ছেদন করেন না। কাজেই তাঁহাদের নখগুলি বৃদ্ধি পাইয়া বক্র হইয়া থাকে।

পাঠাইয়াছিলেন। স্থবির শাস্তার নিকট অনুমতি লইয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেলেন, বন্ধুও তাঁহাকে নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করাইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং নানারূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্থবিরকে গার্হস্থ্য সুখের ও পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রলোভন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত আনন্দ, আমার গৃহে চেতন, অচেতন বহুবিধ ভোগের পদার্থ আছে। আমি তৎসমস্ত দুইভাগ করিয়া আপনাকে একভাগ দিতেছি। আসুন, আমরা দুইজনে মিলিয়া এই গৃহে বাস করি।" ইহা শুনিয়া, আনন্দ রোজকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইন্দ্রিয়-সেবা অশেষ দুঃখের নিদান। অতঃপর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আনন্দ, রোজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি?" আনন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভগবন; তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।" "রোজ তোমায় কি বলিলেন?" 'ভদন্ত, রোজ আমাকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে গৃহবাসের ও ইন্দ্রিয়সেবার দোষ বুঝাইয়া দিয়াছি।' "দেখ, রোজ যে কেবল এ জন্মেই প্রব্রাজকদিগকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা আনন্দের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন রাজকীয় উদ্যানে রহিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে বারাণসী-শ্রেষ্ঠী তাঁহার আকারপ্রকার দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া ভোজন করাইলেন। শ্রেষ্ঠীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি তদবধি তদীয় উদ্যানেই বাস করিবেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পরমযত্নে উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং একমনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল।

বোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রেষ্ঠীর এরূপ প্রেম জন্মিয়াছিল যে একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "প্রব্রজ্যা দুঃখের আকর; আমি বন্ধু বচ্ছনখকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইব, নিজের সমস্ত বিভব দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ তাঁহাকে দিব এবং দুই জনে একত্র বাস করিব।" অনন্তর তিনি একদা আহারান্তে বন্ধুর সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত বচ্ছনখ, প্রব্রজ্যা বড়ই

ক্লেশকর; গৃহবাসেই সুখ। আসুন, আমরা এক সঙ্গে থাকিয়া ইচ্ছামত কাম সম্ভোগ করি।" ইহার পর তিনি নিম্নলিখিত গাথাটি বলিলেন :

ধনধান্যে পরিপূর্ণ গৃহখানি হয়
পরম সুখের স্থান, বলিনু নিশ্চয়।
খাদ্যপেয় ভুঞ্জ হেথা যত ইচ্ছা মনে;
নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও বিচিত্র শয়নে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন, তুমি অজ্ঞানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখবিলাষী হইয়াছ এবং সেইজন্য গার্হস্থ্যজীবনের গুণ ও প্রব্রজ্যার দোষ কীর্ত্তন করিতেছ; আমি এখন তোমাকে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বলিতেছি; শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্ত সম্পত্তি রক্ষার তরে,
অর্থ-উপার্জ্জন হেতু মিথ্যা আচরণ করে,
স্বার্থে অন্ধ হয়ে করে অপরের উৎপীড়ন—
গৃহীর স্বভাব এই—দেখি আমি অনুক্ষণ।
এবংবিধ পাপে রত গৃহী যত এই ভবে;
হেন দোষাকর গৃহে কে বল পশিবে তবে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বর্ণন করিয়া উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন রোজ মল্ল ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই বচ্ছনখ তপস্বী।]

---

২৩৬. বক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এজন্ম নহে, পূর্ব্বেও বড় ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে শরীর-পরিগ্রহপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে এক সরোবরে বাস করিতেন। বহু মৎস্য তাঁহার অনুচরভাবে বিচরণ করিত।

একদিন মৎস্যগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য এক বকের বড় ইচ্ছা জন্মিল। সে ঐ সরোবরের নিকটে একস্থানে মস্তক অবনত ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি

করিল, এবং কোন মৎস্য অসাবধানভাবে বিচরণ করিলেই তাহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে মৎস্যগুলির দিকে একটু একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবরের সেই অংশে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যগণ বককে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

না জানি এ দ্বিজ[১] কত পুণ্যবান,
শুভ্র দেহ এর কুমুদ সমান।
আহারান্বেষণে চেষ্টা আর নাই,
পক্ষদ্বয় শান্ত রহিয়াছে তাই।
মধ্যে মধ্যে চক্ষু করে উন্মিলন;
কি ধ্যানেতে যেন হয়েছে মগন!

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেই ভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

জান না ইহার চরিত্রে কেমন,
তাই কর এর প্রশংসা কীর্ত্তন।
বকরূপী দ্বিজ মীনের রক্ষক
হয় নাক কভু; এ শুধু ভক্ষক।
ভক্ষণের তরে, হের পক্ষদ্বয়
নিস্পন্দ করিয়া আছে দুরাশয়।

ইহা শুনিয়া মৎস্যগণ মহাশব্দে জল আলোড়ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে ভীত হইয়া বক পলায়ন করিল।

[**সমবধান :** তখন এই ভণ্ড ছিল সেই বক এবং আমি ছিলাম সেই মৎস্যরাজ।]

---

২৩৭. সাকেত-জাতক

[শাস্তা সাকেত নগরের নিকটে অবস্থিতিকালে তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত ও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে বলা হইয়াছে।][২]

---

[১] । পক্ষী। ইহার আর একটি অর্থ ব্রাহ্মণ। এখানে শেষোক্ত অর্থের দিকেও লক্ষ্য আছে।

[২] । ৬৮-সংখ্যক জাতক।

তথাগত বিহারে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, কিরূপে স্নেহ সঞ্জাত হয়?" এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

কেন, প্রভু, কোন জনে করি দর্শন
হৃদয়ে প্রীতির রস হয় নিঃসরণ?
সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ তাহায়
দেখিলেই চিত্ত স্বতঃ সুপ্রসন্ন হয়?
অন্যত্র ইহার কিন্তু হেরি বিপরীত,
দৃষ্টিমাত্র ঘৃণা হয় মনেতে উদিত!

তখন শাস্তা প্রেমের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

পুত্রকলত্রাদি-ভাবে জন্মান্তরে যার
সঙ্গে থাকি হইয়াছে স্নেহের সঞ্চার,
অথবা এজন্মে হিতকামী যেবা তব,
দেখিলে তাহারে হয় স্নেহের উদ্ভব।
এ দুই কারণে স্নেহজনমে হৃদয়ে,
উৎপলাদি পুষ্প যথা জন্মে জলাশয়ে।

[**সমবধান :** তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলেন সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণী এবং আমি ছিলাম তাঁদের পুত্র।]

----

২৩৮. একপদ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভূস্বামী নাকি শ্রাবস্তী নগরে বাস করিতেন। একদিন ইহার পুত্র ইহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া "অর্থস্য দ্বার[১]" (অর্থাৎ মার্গচতুষ্টয়-প্রাপ্তির উপায় কি) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ভূস্বামী ভাবিলেন, 'এরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধই দিতে পারেন; আমি অজ্ঞ, আমার কি সাধ্য যে ইহার উত্তর দি? অনন্তর তিনি পুত্রকে লইয়া জেতবনে গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার এই পুত্রটি আমার কোলে বসিয়া পরমার্থ-লাভের কি উপায়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার উত্তর জানি না বলিয়া আসিলাম; আপনি দয়া করিয়া ইহার উত্তর দিন।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন,

---

[১]। এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের অর্থস্যদ্বার-জাতক (৮৪) দ্রষ্টব্য।

"দেখ, উপাসক, তোমার পুত্রটি কেবল যে এ জন্মেই পরমার্থান্বেষী তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। এখন জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে কথা ইহার স্মৃতিগোচর হইতেছে না।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করিলেন। একদিন তাঁহার তরুণ বয়স্ক এক পুত্র পিতৃক্রোড়ে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাকে এমন একটি মাত্র পদে এমন একটি অর্থ বলুন, যাহাতে বহু বিষয় বুঝায়।" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠীপুত্র নিম্নলিখিত গাথাটি বলিলেন :

এরূপ একটি পদ বল পিতঃ, দয়া করি,
বহু ভাব প্রতিভাত হয় মনে যারে স্মরি।
অল্পেতে অধিক ব্যক্ত করে হেন বল পদ,
যে পদার্থে লভিবারে পারিব সর্ব্ব সম্পদ।

বোধিসত্ত্ব এই প্রশ্ন উত্তর দিবার সময় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

'দক্ষতা' একটি পদ বহুগুণ-সমন্বিত,
দক্ষতা থাকিলে তব হইবে অশেষ হিত।
দক্ষতার সঙ্গে যদি শীল, ক্ষান্তি যুক্ত হয়,
মিত্রে সুখ, শত্রু দুঃখ পাবে তব নিঃসংশয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়া নিজের অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখা করিলেন; তাহা শুনিয়া পিতাপুত্রে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই পুত্র ছিল সেই পুত্র; এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

---

২৩৯. হরিতমাত-জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল মগধরাজ বিম্বিসারকে কন্যাদান করিবার সময় স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নাকি কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে কোশলকন্যা পতিশোকে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন। অজাতশত্রু মাতার মৃত্যুর পরেও কাশীগ্রাম ভোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া প্রসেনজিৎ সঙ্কল্প করিলেন, 'পিতৃহন্তা ও চৌর অজাতশত্রুকে পৈতৃক গ্রাম ভোগ করিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কখনও মাতুলের, কখনও বা ভাগিনেয়ের জয় হইতে লাগিল। অজাতশত্রু যখন জয়লাভ করিতেন, তখন রথে পতাকা উড়াইয়া মহাড়ম্বরে নগরে ফিরিয়া আসিতেন; কিন্তু যখন পরাজিত হইতেন, তখন নিতান্ত বিষণ্ন হইতেন, এবং কাহাকেও না জানাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, অজাতশত্রু মাতুলকে পরাস্ত করিলে উল্লসিত হন, কিন্তু নিজে পরাস্ত হইলে নিতান্ত বিষণ্ন হইয়া পড়েন।" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া এবং প্রশ্ন দ্বারা তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি জয়লাভ করিলে প্রফুল্ল এবং পরাজিত হইলে বিষণ্ন হইত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নীলমণ্ডুক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকে মাছ ধরিবার জন্য নদী, বিল প্রভৃতিতে 'ঘোনা'[২] পাতিয়া রাখিত। একদা এক খানা ঘোনায় অনেক মাছ ঢুকিয়াছিল। একটা ঢোঁড়া সাপ মাছ খাইতে খাইতে সেই ঘোনার ভিতর গেল। তখন অনেকগুলা মাছ একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে

১। এই নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। পাতার 'হরিতমাতা' দেখা যায়; টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় 'হরিতমণ্ডুকপুত্তা' এররূপ লিখিয়াছেন। ইহাতেও অর্থ বিশদ হইতেছে না। পাঠান্তর—"হরিতমণ্ডুক"। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

২। পালি 'কুমিন'। মাছ ধরিবার জন্য যে সকল খাঁচা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেগুলি আকারভেদে ও প্রদেশভেদে 'ঘোনা' 'রাবাণি', 'বেনে', 'দোহাড়' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়।

তাহার সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইল। সাপ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া মরণভয়ে ঘোনার মুখ দিয়া বাহিরে গেল এবং বেদনায় অভিভূত হইয়া জলের ধারে পড়িয়া রহিল। নীলমণ্ডুকরূপী বোধিসত্ত্ব লাফ দিয়া সেই ঘোনার মুখের উপর গিয়া পড়িলেন। অন্য কাহারও নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিতে না পারিয়া সাপ সেই ভেককেই বলিল, "বন্ধু নীলমণ্ডুক, তোমার বিবেচনায় এই মাছগুলার কাজ ভাল হইয়াছে কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

সাপ আমি, শুধু এরা দংশিল আমায়,
প্রবেশ করিনু যবে ঘোনার ভিতর;
দুর্নীতি এদের, ভাই, কি বলিল, হায়?
বল কি মাছের সাজে হেন ব্যবহার?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মাছগুলা বেশ করিয়াছে। যদি বল, 'কেন?' তাহার কারণ এই—তুমি যখন নিজের কোঠে পাইলে মাছ খাও, তখন মাছগুলিই বা আপনাদের কোঠে পাইয়া তোমাকে খাইবে না কেন? নিজের কোঠে, নিজের অধিকারে, নিজের বিচরণক্ষেত্রে কেহই দুর্ব্বল নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

যতদিন থাকে শক্তি পরস্ব-হরণে
পরস্ব-হরণে রত দেখি কতজনে।
শেষে যদি তাহাদের ঘটে শক্তিক্ষয়,
নব-শক্তিমান কার(ও) ঘটে অভ্যুদয়,
লুণ্ঠকের ধন তবে হয় বিলুণ্ঠিত,—
যে মূল্যে হয়েছে ক্রীত, সে মূল্যে বিক্রীত।[১]

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এদিকে সাপটা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া মাছগুলা শত্রুর শেষ রাখিতে নাই ইহা স্থির করিয়া, ঘোনার মুখ দিয়া বাহির হইল এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়া চলিয়া গেল।[২]

[**সমবধান :** তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই উদকসর্প এবং আমি ছিলাম সেই নীলমণ্ডুক।]

---

[১]। গ্রীক পণ্ডিত সোলন লীডিয়ারাজ ক্রীশাস্‌কে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার অপেক্ষা যে ব্যক্তির অধিক লৌহ আছে, সেই আপনার এই বিপুল ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে পারে।"

[২]। মাছ ঘোনায় পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না। সাপির সম্বন্ধেও সেই কথা। কাজেই এই আখ্যায়িকায় যুক্তাযুক্ত বিচারণায় ত্রুটি দেখা যাইতেছে।

২৪০. মহাপিঙ্গল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত নয়মাসকাল শাস্তার প্রাণনাশার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিল এবং অবশেষে জেতবনের দ্বারকোষ্ঠকের নিকট ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল। ইহাতে সমস্ত জেতবনবাসী ও সমস্ত কোশলরাজ্যবাসী অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "এতদিনে পৃথিবী বুদ্ধ-প্রতিকণ্টক দেবদত্তকে গ্রহণ করিয়াছে; সম্যকসম্বুদ্ধ এখন নিষ্কণ্টক হইলেন।" ক্রমে এই কথা লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; তচ্ছ্রবণে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী, যক্ষ রক্ষোভূতাদি উপদেবতা এবং দেবগণ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, পৃথিবী দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে বুদ্ধ-প্রতিকণ্টক দেবদত্ত ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, দেবদত্তের বিনাশে বহুলোকে কেবল এখনই যে তুষ্ট হইয়াছে ও হাসিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহারা তুষ্ট হইয়াছিল ও হাসিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপিঙ্গল নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতি অধর্ম্মচারী ও অন্যায়পরায়ণ ছিলেন, নিয়ত নিজের ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষু যন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন। তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন, তাহাদের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদ করিতেন ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন। ফলতঃ তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর, পুরুষ ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন; অন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়াও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এই নিমিত্ত কি ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণ, কি তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যা ও অমাত্যগণ, সকলেরই অতি অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। নেত্রপতিত রজঃকণা, অন্নপিণ্ডমধ্যস্থ কর্কর[১] ও পদতলপ্রবিষ্ট কণ্টক যেমন পীড়াদায়ক, রাজা মহাপিঙ্গল ও সেইরূপ সকলেরই

---

[১]। কর্কর বা শর্করা = কাকর বা কঙ্কর। 'কঙ্কর' সংস্কৃত শব্দ নহে। সম্ভবত উচ্চারণ-দোষে প্রথমে 'কর্কর' হইতে 'কাকর' বা 'কর্কর', পরে 'কাকর' হইতে 'কঙ্কর' শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

পীড়াদায়ক হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এই মহাপিঙ্গলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপিঙ্গল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন বারাণসীর সমস্ত অধিবাসী অতিমাত্র তুষ্ট হইল, আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল, এক সহস্র শকটে কাষ্ঠ আনিয়া তাঁহার শব দগ্ধ করিল এবং বহু সহস্র ঘট জল দিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল, এবং নগরে আনন্দভেরী বাজাইয়া, "এতদিনে আমরা ধার্ম্মিক রাজা পাইলাম" এই শুভ সংবাদ প্রচার করিল। তাহারা পতাকা তুলিয়া নগর সাজাইল দ্বারে দ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিল; মণ্ডপের তলে লাজা ও পুষ্প ছড়াইয়া দিল এবং সেখানে বসিয়া পানভোজনে মত্ত হইল। বোধিসত্ত্বও অলঙ্কৃত বেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রতলে মহাপল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া রাজশ্রীসঙ্গম অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, গৃহপতিগণ ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বোধিসত্ত্বের অবিদূরে এক দৌবারিক ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে দৌবারিক, আমার পিতার মৃত্যুতে সকলেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়াছে এবং নানারূপ উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছ! বলত, আমার পিতা কি তোমার প্রিয় ও আনন্দদায়ক ছিলেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাটি বলিয়াছিলেন :

মহাপিঙ্গলের নিষ্ঠুর পীড়নে হয়েছিল জ্বালাতন;
মরণে তাঁহার লভেছে আস্বাদ তাই আজ সর্ব্বজন।
ছিলেন কি সেই অকৃষ্ণনয়ন[১] রাজা তব প্রিয়ঙ্কর?
বল, কি কারণ করিছ ক্রন্দন তুমি দৌবারিক-বর?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৌবারিক উত্তর দিল, "মহাপিঙ্গল মরিয়াছেন বলিয়া আমি যে সেই শোকে কান্দিতেছি তাহা নহে। এতকাল পরে বরং আমার মাথাটা আরামে থাকিবে। পিঙ্গলরাজ প্রাসাদে উঠিবার সময় এবং প্রাসাদ হইতে নামিবার সময় আমার মাথায় আট আটটা কিল দিতেন, সে ত যে সে কিল নয়, যেন কামারের হাতুড়ির ঘা। তিনি পরলোকে গিয়াও আমাকে মনে করিয়া নরকদ্বারে যমের মাথায় সেইরূপ কিল মারিবেন; তাহা হইলে যমদূতেরা বলিয়া উঠিবে, "এ লোকটা ত আমাদিগকে জ্বালাতন করিল"; এবং তাহারা মহাপিঙ্গলকে আবার নরলোকে পাঠাইয়া দিবে। পাছে তিনি ফিরিয়া আসিয়া

---

[১]। টীকাকার বলেন যে এই রাজা বিড়ালাক্ষ ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে অকৃষ্ণনেত্র বলা হইয়াছে এবং এই জন্যই তাহার পিঙ্গল নাম হইয়াছিল।

আমার মাথায় সেইরূপ কিল মারেন সেই ভয়েই আমি কান্দিতেছি।” এই কথা ভালরূপ বুঝাইবার জন্য দৌবারিক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

অকৃষ্ণনয়ন না ছিল কখন সদয় আমার’পর;
ভয় এই মনে, পাছে ইহলোকে ফিরি আসে নরেশ্বর।
পরলোকে তিনি যমেরে নিশ্চয় করিবেন জ্বালাতন
তাই পাছে যম আবার তাঁহারে করে হেথা আনয়ন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “সহস্র শকট কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার শব দগ্ধ করা হইয়াছে; শত শত ঘট জলদ্বারা তাঁহার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে; তাঁহার শ্মাশানভূমির সর্ব্বাংশ খনন করা হইয়াছে; জীবের স্বভাবই এই যে যাহারা পরলোকে যায়, তাহারা গত্যন্তর লাভ করে বলিয়া কখনও পূর্ব্ব শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

শত শত ভার কাষ্ঠের শব যায় হইয়াছে ভস্মীভূত,
শত শত ঘট জলেতে যাহার চিতা-অগ্নি নির্ব্বাপিত;
শ্মাশান যাহার সর্ব্বত্র সুখাত হইয়াছে—তার পর,
সে জন ফিরিয়া আসিবে না কভু; ভয় তুমি পরিহার।”

বোধিসত্ত্বের এই কথায় দৌবারিক তদবধি আশ্বস্ত হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিয়া এবং দানপুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতিলাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই পিঙ্গল এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

---

২৪১. সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া প্রথমে বহু উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী করিতে পারেন নাই। নালাগিরির সম্বন্ধে শাস্তা যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবদত্তের প্রতিপত্তি ও উপহারাদি-প্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, দেবদত্ত প্রথমে উপহারাদি পাইবার ও লোকের সম্মান লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াও শেষে উহা চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেবদত্তের মানসম্ভ্রম ও অর্থাগম যে কেবল এ জন্মেই বিলুপ্ত হইল তাহা নহে, পূর্ব্বেই ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ

করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায়[১] পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীজয়মন্ত্র জানিতেন। পৃথিবী-জয়মন্ত্রটি "আবর্জ্জনমন্ত্র" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।[২]

একদিন বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে এক নিভৃত স্থানে[৩] গমন করিলেন এবং শিলাপৃষ্ঠে আসীন হইয়া উহা আবৃত্তি করিলেন। [এই মন্ত্র নাকি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া অপর কাহাকেও শুনাইতে নাই; সেই জন্যই বোধিসত্ত্ব ঐরূপ স্থানে আবৃত্তি করিতে গিয়াছিলেন।]

বোধিসত্ত্ব যখন উক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন, তখন একটা শৃগাল গর্ত্তে থাকিয়া উহা শুনিতে পাইল এবং কণ্ঠস্থ করিল। [এই শৃগাল নাকি কোন অতীত জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এবং পৃথিবী-জয়মন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল।]

বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পর আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্র দেখিতেছি, আমি সুন্দররূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছি।" তখন শৃগালও গর্ত্তের বাহির হইয়া বলিল, "ঠাকুর এই মন্ত্র তোমা অপেক্ষা আমি আরও ভাল কণ্ঠস্থ করিয়াছি"। ইহা বালিয়াই শৃগাল সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বোধিসত্ত্ব কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, "কে কোথা আছ, এই শৃগালটাকে ধর, নচেৎ এ মহা অনর্থ ঘটাইবে,"। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; শৃগাল পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল।

শৃগাল বনে গিয়া একটা শৃগালীর গাত্রে ঈষৎ দংশন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল, "কি প্রভু, কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

"আমি কে তা জানিস্, কি জানিস না?"

"আমি ত আপনাকে জানি না।"

১। অষ্টাদশ বিদ্যা বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদ চতুষ্টয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ শস্ত্রশাস্ত্র (মতান্তরে স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে এই অখ্যায়িকায় তিন বেদ অর্থাৎ ঋক, সাম ও যজুঃ পৃথক বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

২। ইংরাজী অনুবাদক "পঠবীজয় মন্তো তি আবজ্জন মন্তো বুচ্চতি" এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন, "এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ধ্যানপর হওয়া আবশ্যক।" কিন্তু ইহা ভ্রম। 'আবর্জ্জন' = জয়।

৩। মূলে 'অঙ্গণট্ঠানে আছে। 'অঙ্গন' বলিলে এখানে কোন উন্মুক্ত ও নিভৃত স্থান বুঝিতে হইবে।

তখন শৃগাল পৃথিবী জয়মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বনের হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, মৃগ প্রভৃতি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু নিজের নিকট আনয়ন করিল, তাহাদের রাজা হইয়া "সর্ব্বদংষ্ট্র" নাম গ্রহণ করিল এবং এক শৃগালীকে অগ্রমহিষীর পদ দিল। তদবধি দুইটা হস্তীর পৃষ্ঠে একটা সিংহ চরিত এবং শৃগালরাজ তাহার মহিষীকে সঙ্গে লইয়া সেই সিংহের পৃষ্ঠে উপবেশন করিত। অরণ্যবাসী সমস্ত পশুই তাহার মহাসম্মান করিত।

এইরূপে বহুসম্মান ভোগ করিয়া শৃগালের মনে বড় গর্ব্ব জন্মিল। সে বারাণসী রাজ্য জয় করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত চতুস্পদ জন্তু সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল এবং বারাণসীর অদূরে গিয়া উপস্থিত হইল । তাহার অনুচরগণ দ্বাদশ যোজন স্থান অধিকার করিয়া রহিল। শৃগাল সেনাসন্নিবেশ করিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইল,—"হয় রাজ্য দাও, নয় যুদ্ধ দাও"। বারাণসীবাসীরা এই আকস্মিক ব্যাপারে ভীত ও চকিত হইয়া নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ! সর্ব্বদংষ্ট্র শৃগালের সহিত যুদ্ধ করিবার ভার আমার উপর রহিল। আমা ভিন্ন অন্য কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।" এইরূপে রাজাকে ও নগরবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সর্ব্বদংস্ট্রকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, সে কি উপায়ে এই রাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।" অনন্তর তিনি সিংহদ্বারের অট্টালকে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সর্ব্বদংস্ট্র বল ত তুমি কি উপায়ে এই নগর অধিকার করিবে ভাবিয়াছ?" সর্ব্বদংষ্ট্র উত্তর দিল, 'আমি সিংহদিগকে গর্জ্জন করিতে বলিব; ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইবে; কাজেই আমি অনায়াসে নগর গ্রহণ করিব।"

"বটে, এই উহার অভিসন্ধি!" ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে আদেশ দিলেন, "তোমরা মাষপিষ্ট দ্বারা স্ব স্ব কর্ণবিবর রুদ্ধ কর।" অধিবাসীরা ভেরীনাদ দ্বারা প্রচারিত এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কুকুর, বিড়াল পর্য্যন্ত সমস্ত চতুষ্পদের এবং নিজের নিজের কর্ণচ্ছিদ্রগুলি মাষপিষ্ট দ্বারা এরূপ রুদ্ধ করিল যে, অপরের কোন শব্দই আর তাহাদের শ্রুতি গোচর হইবার, সম্ভাবনা থাকিল না।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার অট্টালকে আহোরণ করিলেন এবং ডাকিলেন, "সর্ব্বদংষ্ট্র!"

"কিহে ঠাকুর, কি বলিবে বল।"

"বল ত কি উপায়ে এই রাজ্য গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছ।"

"বুঝিতে পার নাই? সিংহদিগের দ্বারা গর্জ্জন করাইবে; তাহা শুনিয়া মানুষগুলার মহাত্রাস জন্মিবে; তখন তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিব ও নগর অধিকার করিব।"

"সিংহদিগের দ্বারা ত গর্জ্জন করাইতে পারিবে না। সিংহেরা সুরক্তনখ-সম্পন্ন, কেশরী ও পশুরাজ। তুমি কি ভাবিয়াছ, তাহারা তোমার মত একটা বৃদ্ধ শৃগালাধমের আজ্ঞা পালন করিবে?"

শৃগাল অতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। সে উত্তর দিল, "অন্য সিংহের কথা দূরে থাকুক, আমি যাহার পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা দ্বারাই গর্জ্জন করাইব।"

"করাও দেখি, তোমার কেমন সাধ্য।"

এই কথা শুনিয়া শৃগাল পদাঘাত দ্বারা নিজের বাহন সিংহটাকে গর্জ্জন করিতে সঙ্কেত করিল। সিংহ হস্তীকুম্ভে নিজের মুখ স্থাপন করিয়া তিনবার ঘোর নিনাদ করিল। তাহাতে হস্তী এত ভীত হইল যে সে শৃগালকে নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল এবং পাদপীড়নে তাহার মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। এইরূপে সেখানে এবং তন্মুহুর্ত্তেই সর্ব্বদংষ্ট্রের প্রাণবিয়োগ হইল। হস্তীগুলা সিংহনাদ শুনিয়া মরণভয়ে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইল এবং পরস্পরকে আঘাত করিয়া সকলেই মারা গেল। ফলত কেবল সিংহ ব্যতীত অন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু-মৃগশূকরাদি হইতে শশবিড়াল পর্য্যন্ত সকলেই—সেখানে এইরূপে নিহত হইল। সিংহেরা পলায়ন করিয়া বনে আশ্রয় লইল। দ্বাদশ যোজন ক্ষেত্রে কেবল মাংসরাশি পড়িয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নগরদ্বারসমূহ খোলাইয়া দিলেন এবং ভেরীধ্বনি দ্বারা প্রচার করিলেন,— "এখন সকলে স্ব স্ব কর্ণবিবর হইতে মাষপিষ্ট ফেলিয়া দিউক, এবং যাহারা মাংস খাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা মাংস সংগ্রহ করুক।" এই আদেশ পাইয়া লোকে যত পারিল টাট্‌কা মাংস খাইল এবং অবশিষ্ট মাংস শুকাইয়া বল্লূর[১] প্রস্তুত করিল। শুনা যায় যে এই সময়েই লোকে প্রথম বল্লূর প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

[শাস্তা এরূপে ধর্ম্মোদেশন দিয়া নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা দুইটি বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :

বহু অনুচর পাইতে বাসনা করিল শৃগালাধম;
লভি তাহা তার গর্ব্বে স্ফীত মন, ঘটিল মতির ভ্রম।
বরি রাজপদে পশুগণ তার করিল সম্মান কত;

---

[১]। বল্লূর—শুষ্ক মাংস বা শূকর-মাংস। এখানে 'শুষ্ক মাংস' এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

মদোদ্ধত শিবা	কিন্তু শেষে হ'ল	করিপদাঘাতে হত।
সেইরূপ যেন',	মানব সমাজে	যে জন বাসনা করে,
বহু অনুচরে	বেষ্টিত হইয়া	রব মহা আড়ম্বরে,
লভি অনুচর,	লভি বহু মান,	গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে পরে,
ধরারে করিয়া	শরাসম জ্ঞান	নিজ বুদ্ধিদোষে মরে।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

---

২৪২. শুনক-জাতক

[একটা কুকুর অম্বলকোট্ঠকের নিকটবর্ত্তী আসনশালায় ভাত খাইত। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় কতিপয় পানীয়হারক[১] নাকি এই কুকুরটাকে জন্মাবধি পুষিয়াছিল। ক্রমে আসনশালায় ভাত খাইতে খাইতে সে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। একদিন কোন গ্রামবাসী সেই কুকুর দেখিতে পাইয়া পানীয়হারকদিগকে নগদ এক কাহণ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া তাহাকে ক্রয় করিল এবং চর্ম্মরজ্জু দ্বারা তাহার গলা বাঁধিয়া লইয়া গেল। কুকুরটা তখন কোন বাধা দিল না বা ঘেউ ঘেউ করিল না; গ্রামবাসী তাহাকে যাহা খাইতে দিল, তাহাই খাইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেল। গ্রামবাসী ভাবিল, 'কুকুরটা আমার বশে আসিয়াছে'; কাজেই সে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিল। কিন্তু কুকুর যেমন বন্ধনমুক্ত হইল, অমনি এক ছুটে সেই আসনশালায় ফিরিয়া গেল। ভিক্ষুরা তাহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, কিরূপে সে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। তাঁহারা সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই এই কুকুরটা আসনশালায় ফিরিয়া আসিয়াছে। বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য এ বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে'; যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছে, অমনি ছুটিয়া এখানে আসিয়াছে।" এই সমস্ত শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, এ কুকুরটা কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও বেশ বন্ধনমোক্ষ-কুশল ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

---

[১]। পানীয়হারক—যাহারা জল বহন করিয়া আনে। (তুলং)—তৃণকারক।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক আঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে বারাণসীর একজন অধিবাসীর একটা পোষা কুকুর ছিল; সে প্রতিদিন অন্নপিণ্ড খাইয়া বিলক্ষণ স্থুলাঙ্গ হইয়াছিল।

একদিন এক গ্রামবাসী বারাণসীতে গিয়া ঐ কুকুর দেখিতে পাইল এবং কুকুরস্বামীকে নিজের উত্তরীয় বস্ত্রখানি ও নগদ এক কাহণ দিয়া উহা ক্রয় করিল। অনন্তর সে চর্ম্মযোত্র দ্বারা উহার গলা বান্ধিল এবং যোত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে যাইতে যাইতে যে এক বনের ধারে উপস্থিত হইল, সেখানে একখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুকুরটাকে বান্ধিয়া রাখিল এবং নিজে কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময় বোধিসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে সেই বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুকুরটাকে চর্ম্মযোত্র-বদ্ধ দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

কুকুর তুমি বোকা বড় নইলে এতক্ষণ
চামের বাঁধন খেয়ে, ঘরে করতে পলায়ন।

ইহা শুনিয়া কুকুটা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

বল্লে যাহা বুঝলেম তাহা, আমিও মনে মনে
স্থির করেছি পলাইব কাটিয়া বাঁধনে।
ভাব্ছি কেবল সুযোগ আসি জুটিবে কখন—
লোকজন সব ঘুমে কখন হবে অচেতন।

অনন্তর রাত্রিকালে সকলে যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন কুকুর সেই চর্ম্মরজ্জু উদরস্থ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের পালকের নিকট ফিরিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন এই কুকুর ছিল সেই কুকুর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

---

২৪৩. গুপ্তিল-জাতক[১]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে ভিক্ষুরা একদিন দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, “ভাই দেবদত্ত, সম্যকসম্বুদ্ধ তোমার আচার্য্য, তুমি তাঁহার প্রসাদে পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ;

[১]। পাসি “গুপ্তিল-জাতক।”

চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে শিখিয়াছ; এরূপ আচার্য্যের সহিত শত্রুতাচরণ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।” ইহা শুনিয়া দেবদত্ত উত্তর দিয়াছিল, “সে কি কথা ভাই? আমার আচার্য্যে শ্রমণ গৌতম! কখনই নয়। তোমরা কি বলিতে চাও আমি নিজবলেই পিটকত্রয় আয়ত্ত করি নাই এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে শিখি নাই?” দেবদত্ত এইরূপে নিজের আচার্য্যের প্রত্যাখান করিয়াছিল।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “দেখ ভাই, দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখান করিয়া ও সম্যকসম্বুদ্ধের শত্রু হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইল।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান দ্বারা এবং তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল, তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল।” ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা বলিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গন্ধর্ব্বকুলে[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল গুপ্তিলকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তি পর তিনি গন্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে জম্বুদ্বীপে গান্ধর্ব্বাবিদ্যায় অন্য কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন না। অন্ধ মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষার জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বারাণসীবাসী কতিপয় বণিক্ বাণিজ্যার্থ উজ্জয়িনী নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে উৎসব হইবে শুনিয়া তাঁহার নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিলেন, প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও খাদ্যপানীয় ক্রয় করিয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, “উপযুক্ত বেতন দিয়া একজন গন্ধর্ব্ব আনয়ন কর।”

তৎকালে মূসিল নামক এক ব্যক্তি উজ্জয়নীনগরে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ছিলেন। বণিকেরা তাঁহাকেই আনাইয়া নিজেদের গন্ধর্ব্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। মূসিল বীণাবাদক ছিলেন; তিনি বীণাটিকে উত্তম মূর্চ্ছনায় তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বারাণসীর বণিকেরা পূর্ব্বে কতবার গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাঁদের কানে মূসিলের বীণাবাদন ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল, কে যেন মাদুরের উপর আঁচড় দিতেছে। কাজেই তাঁহারা মূসিলের

---

[১]। গন্ধর্ব্ব = গায়ক ও বাদক (ইংরেজী musician)। গান্ধর্ব্ববিদ্যা = গানবাজানা (music)

বীণাবাদনে তৃপ্তির চিহ্ন দেখাইলেন না। মূসিল দেখিলেন, কেহই তাহার বাদ্যে সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, 'খুব চড়া সুরে বাজাইতেছি বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে।' তখন তিনি তারগুলিকে মধ্যম মূর্চ্ছনায় নামাইয়া মধ্যম সুরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বণিকেরা তাহাতেও সন্তোষের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না—মধ্যস্থের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মূসিল বিবেচনা করিলেন, 'এ মূর্খেরা গান্ধর্ব্ববিদ্যার কিছুই বুঝে না।' তিনি তখন নিজেও যেন নিতান্ত অনবিজ্ঞ, এই ভাণ করিয়া তারগুলি শিথিল করিয়া বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও শ্রোতারা ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তাহা দেখিয়া মূসিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভো বণিকগণ, আমি বীণা বাজাইতেছি; অথচ আপনারা সন্তোষলাভ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি বলুন ত।'

বণিকেরা বলিলেন, "সে কি? আপনি কি বীণা বাজাইতেছেন? আমরা ভাবিয়াছি, আপনি এতক্ষণ বীণার সুর বান্ধিতেছিলেন।"

"আপনারা কি আমার অপেক্ষা কোন ভাল বীণাবাদককে জানেন, না নিজেদের অবজ্ঞাবশতই সন্তোষলাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন?"

"যাহারা পূর্ব্বে বারাণসীতে গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছে তাহাদের কর্ণে আপনার বীণাবাদন ভাল লাগে না। আপনার বাদ্য শুনিয়া মনে হয়, যেন গৃহিণীরা ছেলেমেয়েদের মন ভুলাইবার জন্য গুন গুন করিতেছে।"

"শুনুন, যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া লউন; ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা যখন বারাণসীতে ফিরিবেন, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।"

বারাণসীর বণিকেরা বলিলেন, "উত্তম কথা; তাহাই করা যাইবে।" অনন্তর বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় তাঁহারা মূসিলকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে গুপ্তিলের বাসস্থান দেখাইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

মূসিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গুপ্তিলের সুন্দর বীণাটি একস্থানে বান্ধা রহিয়াছে দেখিয়া উহা খুলিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা অন্ধ ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ভাবিলেন, ইন্দুরে বুঝি বীণার তার খাইতেছে। তাঁহারা ইন্দুর তাড়াইবার জন্য "সু সু" বলিয়া উঠিলেন।

মূসিল তৎক্ষণাৎ বীণাটি রাখিয়া দিয়া গুপ্তিলের মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

মূসিল বলিলেন, "আমি আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য উজ্জয়িনী হইতে আসিতেছি।"

"বেশ করিয়াছ।"

"আচার্য্য কোথায়?"

"বাবা, সে বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু আজই ফিরিবে।"

মূসিল সেখানে বসিয়া রহিলেন। গুপ্তিল ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত শিষ্টালাপ করিলেন। অনন্তর মূসিল নিজের আগমনকারণ বলিলেন। গুপ্তিল অঙ্গ-বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি মূসিলের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, লোকটা অসৎ; কাজেই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। এ বিদ্যা তোমার জন্য নহে।" মূসিল তখন গুপ্তিলের মাতাপিতার পা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া যাচঞা করিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমার শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিন।" ইহাতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা গুপ্তিলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুপ্তিল তাহা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া মূসিলকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর মূসিল একদিন গুপ্তিলের সহিত রাজভবনে গেলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে ইনি কে?" গুপ্তিল বলিলেন "মহারাজ, ইনি আমার অন্তেবাসী ।" রাজভবনে যাইতে যাইতে মূসিল ক্রমে রাজার বিশ্বাসভাজন হইলেন।

এদিকে গুপ্তিল মূসিলের শিক্ষাবিধানে কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না, অন্যান্য আচার্য্যেরা যেমন শিষ্যদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র শিখাইয়া ক্ষান্ত হন, কখনও সমস্ত বিদ্যা দান করেন না,[১] গুপ্তিলের প্রকৃতি সেইরূপ ছিল না। তিনি নিজে যাহা জানিতেন, মূসিলকে তাহার সমস্তই শিখাইয়া বলিলেন, "বাবা, এখন তোমার বিদ্যা সমাপ্ত হইল।"

মূসিল ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি; জম্বুদ্বীপের মধ্যে বারাণসী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী; আমার আচার্য্য এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব এখন আমাকে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতে হইবে।' এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "প্রভু, আমার ইচ্ছা যে বারাণসীরাজের সেবা করি।"

গুপ্তিল বলিলেন, "বেশ বাবা; আমি রাজাকে তোমার প্রার্থনা জানাইব।" অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার অন্তেবাসী আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করে; ইহাকে কি বেতন দিবেন আজ্ঞাকরুন।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা পান, সে তাহার অর্দ্ধ পাইবে।" গুপ্তিল মূসিলকে এই কথা জানাইলে, তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, যদি আপনার সমান বেতন পাই তাহা হইলেই কাজ করিব, নচেৎ করিব না।"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন করিবে না?"

"আপনি যে বিদ্যা জানেন, আমিও কি তাহার সমস্ত জানি না?"

---

[১]। আচার্য্যদিগের এইরূপ প্রবৃত্তিকে 'আচরিয়মুট্ঠি' (আচার্য্যমুষ্টি) বলা হইয়াছে।

"তাহা জান বৈ কি।"

"যদি তাহা হয়, তবে আমি অর্দ্ধ বেতন পাইব কেন?"

গুপ্তিল রাজাকে মূসিলের এই উত্তর জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "সে যদি আপনার সমান বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে সমান বেতনই পাইবে।"

গুপ্তিল মূসিলকে রাজার আদেশ জানাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ কথা; আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।" রাজাও তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, আপনারা কোন দিন স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন স্থির করুন।" গুপ্তিল উত্তর দিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

অতঃপর রাজা মূসিলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাহিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" মূসিল উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ, একথা মিথ্যা নহে।" আচার্য্যের সহিত বিবাদ করিতে নাই, অতএব তুমি এরূপ কাজ করিও না", রাজা এইরূপে বারণ করিলেও মূসিল বলিলেন, "মহারাজ ক্ষান্ত হউন, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমার ও আচার্য্যের পরীক্ষা হউক; দেখিব, আমাদের মধ্যে কে গান্ধর্ব্ববিদ্যায় অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে"।

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই দেখ।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করাইলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আচার্য্য গুপ্তিল ও তাহার অন্তেবাসী মূসিল রাজদ্বারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন; নগরবাসীরা যেন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কাহার কত বিদ্যা, দর্শন করে।"

এদিকে গুপ্তিল চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই মূসিল তরুণবয়স্ক ও নববীর্য্যসম্পন্ন, কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও হীনবল। বৃদ্ধের কার্য ফলদায়ী হয় কিনা সন্দেহ। আমার অন্তেবাসী পরাজিত হইলেও আমার কোন বিশিষ্ট গৌরব লাভ হইবে না; কিন্তু আমি যদি তাঁহার নিকট পরাজিত হই, তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা। তাহা অপেক্ষা বরং বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করাই ভাল।" এইরূপে ভাবিয়া তিনি বনে গেলেন, কিন্তু মরণভয়ে গৃহে ফিরিলেন। এইরূপে গুপ্তিল মরণভয়ে বনে এবং লজ্জাভয়ে গৃহে যাতায়াত করিয়া ছয় দিন কাটাইলেন। তাঁহার যাতায়াতে ঘাস মরিয়া গেল ও পায়ের চাপে বনভূমিতে একটা পথ প্রস্তুত হইল।

ইহাতে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ চিন্তা করিয়া জানিলেন, গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব তাঁহার অন্তেবাসীর ক্রূরতায় অরণ্যে মহাদুঃখ ভোগ করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমাকে গুপ্তিলের সাহায্য করিতে হইবে'। অনন্তর তিনি মহাবেগে গমন করিয়া গুপ্তিলের পুরোভাগে আর্বিভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি নিমিত্ত 'অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?'"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি শক্র।"

"দেবরাজ, আমি অন্তেবাসীর নিকট পাছে পরাজিত হই এই ভয়ে বনে প্রবেশ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া গুপ্তিল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিলেন :

সপ্ততন্ত্রী সুমধুরা মোহিণী বীণার
বাদন শিখিল অন্তেবাসিক আমার।
রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে;
রক্ষা কর, হে কৌশিক[১] এই বিপত্তিতে।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "কোন ভয় নাই; আমিই আপনার পরিত্রাতা, আমিই আপনার শরণ হইব।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি পাঠ করিলেন :

তারিব তোমার, সৌম্য, নাহি কোন ভয়;
আচার্য্য গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়।
আচার্য্যেরে পরাজিতে শিষ্যে না পারিবে;
বিজয়ী আচার্য্য তার গর্ব্ব বিনাশিবে।

"আপনি বীণা বাজাইবার সময় একটা তার ছিঁড়িয়া ছয়টা বাজাইবেন। ইহাতেও আপনার বীণার স্বর অক্ষুণ্ন রহিবে। মূসিলও আপনার দেখাদেখি একটা তার ছিঁড়িবে; কিন্তু তাহাতে তাহার বীণার স্বর বিকৃত হইবে। তাহা হইলে তখন মূসিলের পরাজয় ঘটিবে। তাহাকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনি ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এমন কি সপ্তম তার পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া শেষে কেবল দণ্ডটি বাজাইবেন; ছিন্ন তারগুলির প্রান্ত হইতেই স্বর নিঃসৃত হইয়া দ্বাদশযোজন-বিস্তীর্ণ সমগ্র বারাণসীনগরী পরিপূর্ণ করিবে।" অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে তিনটা পাসার গুলি দিয়া আবার বলিলেন, "যখন আপনার বীণাশব্দে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইবে, তখন আপনি ইহার একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে তিনি শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া আপনার পুরোভাগে নৃত্য আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা যখন নৃত্য করিতে থাকিবেন, তখন আপনি দ্বিতীয় গুটিকাটি পূর্ব্ববৎ ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে আরও তিনশত অপ্সরা আসিয়া আপনার বীণার সম্মুখে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অতঃপর তৃতীয়টাও নিক্ষেপ করিলে দেখিবেন, আরও তিনশত অপ্সরা রঙ্গমণ্ডলে নৃত্য করিতেছেন। আমিও তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত হইব। যান, আপনার কোন ভয়

---

[১]। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শক্রের নামান্তর।

নাই।”

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে গুপ্তিল গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন রাজদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে রাজার আসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে পল্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। সহস্র অলঙ্কৃত রমণী, অমাত্য ব্রাহ্মণ এবং পৌরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ফলত সেখানে সমস্ত নগরবাসীই উপস্থিত হইল; ইহাদের জন্য রাজাঙ্গণে চক্রের পর চক্রাকারে, মঞ্চের উপর মঞ্চাকারে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। গুপ্তিল স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া নানাবিধ সুরস খাদ্যগ্রহণপূর্ব্বক বীণাহস্তে সেখানে গিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। শক্রও অদৃশ্যমানবশরীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেবল গুপ্তিলই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে মূসিলও গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল।

প্রথমে দুইজনেই একরূপ বাজাইলেন; সেই জনসঙ্ঘ উভয়েরই বাদ্য পরিতুষ্ট হইল এবং পুনঃ পুনঃ বাহবা দিতে লাগিল। অতঃপর আকাশস্থ শক্র, কেবল গুপ্তিল শুনিতে পারেন এইরূপ স্বরে বলিলেন, “একটা তার ছিঁড়িয়া ফেলুন।” তখন বোধিসত্ত্ব ভ্রমর তন্ত্রটি[১] ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছিন্ন হইলেও ইহার প্রান্ত হইতে দিব্য বাদ্যের ন্যায় মধুর স্বর নিঃসৃত হইতে লাগিল। মূসিলও ইহা দেখিয়া একটি তার ছিঁড়িলেন, কিন্তু উহা হইতে কোন স্বরই বাহির হইল না। অতঃপর আচার্য্য ক্রমে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত সমস্ত তার ছিঁড়িয়া শুদ্ধ দণ্ডটি বাজাইতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার বীণার স্বর সমস্ত নগরে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া সেই সহস্র সহস্র লোকে চেলক্ষেপ[২] করিতে ও বাহবা দিতে লাগিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিলেন; অমনি তিন শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুটিকা ক্ষেপণ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত অপ্সরা অবতরণপূর্ব্বক, শক্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সমবেত জনসঙ্ঘের দিকে ঈঙ্গিত করিলে তাহারা দাঁড়াইয়া মূসিলকে তর্জ্জন করিতে লাগিল, “তুমি নিজের ওজন বুঝনা; আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে বড় ভুল হইয়াছে।” অনন্তর তাহারা ইষ্টক, প্রস্তর, লগুড়,

---

[১]। বীণার যে সাতটা তার থাকে তাহার প্রথমটির নাম ভ্রমরতন্ত্র। বোধ হয় ইহা হইতে ভ্রমরের রবের ন্যায় গুণ গুণ নিঃসৃত হয় বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

[২]। প্রশংসাদি দ্যোতনার্থ উত্তরীয়াদি ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিধূনন। ইংরাজীদিগের waving handkerchiefs.

যে যাহা পাইল তাহার আঘাতে হতভাগ্য মূসিলের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং তাহাতে নিহত করিয়া পা ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা আবর্জ্জনা স্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া, মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, গুপ্তিলের উপর সেইরূপ ধনবর্ষণ করিলেন; নাগরিকেরাও তাহাই করিল। শক্রও বোধিসত্ত্বকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমি তোমার জন্য সহস্র আজানেয় অশ্বযুক্ত রথ দিয়া মাতলিকে পাঠাইতেছি। তুমি সেই সহস্র তুরগযুক্ত বৈজয়ন্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে যাইবে।" অনন্তর শক্র চলিয়া গেলেন।

শক্র স্বর্গে গিয়া পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে[১] আসীন হইলে দেবকন্যারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কোথা গিয়াছিলেন?" শক্র যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন এবং গুপ্তিলের গুণ ও শীল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন, "আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে আচার্য্যকে দর্শন করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন।"

তখন শক্র মাতলিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, দিব্যাঙ্গনারা গুপ্তিল গন্ধর্ব্বকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তুমি যাও, তাঁহাকে বৈজয়ন্ত রথে আরোহণ করাইয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং গুপ্তিলকে লইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। শক্র মিষ্টবাক্য গুপ্তিলের অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আচার্য্য, দেবকন্যারা আপনার বীণাবাদন শুনিতে চান।"

গুপ্তিল বলিলেন, "মহারাজ, আমরা গন্ধর্ব্ব; সঙ্গীতবিদ্যাই আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। পারিশ্রমিক পাইলে নিশ্চয় বাজাইব।" "আপনি বাজাতে আরম্ভ করুন। আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

"আমি অন্য কোন পুরস্কার চাই না। এই দেবকন্যারা যে যে কল্যাণকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আমার নিকট সেই সমস্ত বলুন; তাহা হইলেই আমি বাজাইব।"

ইহা শুনিয়া দেবকন্যাগণ বলিলেন, "আপনি অগ্রে বাজান; তাহার পর আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে স্ব স্ব কল্যাণ কর্ম্মের কথা জানাইব।"

গুপ্তিল দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সপ্তাহকাল বীণাবাদন করিয়াছিলেন; তাঁহার বাদ্য দিব্য বাদ্যকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সপ্তম দিবসে তিনি এক একটি করিয়া প্রথম হইতে সমস্ত দেবকন্যাকে তাঁহাদের কল্যাণকার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন কশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক ভিক্ষুকে উত্তম বস্ত্র

---

[১]। পাণ্ডুকম্বল-শিলা—মণিবিশেষ। বৌদ্ধমতে শক্রের আসন এই মণিতে নির্ম্মিত।

দান করিয়াছিলেন বলিয়া জম্মান্তরে শক্রের পরিচারিকারূপে দেবকন্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক সহস্র অপ্সরা তাঁহার সহচরী ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূর্ব্বজন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছেন, যে তাহার বলে এখানে আসিয়া জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব যে যে প্রশ্ন করিলেন এবং দেবকন্যা যে যে উত্তর দিলেন, সে সমস্ত বিমানবস্তুতে[১] বর্ণিত আছে। [তাহা হইতে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :]

"শ্বেতাঙ্গী দেবতে, তুমি, রূপের ছটায়
উজলিছ দশ দিক, উজলে যেমন
শুকতারা[২] মনোহরা প্রভাত সময়।
এ কান্তি, এ অভ্যুদয়, বল শুভাননে,
এ স্বর্গবাসের সুখ, ভূঞ্জি যাহা মন
সুমধুর শান্তিরসে হয় নিমগন,
কি কর্ম্মের ফলে তুমি লভিলা এ সব?
অপায় বিভূতি তব হেরি দেবলোকে!
জিজ্ঞাসি তোমায়, দেবি, নরজন্মে তুমি
কি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এ পুণ্য অর্জ্জিলা,
লভিলা এ দিব্যরূপ, অগ্নিশিখাসম,
যাহার প্রভায় উদ্ভাসিত দিক দশ?"
"সেই ধন্য নারীকুলে, নরনারী মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি গণি তারে, করে যেই দান
উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্য দীনে, সাধুজনে।
দানে তুষি যাচকেরে যায় সেই চলি
দিব্য মনোহর ধামে দেহ অবসানে।
কহিনু, আচার্য্য, আমি কি পুণ্যের ফলে
পেয়েছি বিমান এই, লভিয়াছি দেখ,
সুচারু অপ্সরা-দেহ, সহস্র অপ্সরা
আমার সেবায় রত! পুণ্যফল এই।

---

[১]। সূত্রপিটকের অন্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের অংশে।

[২]। "ঔষধি তারা'—শুক্লরস্মিবিশিষ্ট তারা, শুকতারা। হঠাৎ মনে হয় যে ঔষধিতারা শব্দের অর্থ চন্দ্র,; কিন্তু এখানে সে অর্থ নহে। সুধাভোজন জাতকেও (৫৩৫) এই শব্দটির শুকতারা অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়।

এ সৌন্দর্য্য, এ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্গসুখ,
উক্ত পুণ্যবল আমি ভঞ্জি এই ক্ষণে।
এ উজ্জ্বল রূপ মোর, এ দেহের আভা,
উদ্ভাসিত দশদিক ছটায় যাহার,
সব সেই পুণ্য ফলে লভিয়াছি আমি।”

অপর এক দেবী পিণ্ডচারিক ভিক্ষুর পূজার্থ পুষ্পদান করিয়াছেন; কেহ বা, চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দাও, এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উহা দিয়াছিলেন; কেহ মধুর ফল, কেহ উত্তম রস, কেহ বা কাশ্যপ বুদ্ধের চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দান করিয়াছেন। কেহ, ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা পথে যাইতে যাইতে বা গৃহস্থালয়ে যে ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেহ জলে দাঁড়াইয়া, নৌকাস্থিত কোন ভিক্ষুর ভোজন শেষ হইলে, তাঁহার পানের জন্য জল দিয়াছিলেন, কেহ গৃহস্থাশ্রমে সতত অক্রুদ্ধচিত্তে শ্বশুরশ্বাশুড়ীর সেবাপরায়ণা ছিলেন, কোন শীলবতী নিজের লব্ধ অংশও ভাগ করিয়া অন্যকে দিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আহার করিতেন; কোন রমণী পরগৃহে দাসী ছিলেন; যাহা পাইতেন, বিনা ক্রোধে ও বিনা গর্ব্বে অপরকে তাহার অংশ দিতেন এবং সেই পুণ্যবলে এখন দেবরাজের পরিচারিকা হইয়াছেন। ফলতঃ গুপ্তিল বিমানবস্তুতে[১] যে সাইত্রিশ জন দেবকন্যার উল্লেখ আছে, তাঁহারা কি কি কর্ম্ম করিয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছেন, বোধিসত্ত্ব প্রত্যেককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারাও গাথাদ্বারা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া গুপ্তিল বলিলেন, “অহো! আজ আমার লাভ, পরম লাভ হইল! আমি এখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে অতি অল্প মাত্র সৎকর্ম্ম দ্বারা ও দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন হইতে দানাদি কুশলকর্ম্মে রত হইব।” এই বলিয়া তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদান পাঠ করিলেন :

শুভক্ষণে করিয়াছি হেথা আগমন,
সুপ্রভাত আজ মোর; কোন মহাত্মায়
মুখ দেখি শয্যাত্যাগ করিয়াছি আজ?
চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম দেবকন্যাগণে,
সমুজ্জ্বল দশদিক রূপেতে যাঁদের।
শুনিলাম ইহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী।
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, অদ্যাবধি আমি

[১]। বিমানবস্তুর একটি আখ্যায়িকা।

হইব কুশলকর্ম্মে রত অনুক্ষণ,
দান, দম, সংযমেতে যাপিব জীবন।
তা হ'লে আমিও শেষে ত্যাজি মর্ত্ত্য দেহ
পশিব সে দেশে, যথা দুঃখ নাহি পশে।

সপ্তাহকাল অতীত হইলে দেবরাজ সারথি মাতলিকে আজ্ঞা দিয়া গুপ্তিলকে রথারূঢ় করাইয়া বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্তিল বারাণসীতে ফিরিয়া, দেবলোকে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকে তাহা প্রচার করিলেন। তদবধি লোকে উৎসাহসহকারে পুণ্যানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই মূসিল, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব।]

----

২৪৪. বীতেচ্ছ-জাতক[1]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন পলায়িত পরিব্রাজককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই পরিব্রাজক নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি তাঁহার সহিত বিচারক্ষম কোন পণ্ডিত দেখিতে পান নাই। অনন্তর তিনি শ্রাবস্তীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আমার সহিত বিচার করিতে সমর্থ?" লোকে উত্তর দিল, "সম্যকসম্বুদ্ধ।" তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন পরিবৃত হইয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান তখন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চারি শ্রেণীর শিষ্যদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন। পরিব্রাজক উপস্থিত হইয়াই, তাঁহাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান উহার উত্তর দিয়া তাঁহাকেও একটি প্রশ্ন করিলেন। পরিব্রাজক উহার উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার একটিমাত্র পদপ্রয়োগে এই পরিব্রাজকের পরাজয় ঘটিল!" শাস্তা বলিলেন, "আমি এখনই যে ইহাকে একটিমাত্র পদে উচ্চারণ করিয়া পরাস্ত করিলাম, তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপে পরাস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন :]

*   *   *

---

[1]। বীতেচ্ছ—বিগতেচ্ছ, যেমন বুদ্ধাদি—কেননা তাঁহারা তৃষ্ণা দমন করিয়াছিলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহুকাল হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কোন গণ্ডগ্রামের নিকটে গঙ্গার একটা বাঁকের মাতায়, পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কোন পরিব্রাজক সমস্ত জম্বুদ্বীপে নিজের সহিত বিচারক্ষম কোন লোক না পাইয়া সেই গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত বিচার করিতে পারে, এখানে এমন কোন লোক আছে কি?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আছেন বৈ কি?" এবং তাহার নিকট বোধিসত্ত্বের ক্ষমতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন পরিবৃত হইয়া, বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গেলেন এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বনগন্ধযুক্ত গঙ্গাজল পান করিবেন কি?" পরিব্রাজক তাঁহাকে বাগ্‌জালে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "গঙ্গা কি? গঙ্গ কি বালুকা, না জল?" গঙ্গা বলিলে কি এপার বুঝায়, না ওপার বুঝায়?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যদি বালুকা, জল, এপার ও ওপার বাদ দেন, তবে আপনি গঙ্গা পাইবেন কোথা?" এই প্রশ্নে পরিব্রাজক নিরুত্তর হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি পলায়ন করিলে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনস্থান-সমাসীন ব্যক্তিদিগকে এই গাথাদ্বয় বলিলেন :

দেখে যাহা, পেতে তাহা ইচ্ছা নাহি হয়।
দেখিতে না পায় যাহা, পেতে ইচ্ছা, তায়।[১]
ঈপ্সিত লাভের তরে ভ্রমি চিরদিন
কভু না লভিবে তাহা এই মতিহীন।
লভে যাহা, তুষ্ট তাহে নহে এর মন;
প্রার্থী যার, লভি তায় করয়ে হেলন।
এরূপে ইচ্ছার কভু না হয় পূরণ;[২]
বীতেচ্ছের গুণ তাই করি সঙ্কীর্ত্তন।

[**সমবধান :** তখন এই পরিব্রাজক ছিল সেই পরিব্রাজক এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

[১]। গঙ্গায় জল দেখিতেছে, অথচ জলাদি বর্জ্জিত গঙ্গা চায়; সেইরূপ রূপাদিবিনিযুক্ত আত্মা খুঁজিয়া বেড়ায়।

[২]। কেননা ইহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, তৃষ্ণারও দমন করিতে পারে না—একটা পাইলে তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্য একটার দিকে ধাবিত হয়।

২৪৫. মূলপর্য্যায়-জাতক

[শাস্তা যখন উক্‌কট্‌ঠার নিকটবর্ত্তী সুভগবনে[১] অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মূলপর্য্যায়সূত্রের[২] প্রসঙ্গে এই কথা বলিতেছিলেন।

শুনা যায় তৎকালে ত্রিবেধ বিশারদ পঞ্চশত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রিপিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা মদোন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সম্যকসম্বুদ্ধ পিটক তিনখানি জানেন; আমরাও তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য কি?" তাঁহারা অতঃপর বুদ্ধোপাসনা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেরাই শিষ্যের দল গড়িয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন এই সকল ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় তিনি অষ্টভূমিদ্বারা[৩] সুসজ্জিত করিয়া মূলপর্য্যায়সূত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা উহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি যে কুত্রাপি আমাদের মত পণ্ডিত নাই; এখন দেখিতেছে আমরা কিছুই জানিনা। ফলতঃ কেহই বুদ্ধের সদৃশ পণ্ডিত নহে। অহো! বুদ্ধের কি অপার গুণ!" এইরূপে উদ্ধৃতদন্ত সর্পের ন্যায় হৃতগর্ব্ব হইয়া তাঁহারা তদবধি শান্তশিষ্টভাবে চলিতে লাগিলেন।

শাস্তা উক্কট্‌ঠায় যথাভিরুচি বাস করিয়া বৈশালীতে গমন করিলেন এবং সেখানে গৌতম চৈত্যে অবস্থিতি করিয়া গৌতমসূত্র[৪] বলিলেন। তচ্ছ্রবণে ভুবনসহস্র কম্পিত হইল এবং উক্ত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

উক্কট্‌ঠায় অবস্থিতিকালে শাস্তা যখন মূলপর্য্যায়সূত্রকথন শেষ করিয়াছিলেন,

---

[১]। উক্‌কট্‌ঠা কোয়ায় ছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। প্রবাদ আছে যে লোকে উল্কা (মশাল) জ্বালিয়া এক রাত্রিতে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উক্কট্‌ঠা হয়। "উক্কট্‌ঠাং নিস্‌সায় সুভগবনে" এইরূপ আছে। 'নিস্‌সায়' শব্দটির অর্থ মোটামুটি 'নিকট' এইরূপ ধরিলেও ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। ভিক্ষুরা নগরে বাস করিতেন না; কিন্তু নগর বা জনপদ হইতে বহুদূরেও থাকিতে পারিতেন না, কারণ তাহা করিলে ভিক্ষাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? এই জন্য তাঁহারা নগর বা জনপদের অনতিদূরে কোন নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করিতেন। অতএব নগর বা জনপদ তাঁহাদের আশ্রয়স্থানীয় ছিল। নিস্‌সায় শব্দটিতে এই আশ্রয়ের ভাব নিহিত আছে।

[২]। মূলপর্য্যায়সুত্র—মধ্যমনিকায়ের প্রথম সূত্রে। ত্রিপিটকের এই সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা দূরূহ বলিয়া গণ্য।

[৩]। ভূমি অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানের স্তর। 'অষ্ট ভূমি' বলিলে কামাবচর ভূমি, রূপাবচরভূমি, অরূপাবচরভূমি এবং প্রথম ধ্যানভূমি ইত্যাদি পঞ্চভূমি এই আটটি বুঝায়। শাস্তা অগ্রে এই সকল ভূমি ব্যাখ্যা করিয়া পরে সূত্র ব্যাখা করিয়াছিলেন, এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

[৪]। গৌতমসূত্র—অঙ্গুত্তরনিকায়, ভরণ্ডু বগ্‌গ, তৃতীয় সুত্ত।

তখন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন : "দেখ ভাই, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এই ব্রাহ্মণ প্রব্রাজকেরা এতদিন মদোন্মত্ত হইয়াছিল; কিন্তু মূলপর্য্যায়সূত্র শুনিয়া এখন কেমন বিনীত হইয়াছে!" ভিক্ষুরা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পুরাকালেও এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কারে উচ্চশির হইয়া বিচরণ করিত এবং আমি তাহাদের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর পর তিনি বেদত্রয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য বলিয়া পরিণত হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বেদমন্ত্র শিক্ষা করিত। এই পঞ্চশত শিষ্যও সাতিশয় মনোযোগের সহিত বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহাদের মনে গর্ব্ব জন্মিল; তাহারা ভাবিতে লাগিল, 'আচার্য্য যাহা জানেন, আমারও তাহা জানি, বিদ্যাসম্বন্ধে আচার্য্যের সহিত আমাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।' এই গর্ব্বভরে তাহারা আচার্য্যের নিকট যাওয়া বন্ধ করিল, গুরুগৃহে শিষ্যদিগের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সমস্ত অবহেলা করিতে লাগিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব বদরিবৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই দুর্ব্বিনীত শিষ্যগণ তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে[১] ঐ বৃক্ষে নখাঘাত করিয়া বলিল, "এ গাছটা নিঃসার।"[২] বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শিষ্যগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উপহাস করিতেছে। তিনি বলিলেন, "শিষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে একটি প্রশ্ন করিব।' ইহাতে তাহারা অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিল, "করুন, আমরা উত্তর দিতেছি।" আচার্য্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি দ্বারা প্রশ্ন করিলেন :

---

[১]। মূলে 'তং বঞ্চেতুকামা' আছে। কিন্তু এখানে 'বঞ্চনা' বা 'প্রতারণা' অর্থ সুসঙ্গত নহে।

[২]। বদরি বৃক্ষের না হউক, ফলের অসারতার প্রতি কটাক্ষপাত সাহিত্যে আছে :—

নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেহপি হি সজ্জনাঃ।

অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ॥ (হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৯৫ শ্লোক)।

বদরি ফল বাহিরে সুন্দর হইলেও ভিতরে তত সারবান নহে। পক্ষান্তরে নারিকেলের ইহার বিপরীতভাব। বাহ্য সৌন্দর্য্যের ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাকাল ফল।

কালের কুক্ষিতে লয় সকলেই পায়,
সর্ব্বভূতে খায় কাল, নিজেকেও খায়।[১]
ভাবিয়া বলত দেখি, প্রিয় শিষ্যগণ,
কে পারে এ হেন কালে করিতে ভক্ষণ।

প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্যদিগের কেহই উত্তর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মনে করিও না যে এই প্রশ্নের উত্তর বেদত্রয়ে দেখিতে পাইবে। তোমরা ভাব যে আমি যাহা জানি, তোমরাও তাহা জান। এই গর্ব্বে তোমরাই বদরিবৃক্ষের দশাপন্ন হইয়াছ।[২] তোমরা স্বপ্নেও ভাব না যে তোমাদের অজ্ঞাত বহুবিষয় আমার জানা আছে। তোমরা এখন যাও; আমি সাত দিন সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখ, প্রশ্নের সমাধান করিতে পার কি না।" এই আদেশ পাইয়া শিষ্যগণ বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল, কিন্তু সপ্তাহকাল ভাবিয়াও প্রশ্নটির আগাগোড়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সপ্তম দিনে তাহারা পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভদ্রমুখগণ![৩] তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "না মহাশয়, আমরা কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

গ্রীবায় আবদ্ধ বৃহৎ, লোমশ
বহু নরশির দেখিবারে পাই;
কিন্তু এই ঘোর সংশয় আমার,
কর্ণদ্বয়[৪] বুঝি অনেকের(ই) নাই।

"তোমরা অতি অপদার্থ; তোমাদের কর্ণচ্ছিদ্রমাত্র আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নাই।" অনন্তর তিনি নিজেই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন। শিষ্যগণ তাহা শুনিলে এবং

---

[১]। কাল বা মহাকাল স্রষ্টা ও সর্ব্বসংহারক। গ্রীক পুরাণেও Kronos নিজের সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে।

[২]। কাল বা মহাকাল স্রষ্টা ও সর্ব্বসংহারক। গ্রীক, পুরাণেও Kronos নিজের সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে।

[৩]। যাহার মুখ দেখিলে সুপ্রভাত হইল মনে করা যায়। এই পদটি সাধারণত সম্বোধনে, কখনও বা মধ্যম পুরুষে কর্ত্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইত। দিব্যাবদানে ইহা নিম্নকক্ষ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনের সময় প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে নাটকে রাজাকে সম্বোধন করিবার সময় ইহা প্রয়োগ করা হয়।

[৪]। উপদেশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা।

"অহো, আচার্য্যের[১] কি অদ্ভুত ক্ষমতা"! ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিল। তদবধি তাহাদের দর্পচূর্ণ হইল এবং তাহারা যথারীতি আচার্য্যের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল।

[**সমবধান :** তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই পঞ্চশত শিষ্য এবং আমি ছিলাম তাহাদের আচার্য্য।

---

২৪৬. তেলোবাদ-জাতক[২]

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কুটাগারশালায় অবস্থিতিকালে সিংহসেনাপতিকে[৩] উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি ভগবানের শরণ লইয়া পরদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মাংস-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। নির্গ্রন্থেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল এবং তথাগতের অনিষ্ট কামনায়, "শ্রমণ গৌতম জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে লব্ধ মাংস ভক্ষণ করেন" এই গ্লানি রটাইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র[৪] নিজের দলবল লইয়া শাস্তার গ্লানির রটাইয়া বেড়াইতেছেন-তিনি বলিতেছেন, শ্রমণ গৌতম জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র যে কেবল এ জন্মেই, আমি নিজের উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস খাইয়াছি বলিয়া আমার গ্লানি করিতেছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ

১। এখানে আচার্য্য শব্দটি বহুবচনান্ত আছে—বোধ হয় গৌরবে।

২। এই জাতকের নাম তেলোবাদ (তৈলাববাদ) কেন হইল বুঝা যায় না। উপসংহারে টিকাকার ইহাকে বালাববাদ জাতক বলিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত। (বাল = মূর্খ)।

৩। সিংহসেনাপতি—ইনি বৈশালী রাজ্যের একজন সেনানী; ইনি পূর্ব্বে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্রের শিষ্য ছিলেন পরে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হন। যুদ্ধ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সহিত ইহার যে কথোপকথন হয়, বর্ত্তমান যুগে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে।

৪। মূলে 'নিগণ্ঠ নাথপুত্ত' আছে; কিন্তু পালিসাহিত্যে সচরাচর 'নাটপুত্ত' দেখা যায়। দিব্যাবদনে ছয়জন তীর্থিকেরর সংস্কৃত নাম এইরূপ আছে : পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশালীপুত্র, সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র, অজিত কেশকম্বল, ককুদ কাত্যায়ন এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র। নির্গ্রন্থ বলিলে দিগম্বর বুঝায় জৈন বুঝায়। জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। অতএব বৌদ্ধসাহিত্যের নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং মহাবীর একই ব্যক্তি।

করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা তিনি লবণ ও অম্লের নিমিত্ত হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজের গৃহে লইয়া গেল, একখানা আসন দেখাইয়া তাহাতে বসাইল, ভোজনের জন্য মৎস্য ও মাংস পরিবেষণ করিল, এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে একপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল, “আপনার উদ্দেশ্যেই প্রাণীবধ করিয়া এই মাংস সংগ্রহ করা হইয়াছিল; অতএব এজন্য যে পাপ হইয়াছে তাহা আপনার, আমার নহে।” অনন্তর গৃহস্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

মারি, কাটি, বধি প্রাণী দুরাচারণগণ
মাংস দেয় অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
যে মারে সেই কি শুধু পাপভাক্ হয়?
যে খায় তারেও পাপ পরশে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

দারাপুত্র বধি মাংস দুরাচারগণ
দিতে পারে অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
যদি সে অতিথি নিজে প্রজ্ঞাবান[১] হয়;
পাপ তারে পরশিতে পারে না নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গৃস্থকে ধর্ম্মকথা বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই সম্পন্ন গৃহস্থ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের সংস্কারোদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে ভিক্ষুদিগের মাংসাহার পরিহার অন্যতম। বুদ্ধদেব কিন্তু দেবদত্তের অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এইটিও গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, “ভিক্ষুরা ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্য আহার করিবেন- গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবেন। তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কেহ মাংস

[১]। অর্থাৎ ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গৃহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনার জন্য সময়বিশেষে এমন দেশে যাইতে পারেন, যেখানে মাংস আহার না করিলে দেহরক্ষাই অসাধ্য হয়। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে সে স্বতন্ত্র কথা।”

---

২৪৭. পাদাঞ্জলি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে উপলক্ষ্য করিয়া এইকথা বলিয়াছিলেন।

একদিন মহাশ্রাবকদ্বয়[১] কোন একটা প্রশ্নের বিচার করিতেছিলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বিচার শুনিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থবির লালুদায়ীও[২] সেই সভায় বসিয়াছিলেন; তিনি কিন্তু ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, ‘আমি যাহা জানি, তাহার তুলনায় ইঁহাদের জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর’। লালুদায়ীর ওষ্ঠকুঞ্চন দেখিয়া অন্যান্য স্থবিরেরা সেস্থান ত্যাগ করিলেন; কাজেই সভাভঙ্গ হইল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনার সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, লালুদায়ী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের প্রতি অনবজ্ঞা দেখাইয়া ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়াছিলেন।” তাঁহাদের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও লালুদায়ী ওষ্ঠ আকুঞ্চন করা ব্যতীত অন্য কিছু জানিত না।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজার পাদাঞ্জলি নামক এক জড়মতি ও আলস্যপরতন্ত্র পুত্র ছিলেন।

কালসহকারে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, অমাত্যেরা তাঁহার প্রেতকৃত্য

---

[১]। সারীপুত্র ও মহামৌদগল্যায়ন।

[২]। লালুদায়ী বা লাড়ুদায়ী [লাল (স্থূলবুদ্ধি) + উদায়ী]। তুল কালুদায়ী। লালুদায়ীর কথা ১ম খণ্ডের তণ্ডুলনালী-জাতক (৫), লাঙ্গলীষা-জাতকে (১২৩) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের সোমদত্ত-জাতকেও (২১১) দেখা যায়।

সম্পাদনপূর্ব্বক পাদাঞ্জলিকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহাকে একথা জানাইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "লোকের বিশ্বাস, এই রাজকুমার জড়মতি ও আলস্য পরতন্ত্র। ইঁহাকে একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।"

এই কথামত অমাত্যেরা একটা বিবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুমারকে আপনাদের সমীপে বসাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিলেন, অর্থাৎ যাহার ধন তাহাকে না দিয়া অন্যকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন ত কুমার, আমরা কেমন ঠিক বিচার করিলাম।" কুমার কোন উত্তর না দিয়া কেবল ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "বোধ হইতেছে কুমারের বুদ্ধি আছে; আমরা যে অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহা ইনি বুঝিতে পারিয়াছেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

প্রজ্ঞাবলে পাদাঞ্জলি ধ্রুব শ্রেষ্ঠ আমা সবাকার;
তাই ওষ্ঠ আকুঞ্চিল, বুঝিয়াছে প্রকৃত ব্যাপার।

অনন্তর আর একদিনও অমাত্যেরা অন্য একটি বিচারের আয়োজন করিলেন এবং সেদিন প্রকৃত বিচার করিয়া পাদাঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত রাজপুত্র, আমরা কেমন ন্যায্য বিচার করিলাম।" পাদাঞ্জলি কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। তখন তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা ও জড়তার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থানর্থ বুঝিবারে নাহিক শকতি;
ওষ্ঠ আকুঞ্চন ছাড়া নাহি কিছু জানে জড়মতি।

রাজকুমার পাদাঞ্জলি যে অতি জড়মতি, অমাত্যেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকেই রাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন।

[**সমবধান :** তখন লালুদায়ী ছিল পাদাঞ্জলি এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

২৪৮. কিংশুকোপম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কিংশুকোপম-সূত্র প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা চারিজন ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থান[১] প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা যাহার যে কর্ম্মস্থান তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; ভিক্ষুরা

---

[১]। কর্ম্মস্থান অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়। ১ম খণ্ডে ১০৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

উহা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব রাত্রি-যাপনের ও দিবা যাপনের স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ষড়বিধ স্পর্শায়তন,[১] একজন পঞ্চস্কন্ধ,[২] একজন মহাভূতচতুষ্টয়,[৩] ও একজন অষ্টাদশ ধাতু ধ্যান করিয়া[৪] অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পর শাস্তার নিকট গিয়া স্ব স্ব অধিগত গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের একজনের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল এবং তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবান, সমস্ত কর্ম্মস্থানেরই চরমফল নির্ব্বাণ; ইহারা প্রত্যেকেই আবার অর্হত্ত্ব প্রদান করে। ইহার তাৎপর্য্য কি জানিতে ইচ্ছা হয়।" শাস্তা বলিলেন, "কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়া পুরাকালে ভ্রাতৃগণ যেরূপ নানাত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল, তোমরাও কি তাহাই করিতেছ না?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।" তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের চারিটি পুত্র ছিলেন। তাঁহারা একদিন সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমরা কিংশুক বৃক্ষ দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আমাদিগকে উহা দেখাও।" সারথি "যে আজ্ঞা, দেখাইব" বলিয়া অঙ্গিকার করিল; কিন্তু চারিজনকেই এক সঙ্গে না দেখাইয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে রথে লইয়া অরণ্যে গমন করিল। তখন পত্রহীন কিংশুক বৃক্ষের কোরকোদ্গম হইতেছিল। সারথি রাজকুমারকে উহা দেখাইয়া বলিল, "এই কিংশুকবৃক্ষ।" ইহার পর একে একে সে একজনকে নবপত্রোদ্গামকালে, একজন পুষ্পিতকালে এবং একজনকে ফলিতকালে কিংশুক বৃক্ষ দেখাইল।

অনন্তর একদিন ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্র উপবেশন করিয়া, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ,

---

১। আয়তন—বৌদ্ধদর্শনে ছয়টি কর্ম্মেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, বা ত্বক, এবং মন) এবং ছয়টি জ্ঞানের বিষয় এই বারটি আয়তন আছে। স্পর্শায়তনে ছয়টি অঙ্গ—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণস্পর্শ, জিহ্বাস্পর্শ, কায়স্পর্শ, ও মনস্পর্শ।

২। পঞ্চস্কন্ধ—অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান । লোকের যখন মৃত্যু হয় তখন স্কন্ধগুলিরও বিনাশ হয়, কিন্তু কর্ম্মফলে তৎক্ষণাৎ আবার নতুন স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রাণীমাত্রেই এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি; স্কন্ধবিহীন কোন আত্মা নেই।

৩। বৌদ্ধ মতে মহাভূত ৪টি মাত্র—পৃথিবী, জল, তেজ, ও বায়ু। তুল "চাতূর্ভৌতিকমিত্যেকে"-সাঙ্খ্যসূ ৩।১৮।

৪। অষ্টাদশ ধাতু যথা : চক্ষু, রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্রবিজ্ঞান; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণবিজ্ঞান; জিহ্বা, রস, জিহ্বাবিজ্ঞান; কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়বিজ্ঞান; মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান।

এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন "কিংশুক বৃক্ষ অবিকল দগ্ধ স্থাণুর ন্যায়।" দ্বিতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়।" তৃতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক মাংস-পেশীর ন্যায়।" চতুর্থ কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক শিরীষ বৃক্ষের ন্যায়।" এইরূপে প্রত্যেকেই অপরের বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হইলে, তাঁহারা পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কিরূপ বলিয়াছ?" তাঁহারা যে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "তোমরা চারিজনেই কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়াছ বটে, কিন্তু সারথি যখন দেখাইয়াছিল তখন, কোন সময়ে কিংশুক বৃক্ষ কেমন দেখায়, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা কর নাই; ইহাই তোমাদের সন্দেহের কারণ।" পুত্রদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

কিংশুক দেখিলা সর্ব্বে তাতে কোন নাহিক সন্দেহ;
কিন্তু সর্ব্বকালে ইহা কিরূপ, না জিজ্ঞাসিলা কেহ।

[শাস্তা এইরূপে ভিক্ষু-চতুষ্টয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া বলিলেন, "যেমন রাজকুমারগণ তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা না করায় কিংশুক সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারাও এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছ। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

সর্ব্ববিধ জ্ঞানসহ, তন্ন তন্ন করি শিখি
না করিলে ধর্ম্মের অর্জ্জন
সন্দিহান হয় লোকে; কিংশুক-সম্বন্ধে যথা
হয়েছিল রাজপুত্রগণ।[১]

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ এই গল্প অল্পাধিক মাত্রায় পরিবর্ত্তিত আকারে নানাস্থানে প্রচলিত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বহুরূপের গল্প, অন্ধচতুষ্টয়ের হস্তীরূপবর্ণন, দুইজন যোদ্ধার একটা চর্ম্মের বর্ণ লইয়া বিবাদ ইত্যাদি আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের মারুত জাতকও (১৭) তুলনীয়।]

---

[১]। অর্থাৎ, এই ভিক্ষুরা স্রোতাপত্তিমার্গ ইত্যাদি পরিভ্রমণ না করিয়াই একেবারে অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহাদের মনে স্পর্শায়তনাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

২৪৯. শ্যালক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন এক মহাস্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে এই স্থবির এক বালককে প্রবজ্যা দিয়া শেষে তাহাকে পীড়ন করিতেন। উক্ত শ্রামণের পড়ীন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রব্রজ্যা পরিহার করিয়া যায়। তখন স্থবির তাহার নিকট গিয়া তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন—বলেন, "দেখ বৎস, তোমার চীবর, তোমার পাত্র তোমারই হইবে; আমার আর এক প্রস্থ পাত্র ও চীবর আছে, তাহাও তোমায় দিব; এস, আবার প্রব্রাজক হও।" শ্রামণের প্রথমে বলিল, "আমি আর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব না" কিন্তু শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া আবার প্রব্রজ্যা লইল। কিন্তু যে দিন সে প্রব্রাজক হইল, সেই দিন হইতেই স্থবির আবার তাহার পীড়ন আরম্ভ করিলেন, এবং পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আবারও সে সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। তখন স্থবির তাহাকে পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উত্তর দিল, "আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না, অথচ আমি না থাকিলেও আপনার চলে না। আপনি চলিয়া যান, আমি আর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না।"

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ঘটনা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "দেখ ভাই, সে বালকটি ত ভাল বলিয়া বোধ হয়। কেবল মহাস্থবিরের আশয় জানিয়া সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উহা জানিতে পাইয়া বলিলেন, "এই বালকটি যে কেবল এখনই ভাল, তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এই রূপই ছিল; কিন্তু একবার মাত্র এই ব্যক্তির দোষ দেখিতে পাইয়াই সে ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক সম্পন্ন গৃহস্থকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা[১] জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময় এক সাপুড়ে একটা মর্কটকে শিক্ষা দিয়া ও তাহাকে বিষ প্রতিষেধক ঔষধ খাওয়াইয়া সাপের সহিত খেলা করাইত এবং এই উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

---

[১]। 'ধান্য' বলিলে কেবল 'ধান' নহে, যব, গম প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার শস্য বুঝায়।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। উৎসবে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিবে এই উদ্দেশ্যে সাপুড়ে বোধিসত্ত্বের নিকট মর্কটটি লইয়া বলিল, "ভাই, এটা তোমার নিকট রহিল; দেখিও ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেন কোন ত্রুটি না হয়।" অনন্তর আমোদ প্রমোদ করিয়া সে সাতদিন পরে বোধিসত্ত্বের গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মর্কটটা কোথায়?" মর্কট প্রভুর স্বর শুনিয়াই ধানের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল! সাপুড়ে একখানা বাঁশ দিয়া তাহার পিঠে আঘাত করিল, তাহাকে লইয়া একটা বাগানের একপাশে বান্ধিয়া রাখিল এবং ঘুমাইয়া পড়িল। সে নিন্দ্রিত হইয়াছে জানিয়া মর্কটটা কোনরূপে বন্ধনমুক্ত হইল, পলাইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং একটা আম খাইয়া আঁটিটা সাপুড়ের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ইহাতে সাপুড়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া মর্কটকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'মিষ্টকথা দ্বারা ইহাকে ভুলাইয়া গাছ হইতে নামাইতে হইবে। তাহা করিলেই ইহাকে ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে মর্কটকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

এস শ্যাল,[১] ঘরে চল, এস বৃক্ষ হ'তে নামি,
একপুত্রসম যত্নে পালিব তোমায় আমি।
যা কিছু ভোগের বস্তু রয়েছে আমার ঘরে,
একা তুমি কর ত্যাগ, যত ইচ্ছা অকাতরে।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

নিশ্চয় আমায় নাহি ভালবাস মনে,
প্রহারিলে বংশদণ্ডে তেঁই অকারণে।
পক্কাম্র হেথায় আমি যত ইচ্ছা খাই,
যথাসুখে গৃহে তুমি ফিরে যাও, ভাই।

ইহা বলিয়া মর্কট উল্লম্ফন করিতে করিতে বনের ভিতর প্রবেশ করিল; সাপুড়েও ক্ষুণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন এই শ্রামণের ছিল সেই মর্কট; এই মহাস্থবির ছিলেন সেই সাপুড়ে; এবং আমি ছিলাম সেই ধার্ম্মিক শস্যবিক্রেতা।]

---

[১]। টীকাকার বলেন 'সালকা তি নামেন আলাপন্ত।' বাঙ্গালা ভাষায় কাহাকেও 'শালা' বলিলে দেওয়া হয়; কিন্তু প্রাচীন কালে 'শ্যালক' শব্দটি প্রতিবোধকই ছিল। অনেক নাটকে রাজার প্রিয়প্রাত্র 'শ্যালক' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

২৫০. কপি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কুহুকী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটার কুহকের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও কুহক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "দেখ, এই ব্যক্তি যে কেবল এজন্মেই কুহকী হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্বেও কুহকী ছিল। এ যখন মর্কটজন্ম লাভ করিয়াছিল, তখনও কেবল অগ্নির উত্তাপ পাইবার জন্য কুহকের আশ্রয় লইয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর এবং যখন তাহার পুত্র ছুটাছুটি করিতে শিখিল, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইল। তখন তিনি পুত্রটিকে কোলে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রটিও তখন তাপসকুমাররূপে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে একটা মর্কট শীতে এত কাতর হইল যে তাহাতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কট্ কট্ ও শরীর থর্ থর্ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে বেড়াইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব একখানা বড় কাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া রহিলেন; পুত্রটি সেখানে বসিয়া তাহার পা টিপিতে লাগিলেন। এদিকে সেই মর্কট কোন মৃত তাপসের ব্যবহৃত বল্কলাদি পাইয়া তাপস সাজিল। সে অন্তরবাস ও সঙ্ঘাটি পরিল, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিল, বাঁক ও কমণ্ডলু লইয়া ঋষিবেশে বোধিসত্ত্বের পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে অগ্নি-সেবার আশায় কুহক করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্র বলিল, "বাবা, একজন তপস্বী শীতে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আসেন। তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলুন; তিনি আসিয়া অগ্নিসেবা করুন।" পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিবার সময় বালক নিম্নলিখিত গাথাটি বলিল :

প্রশান্ত, সংযমী এক শীতার্ত্ত তাপস এসে
রয়েছেন কুঠীরের দ্বারে;

প্রবেশি কুঠীরমাঝে শীত ক্লেশ নিবারিতে
দয়া করি বলুন উঁহারে।

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী তাপসকে মর্কট বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

প্রশান্ত সংযমী তাপস এ নয়,
কপি এই, বৎস, জানিনু নিশ্চয়।
চরে গাছে গাছে, অপবিত্র করে
যখন ইহারা যেখানে বিহরে।
কোপনস্বভাব, অতি হীনমতি,
প্রবেশিলে ঘরে ঘটায়ে দুর্গতি।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া মর্কটকে ভয় দেখাইলে সে লাফ দিতে দিতে চলিয়া গেল এবং বন ভাল লাগুক, নাই লাগুক, আর কখনও ঐ আশ্রমের নিকট আসিল না।

বোধিসত্ত্ব কালক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন;[১] পুত্রও ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং পিতাপুত্র উভয়েই অপরিহীন ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মলোক বাসের উপযুক্ত হইলেন।

[এইরূপে শাস্তা বুঝাইয়া দিলেন যে কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ঐ ভিক্ষু কুহকী ছিল। অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের **সমবধান** করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুদিগের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান : তখন এই কুহকী ভিক্ষু সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ পূর্ব্ববর্ণিত মর্কট-জাতকে (১৭৩) এবং জাতকে প্রবেধ অতি অল্প।

----

[১]। প্রথম খণ্ড, ৯৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

ত্রি-নিপাত

২৫১. সঙ্কল্প-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি রত্নশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি একদা শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে দর্শন করিয়া মন্মথশরে ব্যথিত হইয়াছিলেন। তদবধি বিহারের কোন কার্য্যেই তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন ছিল না। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যখন দেখিলেন তিনি পুনর্ব্বার সংসারাশ্রম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন বলিতে লাগিলেন, "দেখ যাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় প্রপীড়িত শাস্তা তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রদান করেন। চল, আমরা তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তির এখানে আসিবার ইচ্ছা নাই; তথাপি তোমরা ইহাকে কেন এখানে লইয়া আসিলে?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত"। "ইহার কারণ কি?" উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু এই প্রশ্নের উত্তর সমস্ত প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা ধ্যানবলে সমস্ত রিপু দমন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের অন্তঃকরণেও পুরাকালে রমণীদর্শনে অসাধুভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব, সেই রমণী যে তোমার ন্যায় তুচ্ছ ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যখন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও কলুষতা হইতে নিষ্কৃতি পান না, যখন নিষ্কলঙ্ক যশঃসম্পন্ন মহাত্মারাও অযশস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন অপরিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। যে বায়ুর বেগে সুমেরু কম্পিত হয়, তাহার আঘাতে কি শুষ্কপত্ররাশি স্থির থাকিতে পারে? যে রিপুর দ্বারা ভাবী অভিসম্বুদ্ধের হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে অটল থাকা নিতান্তই অসম্ভব।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি-ধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিলেন। কালক্রমে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন এবং ভাণ্ডারস্থ সুবর্ণ পরিদর্শন করিতে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই যে রাশি রাশি ধন দেখিতে পাইতেছি; যাঁহারা ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত আর দেখিবার উপায় নাই!" এইরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হইল এবং সর্ব্বশরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিলন।

বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল সংসারে থাকিয়া মুক্তহস্তে দান করিলেন এবং শেষে বীতকাম হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য সাশ্রু নয়নে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল ধ্যানসুখে নিমগ্ন রহিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, লোকালয়ে গিয়া অম্ল ও লবণ সেবন করা যাউক; তাহা করিলে চলাফেরা হইবে, শরীরে বলাধান ঘাটিবে। যে সকল লোকে মাদৃশ শীলবান ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিবে ও অভিবাদন করিবে তাহারাও জীবনান্তে স্বর্গে যাইবে।" এই চিন্তা করিয়া তিনি হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে, ভিক্ষা করিতে করিতে, একদিন সূর্য্যাস্তকালে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপনের স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজ্যোদ্যান দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থানটি নির্জ্জনবাসের উপযুক্ত; অতএব এখানেই অবস্থান করা যাউক।' তিনি ঐ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় হইলেন এবং সেখানে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর জটা, অজিন ও বল্কলাদি যথারীতি বিন্যস্ত করিয়া পাত্রহস্তে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ প্রশান্ত, গমন মহানুভাবব্যঞ্জক, দৃষ্টি যুগমাত্রস্থানে আবদ্ধ। তাঁহার দেহনিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বোধিসত্ত্ব এই বেশে ক্রমশঃ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তখন প্রাসাদের মহাতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি বাতায়নের ভিতর দিয়া

বোধিসত্ত্বকে অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার গরিমাময়ী গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন 'যদি জগতে পূর্ণশান্তি নামে কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা এই মহাত্মারই মনে বিদ্যমান আছে।' অনন্তর তিনি এক অমাত্যকে বলিলেন, "তুমি গিয়া ঐ মহাত্মাকে এখানে আনয়ন কর।"

অমাত্য গিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "ভগবন্, রাজা আপনাকে ডাকিতেছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বিজ্ঞবর, রাজা ত আমায় জানেন না।" "আচ্ছা, আমি যতক্ষণ না ফিরি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" এই বলিয়া অমাত্য রাজার নিকট গিয়া বোধিসত্ত্বের কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাদের কোন কুলোপগ তাপস নাই[১] (অতএব তাঁহাকে কুলোপগের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিব); তুমি আবার যাও এবং তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" তদনুসারে অমাত্য চলিয়া গেলেন, রাজা নিজেও বাতায়ন হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, দয়া করিয়া একবার এদিকে পদার্পণ করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যের হস্তে ভিক্ষাপাত্র দিয়া মহাতলে অধিরোহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, রাজপর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, এবং নিজের জন্য যে ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহার ভোজনের জন্য সেই সমস্ত আনাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেগুলির উত্তর শুনিয়া উত্তরোত্তর এত প্রীত হইলেন যে, পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার আশ্রম কোথায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি হিমবন্ত প্রদেশে থাকি এবং সেখান হইতেই আসিতেছি।" "কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন? "বর্ষাবাসের নিমিত্ত।" "তবে দয়া করিয়া আমার উদ্যানে অবস্থিতি করুন না কেন? তাপসদিগের যে চতুর্ব্বিধ উপকরণ[২] আবশ্যক, আপনি তাহার কোনটিরই অভাব বোধ করিবেন না, আমিও স্বর্গপ্রাপ্তিজনক পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব।" বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে রাজা প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, সেখানে তাঁহার পর্ণশালা, চঙ্ক্রমণস্থান, এবং দিবাভাগে ও রাত্রিকালে অবস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে যে উপকরণ আবশ্যক সে সমস্তও আনাইয়া দিলেন। অনন্তর রাজা উদ্যানপালের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিবার সময় বলিলেন,

---

[১]। 'কুলূপকতাপস' বা 'কুলূপগতাপস'—কুলং উপগচ্ছতি ইতি কুলোপগ—যিনি প্রতিদিন বাড়ীতে আগমন করেন এবং ভিক্ষাদি লইয়া যান।

[২]। চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয়নাসন (শয্যা) ও ভৈষজ্য।

"ভদন্ত, আপনি এই স্থানে যথাসুখে বাস করুন।" তদবধি বোধিসত্ত্ব একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইল। রাজা নিজেই তাহাদিগের দমনার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মহিষীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেবি! হয় তোমাকে নয় আমাকে রাজধানীতে থাকিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "স্বামীন্, আপনি একথা বলিতেছেন কেন?" "আমাদের গুরুস্থানীয় শীলবান তাপসের কথা ভাবিয়া।" "আমি তাহার সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি করিব না। তাঁহার ভার আমার উপর থাকিল; আপনি নিঃশঙ্কমনে যাত্রা করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজা বিদ্রোহদমনার্থ চলিয়া গেলেন; মহিষী যথাপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন যথাসময়ে রাজপুরীতে যাইতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছামত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভোজন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন মহিষী তাঁহার জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। তখন মহিষী সেই অবসরে স্নান করিয়া অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং অনুচ্চ শয্যা বিস্তারপূর্ব্বক পরিষ্কৃত শাটকদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন বেলা অধিক হইয়াছে; তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আকাশপথে মহাবাতায়নদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কলের শব্দ শুনিয়া সহসা উত্থান করিবার সময় মহিষীর গাত্র হইতে সেই পীতোজ্জ্বল শাটক খসিয়া পড়িল। এই অপূর্ব্ব ও রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের চিত্তবিকার ঘটিল এবং তিনি মহিষীর দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন করণ্ডকপ্রক্ষিপ্ত বিষধর যেমন ফণা বিস্তার করিয়া উত্থিত হয়, বোধিসত্ত্বের ধ্যান-নিরুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি সেইরূপ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল; তিনি কুঠারচ্ছিন্ন ক্ষীরপাদপের ন্যায়[১] অধঃপতিত হইলেন। দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানবল বিনষ্ট ও ইন্দ্রিয়সমূহ কলুষিত হইল; তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া ভোজনের সামর্থ্য রহিল না। মহিষী তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি আসন গ্রহণ করিলেন না; কাজেই মহিষী সমস্ত খাদ্য তাঁহার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন আহারান্তে বাতায়নের ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশমার্গে প্রতিগমন করিতেন; কিন্তু আজ আর তাহা করিতে পারিলেন না; খাদ্য গ্রহণ করিয়া মহাসোপানপথে অবতরণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। মহিষী বুঝিতে

---

[১]। ন্যগ্রোধ উডুম্বর, অশ্বত্থ ও মধুক (মহুয়া)—এই চারি জাতীয় বৃক্ষ ক্ষীরতরু নামে বিদিত।

পারিলেন যে বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত হইয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব উদ্যানে ফিরিলেন বটে, কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না; তিনি ভোজ্যপাত্র আসনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিলেন এবং অহো! কি সুন্দর রমণী! ইঁহার হস্তপদের গঠন কি সুঠাম! কটির কি অপূর্ব্ব ক্ষীণতা! উরুর কি মনোহর বিশালতা!" কেবল এই প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্তাহকাল এইভাবে পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার খাদ্য পচিয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে নীল মক্ষিকা আসিয়া উহা ছাইয়া ফেলিল।

এদিকে রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানী সুসজ্জিত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রথমে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, পরে বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যানে গেলেন। সেখানে আশ্রমপাদের সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, বোধিসত্ত্ব হয়ত অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তিনি কুটীরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন বোধিসত্ত্ব শুইয়া আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন 'সম্ভবতঃ ইঁহার অসুখ করিয়াছে।' ইহা মনে করিয়া তিনি গলিত খাদ্য সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন, পর্ণশালা পরিস্কৃত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ! আমি বিদ্ধ হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন, 'ইহা বোধ হয় আমার শত্রুপক্ষের কাজ। তাহারা আমার জন্য কোন ক্ষতি করিবার সুযোগ পায় নাই; কাজেই আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহারই অনিষ্ট করিবে এই সঙ্কল্পে ইঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বোধিসত্ত্বের শরীর পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোথাও ক্ষত দেখিতে পাইলেন না। কাজেই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত! আপনি দেহের কোন অংশে বিদ্ধ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমাকে অন্যে বিদ্ধ করে নাই; আমি নিজেই নিজেকেই বিদ্ধ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি উত্থানপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিলেন :

যে বাণে হৃদয় বেধ করিয়া আমার
দহিছে সকল অঙ্গ, গড়ে নাই তারে
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত করি
ইষুকার কোন; কিংবা ধনুর্দ্ধর কেহ
করে নাই তাহারে নিক্ষেপ, মহারাজ,
আকর্ণ টানিয়া গুণ লক্ষি মোর দেহ।

কামরূপ-জলধৌত বিতর্ক-পাষাণে[১]
শাণিত সে শর আমি হানিয়াছি নিজ
বুকে; অপরের ইথে দোষ কিছু নাই।
কোন অঙ্গে হেন ক্ষত দেখা নাহি যায়
যা হ'তে আমায়, ছুটি শোণিতের স্রাব
করিবে দুর্ব্বল; মূঢ় আমি, হে রাজন্;
চিত্তের দৌর্ব্বল্য হেতু, পরিহরি ধ্যান
স্বখাত সলিল এবে ডুবিয়াছি হায়!

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রাজাকে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তাহার পর তিনি রাজাকে পর্ণশালা হইতে বাহির করিয়া দিয়া কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন, এবং পর্ণশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি হিমবন্তে ফিরিয়া যাইব।" রাজা বলিলেন, "আপনাকে যাইতে দিব না।" "মহারাজ! এখানে বাস করিয়া আমার যে অধঃপতন হইয়াছে তাহা ত আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি কিছুতেই এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়াও কিন্তু রাজা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আকাশপথে হিমবন্তে প্রতিগমন করিলেন এবং যাবজ্জীবন সেখানে অবস্থিতি করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য সকলে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদামগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৫২. তিলমুষ্টি-জতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ক্রোধন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি নিতান্ত কোপন ছিলেন। তাহার স্বভাব এমন রুক্ষ ছিল যে কেহ সামান্য কিছু বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও দুর্ব্বাক্য বলিতেন এবং তাহাকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করিতেন।

---

[১]। বিতর্ক—চিন্তা। এখানে ইহা 'অকুশল বিতর্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অকুশল বিতর্ক ত্রিবিধ—কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “দেখ, অমুক ভিক্ষু বড় কোপন ও রূক্ষস্বভাব; তিনি সামান্য কারণেই চুল্লীতে প্রক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করেন। বুদ্ধ-শাসনে ক্রোধের স্থান নাই; অথচ ইহাতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তিনি ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না!” এই কথা শুনিয়া শাস্তা একজন ভিক্ষু প্রেরণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে আনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হেতু তুমি কি প্রকৃতই কোপনস্বভাব?” ভিক্ষু উত্তর দিলেন, “হা ভগবন।” তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অত্যন্ত কোপন ছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্তকুমার। তখন এই নিয়ম ছিল যে নিজেদের রাজধানীতে সুবিখ্যাত অধ্যাপক থাকিলেও রাজারা পুত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কোন দূরবর্ত্তী পররাজ্যে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে বিদেশে থাকিলে কুমারদিগের মনে দর্প ও অভিমান জন্মিতে পারিবে না, তাঁহারা শীতাতপাদি শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিতে শিখিবেন এবং লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। এই প্রথানুসারে, ব্রহ্মদত্তকুমার যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া একযোড়া একতলিক পাদুকা,[১] একটি পত্রনির্ম্মিত ছত্র এবং সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি এখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।”

কুমার “যে আজ্ঞা” বলিয়া মাতা-পিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যথাকালে তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া আচার্য্যের গৃহ অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। আচার্য্য তখন শিষ্যদিগকে পাঠ দিয়া গৃহদ্বারে পাদচারণ করিতেছিলেন; কুমার যেখান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, সেখানেই পাদুকা ও ছত্র ত্যাগ করিলেন; এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুমার পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য

---

[১]। একতলিক উপাহানা—একখানা চামড়ার তলবিশিষ্ট জুতা। মধ্যদেশের ভিক্ষুদিগের পক্ষে এইরূপ জুতা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। প্রত্যন্তবাসী ভিক্ষুরা “গণংগণ” অর্থাৎ একাধিক চর্ম্মের তলবিশিষ্ট জুতা ব্যবহার করিতেন।

জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কুমার বলিলেন, "ভগবন্, আমি বারাণসী হইতে আসিয়াছি। "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-রাজের পুত্র।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "ভবৎসকাশে বিদ্যালাভের জন্য আসিয়াছি।" "তুমি দক্ষিণা দিয়া বিদ্যা শিখিবে কিংবা গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা শিখিবে?"[১] "আমি দক্ষিণা আনিয়াছি।" এই বলিয়া কুমার আচার্য্যের পাদমূলে সহস্রকার্ষাপণপূর্ণ থলিটি রাখিয়া দিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন।

ধর্ম্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্য্যদিগের সাংসারিক কার্য্য করিয়া রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিত; কিন্তু যাহারা দক্ষিণা দান করিত, আচার্য্যেরা তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠপুত্রবৎ মনে করিয়া শিক্ষা দিতেন। তক্ষশিলাবাসী এই আচার্য্যও ব্রহ্মদত্তকুমারের শিক্ষাসম্বন্ধে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি শুক্লপক্ষে যে যে দিন শুভযোগ পাইতেন, সেই সেই দিন তাঁহাকে পাঠ দিতেন। এইরূপে কুমারের শিক্ষাবিধান হইতে লাগিল।

একদিন কুমার আচার্য্যের সহিত স্নান করিতে গেলেন। পথে এক বৃদ্ধা তিলে খোষা ছাড়াইয়া শাঁসগুলি সম্মুখে ছাড়াইয়া বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কুমারের তিলশাঁস খাইতে ইচ্ছা হইল এবং তিনি একমুষ্টি তুলিয়া মুখে দিলেন। বৃদ্ধা ভাবিলেন, ছেলেটির বোধ হয় বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সে জন্য সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ইহার পরদিনও ঠিক ঐ সময়ে ঐরূপ ঘটিল এবং সেদিনও বাঙনিষ্পত্তি করিল না। কিন্তু তৃতীয় দিনেও কুমার যখন ঐ কাণ্ড করিলেন, তখন সে বাহু তুলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ, এই দেশ-প্রমুখ আচার্য্য নিজের ছাত্রদিগের দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মা?" "প্রভু, আমি তিলশাঁস শুকাইতেছি; আপনার এই ছাত্রটি আজ এক মুষ্টি খাইল, কাল একমুষ্টি খাইয়াছিল, পরশুও একমুষ্টি খাইয়াছিল। এরূপ করিলে যে শেষে আমার যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিবে।" "তুমি কান্দিও না; আমি তোমাকে তিলের মূল্য দেওয়াইতেছি।" "আমি মূল্য চাই না, বাবাঠাকুর। আর যাহাতে এমন কাজ না করে, এই শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।" "তবে দেখ, মা!" ইহা বলিয়া আচার্য্য দুই জন শিষ্য-দ্বারা কুমারের দুই হাত ধরাইলেন, এবং "সাবধান, আর কখনও এমন কাজ করিও না," এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে বংশযষ্টি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে তিনবার আঘাত করিলেন। ইহাতে আচার্য্যের উপর কুমারের ভয়ানক

১। মূলে "কিংতে আচরিয়ভাগো আভতো উদাহু ধম্মান্তেবাসিকো হোতুকামো সি?" অর্থাৎ 'তুমি আচার্য্যভাগ আনয়ন করিয়াছ বা ধর্ম্মান্তেবাসিক হইবে?" এইরূপ আছে।

ক্রোধ জন্মিল; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্য কুমারের ক্রোধভাব বুঝিতে পারিলেন।

অতঃপর কুমার মনোযোগবলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রহারের কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিন পাইলে আচার্য্যের প্রাণবধ করিব। তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় যখন আচার্য্যে চরণবন্দনা করিলেন, তখন বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি রাজপদ লাভ করিলে, আপনার নিকট লোক পাঠাইব। আপনি যেন তখন দয়া করিয়া আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন।" কুমারের ভক্তির আধিক্য দেখিয়া আচার্য্য ইহাতে সম্মত হইলেন।

কুমার বারাণসীতে গিয়া মাতা-পিতার নিকট অধীত বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা বলিলেন, "বৎস, যখন ভাগ্যগুণে মরিবার পূর্ব্বে তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, তখন আমার জীবদ্দশাতেই তোমাকে রাজশ্রীসম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কুমার রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি যে ক্রোধভাব জন্মিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিলেন না। যখনই সেই প্রহারের কথা মনে পড়িত, তখনই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইত। তিনি আচার্য্যের প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

আচার্য্য ভাবিলেন, 'এই রাজা যতদিন তরুণবয়স্ক থাকিবে, ততদিন ইঁহার ক্রোধোপশম করা যাইতে পরিবে না।' এই নিমিত্ত তখন তিনি বারাণসীতে গমন করিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত-কুমারের রাজত্বকালের যখন প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ অতীত হইল, তখন তাঁহার ক্রোধশান্তি সম্ভবপর মনে করিয়া সেই আচার্য্য তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজকে বল যে তাঁহার আচার্য্য আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন এবং আচার্য্যকে স্বসমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ পাঠালেন।

আচার্য্যকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আরক্তলোচনে অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই আচার্য্য আমার শরীরের যে অংশে প্রহার করিয়াছিলেন, এখনও সেখানে বেদনা অনুভব করিতেছি। ইহাঁর কপালে মৃত্যু আছে; ইনি মরিবেন বলিয়াই এখানে আগমন করিয়াছেন; অদ্যই ইহাঁর জীবনাবসান হইবে।" এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে রাজা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

একমুষ্টি তিল তরে যে দুঃখ দিয়াছ মোরে
ভুলিব না থাকিতে জীবন;

বাহুদ্বয় ধরি, পৃষ্ঠে কশাঘাত তিনবার
করেছিলা অতি নিদারুণ।
জীবনে কি নাই মায়া? বলত, ব্রাহ্মণ, মোরে
কি সাহসে আসিলে এখানে;
পরে কি ক্ষমিতে সেই, দহিছে যাহার মন
পূর্ব্বকৃত স্মরি অপমানে?

রাজা আচার্য্যকে এইরূপ মৃত্যুভয় দেখাতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে আচার্য্য নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

"আর্য্যগণ[১] দণ্ডদানে করেন দমন
যাহারা অনার্য্য পথে করে বিচরণ।
এ নহে ক্রোধের কাজ, শুন, ওহে মহারাজ;
শাসন ইহারে বলে যত জ্ঞানিজন;
যাহার মাহাত্ম্যে হয় সমাজ-রক্ষণ।

মহারাজ, পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বুঝুন। এক্ষেত্রে ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার অকর্ত্তব্য। আমি যদি তখন আপনাকে ঐরূপ শাসন না করিতাম, তাহা হইলে আপনি ক্রমশঃ পিষ্টক, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতি অপহরণ করিতে করিতে চৌর্য্য-নিপুণ হইতেন, শেষে লোকের ঘরে সিঁদ কাটিতে[২] শিখিতেন, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতেন, গ্রামে গ্রামে নরহত্যা করিয়া বেড়াতেন। শান্তিরক্ষকেরা আপনাকে সাধারণের শত্রু মনে করিত এবং অপহৃত দ্রব্যসহ ধরিয়া আপনাকে রাজার নিকট লইয়া যাইত; রাজাও আদেশ দিতেন, 'ইহাকে দোষানুরূপ দণ্ড দাও।' ভাবিয়া দেখুন ত তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা ঘটিত। আপনি কি এই অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন? বলিতে কি, মহারাজ, আমি তখন দণ্ড দিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আপনি এই ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।"

আচার্য্য রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ অমাত্যেরাও

---

[১]। পালি টীকাকার আর্য্য শব্দের এই ব্যাখা করিয়াছেন :—আর্য্য চতুর্ব্বিধ—আচারার্য্য, দর্শনার্য্য, লিঙ্গার্য্য, প্রতিবেধার্য্য। মনুষ্য হউক বা ইতর প্রাণী হউক, যে সদাচার-সম্পন্ন, সেই আচারার্য্য। যাহারা চাল চলন সভ্যজনোচিত সে দর্শনার্য্য; দুঃশীল ব্যক্তিও শ্রমণের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তাহাকে লিঙ্গার্য্য বলা যায়। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতি প্রতিবেধার্য্য। "প্রতিবেধ শব্দের অর্থ সূক্ষ্মদৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান। এই অর্থের সমর্থনার্থ টীকাকার তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; অনাবশ্যক বোধে সেগুলি এখানে প্রদত্ত হইল না।

[২]। সিঁদকাটা—সন্ধিচ্ছেদন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি—পন্থদ্রোহ। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা—গ্রামযাত সাধারণের শত্রু—রাজাপরাধিক। বামাল গ্রেপ্তার করা—সভাণ্ডগ্রহণ।

তাঁহার সারগর্ভ বাক্য শুনিয়া একবাক্য বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সত্য সত্যই এই আচার্য্যের প্রসাদে আপনি এত অভ্যুদয়শালী হইয়াছেন।" রাজা তখন আচার্য্যের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং বলিলেন, "গুরুদেব, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনার চরণে অর্পণ করিলাম।" আচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজ্য প্রয়োজন নাই।

রাজা তখন তক্ষশীলায় লোক পাঠাইয়া আচার্য্যের পত্নী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে বারাণসীতে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে বিপুল ধন দান করিয়া পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি আচার্য্যকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অনন্তর জীবনের অবশিষ্টকাল দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন; অপর অনেকে কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ কেহ সকৃদাগামিফল লাভ করিলেন।

সমবধান : তখন এই ক্রোধন ভিক্ষু ছিল রাজা ব্রহ্মদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

২৫৩. মণিকণ্ঠ-জাতক

[শাস্তা আলবির নিকটবর্ত্তী[১] অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিবার সময় কুঠিকার-শিক্ষাপদ সম্বন্ধে[২] এই কথা বলিয়াছিলেন। আলবির ভিক্ষু কুটীর প্রস্তুত করিবার সময় লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এজন্য কখনও কথায়, কখনও ইঙ্গিতে অভাব জানাইয়া অতি অধিক মাত্রায় যাচঞা করিয়া বেড়াইতেন। সকল ভিক্ষুর মুখেই এক কথা "আমাদিগকে জন দাও,

---

[১]। আলবি (আটবী)—শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে। ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

[২]। কুঠীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিক্ষুদিগকে যে যে উপদেশ পালন করিতে হইবে (শিক্ষাপদ = উপদেশ)। এ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ব্রহ্মদত্ত জাতক (৩২৩) এবং অস্থিসেন জাতক [৪০৩] দ্রষ্টব্য। এই শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের সূত্রবিভঙ্গে দেখা যায়। বিরুটের স্তূপের দেখা যায় এক ব্যক্তি কুঠীরের সম্মুখে বসিয়া পঞ্চশীর্ষ একটা সর্পের সহিত আলাপ করিতেছে। সম্ভবতঃ উহা এই জাতক অবলম্বন করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

মজুর খাটাইবার জন্য যাহা (দ্রব্য অর্থ) আবশ্যক[১] তাহা দাও" ইত্যাদি। যাচঞা ও বিজ্ঞাপ্তির এই অতিমাত্রাবশতঃ লোক বড় উপদ্রুত হইয়াছিল; এমন কি ভিক্ষু দেখিলেই শেষে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া যাইত।

অনন্তর একদিন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আলবিতে গিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকে তাঁহার ন্যায় স্থবিরকে দেখিয়াও পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিল।[২] তিনি আহারান্তে ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে এই আলবিতে ভিক্ষা অতি সুলভ ছিল; কিন্তু এখন এখানে ভিক্ষা দুর্লভ হইয়াছে। ইহার কারণ কি বল ত?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

এই সময়ে ভগবান আলবিতে গিয়া অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাকশ্যপ তাঁহার নিকট গিয়া ভিক্ষুদিগের এই কাণ্ড নিবেদন করিলেন। এখন ইহার প্রতিবিধানার্থ শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করিয়া আলবির ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা লোকের নিকট বহু যাচঞা করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছ, একথা সত্য কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" তখন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "কেহ অতিরিক্ত যাচঞা করিলে সপ্তরত্ন পরিপূর্ণ[৩] নাগলোকের অধিবাসীদিগেরও বিরক্তি জন্মে; মনুষ্যদিগের পক্ষে ত আরও অধিক বিরক্তি হইবে, কারণ পাষাণ হইতে মাংস উৎপাটন করাও যেমন দুষ্কর, মানুষের নিকট হইতে একটি কার্ষাপণ আদায় করাও সেরূপ দুষ্কর।" অনন্তর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন,

---

১। মূলে "পুরিসত্থকরম্' আছে। ইহার অর্থ—"যদ্দারা লোক খাটাইতে পারা যায়" আর্থৎ হয় মজুর দাও, নয় মজুর খাটাইবার মজুরী দাও। যাচন—মুখ কুটিয়া প্রার্থনা করা; বিঞ্ঞাত্তি (বিজ্ঞাপ্তি) কথা না বলিয়া অভাব জানান। ভিক্ষা প্রার্থনার নাম বিজ্ঞাপ্তি;—ভিক্ষু কেবল পাত্র হস্তে করিয়া গৃহস্থের দ্বারদেশে দাঁড়াইবেন; কোন কথা বলিতে বা অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে পারিবেন না।

২। মূলে "পটিজগ্গিংসু" ও "পটিপজ্জীসু" এই দুই পাঠ দেখা যায়। ইহার কোনটিতেই অর্থ ভাল হয় না। পটিপজ্জিংসু এই পাঠ ভাল। ইহার অর্থ—অন্য লোকে যেরূপ করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ করিল, অর্থাৎ মহাস্থবিরকে দেখিয়াই পলাইয়া গেল।

৩। সপ্তরত্ন, যথা : সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, বৈদুর্য্য, বজ্র, প্রবাল। মণি = পদ্মরাগাদি; বৈদুর্য্য= Cat's eye; বজ্র = হীরক।

তখন অন্য পুণ্যবান সত্ত্ব তাঁহার জননীর কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তাঁহারা এতদূর দুঃখিত হইলেন, যে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার উজানে এবং কনিষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার ভাটীতে অবস্থিত হইল।[১]

একদা মণিকণ্ঠ নামক নাগরাজ স্বীয় বাসস্থান হইতে বর্হির্গত হইয়া মানববেশে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে কনিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে শিষ্টালাভ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের প্রতি এমন অনুরক্ত হইলেন যে, শেষে একের পক্ষে অন্যকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। অতঃপর মণিকণ্ঠ পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠ তাপসের নিকট আসিতেন, অনেক্ষণ বসিয়া কথোপকথন করিতেন, যাইবার সময় স্নেহবশে প্রকৃত রূপ ধারণপূর্ব্বক নিজের দেহদ্বারা তাপসকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহার মস্তকের উপর আপনার বৃহৎ ফণা বিস্তৃত করিতেন এবং এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নেহ বিনোদনান্তে তাপসের দেহ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিতেন। কনিষ্ঠ তাপস মণিকণ্ঠের ভয়ে (অর্থাৎ তদীয় প্রকৃতরূপ দেখিয়া) ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ত্বক রূক্ষ ও বিবর্ণ হইল, সমস্ত শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইল, বাহির হইতে ধমনিগুলি দেখা যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কনিষ্ঠ তাপস একদিন অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। অগ্রজ জিজ্ঞাসিলেন "ভাই, তুমি কৃশ হইয়াছ কেন? তোমার দেহ রূক্ষ ও বিবর্ণ, এবং চর্ম্ম পাণ্ডুর হইয়াছে; তোমার ধমনিগুলি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ইহার কারণ কি?" কনিষ্ঠ তখন অগ্রজকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "সত্য বলত, তুমি সেই নাগের আগমন ইচ্ছা কর, কি না কর।" "না, আমি ইচ্ছা করি না।" সেই নাগরাজ তোমার নিকট কি আভরণ পরিধান করিয়া আসিয়া থাকে?" "তাহার কণ্ঠে এক মহামূল্য মণি থাকে।" "তাহা হইলে, যখন ঐ নাগরাজ আবার আসিবে, তখন সে বসিবার পূর্ব্বেই তুমি বলিবে, আমাকে এ মণিটা দাও। ইহা বলিলে সে তোমাকে নিজের দেহদ্বারা বেষ্টন না করিয়াই চলিয়া যাইবে। তাহার পরদিন, তুমি আশ্রম দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তাহাকে আসিতে দেখিলেই মণিটা চাহিবে। তৃতীয় দিনে গঙ্গাতীরে থাকিয়া, সে যখন জল হইতে উপরে উঠিবে, তখন চাহিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে সে আর কখনও তোমার নিকটে আসিবে না।"

---

[১]। "উর্দ্ধগঙ্গায়" এবং "অধোগঙ্গায়।"

কনিষ্ঠ তাপস জ্যেষ্ঠের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ, তাহাই করিব", এবং নিজের পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে পরদিন নাগরাজ আসিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তিনি প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে তোমার এই আভরণখানি দান কর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ আসন গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিবসে তাপস আশ্রমদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং নাগরাজকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাল আমাকে তোমার রত্নাভরণখানি দাও নাই, আজ কিন্তু দিতেই হইবে। ইহা শুনিয়া নাগরাজ আশ্রমের ভিতর প্রবেশ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। সর্ব্বশেষে তৃতীয় দিনে তিনি যখন জল হইতে উত্থিত হইতেছিলেন, সেই সময়েই কনিষ্ঠ তাপস বলিলেন, "আজ লইয়া তিন দিন যাচঞা করিলাম, এখন তোমার রত্নাভরণখানি আমায় দান কর।" তখন নাগরাজ জলের মধ্যে থাকিয়াই নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাপসের প্রার্থনা প্রত্যাখান করিলেন :

প্রচুর প্রকৃষ্ট ভোজ্য পেয় আমি পাই,
এ মণির গুণে সদা, শুন মোর ভাই।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক, আসিব না আশ্রমে তোমার।
যুবক শাণিত অসি করি আস্ফালন,[১]
করে অপরের মনে ভীতি উৎপাদন।
তুমিও অন্যায়রূপে, যাচি এই মণি,
ভয় দেখাইলে, হায় আমার তেমনি।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক আসিব না আশ্রমে তোমার।

ইহা বলিয়া নাগরাজ জলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন; তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

কিন্তু কনিষ্ঠ তাপস সেই সুদর্শন নাগরাজের অদর্শনহেতু কৃশ, বিবর্ণ ও পাণ্ডু হইলেন, তাঁহার ধমনিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ফুটিয়া উঠিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠের অবস্থা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই তোমার যে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ দেখা যাইতেছে,

---

১। মূলে "সুসূ যথা সক্খরধোতপাণি" আছে। টীকাকার এখানে গোটা "অসি" শব্দটির উহ্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নচেৎ অর্থ হয় না। শিশু (অর্থাৎ যুবক) অসি প্রস্তরে শাণিত করিয়া ধারণ করিয়াছে, এইরূপ ভাব।

ইহার কারণ কি?” কনিষ্ঠ বলিলেন, “সেই দর্শনীয় নাগরাজের অদর্শনহেতু।” ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, এই তপস্বী নাগরাজ বিনা থাকিতে পারেন না। তখন তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

প্রীতি যার পেতে তব আকিঞ্চন,
যাচঞা তার কাছে করো না কখন।
অতি যাচঞায় করি জ্বালাতন
হয় লোকে শেষে বিদ্বেষ-ভাজন।
মণির লাগিয়া ব্রাহ্মণ মাগিল,
সেই হেতু নাগ অদৃশ্য হইল।

এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠকে আশ্বাস দিলেন এবং “আর শোক করিও না” এই উপদেশ দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর উভয় সহোদরই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, “অতএব দেখিলে, ভিক্ষুগণ, যে সপ্তরত্নপরিপূর্ণ নাগলোকের অধিবাসীরাও অতি যাচঞায় উত্তেজিত হইয়া থাকে, মনুষ্যদিগের ত দূরের কথা।” অনন্তর তিনি ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকের **সমবধান** করিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ তাপস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ তাপস।

---

২৫৪. কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির সারিপুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা সম্যকসম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার সৎকারার্থ বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নানাবিধ উপহারদানের আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা এক ধর্মঘোষক[২] ভিক্ষুকে বিহারে রাখিয়া তাঁহার উপর এই ভার দিল যে নগরবাসীদিগের যে যে আসিয়া যতজন ভিক্ষুকে দান দিতে চাহিবে, তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে ততজন ভিক্ষু দিবেন।

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্রা বৃদ্ধা রমণী একজন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত

---

[১]। সৈন্ধব-সিন্ধুদেশজ অশ্ব; যে কোন উৎকৃষ্ট অশ্ব। কুণ্ডককুক্ষি—যে কুঁড়া খাইয়া পুষ্ট হইয়াছে।

[২]। যে ভিক্ষু কাঁসর বা ঘণ্টা বাজাইয়া ধর্ম্মদেশনার সময় বিজ্ঞাপন করে।

করিয়াছিল। সে ঊষাকালে ধর্ম্মঘোষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমায় একজন ভিক্ষু দিন।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি নগরবাসীদিগের প্রার্থনামত তাহাদের মধ্যে ভিক্ষু বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; কাজেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমি ত সমস্ত ভিক্ষুই বিলি করিয়া দিয়াছি; তবে স্থবির সারিপুত্র এখনও বিহারে আছেন; তুমি তাঁহাকে ভিক্ষা দাও গিয়া।" ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া জেতবনের দ্বার কোষ্ঠকের নিকট স্থবিরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সারিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া আসনে বসাইল।

অনেক বহু-শ্রদ্ধান্বিত গৃহস্থ শুনিতে পাইলেন যে এক বৃদ্ধা নাকি ধর্ম্মসেনাপতিকে লইয়া নিজের গৃহে উপবেশন করাইয়াছে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও এ কথা শুনিলেন এবং বৃদ্ধার নিকট একখানি শাটক, সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটি স্থবিকা ও বহুবিধ খাদ্য প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, স্থবিরকে পরিবেষণ করিবার সময় আর্য্যা যেন এই শাটক পরিধান করেন এবং এই সহস্র কার্ষাপণ ব্যয় করেন।" রাজার দেখাদেখি অনাথপিণ্ডদ, খুল্ল অনাথপিণ্ডদ এবং মহোপাসিকা বিশাখাও বৃদ্ধার নিকট ঐরূপ উপহার পাঠাইলেন; অন্যান্য গৃহস্থ স্ব স্ব সাধ্যানুসারে কেহ একশত, কেহ দ্বিশত কার্ষাপণ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে একদিনেই সেই বৃদ্ধা শতসহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইল।

স্থবির সারিপুত্র বৃদ্ধাদত্ত যাগূ পান করিলেন, খাদ্য ও পক্কান্ন আহার করিলেন এবং অনুমোদনান্তে তাহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, ধর্ম্মসেনাপতি এই বৃদ্ধা গৃহপত্নীর দৈন্য দূর করিলেন, তিনিই এই দরিদ্রার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন; তিনি তৎপ্রদত্ত খাদ্যগ্রহণে ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মেই এই বৃদ্ধার আশ্রয় হইয়াছেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া তৎপ্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উত্তরাপথে এক বণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উত্তরাপথ হইতে পঞ্চশত অশ্ববণিক বারাণসীতে গিয়া অশ্ব বিক্রয় করিত।

একদা এক অশ্ববণিক্ পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীর অভিমুখে যাইতেছিল। পথে বারাণসীর অনতিদূরে এক নিগমগ্রাম[১] ছিল। সেখানে পূর্ব্বে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার প্রকাণ্ড বাসভবনটি ছিল; কিন্তু বংশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র বৃদ্ধা রমণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধাই তখন উক্ত প্রাসাদে বাস করিতেন। অশ্ববণিক্ এই নিগমগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাড়ী ভাড়া লইল এবং অশ্বগুলিকে একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই তাহার অশ্বদিগের মধ্যে এক আজানেয়ী অশ্বিনী শাবক প্রসব করিল। কাজেই বণিক্‌কে আরও দুই তিন দিন সেখানে থাকিতে হইল। অনন্তর সে রাজদর্শনার্থ যাত্রা করিল। তাহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "ঘরভাড়া দিলে না?" "দিচ্ছি, মা।" "ভাড়া দিবার সময় আমাকে এই অশ্বশাবকটা দাও এবং ভাড়া হইতে উহার দাম কাটিয়া লও।" বণিক্ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা অশ্বশাবকটিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং ভাত, কুঁড়া, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দিত, এই সকল খাওয়াইয়া তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত অশ্বসহ বারাণসীতে যাইবার সময় ঐ বাড়ীতেই বাসা লইলেন; কিন্তু কুণ্ডকখাদক সৈন্ধব অশ্বপোতকের গন্ধ পাইয়া তাঁহার একটি অশ্বও ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ বাড়ীতে কোন ঘোড়া আছে কি?" বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, আর কোন ঘোড়া নাই; কেবল একটা বাচ্চা আছে; আমি তাহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় পুষিতেছি।" "সে বাচ্চাটা কোথায়, মা?" চরিতে গিয়াছে, বাবা।" "কখন ফিরিবে?" "শীগ্‌গিরই ফিরিবে।"

বোধিসত্ত্ব ঐ অশ্বশাবকের আগমন-প্রতীক্ষায় নিজের অশ্বগুলিকে বাহিরে রাখিয়াই বসিয়া রহিলেন। এ দিকে সৈন্ধব-পোতকও চরিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। বোধিসত্ত্ব সেই কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব-পোতককে দেখিয়া লক্ষণসমূহ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'এই অশ্বশাবক মহার্ঘ রত্ন; বৃদ্ধাকে মূল্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে।'

এ দিকে সৈন্ধব-পোতক গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল এবং তখনই বোধিসত্ত্বের অশ্বগুলিও প্রবেশ করিতে পারিল।

বোধিসত্ত্ব দুই তিন দিন বৃদ্ধার গৃহে অবস্থিতি করিয়া অশ্বগুলির ক্লান্তি অপনোদন করিলেন এবং যাত্রা করিবার সময় বলিলেন, "মা, আপনি দাম

---

[১]। Market-town. যে শহরে ক্রয়-বিক্রয়াদির জন্য হাট বসে।

লইয়া এই বাচ্চাটা আমার নিকট বেচুন।" বৃদ্ধা বলিলেন, "বল কি বাবা! ছেলে কি বেচিতে আছে?" "মা, আপনি ইহাকে কি খাওয়াইয়া পুষিতেছেন?" "আমি ইহাকে ভাত, কাঁজি, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দেয়, এই সকল দ্রব্য খাইতে দিই এবং কুঁড়ার (বা ক্ষুদের) যাউ রান্ধিয়া তাহা পান করাই। এইভাবে ইহাকে পুষিয়া আসিতেছি, বাবা।" "মা, আমি ইহাকে পাইলে খুব ভাল ভাল খাবার দিব; এ যেখানে থাকিবে তাহার উপর চান্দোয়া খাটাইব, ইহার শুইবার ও দাঁড়াইবার জায়গায় আস্তরণ দিব।" "তা যদি কর, তাহা হইলে আমার বাছা সুখে থাকুক, তুমি ইহাকে লইয়া যাও।"

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বপোতকের পদচতুষ্টয়, লাঙ্গুল ও মুখের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মূল্য স্থির করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ষট্‌সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বৃদ্ধাকে নববস্ত্রে ও আভরণে সুসজ্জিত করিয়া অশ্বপোতকের সম্মুখে অবস্থিত করাইলেন। সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বৃদ্ধার দিকে তাকাইল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও তাহার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি এতদিন যে তোমাকে পুষিয়াছিলাম, তাহার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পাইয়াছি; তুমি বাছা, এখন ইঁহার সঙ্গে যাও।" অনন্তর সেই অশ্বপোতক (বোধিসত্ত্বের সঙ্গে) চলিয়া গেল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "দেখা যাউক, এই অশ্বপোতক নিজের বল জানে, কি না জানে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি উহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া দ্রোণে রাখিয়া দিলেন এবং তাহার মধ্যে কুণ্ডক যাগূ ছড়াইয়া উহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু অশ্বপোতক স্থির করিল, 'আমি এ খাদ্য খাইব না।' কাজেই সে ঐ যাগূ পান করিতে চাহিল না। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

অন্যের উচ্ছিষ্ট তৃণ, অথবা কুণ্ডক, ফেন,
খাদ্য তব ছিল এত দিন;
তবে কেন নাহি খাও দিয়াছি যা খেতে আজ?
নহে এ ত কোন অংশে হীন।

ইহা শুনিয়া সৈন্ধব পোতক নিম্নলিখিত দুইটি গাথা বলিল:

কুল, শীল অবিদিত যেখানে তোমার,
ফেন, কুঁড়া পেলে হয় প্রচুর আহার।
জান তুমি এবে মোরে, আমি হয়োত্তম,
জানি আমি, জান তুমি, এই হেতু মম
কুঁড়া আর ফেন খেতে ইচ্ছা নাহি হয়;
আর না খাইব ইহা, শুন মহাশয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমার পরীক্ষার জন্য এরূপ

করিয়াছিলাম; তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।” অনন্তর তিনি অশ্বশাবকটিকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাওয়াইলেন, রাজাঙ্গণে গিয়া একপার্শ্বে পঞ্চশত অশ্ব রাখিলেন, এবং অপর পার্শ্বে বিচিত্র পর্দ্দা খাটাইয়া, মাটির উপর গালিচা বিছাইয়া ও উপরে চান্দোয়া তুলিয়া সেখানে সৈন্ধব-পোতককে রাখিলেন। রাজা আসিয়া অশ্ব দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসিলেন, “এই ঘোটকটিকে পৃথক রাখা হইয়াছে কেন?” বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, “মহারাজ, এই ঘোটকটি সৈন্ধব; ইহাকে অন্য অশ্ব হইতে পৃথক না রাখিলে এ তাহাদিগকে এখনই বন্ধনমুক্ত করিয়া বিদূরিত করিবে।” “ঘোটকটি দেখিতে ভাল ত?” “হাঁ, মহারাজ।” “তবে উহা কিরূপ বেগে চলিতে পারে দেখিতে হইবে।”

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বটিকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, রাজাঙ্গণে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন এবং “দেখুন, মহারাজ” বলিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। ঘোড়াটা এমন বেগে ছুটিতে লাগিল, যে বোধ হইল সমস্ত রাজাঙ্গণ যেন এক নিরন্তর অশ্বপঙ্ক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, “মহারাজ, সৈন্ধব অশ্বপোতকের বেগ দেখুন।” তিনি তাহাকে এমনভাবে ছুটাইলেন যে, সমবেত লোকের কেহই তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। তাহার পর তিনি অশ্বের উদর রক্তবস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ছুটাইলেন; লোকে কেবল রক্তবস্ত্রখানিই দেখিতে লাগিল।

নগরের মধ্যে কোন উদ্যানে একটা পুষ্করিণী ছিল। বোধিসত্ত্ব অশ্বটিকে সেখানে লইয়া জলের পৃষ্ঠে ছুটাইলেন। অশ্ব এমন সুকৌশলে ধাবিত হইল যে, তাহার ক্ষুরাগ্র পর্য্যন্ত ভিজিল না। তাহার পর সে পদ্মপত্রের উপর দিয়া ছুটিল; কিন্তু একটি পদ্মপত্রও তাহার ভারে জলমগ্ন হইল না।

এইরূপে অশ্বের অদ্ভুত বেগ প্রদর্শন করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং করতালি দিয়া এক হস্ত প্রসারিত করিলেন। অশ্ব অমনি পদচতুষ্টয় একত্র করিয়া তাঁহার হস্ততলে দণ্ডায়মান হইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, এই অশ্বপোতকের সর্ব্ববিধ বেগপ্রদর্শনার্থ আসমুদ্র ধরাতলও পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র নহে।” রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন; সৈন্ধবপোতককেও নিজের মঙ্গলাশ্বের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সৈন্ধব-পোতক রাজার সাতিশয় প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইল; রাজা তাহার সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহার বাসগৃহ রাজার নিজের বাসগৃহের ন্যায় অলঙ্কৃত হইল; চতুর্জাতীয় গন্ধ দ্বারা[১] উহার ভূমি লেপন

---

[১]। সংস্কৃত সাহিত্যে দশবিধ গন্ধের উল্লেখ দেখা যায়—ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, নির্হারী,

করা হইত; প্রাচীরগুলি পুষ্পমালাদি দ্বারা পরিশোভিত হইত; ঊর্দ্ধদেশে সুবর্ণ তারকা-খচিত চন্দ্রাতপ শোভা পাইত; ফলতঃ চতুর্দ্দিকেই ইহা বিচিত্র পটমণ্ডপের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। উহাতে প্রতিদিন গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলিত; অশ্বের মলমূত্রত্যাগের স্থানে সুবর্ণস্থালী রক্ষিত হইত; আহারের জন্য প্রত্যহ রাজভোগের আয়োজন হইত। ইহার আগমনকাল হইতেই সমস্ত জম্বুদ্বীপ রাজার করতলগত হইল। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের **সমবধান** করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী হইলেন।

সমবধান : তখন এই বৃদ্ধাই ছিল সেই বৃদ্ধা; সারিপুত্র ছিলেন সেই সৈন্ধব-পোতক; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই অশ্ববণিক।]

----

২৫৫. শুক-জাতক

[এক ভিক্ষু অতি-ভোজনহেতু অজীর্ণ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জেতবনে অবস্থিতি-কালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় ঐ ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নিজের কুক্ষিপ্রমাণ না বুঝিয়া অতি ভোজন করিয়াছিলেন এবং জীর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, অতীত জন্মেও এই ব্যক্তি অতি-ভোজনবশত প্রাণ হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে শুক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিমবন্তের সমুদ্রাভিমুখী পার্শ্বস্থ সহস্র সহস্র শুকের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল। যখন পুত্রটি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবল হইল, তখন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিশক্তি বড় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। শুকেরা বড় শীঘ্রগামী; সেইজন্যই বোধ হয় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাহাদের চক্ষু দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যাহা হউক, বোধিসত্ত্বের পুত্র মাতাপিতাকে

সংহত, স্নিগ্ধ, রূক্ষ, বিশদ, অম্ল।

কুলায়ে রাখিয়া নিজেই চরায় যাইত এবং তাঁহাদিগের পোষণ করিত। সে একদিন গোচরভূমিতে গিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি দ্বীপ দেখিতে পাইল। সেই দ্বীপে সুবর্ণবর্ণ-মধুরফলবিশিষ্ট আম্রবন ছিল। পরদিন গোচরবেলায় সে উড়িয়া গিয়া সেই আম্রবনে অবতরণ করিল, আম্ররস পান করিল এবং আম্রফল লইয়া মাতাপিতাকে দিল। বোধিসত্ত্ব তাহা খাইবার সময় রস আস্বাদন করিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন,“বাবা, ইহা না অমুক দ্বীপের আম।” তাহার পুত্র বলিল “হাঁ বাবা।” “দেখ বাবা, যে সকল শুক ঐ দ্বীপে যায়, তাহারা বেশী দিন বাঁচে না। তুমি আর কখনও ঐ দ্বীপে যাইও না।” কিন্তু পুত্র পিতার উপদেশ কর্ণপাত না করিয়া সেখানে যাইতে লাগিল।

অনন্তর এক দিন সে ঐ দ্বীপে গিয়া বহু আম্ররস পান করিল এবং মাতাপিতার জন্য ফল লইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া আসিবারকালে গুরুভারজনিত ক্লান্তিবশত নিদ্রাভিভূত হইল। সে নিদ্রিত অবস্থাতেই উড়িতে লাগিল; কিন্তু তুণ্ডে যে ফলটি লইয়া যাইতেছিল, তাহা পড়িয়া গেল। ক্রমে সে অভ্যস্ত পথ হইতে সরিয়া পড়িল, নিম্নগামী হইয়া উদকপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল, এবং শেষে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। তখন একটি মৎস্য তাহাকে খাইয়া ফেলিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন, তাহার আগমনকাল অতীত হইয়াছে, অথচ সে ফিরিয়া আসিল না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সে সমুদ্রে পড়িয়া মারা গিয়াছে। অতঃপর সেই অদূরদর্শী শুক-পোতকের মাতাপিতাও আহারাভাবে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

বুঝি নিজ পরিমাণ যতদিন বিহঙ্গম
করেছিল আহার গ্রহণ,
হারায় নি পথ কভু, মাতা পিতা, উভয়ের
করেছিল ভরণ পোষণ।
কিন্তু যবে লোভবশে বহুতর আম্ররস
উদরস্থ করিল দুর্মতি,
তখনি দুর্ব্বল হয়ে ডুবিল সাগর জলে;
অমিতাচারীর এই গতি!
মিতাচার সুখাবহ, মিতাহার স্বাস্থ্যকর;
অমিতাচারেতে বলক্ষয়;
মিতাহারী, মিতাচারী সুখে তাকে চিরদিন

হয় তার বল-উপচয়।[১]

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ হইল।

সমবধান : তখন এই অতিভোজী ভিক্ষু ছিল সেই শুকরাজপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

২৫৬. জরুদপান-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল বণিক নাকি একদা শ্রাবস্তীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত শকটে পুরিয়াছিল এবং বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার সময় তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বহুদান দিয়াছিল, ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়াছিল, শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা বাণিজ্যার্থ দূর পথ অতিক্রম করিব। পণ্যদ্রব্যগুলি

---

[১]। টীকাকার এই গাথাগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

আর্দ্র, শুষ্ক যেই দ্রব্য করিবে আহার,
সাবধানে সদা যেন হও মিতাচার।
মিতাহারী, লঘু সদা উদয় যাহার,
হয় সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভিক্ষু সদাচার।
চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস করিয়া ভোজন,
তার পর জল খেয়ে কর সমাপন।
নিষ্ঠাবান ভিক্ষুপক্ষে পর্য্যাপ্ত ইহাই।
মিতাহারে চিরদিন সুখেতে কাটাই।
মিতাহারগুণ সদা করিয়া স্মরণ,
মিতাহারে যেই করে জীবন যাপন,
রোগের যন্ত্রণা তারে না হয় ভুঞ্জিতে
শীঘ্র আসি জরা তারে না পারে গ্রাসিতে।
আয়ুর্বৃদ্ধি হয় তার মিতাহার গুণে;
অতএব মিতাহারী হও সর্ব্বজনে।

ইহার সঙ্গে মনু ২।৫৭

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ"

এই বচন তুলনীয়

[২] জর (পুরাতন) + উদদান (কূপ)।

বিক্রয় করিয়া যদি সফলকাম হই, এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনার অর্চ্চনা করিব।” অনন্তর তাহারা গন্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছিল।

একদিন তাহারা এক কান্তার অতিক্রম করিবার সময় একটা পুরাতন কূপ দেখিতে পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, “এই কূপের জল নাই; আমরা কিন্তু পিপাসায় কাতর হইয়াছি। এস, ইহা খনন করা যাউক।” অনন্তর তাহারা খনন আরম্ভ করিল এবং একে একে লৌহ হইতে বৈদুর্য্য পর্য্যন্ত বহুবিধ খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল রত্নদ্বারা শকটগুলি পূর্ণ করিল এবং নিরাপদে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেল। সেখানে আনীত ধন যথাস্থানে রক্ষিত করিয়া তাহারা স্থির করিল, “আমরা যখন এরূপ লাভবান হইয়াছি, তখন ভিক্ষুদিগকে ভূরিভোজন করাইতে হইবে”। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিল, তাঁহাকে বহু ধন দান করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া, যেরূপে ধনলাভ করিয়াছিল তাহা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “উপাসকগণ, তোমরা লব্ধধনে সন্তুষ্ট হইয়াছ; তোমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল না; এই জন্য তোমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ধনপ্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। পুরাকালে কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। অনন্তর তিনি উক্ত উপাসকদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর একজন প্রসিদ্ধ সার্থবাহ হইয়াছিলেন। তিনি একদা বারাণসীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শকটপূর্ণ করিয়াছিলেন, বহু বণিক সঙ্গে লইয়া, তোমরা যে কান্তারের কথা বলিলে, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তোমরা যে কূপের কথা বলিলে, সেই কূপ, দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেখানে বণিকেরা জল পান করিবার আশায় উক্ত কূপ খনন করিতে করিতে একে একে বৈদুর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত রত্ন পাইয়াও তাহাদের সন্তোষ জন্মে নাই; তাহারা ভাবিয়াছিল আরও নিম্নে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর রত্ন নিহিত আছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ভূয়োভূয়ঃ খনন করিয়াছিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, “বণিকগণ, লোভই লোকের বিনাশমূল। আমরা বহুধন লাভ করিয়াছি; ইহাতেই সন্তুষ্ট হও, আর খনন করিও না।” কিন্তু তাহারা নিষেধসত্ত্বেও ক্রমাগত খনন করিতে লাগিল। ঐ কূপের নিম্নে এক নাগরাজ বাস করিতেন। খননের জন্য যখন নাগরাজের বিমান ভগ্ন হইল এবং ঊর্দ্ধ হইতে লোষ্ট্র ও ধূলি পড়িতে

লগিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাত দ্বারা বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সকলকে নিহত করিলেন। অনন্তর তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শকটগুলিতে বলদ যুতিলেন ও রত্ন বোঝাই করিলেন, বোধিসত্ত্বকে একখানি সুন্দর যানে বসাইলেন, নাগবালকদিগের দ্বারা শকটগুলি চালাইলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে সমস্ত ধন যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব এমনভাবে দান করিতে লগিলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন রহিল না। তিনি শীলসমূহ রক্ষা করিতেন এবং পোষধ ব্রত পালন করিতেন। এই নিমিত্ত জীবনাবসানে তিনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

উদকার্থে পুরাতন করিয়া কূপ খনন
পেয়েছিল বণিকের দল
লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা বহু,
বৈদুর্য্য রতন সমুজ্জ্বল।
এত পেয়ে কিন্তু, হায়, সন্তুষ্ট না হ'ল তারা,
ভূয়োভূয়ঃ করিল খনন;
সেই হেতু আশীবিষে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ি
লোভীদের করিল নিধন।
খোড় তাহে ক্ষতি নাই, অতি খোঁড়া কিন্তু, ভাই,
অমঙ্গল করে সঙ্ঘটন;
খুঁড়িয়া লভিল ধন; অতি খুঁড়ি মূর্খগণ
ধন প্রাণ করে বিসর্জ্জন।

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই প্রসিদ্ধ সার্থবাহ।]

☞ অতিলোভের পরিণামসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত সিদ্ধিবর্ত্তি-চতুষ্টয়ের কথা তুলনীয় (অপরীক্ষিতকারকম্-২)।

---

২৫৭. গ্রামণীচণ্ড-জাতক

[শাস্তা জেতবনে প্রজ্ঞাপ্রশংসা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের প্রজ্ঞার প্রশংসা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, “অহো! তথাগতের কি মহীয়সী প্রজ্ঞা। ইহা যেমন

বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী; যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা; ফলতঃ তিনি প্রজ্ঞাবলে ভূলোক ও স্বর্লোক, উভয় লোককেই অতিক্রম করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত কেবল এ জন্ম নহে, অতীত জন্মেও প্রজ্ঞাবান ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :][১]

* * *

পূর্ব্বকালে যখন জনসন্ধ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সুপরিমার্জ্জিত কাঞ্চনময় মুকুটের ন্যায় অতীব নিষ্কলঙ্ক ও শোভাসম্পন্ন ছিল বলিয়া নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "আদর্শমুখ কুমার"।

বোধিসত্ত্বের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখনই তিনি পিতার যত্নে বেদত্রয়ে ও সর্ব্ববিধ লৌকিক কর্ত্তব্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা জনসন্ধের মৃত্যু হইল; অমাত্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদীয় স্বর্গকামনায় বিস্তর দান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই কুমার নিতান্ত শিশু; ইহাকে কিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে? অভিষেকের পূর্ব্বে ইহাকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।"[২] ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একদিন সুসজ্জিত করিলেন, বিচারালয় সুসজ্জিত করিলেন, সেখানে কুমারের উপবেশনার্থ একখানি পল্যঙ্ক রাখিয়া দিলেন এবং কুমারকে গিয়া বলিলেন, "আপনাকে একবার বিচারালয়ে যাইতে হইবে।" "বেশ, যাইতেছি" বলিয়া কুমার বহু অনুচরসহ বিচারগৃহে গিয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

কুমার বিচারাসনে আসীন হইলে অমাত্যেরা এক মর্কটকে বাস্তুবিদ্যাচার্য্যের[৩] বেশ পরাইয়া ও দুই পায়ে হাঁটাইয়া তাঁহার নিকট আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময়ে এই ব্যক্তি বাস্তুবিদ্যাচার্য্য

---

[১]। এই ভূমিকার সহিত উন্মার্গ-জাতকের (৫৪৬) ভূমিকা তুলনীয়।

[২]। ইহা হইতে বুঝা যায়, পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজপদ সর্ব্বত্র পুরুষানুক্রমিক ছিল না; মৃত রাজার বংশধর অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অযোগ্য হইলে মন্ত্রীরা অপর কাহাকেও রাজা করিতে পারিতেন। অন্য কোন কোন জাতকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

[৩]। বাস্তুবিদ্যা—যে বিদ্যার বলে বাস্তু ভূমির দোষগুণ বলা ও শল্যোদ্ধার করা যাইতে পারে।

ছিলেন। বাস্তুবিদ্যায় ইঁহার এমন নৈপুণ্য যে ইনি ভূপৃষ্ঠের সাত হাত[১] নীচে কোন দোষ থাকিলেও তাহা দেখিতে পান। ইনি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেই খানেই রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মিত হয়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে কোন পদে নিযুক্ত করুন।"

কুমার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, "এ মনুষ্য নহে, মর্কট; অন্যে যাহা প্রস্তুত করে, মর্কটেরা তাহার বিনাশ করিতে জানে, কিন্তু যাহা কেহ করে নাই, তাহা সম্পন্ন করিতে বা বিচার করিয়া দেখিতে মর্কটের সাধ্য নাই।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :

বাস্তুবিদ্যা-সুনিপুণ এ নহে নিশ্চয়,
লোভী বলিমুখ[২] এই, শুন, মহাশয়।
ভাঙ্গিতে নিপুণ বড়, গড়িতে না পারে,
মর্কট-চরিত্র এই বিদিত সংসারে।

অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে।" অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু দুই তিন দিন পরে তাহাকেই পুনর্ব্বার সাজাইয়া বিচারালয়ে আনিয়া বলিলেন, "কুমার, এই ব্যক্তি আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় বিনিশ্চয়ামাত্য[৩] ছিলেন এবং অর্থি-প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন। ইহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচারকার্য্যে আপনার সহায় করিয়া লউন।" কুমার আগন্তুককে দেখিয়া ভাবিলেন, 'চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ও হিতাহিত-জ্ঞানবিশিষ্ট মানব কখনও এরূপ লোমশ হইতে পারে না; এই চিত্তবৃত্তিহীন বানর কি বিনিশ্চয়-কার্য্যে নিপুণ হইতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

এরূপ লোমশ দেহে বুদ্ধি কি সম্ভবে?
বিশ্বাস এমন জীবে কে করেছে কবে?
শুনেছি পিতার ঠাঁই, বানরের বুদ্ধি নাই,
এও সেই বুদ্ধিহীন বানর নিশ্চয়;
কেন প্রতারণা মোরে কর, মহাশয়?

এই গাথা শুনিয়াও অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন,

---

১। মূলে 'সপ্তরতন' এই পদ আছে। রতন = সংস্কৃত 'রত্নি' বা 'অরত্নি'—কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একহাত কিংবা একমুট হাত।

২। বলিমুখ = মর্কট।

৩। বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (জজ)।

হয় ত তাহাই সত্য।” তাঁহারা সেদিনও সেই মর্কটকে বিচারালয় হইতে লইয়া গেলেন; কিন্তু আর এক দিন তাহাকেই পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, “কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় এই ব্যক্তি মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে আশ্রয় দিন।” কুমার কিন্তু তাহাকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, মর্কটেরা অস্থিরচিত্ত; তাহারা কি মাতাপিতার সেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে?’ এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

দশরথ[১] পিতা মম, শুনেছি তাঁহার মুখে
মর্কট চঞ্চলমতি; সে কভু না রাখে সুখে
পিতা, মাতা, ভাই, বোনে, কিম্বা জ্ঞাতি বন্ধুজনে;—
করে না কখন(ও) কার(ও) ইষ্টের সাধন;
মর্কট-প্রকৃতি এই জানে সর্ব্বজন।

অমাত্যেরা এবারেও বলিলেন, “আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব নহে।” অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে সরাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমাদের কুমার, দেখিতেছি, বিলক্ষণ বুদ্ধিমান; ইনি নিশ্চিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।’ এই স্থির করিয়া তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং “আদর্শকুমার রাজা হইয়াছেন, তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন কর” এই কথা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হইল। নিম্নলিখিত চৌদ্দটি প্রশ্নের উত্তরদান হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় :

গো, শিশু, ঘোটক, ডোম,[২] গ্রামের মণ্ডল,
গণিকা, তরুণী, সর্প, মৃগ—এ সকল,
তিত্তির, দেবতা, নাগ, তাপসের দল,
ব্রাহ্মণবালক—এই চৌদ্দ প্রশ্নস্থল।

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ-সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

বোধিসত্ত্ব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতপূর্ব্ব রাজা জনসন্ধের গ্রামণীচণ্ড নামক এক ভৃত্য বিবেচনা করিয়াছিল, ‘রাজকার্য্যে রাজার সমবয়স্ক লোক নিযুক্ত হইলেই শোভা পায়; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; ঈদৃশ অল্পবয়স্ক রাজার ভৃত্য হইয়া

---

[১]। ইহা জনসন্ধের নামান্তর।

[২]। মূলে ‘নলকার’ এই পদ আছে।

থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, অতএব জনপদে গিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।' এই অভিপ্রায়ে গ্রামণীচণ্ড রাজধানী হইতে তিন যোজন দূরে এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু ভূমিকর্ষণের জন্য তাহার গরু ছিল না। কাজেই, যখন বৃষ্টি হইল, তখন সে এক বন্ধুর বাড়ি হইতে দুইটি গরু চাহিয়া আনিল, সমস্ত দিন ভূমি কর্ষণ করিল এবং বিকালবেলা গরু দুইটিকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য বন্ধুর গৃহে গমন করিল। বন্ধু তখন তাহার স্ত্রীর সহিত ঘরের মধ্যে বসিয়া ভাত খাইতেছিল। গোশালা গরু দুইটার জানা ছিল; তাহারা আপনা হইতেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন গরু দুইটা গোশালায় প্রবেশ করিল, তখন গ্রামণীচণ্ডের বন্ধু তাহার থালা তুলিয়া আহার করিতেছিল এবং বন্ধুপত্নী ভোজন শেষ করিয়া তাহার থালা নামাইয়া রাখিতেছিল। তাহারা গ্রামণীচণ্ডকে আহার করিতে আহ্বান করিল না দেখিয়া সে "এই তোমাদের গরু ফিরাইয়া দিলাম" এরূপ কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল। অতঃপর রাত্রিকালে চোর আসিয়া গোশালা[১] হইতে গরু দুইটা অপহরণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামণীর বন্ধু গোশালা শূন্য দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে গরু চুরি গিয়াছে; তথাপি সে সঙ্কল্প করিল, গ্রামণীর নিকট হইতেই ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। অনন্তর সে গ্রামণীর নিকট গিয়া বলিল, "আমার গরু ফিরাইয়া দাও।" গ্রামণী বলিল, "বাঃ! গরু যে তোমার গোহালেই রহিয়াছে!" "তুমি কি গরু দুইটি আমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিয়াছ?" "না, আমি তোমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিই নাই।" "তবে, এই দেখ রাজার দূত উপস্থিত; এস রাজার কাছে যাই। (সে দেশে এই প্রথা ছিল যে, লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপরা তুলিয়া বলিত, 'এই দেখ রাজার দূত; এস, রাজার নিকট যাই।' এই কথা শুনিয়া যদি কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। সুতরাং) "রাজদূত" এই শব্দ শুনিয়া গ্রামণী ঐ ব্যক্তির সহিত যাত্রা করিল।

গ্রামণী তাহার অভিযোক্তার সহিত রাজদ্বারাভিমুখে যাইবার সময় এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার এক বন্ধু বাস করিত। গ্রামণী বলিল "দেখ, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে; তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি গ্রামের ভিতর গিয়া কিছু খাইয়া আসি।" গ্রামণী তাহার বন্ধুর গৃহে গেল, কিন্তু তাহার বন্ধু তখন বাড়ীতে ছিল না। বন্ধুর স্ত্রী বলিল, "রান্ধা ভাত নাই; আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, এখনই ভাত রান্ধিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া সে যেমন

---

[১]। মূলে 'বজ' পদ আছে। বজ = ব্রজ।

তাড়াতাড়ি চাউল আনিবার জন্য মাচায় উঠিতে গেল, অমনি পদস্খলন হওয়ায় মাটিতে আছাড় পড়িল। সে সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। অকস্মাৎ পতনের জন্য তখনই তাহার গর্ভস্রাব হইল। তাহার স্বামীও ঠিক সেই সময় গ্রামণীকে ধরিয়া বলিল, "তুমিই প্রহার করিয়া আমার স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটাইয়াছ; এই দেখ রাজার দূত; চল তোমাকে রাজার নিকট লইয়া যায়।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিল। গ্রামণী এখন দুই জনের বন্দী; একজন তাহার অগ্রে ও একজন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া চলিতে লাগিল।

ইহার পর তাহারা আর একটা গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা বাগ না মানিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, সহিস কিছুতেই উহাকে থামাইতে পারিল না। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "চণ্ড মামা, যা তা কিছু একটা দিয়া মারিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাইয়া দাও ত।" গ্রামণী একখানা পাথর লইয়া ছুড়িল; ইহা ঘোড়াটার পায়ে গিয়া লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভেরেণ্ডার কাঠ যেমন সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, পাথরের চোটে ঘোড়ার পাখানিও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া গেল।" তাহা দেখিয়া সহিস বলিল, "কল্লে কি মামা, ঘোড়াটার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! এই দেখ রাজার দূত।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে ধরিয়া রাজদ্বারে চলিল।

একে একে তিনজনের হাতে বন্দী হইয়া গ্রামণী চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহারা ত আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল; আমি গরুর দাম দিতে পারিব না; গর্ভপাতের জন্য যে দণ্ড হইবে তাহা দেওয়া ত একেবারেই অসাধ্য; ঘোড়ার দামই বা পাইব কোথা? আমার পক্ষে এখন মরণই মঙ্গল।' এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইবার সময় সে পথের পার্শ্বে একটা বন এবং ঐ বনের এক পার্শ্বে প্রপাতযুক্ত একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইল। প্রপাতের নিম্নে ছায়ায় বসিয়া দুইজন নলকার মাদুর বুনিতেছিল; তাহাদের একজন পিতা এবং একজন পুত্র।

গ্রামণী বলিল, "বড় বাহ্যে পেয়েছে; তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" অনন্তর সে পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রপাতের উপর হইতে (আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে) লম্ফ দিল; কিন্তু ভূতলে না পড়িয়া, নলকারদিগের মধ্যে যে পিতা, তাহার পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। সেই এক আঘাতেই বৃদ্ধ নলকারের জীবনান্ত হইল; গ্রামণী উঠিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। মৃত নলকারের পুত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "দুরাত্মা, তুই আমার পিতাকে মারিয়া ফেলিলি! এই দেখ, তোর জন্য রাজদূত উপস্থিত।" ইহা বলিয়া সে গ্রামণীর হাত ধরিয়া গুল্মের ভিতর হইতে বাহির হইল। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হে, কি হইয়াছে?" নলকারপুত্র উত্তর দিল, "আর কি হইবে; এই পাপিষ্ঠ আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।"

এখন হইতে চারিজন অভিযোক্তা গ্রামণীকে বেষ্টন করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা অপর এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানকার মণ্ডল গ্রামণীচণ্ডকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "বটে, আজ তুমি রাজার সহিত দেখা করিবে? আমি রাজার নিকট একটি কথা বলিয়া পাঠাইতে চাই; তুমি বলিবার ভার লইবে কি?" "লইব না কেন? কি কথা বল।" "দেখ, আমি স্বভাবতঃ সুশ্রী; এবং এতকাল ধনবান, যশোবান ও অরোগ ছিলাম; কিন্তু এখন আমার দুরবস্থা এবং আমি পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছি। তুমি রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। রাজা শুনিয়াছি সুপণ্ডিত; তিনি তোমায় যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় তাহা আমায় জানাইবে।" গ্রামণী ''যে আজ্ঞা" বলিয়া মণ্ডলের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অন্য একটি গ্রামের নিকট এক গণিকা গ্রামণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজাকে দেখিতে।" ''রাজা না কি বড় পণ্ডিত; আমার হইয়া তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে কি? পূর্ব্বে আমার বহু লাভ হইত; কিন্তু এখন যাহা পাই তাহাতে পানের খরচটা পর্য্যন্ত চলে না। এখন আমার কাছে কেহই আসে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসিবে, ইহার কারণ কি। তিনি ইহার যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় আমায় বলিয়া যাইও।"

সম্মুখের আর এক গ্রামে গ্রামণী এক তরুণীকে দেখিতে পাইল। তরুণীও গ্রামণীকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল যে সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "দেখ, আমি স্বামীগৃহেও থাকিতে পারি না, পিতৃগৃহেও থাকিতে পারি না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় জানাইবে।"

অতঃপর গ্রামণীর সহিত এক সর্পের দেখা হইল। ঐ সর্প রাজপথের পার্শ্বস্থ একটা বল্মীকে বাস করিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামণী, তুমি কোথা যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "রাজা শুনিয়াছি বড় পণ্ডিত। তুমি তাঁহার নিকট আমার হইয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিও। আমি যখন আহার অন্বেষণে যাই, তখন ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত কৃশ থাকি; তথাপি বাহির হইবার সময় আমার দেহে সমস্ত গর্ত্ত পূরিয়া যায়; আমি অতি কষ্টে উহা টানিতে টানিতে বাহিরে আসি; কিন্তু আমি পরিতোষসহকারে আহার করিয়া আমার দেহ বেশ স্থূল হয়, তখন আমি অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করি, উহার কোন পাশই আমার গায়ে লাগে না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জানিয়া আমায় বলিবে।"

তাহার পর এক মৃগ গ্রামণীকে দেখিতে পাইল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "আমি কেবল একটা গাছের তলে যে তৃণ জন্মে তাহাই খাইতে পারি, অন্য কোন স্থানের তৃণে আমার রুচি হয় না। ইহার কারণ কি, তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অপর একস্থানে এক তিত্তির ছিল। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "দেখ, আমি কেবল একটা বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করিতে পারি; অন্যত্র শব্দ করিলে তাহা শ্রুতিকঠোর হয়। ইহার কারণ কি, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

গ্রামণীর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এক বৃক্ষ-দেবতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামণী, তুমি কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার কাছে।" "আমি পূর্ব্বে বিস্তর পূজা পাইতাম; এখন কেহ আমাকে পল্লবমুষ্টি পর্য্যন্ত দান করে না। রাজা না কি বড় পণ্ডিত; ইহার কারণ কি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অতঃপর এক নাগরাজের সহিত গ্রামণীর দেখা হইল। নাগরাজও পূর্ব্বৎ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে। তখন সে বলিল, "পূর্ব্বে এই সরোবরের জল মণিবৎ নির্ম্মল ছিল; এখন কিন্তু আবিল ও মণ্ডাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা না কি বড় পণ্ডিত; তুমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইতে হইতে গ্রামণী রাজধানী নিকটবর্ত্তী হইল। সেখানে এক উদ্যানে কতিপয় তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে, তখন তাহাকে বলিলেন, "এই উদ্যানে পূর্ব্বে প্রচুর মধুর ফল জন্মিত; কিন্তু এখন যে ফল হয়, তাহার না আছে রস, না আছে স্বাদ। রাজা না কি বড় পণ্ডিত; তুমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

কিন্তু এখনও গ্রামণী নিস্তার পাইল না; সে যখন নগরদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল এক গৃহে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র বসিয়া আছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ হে, চণ্ড!" চণ্ড উত্তর দিল, "রাজার নিকটে।" "তবে আমাদের একটা কাজের ভার লইয়া যাও। এত দিন আমরা যে পাঠ অভ্যাস করিতাম, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এখন যাহা পাঠ করি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, সমস্তই যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়; ঘট সচ্ছিদ্র হইলে তাহাতে যেমন জল থাকিতে পারে না, পঠিত বিষয়ও সেইরূপ আমাদের মনে তিষ্ঠিতে পারে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও, এরূপ হইবার কারণ কি?"

গ্রামণীচণ্ড এইরূপে চৌদ্দটি প্রশ্ন লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজা তখন বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। যাহার গরুচুরি গিয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে সেই ব্যক্তি গ্রামণীকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। রাজা গ্রামণীকে দেখিবামাত্রই

চিনিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই ব্যক্তি আমার পিতার পুরাতন ভৃত্য; আমাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, এ এতদিন কোথায় ছিল?’ অনন্তর তিনি গ্রামণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “কিহে, চণ্ড যে? তুমি এতদিন কেথায় ছিলে? তোমার ত বহুকাল দেখা পাই নাই। কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল।” গ্রামণী উত্তর করিল, “মহারাজ, আপনার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিবার পর হইতেই আমি জনপদে গিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এখন এই ব্যক্তির গরু চুরি গিয়াছে বলিয়া আমাকে রাজদূত দেখাইয়া আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছে।” “বেশ করিয়াছে; এরূপ ভাবে না আনিলে ত তুমি এখানে আসিতে না। এইরূপে আসিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। কৈ, সে লোক কোথায়?” “এই মহারাজ।” “তুমি কি সত্যই আমাদের চণ্ডকে দূত দেখাইয়া এখানে আনয়ন করিয়াছ?” “হ্যাঁ মহারাজ।” “কি কারণে আনিয়াছ?” “এ আমার গরু দুইটি দিতেছে না।” “কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?” “মহারাজ, একবার আমার কথাটা শুনিতে আজ্ঞা হউক।” ইহা বলিয়া চণ্ড, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত নিবেদন করিল। তখন রাজা অভিযোক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গরু দুইটা যখন গোশালায় প্রবেশ করে, তখন তুমি দেখিতে পাইয়াছিলে কি?” “না, মহারাজ।” “তুমি কি জাননা আমার নাম আদর্শমুখ? সত্য কথা বল, কিছু গোপন করিও না।” “গরু দুইটাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, মহারাজ।” “দেখ চণ্ড, তুমি গরু ফিরাইয়া দাও নাই বলিয়া এই ব্যক্তির নিকট দায়ী; এ ব্যক্তিও গরু দেখিয়াছে, অথচ বলিল ‘দেখি নাই’; অতএব জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সুতরাং তুমি ইহাকে গোমূল্য-স্বরূপ চব্বিশ কাহণ ক্ষতিপূরণ দাও এবং স্বহস্তে ইহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন কর।” এই আদেশ শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেই গো-স্বামীকে বাহিরে লইয়া গেল। সে ভাবিল, “চক্ষু দুইটিই যদি উৎপাটিত হইল, তবে কাহণগুলি লইয়া কি করিব।” সে গ্রামণীচণ্ডের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল “দোহাই তোমার, গ্রামণী; গরুর মূল্য চব্বিশ কাহণ তোমারই থাকুক; তাহা ছাড়া তুমি এই কাহণগুলিও গ্রহণ কর।’ ইহা বলিয়া সে গ্রামণীকে কতিপয় দিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় অভিযোক্তা বলিল, “মহারাজ, এই গ্রামণী আমার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহার গর্ভপাত ঘটাইয়াছে।” রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “এ কথা সত্য কি, গ্রামণী?” “বলিতেছি, মহারাজ, শ্রবণ করুন।” ইহা বলিয়া চণ্ড সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি প্রকৃতই ইহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিলে এবং সেই জন্য তাহার গর্ভপাত হইয়াছিল?” “না, মহারাজ, আমি প্রহারও করি নাই, গর্ভপাতও ঘটাই নাই।” তখন রাজা অভিযোক্তাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যে গর্ভপাত ঘটাইয়াছে, বলিতেছ, এখন তাহার কোন প্রতীকারের উপায় আছে কি?" সে বলিল, "এখন আর কি প্রতীকার করিব?" "তবে তুমি এখন কি চাও? "আমি একটি পুত্র চাই।" "শুন চণ্ড, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীকে নিজের গৃহে লইয়া যাও; তাহার গর্ভে যখন পুত্র জন্মিবে, তখন তাহাকে ইহার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" এই আদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চণ্ডের পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিল, "দোহাই তোমার, আমার সংসার ভাঙ্গিও না।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ন করিল।

তখন তৃতীয় অভিযোক্তা অগ্রসর হইয়া বলিয়া, "মহারাজ, চণ্ড আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য না কি?" চণ্ড উত্তর দিল, "মহারাজ, বলিতেছি শুনুন।" অনন্তর সে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া রাজা সেই সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গ্রামণীকে বলিয়াছিলে যে কিছু দ্বারা আঘাত করিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাও।" "না, মহারাজ, আমি এ কথা বলি নাই।" কিন্তু রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "হা, মহারাজ, আমি এ কথা বলিয়াছিলাম বটে।" "শুন চণ্ড, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, অথচ বলিল যে বলে নাই। এই মিথ্যা বাক্যের জন্য তুমি ইহার জিহ্বা ছেদন কর এবং আমার নিকট হইতে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া ইহার অশ্বের মূল্য দাও।" এই আদেশ শুনিয়া অশ্বের মূল্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সেই সহিস গ্রামণীকে নিজেই কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

পরিশেষে নলকারপুত্র অভিযোগ করিল, "মহারাজ এই দুরাত্মা আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি" হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?" চণ্ড বলিল, "মহারাজ, বলিতেছি, শুনুন।" অনন্তর সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে রাজা নলকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও?" সে বলিল, "মহারাজ, যাহাতে আমার পিতাকে পাই, তাহার উপায় করুন।" ইহাতে রাজা আদেশ দিলেন, "চণ্ড, এ ব্যক্তির একজন পিতার প্রয়োজন। অতএব তুমি ইহার মাতাকে লইয়া ঘরে যাও এবং ইহার পিতৃস্থানীয় হও।" ইহা শুনিয়া নলকার গ্রামণীকে বলিল, "দোহাই মহাশয়, আমার পিতৃসংসার ভাঙ্গিবেন না।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ণ করিল।

এবম্প্রকারে বিচারে বিজয়ী হইয়া গ্রামণীচণ্ড মহা পরিতোষ লাভ করিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। প্রশ্নগুলি বলিতে পারি কি?" "পারিবে না

কেন? এখনই বল।” তখন চণ্ড ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগের প্রশ্নটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য প্রশ্নগুলি একে একে প্রতিলোমক্রমে উত্থাপিত করিতে লাগিল; রাজাও সেগুলির যথাক্রমে উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, “পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগের বাসস্থানের নিকট এমন একটা কুক্কুট ছিল যে সে বেলা বুঝিয়া ডাকিত; তাহারা সেই ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অরুণোদয় পর্য্যন্ত বেদাভ্যাস করিত; কাজেই অধীত বিষয় তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু এখন সেখানে আর একটা কুক্কুট আসিয়াছে। সেটা অবেলায়—কখনও গভীর রাত্রিতে, কখনও বা অনেক বেলা হইলে—ডাকে। কাজেই ছাত্রেরা এখন কখনও গভীর রাত্রিতে কুক্কুটের ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগ করে; কিন্তু নিদ্রার বশে বেদাভ্যাসে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার শুইয়া পড়ে; কখনও আবার অনেক বেলায় কুক্কটের ডাক শুনে, কাজেই তাহাদের বিলম্বে ঘুম ভাঙ্গে এবং পাঠের সময় থাকে না। এই কারণেই তাহাদের পাঠাভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটিতেছে।”

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : সেই তাপসেরা পূর্ব্বে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং যথানিয়মে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা শ্রমণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, অকর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়াছেন, উদ্যানে যে সমস্ত ফল জন্মে তাহা পরিচারকদিগের দিয়া নিজেরা পরস্পরের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য বিনিময়পূর্ব্বক অসাধুভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন[১]। এই কারণেই এখন উদ্যানের ফলগুলি মধুর হয় না। কিন্তু তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন, তাহা হইলে উদ্যানজাত ফলও আবার মধুর হইবে। তাঁহারা জানেন না যে রাজাদের কত বুদ্ধি। তুমি গিয়া তাঁহাদিগকে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে বলিও।”

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : নাগরাজেরা এখন পরস্পরের মধ্যে কলহ করেন; সেই কারণেই সরোবরের জল আবিল হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবার পূর্ব্বের মত সম্প্রীতভাবে চলেন, তবে জলও পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইবে।”

চতুর্থ প্রশ্নর উত্তর : “সেই বৃক্ষদেবতা, পূর্ব্বে বনের ভিতর দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করিত, তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন; সেই জন্য তিনি নানারূপ

---

[১]। মূলে ‘পিণ্ডপাত-প্রতিপিণ্ডেন’ এই পদ আছে। সঙ্ঘের নিয়ম এই যে সুস্থ অবস্থায় সকলেই প্রতিদিন ভিক্ষায় বাহির হইবেন এবং প্রাণধারণোপযোগী ভিক্ষা পাইলেই তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া বিহারে ফিরিবেন। কিন্তু কোন কোন ভিক্ষু এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিন ভিক্ষায় যাইতেন এবং যাহা পাইতেন তাহা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া খাইতেন; তাঁহাদের দলের অপর সকলে সেই দিন বিহারেই থাকিতেন। কিন্তু ইহা শ্রমণধর্ম্মবিরুদ্ধ, কারণ ইহাতে অলসতা ও লোভের প্রশ্রয় হয় এবং সঞ্চয় চেষ্টা জন্মে। শতধর্ম্মা-জাতক (১৭৯) দ্রষ্টব্য।

পূজোপহার প্রাপ্ত হইতেন। এখন কিন্তু তিনি পথিকদিগের রক্ষাকল্পে উদাসীন হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার পূজা প্রাপ্তির-সম্বন্ধেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যদি তিনি পূর্ব্বের মত পথিকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবতী হন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার পূজা পাইবেন। তিনি জানেন না যে (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে জন্য) পৃথিবীতে রাজা রহিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁহাকে বলিও, ঐ বনের ভিতর দিয়া যাহারা গমনাগমন করিবে, তিনি যেন অতপর তাহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করেন।"

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর : "তিত্তীরটা যে বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করে, তাহার নিম্ন রত্নপূর্ণ একটা কলসী আছে। তুমি গিয়া তাহা তুলিয়া লও।"

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর : "ঐ মৃগ যে বৃক্ষের মূলে রুচির সহিত ঘাস খাইয়া থাকে, তাহাতে একখানি বড় মৌচাক আছে। মৃগ মধুলিপ্ত তৃণের আস্বাদ পাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছে, কাজেই অন্য তৃণ খাইতে পারে না। তুমি গিয়া সেই চাক ভাঙ্গিয়া ভাল মধুটুকু আমাকে পাঠাইয়া দাও এবং অবশিষ্ট নিজে খাও।"

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর : ''সেই সর্প যে বল্মীকে বাস করে, তাহার নিম্নে রত্নপূর্ণ একটা বৃহৎ কলসী আছে; সর্প উহা রক্ষা করে। বাহির হইবার সময় ধনের মায়ায় সর্পের শরীর স্ফীত হইয়া বিবরপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু আহারান্তে ফিরিবার সময় সেই ধনলোভেই তাহার শরীরটা অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করে, কোথাও বাধা লাগে না। তুমি গিয়া সেই রত্ন তুলিয়া লও।"

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর : সেই তরুণীর স্বামীগৃহ ও পিতৃগৃহের মধ্যে এক গ্রামে তাহার এক জার বাস করে। যখন জারের কথা মনে পড়ে, তখন তাহার প্রতি অনুরাগ-বশত সে স্বামীগৃহে থাকিতে চায় না। মা-বাপের সঙ্গে দেখা করিবে, এই ছলে সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে এবং কিয়দ্দিন জারগৃহে থাকিয়া পিত্রালয়ে যায়। কিন্তু সেখানে দুই চারি দিন থাকিবার পরই আবার জারের কথা মনে পড়ে; তখন স্বামীগৃহে যাইব বলিয়া সে পুনর্ব্বার জারগৃহে যায়। তুমি গিয়া সেই রমণীকে বলিও যে, দেশে রাজা আছেন; সে যেন মন স্থির করিয়া স্বামীর নিকটেই থাকে নচেৎ রাজা তাহাকে ধরিবেন ও তাহার প্রাণদণ্ড[১] করিবেন।"

নবম প্রশ্নের উত্তর : সেই গণিকা পূর্ব্বে একজনের নিকট অর্থগ্রহণ করিলে

---

[১]। ইহাতে বোধ হয় পুরাকালে এদেশে অবস্থাবিশেষে ব্যভিচারিণীদিগের প্রাণদণ্ড হইত।
তুং ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদরাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে। মনু-৮/৩৭১
কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায়—অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তাপসী চ রোগভাক্।
বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি।

ঐ অর্থানুরূপ তাহার সন্তোষ বিধান না করিয়া পুরুষান্তরের হস্ত হইতে অর্থগ্রহণ করিত না। সে কারণে পূর্ব্বে তাহার বহু উপার্জ্জন হইত। এখন কিন্তু তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে একের নিকট গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অপরের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে; প্রথম ব্যক্তিকে তৃপ্তিলাভের অবকাশ না দিয়াই দ্বিতীয়ের সংসর্গ অবলম্বন করে। কাজেই তাহার উপার্জ্জন কমিয়াছে; কেহই তাহার সংসর্গে আসিতে চায় না। সে যদি আবার পূর্ব্বের নিয়মমত চলে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তুমি গিয়া তাহাকে এইরূপ করিতে বলিও।”

দশম প্রশ্নের উত্তর : ‘‘এই মণ্ডল পূর্ব্বে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিত; কাজেই সে সকলের প্রিয় হইয়াছিল। সকলে তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বহু উপঢৌকন দিত। এই হেতু সে হৃষ্ট, পুষ্ট, ধনবান ও যশস্বী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন সে উৎকোচলোভী হইয়াছে, বিচারের সময় পক্ষপাত করে; সেই কারণে এখন সে দুঃস্থ, অসন্তুষ্ট ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়াছে। সে যদি পুনর্ব্বার যথাধর্ম্ম বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সুখী ও সুস্থ হইতে পারিবে। দেশে যে রাজা আছেন এ কথা তাহার স্মরণ নাই। তাহাকে বলিও সে যেন কখনও বিচারের সময় পক্ষপাত না করে।”

গ্রামণীচণ্ড এইরূপে রাজাকে একে একে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল; রাজাও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায় নিজের প্রজ্ঞাবলে তৎসমস্ত মীমাংসা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি গ্রামণীকে বহু ধন দিলেন এবং সে যে গ্রামে বাস করিত, তাহা ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। চণ্ড রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-বালক, তাপসগণ, নাগরাজ ও বৃক্ষদেবতাকে রাজার উত্তর শুনাইল, তিত্তিরের বাসস্থান হইতে রত্নপূর্ণ কুম্ভ তুলিয়া লইল, যে বৃক্ষের মূলে মৃগ তৃণ খাইত, তাহা হইতে মধুচক্র ভাঙ্গিয়া রাজাকে মধু পাঠাইয়া দিল, সর্পের বল্মীক ভাঙ্গিয়া ধন সংগ্রহ করিল এবং তরুণী, গণিকা ও মণ্ডলকে রাজার আদেশ জানাইল। অনন্তর সে মহাসমারোহে নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল, যাবজ্জীবন ধর্মপথে চলিল এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল। রাজা আদর্শমুখও দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জীবিতাবসানে স্বর্গলোকবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[তথাগত যে কেবল এ জন্মেই মহাপ্রাজ্ঞ তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন, এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ বা অর্হৎ হইল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন গ্রামণীচণ্ড, এবং আমি ছিলাম রাজা আদর্শ-মুখ।]

[ভূগর্ভনিহিত ধনের ক্ষমতা-সম্বন্ধে নন্দজাতক (৩৯), এবং পঞ্চতন্ত্র (মিত্রসংপ্রাপ্তি)-বর্ণিত হিরণ্যক-নামক মূষিকের কথা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

---

২৫৮. মান্ধাতৃ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যার সময় এক অলঙ্কৃত ও সুবেশ-সজ্জিত রমণী দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর ভিক্ষুরা ইহাকে ধর্ম্মসভায় আনিয়া শাস্তাকে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" "তুমি গৃহে বাস করিয়াও কি কস্মিন্‌কালে এই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিবে?" কামতৃষ্ণা সমুদ্রের ন্যায় দুষ্পার। পুরাকালে যাঁহারা দ্বিসহস্রদ্বীপ বেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, যাঁহারা মানবধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও চতুর্মহারাজদিগের দেবলোকে রাজত্ব করিতেন, যাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে এবং ষট্‌ত্রিংশ শক্রভবনে[১] দেবরাজের ন্যায় অখণ্ডপ্রতাপ ছিলেন, তাঁহারাও কামতৃষ্ণা-পুরণে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তোমার ত দূরের কথা। তুমি কি কখনও এই তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিবে?" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে প্রথম কল্পে[২] মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রোজ; রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ; কল্যাণের পুত্র

---

[১]। প্রতি চক্রবালে এক একজন শক্র থাকেন। চক্রবাল অসংখ্য; অতএব ইহাতে 'ষটত্রিংশ শক্রভবনের' ব্যাখ্যা হয় না। অতীতবস্তুতে দেখা যায়, মান্ধাতা এত দীর্ঘজীবী ছিলেন যে তাঁহার সময়ে একে একে ছত্রিশজন শক্র স্বর্গলোকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বর্ত্তমান বস্তুর এই অংশে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

[২]। কল্প সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। মহাসম্মত বৌদ্ধমতে পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বত মনু-স্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্ত-সময়ে, লোকে যখন বুঝিয়াছিল যে রাজা না থাকিলে সমাজরক্ষা হয় না, তখন তাহারা এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে 'মহাসম্মত' এই আখ্যা দিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন গৌতমবুদ্ধই বোধিসত্ত্বরূপে 'মহাসম্মত' হইয়াছিলেন।

বরকল্যাণ; বরকল্যাণের পুত্র উপোষধ; পোষধের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা সপ্তরত্নাধিপ ও ঋদ্ধি-চতুষ্টয়সম্পন্ন ছিলেন[১] এবং রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, যখন তিনি বামহস্তমুষ্টির উত্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আস্ফোটন করিতেন, তখনই আকাশ হইতে দিব্য মেঘে যেন জানুপ্রমাণ সপ্তরত্ন বর্ষণ করিত।[২] তিনি চুরাশি হাজার বৎসর বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন, চুরাশি হাজার বৎসর যুবরাজ ছিলেন এবং চুরাশি হাজার বৎসর চক্রবর্ত্তিরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল এক অসংখ্যেয়-পরিমিত ছিল।[৩]

এতাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও একদিন মান্ধাতা কামতৃষ্ণাপূরণে অসমর্থ হইয়া উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনাকে উৎকণ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "দেখ, আমার পুণ্যবল বিবেচনা করিলে এই রাজ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বল ত, কোন স্থান প্রকৃত রমণীয়।" "মহারাজ, দেবলোক অতি রমণীয় স্থান।"

ইহা শুনিয়া মান্ধাতা চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া[৪] অনুচরবর্গসহ চতুর্মহারাজিক স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ-চতুষ্টয় দেবগণ-পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও গন্ধ হস্তে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন এবং চতুর্মহারাজিক-শাসিত দেবলোকে গিয়া তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য দান করিলেন। মান্ধাতা সেখানে নিজের পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিলেন না এবং পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত হইলেন। মহারাজ-চতুষ্টয় তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মান্ধাতা বলিলেন, "এই দেবলোক হইতে রমণীয়তর আর কোন স্থান আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি।" মহারাজগণ বলিলেন, "সে সকল অপরের সেবক, আমরাও তাহাদেরই ন্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকই পরমরমণীয় স্থান।"

মান্ধাতা তখন পুনর্ব্বার চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া এবং অমাত্যগণে পরিবৃত

---

[১]। রাজচক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে সপ্তরত্ন বলিলে চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক এই কয়টি বুঝায়। স্ত্রী = মহিষী; গৃহপতি = গৃহস্থ। ইঁহারা রাজার অনুচর ও পারিষদ; পরিনায়ক = যুবরাজ (Crown Prince)। ঋদ্ধির সংখ্যা সচরাচর দশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যথাঃ–অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদচতুর্ব্বিধ (১) ছন্দ অর্থাৎ ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প, (২) বীর্য্য, (৩) চিত্ত, (৪) মীমাংসা।

[২]। এখানে সপ্তরত্ন যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, বৈদুর্য্য, বজ্র ও প্রবাল। মণি = পদ্মরাগাদি; বজ্র = হীরক।

[৩]। এক কোটির বিশঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০টা শূন্য দিলে যত হয়, তত বৎসর।

[৪]। চক্রবর্ত্তী রাজা কোথাও যাত্রা করিলে এই চক্র ইন্দ্রজাল-বলে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিত।

হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেবরাজ শক্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও গন্ধ হস্তে লইয়া প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই দিকে আসুন, মহারাজ।"

মান্ধাতা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলে তাঁহার পরিনায়করত্ন চক্ররত্ন লইয়া নরলোকে অবতরণপূর্ব্বক স্বকীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। শক্র মান্ধাতাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গিয়া দেবতাদিগকে দুই সম্প্রদায়ে এবং নিজের রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে এক এক অর্দ্ধ দান করিলেন। তদবধি স্বর্গলোকে দুই জন রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইল; শক্র তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর আয়ুর্ভোগপূর্ব্বক লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন; অন্য একজন শক্র জন্মলাভ করিলেন, তিনিও দেবরাজ্য পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; এইরূপে একে একে ছত্রিশ জন শক্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল; মান্ধাতা কিন্তু তাঁহার সেই মানবানুচরগণসহ দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে জীবনযাপন করিলেও তাঁহার কামতৃষ্ণা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে তাঁহার মনে হইল, 'অর্দ্ধস্বর্গরাজ্যমাত্র ভোগ করিয়া লাভ কি? শক্রের প্রাণ সংহার করিয়া দেবরাজ্যে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব।' কিন্তু তিনি শক্রের প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না।

তৃষ্ণা বিপত্তির মূল; মান্ধাতার আয়ু ক্ষীণ হইল; তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিল; দেবলোকে নরদেহের বিনাশ হইতে পারে না তিনি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং এক উদ্যানে অবতরণ করিলেন। উদ্যানপাল রাজভবনে গিয়া তাঁহার আগমন বার্তা জানাইল। রাজকুলের সকলে গিয়া সেই উদ্যানেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; মান্ধাতা সেই শয্যায় পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার উত্থানশক্তি রহিল না।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি বলিতে আদেশ দিবেন।" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "আমার নিকট হইতে জনসমূহের জন্য এই বার্ত্তা লইয়া যাও যে মহারাজ, মান্ধাতা দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, বহুকাল চতুর্মহারাজদিগের অধিকারেও রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ছত্রিশ জন শক্রের আয়ুষ্কাল দেবলোকে আধিপত্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।" ইহা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

দিবাকর, নিশাকর, স্বীয় স্বীয় কক্ষপথে যতদূর করে বিচরণ,
যতদুর পৃথিবীর দশদিক্ উদ্ভাসিত হয় পেয়ে রবির কিরণ,

সর্ব্বত্র সকলে ছিল মহারাজ মান্ধাতার দাসত্বে নিযুক্ত দিবারাত্র;
এমনি প্রভাব তাঁর, এমনি অশ্রুতপূর্ব্ব ত্রৈলোক্যে অখণ্ড আধিপত্য!
বর্ষিতেন সপ্তরত্ন; করতল-আস্ফোটনে; নাহি ছিল কিছুর অভাব;
তবু তৃপ্তি নাহি তাঁর, ইচ্ছা আর(ও) পাইবার; হায়, তৃষ্ণা, কি তোর স্বভাব!
তৃষ্ণা অনর্থের মূল; নাহি এতে কোন সুখ; তৃষ্ণা সর্ব্ব দুঃখের আলয়;
তারে বলি সুপণ্ডিত, একমনে সযতনে করে যেবা হেন তৃষ্ণা ক্ষয়।
উপজে যদিও তৃষ্ণা দিব্যপদার্থের লাগি, তাও নহে সুখের কারণ;
এই হেতু তৃষ্ণাক্ষয়ে সম্যকসম্বুদ্ধ-শিষ্য রত হয়ে থাকে অনুক্ষণ।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন; আরও অনেকে স্রোতাপত্তি-ফল পাইল।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই রাজা মান্ধাতা।]

☞ মান্ধাতার আখ্যায়িকা দিব্যাবদান, মিলিন্দপঞ্হ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। পৌরাণিক মান্ধাতায় আখ্যায়িকার সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক। চেদি-জাতকের (৪২২) অতীত বস্তুতে মান্ধাতার বধস্তন আরও কয়েকজন রাজার নাম আছে।

---

২৫৯. তিরীটবচ্ছ-জাতক

[আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির কোশলরাজপত্নীদিগের হস্ত হইতে পঞ্চশত এবং কোশলরাজের হস্ত হইতে পঞ্চশত, সর্ব্বশুদ্ধ একসহস্র শাটক পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ইতঃপূর্ব্বে দ্বি-নিপাতে শৃগাল-জাতকে[১] বলা হইয়াছে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার তিরীটবচ্ছ (তিরীটবৎস) এই নাম রাখা হয়। তিনি যথাকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলা নগরে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিলেন, কিন্তু বিবাহান্তে গৃহবাস আরম্ভ করিবার পর, যখন তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি এত দুঃখিত হইলেন যে সংসারত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া বনে বলিয়া গেলেন এবং সেখানে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

[১]। ১৫২ম জাতক; কিন্তু সেখানে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইহা গুণ-জাতকে(১৫৬) প্রদত্ত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসীরাজের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজা বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া রণে পরাজিত হইলেন এবং মরণভয়ে গজারোহণে এক পার্শ্ব দিয়া পলায়নপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না; তিনি ফলমূল সংগ্রহের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। তপোবনে আসিয়াছি ইহা বুঝিয়া রাজা হস্তীস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন। পথশ্রমে এবং বাতাতপে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ভূতলে অবতরণ করিয়াই তিনি জলের কলসী খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে চঙক্রমণের[১] এক কোণে একটা কূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু জল তুলিবার জন্য সেখানে রজ্জু ও ঘট কিছুই ছিল না; এদিকে তাঁহার পিপাসা দমন করিবারও সাধ্য ছিল না। কাজেই হস্তীর উদরবেষ্টন করিয়া যে যোত্র বান্ধা ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া লইলেন, হস্তীটীকে কূপের তটে দাঁড় করাইলেন এবং তাহার পায়ে যোত্রের এক প্রান্ত বান্ধিয়া অপর প্রান্তাবলম্বনে নিজে কূপের ভিতর নামিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি জল হাতে পাইলেন না; কাজেই যোত্রের প্রান্তের সহিত নিজের উত্তরাসঙ্গ বন্ধন করিলেন এবং পুনর্ব্বার অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না; তাঁহার পাদাগ্র জল স্পর্শ করিল মাত্র। পিপাসায় তখন তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন যে ভাবিতে লাগিলেন, পিপাসা শান্তি করিয়া মৃত্যু হইলেও তাহা সুখের মরণ হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি কূপে পতিত হইলেন এবং যত ইচ্ছা জল পান করিলেন; কিন্তু উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া সেখানেই অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব বন্যফল সংগ্রহপূর্ব্বক অপরাহ্নে আশ্রমে ফিরিয়া হস্তী দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা আসিয়াছেন কি? হস্তীটা ত দেখেতেছি বর্ম্মরক্ষিত। ব্যাপারখানা কি? হস্তীটার কাছে গিয়া একবার দেখা যাউক।' তিনি নিকটবর্ত্তী হইতেছেন বুঝিয়া হস্তী এক পার্শ্বে স্থির হইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব কূপতটে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ।" অনন্তর তিনি মই বান্ধিয়া রাজাকে উপরে তুলিলেন, তাঁহার শরীর টিপিয়া দিলেন, তাঁহাকে তেল মাখাইলেন এবং স্নান করাইয়া বন্যফলাদি খাইতে দিলেন। তিনি হস্তীটারও বর্ম্মাদি সজ্জা খুলিয়া দিলেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের আশ্রমে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিবার পর রাজধানীতে

---

[১]। পা-চারি করিবার জন্য চৌতারা।

ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি একবার রাজধানীতে পায়ের ধূলা দিবেন। রাজসৈন্য নগরের অদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিল; তাহারা রাজাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

বোধিসত্ত্ব দেড়মাস পরে বারাণসীতে গিয়া রাজকীয় উদ্যানে উপনীত হইলেন। রাজা মহাবাতায়ন উদ্ঘাতনপূর্ব্বক অঙ্গনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র চিনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিলেন, নিজে যে তলে বাস করিতেন, তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন, নিজের শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত পল্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য আসিয়াছিল, তাঁহাকে তাহা আহার করাইলেন এবং শেষে নিজে আহার করিয়া তাঁহাকে উদ্যানে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বের পা-চারি করিবার জন্য একটা পরিবৃত চঙ্ক্রমণ-স্থান এবং তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন, প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত দিলেন এবং উদ্যানপালের উপর তাঁহার সেবাশুশ্রূষার ভার দিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও সম্মান করিতেন।

কিন্তু রাজার অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের এইরূপ প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এইরূপ সৎকার যদি কোন যোদ্ধার ভাগ্যে ঘটিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি করিত?" তাঁহারা উপরাজের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের রাজা একজন তপস্বীর প্রতি অত্যধিক মমতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যে ঐ ব্যক্তির ভিতর কি গুণ দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনি রাজার সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করুন।" "বেশ, তাহাই করা যাইবে" বলিয়া উপরাজ অমাত্যগণসহ রাজসকাশে গমন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:

করে নাই কোন কর্ম্ম, যাতে পরিচয়
বিদ্যার ইহার কিছু পাই হে রাজন;
নহে এ ত্রিদণ্ডী[১] তব আত্মীয়, বান্ধব,
কিংবা মিত্র; তব কেন করে প্রতিদিন
রাজাকীয় আহার্য্যের সাবাংশ ভোজন?

ইহা শুনিয়া রাজা পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, তোমার স্মরণ

---

[১]। এক প্রকার পরিব্রাজক। ইহার তিন দণ্ডটি ব্যবহার করিতেন।

আছে কি, আমি প্রত্যন্তপ্রদেশে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যেও ফিরিয়া আসিতে পারি নাই?" 'হাঁ পিতঃ, তাহা আমার স্মরণ আছে।" "তখন এই ব্যক্তির সাহায্যেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বৎস, সেই প্রাণদাতা এখন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে আমার সমস্ত রাজ্য দান করিলেও ইঁহার ঋণ শোধ করা যায় না।" অনন্তর তিনি এই দুইটি গাথা বলিলেন :

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভ্রমি অসহায়
দারুণ অরণ্যে মাঝে; কণামাত্র বারি
না মিলিল সেথা মোর তৃষ্ণা নিবারিতে;
পড়িনু কুপেতে তাই; শেষে এই সাধু
দেখা দিয়া দয়া করি প্রসারিয়া কর
করিল উদ্ধার, বৎস! এই দুর্গতের।
ইঁহারই কৃপায় পেয়ে নতুন জীবন
যম লোক হ'তে আমি পুনঃ নরলোকে
ফিরিয়াছি, শুন বৎস; পরমপূজার্হ
মম এই মুনিবর; পূজ এঁরে তুমি;
দাও যত সাধ্য তব; লভ যজ্ঞফল
উপকারকের করি প্রতি-উপকার।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিলেন,—বোধ হইল যেন তিনি গগনতলে চন্দ্রমা উদিত করাইলেন। বোধিসত্ত্বের গুণব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নিজের গুণও সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল; তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কি যুবরাজ, কি অমাত্যগণ, কি অন্যান্য লোক, কেহই বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে রাজার নিকট কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতেন এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বও অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়ছিলেন।

["পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপে উপকার করিয়াছিলেন" ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনাপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৬০. দূত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা

বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতে কাক-জাতকে[১] বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও তুমি বড় লোভী ছিলে এবং সেই কারণে অসিদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় সেখানে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তিনি নিজের আহার-সম্বন্ধে অতি বিলাসী হইয়াছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'ভোজনশুদ্ধিক রাজা' এই আখ্যা দিয়াছিল। তিনি নাকি এমন বিধানে ভক্ত গ্রহণ করিতেন যে এক এক পাত্র ভক্ত প্রস্তুত করিতে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইত। তিনি গৃহের অন্তর্ভাগে বসিয়া ভোজন করিতেন না; তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিলে বহুলোকের পুণ্যোপার্জ্জন হইবে,[২] এই অভিপ্রায়ে তিনি রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ভোজনের সময় ইহা সুসজ্জিত করাইতেন এবং সেখানে শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত কাঞ্চন পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যা-পরিবৃত হইয়া শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে শতরস ভোজ্য গ্রহণ করিতেন।

একদা এক লোভী ব্যক্তি রাজার ভোজনঘটা দেখিয়া ঐ খাদ্যের আস্বাদ পাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিছুতেই লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া স্থির করিল, 'ইহার একটা উপায় আছে।' সে দৃঢ়ভাবে কোমর বান্ধিয়া এবং দুই হাত তুলিয়া, 'আমি দূত', 'আমি দূত', এই চীৎকার করিতে করিতে রাজার দিকে ছুটিয়া গেল। তৎকালে ঐ দেশে কেহ 'আমি দূত' এই কথা বলিলে লোকে তাহাকে বারণ করিত না; কাজেই উপস্থিত সমস্ত লোকে দুই ভাগ হইয়া তাহাকে যাইবার পথ দিল। সে ছুটিয়া গিয়া রাজার ভোজন পাত্র হইতে একটা গ্রাস তুলিয়া মুখে দিল। ইহা দেখিয়া অসিধারীরা অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনই ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রাজা তাহাদিগকে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাকে মারিও না।" অনন্তর তিনি সেই লোকটাকে

---

[১]। নবনিপাতে এ নামে কোন জাতক নাই। বণ্নিপাতে এক কাকজাতক আছে বটে (৩৯৫); কিন্তু তাহাতেও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দেখা যায় না; কেবল বলা আছে, 'ইহা পূর্ব্বের ন্যায়।' এই জাতকেও ভূমিকায় বলা হইল, লোভীর 'শিরশ্ছেদ' হইয়াছিল; কিন্তু অতীতবস্তুতে দেখা যায় প্রহরীরা তাহার শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলেও রাজা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

[২]। সার্ব্বভৌম রাজদর্শনে পুণ্য হয়, এতদ্দেশীয় লোকের এই সংস্কার।

বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি ভোজন কর।" তিনি নিজে হাত ধুইয়া বসিলেন এবং ঐ ব্যক্তির ভোজন শেষ হইলে তাহাকে নিজের পেয় জল ও নিজের চর্ব্ব্য তাম্বূল দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে বাপু, তুমি বলিতেছ, তুমি দূত; তুমি কাহার দূত বল ত?" সে উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি তৃষ্ণার দূত, আমি উহাদের দূত। তৃষ্ণা আমায় আজ্ঞা দিল, 'তুমি রাজার নিকট যাও' এবং আমি তাহার দূত হইয়া আসিলাম।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

যার জন্য দূরদেশে যায় লোকে বহুক্লেশে
মাগিতে শত্রুর (ও) কৃপা, কি বলিব হায়।
সেই উদরের দূত, আমি ইহা অতি অদ্ভুত;
রথিশ্রেষ্ঠ, ক্ষম, ক্রোধ সংবরি আমায়।
লঙ্ঘিতে যার শাসন না পারে মানবগণ,
দিবারাত্র বশবর্ত্তী হ'য়ে চলে যায়,
সেই উদরের দূত আমি অতি অদ্ভুত
রথিশ্রেষ্ঠ, দোষ তুমি ক্ষমহ আমার।

রাজা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন "লোকটা যাহা বলিল, তাহা সত্য। সমস্ত প্রাণীই উদরের দূত। তাহারা তৃষ্ণাবশে বিচরণ করে। তৃষ্ণাই তাহাদিগের পরিচালন করে। এই সত্য এ ব্যক্তি কি সুন্দরভাবেই প্রকটিত করিল!" তিনি সে ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

তুমি আমি আর অন্য সর্ব্বজন,
উদরের দূত সবাই, ব্রাহ্মগণ।
এক দূতে অন্য দূতের সৎকার
করিবে নিশ্চয়, সাধ্য যত তার।
সহস্র রোহিণী[১], যণ্ড এক আর—
দিলাম তোমার এই পুরস্কার।

অনন্তর রাজা আবার বলিলেন, "এই মহাপুরুষ আমাকে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছেন, যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই।" ফলতঃ বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তির কথায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল এবং অপর বহু জন স্রোতাপত্তিফল

---

[১]। লাল রঙের গাই।

প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : এখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই পুরুষ, এবং আমি ছিলাম সেই ভোজন শুদ্ধিক রাজা।]

----

২৬১. পদ্ম-জাতক

[কয়েকজন ভিক্ষু আনন্দকর্ত্তৃক রোপিত বোধিদ্রুমকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত প্রত্যুৎপন্নবস্তু কলিঙ্গবোধি-জাতক (৪৭৯) সবিস্তর বলা যাইবে। এই বৃক্ষ আনন্দকর্ত্তৃক[১] রোপিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দবোধি নামে অভিহিত হইত। স্থবির আনন্দ যে ইহাকে জেতবন-দ্বারকোষ্ঠকের নিকটে রোপণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ সমস্ত জম্বুদ্বীপেই প্রচারিত হইয়াছিল।

একদা জনপদবাসী কতিপয় ভিক্ষু আনন্দ-বোধিকে মাল্য দ্বারা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, পর দিন মালা কিনিবার জন্য শ্রাবস্তী নগরস্থ উৎপলবীথিতে গেলেন; কিন্তু সেখানে মালা না পাইয়া বিহারে ফিরিয়া আনন্দকে বলিলেন, "মহাশয়, আমরা বোধিদ্রুমকে মালা দিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছায় উৎপলবীথিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে একটি মালাও পাইলাম না।" আনন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মালা আনিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি উৎপলবীথিতে গিয়া বিস্তর নীলোৎপলকলাপ আনিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত লইয়া আনন্দবোধির পূজা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ধর্ম্মসভায় স্থবির আনন্দের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, জনপদবাসী অল্পপুণ্য ভিক্ষুগণ উৎপলবীথিতে গিয়া মালা পাইলেন না; কিন্তু স্থবির সেখান হইতেই বিস্তর মালা লইয়া আসিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বাক্‌পটু লোকে বাক্‌পটুতার পুরস্কারস্বরূপ মালা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

---

[১]। আনন্দের উদ্যোগে মহামৌদ্গল্যায়ন গয়ার বোধিদ্রুম হইতে বীজ আনয়ন করেন এবং অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তক উহা জেতবন বিহারের দ্বারসন্নিকটে রোপিত হয়। প্রবাদ আছে যে বীজ রোপিত হইবা মাত্রই তাহা হইতে ৫০ হস্ত উচ্চ কাণ্ড বিনির্গত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নগরে অভ্যন্তরে একটা সরোবরে পদ্ম ফুটিত। এক ছিন্ননাস ব্যক্তি ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, তিনজন শ্রেষ্ঠিপুত্র মালা পড়িয়া উৎসবে যোগ দিবার ও আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে স্থির করিল, "চল যাই, সেই ছিন্ননাস ব্যক্তিকে অলীক চাটুবাদ শুনাইয়া মালা চাই গিয়া।" অনন্তর, পদ্মরক্ষক ব্যক্তি যখন সরোবরে পদ্ম তুলিতেছিল, তখন তাহারা সেখানে উপস্থিত হইল এবং তীরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের একজন রক্ষককে সম্বোধন করিয়া বলিল :

কাট চুল কাট দাড়ি যত ইচ্ছা লাগে,
দু'দিন পরে বেড়ে হবে ছিল যেমন আগে।
তেমনি তোমার নাকটি বেড়ে হবে আগের মত;
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত?

ইহাতে ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদ্ম দিল না। তখন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল :

শরতে বীজ বুনলে ক্ষেতে অঙ্কুর বাহির হয়,
তেমনি তোমার নাকটি বাহির হবে মহাশয়।
বেড়ে বেড়ে ঠিক আবার হবে আগের মত;
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত?

কিন্তু ইহা শুনিয়াও ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে পদ্ম দিলনা। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল :

প্রলাপ বকে মূর্খ এরা, ভাবে এই কথায়
ভাগ্যে যদি গোটা কত পদ্ম জুটে যায়।
হাঁ বলুক, আর নাই বলুক, তোষামোদী জন;
কাটা নাক হয় না ক আছিল যেমন।
সোজা পথে চলি, ভায়া, সত্য কথা বলি;
গোটা কত পদ্ম দাও, যাই আমি চলি।

এই কথা শুনিয়া পদ্মসরোবরের রক্ষক বলিল, "এ দুই মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তুমি যাহা প্রকৃত, তাহা বলিয়াছ। অতএব তোমারই পদ্ম পাওয়া উচিত।" অনন্তর সে ঐ সত্যবাদীকে একটা বড় পদ্মমালা দিয়া পুনর্ব্বার জলে নামিল।

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম সেই পদ্মলাভী শ্রেষ্ঠীপুত্র।]

---

২৬২. মৃদুপাণি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা এই ব্যক্তিকে ধর্ম্মসভায় আনয়ন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, তুমি না কি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ।" সেই ইহা স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, রমণীরা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। পুরাকালে পণ্ডিতজনেও নিজের কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পিতা কন্যার হাত ধরিয়া ছিলেন; তথাপি সেই রমণী প্রভৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুরুষান্তরের সহিত পলায়ন করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তি পর তিনি তক্ষশীলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজা শাসনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্ব অন্তপুরে নিজের কন্যা ও ভাগিনেয়ের লালন পালন করিতেন। একদিন তিনি অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগিনের রাজা হইবে এবং আমার কন্যা তাহার অগ্রমহিষী হইবে।"

কিন্তু এই বালক ও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আর একদিন অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাগিনেয়ের জন্য অন্য কাহারও কন্যা আনিব, আমার কন্যাকেও অন্য কোন রাজকুলে সম্প্রদান করিব। ইহাতে আমার কুটুম্বের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।" অমাত্যেরা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়ের বাসের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন', কি উপায়ে' রাজকুমারীকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করা যায়? একটা উপায় আছে। দেখা যাউক, কি হয়।' অতঃপর তিনি ধাত্রীকে উৎকোচ দিলেন।

ধাত্রী জিজ্ঞাসিল "আর্য্যপুত্র, আমায় কি করিতে হইবে বলুন।" কুমার বলিলেন, "মা, রাজকন্যাকে অন্তঃপুরের বাহির করিবার সুবিধা চাই। তোমায় ইহার ব্যাবস্থা করিতে হইবে।" "রাজকন্যার সঙ্গে আগে এ সম্বন্ধে কথা বলিয়া

দেখিব।” “বেশ কথা; তাহাই কর।” ধাত্রী রাজকন্যার নিকট গিয়া বলিল, “এস মা, তোমার মাথার উকুন মারিয়া দি।” সে রাজকন্যাকে একখানা অনুচ্চ আসনে বসাইল, নিজে একখানা উচ্চ আসন গ্রহণ করিল, এবং নিজের ঊরুদেশে তাঁহার মাথা রাখিয়া, উকুন খুঁজিতে খুঁজিতে নখ দিয়া একটা আঁচড় দিল। রাজকন্যা বুঝিলেন এ আঁচড় ধাত্রীর নিজের নখের নহে, তাঁহার পিসতুত ভাই এর নখের। তিনি জিজ্ঞাসিলেন “ধাই মা, তুমি কুমারের নিকট গিয়াছিলে?” “হাঁ মা, আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। “তিনি তোমায় কি বলিয়া দিয়াছেন?” “তোমাকে বাহির করিবার কোন উপায় আছে কি না তাহা জিজ্ঞেসা করিয়াছেন।” “তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন”, এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, “মা, তুমি এই গাথাটি শিখিয়া লও, কুমারকে গিয়া ইহা শুনাইবে :

করদ্বয় মৃদুস্পর্শ, গজ সুশিক্ষিত,
অন্ধকারে বৃষ্টি আশা পুরিবে নিশ্চিত।”

এই গাথা শিক্ষা করিয়া ধাত্রী কুমারের নিকট ফিরিয়া গেল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মা, রাজকন্যা কি বলিলেন?” ধাত্রী উত্তর দিল, “বাবা, তিনি আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই গাথাটি বলিয়া পাঠাইয়াছেন।” ইহা বলিয়া সে কুমারকে উক্ত গাথাটি শুনাইল। কুমার শুনিবামাত্র উহার অর্থ বুঝিলেন, এবং “আচ্ছা মা, তুমি এখন যাও”, বলিয়া ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। তিনি একটি সুশ্রী ও কোমলপাণি বালক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত করিলেন; মঙ্গলহস্তী-পালককে উৎকোচ দিয়া নিজের বশে আনিলেন, মঙ্গলহস্তীকে এরূপ শিক্ষা দিলেন যেন সে কিছুতেই ভয় না পায় বা বিচলিত না হয়। এই সমস্ত করিয়া তিনি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের পোষধ[১] দিবসে নিশীথ-সময়ে নিবিড় কৃষ্ণমেঘ হইতে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল। কুমার ভাবিলেন, ‘রাজকন্যা যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, এত দিনে তাহা উপস্থিত হইয়াছে’। তিনি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সেই কোমলপাণি বালক ভৃত্যকে তাহার পৃষ্ঠে বসাইলেন এবং রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পুরোভাগে বাতায়নসমীপে একটা বৃহৎ প্রাচীরের গায়ে হস্তীটাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং সেখানে থাকিয়া

---

[১]। চতুর্দ্দশীতে কিংবা অমাবস্যায়। প্রথমে প্রতিপক্ষে তিন দিন অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী পোষধের (উপোসথের) দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। শেষে প্রতিপক্ষে এক দিন, অর্থাৎ হয় চর্তুদ্দশীতে, নয় পঞ্চদশীতে পোষধ পালন করিবার বিধান হয়। প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে উপোসথের দিন-সংখ্যায় সামান্য ভ্রম আছে।

ভিজিতে লাগিলেন।

রাজা সাতিশয় সতর্কতার সহিত কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহাকে অন্যত্র শয়ন করিতে দিতেন না, নিজের নিকটে একখানা ছোট বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিতেন। যে দিনের কথা হইতেছে, সেদিন রাজকুমারী ভাবিলেন, 'আজ কুমার নিশ্চয় আসিবেন'। কাজেই তিনি শুইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা গেলেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, তিনি বলিলেন "বাবা, আমার স্নান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রাজা বলিলেন, "চল মা, তোমায় স্নান করাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া সেই বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন, 'স্নান কর গিয়া' বলিয়া কুমারীকে তুলিয়া বাতায়নের বহিঃস্থ পদ্মের উপর[১] বসাইলেন এবং তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজকুমারী স্নান করিতে করিতে কুমারের দিকে একখানা হাত বাড়াইয়া দিলেন। কুমার ঐ হাত হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালক ভৃত্যটির হাতে পরাইলেন এবং বালকটিকে তুলিয়া কুমারীর পার্শ্বে পদ্মোপরি বসাইয়া দিলেন। কুমারী তখন বালকটির হাতখানি লইয়া পিতার হাতে দিলেন। রাজা এই হাত ধরিলেন এবং কন্যার হাত ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর কুমারী নিজের দ্বিতীয় হস্ত হইতেও অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালকটির অপর হস্তে পরাইলেন এবং এই হস্তও পূর্ব্ববৎ পিতার হস্তে দিয়া নিজে কুমারের সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজা ভাবিলেন তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া রহিয়াছেন। যখন স্নান শেষ হইল, তখন তিনি বালকটিকেই নিজের কন্যা মনে করিয়া তাহাকে শ্রীগর্ভে[২] শয়ন করাইলেন, উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদুপরি নিজের মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন এবং সেখানে প্রহরী রাখিয়া নিজের কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে রাজা শ্রীগর্ভের দ্বার উন্মোচন করিয়া বালকটিকে দেখিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী কুমারের সহিত যে উপায়ে পলায়ন করিয়াছেন, বালকটি তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। রাজা দুর্মনায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলেও কেহ রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অহো! রমণীরা এমনই অরক্ষণীয়া।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :

কে পারে তুষিতে, বল, রমণীর মন

---

[১]। জানালার বাহিরে একপ্রকার ছোট বারান্দা; ইহা পদ্মাকারে গঠিত বলিয়া পদ্ম নামে অভিহিত।

[২]। শ্রীগর্ভ = রাজকীয় শয়নাগার।

সাবধানে বলি সদা মধুর বচন![1]
নদীতে ঢালিলে জল কে কবে লভিবে ফল?
পুরাইতে গর্ভ তার শক্তি কার(ও) নাই;
ললনার বাসনার অন্ত নাহি পাই।
নিয়ত নরক-পথে নারীর গমন;
দূর হতে সাধু তারে করে বিসর্জ্জন।
তুষিতে নারীর মন যে করে যতন,
ভালবাসে, দেয় তারে যত পারে ধন,
ইহামূত্র নাশ তার জেন তুমি দুর্নিবার;
ইন্ধনে লভিয়া পুষ্টি তাহাই যেমন
মুহূর্ত্তের মধ্যে নাশ করে হুতাশন,
তেমনি রমণীগণে যেবা ভালবাসে
তাহাকেই পিশাচীরা অচিরে বিনাশে।[2]

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'ভাগিনেয়ও আমার পোষ্য।' তিনি

---

[1]। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির এইরূপ অর্থও হইতে পারে—
রমণী কুটিলা; মুখে মধুর বচন,
হৃদয়ে গরল কিন্তু করে সে ধারণ

[2]। এই গাথাদ্বয়ের প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—
বল, বীর্য্য সব যায় নারীর কুহকে পড়ি,
চক্ষুষ্মান্ হয়ে অন্ধ, পাপে দেয় গড়াগড়ি।
গুণী হয় গুণহীন, প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাধন
নারীর কুহকে পড়ি দেয় বিসর্জ্জন।
প্রমত্ত হইয়া পশে প্রণয়-বন্ধনে;
নরীর কুহক, হায়, বুঝিব কেমনে?
যেমন তস্করে করে সর্ব্বস্ব হরণ
পথিকের, সেইরূপ কুহকিনীগণ
প্রমত্তের ধৃতি, তপ, শীল, সত্য, স্মৃতি,
স্বার্থত্যাগ, সাধুকার্য্য-সম্পাদনে মতি
সমস্ত বিনষ্ট করে হায়, হায়, হায়!
জেনে শুনে পড়ে লোকে হেন দুর্দ্দশায়!
অগ্নি যথা কাষ্ঠপুঞ্জ ভস্মীভূত করে।
তেমতি কুহকবলে, রমণীরা হরে
প্রমত্তের কীর্ত্তি, যশ, ধৃতি, শৌর্য্য, বীর্য্য,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য।

মহাসমাদরে কুমারকেই কন্যা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর কুমার ঔপরাজ্যে[১] অভিষিক্ত হইলেন এবং মাতুলের দেহত্যাগের পর নিজেই রাজপদ লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

---

২৬৩. চুল্লপ্রলোভন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন," "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ।" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত।" তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীগণ পুরাকালে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগকেও পাপপথে লইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া রাজ্ঞীদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা কর।" রাণীরা তদনুসারে (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল পরে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ভ্রষ্ট হইয়া বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখনই লোকে তাঁহাকে স্নান করাইল এবং স্তন্যপানের জন্য একজন ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই ধাত্রীর স্তন্যপানের সময় কান্দিতে লাগিলেন। তখন রাজার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অন্য একজনের হাতে দিলেন; কিন্তু কোন স্ত্রীলোক তাঁহাকে কোলে করিলেই তিনি কান্দিয়া অনর্থ ঘটাইতে লাগিলেন। কাজেই রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার জন্য একজন পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই লোকটা তাঁহাকে কোলে তুলিলেই তিনি চুপ করিয়া রহিতেন। তদবধি তাঁহার লালন পালনের জন্য পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করা হইল। তাহারাই তাঁহাকে লইয়া বেড়াইত। স্তন্যপান করাইবার সময় তাহারা হয় স্তন্য দোহন করাইত, অথবা যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার মুখে স্তন দিত। তিনি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

---

[১]। রাজার প্রতিনিধিকে উপরাজ (viceroy) বলা যাইত।

হইলেও কেহই তাঁহাকে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করাইতে পারিল না। রাজা তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বসিবার ঘর ও ধ্যানের ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার অন্য পুত্র নাই; যে পুত্র হইয়াছে, সে কামভোগে বিরত; রাজ্যেও ইহার আকাঙ্খা নাই; এ পুত্র লাভ করিয়া ত আমার দুঃখই হইল।'

তখন রাজধানীতে এক নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা যুবতী নর্ত্তকী বাস করিত। পুরুষের মন যোগাইয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে তাহার বেশ ক্ষমতা ছিল। সে একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?" রাজা তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

তাহা শুনিয়া নর্ত্তকী বলিল, "তাহা হউক, মহারাজ; আমি কুমারকে প্রলোভন দেখাইয়া কামরসের আস্বাদ জানাইব।" রাজা বলিলেন, "আমার পুত্র এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। তুমি যদি তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সে ত রাজা হইবেই; তুমিও তাহার অগ্রমহিষী হইবে।" "সে ভার আমার উপর রহিল, মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অনন্তর সে প্রাসাদ-রক্ষকদিগের নিকট গিয়া বলিল, "আমি ভোরে আসিয়া আর্য্যপুত্রের শয়নমন্দিরে যাইব এবং তাঁহার ধ্যানাগারের বাহিরে বসিয়া গান করিব। যদি তিনি রাগ করেন, তোমরা আমায় জানাইবে; আমি তাহা হইলে চলিয়া যাইব; আর যদি তিনি মন দিয়া শুনেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট আমার সুখ্যাতি করিবে।" রক্ষকেরা "বেশ তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিল।

পরদিন নর্ত্তকী যথাস্থানে অবস্থিতি বীণা-সংযোগে গান আরম্ভ করিল। সে এমন মধুরভাবে গাইতে লাগিল যে বীণার স্বরের সহিত গীতের স্বর এবং গীতের স্বরের সহিত বীণার স্বর মিলিয়া এক হইল। কুমার শয্যায় থাকিয়াই উহা শুনিতে লাগিলেন এবং পরদিন নর্ত্তকীকে অপেক্ষাকৃত নিকটে বসিয়া গান করিতে বলিলেন। তাহার পরদিন তিনি তাহাকে ধ্যানাগারে বসাইয়া গান করাইলেন এবং তাহার পরদিন নিজের সমীপেই বসাইলেন।[১]

এইরূপে উত্তরোত্তর তাঁহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। সংসারের অন্যান্য লোকের পথানুসরণ করিয়া তিনিও কামরসের আস্বাদ পাইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ঐ নর্ত্তকীকে অন্য কোন পুরুষের ভোগ্যা হইতে দিবেন না। তিনি এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে অসিহস্তে লইয়া রাজমার্গে অবতরণপূর্বক পুরুষ

১। Vice is a monster of such frightful mein,
As to be hated needs only to be seen.
But seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.—Pope.

দেখিলেই তাহাকে তাড়া করিতে লাগিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ নর্ত্তকীর সহিত নগর হইতে নির্ব্বাচিত করিলেন।

রাজকুমার নর্ত্তকীর সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অধোগামী পথে গমন করিতে করিতে, একদিকে গঙ্গা ও একদিকে সমুদ্র, এতদুভয়ের অন্তরে একটি স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকী পর্ণশালায় থাকিয়া কন্দমূলাদি পাক করিত, বোধিসত্ত্ব অরণ্যে হইতে ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ফলাহরণার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে এক তাপস সমুদ্রগর্ভস্থ কোন দ্বীপ হইতে ভিক্ষাচর্য্যার্থ আকাশপথে গমন করিবারকালে ঐ আশ্রমের ধূম দেখিতে পাইয়া সেখানে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নর্ত্তকী বলিল, "যতক্ষণ পাক শেষ না হয়, ততক্ষণ দয়া করিয়া বসুন।" অনন্তর সে রমণীসুলভ কৌশলপ্রয়োগে সেই তাপসকে প্রলুব্ধ ও ধ্যানচ্যুত করিল। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হইল। তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিলেন,—সেই রমণীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। এদিকে বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ তাপস অতিবেগে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, এ নিশ্চয় কোন শত্রু হইবে; কাজেই তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাপস তখন উৎপতন করিতে গিয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'তপস্বী সম্ভবতঃ আকাশপথে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ধ্যানভঙ্গবশত এখন সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। ইহাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি বেলান্তে দাঁড়াইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :

> না এসেছ জলপথে; ঋদ্ধির প্রভাবে
> আকাশমার্গেতে চলি এলে মহাশয়;
> রমণীর সঙ্গে মিশি বীর্যহীন এবে;
> পড়িয়া সাগর-গর্ভে জীবন সংশয়!
> রমণীর মায়াবর্ত্তে পড়ে যেইজন
> ব্রহ্মচর্য্য ধ্রুব তার হইবে বিনাশ;
> বুঝি ইহা ভালরূপে বুদ্ধিমান জন
> দূর হ'তে ছাড়ি যায় রমণীর পাশ।[১]

---

[১]। এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটি উদ্ধার করিয়াছেন—

> রমণীর মায়া রোগ শোক, উপদ্রব,
> মরীচিকাসম আশা—বন্ধন এ সব;

কামবশে, কিংবা অর্থ লভিবার তরে
রমণী ভজন যারে একবার করে,
শীঘ্র তার সর্ব্বনাশ হয় সঙ্ঘটন;
অগ্নি যথা করে ত্বরা ইন্ধন দহন।

বোধিসত্ত্বের এই কথা শুনিয়া তাপস সমুদ্র মধ্যে থাকিয়াই পুনর্ব্ববার ধ্যানস্থ হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী এত ভার সঙ্গে লইয়াও আকাশপথে শাল্মলি-তূলের ন্যায় চলিয়া গেলেন! আমিও ইহার ন্যায় ধ্যানবল লাভ করিয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই রমণীকে লোকালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে বলিয়া নিজে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি মনোরম ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্মদ্বারা অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক বাসের উপযুক্ত হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই কুমার, যিনি প্রথমে স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেন না।]

---

২৬৪. মহাপ্রণাদ-জাতক

[শাস্তা গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া স্থবির ভদ্রজিতের অনুভাব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একবার শাস্তা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন, ভদ্রজিৎ নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে। অনন্তর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ভদ্রিক নগরে উপনীত হইলেন এবং কুমার ভদ্রজিতের জ্ঞানপরিপাক-প্রতীক্ষায় সেখানে জাতিয়াবন নামক স্থানে তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। কুমার ভদ্রজিৎ অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভদ্রিক নগরের অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র। তাঁহার তিন ঋতুতে বাস করিবার উপযোগী তিনটি প্রাসাদ ছিল; তাহার এক একটিতে তিনি চারি মাস বাস করিতেন। এক প্রাসাদে বাস করিয়া অন্য

হৃদয়ে নিহত এরা মরণের পাশ;
নরাধম, এ সকলে করে যে বিশ্বাস।

প্রাসাদে যাইবার সময় তিনি জ্ঞাতিজন পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিতেন। তখন কুমারের শোভা যাত্রার ঘটা দেখিবার জন্য সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। লোকে যাহাতে অবাধে দেখিতে পারে, সেইজন্য তখন প্রাসাদদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পথে চক্রে চক্রে আসনমঞ্চ প্রস্তুত হইত।[১]

ভদ্রিক নগরে তিনমাস বাস করিবার পর শাস্তা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, যে তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। নগরবাসীরা অনুরোধ করিল, 'ভদন্ত' আপনি আগামীকল্য যাইবেন'। তাহারা পর দিনই বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের জন্য মহাদানের আয়োজন করিল, নগরমধ্যে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সাজাইল এবং সকলের জন্য আসন স্থাপন করিয়া দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিল। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া সেখানে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসীরা মহাদান দিল। ভোজনান্তে শাস্তা মধুর স্বরে অনুমোদন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কুমার ভদ্রজিৎ এক প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তরে যাইতেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য দর্শনার্থ কেহই উপস্থিত ছিল না। কেবল তাঁহার নিজের লোকজনেরাই তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য সময়ে আমি এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে যাত্রা করিলে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে; লোকে চক্রাকারে কত আসনমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া থাকে; অদ্য কিন্তু আমার নিজের লোকজন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; ইহার কারণ কি বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "স্বামিন্, সম্যকসম্বুদ্ধ এই নগরে তিন মাস বাস করিয়া অদ্য প্রস্থান করিবেন। তিনি ভোজন শেষ করিয়া সমস্ত লোকের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, নগরবাসী সকলেই তাহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছে।" "বটে, তবে চল, আমরাও গিয়া শুনি।" ইহা বলিয়া ভদ্রজিৎ সর্ব্বাভরণ ধারণ করিয়াই অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং জনসঙ্ঘের এক প্রান্তে থাকিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সমস্ত পাপক্ষয় হইল; তিনি তখনই অগ্রফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

তখন শাস্তা ভদ্রিকের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন্, তোমার পুত্র নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়াও আমার ধর্ম্মকথা শ্রবণে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে অদ্যই হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে, নয় পরিবিবর্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমি পুত্রের পরিনির্ব্বাণ চাই না; তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন এবং প্রব্রজ্যা

১। 'চক্কাতিচক্কানি মঞ্চাতিমঞ্চানি' অর্থাৎ এক চক্রের উপর অন্যচক্র এবং এক মঞ্চের উপর অন্য মঞ্চ।

দানের পর আগামীকল্য তাহাকে লইয়া আমার গৃহে আগমন করুন।”

শাস্তা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন; সম্ভ্রান্তবংশীয় সেই কুমারকে লইয়া বিহারে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠীদম্পতী সপ্তাহকাল শাস্তার বহু সৎকার করিলেন।

সপ্তাহ বাসের পর শাস্তা ভদ্রিককে লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোটিগ্রামে উপনীত হইলেন। কোটিগ্রামবাসীরাও বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিল। শাস্তা ভোজনান্তে অনুমোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ভদ্রজিৎ গ্রামের বাহিরে গিয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ‘শাস্তা আসিলেই আমি ধ্যান হইতে উঠিব।’ (কাজেও তাহাই হইল।) যখন প্রবীণ স্থবিরেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না; কিন্তু শাস্তা আসিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া পৃথগ্‌জনেরা ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা ভাবিল, ‘কি আস্পর্দ্ধা, এ যেন কত পূর্ব্বেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, যে প্রবীণ স্থবিরদিগকে আসিতে দেখিয়াও আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল-না!”

কোটিগ্রামবাসীরা নৌসঙ্ঘাটি প্রস্তুত করিল।[১] শাস্তা সঙ্ঘাটিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “ভদ্রজিৎ কোথায়?” ভিক্ষুরা বলিলেন, “এই যে ভদন্ত, ভদ্রজিৎ এখানে।” শাস্তা বলিলেন, “এস, ভদ্রজিৎ, তুমি আমার সহিত এক নৌকায় উঠ।” তখন ভদ্রজিৎ অগ্রসর হইয়া শাস্তার নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা যখন গঙ্গার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন, তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, “বল ত, ভদ্রজিৎ, মহাপ্রণাদ রাজার সময় তুমি যে প্রাসাদে বাস করিতে, তাহা কোথায়।” ভদ্রজিৎ উত্তর দিলেন, “ভদন্ত, তাহা এই স্থানেই নিমগ্ন রহিয়াছে।” ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা পৃথগ্‌জনের ন্যায় ভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, “তাই ত, স্থবির ভদ্রজিৎ যে এখন নিজের অর্হত্ত্ব প্রতিপাদন আরম্ভ করিলেন।” ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “দেখ ভদ্রজিৎ, তুমি এই সতীর্থ ব্রহ্মচারীদিগের সংশয় ছেদন কর।”

ভদ্রজিৎ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে গমন করিয়া[২] অঙ্গুলীর অগ্রভাগে সেই প্রাসাদস্তূপ গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চশত যোজন বিস্তীর্ণ প্রাসাদসহ আকাশে উত্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি প্রাসাদের এক অংশ ভেদ করিয়া, উহার অভ্যন্তরে তখন যাঁহারা বাস করিত, তাহাদিগকে দর্শন দিলেন

---

[১]। এই খণ্ডের ৬৭১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। এখানে ‘উপ্পতিত্বা’ ও ‘উপগন্ত্বা’ এই দুই পাঠ আছে। প্রথম পাঠে ‘আকাশপথে উঠিয়া (ঋদ্ধিবলে, অথবা এক লাফে) এই অর্থ করা যাইতে পারে।

এবং পরিশেষে সমস্ত প্রাসাদটিকে বারিপৃষ্ঠ হইতে এক যোজন[১], দুই যোজন, তিন যোজন পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তদীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞাতিগণ প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-নাগ-মণ্ডুকাদি হইয়া সেইখানেই পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল। প্রাসাদটি যখন বারিপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তাহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভদ্রজিৎ, তোমার জ্ঞাতিগণ বড় কষ্টে পড়িয়াছে।" ইহা শুনিয়া ভদ্রজিৎ প্রাসাদটি জলে বিসর্জ্জন করিলেন; উহা পুনর্ব্ববার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর শাস্তা গঙ্গাপারে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত হইল। তিনি সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আসীন হইয়া তেজ বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, স্থবির ভদ্রজিৎ কোন সময়ে এই প্রাসাদে বাস করিতেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহাপ্রণাদ রাজার সময়ে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলানগরে সুরুচি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নামও সুরুচি ছিল। শেষোক্ত পুত্র মহাপ্রণাদ। তাঁহারাই এই প্রাসাদ লাভ করিয়াছিলেন। লাভের কারণ তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম : তাঁহারা পিতাপুত্রে নলও উডুম্বর কাষ্ঠাদি দ্বারা কোন প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

[এই জাতকের অতীতবস্তু সমস্ত প্রকীর্ণক নিপাতে সুরুচি-জাতক (৪৮৯) পাওয়া যাইবে।]

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিলেন এবং অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটি বলিলেন :

---

[১]। 'তিরিয়ম্ সোড়সপব্বেধো উচ্চং আহু সহস্সধা'—বিত্থারতো সোড়সকণ্ডপাতবিত্থারো আহোসি উচ্চমাহু সহস্সধাতি উব্বেধেন সহস্সকণ্ডগমনমত্তং উচ্চো আহু সহস্সকণ্ডগমনগণনায়ং পঞ্চবিসতি যোজনপ্পমানং হোতি বিত্থারতো পনস্স অড্ঢযোজনমত্তো। কণ্ডপাত = নিক্ষিপ্তঃশর যতদূর গিয়া পড়ে। টীকাকার এক হাজার কণ্ডপাতে ২৫ যোজন ধরিয়াছেন। ৪ ক্রোশে এক যোজন এবং ৮০০০ হাতে এক ক্রোশ ধরিলে এক কণ্ডপাত = ৮০০ হাত। অতএব ১০ কণ্ডপাত = ১ ক্রোশ। ষোল কণ্ডপাত দেড় ক্রোশের কিছু বেশী কিছু অর্দ্ধ যোজন কম।

প্রণাদ রাজার প্রকাণ্ড ভবন সুবর্ণ-নির্ম্মিত, বিচিত্রগঠন;
সাদ্ধক্রোশ তার আছিল বিস্তার উচ্চতা পঞ্চবিংশতি যোজন।
উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি যোজন, শততল সেই বিশাল ভবন।
ধ্বজমালা পরি ছিল অলঙ্কৃত চারুমরকতমণি-বিমণ্ডিত।
সাত দলে আসি শক্রের প্রেরিত দু'হাজার সেথা গন্ধর্ব্ব নাচিত।
সত্য, ভদ্রজিৎ, বলিয়াছ তুমি; প্রণাদের হেথা ছিল লীলাভূমি।
শক্ররূপে আমি ছিনু সে সময় নিরত সতত তোমার সেবায়।

ইহা শুনিবামাত্র পৃথগ্জন ভিক্ষুদিগের সংশয় নিরাকৃত হইল।

সমবধান : তখন ভদ্রজিৎ ছিল মহাপ্রণাদ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

২৬৫. ক্ষুরপ্র-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহাকে শাস্তা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিয়াছিল, হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তুমি এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কি জন্য বীর্য্যহীন হইলে? প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণপ্রদানে অসমর্থ শাসনে থাকিয়াও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বনরক্ষকের কুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশতপুরুষ-পরিবৃত হইয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা হইয়াছিলেন। তিনি বনসমীপস্থ এক গ্রামে বাস করিতেন এবং বেতন লইয়া পথিকদিগকে বন পার করাইয়া দিতেন।

একদা বারাণসীবাসী এক সার্থবাহপুত্র পঞ্চশত শকটসহ সেই গ্রামে গিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব; তুমি আমাদিগকে এই বন পার করাইয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং গ্রহণ করিবার সময়েই দাতার কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সার্থবাহ-পুত্রকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

বনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ পঞ্চশত দস্যু তাঁহাদিগকে

---

[১]। ক্ষুরপ্র = এক প্রকার তীর। ইহার ফলক অশ্বক্ষুরাকার ।

আক্রমণ করিল। দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র অন্যান্য লোকে বুকের উপর ভর দিয়া পড়িয়া রহিল; কিন্তু তাহাদের অধিনেতা গর্জ্জন ও উল্লম্ফন করিতে করিতে দস্যুদিগকে এমনভাবে প্রহার দিলেন যে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তিনি সার্থবাহপুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে কান্তার অতিক্রম করাইয়া দিলেন।

বন উত্তীর্ণ হইবার পর সার্থবাহপুত্র স্কন্ধাবার প্রস্তুত করাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং বনরক্ষক-নায়ককে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া নিজেও প্রাতরাশ সমাপন করিলেন। অনন্তর নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, যখন পঞ্চশত নিষ্ঠুর দস্যু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিল, তখনও তোমার মনে কিছুমাত্র ত্রাস জন্মে নাই, ইহার কারণ কি?" এই প্রশ্ন করিবার সময় সার্থবাহ-পুত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

শরাসন হতে ছুটে শর অগণন;
শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ;
ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
দেখিয়া এ সব তবু কেন, মতিমান্,
হয় নাই মন তব স্তম্ভিত শঙ্কায়?
কারণ ইহার বল খুলিয়া আমায়।

তাহা শুনিয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা অপর গাথা দুইটি বলিলেন :

শরাসন হতে ছুটে শর অগণন,
শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ,
ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
দেখিয়া এসব মম, শুন মতিয়ান,
বিপুল আনন্দ মনে হইল সঞ্চার;
শঙ্কার না কিছুমাত্র ছিল অধিকার।
সে আনন্দবলে করি শত্রু পরাজয়;
গ্রহণ করিনু যবে আমি, মহাশয়,
বেতন তোমার কাছে, তখন(ই) জীবন
উৎসর্গ করিনু তব রক্ষার কারণ।
বীর যেই, বীর কৃত্য করে সম্পাদন,
জীবনের মায়া করে সেই করে বিসর্জ্জন।

বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার মুখ হইতে শরবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি সার্থবাহপুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এরূপ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে

পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সার্থবাহ-পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই বনরক্ষক-নায়ক।]

---

২৬৬. বাতাগ্রসৈন্ধব-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, শ্রাবস্তীনগরে এক পরমসুন্দরী রমণী এক পরমসুন্দর সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। তাহার মনে এমন কামাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল যে তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছিল। তাহার দেহে ও চিত্তে কোনরূপ সুখ রহিল না; তাহার আহারে অরুচি জন্মিল; সে শয়নমঞ্চের কোণা ধরিয়া[২] শুইয়া রহিল। তাহার পরিচারিকাও সাথীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনে কি অশান্তি জন্মিয়াছে যে খাটের কোণা ধরিয়া পড়িয়া আছ? তোমার কি অসুখ করিয়াছে, বল।" প্রথম দুই একবার সে তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তাহারা আশ্বাস দিল, "কোন চিন্তা নাই; আমরা তাহাকে আনিয়া দিব।"

অনন্তর তাহারা গিয়া সেই ভূস্বামীর সহিত আলাপ করিল। তিনি প্রথমে তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু শেষে তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়বশত সম্মত হইলেন। তিনি অঙ্গীকার করিলেন, অমুক দিনে অমুক সময়ে যাইব।' তাহারা গিয়া উক্ত রমণীকে এই সংবাদ দিল।

রমণী তখন নিজের শয়নকক্ষ সাজাইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অলঙ্কার পরিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় পল্যঙ্কের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু তিনি যখন গিয়া খট্টার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তখন সে ভাবিল 'আমি যদি হাল্‌কা এখনই ইঁহাকে অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার স্ত্রীজনোচিত মর্য্যাদার হানি হইবে। ইনি যে দিন প্রথম আসিলেন, সেই দিনেই ইহাকে অবকাশ দান করা

---

[১]। সৈন্ধব = সিন্ধুদেশজাত বা উৎকৃষ্ট ঘোটক। বাতাগ্র = সে বাতাসের আগে আগে চলে।

[২]। "অটনিং গহেত্বা নিপজ্জি"। সংস্কৃতভাষায় অটনি শব্দের অর্থ ধনুকের কোটির যে অংশে ছিলা পরাইবার জন্য খাঁজ কাটা থাকে। শয্যার সম্বন্ধে বোধ হয় ইহার দ্বারা পারার যে ভাগ বাজুর উপরে থাকে, তাহা বুঝায়।

অকর্ত্তব্য। আজ ইঁহাকে একটু বিরক্ত করিয়া অন্যদিন অবকাশ দিলেই চলিবে।' কাজেই, ভূস্বামী যখন হস্তগ্রহণাদিদ্বারা তাহার সহিত কেলি করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে তাহার হাত ধরিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিল, "তুমি চলিয়া যাও; তোমাকে দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহাতে সেই ভূস্বামী হাত গুটাইয়া লইলেন এবং সজ্জিত হইয়া সেই স্থান হইতে উঠিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ভূস্বামী চলিয়া গেলে এই রমণীর সখীও পরিচারিকারা তাহার কাণ্ড শুনিয়া বলিতে লাগিল, "এই লোকটার প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি আহার ত্যাগ করিয়া পড়িয়াছিলে; আমরা বার বার অনুরোধ করিয়া ইহাকে লইয়া আসিলাম। তুমি ইহাকে অবকাশ দিলে না কেন বল ত?" সে তাহাদিগকে প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দিল; কিন্তু তাহারা "বেশ কিন্তু নাম জাহির করিলে" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই ভূস্বামী অতঃপর তাহাকে দেখিবার জন্য আর ফিরিলেন না। সে রমণীও তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সেই ভূস্বামী একদিন বহু মাল্যগন্ধবিলেপনসহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দাও নাই কেন?" ভূস্বামী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন, এই কারণে লজ্জায় আমি এতদিন বুদ্ধোপাসনায় যোগ দিতে পারি নাই।" "এই রমণী এখন যেমন আসক্তিবশত তোমাকে ডাকাইয়াছিল এবং তুমি উপস্থিত হইবার পর অবকাশ না দিয়া লজ্জা দিয়াছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ কোন পণ্ডিতসত্ত্বে আসক্তা হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু সে উপস্থিত হইলে অবকাশ দেয় নাই; তাহাকে নিরর্থক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সৈন্ধবকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাজার মঙ্গলাশ্ব হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বাতাগ্রসৈন্ধব। অশ্বপালেরা তাঁহাকে লইয়া গঙ্গায় স্নান করাইত। একদা কুণ্ডলী নাম্নী এক গর্দ্দভী তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইল। কামবশে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; সে ঘাস জল ত্যাগ করিল। তাহার শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সে কৃশ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইল। তাহাকে কৃশ হইতে দেখিয়া তাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে? তুমি ঘাস খাও না, জল খাও না, তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে; তুমি কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে সেখানে

পড়িয়া থাকিতেছ।” গর্দ্দভী প্রথমে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে মনের কথা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া তাহার পুত্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, “কোন চিন্তা নাই, মা; আমি তাহাকে লইয়া আসিব।”

অনন্তর বাতাগ্রসৈন্ধব যে সময়ে স্নানের জন্য যাইতেছিলেন, গর্দ্দভ-পোতক তখন তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, “পিতঃ, আমার মাতা আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আহার ত্যাগ করিয়া শীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছেন। আপনি তাঁহার প্রাণদান করুন।” “আচ্ছা বাবা, তাহাই করিব। অশ্বপালেরা আমাকে স্নান করাইয়া কিয়ৎকাল চরিবার জন্য গঙ্গাতীরে ছাড়িয়া দেয়, তোমার মাকে লইয়া সেই স্থানে আসিও।”

গর্দ্দভ-পোতক তাহার মাতাকে সেই স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল এবং নিজে একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। অশ্বপালেরাও বাতাগ্রসৈন্ধবকে সেখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। তিনি গর্দ্দভীকে দেখিয়া তাহার নিকটে গেলেন; কিন্তু তিনি নিকটে গিয়া তাহার গাত্র আঘ্রাণ করিবামাত্র গর্দ্দভী ভাবিল, ‘আমি যদি নিতান্ত হাল্‌কা হইয়া এ আসিবামাত্র অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার যশ ও স্ত্রী জনোচিত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। অতএব আমার যেন ইচ্ছাই নাই এই ভাব দেখাইতে হইবে।’ ইহা স্থির করিয়া সে সৈন্ধবের নিম্ন হনূতে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিল। সৈন্ধব-পোতকের দন্তমূল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, ‘এই গর্দ্দভীতে আমার কি প্রয়োজন?’ অনন্তর তিনিও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন গর্দ্দভীর অনুতাপ জন্মিল; সে শোকে অভিভূত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহার পুত্র অগ্রসর হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল :

যার জন্য পাণ্ডুবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার
হ’ল দেহ, খাদ্যে রুচি না ছিল তোমার
নিকটে সে সমাগত; তবে কি কারণ
যাইতেছ তুমি, মাতঃ, করি পলায়ন?

পুত্রের কথা শুনিয়া গর্দ্দভী নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

পুরুষ করিবামাত্র প্রথম দর্শন
রমণী প্রণয় যদি করে বিজ্ঞাপন,
স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার হানি হয় তায়;
সেই হেতু মাতা তব পলাইয়া যায়।

এই গাথাদ্বারা গর্দ্দভী পুত্রকে স্ত্রীজাতির স্বভাব জানাইল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :

যশস্বী সৎকুলজাত পুরুষে দেখি আগত,
অভিমানে যে না করে প্রীতি প্রদর্শন,
কত যে মনের ক্লেশ ভুঞ্জে সেই, নাহি শেষ,
তাড়াইয়া বাতাগ্রেরে কুণ্ডলী যেমন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই রমণী ছিল সেই গর্দ্দভী এবং আমি ছিলাম সেই বাতাগ্রসৈন্ধব।]

---

২৬৭. কর্কট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে আর এক রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী জনপদে অনেক অর্থ ধার দিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিলেন এবং আদায় করিয়া ফিরিবার সময় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা পরমরূপবতী ছিলেন। দস্যুদিগের অধিনেতা তাঁহার রূপ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইল যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই ভূস্বামীর প্রাণসংহারে উদ্যত হইল।

সেই রমণী অতি শীলবতী ও আচার-সম্পন্না ছিলেন এবং পতিকেই প্রধান দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি দস্যুদলপতির পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি যদি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার স্বামীর প্রাণনাশ করেন, তাহা হইলে আমি হয় বিষ খাইয়া, নয় নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিব; কিছুতেই আপনার অনুগামিনী হইব না। অতএব অকারণে আমার স্বামীকে মারিবেন না।" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তিনি দস্যুদলপতির হাত হইতে পতিকে মুক্ত করিলেন।

অতঃপর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় সঙ্কল্প করিলেন যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাওয়া যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা গন্ধকুটীতে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন 'দাদনের টাকা আদায় করিবার জন্য (জনপদে) গিয়াছিলাম।" "পথে কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?" ভূস্বামী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা পথে দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম, তাহাদের অধিনেতা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু

শেষে আমার এই ভার্য্যার প্রার্থনায় মুক্তি লাভ করিয়াছি। ইঁহার জন্যই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।” শাস্তা বলিলেন, ‘উপাসক, ইনি যে কেবল এজন্মে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি পণ্ডিতদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।” অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমবন্তের এক মহাহ্রদে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কর্কট বাস করিত। ঐ কর্কটের বাসস্থান ছিল বলিয়াই উক্ত হ্রদের ‘কুলীরদহ’ এই নাম হইয়াছিল। তাহার দেহ একটা খলমণ্ডলের ন্যায়[১] বিশাল ছিল। সে হস্তী ধরিয়া তাহাদিগকে মারিত ও খাইত। হস্তীরা তাহার ভয়ে সেই হ্রদে খাদ্যসংগ্রহের জন্য অবতরণ করিতে পারিত না।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব কুলীরদহের অবিদূরবাসী কোন গজযূথপতির ঔরসে এক হস্তীনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হস্তীনী গর্ভরক্ষার মানসে পর্ব্বতপাদান্তরে গমনপূর্ব্বক সেখানে যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করে। বোধিসত্ত্ব কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার বিশাল দেহ বীর্য্যসম্পন্ন হইল এবং পরম রমণীর অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি এক করেণুকাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্কটকে ধরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বোধিসত্ত্ব পত্নী ও মাতাকে লইয়া গজযূথের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার দর্শন লাভ করিয়া বলিলেন, ‘বাবা, আমি কর্কটটাকে ধরিব।’ যূতপতি বলিল, “বাবা, তুমি ইহা পারিবে না।” কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় সে বলিল, “চেষ্টা করিয়া দেখ; বুঝিবে, আমার কথা সত্য কি না।”

কুলীরদহের নিকটে যত হস্তী ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া সকলের সঙ্গে হ্রদের তটে গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “কর্কট হস্তীদিগকে কখন ধরে? যখন তাহারা জলে নামে, না যখন তাহারা জল হইতে উঠে?” তাহারা উত্তর দিল, “জল হইতে উঠিবার সময়ে ধরে।”

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “তবে তোমরা হ্রদে অবতরণ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ কর এবং অগ্রে উঠিয়া যাও; আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।” হস্তীরা তাহাই করিল। বোধিসত্ত্ব সকলের পশ্চাতে উঠিতেছিলেন; কর্ম্মকার বৃহৎ সন্দংশ দ্বারা যেমন লৌহপিণ্ড ধরে, কর্কটও সেইরূপ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা

---

[১]। খলমণ্ডল = খামার, যেখানে চাষারা গাছ হইতে শস্য ছাড়ায়।

বোধিসত্ত্বের পা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। বোধিসত্ত্বের পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্ব কর্কটকে স্থলাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না; পরন্তু কর্কটই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে ভীত হইয়া ক্রমাগত উচ্চরব করিতে লগিলেন; অন্য সকল হস্তী মরণভয়ে ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে পলাইয়া গেল; বোধিসত্ত্বের পত্নীও আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব, যাহাতে তাঁহার পত্নী পলায়ন না করেন সেই উদ্দেশ্যে, নিজের বদ্ধভাব বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

স্বর্গ-শৃঙ্গী, জলচর, অলোমশরীর—
অস্থিই চর্ম্মের কাজ করে যার দেহে,
মস্তক উপরে যার উঠিয়াছে ফুটি
বড় বড় চক্ষু দুটি, হেন জন্তু প্রিয়ে,
অভিভূত করিয়াছে প্রাণনাথে তব।
তাই সে করুণনাদ করে বার বার;
ছাড়িয়া যেওনা তুমি এ বিপত্তিকালে।

ইহা শুনিয়া হস্তিনী ফিরিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন :

ছাড়িব তোমায় নাথ, যষ্টি বর্ষ বয়ঃ যায়![১]
ছাড়িব না; করিতেছি যথাসাধ্য প্রতিকার।
সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে তুমি প্রিয়ে অতি;
তোমা ছাড়া অভাগীর আর কেবা আছে গতি?

এইরূপে বোধিসত্ত্বকে উৎসাহিত করিয়া হস্তীনী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি কর্কটের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া তোমায় মুক্ত করিতেছি।" অনন্তর তিনি কর্কটকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

সমুদ্রে, গঙ্গার গর্ভে, অথবা নর্ম্মদা নীরে
বাস করে যত জলচর,
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ, তাই কান্দি মাগি ভিক্ষা,
ছেড়ে দাও পতিরে আমার।

করেণুকা যখন এই গাথা বলিতে লাগিলেন, তখন বামাকণ্ঠস্বরে কর্কটের মন মুগ্ধ হইল, এবং সে নির্ভয়ে বোধিসত্ত্বের পা হইতে নিজের শৃঙ্গ শিথিল করিয়া

---

[১]। ষাট বৎসর বয়স হইলে হস্তীরা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন হয়।

লইল—বোধিসত্ত্ব বিমুক্ত হইলে কি করিবেন তাহা ভাবিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তখনই পা তুলিয়া কর্কটের পৃষ্ঠোপরি দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাহার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি বিজয়নাদ করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া অপর হস্তীগুলি আবার সেখানে ফিরিয়া আসিল এবং কর্কটকে টানিয়া তুলিয়া ও ভূতলে রাখিয়া এমনভাবে মর্দ্দন করিতে লাগিল যে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় দেহ হইতে পৃথক হইয়া অন্য এক স্থানে পতিত হইল।

কুলীরদহ গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল। কাজেই যখন গঙ্গা জলপূর্ণ হইত, তখন ইহাও গঙ্গাজলে পূরিয়া উঠিত; গঙ্গার জল কমিলে দহ হইতে গঙ্গায় জল আসিয়া পড়িত। এইরূপে কর্কটের শৃঙ্গদ্বয় গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের একটি সমুদ্রে প্রবেশ করিল; অপরটি যখন রাজকুলজাত দশ সহোদর[১] জলকেলি করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহারা ইহা দ্বারা আনক নামক মৃদঙ্গ প্রস্তুত করাইলেন। যে শৃঙ্গটা সমুদ্রে গিয়াছিল, তাহা অসুরদিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহারা তদ্দ্বারা আড়ম্বর নামক ভেরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। অতঃপর অসুরেরা যখন শক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয় এবং এই ভেরী ফেলিয়া পলাইয়া যায়, তখন শক্র ইহা নিজের ব্যবহার্থ গ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই লোকে বলিয়া থাকে, "আড়ম্বর মেঘের ন্যায় বজ্রধ্বনি হইতেছে।"

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূস্বামী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই উপাসিকা ছিলেন সেই করেণুকা এবং আমি ছিলাম তাহার পতি।]

☞ বিরুটস্তূপে এই জাতকের ছবি আছে। তত্রত্য প্রস্তর-ফলকে ইহার 'নাগ-জাতক' এই নাম উৎকীর্ণ আছে।

---

[১]। 'দশ ভাই' সম্বন্ধে ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। বসুদেব আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপূরাণে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খরূপী পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া তাহার কঙ্কাল দ্বারা পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

২৬৮. আরামদূস-জাতক[১]

[শাস্তা দক্ষিণগিরিতে অবস্থিতিকালে কোন উদ্যানপালপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শাস্তা বর্ষাবাসান্তে জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণগিরি জনপদে ভিক্ষাচার্য্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যবাগূ ও চর্ব্ব্যভোজ্যাদি দিবার পর বলিয়াছিলেন, 'প্রভুরা যদি উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখিতে পারেন।" অনন্তর তিনি উদ্যানপালকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রভুরা যদি কোন ফল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দিবে।"

ভিক্ষুরা বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন উদ্যানের এক অংশ বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে। তাঁহারা উদ্যানপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থান পতিত ও বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে কেন?" উদ্যানপাল উত্তর দিল, "এক উদ্যানপালের পুত্র কতগুলি চারা গাছে জল সেচন করিতে গিয়া স্থির করিয়াছিল, যে গাছের মূল যত লম্বা, তাহাতে সেই পরিমাণে জল দিতে হইবে এবং এইজন্য সে গাছগুলি উপড়াইয়া তাহাদের মূলপ্রমাণ জল সেচন করিতেছিল। এস্থানে যে বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ।" ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই বালক কেবল এ জন্মে নহে; পূর্ব্বজন্মেও উদ্যানের অনিষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ বিশ্বসেনের সময় একবার একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক উদ্যানপাল উৎসবে যোগ দিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার আশায় উদ্যানবাসী মর্কটদিগকে বলিল, "এই উদ্যান হইতে তোমরা বহু উপকার পাইয়া থাক। আমি সপ্তাহকাল উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিব; তোমরা এই সাত দিন চারা গাছগুলিতে জল সেচন করিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিল। উদ্যানপালও তাহাদিগকে কতকগুলি চর্ম্মঘট দিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর মর্কটেরা জল সেচন করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে আরম্ভ করিল।

---

[১]। প্রথম খণ্ডেও এই নামে এক জাতক আছে (৪৬)। ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহার গাথাও বিভিন্ন।

এই সময়ে তাহাদের পালের অধিনেতা বলিল, "একটু সবুর কর, জল চিরদিনই দুর্লভ; কাজেই হিসাব করিয়া খরচ করা আবশ্যক। গাছগুলি উপড়াইয়া দেখা যাউক কোনটার মূল কত লম্বা। মূল দীর্ঘ হইলে বেশী জল, মূল হ্রস্ব হইলে কম জল সেচন করিলেই চলিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এক দলে গাছ উপড়াইয়া চলিল এবং এক দলে সেগুলি পুনর্ব্বার রোপণ করিয়া তাহাদের মূলে জল সেচন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন কারণে উদ্যানে গিয়া মর্কটদিগের সেই কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাদিগকে এরূপ করিতে বলিয়াছে?" তাহারা উত্তর দিল "আমাদের অধিনেতা"। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, তোমাদের অধিনেতারই যদি এইরূপ বুদ্ধি হয়, তবে তোমাদের না জানি আরও কিরূপ হইবে।" তিনি এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

সকলের শ্রেষ্ঠ বলি মানিয়াছ যায়,
তাহার(ই) বুদ্ধির দৌড় এই যদি হয়,
না জানি কেমন বুদ্ধি অন্য সবাকার!
দেখে শুনে চমৎকার লেগেছে আমার।

ইহা শুনিয়া বানরেরা দ্বিতীয় গাথা বলিল :

আমাদের নিন্দা তুমি কর অকারণ,
নহি মোরা গণ্ডমূর্খ, শুনহে ব্রাহ্মণ।
না দেখিয়া মূল, কেহ পারে কি জানিতে
কোন গাছে কত জল হইবে সেচিতে?

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

নিন্দা তোমাদের কিংবা অন্য বানরের
করি না এক্ষেত্রে আমি; ভাজন নিন্দার
প্রকৃত সে বিশ্বসেন, উদ্যানে যাহার
হইয়াছে স্থান হেন বৃক্ষরোপকের।

[**সমবধান :** তখন এই উদ্যাননাশক বালক ছিল বানরদিগের সেই অধিনেতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

---

২৬৯. সুজাতা-জাতক

[ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা, বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতা অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

সুজাতা যখন অনাথপিণ্ডদের সংসারে প্রবেশ করেন, তখন পিত্রালয় হইতে অনেক দাসদাসী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 'আমি উচ্চ কুলের কন্যা' এই গর্ব্বে তিনি প্রচণ্ডা, ক্রোধনা ও পরুষভাষিণী হইয়াছিলেন। তিনি শশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামী, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিতেন না, বাড়ীর দাসদাসীদিগকে নিয়ত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন, কখনও কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদিন শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া অনাথপিণ্ডদের গৃহে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে সুজাতা দাসদাসীদিগের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাস্তা ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, 'ভগবান আমার পুত্রবধূটি ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিতেছেন। তিনি গুরুজনকে ভয় করেন না, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামীর কথা শুনেন না; তাঁহার না আছে দান, না আছে শীল, না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি। তিনি গৃহস্থিত সকলের সঙ্গে কেবল অহোরাত্র কলহ করিয়া বিচরণ করেন।" 'তুমি তাহাকে এখানে আসিতে বল।" তদনুসারে সুজাতে শাস্তার সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "সুজাতা ভার্য্যা সাত প্রকার; তুমি তন্মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত?" সুজাতা বলিলেন, 'প্রভো, আপনি প্রশ্নটি অতি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিলেন; কাজেই আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া সবিস্তর বলুন।" "বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।" সুজাতা উপবেশন করিলে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

দুষ্টমতি, হিতব্রতে চিত্ত নাহি ধায়,
পতির সম্পত্তি সব দুহাতে উড়ায়;
নিজ পতি ঘৃণা করে, পর পুরুষের তরে
অথচ যাহার মন হয় উচাটন,
বধকা'[১] যে ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।
শিল্প বা বাণিজ্য কিংবা কৃষির শরণ
লইয়া যে ধন পতি করেন অর্জ্জন,
নিজ ব্যবহার তরে, যে তাহার অংশ হয়ে
পতির যে কষ্ট হবে ভাবে না কখন,
'চৌরী' হেন ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।
কাজের নামেতে গায়ে জ্বর আসে যার,

[১]। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বন্ধকী' এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা 'পুংশ্চলী' অর্থবাচক।

অলসা, অথচ করে প্রচুর আহার,
কোপনা দুর্ম্মুখা অতি, নাহি দয়া কারো প্রতি,
দাসদাসী জনে করে নিয়ত পীড়ন;
'আর্য্যা' সেই ভার্য্যা[১] ইহা বলে সর্বজন।
চিত্ত যার সদা হিতব্রতপরায়ণ,
পতির সম্পত্তি যত্নে করে সংরক্ষণ;
যেরূপ যতনে মাতা, পুত্রের পালনে রতা,
পতির শুশ্রূষা তথা করে অনুক্ষণ,
'মাতৃসমা' হেন ভার্য্যা বলে সর্ব্বজন।
কনিষ্ঠা ভগিণী যথা জ্যেষ্ঠ সহোদরে
নিয়ত সম্মান করে প্রফুল্ল অন্তরে,
সেইরূপ যে গৃহিনী, পতির বশবর্ত্তিনী,
লজ্জাবশে মুখে যার না সরে বচন,
সে ভার্য্যা 'ভগিনীসমা' বলে সর্ব্বজন।
বিলম্বে সখার সঙ্গে ঘটিল মিলন
সখী যথা সুখী তার নেহারি বদন,
হেরিলে পতির মুখ, তেমনি যে পায় সুখ,
সুজাতা, সুশীলা, সাধ্বী রমণীরতন,
হেন ভার্য্যা 'সখীসমা' বলে সর্ব্বজন।
উৎপীড়নে অসন্তোষ না উপজে বার,
দণ্ডভরে কম্পমান সদা কলেবর,
সুশীলা তিতিক্ষাবতী, ক্রোধহীনা হেন সতী,
তুষিতে পতির মন রত অনুক্ষণ;
'দাসী' সেই ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

এখন বুঝিলে, সুজাতে, যে পুরুষের সাত প্রকার ভার্য্যা হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বধকা, চৌরী ও প্রচণ্ডা, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে যায়, অপর চতুর্ব্বিধা রমণী নির্ম্মাণরতি[২] নামক দেবলোক লাভ করেন।

---

[১]। 'আর্য্য' শব্দ এখানে 'প্রচণ্ডা' বা 'চণ্ডী' অর্থবাচক-ইংরাজী `milady' শব্দের মত। মেজাজ কড়া, কথাবার্তা, চালচলন একটু উচু রকমের এবং পতির উপর প্রভুত্ব, এই সকল ভাব বুঝিতে হইবে। সপ্তবিধ ভার্য্যার বিবরণ সূত্রপিটকের সপ্তভার্য্যাসূত্রে দেখা যায়।

[২]। স্বর্গের অংশবিশেষ; ইহা ঊর্দ্ধতম পঞ্চম স্তরে অবস্থিত।

বধকা, প্রচণ্ডা, চৌরী অতীব দুঃশীলা,
দয়া মায়া নাহি জানে, গুরুজনে নাহি মানে,
নরকে যাইবে সাঙ্গ করি ভবলীলা।
জননী-অনুজা-সখী-দাসী-সমা যারা,
স্ব স্ব সুশীলতা-বলে, নিত্য সংযমের ফলে,
দেহান্তে স্বরগে স্থান লভিবে তাহারা।

শাস্তা উক্ত সপ্তবিধ ভার্য্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিলে সুজাতা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন; এবং শাস্তা যখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাও, তখন তিনি উত্তর দিলেন," "আমি দাসী হইব।" অনন্তর সুজাতা তথাগতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শাস্তা এইরূপে একবার মাত্র উপদেশ দিয়া অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ সুজাতাকে বিনয় শিক্ষা দিলেন। তৎপরে তিনি ভোজন শেষপূর্ব্বক জেতবনে প্রতিগমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তা গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! শাস্তা একবার মাত্র উপদেশ দিয়া এই কুলবধূর মতি ফিরাইলেন এবং তাঁহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও আমি একবার মাত্র উপদেশ দিয়া ধর্ম্মের দিকে সুজাতার মন আকৃষ্ট করিয়াছিলাম"। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্বের জননী অতি ক্রোধনা, নিষ্ঠুরা, উগ্রস্বভাবা, কলহপ্রিয়া ও পরুষভাষিণী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের অনেক সময় ইচ্ছা হইত যে জননীকে কিছু সদুপদেশ দেন; কিন্তু পাছে তাহারা গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি জননীকে উপমা দ্বারা কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব জননীকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গমন করিতেছেন, এমন

সময়ে পথে একটা নীলকণ্ঠ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা সেই শব্দ শুনিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরোধপূর্ব্বক বলিল, "কি বিকট রব! কি কর্কশ স্বর! থামরে বাপু! কান ঝালাপালা হইয়া গেল যে!"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন নটগণ-পরিবৃত হইয়া জননীর সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে নিলীন একটি কোকিল মধুরস্বরে কূজন আরম্ভ করিল। সমস্ত লোক সেই কলস্বরে এমন মোহিত হইল যে তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অহো! কি সুস্নিগ্ধ স্বর! কি শ্রুতিসুখকর স্বর! কি মৃদুস্বর! বিহঙ্গবর, তুমি আবার গান কর।" ইহা বলিয়া তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া ও কান পাতিয়া বৃক্ষের দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপারদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'এবার জননীকে বুঝাইবার অতি সুন্দর অবসর উপস্থিত হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, "দেখ মা, পথে নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিকট চীৎকার শুনিয়া লোকে 'থাম্ থাম্' বলিয়া কানে আঙ্গুল দিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে পরুষশব্দ সকলেরই অপ্রিয়।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :

চিত্রিত উত্তম বর্ণে, সুঠাম, সুন্দর,
অথচ কর্কশ যদি হয় কণ্ঠস্বর,
ইহলোকে, পরলোকে, জানিবে নিশ্চয়
হেন জীব কাহার(ও) না প্রিয়পাত্র হয়।
অতি কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ কলেবর,
তাহাও তিলকে মিশে হয়েছে ধূসর;[১]
এ হেন কোকিল তোষে সবাকার মন
কেবল মধুর স্বর করি বরষণ।
দেখি ইহা শিখে সবে হতে প্রিয়ংবদ,
মিতভাষী, অনুদ্ধত, ছাড়ি ক্রোধ, মদ;
শুনিলে তাদের শ্রুতিমধুর বচন
কৃতার্থ ধর্ম্মার্থ লভি হয় ত্রিভুবন।[২]

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাত্রয় দ্বারা জননীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং তদবধি সেই রমণী সদাচারসম্পন্না হইলেন। বোধিসত্ত্ব এই একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই জননীকে সংযতা হইতে শিখাইলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ

[১]। ধূসর তিলক পাপিয়ার গায়ে দেখা যায়, কোকিলের গায়ে নাই।
[২]। এই গাথার শেষার্দ্ধ ধর্ম্মপদে (৩৬৩ শ্লোকে) দেখা যায়।

গতি লাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন সুজাতা ছিলেন সেই বারাণসীরাজের মাতা এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

----

২৭০. উলূক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কাকের ও উলূকের মধ্যে নিত্যকলহ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাকেরা দিবাভাগে উলূকদিগকে খাইত; উলূকেরাও সূর্য্যাস্তের পর স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া কাকগুলি ঘুমাইয়া আছে দেখিলেই তাহাদের মাথা কাটিয়া প্রাণনাশ করিত। জেতবনের নিকটে এক পরিবেণে এক ভিক্ষু বাস করিতেন। যখন পরিবেণের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সম্মার্জ্জন করিবার সময় হইত, তখন বৃক্ষ হইতে এত কাকের মাথা পড়িয়া থাকিত যে প্রতিদিন তাঁহাকে সেগুলির সাত আট ঝুড়ি তুলিয়া ফেলিতে হইত। তিনি ভিক্ষুদিগকে এই ব্যাপার জানাইলেন; ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষুর বাসস্থান হইতে প্রতিদিন নাকি এত এত কাকের মাথা ঝাঁট দিয়া ফেলিতে হয়।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, কোন সময় হইতে কাক ও উলূকদিগের মধ্যে এই বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "প্রথম কল্প হইতে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে—সৃষ্টির প্রথম কল্পে—মানবগণ সম্মিলিত হইয়া এক সুশ্রী, সুলক্ষণযুক্ত, আজ্ঞাসম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আপনাদের রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল।[১] চতুষ্পদেরাও একত্র হইয়া এক সিংহকে এবং মহাসমুদ্রবাসী মৎস্যেরা আনন্দ নামক মৎস্যকে স্ব স্ব রাজপদে বরণ করিয়াছিল।

---

১ । এখানে মূলে 'অভিরূপং সোভাগ্গপপত্তমং আঞ্ঞাসম্পন্নং সব্বাকারপরিপুণ্ণং' এই চারিটি বিশেষণ আছে। ইহাদেরে মধ্যে প্রথম দুইটী ও চতুর্থটীর মধ্যে পার্থক্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। 'আজ্ঞাসম্পন্ন' বলিলে বাহার চেহারা যে দেখিলেই লোকে তাহার আজ্ঞাপালন করে (of commanding presence) এরূপ বুঝায়।

অতঃপর পক্ষীরা হিমবন্তপ্রদেশে এক শিলাতলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মানুষের রাজা হইল, চতুষ্পদদিগের রাজা হইল, মৎস্যদিগেরও রাজা হইল; কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাস করা অনুচিত; অতএব আমাদিগেরও একজন রাজা থাকা আবশ্যক। দেখা যাউক আমাদের মধ্যে কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত।"

অনন্তর পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল কে তাহাদের রাজা হইবার যোগ্য। তাহারা এক উলূককে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ইহাকেই আমরা মনোনীত করিতেছি।" তখন একটা পাখি সকলের মত জানিবার জন্য তিনবার উলূকের নির্ব্বাচন ঘোষণা করিল। একটা কাক দুইবার সহিষ্ণুভাবে এই ঘোষণা শুনিল; কিন্তু পরে উঠিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা কর; যদি রাজ্যাভিষেকের সময়েই উলূক মহাশয়ের এইরূপ মুখশ্রী হয়, তবে যখন ইনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তখন না জানি ইহা আরও কত ভয়ঙ্করী হইবে! ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটি করিবেন, তখন আমাদের তপ্তপাত্রনিক্ষিপ্ত তিলের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিবে—আমরা কে কোথায় যে প্রক্ষিপ্ত হইব তাহা বলিতে পারি না। সমবেত সভ্যগণ, এই নিমিত্ত ইঁহার নির্ব্বাচন আমার অভিপ্রেত নহে।" এই ভাব আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কাক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

উপস্থিত যত মম জ্ঞাতি-বন্ধুগণ
করিলে কৌশিকে রাজপদে নির্ব্বাচন,
অনুমতি আমি যদি সবাকার পাই,
এ বিষয়ে নিজ মত বলি চলি যাই।

অনন্তর শকুনেরা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাহাকে অনুমতি দিল :

দিনু সবে অনুমতি হে সৌম্য তোমায়,
যাহা পরম্পরাগত ধর্ম্ম-অর্থসুসঙ্গত
বলি তাহা অপনীত করহ সংশয়।
আর আর বহু পক্ষী আসিয়াছে বটে,
প্রজ্ঞাবান দ্যুতিমান বলি তারা পায় মান;
তবু অর্ব্বাচীন তারা তোমার নিকটে।

এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া কাক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিল :

হউক মঙ্গল ভাই, তোমা সবাকার
পেচক-রাজত্ব ভাল না লাগে আমার।
মুখশ্রী, অক্রুদ্ধ যবে, এইরূপ যার,
ক্রুদ্ধ হ'লে তার হাতে নাহিক নিস্তার।

কাক ইহা বলিয়া "আমার ইহাতে মত নাই, আমি ইহা অনুমোদন করি না"

এইরূপ রব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া গেল। উলূকও আসন হইতে উঠিয়া তাহার অনুধাবন করিল। তদবধি ইহাদের পরস্পরের প্রতি বৈরভাব সঞ্জাত হইয়াছে।

অতঃপর শকুনেরা সুবর্ণহংসকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই হংস, যে পক্ষীদিগের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।]

ধপঞ্চতন্ত্রে (মিত্রসংপ্রাপ্তিতে) স্বাভাবিক বৈরীর এই কয়টি উদাহরণ দেখা যায়—নকুল-সর্প; শস্পভুঙ; নখায়ুধ জল-বহ্নি; দেব-দৈত; সারমেয়-মার্জার; ঈশ্বর-দরিদ্র; সপত্নী; সিংহ-গজ; লুব্ধক-হরিণ; শ্রোত্রিয়-ভ্রষ্টক্রিয়; মূর্খ-পণ্ডিত; পতিব্রতা-কুলটা; সজ্জন-দুর্জ্জন ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্র (কাকোলূকীয়ে) কাক ও পেচকের স্বাভাবিক বৈরভাব-সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা দেখা যায়, তাহার সঙ্গে এই জাতক প্রায় এক। পক্ষীরা সমবেত হইয়া বলিল, "বৈনতেয় বাসুদেবভক্ত; তিনি আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখেন না; অতএব অন্য কোন পক্ষীকে রাজা করা হউক।" অনন্তর তাহারা উলূককে রাজা ও কৃকালিকাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিল; কিন্তু বায়স আসিয়া অভিষেক পণ্ড করিল। সে বলিল :

বক্রনাসং সুজিহ্মাক্ষং ক্রূরমপ্রিয়দর্শনম্
অক্রুদ্ধস্যেদৃশং বক্ত্রং ভবেৎ ক্রুদ্ধস্য কীদৃশম্।

তথাচ স্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রং ক্রুয়মপ্রিয়বাদিনম্
উলূকং নৃপতিং কৃত্বা কা নঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।

কথাসরিৎসাগরেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। ঈষপের গল্পে ময়ূরকে রাজা করিবার কথা হইলে jackdaw বলিয়াছিল, "তুমি ত রাজা হইবে, কিন্তু উৎক্রোশ যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন কে রক্ষা করিবে বল ত?"

---

২৭১. উদপান-দূসক-জাতক

[একটা শৃগাল কোন কূপের জল দূষিত করিয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষিপতনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা যে কূপের জলপান করিতেন, একটা শৃগাল নাকি মলমূত্রত্যাগ করিয়া তাহার জল নষ্ট করিয়া যাইত। একদিন তাহাকে ঐ কূপের নিকট দেখিতে পাইয়া শ্রামণেরেরা ঢিল ছুড়িয়া তাড়া করিয়াছিল। ইহার পর সে শৃগাল

আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই।

ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, যে শৃগালটা কূপের জল অপবিত্র করিত, শ্রামণেরদিগের হাতে প্রহার পাওয়া অবধি সে আর ওদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "সেই শৃগাল যে কেবল এ জন্মেই কূপের জল নষ্ট করিয়াছে এমন নহে; পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে এই ঋষিপতন এবং এই কূপই ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরের কোন ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া ঋষিপতনে বাস করিতেন। ঐ সময়ে একটা শৃগাল এই কূপটার জল দূষিত করিয়া যাইত। অনন্তর একদিন তাপসেরা তাহাকে ঘিরিয়া এবং কোনরূপে ধরিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব শৃগালের সহিত আলাপ করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথটি বলিয়াছিলেন :

অরণ্যে তপস্যা করি ঋষি বহুকাল
কত কষ্ট কূপ এই করিলা খনন;
কি নিমিত্ত জল তার, বল ত শৃগাল,
নষ্ট কর প্রতিদিন তুমি অকারণ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিয়াছিল :

শৃগালের রীতি এই, যেথা খায় জল,
সেখানেই ত্যাগ করে মূত্র আর মল।
পিতা, পিতামহ হ'তে পেয়েছি এই ধর্ম্ম;
এতে ক্রুদ্ধ হওয়া তব অনুচিত কর্ম্ম।

তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাটি বলিয়াছিলেন :

এই যদি ধর্ম্ম হয় শৃগাল-সমাজে,
না জানি অধর্ম্মভাব হয় কোন কাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের আর যেন, ভাই,
কখনও আমরা হেথা দেখিতে না পাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শৃগালকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাবধান, আর কখনও এ মুখো হইও না।' তদবধি সে শৃগাল আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন এই শৃগাল সেই কূপ দূষিত করিয়াছিল এবং আমি ছিলাম সেই গণশাস্তা।]

---

২৭২. ব্যাঘ্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিকের বৃত্তান্ত ত্রয়োদশ নিপাতে তক্কারিয় জাতকে (৪৮১) বলা যাইবে। সারিপুত্র ও মোদ্গাল্যায়নকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে কোকালিক নিজের দেশ হইতে জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গমন করিল এবং বলিল, "চল ভাই, কোকালিকের দেশবাসীরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" স্থবিরদ্বয় বলিলেন, "তুমিই যাও ভাই, আমরা যাইব না।" এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোকালিক একাকীই গমন করিল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনা লইয়া ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ ভাই, কোকালিক সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারে না, অথচ ইঁহাদিগকে না পাইলেও তাহার চলে না। ইহাদের সহিত সংযোগও তাহার অসহ্য, আবার ইঁহাদের বিয়োগও তাহার অসহ্য।" এই সময়ে শাস্তা সেখানেই উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও কোকালিক সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারিত না, আবার ইঁহাদিগকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারিত না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমানের অনতিদূরে অন্য একটি বৃহৎ বনস্পতিতে আর এক জন বৃক্ষদেবতা বাস করিতেন। ঐ বনে এক সিংহ এবং এক ব্যাঘ্র বাস করিত। তাহাদের ভয়ে কেহ ঐ বনে যাইত না, গাছ কাটিত না, এমন কি সে দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও সাহস করিত না। ঐ সিংহ ও ব্যাঘ্র নানাপ্রকার মৃগ মারিয়া খাইত এবং ভোজনান্তে যাহা থাকিত তাহা সেখানেই ফেলিয়া যাইত। কাজেই অশুচি গলিতমাংসাদির গন্ধে সেই বনে তিষ্ঠা ভার হইত।

বোধিসত্ত্বের প্রতিবেশিনী বৃক্ষদেবতা অল্পমতি ও কারণাকারণানভিজ্ঞা

ছিলেন। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, ‘সৌম্য, এই হিংস ও ব্যাগ্রের দৌরাত্ম্যে বনভূমি অশুচি ও গলিতমাংসাদির গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে; যাহাতে ইহারা পলাইয়া যায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।” বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, “ভদ্রে এই দুইটা আছে বলিয়াই এতদিন আমাদের বিমান রক্ষা পাইয়াছে; ইহারা পলায়ণ করিলে আমাদের বিমান বিনষ্ট হইবে, কারণ সিংহ ও ব্যাগ্রের পদচিহ্ন না দেখিলে লোকে সমস্ত বন কাটিয়া সমভূমি করিবে এবং চাষবাস করিবে। অতএব তুমি এ অভিপ্রায় ত্যাগ কর।

যে মিত্রের কুসংসর্গে হয় শান্তিনাশ
সতর্ক হইয়া কর সঙ্গে তার বাস।
আত্মাকে যতনে রক্ষা হেন মিত্র হ’তে,
নিজ চক্ষুদ্বয়বৎ করেন পণ্ডিতে।
যে মিত্রের সঙ্গে থাকি শান্তির বর্দ্ধন
হয়, তারে আত্মবৎ করহ যতন।”
সকল বিষয়ে সব পণ্ডিতের ঠাঁই,
নিজে আর হেন মিত্রে ভেদ কিছু নাই।”

বোধিসত্ত্ব এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সেই অল্পমতি দেবতা ইহাতে মন দিলেন না, তিনি একদিন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাইলেন; কাজেই তাহারা পলাইয়া গেল। লোকে আর তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না- বুঝিল যে তাহারা বনান্তরে গিয়াছে। অমনই তাহারা উক্ত বনের এক অংশ কাটিয়া ফেলিল। তখন অল্পমতি দেবতা আবার বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, “সৌম্য, আমি তোমার কথামত কাজ করি নাই, ভয় দেখাইয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রটাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে জানিয়া মানুষে বন কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন বল কি কর্ত্তব্য?” বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, “তাহারা এখন অমুক বনে আছে; তুমি গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আইস।” তদনুসারে সেই অল্পমতি দেবতা তখনই তাহাদের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে,
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিবে কেমন?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিব না আর;
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।

দেবতা কর্ত্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইয়াও সেই সিংহ ও ব্যাঘ্র বলিল, “তুমি দূর হও, আমরা সেখানে যাইতেছি না।” কাজেই দেবতা একাকিনী বনে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে লোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কাটিয়া ক্ষেত প্রস্তুত

করিল এবং চাষ আবাদ করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান : তখন কোকালিক ছিল সেই মূর্খ দেবতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত দেবতা।]

---

২৭৩. কচ্ছপ-জাতক

[কোশলরাজের দুইজন মহামাত্রেয় বিবাদভঞ্জন হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত বস্তু দ্বিনিপাতে বলা হইয়াছে।[১]

আসীৎ পুরা বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম রাজা। তস্মিংশ্চ রাজ্যং কুর্ব্বতি বোধিসত্ত্বঃ কাশীরাষ্ট্রে কস্মিংশ্চিদ ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তরমবাপ্য প্রাপ্তবয়াস্তক্ষশিলাং গত্বা বহূনি শাস্ত্রণ্যধ্যৈষ্ট। অথ স বীতঃকামঃ প্রব্রজ্যামাশ্রিত্য হিমবৎপ্রদেশে গঙ্গাতীরে আশ্রমপদং পরিকল্প্য অভিজ্ঞাঃ সমাপত্তীশ্চ সমালভ্য ধ্যানসুখনুববন্ তস্থৌ। অস্মিন কিল জন্মানি বোধিসত্ত্বাঃ পরমমধ্যস্থ আসীদুপেক্ষা-পারমিতাঞ্চানুষ্ঠিতবান।

অথৈকো দুঃশীলঃ প্রগল্ভঃ শাখামৃগঃ পর্ণশালাদ্বারে নিষণ্নস্য তস্য শ্রোত্রবিবরে যদা তদা সমাগত্য মেহনং প্রবেশ্য রেতঃপাতয়িতুমারেভে; বোধিসত্ত্বস্তু পরমমধ্যস্থত্বাত্তং ন নিবারয়ামাস। এবং গচ্ছিতকালে একদা কশ্চিৎ কচ্ছপ উদকাদুত্থায় মুখংব্যাদায় গঙ্গাতটে আতপমুপসেবমানঃ সুস্বাপ। তমালোক্য স লোলো মর্কটস্তস্য মুখবিবরে মেহনপ্রবেশনমকার্ষীৎ। কচ্ছপন্তু প্রবুদ্ধঃ সমুদগকে নিক্ষিপ্তমিব তন্মেহনমদষ্ট। ততো বলবতী বেদনাস্য সঞ্জাতা। তামসহমানো মর্কটোহচিন্তয়ৎ কো নু খলু মামস্মাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাতুং সমর্থস্তাপসাদন্যঃ। তন্ময়া গন্তব্যমস্যান্তিকম্। ইতি বিচার্য্য স দ্বাভ্যাং হস্তাভ্যাং কচ্ছপমুদ্ধৃত্য বোধিসত্ত্বস্যান্তিকমুপাগমৎ।

বোধিসত্ত্বস্তু তেন দুঃশীলেন মর্কটেন সহ দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রথমাং গাথামাহ :

> ব্রাহ্মণঃ কোহয়মায়াতি পাণৌ ধৃতান্নভাণ্ডকঃ?
> কুত্র ভিক্ষা ত্বয়া লব্ধ? কস্য শ্রাদ্ধেহসিবা ব্রতী?

তচ্ছ্রুত্বা দুঃশীলো মর্কটো দ্বিতীয়াং গাথামাহঃ-

> শাখামৃগোহস্মি দুর্মেধা; অমৃশং পদমামৃশম্।
> ত্বং মাং মোচয়, ভদ্রং তে; মুক্তো গচ্ছামি পর্ব্বতম ॥

---

[১]। উরগ-জাতক (১৫৪) এবং নকুল-জাতক (১৬৫)।

বোধিসত্ত্বস্ততঃ কচ্ছপেন সহ সংলপন্ তৃতীয়াং গাথামাহ :

কাশ্যপাঃ কচ্ছপা জ্ঞেয়াঃ, কৌণ্ডিন্যা মর্কটঃ স্মৃতাঃ।
মুঞ্চ কাশ্যপ কৌণ্ডিন্যং; কৃতং মৈথুনকং ত্বয়া ॥

এতদ্ বোধিসত্ত্ববচনং শ্রুত্বা কচ্ছপঃ সুপ্রসন্নস্তন্মর্কটমেহনং মুমোচ। মর্কটোহপি মুক্তমাত্রো বোধিসত্ত্বং প্রণম্য পলায়িতঃ; নচ তৎস্থানং পুনাবৃত্যাপি পুনরালোকয়ৎ। কচ্ছপোহপি বোধিসত্ত্বং নমস্কৃত্য যথাস্থানং গতঃ। বোধিসত্ত্বোহপ্যপরিহীনধ্যানো ব্রহ্মলোকপরায়ণো বভুব।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান : এই মহামাত্রদ্বয় ছিলেন সেই কচ্ছপ ও বানর এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৭৪. লোল-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক লোভী ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "তুমি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অতিলোভবশত প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমারই দোষে পণ্ডিতেরা নিজ বাসস্থান হইতে বিদূরিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পাচক পুণ্য সঞ্চয় করিবার মানসে পাকশালায় পক্ষীর বাসের জন্য একটা ঝুড়ি রাখিয়া দিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব পারাবতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ঝুড়িতে বাস করিতেন।

একদিন একটা লোভী কাক পাকশালার মটকার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবারকালে দেখিতে পাইল, সেখানে নানা প্রকার মৎস্য ও মাংস রহিয়াছে। ইহাতে সে লোভাভিভূত হইল এবং ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই সমস্ত খাইবার অবকাশ পাইব? অতঃপর সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া স্থির করিল, এই পায়রাটার সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব।

বোধিসত্ত্ব যখন আহার-সংগ্রহের জন্য বনে চলিলেন, তখন কাক নিজের দুষ্ট

---

[১]। এই জাকতটি প্রথম খণ্ডে দেখা যায় (৪২)। সেখানে ইহার কপোত-জাতক।

অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার খাদ্য একরূপ, তোমার খাদ্য অন্যরূপ; তুমি কেন আমার পিছনে পিছনে আসিতেছ?" কাক উত্তর করিল, "আপনার স্বভাবে আমি মুগ্ধ হইয়াছি; কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি যেখানে চরিবেন, আমিও সেখানে চরিব এবং আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।" বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইলেন।

চরিবার ভূমিতে গিয়া কাক দেখাইতে লাগিল বটে যে সে বোধিসত্ত্বের সহিত একই স্থানে চরিতেছে; কিন্তু সুযোগ পাইলে সে পিছনে গিয়া গোবরের তালগুলি ভাঙ্গিয়া কীট খাইতে লাগিল, এবং যখন নিজের পেটটি ভরিল, তখন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "আপনার চরিতে এত সময় লাগে? আহারের সম্বন্ধে পরিমাণ বুঝিয়া চলা উচিত। চলুন, আর বিলম্ব করিলে আমরা যথাসময়ে ফিরিতে পারিব না।"

বোধিসত্ত্ব কাককে সঙ্গে লইয়া বাস স্থানে ফিরিলেন। পাচক দেখিল পারাবত একটি বন্ধু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; অতএব সে কাকের জন্যও একটা তুষের ঝুড়ি বান্ধিয়া দিল। এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাক বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠীর গৃহে বহু মৎস্য মাংস আনীত হইল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল। সে প্রত্যূষকাল হইতেই পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল এবং কোঁথ পাড়িতে লাগিল। ভোর হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই।" কাক বলিল, "আজ আপনি যান; আমার বড় অজীর্ণদোষ হইয়াছে।" "ভাই, কাকের ত কখনও অজীর্ণ রোগের কথা শুনা যায় না; দীপবর্ত্তিকা খাইলে তাহা তোমাদের পেটে কিছুকাল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্য যাহা খাও, তাহা ত তৎক্ষনাৎ জীর্ণ করিয়া ফেলে। আমি যাহা বলি, তাহা কর; এই মৎস্য মাংস দেখিয়া এরূপ (লোভ) করিও না।" "প্রভু, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমার সত্য অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে।" "আচ্ছা নাই গেলে; কিন্তু সাবধান; কোন অন্যায় কাজ করিও না।" কাককে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন।

এ দিকে পাচক নানা প্রকার মৎস্য মাংস দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিল এবং পাকশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল। কাক দেখিল মাংস খাইবার বেশ সুযোগ ঘটিয়াছে। সে একটা ঝোলের পাত্রের উপর গিয়া বসিল। ইহাতে যে 'ক্লিট' শব্দ হইল, তাহা শুনিয়া পাচক মুখ ফিরাইল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া ঘরের ভিতর গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অনন্তর সে, মস্তকের একটা গুচ্ছ ব্যতীত কাকের সর্ব্বশরীর হইতে পালক ছিঁড়িয়া ফেলিল; আদা, জীরা প্রভৃতি পিষায়া ও তাহাতে ঘোল মিশাইয়া কাকের গায়ে মাখাইয়া

দিল; এবং “তুই আমার শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের মৎস্য মাংস উচ্ছিষ্ট করিলি,” এই বলিতে বলিতে তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিল। ইহাতে কাকের সর্ব্বাঙ্গে ভয়ঙ্কর বেদনা হইল।

বোধিসত্ত্ব চরা হইতে ফিরিয়া কাকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন এবং কৌতুকচ্ছলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

মেঘের নাত্‌নী[১] বলাকা তুই শিরে শিখা শোভে,
চোরের মত কাকের ঝুড়ি নিলি কোন লোভে?
শীগ্‌গীর করে আয় নেমে; বল্লেম আমি ভাল;
কাক এসে তোর দেখতে পেলে ঘটাবে জঞ্জাল।

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

বলাকা নই; নাইকে শিখা; আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার; তাইতে এ বিপাক।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

হয় নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার অতিলোভ মরলেও যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটিবে কখন না।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আমি আর এখন হইতে এই স্থানে বাস করিতে পারি না।” তিনি অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। কাক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মারা গেল।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনার পর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই লোভী কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

---

[১]। পালিটীকাকার বলেন যে বলাকারা মেঘগর্জ্জন শুনিয়া গর্ভধারণ করে এই প্রসিদ্ধি। অতএব মেঘগর্জ্জন তোমাদের পিতা এবং মেঘ তাহাদের পিতামহ।

তু—“গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নু নমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ—মেঘদূত।

তক্র-মিশ্রিত আর্দ্রক ইত্যাদি গায়ে মাখা ছিল বলিয়া কাকের রং সাদা হইয়াছিল। এজন্য বোধিসত্ত্ব পরিহাসচ্ছলে তাহাকে বলাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

২৭৫. রুচির-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের ন্যায়। ইহার গাথাগুলি এই :]

কোন সুন্দরী[১] বলাকা গো, কাকের বাসায় কেন?
কাক সখা মোর উগ্র অতি; এ বাসা তার জেন।
জান না কি আমায় তুমি, পায়রা আমার ভাই?
ঘাসের বীচি খেয়ে বেড়াও; নাই কোন বালাই।
বলাকা নই; নই সুন্দরী, আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার; তাইতে এ বিপাক।
হয়নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার অতি লোভ মরলেও যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটবে কখন না।

(উক্ত গাথাগুলি একান্তরিকা)

পূর্ব্ব আখ্যায়িকার ন্যায় এ এসময়েও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এখন হইতে আমি আর এ স্থানে থাকিতে পারি না।" অনন্তর তিনি উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামী-ফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান : তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

---

২৭৬. কুরুধর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হংসঘাতক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।[২] শ্রাবস্তীবাসী দুই বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সচরাচর এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন। একদিন

---

[১]। ঘোল ইত্যাদি প্রলেপ দ্বারা কাকের রং সাদা হইয়েছে; এজন্য পারাবত তাহাকে সুন্দরী বলিয়া পরিহাস করিতেছে।

[২]। প্রথমখণ্ডে শালিত্তক-জাতকের (১০৭ সংখ্যক) প্রত্যুৎপন্নবস্তুও ঠিক এইরূপ।

তাঁহারা অচিরবতী নদীতে[১] স্নান করিয়া বালুকাপুলিনে বসিয়া রৌদ্র সেবন এবং কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশ দিয়া দুইটি হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তরুণ ভিক্ষুদ্বয়ের এক জন একটা লোষ্ট্র হস্তে লইয়া বলিলেন, "আমি ঐ হংসটার চক্ষুতে আঘাত করিতেছি।" অপর ভিক্ষু বলিলেন, "তাহা পারিবে না।" "দাঁড়াইয়া দেখ না, পারি কি না পারি; এ পার্শ্বের চক্ষুতে আঘাত করিতে পারি।" ইচ্ছা করিলেও পার্শ্বের চক্ষুতেও আঘাত করিতে পারি।" "পারিলে আর কি? "তবে দেখ।" অনন্তর তিনি এক খণ্ড ত্রিকোণ প্রস্তর লইয়া হংসটীর পশ্চাদ্‌ভাগ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হংসটী লোষ্ট্রের শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তখন সেই ভিক্ষু একটা বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্র লইয়া এমনভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা হংসটীর সম্মুখবর্ত্তী চক্ষুতে লাগিয়া অপর চক্ষু ভেদপূর্ব্বক বাহির হইয়া গেল। হংসটী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ও ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইল।

সেখানে অন্য যে সকল ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহারা এই কাণ্ড দেখিয়া ঐ দুই ভিক্ষুকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, অথচ এই গর্হিত কার্য্য করিলে! একটা প্রাণীকে মারিয়া ফেলিলে! চল, তোমাদিগকে তথাগতের নিকট লইয়া যাই।"

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তোমরা কি প্রকৃতই প্রাণীহত্যা করিয়াছ?" ভিক্ষুদ্বয় উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন।" "এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও এমন গর্হিত কাজ করিলে কেন? পূর্ব্বকালে যখন বুদ্ধের আর্বিভাব হয় নাই, যখন লোকে পাপময় সংসারেই বাস করিত, তখনও পণ্ডিতেরা অতি সামান্য সামান্য অপরাধ করিয়া অনুতাপ বোধ করিতেন; আর তোমরা এবংবিধ শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও পাপাচারে দ্বিধা বোধ কর না! ভিক্ষুমাত্রেরই কায়মনোবাক্যে সংযমী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়। বোধিসত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের পর তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন এবং পিতার জীবদ্দশায় উপরাজের পদে নিয়োজিত থাকিয়া তদীয় দেহত্যাগের পর নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম্ম[২] এবং কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

---

[১]। অযোধ্যা অঞ্চলস্থ নদীবিশেষ; ইহার বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

[২]। দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন।

কুরুধর্ম্ম বলিলে পঞ্চবিধ শীল বুঝায়; বোধিসত্ত্ব নিজে এবং তাঁহার জননী অগ্রমহিষী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা (উপরাজ), পুরোহিত ব্রাহ্মণ, রজ্জুগ্রাহক,[১] অমাত্য (সারথি), শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাপক,[২] মহামাত্র (দৌবারিক) এবং নগরশোভনা গণিকা, এই সকল ব্যক্তি অতি পরিশুদ্ধভাবে কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৩]

রাজা, রাজামাতা, রাজার মহিষী, উপরাজ, পুরোহিত,
রজ্জুক, সারথি, শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাতা, দৌবারিক সুপণ্ডিত,
বারবিলাসিনী, এই একাদশ ব্যক্তি সেই রাজ্য মাঝে
কুরুধর্ম্ম পালি' থাকিতেন রত সদা নিজ নিজ কাজে।

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিই পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালন করিতেন। রাজা নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের পুরোভাগে ছয়টি দানশালা স্থাপিত করিয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই অকাতর দান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিস্মিত হইয়াছিল। ফলতঃ দানেই তাঁহার আসক্তি ছিল, দানেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত; জম্বুদ্বীপে এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে তাঁহার দানশীলতা অনুভূত হইত না।

এই সময়ে কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর নগরে কলিঙ্গরাজ নামক একরাজা ছিলেন। একদা তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। তাহাতে লোকের ত্রিবিধ ভয় জন্মিল। তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হইবে, অন্নকষ্টবশত মহামারীও দেখা দিবে। ইহার পর তাহারা খাদ্যাভাবে বিব্রত হইয়া সন্তানদিগের হাত ধরিয়া যেখানে সেখানে যাইতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সমবেত হইয়া দন্তপুরে গমনপূর্ব্বক রাজাদ্বারে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

রাজা বাতায়নের নিকট আসীন ছিলেন। তিনি প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা এত চীৎকার করিতেছে কেন?" রাজভৃত্যেরা বলিল,

---

২। অভিধানে রজ্জুক শব্দ দেখা যায় না। এই আখ্যায়িকায় রজ্জুকের প্রকরণে দেখা যায় যে, ইনি রজ্জু (রশি) দ্বারা ক্ষেত্রাদির পরিমাণ নির্ণয় করিতেন; তাহা হইলে ইহাকে সদর আমীন বা Surveyor-General স্থানীয় মনে করা যাইতে পারে। ইংরেজী অনুবাদে রজ্জুক শব্দের 'রথচালক' অর্থ ধরা হইয়াছে। ইহা সমীচীন নহে, কারণ 'সারথি' শব্দেরও এই অর্থ এবং রজ্জুকের কাজের সহিত ইহার মিল নাই।

[২]। প্রজারা অনেক সময়ে রাজাকে করস্বরূপ শস্য দিত। তাহার পরিমাপের তত্ত্বাবধায়ককে দ্রোণমাপক বা দ্রোণমাতা বলা হইত। দ্রোণ এক প্রকার মাপ, ইহার পরিমাণ প্রায়/৪ সের।

[৩]। মূলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উপরাজ, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও সারথি, মহামাত্র ও দৌবারিক, এবং নগরশোভনা ও বর্ণদাসী, এই পদযুগলসমূহ প্রত্যেকে এক এক জন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, নচেৎ পরবর্ত্তী গাথা এবং উপাখ্যানাংশের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

"মহারাজ, সমস্ত রাজ্যে তিনটা মহাভয় দেখা দিয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে না, শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; লোকে অখাদ্য খাইতেছে, রোগে ভুগিতেছে এবং নিঃস্ব হইয়া পুত্রকন্যাদির হাত ধরিয়া অন্নের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব মহারাজ, যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।"

"ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টি ঘটিলে কি করিতেন?"

"মহারাজ, ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টির সময় দান করিতেন, পোষধ দিবসের কর্ত্তব্য পালন করিতেন, শীলাচারসম্পন্ন হইবার সঙ্কল্প করিতেন এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সপ্তাহকাল কুশ-শয্যায় শুইয়া থাকিতেন। তাঁহারা এইরূপ করিলে বৃষ্টি হইত।" "বেশ, আমিও তাহাই করিতেছি।" অনন্তর রাজা উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি হইল না। ইহা দেখিয়া রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম, অথচ বৃষ্টি হইল না; এখন কি করিব বল।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইন্দ্রপস্থ নগরে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের অঞ্জন বৃষভ নামে এক মঙ্গল হস্তী আছে। আমরা গিয়া তাহাকে লইয়া আসি; তাহা হইলেই দেবতা বারিবর্ষণ করিবেন।" সেই রাজা বলবাহনসম্পন্ন এবং দুষ্প্রসহ; তোমরা তাঁহার হস্তী আনিবে কি প্রকারে? "মহারাজ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না; কুরুরাজ পরম দানশীল; দানেই তাঁহার অভিরুচি; কেহ তাঁহার নিকট যাচঞা করিলে তিনি নিজের মুকুট শোভিত মস্তক কিংবা সুপ্রসন্ন নয়নদ্বয় দান করিতেও কুণ্ঠিত হন না; তিনি সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। হস্তীটার জন্য তাঁহাকে বেশী বলিতে হইবে না; আমরা চাহিলে তিনি নিশ্চিত উহা দান করিবেন।" "কে তাঁহার নিকট এইরূপ যাচঞা করিতে সমর্থ?" "ব্রাহ্মণেরা।" ইহা শুনিয়া রাজা সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে আট জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া হস্তীর জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা পাথেয় লইয়া পথিকজনোচিত বেশ পরিধান করিলেন এবং কুত্রাপি একরাত্রির অধিক অবস্থান না করিয়া চলিতে চলিতে কতিপয় দিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নগরদ্বারস্থ একটি দানশালায় আহার করিয়া শরীর সুস্থ করিলেন এবং রাজা কখন দানশালায় আসিবেন, জিজ্ঞাসিলেন। দানশালার লোকে উত্তর দিল, "প্রতি পক্ষে তিন দিন—চতুর্দ্দশীতে, পক্ষান্তে ও অষ্টমীতে—রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। আগামীকল্য পূর্ণিমা, অতএব কল্য তিনি এখানে আসিবেন।"

তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা পরদিন প্রাতঃকালেই গমন করিয়া পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন! বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালে স্নান করিলেন, গাত্রে চন্দনানুলেপ দিলেন, বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত হইলেন এবং সুশোভিত হস্তীবরে আরোহণপূর্ব্বক

বহু অনুচর পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদ্বারস্থ দানশালায় গমন করিলেন। সেখানে যে সকল অতিথি উপস্থিত ছিল, তিনি অবতরণপূর্ব্বক স্বহস্তে সাত আট জনকে অন্ন পরিবেষণ করিলেন এবং তত্রত্য কর্ম্মচারীদিগকে "এই নিয়মে পরিবেষণ কর" এই আদেশ দিয়া পুনর্ব্বার গজস্কন্ধে উঠিয়া দক্ষিণদ্বারে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বদ্বারে বোধিসত্ত্বের অনেক শরীররক্ষক ছিল; সেজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ পান নাই; কাজেই তাঁহারাও দক্ষিণ দ্বারে গিয়া রাজাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। অনন্তর রাজা যখন দ্বারের অনতিদূরে এক উন্নত ভূভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক "মহারাজের জয় হউক" এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে পরিচালিত করিয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইলেন এবং "ভো ব্রাহ্মণগণ, আপনারা কি চান?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাটি পাঠ করিলেন :

শুনি লোকমুখে পরম ধার্ম্মিক তুমি নাকি, নৃপবর,
প্রত্যাখ্যান কভু জীবন থাকিতে যাচক জনে না কর।
সেই হেতু মোরা কলিঙ্গ হইতে, বহু অর্থ করি নাশ,
লভিবার তরে মঙ্গল হস্তীরে এসেছি তোমার পাশ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণগণ, এই হস্তী পাইবার জন্য যদি আপনারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন চিন্তা করিবেন না। আমি ইহাতে সর্ব্ববিধ আভরণসহ দান করিতেছি।" এইরূপে আগন্তুকদিগকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় পাঠ করিলেন :

আচার্য্যের মুখে আমি পাই উপদেশ,
প্রত্যাখ্যানে যাচকের নাহি দিবে ক্লেশ।
আসিবে যে হেথা কিছু পাইবার তরে,
ভগ্নাশ হইয়া যেন নাহি ফিরে ঘরে।
হউক স্বাধীন কিংবা পরাধীন জন,
যথাসাধ্য কর তার প্রার্থনা পূরণ।
রাজ-যোগ্য, রাজ-ভোজ্য এই করিবরে
(যাহার অশেষ গুণ বিদিত সংসারে)
করিলাম দান আমি, হে ব্রাহ্মণগণ;
চলি যান, ল'য়ে এরে যেথা লয় মন।
শুদ্ধ হস্তী নয়, পুনঃ ল'য়ে যান তার
অলঙ্কার, সোণার ঝালর যত আর;

ল’য়ে যান মাহুতেরে চালাইতে তারে;
করিনু সন্তুষ্ট চিত্তে দান সবাকারে।

মহাসত্ত্ব হস্তীপৃষ্ঠ হইতে এইরূপ বলিলেন এবং অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, “দেখি, ইহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনলঙ্কৃত আছে কিনা; ইহাকে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিব।” তিনি হস্তীকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কোন অঙ্গই অলঙ্কারহীন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগের হস্তে উহার শুণ্ড দিয়া তদুপরি সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে পুষ্পগন্ধবাসিত জল পাতনপূর্ব্বক দানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অলংঙ্কারাদিযুক্ত সেই হস্তী গ্রহণ করিলেন, উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দন্তপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে ঐ হস্তী দিলেন।

কিন্তু হস্তী আসিবার পরেও কলিঙ্গে বৃষ্টিপাত হইল না। তখন কলিঙ্গরাজ জিজ্ঞাসিলেন, “ইহার কারণ কি?” অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, “কুরুরাজ ধনঞ্জয় কুরুধর্ম্ম পালন করেন; সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে দশ পনর দিন অন্তর বৃষ্টি হইয়া থাকে। রাজার গুণেই বৃষ্টিপাত হয়। হস্তী একটা পশু মাত্র; ইহার গুণ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতই হইবে?” এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গরাজ বলিলেন, “যদি তাহাই হয়, তবে এই হস্তীকে যেভাবে আনিয়াছ, ঠিক সেইভাবে সমস্ত অলঙ্কার ও লোকজনসহ কুরুরাজকে ফিরাইয়া দাও এবং তিনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করেন, তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া এখানে আনয়ন কর।” এই উপদেশ দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও অমাত্যদিগকে পুনর্ব্বার কুরুরাজের সকাশে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা যথাকালে কুরুরাজের নিকট উপনীত হইলেন এবং হস্তী প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, “মহারাজ, আপনার মঙ্গলহস্তী যাইবার পরেও আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় নাই। লোকে বলে যে আপনি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। আমাদের রাজারও এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উৎসুক। আপনার নিকট হইতে কুরুধর্ম্ম জানিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে, এই আদেশ দিয়া তিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব দয়া করিয়া কুরুধর্ম্ম কি বলুন।”

ধনঞ্জয় বলিলেন, “আমি এক সময়ে কুরুধর্ম্ম পালন করিতাম বটে, কিন্তু তাহার কোন ব্যতিক্রম করিয়াছি কি না, তৎসম্বন্ধে এখন সন্দেহ জন্মিয়াছে। মনে হয় আমার চিত্ত যেন আর কুরুধর্ম্মে অলঙ্কৃত নহে। অতএব কুরুধর্ম্ম কি, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতে অক্ষম।”

ধনঞ্জয়ের চিত্ত যে আর কুরুধর্ম্ম দ্বারা অলঙ্কৃত নহে, এ কথা বলিবার হেতু কি? ব্যাপারটা এই : তৎকালে প্রতি তৃতীয় বৎসর কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকোৎসব নামে একটি উৎসব হইত। রাজারা সেই উৎসবে যোগ দিবার সময় সর্ব্বলঙ্কারে

বিভূষিত হইয়া দেববেশ ধারণ করিতেন, এবং চিত্ররাজ নামক এক যক্ষের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া চারিদিকে চারিটি পুষ্পমণ্ডিত চিত্র-বিচিত্র শর নিক্ষেপ করিতেন। একবার ধনঞ্জয় এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া একটি তড়াগের নিকট চিত্ররাজের সাক্ষাতে ঐরূপ চারটি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে শরটি জলের পৃষ্ঠোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেটিকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহাতে রাজার মনে হইয়াছিল, এই শরটি হয় ত কোন মৎস্যের শরীর ভেধ করিয়াছে। এই সন্দেহে দোলায়মান হইয়া রাজার মনে প্রাণীহত্যারূপ পাতকের চিন্তায় শীলভেদ ঘটিল; সেই জন্য তিনি আর পূর্ব্ববৎ কুরুধর্ম্মপালনজনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেন না। এখন কলিঙ্গদূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তিনি বলিলেন, “কাজেই আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে; আমার জননী কিন্তু ইহা অতিযত্নসহকারে পালন করিয়া থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।” কলিঙ্গবাসীরা বলিলেন, “মহারাজ, আপনি ত প্রাণীহত্যার সঙ্কল্প করেন নাই। সঙ্কল্প না থাকিলে অপরাধ হইবে কেন? আপনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন।” রাজা বলিলেন, “তবে বলিতেছি, আপনারা লিখিয়া লউন।” অনন্তর রাজা বলিতে লাগিলেন, কলিঙ্গবাসীরা সুবর্ণপট্টে উহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—“কাহারও প্রাণবধ করিও না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিও না, ইন্দ্রিয়বশে মিথ্যাচারপরায়ণ হইও না, কদাচ মিথ্যাকথা মুখে আনিও না, মদ্যপান করিও না।” অতপর তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, “এ সমস্ত গুণই আমাতে থাকিতে পারে; তথাপি আমি চিত্তপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনারা আমার জননীর নিকটে গিয়া কুরুধর্ম্ম শিক্ষা করুন।

কলিঙ্গদূতগণ রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, “দেবি, আপনি না কি করুধর্ম্ম রক্ষা করেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা বলুন।” রাজমাতা বলিলেন, “বৎসগণ, আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে; কিন্তু এখন যেন আমার সন্দেহ হইতেছে। আমি আর কুরুধর্ম্ম-জনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করি না; অতএব আমি কিরূপে তোমাদিগকে শিক্ষা দিব?” এই রমণীর দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা ও কনিষ্ঠ উপরাজ হইয়াছিলেন। একবার কোন রাজা বোধিসত্ত্বকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দনসার এবং সহস্র মুদ্রা মূল্যের কাঞ্চনমালা উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা, মায়ের পূজা করিব এই অভিপ্রায়ে, সে সমস্তই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জননী বিবেচনা করিলেন, ‘আমি এই চন্দনসারও লেপন করিব না, মালাও পরিধান করিব না; অতএব এ সমুদয় পুত্রবধূদিগকে দান করি।’ অতঃপর তিনি আবার ভাবিলেন, ‘আমার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অগ্রমহিষী এবং রাজ্যের অধীশ্বরী; তাহাকে

কাঞ্চনমালাটী দিই; কনিষ্ঠা পত্রবধূ অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্না; অতএব তাহাকে চন্দনসার দিই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজমহিষীকে কাঞ্চনমালা এবং উপরাজপত্নীকে চন্দনসার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি; বধূদ্বয়ের মধ্যে কাহার অবস্থা ভাল, কাহার মন্দ, ইহা দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল? জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সম্মান রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম করায় আমি সম্ভবতঃ কুরুধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি।' রাজামাতার মনে এই দ্বৈধীভাব জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গ-রাজদূতদিগকে ওরূপ বলিলেন। কলিঙ্গদূতেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "দেবি, নিজের দ্রব্য যাহাকে ইচ্ছা দান করা যাইতে পারে। আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই সন্দিহান হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা কোন পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ সামান্য ব্যাপারে শীলবত্তা ক্ষুণ্ন হয় না। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম দিন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজমাতার মুখে কুরুধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। অনন্তর রাজমাতা বলিলেন, "বৎসগণ, যদিও তোমরা বলিতেছ যে, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তথাপি আমি আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কিন্তু সযত্নে কুরুধর্ম্ম পালিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহার নিকটে যাও।"

এই উপদেশানুসারে তাঁহারা অগ্রমহিষীর নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। অগ্রমহিষী পূর্ব্ববৎ উত্তর দিয়া বলিলেন, "দেখ, এখন আমি নিজেই নিজের চরিত্রে সন্তুষ্ট নহি। অতএব তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম কি প্রকারে শিক্ষা দিব?" এই রমণী না কি এক দিন, রাজা নগর-প্রদক্ষিণে যাত্রা করিলে, বাতায়ন হইতে তদীয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী গজারূঢ় উপরাজকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি ইহার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে আমার পতির মৃত্যুর পর ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া আমাকেও অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন।' কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি, অথচ সধবা হইয়াও আমি পরপুরুষের দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিলাম! ইহাতে নিশ্চিত আমার চরিত্র স্খলন হইল।' অগ্রমাহষীর মনে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে ঐরূপ বলিলেন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, মনে কোন কুভাবের উৎপত্তি হইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে; আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন কি আর আপনার পক্ষে কোন পাপকার্য্য সম্ভবে? এরূপ সামান্য চিত্তবিক্ষোভে কখনই চরিত্রভ্রংশ ঘটে না। আপনি আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম বুঝাইয়া দিন।" অনন্তর তাঁহারা অগ্রমহিষীর মুখেও কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন।

অগ্রমহিষী বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা আমাকে ধর্ম্মশীলা বলিতেছ বটে, কিন্তু আমি আত্ম প্রসাদ হারাইয়াছি। উপরাজ কিন্তু অতি-সাবধানে কুরুধর্ম্ম পালন করেন। তোমরা তাঁহার নিকটে গমন কর।"

তখন কলিঙ্গরাজদূতেরা উপরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কুরুধর্ম্ম জানিবার জন্য পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা করিলেন। উপরাজের নিয়ম ছিল যে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য যখন তিনি রথারোহণে রাজার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন যদি রাজভবনে আহার করিয়া সেই রাত্রি সেখানেই যাপন করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অশ্বরশ্মি ও প্রাতোদ রথের ধুতের উপর রাখিয়া দিতেন; তাহা দেখিয়া লোক জন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং পরদিন প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি কখন বাহির হইবেন, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিত। সারথি রাত্রিকালে রথের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং পরদিন প্রভাত হইলে উহা লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিত। পক্ষান্তরে, উপরাজ রাজদর্শনান্তে সেই দিনই যদি গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইলে রশ্মি ও প্রতোদ রথের মধ্যে রাখিয়া যাইতেন। লোকজন তাহা দেখিয়া বুঝিত, উপরাজ এখনিই ফিরিবেন; কাজেই তাহারা তাঁহার দর্শন মানসে রাজদ্বারেই উপস্থিত থাকিত। একদিন উপরাজ শেষোক্ত প্রকারে রশ্মি ও প্রতোদ রাখিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া রাজা সে দিন তাঁহাকে বাহির হইতে দেন নাই, কাজেই তিনি রাজভবনেই আহার করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এ দিকে বিস্তর লোক, উপরাজ এখনই বাহিরে আসিবেন ইহা মনে করিয়া, সমস্ত রাত্রি রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। উপরাজ পরদিন প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, বহুলোক দঁড়াইয়া আছে; তাহাদের সকলেরই বস্ত্র বৃষ্টিজলসিক্ত। তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করি, অথচ এতগুলি লোককে কষ্ট দিলাম। অদ্য আমার শীলভঙ্গ হইল।' অন্তঃকরণে এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে বলিলেন, "আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে, এখন কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে; কাজেই আমি আপনাদিগকে কুরুধর্ম্ম বলিতে অক্ষম।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, "উপরাজ, আপনি ত সেই সকল লোককে কষ্ট দিবার সঙ্কল্প করেন নাই। যাহা ইচ্ছপূর্ব্বক কৃত নহে, তাহাতে পাপ হইতে পারে না। আপনি যখন সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন আপনার পক্ষে কোনরূপ পাপকার্য্য করা অসম্ভব।" অনন্তর তাঁহারা উপরাজের নিকট হইতেও শীল শিক্ষা করিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। উপরাজ বলিলেন,

"আপনারা যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি নাই। পুরোহিত মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করেন। আপনারা একবার তাঁহার নিকটে যান।"

কলিঙ্গদূতেরা তদনুসারে পুরোহিতের নিকট গিয়াও কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। এই পুরোহিত একদিন রাজদর্শন যাইবার সময় পথে একখানি অরুণবর্ণ রথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ রথ অন্য কোন রাজা বারাণসীরাজকে উপরাজস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "এই রথ কাহার" জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যখন শুনিয়াছিলেন উহা বারাণসীরাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি; রাজা যদি আমাকে রথখানি দান করেন, তাহা হইলে ইহাতে আরোহণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারি।' অনন্তর তিনি রাজসকাশে গমনপূর্ব্বক "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উপবিষ্ট হইলে, লোকে এ রথখানি লইয়া রাজাকে দেখাইয়াছিল এবং রাজা উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ অতি সুন্দর রথ, ইহা পুরোহিত মহাশয়কে দান কর।" পুরোহিত কিন্তু তখন উহা লইতে ইচ্ছা করেন নাই; এবং রাজার পুনঃ পুনঃ অনুরোধসত্ত্বেও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বরঞ্চ তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও পরদ্রব্যে লোভ করিয়াছি; ইহাতে আমার চরিত্রস্খলন হইয়াছে।' পুরোহিত মহাশয় কলিঙ্গরাজদূতদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তদবিষয়ে এখন সন্দেহ হইয়াছে। কুরুধর্ম্মপালনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, আমি আর তাহার আস্বাদ পাই না। অতএব আমি তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অক্ষম।"

দূতেরা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্য, মনে লোভের উদয় হইলেই যে চরিত্রহানি ঘটে, তাহা নহে। আপনি যখন এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই আত্ম-ধিক্কার দিতেছেন, তখন আপনি কখনও কোন কুকার্য্যে রত হইতে পারেন না।" অনন্তর তাঁহারা পুরোহিতের মুখেও কুরুধর্ম্ম শুনিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমার নিজের মনে কিন্তু সন্দেহপীড়িত। রজ্জুগ্রাহকামাত্য প্রকৃত কুরুধর্ম্মপরায়ণ; তোমরা তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা কর।"

দূতেরা তখন রজ্জুগ্রাহকামাত্যের নিকট গেলেন। এই ব্যক্তি একদিন কোন জনপদে ক্ষেত্র মাপিবার সময়ে রজ্জুর এক প্রান্ত ক্ষেত্রস্বামীর এবং একপ্রান্ত নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্জুর দণ্ডসংলগ্ন প্রান্ত তাঁহার নিজের হস্তে ছিল; তিনি উহা টানিয়া লইয়া গেলে উহা একটা কর্কট বিবরের ধারে গিয়া পড়িয়াছিল; তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি দণ্ডটি বিবরের মধ্যে প্রবেশ

করাই, তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ কর্কটের প্রাণনাশ হইবে; যদি বিবরের পুরোভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে রাজস্বত্বের এবং যদি বিবরের অপরভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে কৃষকের স্বত্বের হানি হইবে। অতএব এখন কর্ত্তব্য কি? অতঃপর তিনি আবার ভাবিয়াছিলেন, 'সম্ভবতঃ কর্কট গর্ত্তের ভিতরে নাই; যদি থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইত।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি কর্কটগর্ত্তের মধ্যেই দণ্ডটি প্রোথিত করিয়াছিলেন। অমনি বিবরবাসী কর্কট 'কিরি কিরি' শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহা শুনিয়া রজ্জুগ্রাহক ভাবিয়াছিলেন, কর্কটটি হয় ত মরিয়া গেল, অথচ আমি মনে করি, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি। এই ত দেখিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল।' রজ্জুগ্রাহক এখন কলিঙ্গ-দূতদিগকে সেই বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই কারণেই আমি নিজের কুরুধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান; অতএব আপনাদিগকে কিরূপে ইহা শিক্ষা দিব?"

কলিঙ্গদূতেরা বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ত তখন ইচ্ছা ছিল না যে, কর্কটটা মরিয়া যাউক; যে কর্ম্ম জ্ঞানকৃত নহে, তাহাতে অপরাধ হইতে পারে না। আপনি যদি এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই এত অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা কোন গুরুতর দুষ্কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না।" অনন্তর তাঁহারা রজ্জুগ্রাহকামাত্যের মুখেও কুরুধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। রজ্জুগ্রাহকামাত্য বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুক না কেন, আমার নিজের মনে কুরুধর্ম্মপালনজনিত তৃপ্তি নাই। সারথি মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক; আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।"

দূতগণ সারথির নিকটে গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সারথি একদিন রাজাকে রথে আরোহণ করাইয়া উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা সেখানে সমস্ত দিন ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নগরে ফিরিবার পূর্ব্বকালেই সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল। পাছে রাজা ভিজিয়া যান, এই আশঙ্কায় সারথি অশ্বদিগকে প্রতোদ দ্বারা উত্তেজিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ঘোটকগুলি অতিবেগে ছুটিয়াছিল। তদবধি উদ্যানে যাইবার বা উদ্যান হইতে ফিরিবার সময়ে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেই মহাবেগে চলিত। এরূপ যাইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, অশ্বগুলি বোধ হয় ভাবিয়াছিল 'এই স্থানে কোনরূপ ভয়ের কারণ আছে এবং সেই জন্যই সেদিন সারথি আমাদিগকে প্রতোদ দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন।' সারথিও শেষে ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা ভিজুন বা না ভিজুন, তাহাতে আমার দোষ কি? আমি অসময়ে সুশিক্ষিত ঘোটকদিগকে প্রতোদ দ্বারা প্রহার করিয়াছি; সেই জন্যই তাহারা প্রতিদিন এখানে নিরর্থক দ্রুতবেগে ছুটিয়া ক্লান্ত হইতেছে। এই কি আমার কুরুধর্ম্মপালনের ফল? এখন

নিশ্চিত আমার ধর্ম্মস্খলন হইয়াছে।’ সারথি দূতদিগের নিকটে এই বৃত্তান্তঃ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, “তদবধি আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। কাজেই ঐ ধর্ম্ম যে কি, তাহা আমি বলিতে অক্ষম।” ইহা শুনিয়া দূতেরা বলিলেন, ‘আপনার ত এমন সঙ্কল্প ছিল যে, যাহাতে অশ্বগুলি ক্লান্ত হয় তাহাই করিতে হইবে। অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই যখন আপনার এতাদৃশ অনুতাপ জন্মিয়াছে, তখন আপনার পক্ষে পাপ কার্য্য করা একান্তই অসম্ভব।” অনন্তর তাঁহারা সারথির মুখে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। সারথি বলিলেন, “আপনারা যাহাই ভাবুন না কেন, আমার চিত্তে কিন্তু এখন কুরুধর্ম্মপালনজনিত তৃপ্তি নাই। আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠীই কুরুধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিপালক। আপনারা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করুন।”

তখন দূতগণ শ্রেষ্ঠীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যক্তি একদা নিজের ধান্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন ধানের শীষগুলি গর্ভ হইতে বাহির হইতেছিল। ফিরিবার সময় ইহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ধানের শীষ লইয়া একটা মালা গাঁথিবেন। সেই জন্য তিনি একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনিয়া উহা একটা স্তম্ভে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ‘এই ধান্যক্ষেত্র হইতে আমাকে রাজার প্রাপ্য ভাগ দিতে হইবে; তাহা দিবার পূর্ব্বেই একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনা অন্যায় হইয়াছে। অথচ এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলি! আজ নিশ্চিত আমার সে ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।’ শ্রেষ্ঠী দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, “যখন আমি নিজেই কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি না বলিয়া সন্দিহান হইয়াছি, তখন আপনাদের নিকট উহা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব?” দূতগণ বলিলেন, “আপনার ত অপহরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে কেহ অদত্তাদান করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য বিষয়েই যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব গ্রহণ করিতে পারেন না।” অনন্তর তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর মুখে কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, “আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে আর কুরুধর্ম্মপালনজনিত আত্মপ্রসাদ নাই। দ্রোণমাপক মহামাত্র মহাশয় আমার বিবেচনায় কুরুধর্ম্মের প্রকৃত পালনকর্ত্তা। আপনারা একবার তাঁহার নিকট গিয়া ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।”

দূতগণ তখন দ্রোণমাপকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন ভাণ্ডারদ্বারে বসিয়া রাজার প্রাপ্য ধান্য মাপাইতেছিলেন; সেই সময় যে ধান্যরাশি মাপা হয় নাই, তাহা হইতে তিনি এক একটি ধান লইয়া

লক্ষ্য[১] স্থাপন করিতেছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তখন তিনি লক্ষ্য গণিয়া—'এত ধান মাপা হইল' বলিয়া লক্ষ্যগুলি ঝাঁট দেওয়াইয়া যে ধান্যরাশি মাপা হইয়াছিল, তাহার উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া কিন্তু তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিলাম, কি অমাপা ধানের উপর ফেলিলাম?' তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যদি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিয়া থাকি, তাহা হইলে অকারণে রাজার অংশ বাড়াইয়াছি এবং প্রজার অংশ কমাইয়াছি। হায়! আমার আবার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি! এখন দেখিতেছি আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।' দ্রোণমাপক দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন কুরুধর্ম্মপালন সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ।" দূতেরা বলিলেন, "আপনি ত প্রজার স্বত্ব অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে অদত্তাদান হইল বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য ব্যাপারে যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ দেখা যইতেছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব অপহরণ করিতে পারেন না।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দ্রোণমাপকের মুখে কুরুধর্ম্ম শুনিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। দ্রোণমাপক বলিলেন, "আপনারা আমায় ধার্ম্মিক বলিতেছেন বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে এখন আর ধর্ম্মরক্ষা-জনিত তৃপ্তি নাই। আপনারা দৌবারিকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তিনি ইহা সযত্নে পালন করিয়া থাকেন।"

দূতগণ তখন দৌবারিকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন নগরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময় তিনবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়াছিলেন। এক দরিদ্র নিজের কনিষ্ঠ ভগিনীর সহিত অরণ্যে কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিবার সময় ঐ শব্দ শুনিয়া ভগিনীকে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া দৌবারিক বলিয়াছিলেন, "নগরে যে রাজা আছেন, তাহা বুঝি তুই জানিস না? যথাসময়ে যে দরজা বন্ধ হয়, তাহাও বোধ হয় মনে নাই যে, স্ত্রী লইয়া এতক্ষণ বনে বনে আমোদ করিতেছিলি?" দরিদ্র ব্যক্তি উত্তর দিয়াছিল, "মহাশয়, এই রমণী আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী।" তখন দৌবারিক ভাবিয়াছিলেন, "করিলাম কি! একজনের ভগিনীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া ফেলিলাম! অথচ আমার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি! অদ্য আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।" দৌবারিক দূতগণের

---

[১]। কত মাপা বা গণনা হইল তাহা জানিবার জন্য এক একটি দ্রব্য স্বতন্ত্র স্থানে রাখিবার প্রথা আছে; এই স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত দ্রব্যের নাম সাক্ষী বা লক্ষ্য।

নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই নিমিত্ত, কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না, তৎসম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে। অতএব আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।" দূতগণ বলিলেন, "আপনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন; ইহাতে ধর্ম্মহানি হইবে কেন? বিশেষতঃ এই সামান্য ঘটনাতেই যখন আপনার এরূপ আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আপনি কখনও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন না।" অনন্তর তাঁহারা দৌবারিকের নিকট শুনিয়া সুবর্ণপট্টে কুরুধর্ম্ম লিখিয়া লইলেন। দৌবারিক বলিলেন, "আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। এই নগরে এক বর্ণদাসী আছেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থকেন। আপনারা তাঁহারা নিকটে যান।"

দূতগণ তখন সেই গণিকার নিকটে গমন করিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। সেও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত অপর ব্যক্তিদিগের ন্যায় অসম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার কারণ এই : একদা দেবরাজ শক্র তাহার চরিত্র পরীক্ষার্থ ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এখনই আসিতেছি।" কিন্তু তাহার পর তিনি দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে দেখা দেন নাই। পাছে অধর্ম্ম হয়, এই আশঙ্কায় উক্ত রমণী ঐ তিন বৎসর পুরুষান্তরের হস্ত হইতে একটি তাম্বূল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। সে ক্রমে নিতান্ত হীনাবস্থাপন্না হইয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল 'যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, সে তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না; আমার এখন অন্ন জুটে না, এখন আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হইল: অতএব প্রধান বিচারপতির নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলি এবং পূর্ব্ববৎ অপরের নিকট হইতে অর্থগ্রহণে প্রবৃত্ত হই।" অনন্তর সে বিচারমন্দিরে গিয়া বলিয়াছিল, "ধর্ম্মাবতার, আজ তিন বৎসর হইল এক ব্যক্তি আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল; কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত ফিরিল না; সে জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না। এ দিকে অর্থাভাবে আমার পক্ষে প্রাণধারণ অসম্ভব হইয়াছে; এখন আমি কি করিব অনুমতি দিন।" বিচারপতি বলিয়াছিলেন, "সে যখন তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না, তখন তুমি আর কি করিতে পার? এখন হইতে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জনের পথ দেখ।" বিচারকের আদেশ পাইয়া বর্ণদাসী যেমন বিচারগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, অমনি এক পুরুষ আসিয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র শক্র গিয়া দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল; অতএব আমি তোমার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না।' ইহা বলিয়া সে হাত গুটাইয়া লইয়াছিল। তখন শক্র নিজের

প্রকৃত শরীর ধারণ করিয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য নগরের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইয়াছিল। শক্র জনসঙ্ঘের মধ্যে বলিয়াছিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীর চরিত্র পরীক্ষার্থ আমি ইহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলাম। যদি তোমরা চরিত্রবান হইতে চাও, তবে এই রমণীর অনুকরণ কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি উক্ত বর্ণদাসীর গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং "এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিও" এই কথা বলিয়া দেবলোকে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। দূতগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বর্ণদাসী বলিল, 'আমি গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অন্য কর্ত্তৃক দীয়মান অর্থ গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম; ইহা ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণে শান্তি নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট কিরূপে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব?" দূতগণ বলিলেন, "কেবল হস্তপ্রসারণদ্বারা শীলহানি হয় না; আপনার চরিত্র পরম পরিশুদ্ধ।" অনন্তর তাঁহারা বর্ণদাসীর নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহাও সুবর্ণপট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া হইলেন।

এইরূপে একে একে একাদশ ব্যক্তির নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া ও তাহা সুবর্ণপট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া দূতগণ দন্তপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং কলিঙ্গরাজের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ঐ সুবর্ণপট্ট দিলেন। রাজা তাহা দেখিয়া কুরুধর্ম্ম পালন করিলেন এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন কলিঙ্গ রাজ্যে বৃষ্টি হইল, ত্রিবিধ ভয় বিদূরিত হইল, বসুন্ধরা প্রচুর শস্য প্রসব করিলেন, সর্ব্বত্র সুভিক্ষ দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সপরিবারে স্বর্গে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে জাতকের সমবধান করিলেন :

আছিলা উৎপলবর্ণা গণিকা সেকালে;
পূর্ণছিলা দৌবারিক; রজ্জুগ্রাহ পদে
কচ্চান সুগতি; করিতেন সাবধানে
কোলিত ধার্ম্মিকবর দ্রোণমাপকের
কাজ; সারিপুত্র শ্রেষ্ঠী; সারথি হইয়া
চালাইত রাজপথ অনিরুদ্ধ ধীর;
পৌরোহিত্যে নিয়োজিত কাশ্যপ স্থবির;
ঔপরাজ্য করিতেন নন্দ সুপণ্ডিত;
বাহুল-জননী ছিলা রাজার মহিষী;
মায়াদেবী রাজমাতা; বোধিসত্ত্ব পুনঃ

কুরুরাজপদে থাকি অপ্রমত্তভাবে
পালিতেন যথাধর্ম্ম সদা পৃথিবীরে।[১]

----

২৭৭. রোমক-জাতক[২]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যার চেষ্টা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সহজেই যোগ্য।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুপারাবত-পরিবৃত হইয়া অরণ্য-মধ্যস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। এক সাধুশীল তপস্বীও এই পারাবতদিগের বাসস্থানের অনতিদূরে কোন প্রত্যন্তগ্রামের সন্নিকটে অপর একটি পর্ব্বতগুহায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেন। বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতেন।

তপস্বী ঐ আশ্রমে বহুদিন অবস্থিতি করিয়া শেষে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর একজন ভণ্ড তপস্বী[৩] গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব পারাবতগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারও নিকটে গমন করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিবাদন করিতেন। তিনি আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতেন, গিরিকন্দরে খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং সায়ংকালে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন। কূটতাপস এই আশ্রমে পঞ্চাশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল বাস করিল।

---

[১]। অনিরুদ্ধ—ইনি শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতোদনের পুত্র। নন্দ—ইনি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইহার গর্ভধারণী মহাপ্রজাপতি মায়াদেবীর সহোদরা। অনিরুদ্ধ, নন্দ ও অন্যান্য কতিপয় শাক্যরাজকুমার সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষু হইয়াছিলেন। পূর্ণ—একজন বণিক; ইনি রাজগৃহ নগরে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোলিত—এক জন ব্রাহ্মণ, ইহার গোত্রনাম মৌদ্গাল্যায়ন; ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। কচ্ছান-কাত্যায়ন। ইনি বুদ্ধদেবের অন্যমত প্রধান শিষ্য। কাশ্যপ স্থবির—ইনিও বুদ্ধের প্রধান শিষ্য। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বানের পর সপ্তপর্ণী গুহায় যে সঙ্গীতি হয়, তাহাতে ইনি অভিধর্ম্মপিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

[২]। পালককে 'রোম' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই জন্য উপাখ্যান বর্ণিত পারাবত রোমক নামে অভিহিত হইয়াছে।

[৩]। 'জটিল'= জটাধারী। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জটাধারণ করিতেন না।

একদিন প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা পারাবত-মাংস রন্ধন করিয়া ঐ কূটতাপসকে খাইতে দিল। সে উহার রসাস্বাদনে মুগ্ধ হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কি মাংস?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আজ্ঞা, ইহা পায়রার মাংস।" ইহা শুনিয়া কুটতাপস ভাবিল, 'আমার আশ্রমে অনেক পায়রা আসিয়া থাকে; সেগুলাকে মারিয়া মাংস খাইলে ত বেশ হয়।' ইহা স্থির করিয়া সে তণ্ডুল ঘৃত, দধি, জীরক, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল এবং পারাবতদিগের আগমন-প্রতীক্ষার চীবরের একপ্রান্ত দ্বারা একটা মুদ্গর আচ্ছাদিত করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া রহিল।

পারাবতগণে পরিবৃত বোধিসত্ত্ব সে দিন সেখানে গিয়াই কূটতাপসের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই দুষ্ট তাপসের আকার ত অন্যদিনের মত নয়। এ বুঝি আমার সজাতীয়গণের মাংস খাইয়াছে; ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তপস্বী অনুবাত স্থানে থাকিয়া তাহার গাত্রগন্ধ অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে সে তাহদের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছে অতএব তিনি স্থির করিলেন, সে তপস্বীর নিকট আর যাওয়া হইবে না। অনন্তর তিনি পারাবতগণ-সহ সে স্থান হইতে প্রত্যবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যত্র চরিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন না দেখিয়া কূটতাপস ভাবিল, 'ইহাদের সঙ্গে মধুর আলাপ করা যাউক; তাহা হইলে আমি ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিব। তখন ইহারা নিকটে আসিবে এবং আমি ইহাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত দুইটি গাথা বলিল :

পঞ্চাশ বর্ষের ঊর্দ্ধ এই শৈল কন্দরেতে
হে রোমক, করিতেছি বাস;
সন্দেহ না করি মনে পূর্ব্বে পক্ষিগণ আসি
নির্ভয়ে থাকিত মোর পাশ;
এবে বলে বক্রাঙ্গ,[১] কেন উদ্‌বেজিত তারা,
গুহান্তরে কেন তারা চরে?
সে বিশ্বাস, সেই শ্রদ্ধা, হয় তারা ভুলিয়াছে,
তাই মোর অনাদর করে;
কিংবা এরা তারা নয়, হবে অন্য পক্ষিগণ,

---

[১]। এই বিশেষণটি বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। পক্ষীরা উৎপতনের সময় গ্রীবা বক্র করিয়া যায়, এই জন্য পক্ষি-জাতিকেই 'বক্রাঙ্গ' বলা যাইতে পারে, টীকাকারের এই মত।

বহুকাল প্রবাসেতে ছিল;
এসেছে এখন হেথা, সে কারণ, মনে লয়,
আমি কে তা কেন না চিনিল।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

এখন কি মূর্খ মোরা চিনি না তোমায়?
যা ছিলে তাই আছ তুমি সন্দেহ কি তার?
আমরাও যা ছিলাম আগে তাই আছি এখন;
দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ এবে তোমার মন।
তাই তোমারে, আজীবক, দেখে লাগে ত্রাস,
পলাইয়া যাই মোরা যেথা যার বাস।

কূটতাপস দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে। সে মুদ্গার নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন সে বলিয়া উঠিল, "যা, দূর হ, এবার পরিত্রাণ পাইলি।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত অপায় চারিটি[১] হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি যদি আর এখানে বাস কর, তবে গ্রামবাসীদিগকে বলিব, 'এ বেটা চোর' এবং তোমাকে ধরাইয়া দিব। যদি ভাল চাও, তবে শীঘ্র পলায়ন কর।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন; কূট তাপসও আর সেখানে বাস করিতে পারিল না।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূটতাপস; সারিপুত্র ছিলেন সেই প্রথমোক্ত সাধুশীল তাপস এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত নায়ক।]

☞ এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের গোধা-জাতক (১৩৮) এবং শৃগাল-জাতকে (১৪২) তুলনীয়।

---

২৭৮. মহিষ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটা ধূর্ত্ত মর্কটের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে একটা পোষা বানর ছিল। সেটা বড় ধূর্ত্ত ছিল; হস্তীশালায় গিয়া একটা শিষ্টশান্ত হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিত এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিই লাপালাফি করিত। হস্তীটা অতি শীলবান ও ক্ষান্তিমান ছিল বলিয়া ইহাতে কোন ক্রোধের লক্ষণ প্রদর্শন করিত না।

---

[১]। নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

অনন্তর একদিন এই হস্তীর স্থানে অন্য একটা হস্তী রাখা হইয়াছিল। মর্কটটা তাহাকে পূর্ব্বের সেই হস্তী মনে করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আহোরণ করিল। দুষ্ট হস্তী তাহাকে শুণ্ড দ্বারা ধরিয়া ভূতলে ফেলিল এবং পাদনিষ্পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।

এই ঘটনা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশিত হইল। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনেছ ভাই, সেই ধূর্ত্ত মর্কটটা না কি শিষ্টশান্ত হাতি মনে করিয়া একটা দুষ্ট হাতির পিঠে চড়িয়াছিল। হাতিটা উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ধূর্ত্ত মর্কটটা যে কেবল এ জন্মেই এইরূপ দুঃশীল হইয়াছিল তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এইরূপ দুঃশীলতার পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মহিষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহার দেহ অতি বিশাল ও বলিষ্ঠ হইয়াছিল এবং তিনি ভূধর, কন্দর গহনকানন প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহার এক স্থানে একটি রমণীয় বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি বিচরণান্তে তাহার মূলে বিশ্রাম করিতেন। একটা ধূর্ত্ত মর্কট এই সময়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিত, তদুপরি মলমূত্র ত্যাগ করিত, কেলি করিবার জন্য তাঁহার শৃঙ্গ ধরিয়া ঝুলিত এবং লাঙ্গুল ধরিয়া দোল খাইত। বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ায় বিভূষিত ছিলেন বলিয়া দুষ্ট মর্কটের এইরূপ অনাচারেও কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিতেন না। কাজেই মর্কট পুনঃ পুনঃ এইরূপ কুকর্ম্ম করিত।

ঐ বৃক্ষে এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি একদিন বৃক্ষস্কন্ধে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহিষরাজ, তুমি এই দুষ্ট মর্কটের অবমাননা সহ্য কর কেন? ইহাকে নিষেধ কর না কেন?" নিজের মনের ভাব আরও সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার জন্য বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

দুঃশীল মর্কট এই করে নিত্য জ্বালাতন;
তবু কেন সহ্য তুমি কর এত উৎপীড়ন?
তোমার তিতিক্ষা দেখি, এই মোর মনে লয়,
সর্ব্বকামপ্রদ প্রভু এ বুঝি তোমার হয়।
শৃঙ্গাঘাতে মার এবে, পদে করে নিষ্পীড়ন;
প্রতিবেধ বিনা মূর্খ করে সদা উৎপীড়ন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৃক্ষদেবতে, আমি যদি এই মর্কটের জাতিগোত্র- বল প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া, ইহার অপারাধ সহ্য না করি, তাহা হইলে আমার মনোরথসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? এই মর্কট অপর মহিষকেও আমার ন্যায় মনে করিয়া নিশ্চয় এইরূপ অনাচার করিবে; যখন কোন উগ্রপ্রকৃতি মহিষের সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ করিবে; তখন সে ইহাকে বধ করিবে। অন্যে ইহাকে বধ করিলে আমার দুঃখেরও অবসান হইবে; আমাকে প্রাণীহত্যার পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

যেরূপ আমার সাথে করে দুষ্ট ব্যবহার,
করিলে অন্যের সঙ্গে পাবে সদ্যঃ ফল তার।
বধিবে দুষ্টেরে তারা; পাব আমি পরিত্রাণ
দুঃখ হ'তে, অনায়াসে, না বধি কাহার(ও) প্রাণ।

ইহার কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং একটা চণ্ড মহিষ আসিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিল। দুষ্ট মর্কট ইহাকে বোধিসত্ত্ব মনে করিয়া ইহারও পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেইরূপ অনাচার করিল। চণ্ডমহিষ পৃষ্ঠ কম্পন করিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিল, শৃঙ্গদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল এবং পাদদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তাহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।

[**সমবধান :** তখন এই দুষ্ট হস্তী ছিল সেই দুষ্ট মহিষ; এই দুষ্ট মর্কট ছিল সেই দুষ্ট মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান মহিষরাজ।]

---

২৭৯. শতপত্র-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাণ্ডুকের ও লোহিতকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ষড়বর্গীয়দিগের[২] মধ্যে মৈত্রেয় ও ভূমিজক, এই দুইজন রাজগৃহের নিকটে, অশ্বজিৎ ও পূনর্ব্বসু, এই দুইজন কীটাগিরির নিকটে, এবং পাণ্ডুকও লোহিতক, এই দুই জন শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী জেতবনে থাকিতেন। যে সমস্ত বিষয় ধর্ম্মশাস্তানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে, ষড়বর্গীয়েরা সেই সকলের

---

[১]। শতপত্র বলিলেন বক, ময়ূর, কাষ্ঠকুট্ট প্রভৃতি কয়েক প্রকার পক্ষী বুঝায়। ইংরাজী অনুবাদক 'বক' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

[২]। ছয়জন অবাধ্য ভিক্ষু 'ষড়বর্গীয়' নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। নন্দিবিলাস প্রভৃতি আরও অনেক জাতকে ষড়বর্গীরদিগের উল্লেখ আছে।

সম্বন্ধে কুতর্ক উপস্থাপিত করিতেন, যাহারা তাঁহাদের বন্ধু, তাহাদিগের উৎসাহার্থ বলিতেন, "দেখ ভাই, তোমরা কি জাতি, কি গোত্র, কি শীল, কিছুতেই অন্যান্য ভিক্ষুদিগের অপেক্ষাহীননহে; তোমরা যদি স্বমত পরিহার কর, তাহা হইলে এই সকল লোকের আস্পর্দ্ধা আরও বৃদ্ধি হইবে।" এইরূপ বলিয়া ষড়বর্গীয়েরা তাহাদিগকে ভ্রান্তমত ত্যাগ করিতে দিতেন না; কাজেই নানারূপ বিবাদ বিসংবাদ হইত। অবশেষে ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত ভগবানের গোচর করিলেন। এই নিমিত্ত এতৎসম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইলেন এবং পাণ্ডুক ও লোহিতককে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সত্যই কি তোমরা নিজেরাও কুতর্ক উপস্থাপিত কর এবং অপরকে তাহাদের ভ্রান্তমত পরিহার করিতে দেও না?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এ কথা মিথ্যা নহে।" "ভিক্ষুগণ, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমাদের কাজ এবং পুরাকালীন শতপত্র ও মানুষের কাজ তুল্যরূপ।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া পঞ্চশত চোর সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং কখনও রাহাজানি করিয়া, কখনও সিঁদ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি কোন জনপদবাসীকে এক সহস্র কার্ষাপণ ঋণ দিয়াছিলেন; কিন্তু উহা আদায় না করিয়াই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভার্য্যাও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বাবা, তোমার পিতা এক ব্যক্তিকে এক সহস্র কার্ষাপণ ধার দিয়া আদায় না করিয়া মরিয়াছেন; এখন আমিও যদি মরি, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তোমাকে ঐ অর্থ দিবে না; অতএব এখনই গিয়া, আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, উহা আদায় করিয়া আন।" পুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং কার্ষাপণগুলি পাইল। এদিকে তাহার মাতা প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুত্রস্নেহবশত ঔপপাতিক[১] শৃগালী হইয়া তাহার আগামনপথে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রকে বনাভিমুখে আগত দেখিয়া শৃগালী বলিতে লাগিল, "বাছা, এই বনে প্রবেশ করিও না; এখানে চোর

---

[১]। গর্ভবাস বিনা জাত। সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষের সংসর্গেই প্রাণীদিগের জন্ম হয়; কিন্তু দেবতারা এ নিয়মের বহির্ভূত সময়ে সময়ে মনুষ্যাদি প্রাণীরও এরূপ জন্ম সম্ভবপর।

আছে; তাহারা তোমাকে মারিয়া কাহণগুলি লইয়া যাইবে।" ইহা বলিতে বলিতে শৃগালী বার বার তাহার পথ রোধ করিতে লাগিল। পুত্র কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না; 'এই কালকর্ণী শৃগালী আমার পথ রোধ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া সে লোষ্ট্র ও যষ্টিদ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিল এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে এক শতপত্র বলিতে লাগিল, "লোকটার হাতে সহস্র কার্ষাপণ আছে; তোমরা ইহাকে মারিয়া সেইগুলি গ্রহণ কর।" ইহা বলিতে বলিতে সে চোরদিগের অভিমুখে উড়িয়া গেল। লোকটা এই শতপত্রের এই কাণ্ডও বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'এই পক্ষী শুভশংসী; এখন আমার শুভফল প্রাপ্তি ঘটিবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আপনি নিনাদ করুন, প্রভু, আপনি নিদান করুন।"

বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিধ শব্দেরই অর্থ বুঝিতেন। তিনি শৃগালী ও শতপত্রের ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই শৃগালী বোধ হয় লোকটার মতো ছিল ও তজ্জন্য, পাছে কেহ ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ করে এই আশঙ্কায়, ইহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে; আর শতপত্র বোধ হয় ইহার শত্রু ছিল; সেই জন্য বলিতেছে, ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর। লোকটা কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না; কাজেই হিতৈষিণী মাতাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে ইষ্টকামী মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিতেছে। অহো, লোকটা কি মূর্খ!'

[বোধিসত্ত্বেরা মহাপুরুষ হইলেও কখনও কখনও দুষ্টজন্মগ্রহণবশত পরস্বাপহরণ করিয়া থাকিতেন। লোকে বলে যে নক্ষত্রদোষে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।]

এদিকে চোরেরা যেখানে ছিল, লোকটা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস কোথায়?" সে উত্তর দিল "আমি বারাণসীবাসী।" "কোথা হইতে আসিতেছ?" একটা গ্রামে সহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্য ছিল; সেখান হইতে আসিতেছি।" তাহা পাইয়াছ কি?" "হাঁ পাইয়াছি।" "কে তোমায় সেখানে পাঠাইয়াছিল?" "প্রভু, আমার পিতা মারা গিয়াছেন; মাতাও পীড়িতা; তিনি মরিলে আমি আর কার্ষাপণগুলি পাইব না বলিয়া তিনিই আমায় পাঠাইয়াছিলেন।" "এখন তোমার মাতা কি অবস্থায় আছেন, তাহা জান?" "না, প্রভু, তাহা আমি জানি না।" "তুমি রওনা হইলে তোমার মা মারা গিয়াছেন এবং পুত্রস্নেহবশত শৃগালী হইয়া, পাছে তোমার প্রাণ যায় এই ভয়ে, পথ অবরোধ করিয়া তোমার নিষেধ করিতেছিলেন; তুমি কি না তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলে! আর এই শতপত্র পক্ষী তোমার শত্রু।

এ আমাদিগকে বলিল, 'ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর।' কিন্তু তুমি এমনই মূঢ়, যে হিতৈষিণী মাতাকে অনিষ্টকারিণী মনে করিলে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে হিতেষী বলিয়া স্থির করিলে! শতপত্র তোমার কোন ভাল করে নাই; তোমার মাতা কিন্তু তোমার মহা উপকার করিয়াছেন। যাও, তোমার কার্ষাপণগুলি লইয়া প্রস্থান কর।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

কাননের মাঝে শৃগালী আসিয়া হিত বলে, রোধে পথ;
শত্রু ভাবে তারে মূর্খ মাণবক; রোষে, তর্জে, গর্জে কত!
শতপত্র তার শত্রু ভয়ঙ্কর; মিত্র বলি তারে মানে!
অহো কি মূঢ়তা ভ্রান্ত মানবের! শত্রু মিত্র নাহি জানে!
হেথাও সেরূপ কাণ্ডাকাণ্ডহীন দেখি আমি একজন;
হিত বাক্য শুনি অর্থ নাহি বুঝে বিপরীত ভাবে মনে।
যাহার তাহার প্রশংসা নিরত, যাহারা দেখায় ভয়—
ছাড়িলে স্বমত রটিবে কলঙ্ক, অতএব ছাড়া নয়—
সেই সব লোকে মিত্র বলি জানে; মাণবক যে প্রকার
শতপত্ররূপী বিষম শত্রুরে ভেবেছিল মিত্র তার।[১]

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই চোরদিগের অধিনেতা।]

---

২৮০. পুটদূসক-জাতক

[একটা বালক কতগুলি পাতার ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী জনৈক অমাত্য একবার বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপহার দিবার সময় বলিয়াছিলেন, আপনারা যদি কেহ উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবাধে করিতে পারেন।" এই অনুমতি পাইয়া ভিক্ষুরা উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যানপাল

---

[১]। এই প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটি উদ্ধত করিয়াছিলেন :—

অর্থগৃন্ধু মিত্র, মিত্র বাক্যে পটু, যে মিত্র নিরত তোষে,
ব্যসনের সাথী যে মিত্রের হেতু মজে লোক নানা দোষে,
এই চারি মিত্র অতি ভয়ঙ্কর যমের কিঙ্করপ্রায়;
পণ্ডিত যাহারা দূর হ'তে তারা ত্যজি এ সকলে যায়।

একটা পত্রবহুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক একটা বড় পাতা লইয়া ঠোঙ্গা করিতে লাগিল এবং এই ঠোঙ্গায় ফুল রাখা চলিবে, এই ঠোঙ্গার ফল রাখা চলিবে, এইরূপ বলিয়া সে এক একটি ঠোঙ্গা বৃক্ষ মূলে ফেলিতে লাগিল। এদিকে তাহার ছোট একটি ছেলে, ঠোঙ্গাগুলি যেমন পড়িতে লাগিল, অমনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিতে লাগিল। ভিক্ষুরা শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই বালক কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল! অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর এক গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, তিনি যখন গৃহস্থ হইয়াছিলেন, তখন একদিন কোন কারণে তিনি একটা উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। সেই উদ্যানে অনেক বানর থাকিত। এই উদ্যানপাল যেমন করিয়াছে, সেই উদ্যানের রক্ষকও সেইরূপে ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিতেছিল এবং বানরদিগের অধিনেতা, সেগুলি যেমন পড়িতেছিল, অমনি নষ্ট করিতেছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠোঙ্গাগুলি ভাঙ্গিয়া বানরটা ভাবিতেছে যে সে উদ্যানপালের পরম সন্তোষজনক কাজ করিতেছে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :

পূটের নির্ম্মাণে পটু বানর নিশ্চয়,
নচেৎ ভাঙ্গিবে কেন পুট যত পায়?
করিবে সুন্দরতর পুটের গঠন,
বুঝিলাম, মৃগরাজ[১] করেছে দমন।

ইহা শুনিয়া সেই মর্কট নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিল :

পিতৃমাতৃকুলে মম কভু কোন জন
পুটের নির্ম্মাণপটু হয়নি কখন।
অন্যে যাহা করে তার বিনাশ-সাধন,
বানর-কুলের এই ধর্ম্ম সনাতন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :

এই যদি ধর্ম্ম হয় বানরকুলের
না জানি অধর্ম্ম কি বা হয় তাহাদের!
ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান কি বা বলিহারি যাই!
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের দেখে কাজ নাই।

---

[১]। এখানে বানরকে বুঝাইতেছে।

এইরূপে বানরকে ভৎর্সনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে প্রস্থান কয়িাছিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই পুটনাশক বালকটি ছিল সেই বানর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ]

---

২৮১. অভ্যন্তর-জাতক

[স্থবির সারিপুত্র স্থবিরা বিম্বাদেবীকে[১] আম্ররস দান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ মহাধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক যখন বৈশালী নগরীস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রজাপতী গৌতমী পঞ্চশত শাক্যমহিলা সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ সেখানে উপস্থিত হন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। এই পঞ্চশত শাক্যমহিলা অতঃপর নন্দকের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর শাস্তা যখন শ্রাবস্তীর নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন রাহুলমাতা ভাবিলেন, 'আমার স্বামী প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, পুত্রও প্রব্রাজক হইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে; আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব? আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে যাইব; তাহা হইলে নিয়ত সম্যকসম্বুদ্ধের ও পুত্রের দর্শনলাভ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত শ্রাবস্তীতে গমনপূর্ব্বক সেখানে ভিক্ষুণীদিগের এক উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শাস্তা ও প্রিয়পুত্রকে দেখিবার সুযোগ পাইতেন। রাহুল তখন শ্রামণের ছিলেন; তিনি প্রায়ই মাতাকে দেখিতে যাইতেন।

একদিন বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল। রাহুল যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য গৃহের বাহিরে যাইতে পারিলেন না; অন্য একজন ভিক্ষুণী গিয়া তাঁহাকে বিম্বাদেবীর অসুখের কথা জানাইলেন। তখন রাহুল মাতার পার্শ্বে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থায় আপনার কি খাওয়া উচিত?" বিম্বাদেবী বলিলেন "বৎস, যখন গৃহে ছিলাম, তখন শর্করা মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে উদরবাতের প্রশমন হইত।

---

[১]। যশোধরার নামান্তর।

এখানে এখন আমাদিগকে ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়; এখন শর্করা মিশ্রিত আম্ররস কোথায় পাইব?" শ্রামণের রাহুল বলিলেন, "আমি সংগ্রহ করিতে চলিলাম; পাইলেই লইয়া আসিব।" অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আয়ুষ্মান রাহুলের উপাধ্যায় ধর্ম্মসেনাপতি, আচার্য্য মহামৌদ্গল্যায়ন, খুল্লতাত স্থবির আনন্দ, পিতা স্বয়ং সম্যকসম্বুদ্ধ। ফলতঃ তাঁহার সৌভাগ্যের সীমাপরিসীমা ছিল না; তথাপি তিনি অন্য কাহারও নিকট না গিয়া উপাধ্যায়ের নিকটেই উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" রাহুল উত্তর দিলেন, "ভদন্ত আমার জননী স্থবিরা বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কূপিত হইয়াছে।" "তাঁহাকে কি কি দ্রব্য খাইতে দেওয়া যায়?" "এ অবস্থায় শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে নাকি তিনি উপকার বোধ করেন।" "বেশ, তাহাই সংগ্রহ করিতেছি; তুমি সে জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

পরদিন সারিপুত্র রাহুলকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে এক আসনশালায়[১] বসাইয়া নিজে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে উদ্যানপাল এক ঝুড়ি সুপক্ক[২] মধুর আম্রফল লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা আমগুলি খোষা ছাড়াইয়া তাহাদের উপর চিনি ছড়াইলেন এবং নিজেই মর্দ্দন করিয়া আম্ররস দ্বারা স্থবিরের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর স্থবির রাজভবন হইতে আসনশালায় ফিরিয়া গেলেন এবং "যাও, তোমার মাকে দাও গিয়া" বলিয়া পাত্রটি রাহুলের হস্তে দিলেন। রাহুল তাহাই করিলেন এবং উক্ত রস পান করিবামাত্র বিম্বাদেবীর উদরবাতের উপশম হইল।

এদিকে রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "সারিপুত্র এখানে আম্ররস পান করিলেন না; দেখিয়া আইস, উহা অন্য কাহাকেও দিলেন কি না।" ঐ লোকটা সারিপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া রাজাকে জানাইল। তচ্ছ্রবণে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "শাস্তা যদি গাহর্স্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারেন; তখন শ্রামণের রাহুল হইবেন তাঁহার পরিনায়করত্ন, স্থবিরা বিম্বাদেবী হইবেন তাঁহার

---

[১]। আসন শালা—পথিকদিগের বিশ্রামগৃহ। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় waiting room বলা যাইতে পারে।

[২]। মূলে পিণ্ডিপক্ক এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'গাছেই এমন পাকিয়াছিল যে তখনই সেগুলি আহার করা যাইতে পারে'। পিণ্ডি = থলো (bunch)।

স্ত্রীরত্ন এবং অখণ্ড ভূমণ্ডল হইবে তাঁহাদের রাজ্য।[১] ইহাদিগের পরিচর্য্যা করা আমার কর্ত্তব্য। ইঁহারা যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এখন আমার রাজধানীর সন্নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ইঁহাদের সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইলে ভাল দেখাইবে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তদবধি বিম্বাদেবীর জন্য প্রতিদিন আম্ররস পাঠাইতে লাগিলেন।

স্থবির সারিপুত্র বিম্বাদেবীর জন্য আম্ররস আনয়ন করেন, ক্রমে এই কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ধর্ম্মশালায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, সারিপুত্র নাকি আম্ররস আনয়ন করিয়া বিম্বাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মে আম্ররস দ্বারা বিম্বাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সেখানে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, কিন্তু মাতা পিতার মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করেন। অনেক ঋষি তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন।

বহুকাল পরে একদা তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ শিষ্যগণসহ পর্ব্বতপাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সকল ঋষির শীলতেজে শক্রের বৈজয়ন্তপ্রাসাদ কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তাপসদিগের বাসস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতে হইবে; অবস্থিতি-সম্বন্ধে উপদ্রব জন্মিলে ইহারা চিত্তের একাগ্রতা

---

[১]। চক্রবর্ত্তী রাজার সাতটি রত্ন থাকে, যথা : ছত্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক। গৃহপতি অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী অনুচরবৃন্দ; পরিনায়ক অর্থাৎ রাজ্যের ভাবী অধিকারী (crown prince.)

হারাইবে; তাহা হইলেই আমি শান্তিতে থাকিতে পারিব।'[১] অনন্তর, কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন, 'আমি রাত্রির মধ্যমযামে রাজার অগ্রমহিষীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে[২] প্রবেশ করিব, এবং আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিব, "ভদ্রে, তুমি যদি অভ্যন্তরাম্রফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিবে।" একথা শুনিয়া মহিষী রাজাকে বলিবেন এবং রাজা আম্রফল-সংগ্রহার্থ উদ্যানে লোক পাঠাইবেন। আমার প্রভাববলে উদ্যানের সমস্ত আম্র অন্তর্হিত হইবে; রাজভৃত্যেরা রাজাকে গিয়া বলিবে, "উদ্যানে আম্র পাওয়া গেল না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, "কে আম্র খাইয়াছে?" ভৃত্যেরা বলিবে, "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা তাপসদিগকে প্রহার করিয়া উদ্যান হইতে দূর করিয়া দিবেন। তাপসদিগের উপর উপদ্রব করিবার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।' এইরূপ সংকল্প করিয়া শক্র নিশীথ সময়ে রাজ্ঞীর শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া নিজের দেবরাজ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং রাজ্ঞীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটি বলিলেন :

অভ্যন্তর নামে দ্রুম, দিব্য ফল তার
দোহদ-নিবৃত্তি তরে করিলে আহার
প্রসবে তনয় নারী, যায় করতলে
একচ্ছত্র আধিপত্য এ মহীমণ্ডলে।
তুমি ভদ্রে, নরেশের প্রণয়ভাগিনী,
বল তাঁরে; সেই ফল আনিবেন তিনি।

এই গাথাদ্বয় বলিবার পর শক্র রাজ্ঞীকে উপদেশ দিলেন, "যাহা বলিলাম, তাহা অবহেলা করিও না; রাজাকে এই কথা বলিতে যেন বিলম্ব না হয়; কালই তাঁহাকে একথা জানাইতে ভুলিও না।" অনন্তর শক্র নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন মহিষী পরিচারিকাদিগের নিকট প্রকৃত কথা বলিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা শ্বেতচ্ছত্রশোভিত সিংহাসনে বসিয়া নৃত্য দেখিতেছিলেন; কিন্তু সেখানে মহিষী উপস্থিত হন নাই দেখিয়া জনৈক পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর করিল,

---

[১]। মানবের তপোবলদর্শনে শক্রের অশান্তি এবং ছলে বলে নানারূপ বিঘ্নোৎপাদন হিন্দুপুরাণে সুবিদিত।

[২]। মূলে 'সিরিগব্‌ভ' এইরূপ আছে। যাহা রাজকীয়, তাহার পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ যোগ করিবার রীতি ছিল, যেমন শ্রীগর্ভ শ্রীশয়ন ইত্যাদি।

"তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা মহিষীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, কি অসুখ করিয়াছে বল ত?"

মহিষী। অন্য কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু একটি দ্রব্য খাইবার জন্য আমার বড় সাধ হইয়াছে।

রাজা। কি দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র ফল।

রাজা। অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র কি তাহা আমিও জানি না; কিন্তু সেই ফল আহার করিতে পারিলেই আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে; নচেৎ প্রাণ থাকিবে না।

রাজা। যদি এরূপ হয় তবে যে প্রকারেই হউক, উহা আনাইতেছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।

মহিষীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন এবং রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অভ্যন্তরাম্র নামক এক প্রকার ফল খাইবার জন্য দেবীর বড় ইচ্ছা হইয়াছে। বলুন ত এখন কি কর্ত্তব্য?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! দুইটি আম্রের মধ্যবর্ত্তী আম্রটিকে অভ্যন্তরাম্র বলা যাইতে পারে। আপনি উদ্যানে লোক পাঠাইয়া এইরূপ ফল আনয়ন করুন এবং দেবীকে খাইতে দিন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছেন।" ইহা বলিয়া রাজা ঐরূপ আম্র আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু শক্র নিজের অনুভাববলে, লোকে যেন খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছে এইভাবে, সমস্ত আম্র অদৃশ্য করিয়াছিলেন; কাজেই যাহারা আম্রের জন্য গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া একটিও ফল পাইল না, এবং ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ! বাগানে আম নাই।' রাজা বলিলেন, "আম নাই; এত আম থাকে, খাইল কে?" "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাপসদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়া বাগান হইতে বাহির করিয়া দাও।" রাজভৃত্যেরা 'যে আজ্ঞা বলিয়া, তাহাই করিল; শক্রেরও মনোরথ পূর্ণ হইল। কিন্তু মহিষীর সাধ পূর্ণ হইল না; তিনি অভ্যন্তরাম্র পাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন এবং শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন এবং অভ্যন্তরাম্র নামে কোন বিশিষ্ট ফল আছে কি না জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, দেব! অভ্যন্তরাম্র দেবভোগ্য ফল; ইহা হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চনগুহার অভ্যন্তরে জন্মে; আমরা পুরুষপরম্পরায় এই কথা শুনিয়া আসিতেছি।" রাজা বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে কে তাহা আনিতে পারে

বলুন ত?”

মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যায়। আমাদিগকে একটা শুকশাবক প্রেরণ করিতে হইবে।”

ঐ সময়ে রাজভবনে একটি শুকশাবক ছিল; কুমারেরা যে রথে আরোহণ করিতেন, তাহার চক্রের নাভি যত বড়, এই শুকের দেহও তত বড় হইয়াছিল, এবং তাহার যেমন বল, সেইরূপ প্রজ্ঞা ও উপায়কুশলতা জন্মিয়াছিল। রাজা সেই শুকশাবককে আনাইয়া বলিলেন, “বৎস শুকপোতক, আমি তোমার বহু উপকার করিয়াছি; তোমাকে কাঞ্চন পঞ্জরে রাখিয়াছি, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইয়াছি, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইয়াছি; তোমাকেও আমার একটি কার্য্য করিতে হইবে।”

“বলুন, মহারাজ, আমাকে কি করিতে হইবে।

“বৎস, দেবীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যন্তরাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেই ফল নাকি হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চন পর্ব্বতে পাওয়া যায়। তাহা দেবতাদিগের সেব্য; মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যাইতে পারে। তোমাকে গিয়া সেই ফল আহরণ করিতে হইবে।”

“যে আজ্ঞা, মহারাজ, আমি সেই ফল আনয়ন করিব।”

অনন্তর রাজা শুকশাবককে সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন এবং তাহার পক্ষদ্বয়ের নিম্নে শতপাক[১] তৈল মর্দ্দন করাইলেন; শেষে তাহাকে উভয়হস্তে ধারণ করিয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইলেন এবং সেখানে আকাশে ছাড়িয়া দিলেন।

শুকপোতক রাজাকে প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে উড়িয়া চলিল এবং মনুষ্যপথ অতিক্রমপূর্ব্বক হিমবন্তের প্রথম পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শুকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে সেই স্থান বলিয়া দাও।” তাহারা উত্তর দিল, “আমরা জানি না; দ্বিতীয় পর্ব্বত শ্রেণীতে যে সকল শুক আছে, তাহারা জানিতে পারে।” এই কথা শুনিয়া সে ঐ স্থান হইতে পুনর্ব্বার উড়িতে আরম্ভ করিল এবং দ্বিতীয় পর্ব্বতরাজিতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু শেষোক্ত স্থানের শুকেরাও বলিল, “আমরা জানি না, সপ্তম পর্ব্বতশ্রেণীতে যে সকল শুক বাস করে, তাহারা জানিতে পারে।” তখন শুকশাবক সপ্তম পর্ব্বতশ্রেণীতেই গেল এবং অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিল। এই স্থানের শুকেরা উত্তর দিল, “অমুক স্থানে কাঞ্চন পর্ব্বতে

---

[১]। শতবার পাক করা বা শোধিত করা।

নাকি সেই ফল পাওয়া যায়।” “আমি সেই ফল লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া ফল দাও।” “সে ফল বৈশ্রবণের পরিভোগ্য; আমাদের সাধ্য নাই যে তাহার নিকট যাই। ঐ বৃক্ষ মূল হইতে শাখাপল্লব পর্য্যন্ত সাতটি লৌহজাল দ্বারা বেষ্টিত; সহস্র কোটি কুম্ভাণ্ড[১] ও রাক্ষস নিয়ত উহার রক্ষাবিধান করিতেছে; তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহার আর নিস্তার নাই। সেস্থান প্রলয়াগ্নির ন্যায়, সে স্থান অবীচির ন্যায়; তুমি সেখানে যাইবার প্রার্থনা করিও না।” “তোমরা যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমাকে পথ বলিয়া দাও।” “নিতান্তই যদি যাও, তবে অমুক অমুক স্থান দিয়া যাইবে।”

তাহারা যে পথ নির্দেশ করিয়া দিল, শুকশাবক মনোনিবেশসহকারে তাহা বুঝিয়া লইল, এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দিবাভাগে অদৃশ্য রহিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে যখন রাক্ষসেরা নিদ্রাভিভূত হইল, তখন সে অভ্যন্তরাম্র বৃক্ষের একটি মূল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে লাগিল। এমনি লৌহজালে ‘কিলিট্’ করিয়া শব্দ হইল এবং তচ্ছ্রবণে রাক্ষসদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা শুকশাবককে দেখিয়া ‘আম চোর’, ‘আম চোর’ বলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং কি দণ্ড দিবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, “ইহাকে মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলি।” কেহ বলিল, “ইহাকে দুই হাতে পিষিয়া, তাল পাকাইয়া তিল তিল করিয়া ছড়াইয়া দি।” কেহ বলিল, “ইহাকে দুই ফা’ল করিয়া চিরিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাই।”

শুকপোতক, তাহাদের কে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিল, সমস্ত শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পাইল না। সে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “রাক্ষসগণ, তোমরা কাহার ভৃত্য!” তাহারা উত্তর দিল “আমরা বৈশ্রবণ মহারাজের ভৃত্য।” “বা! তোমরা এক রাজার ভৃত্য! বারাণসীরাজ আমাকে অভ্যন্তরাম্র ফল লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র সেখানেই তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়াছি। যে আপনার মাতা, পিতা এবং প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জন করে, সে দেহক্ষয়ের পর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। এতএব আমিও দেখিতেছি, আজ তির্য্যগদেহ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিব।” অনন্তর শুকপোতক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিল :

ভর্ত্তৃকার্য্যে করি প্রাণপণ
আত্মপরিত্যাগী বীরগণ,

---

[১]। কুম্ভাণ্ড একপ্রকার দেবযোনি। এই জাতকে রাক্ষস ও কুম্ভাণ্ড শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে দিব্য ধামেতে যান,
দেহ হলে অবসান,
হবে সেথা আমার গমন।

এইরূপে উক্ত গাথা দ্বারা সে রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইল। তাহা শুনিয়া রাক্ষসেরা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল, "এই শুকশাবক দেখিতেছি ধার্ম্মিক; ইহাকে ত মারিতে পারিব না; এস ইহাকে ছাড়িয়া দি।" এই ভাবিয়া তাহারা শুকশাবককে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, "যাও।" তুমি মুক্ত হইলে। আমাদের হাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইল না; তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাও।" শুকশাবক বলিল, "আমাকে যেন রিক্তমুখে ফিরিতে না হয়; দয়া করিয়া একটা আম্র ফল দাও।" "শুকশাবক, তোমাকে একটি ফলও দিতে পারি না। এই গাছে যত আম দেখিতেছ, সমস্তই চিহ্নিত; একটি মাত্র ফলও এদিক ওদিক্ হইলে আমাদের প্রাণান্ত ঘটিবে। তপ্ত খোলায় তিল ফেলিলে তাহা যেমন ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, বৈশ্রবণ ক্রুদ্ধ হইয়া একবার মাত্র তাকাইলে, সহস্র সহস্র কুম্ভাণ্ডও সেইরূপে কে কোন দিকে ছুটিয়া পলাইবে তাহার পথ পাইবে না। সেই জন্যই তোমায় আম দিতে পারিতেছি না। তবে কোথায় গেলে তুমি আম পাইতে পার তাহা বলিতেছি।" "কে দিবে তাহা আমার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; তবে ফল একটা পাইতেই হইবে। বল, কোথায় গেলে পাইব।" "এই যে কাঞ্চন পর্ব্বতমালা দেখিতেছ, ইহার এক দুর্গম অংশে জ্যোতিরস[১] নামক এক তাপস আছেন। তিনি কাঞ্চনপত্রী নামক পর্ণশালায় অগ্নিতে হোম করেন। এই তাপস বৈশ্রবণের কুলোপগ গুরু। বৈশ্রবণ তাঁহার সেবার জন্য প্রতিদিন চারিটি আম্রফল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও।"

"বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শুক রাক্ষসদিগের নিকট বিদায় লইল এবং ঐ তাপসের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" শুকপোতক উত্তর দিল, "বারাণসীরাজের নিকট হইতে।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "প্রভো, আমাদের রাজ্ঞীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যন্তরাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেইজন্য এদেশে আসিয়াছি, কিন্তু রাক্ষসেরা স্বয়ং এই ফল না দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ফল পাইবে।"

ইহার পর বৈশ্রবণ তাপসের নিকট চারিটিআম্রফল পাঠাইলেন; তাপস তাহা হইতে নিজে দুইটি খাইলেন, একটি শুকশাবককে খাইতে দিলেন এবং তাহার

১। জ্যোতিরস একপ্রকার মণিরও নাম। এই মণি ঈপ্সিতফলপ্রদ।

ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট ফলটি একগাছি শিকায় ফেলিয়া তাহা তাহার গলায় বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন ফিরিয়া যাও।"

অনন্তর শুকপোতক বারাণসীতে গিয়া রাজ্ঞীকে আম্র প্রদান করিল; উহা খাইয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল; কিন্তু এত করিয়াও তিনি পুত্রলাভ করিলেন না।[১]

[**সমবধান :** তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই রাজ্ঞী; আনন্দ ছিলেন সেই শুক, সারিপুত্র ছিলেন সেই আম্রফলদাতা তাপস এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের উদ্যানস্থ সেই ঋষিগণশাস্তা।]

---

২৮২. শ্রেয়ো-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের একজন অমাত্য-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি রাজার পরমোপকারক ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজাও তাঁহাকে নিজের বহুহিতসাধক জানিয়া তাঁহার সবিশেষ সম্মান করিতেন। ইহাতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া অন্য অনেক অমাত্য তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলীক গ্লানির কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা পিশুনকারকদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া এই নির্দ্দোষ ও সাধুশীল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, তিনি প্রকৃত দোষী কি না তাহা অনুসন্ধান করিলেন না। কারাগৃহে একাকী থাকিয়া তিনি শীলবলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিলেন, একাগ্রচিত্তের প্রভাবে সংস্কারসমূহের[২] প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন এবং এইরূপে ক্রমে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা বুঝিতে পারিলেন, ঐ অমাত্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তখন তিনি তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন শাস্তাকে বন্দনা

---

[১]। এই জাতকে শক্রের চরিত্রে ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি যে দুই তিনটি দোষ লক্ষিত হয়, অন্যান্য জাতকে সাধারণতঃ সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি সচরাচর ধার্ম্মিকের সহায় বলিয়াই কীর্ত্তিত।

[২]। সংস্কার (পালি সংখার) শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় (যথা প্রসাধন, সমষ্টি, পদার্থ, জড়জগৎ, কর্ম্ম, স্কন্ধ)। অনিচ্চা সব্ব সংখারা,' 'বয়ধম্মা সংখারা' ইত্যাদি বাক্যে বোধ হয় ইহা 'জড়জগৎ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে ইহা দ্বারা কেবল জড় পদার্থ নহে, জড়ের গুণও বুঝাইয়াছে এবং যাহা কিছু অনিত্য, সমস্তই সংস্কার নামে অভিহিত হইয়াছে। 'অনিত্যত্ব' বলিলেই 'মৃত্যুর' ভাব মনে উদিত হয়; কাজেই 'সংস্কার' শব্দ 'পঞ্চস্কন্ধ 'অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'সঙ্খারা পরমা দুক্‌খা' এই বাক্যের অর্থ পঞ্চস্কন্ধের সংযোগ অর্থাৎ জীবন দুঃখকর।

করিবার অভিপ্রায়ে এই অমাত্য প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গমন করিলেন, এবং তথাগতের পূজা করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিলেন, "সম্প্রতি তোমার যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।" অমাত্য বলিলেন, "ভদন্ত, অনর্থ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি সেই অনর্থ হইতেই অর্থ লাভ করিয়াছি; আমি কারাগারে থাকিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" "উপাসক, তুমিই যে কেবল অনর্থ হইতে অর্থ লাভ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরাও অনর্থ হইতে অর্থ আহরণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত উপাসকের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যলাভ করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিতেন, অকাতরে দান করিতেন, শীলসমূহ পালন করিতেন এবং উপোষধব্রত রক্ষা করিতেন।

বোধিসত্ত্বের একজন অমাত্য রাজার শুদ্ধান্তঃপুরের কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজার ভৃত্যগণ ইহা জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "মহারাজ, অমুক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, অমাত্য প্রকৃতই দুশ্চরিত্র; তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে আমার কোন কাজ করিও না।" অনন্তর তিনি ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিলেন।

নির্ব্বাচিত অমাত্য এক সামন্তরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, মহাশীলবজ্জাতকে (৫১, ১ম খণ্ড) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিল। এ ক্ষেত্রেও সেই সামন্তরাজ, উক্ত অমাত্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা, তিন বার পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহার সত্যতা-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বারাণসী গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বিপুলবাহিনীসহ ঐ রাজ্যের সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারণসীরাজ্যের পঞ্চশত মহাযোদ্ধা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "দেব, অমুক রাজা নাকি আমাদের রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য জনপদ বিধ্বস্ত করিতে করিতে আসিতেছেন। অনুমতি দিন, আমরা এখান হইতেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বন্দী করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিংসা দ্বারা যে রাজ্য লাভ (রক্ষা) করিতে হয়, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে

না।”

অতঃপর চোররাজ[১] আসিয়া নগর বেষ্টন করিলেন। তখন অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; আমরা গিয়া চোররাজকে বন্দী করি।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “না, কিছুই করা যাইতে পারে না। তোমরা নগরের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দাও।”

চোররাজ চতুর্দ্বারে বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, প্রাসাদে আরোহণ-পূর্ব্বক অমাত্যপরিবৃত বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। বোধিসত্ত্ব কারাগারে থাকিয়াও চোররাজের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া মৈত্রীভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মৈত্রীভাবনাবশতঃ চোররাজের শরীরে ভীষণ জ্বালা উৎপাদিত হইল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন যুগপৎ দুইটা উল্কাদ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি মহাযন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া এরূপ ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ বলিল, “আপনি শীলবান রাজাকে কারাযন্ত্রণা দিতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন।” ইহা শুনিয়া চোররাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, “আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক।” তিনি রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, “এখন হইতে আপনার শত্রুদমনের ভার আমার উপর রহিল।” অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অলঙ্কৃত মহাবেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রশোভিত পল্যঙ্কে আসীন হইলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অমাত্যদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

উত্তম কুশল ধর্ম্মে রত যেই জন,
উত্তম পুরুষে সেবা করি অনুক্ষণ
লভে সে পরম শ্রেয়ঃ; সেই হেতু আজ
মম মৈত্রীভাবে মুগ্ধ দেখ চোররাজ।
মৈত্রীবলে একা আমি রক্ষি শত জনে;
নচেৎ নিহত তারা হ’ত এতক্ষণে।
অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রদর্শন
করেন সতত যিনি সুধীর সুজন।

---

[১]। ‘যিনি আক্রমণ করিয়া অপরের রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন বা করিতে আসিতেছেন’ এখানে এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

মৃত্যু-অন্তে সুরলোকে গমন তাঁহার;
শুন কাশীবাসী সবে বচন আমার।[১]

মহাসত্ত্ব এইরূপে জনসাধারণের প্রতি মৈত্রীপ্রদর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসীধামে শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

বারাণসীপতি কংস মহারাজ[২] এই সব কথা বলি
ফেলি ধনুর্ব্বাণ, লভিয়া সংযম, ধ্যানবলে হ'য়ে বলী।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই চোররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

---

২৮৩. বর্দ্ধকি-শূকর-জাতক[৩]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক এক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল যখন রাজা বিম্বিসারের সহিত নিজের দুহিতা কোশলদেবীর বিবাহ দেন, তখন কন্যার স্নানচূর্ণের[৪] ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ লক্ষমুদ্রা আয়ের কাশীগ্রাম যৌতুক দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু যখন পিতৃহত্যা করেন, তখন কোশলদেবীও শোকাভিভূতা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনার পর কোশলরাজ ভাবিলেন, 'অজাতশত্রু তাহার পিতার প্রাণনাশ করিল, আমার ভগিনীও পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন; যে পিতৃহন্তা ও চোর, তাহাকে

---

[১]। এই গাথাদ্বয়ের ইংরাজী অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই।" সেয্যংসো সেয্যসো হোতি বো সেয্যং উপসেবতি" প্রথম গাথার এই প্রথম চরণ অর্থকথায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—'সেয্যংসো' অর্থাৎ কুসলধম্মসন্নিস্‌সিতো পুগ্‌গলো (পুরুষ) যো পুনপ্‌পুনং 'সেয্যম্' অর্থাৎ কুসলাভিরতং উত্তমপুগ্‌গলং উপসেবতি সো 'সেয্যসো' পসংসতয়ো হোতি। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে এ অর্থ আদৌ প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় গাথার শেষ চরণে ইহা অপেক্ষাও ভ্রম ঘটিয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে পেচ্চ সগ্‌গং ন গচ্ছেয্য" এই পাঠ না হইয়া পেচ্চ সগ্‌গং নিগচ্ছেয্য' এইরূপ হইবে। সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবেন না, এ পাঠ কখনও শিষ্ট হইতে পারে না।

[২]। বুঝিতে হইবে যে এই জাতকবর্ণিত কাশীরাজের নাম ছিল কংস।

[৩]। বর্দ্ধকি = সূত্রধর (বৃধ-ধাতুজ)।

[৪]। স্নানার্থ সুগন্ধ জল এবং স্নানান্তে ব্যবহারার্থ সুগন্ধ চূর্ণ (cosmetic powder) এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত।

কাশীগ্রাম কেন দেব?' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম হইতে বঞ্চিত করিলেন। তদবধি এই গ্রাম লইয়া উভয় রাজার মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইতে লাগিল। অজাতশত্রু তরুণবয়স্ক ও সমর্থ; পক্ষান্তরে প্রসেনজিৎ অতি বৃদ্ধ; কাজেই প্রসেনজিৎ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন; মহাকোশলের অধিবাসীরাও শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

একদিন প্রসেনজিৎ অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ক্রমাগতই পরাস্ত হইতেছি; এখন কর্ত্তব্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি আর্য্যেরা মন্ত্রকুশল; অতএব জেতবনে গিয়া তাঁহারা এসম্বন্ধে কি বলেন শুনিলে ভাল হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা চরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা গিয়া যথাসময়ে ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া আইস।" চরেরা এই আজ্ঞামত কাজ করিবার জন্য তখনই প্রস্থান করিল।

এই সময়ে বিহারের নিকটে এক পর্ণকুটীরে উপ্ত ও ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক দুইজন বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য রাত্রির প্রথম ও মধ্যম যামে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি শেষ যামে প্রবুদ্ধ হইয়া কয়েকখানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালিলেন এবং তাহার নিকট বসিয়া বলিলেন, "ভদন্ত উপ্ত স্থবির!" উপ্ত বলিলেন, "কি ভদন্ত তিষ্য স্থবির?" "আপনি কি ঘুমাইতেছেন না?" "না ঘুমাইয়া কি করিব?" "উঠিয়া বসুন।" উপ্ত উঠিয়া বসিলেন। তখন তিষ্য বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এই লম্বোদর কোশলরাজ পূর্ণ অন্নভাণ্ড পচাইয়া ফেলিতেছে![1] কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেনা। সে কেবল পরাজিতই হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে।" "তাহাকে এখন কি করিতে বলেন!" এই প্রশ্নের সময় রাজার চরেরা কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কথা শুনিতে লাগিল।

ধনুর্গ্রহ তিষ্য স্থবির যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ, শকটব্যূহ।[2] অজাতশত্রুকে ধরিবার ইচ্ছা থাকিলে কোশলবাসীদিগকে অমুক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দুইটা গিরিদুর্গে সৈন্য রাখিতে হইবে, প্রথমে দেখাইতে হইবে যেন তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল; পরে শত্রুরা যখন পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন গিরিবর্ত্ম রুদ্ধ

---

[1]। অর্থাৎ সুবিধা পাইয়াও সুবিধা করিতে পারিতেছে না, বুদ্ধিদোষে সমস্ত পণ্ড করিতেছে।

[2]। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৮৭ ও ১৮৮ শ্লোকে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ ও পদ্মব্যূহ এই সাত প্রকার ব্যূহের বর্ণনা আছে। অগ্রভাগ সূচ্যাকার, পশ্চাৎ স্থূল এই ব্যূহের নাম শকটব্যূহ। সমভাবে বিস্তৃত মণ্ডলাকার ব্যূহ পদ্মব্যূহ নামে অভিহিত। সমস্ত ব্যূহেরই মধ্যভাগে রাজার অবস্থান।

করিতে হইবে, গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যগণ উল্লম্ফন ও সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইবে এবং পুনঃ পশ্চাৎ উভয়দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এরূপ করিলে স্থলে পতিত মৎস্য কিংবা মুষ্টিমধ্যগত মণ্ডুকশাবক ধরা যেরূপ সহজ, শত্রুকেও সেইরূপ অনায়াসে ও অল্পসময়ের মধ্যে ধরা যাইবে।"

চরেরা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। অতঃপর রাজা রণভেরী বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, শকটব্যূহ রচনা করিয়া অজাতশত্রুকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া আনিলেন। কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপিত হইল। কোশলরাজ ভাগিনেয়ের সহিত নিজের কন্যা বজ্রকুমারীর বিবাহ দিলেন,[১] এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই কাশীগ্রামই পুনর্ব্বার যৌতুক দিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে এই বৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শুনিতেছি, কোশলরাজ ধনুর্গ্রহ তিষ্যের উপদেশানুসারে চলিয়া অজাতশত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "ধনুর্গ্রহ তিষ্য যে কেবল এজন্মেই যুদ্ধবিদ্যা-সম্বন্ধে বিচারক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মেও তিনি যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীনগরের নিকটে সূত্রধরদিগের এক গ্রাম ছিল। তত্রত্য একজন সূত্রধর কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনে গিয়া গর্ত্তে পতিত এক শূকরশাবক দেখিতে পাইল এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া পুষিতে লাগিল। এই শূকরশাবক ক্রমে মহাকায় ও বক্রদংষ্ট্র হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত হইল। বৰ্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধরকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার বৰ্দ্ধকিশূকর এই নাম রাখিয়াছিল। সূত্রধর যখন কোন কাঠ কাটিত, তখন সে তুণ্ডদ্বারা তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিত, বাসি, কুঠার, তক্ষণী,[২] মুদ্গার প্রভৃতি যন্ত্রগুলি মুখ দিয়া কামড়াইয়া আনিয়া দিত এবং মাপিবার সময়

---

[১]। ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয় রাজকুলে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। অসিলক্ষণ-জাতকে (১২৬) এবং মৃদুপাণি-জাতকেও (২৬২) এইরূপ বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়।

[২]। বাটালি।

কৃষ্ণবর্ণ সূত্রের[১] এক প্রান্ত টানিয়া ধরিত।

সূত্রধরের ভয় হইল পাছে কেহ এই হৃষ্টপুষ্ট শূকরটীকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই জন্য সে একদিন তাহাকে বনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। শূকরও বনে প্রবেশ করিয়া কোন নিরাপদ্ ও সুখকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল পর্ব্বতপার্শ্বে এক মনোরম স্থানে একটা বৃহৎ গুহা রহিয়াছে এবং তাহার নিকটে কন্দমূলফলের কোন অভাব নাই। এই সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বহুশত শূকর তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "আমি তোমাদিগকেই খুঁজিতে ছিলাম; তোমরা দেখিতেছি আপনা হইতেই আসিয়াছ। এই স্থানটি রমণীয়। আমি এখন এখানেই বাস করিব।" তাহারা বলিল, "স্থানটি অতি রমণীয় বটে; কিন্তু এখানে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে।" "তোমাদিগকে দেখিয়া আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। এমন সুন্দর বিচরণক্ষেত্র থাকিতেও তোমাদের শরীরে রক্তমাংস নাই। তোমাদের ভয়ের কারণ কি বল ত?" "প্রাতঃকালে একটা বাঘ আসে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, ধরিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" "সে কি নিয়তই এরূপ ধরিয়া থাকে, না মধ্যে মধ্যে আসিয়া ধরে?" ''নিয়তই ধরে।" "এখানে কয়টা বাঘ আছে?" "একটা মাত্র।" "তোমরা এত প্রাণী, অথচ একটা বাঘের সঙ্গে পারিয়া উঠ না!" "আমাদের পারিবার সাধ্য কি?" "আচ্ছা, আমি তাহাকে ধরিতেছি; তোমরা কেবল, আমি যাহা বলিব সেই মত কাজ করিবে। সে বাঘ কোথায় থাকে?" "ঐ যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকে।"

অনন্তর বর্দ্ধকিশূকর, রাত্রিকালেই, বনবাসী শূকরদিগকে কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে লাগিল। সে বলিল, "দেখ, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার : পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ।" অনন্তর সে শূকরদিগকে পদ্মব্যূহাকারে স্থাপিত করিল। কোন স্থান হইতে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করিলে সুবিধা হইতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল; কাজেই সে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। সে শূকরী ও তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শাবকদিগকে[২] মধ্যভাগে রাখিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে প্রথমে বন্ধ্যা শূকরীগুলি, পরে শূকরশাবকগুলি, তদনন্তর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরগুলি, তদনন্তর দীর্ঘদংষ্ট্র শূকরগুলি, এবং সকলের বহির্ভাগে যুদ্ধক্ষম বলবান

---

[১]। আমাদের দেশে এখন ছুতরেরা খড়ি দিয়া সূতার দাগ দেয়; কিন্তু সিংহলে তাহারা খড়ির পরিবর্তে অঙ্গার ব্যবহার করে।

[২]। মূলে 'শূকরপিল্লকে' এই পদে আছে। পিল্লকো = শিশু। ইহা হইতে 'পোলা ও পিলা' (ছেলেপিলে) হইয়াছে।

শূকরগুলি, কোথাও দশ দশটি, কোথাও বিশ বিশটি এইভাবে, সজ্জিত করিয়া বলগুল্ম রচনা করিল। সে যেখানে নিজে অবস্থিতি করিল, তাহার সম্মুখে একটা মণ্ডলাকার গর্ত্ত খনন করাইল; পশ্চাতেও শূর্পাকার[১] আর একটি গর্ত্ত প্রস্তুত হইল; উহা গুহার ন্যায় ক্রমশঃ গভীর হইয়া নামিয়াছিল। এইরূপে বলবিন্যাস করিয়া সে ষাট, সত্তরটি যুদ্ধক্ষম শূকর সঙ্গে লইয়া ব্যূহের প্রত্যেক অংশে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না।" এই সময়ে সূর্য্য উঠিল, ব্যাঘ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ব্যাঘ্র দেখিল, সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গিয়া শূকরদিগের সম্মুখস্থিত পর্ব্বততলে দাঁড়াইয়া এবং সেখান হইতে তাহাদিগের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। তাহা দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, 'তোমরাও উহার দিকে ঐ ভাবে তাকাও' এবং একটা সঙ্কেতদ্বারা সকলকে ঐরূপ করিতে আদেশ দিল। ইহাতে শূকরেরাও ব্যাঘ্রের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। ইহার পর বাঘ হাঁ করিয়া হাঁই তুলিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। সে মূত্রত্যাগ করিল, শূকরেরাও মূত্রত্যাগ করিল। ফলতঃ বাঘ যাহা যাহা করিল, শূকরেরাও তাহা তাহা করিল। ইহা দেখিয়া বাঘ ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার খানা কি? পূর্ব্বে আমাকে দেখিবামাত্র এই শূকরেরা পলাইবার পথ পাইত না; আজ ইহারা পলায়ন করা দূরে থাকুক আমার প্রতিশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহারই অনুকরণ করিতেছে! ঐ দেখা যাইতেছে, উচ্চস্থানে একটা শূকর দাঁড়াইয়া আছে; সেই আজ ইহাদিগকে এইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আজ যে আমার জয় হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেল।

ঐ স্থানে এক জটাধারী ভণ্ডতপস্বী বাস করিত। ব্যাঘ্র প্রতিদিন যে মাংস আনিত, সে তাহার এক অংশ খাইত। সে আজ বাঘকে খালিমুখে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত কথা বলিতে গিয়া, নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

মৃগয়ায় পূর্ব্বে তুমি যাইতে যখন
এ অঞ্চলে, বাছি বাছি করিতে হনন
বৃহৎ শূকরগণে; আজি কি কারণে
রিক্তমুখে ফিরিয়াছ বিষণ্নবদনে?
দেখিয়া তোমার দশা এই মনে লয়,
পূর্ব্ব বলবীর্য্য তব হইয়াছে ক্ষয়।

---

[১]। মূলে 'কুল্লক-সণ্ঠানম্' এই পদ আছে। কুল্লকো = কুল্লো = কুল্য বা শূর্প (বাঙ্গালা কুলা)।

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিল :

দেখিলে আমারে পূর্ব্বে ভয়েতে কাঁপিয়া
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে তারা যেত পলাইয়া
নানাদিকে, গুহামধ্যে লইত আশ্রয়;
অদ্য কিন্তু দেখি মোরে নাহি পায় ভয়।
ব্যূহবদ্ধ হ'য়ে তারা রয়েছে যেখানে,
অসাধ্য আমার অদ্য পশিতে সেখানে।

অনন্তর ব্যাঘ্রকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সেই কূটতপস্বী বলিল, "কোন ভয় নাই, তুমি গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিবামাত্র তাহারা ভয়ে, যে যে দিকে পারে, ছুটিয়া পলাইবে। ব্যাঘ্র এই বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাহসে ভর করিয়া পুনর্ব্বার সেই পাষাণতলে গিয়া দাঁড়াইল। বর্দ্ধকিশূকর পূর্ব্বকথিত গর্ত্ত দুইটির অন্তরে অবস্থিত ছিল। শূকরেরা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "স্বামিন্, সেই মহাচোর আবার আসিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিও না; এবার উহাকে ধরিয়া ফেলিতেছি।"

ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে বর্দ্ধকিশূকরের উপর পড়িবার জন্য লম্ফ দিল। ব্যাঘ্র যখন তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, সেই সময়ে বর্দ্ধকিশূকর ঘাড় নামাইয়া অতিবেগে মণ্ডলাকার ঋজু গর্ত্তটার ভিতর পরিয়া গেল। ব্যাঘ্র কিন্তু নিজের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই তির্য্যক্খাত শূর্পাকার গর্ত্তের অতিসঙ্কট অংশে জড়পিণ্ডের ন্যায় পতিত হইল। বর্দ্ধকিশূকর তখন গর্ত্ত হইতে উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া ব্যাঘ্রের উরুদেশে দন্ত প্রহার করিল, বৃক্ক পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল, পঞ্চমধুরের ন্যায় সুস্বাদ মাংসের মধ্যে দন্ত প্রবেশিত করিয়া দিল এবং মস্তকটা বিদীর্ণ করিয়া, "এই লও তোমাদের শত্রু" বলিতে বলিতে তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করিল। যে সকল শূকর প্রথমে সেখানে যাইতে পারিল, তাহারা ব্যাঘ্র মাংস খাইল; কিন্তু যাহারা শেষে গিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উহাদের মুখের ঘ্রাণ লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "বাঘের মাংসের কেমন আস্বাদ গা?"

কিন্তু ইহাতেও শূকরেরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইল না। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত হইতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "প্রভু, একটা বাঘ মারিয়া কি হইল বলুন? কূটতপস্বী যে এখনও বাঁচিয়া আছে! সে মনে করিলে দশটা বাঘ লইয়া আসিতে পারে।" "কূটতপস্বী কে?" "সে একজন অতি দুঃশীল মানুষ।" "বাঘ মারিলাম, আর একটা মানুষে আমাদিগকে মারিবে! চল, এখনই তাহাকে ধরা যাউক।" ইহা বলিয়া বর্দ্ধকিশূকর দলবল লইয়া কূটতপস্বীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

এদিকে কূটতপস্বী ভাবিতেছিল, 'ব্যাঘ্রের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তবে কি শূকরেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিল?' অনন্তর সে ব্যাপার জানিবার জন্য, ব্যাঘ্র যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর হইল; এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিতে পাইল শূকরের পাল ছুটিয়া আসিতেছে। সে তখন তল্পী তাড়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু শূকরেরা তাড়া করিল দেখিয়া ঐ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া অতিবেগে এক উড়ম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা তাহাদের নেতাকে বলিল, "প্রভু, এবার সর্ব্বনাশ হইল; তাপস পলাইয়া গাছে উঠিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গাছে?" "ঐ উডুম্বর গাছে।" "তা উঠিলই বা! শূকরীরা জল আনুক, শূকরশাবকেরা গাছের গোঁড়া খুড়ুক; দাঁতাল শূকরগুলা শিকড় কাটুক; আর সব শূকর গাছের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক।" এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, শূকরগণ যখন, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সে উডুম্বর বৃক্ষের সরল মূল শিকড়টাকে, লোকে যেমন কুঠারদ্বারা প্রহার করে সেইভাবে, একবার মাত্র দন্তদ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলিল; গাছটা মড়ু মড়ু শব্দে পড়িয়া গেল। যে সকল শূকর উহা বেষ্টন করিয়াছিল তাহার কূট তাপসকে ভূতলে ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, কেবল হাড় ছাড়া আর সমস্ত উদরসাৎ করিল। অনন্তর তাহারা বর্দ্ধকিশূকরকে সেই উড়ুম্বর-কাণ্ডের উপর বসাইল এবং কূটতাপসের শঙ্খে জল আনিয়া তদ্দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক তাহাকে আপনাদের রাজপদে বরণ করিল। এখন পর্য্যন্ত রাজাদিগের অভিষেক-কালে যে একটা প্রথা দেখা যায়, প্রবাদ আছে, এইরূপে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহারা সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত ভদ্রপীঠে উপবিষ্ট হন এবং লোকে তিনটি শঙ্খে জল আনিয়া তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করে।

উক্ত আরণ্যপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শূকরদিগের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং একটা বৃক্ষের শাখান্তর হইতে তাহাদিগের অভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

শূকরের সঙ্ঘে করি নমস্কার,
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হেরিনু যাহার।
দন্তাঘাতে আজ বরাহের গণ
ভীষণ ব্যাঘ্রের করিল নিধন।
দন্ত ভিন্ন যার শস্ত্র কোন নাই,
ব্যাঘ্র পরাজিত হ'ল তার ঠাঁই।
ধন্য একতার বিচিত্র শকতি,
যার বলে এরা লভে অব্যাহতি!

[**সমবধান :** তখন ধনুর্গ্রহ তিষ্য ছিলেন সেই বর্দ্ধকি-শূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

----

২৮৪. শ্রী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শ্রীচৌর ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু খদিরাঙ্গার- জাতকে (১ম খণ্ড, ৪০) সবিস্তর বলা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদের চতুর্থদ্বার-প্রকোষ্ঠ নিবাসিনী সেই মিথ্যাদৃষ্টি দেবতা পাপের প্রায়শ্চিত্তহেতু চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ আনয়ন করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অনাথপিণ্ডদ এই দেবতাকে শাস্তার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। শাস্তা উক্ত দেবতাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাতে তিনি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ পূর্ব্ববৎ যশস্বী হইলেন। তৎকালে শ্রাবস্তীতে শ্রী-লক্ষণবিৎ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাশ্রেষ্ঠীর পুনরভ্যুদয় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; এখন আবার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। আমি দেখা করিবার ছলে ইহার গৃহে গিয়া ইহার শ্রী অপহরণ করিয়া আনিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া যথারীতি শিষ্টাচারের পর অনাথপিণ্ডদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ তখন শ্রেষ্ঠীর শ্রী কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন।

অনাথপিণ্ডদ একটা ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত কুক্কুটকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিয়াছিলেন। এই কুক্কুটের চূড়ায় তাঁহার শ্রী অবস্থান করিত। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যখন শ্রীর অবস্থান জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন্, আমি পঞ্চশত শিষ্যকে ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকি; কিন্তু একটা অকালরাবী কুক্কুট আমাদিগকে বড় জ্বালাতন করে। আপনার এই কুক্কুটটী কালরাবী; আমি ইহাই পাইবার জন্য আসিয়াছি। আমাকে এই কুক্কুটটা দান করুন।" অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "বেশ, আপনি এই কুক্কুটটী লইয়া যান; আমি আপনাকে ইহা দান করিলাম।" কিন্তু তিনি যেমন "দান করিলাম" এই কথা বলিলেন, অমনি শ্রী কুক্কুটচূড়া হইতে অপগত হইয়া তাঁহার উপধানের নিকটে স্থাপিত মণিতে আশ্রয় লইল। শ্রী যে মণিতে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট সেই মণি যাচঞা করিলেন। ঐ উপধানের নিকটে শ্রেষ্ঠী আত্মরক্ষার্থ একখানা যষ্টি রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি যেমন বলিলেন, "আপনাকে মণিও দান করিলাম," অমনি শ্রী মণি

পরিত্যাগ করিয়া সেই যষ্টিতে আশ্রয় লইল। ব্রাহ্মণ ইহাও লক্ষ্য করিয়া সেই যষ্টিখানাও প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী যেমন বলিলেন, "বেশ, ইহাও লইয়া যান," অমনি শ্রী যষ্টি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পূর্ণলক্ষণা-নাম্নী প্রধানা ভার্য্যার মস্তকে আশ্রয় লইল। শ্রী-চৌর ব্রাহ্মণ ইহা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "তাই ত, শ্রী এবার যাহাকে আশ্রয় লইল, সে ত অপরিবর্জ্জনীয়; কাজেই তাহাকে প্রার্থনা করা যাইতে পারে না।" মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন্, আমি আপনার গৃহ হইতে শ্রী অপহরণ করিয়া লইবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম। শ্রী তখন আপনার পালিত কুক্কুটের চূড়ায় অবস্থান করিত। কিন্তু আপনি যখন কুক্কুটটীকে দান করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রী গিয়া মণিতে প্রবেশ করিল; আবার আপনি যখন আমায় মণি দিলেন, তখন মণি ছাড়িয়া আরক্ষণদণ্ডে এবং আরক্ষণদণ্ড দান করিবার পর পূর্ণলক্ষণা দেবীর মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ণলক্ষণা দেবী অবর্জ্জনীয়া; কাজেই আপনার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করা যায় না। অতএব আমি আপনার শ্রী অপহরণ করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, শাস্তাকে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনাইতে হইবে। তিনি বিহারে গিয়া শাস্তার অর্চ্চনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, আজকাল একের শ্রী অপরের করতলগত হয় না; কিন্তু পুরাকালে অল্পপুণ্যশীলদিগের শ্রী পুণ্যবানদিগের পাদমূল আশ্রয় করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশী রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল। তাহাতে তাঁহার মনে এমন কষ্ট হইল যে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তি প্রভৃতি লাভ করিলেন।

এখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ, অম্ল প্রভৃতি সেবনের নিমিত্ত জনপদে অবতরণপূর্ব্বক বারাণসীরাজের উদ্যানে উপনীত হইলেন, এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া গজাচার্য্যের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। গজাচার্য্য বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া নিজের উদ্যানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন রীতিমত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক দিন এক কাঠুরিয়া বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার

সময় বেলা থাকিতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। কাজেই সে নগরের বাহিরে একটা দেবালয়ে আশ্রয় লইল এবং কাঠের আটিটাকে বালিশ করিয়া সেইখানে শুইয়া রহিল। ঐ দেবমন্দিরের নিকটে কতকগুলি কুক্কুট স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত। তাহারা রাত্রিকালে উহার অবিদূরস্থ একটা বৃক্ষে থাকিত। প্রত্যূষে উপর ডালের একটা কুক্কুট মলত্যাগ করিল; উহা নিম্ন ডালের একটা কুক্কুটের মস্তোকপরি পতিত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "কে আমার মাথায় বিষ্ঠা ফেলিল রে?" উপরের কুক্কুট বলিল, "আমি ফেলিয়াছি।" "কেন ফেলিলি?" "বুঝিতে পারি নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া সে আবারও মলত্যাগ করিল। অনন্তর উভয়েই "তোর কি ক্ষমতা?" "তোর কি ক্ষমতা?" বলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "যে আমায় মারিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিয়া আহার করিবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র কার্ষাপণ লাভ করিবে।" উপরিস্থিত কুক্কুট বলিল, "ইহাতেই তোর এত আস্পর্দ্ধা! যে আমার স্থূল মাংস খাইবে, সে রাজা হইবে; উপরিভাগস্থ মাংস খাইলে যে পুরুষ, সে লক্ষপতি হইবে, যে স্ত্রী, সে অগ্রমহিষী হইবে; অস্থি-সংলগ্ন মাংস খাইলে যে গৃহী, সে ভাণ্ডাগারিকের পদ লাভ করিবে, যে পরিব্রাজক, সে রাজকুলের পূজনীয় হইবে।"

কাঠুরিয়া কুক্কুটদিগের এই সমস্ত কথা শুনিল। সে ভাবিল, "যদি রাজ্য পাই, তবে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া কি করিব?" সে আস্তে আস্তে গাছে চড়িয়া উপরিস্থিত কুক্কুটটা ধরিয়া মারিয়া ফেলিল এবং "রাজা হইব" ভাবিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নগরাভিমুখে চলিল। তখন নগরের দ্বার খোলা হইয়াছিল; সে প্রবেশ করিয়াই কুক্কুটটার ত্বক্ উন্মোচন করিল, নাড়ী-ভুঁড়ী ফেলিয়া দিল এবং তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এই কুক্কুট-মাংস অতি উত্তমরূপে রন্ধন কর।" গৃহিণী কুক্কুটমাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সম্মুখে গিয়া বলিল, "আহার করুন।" সে বলিল, "ভদ্রে, এই মাংসের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা; ইহা ভোজন করিলে আমি রাজা হইব এবং তুমি অগ্রমহিষী হইবে।" অনন্তর সে সেই মাংস ও অন্ন লইয়া গঙ্গাতীরে গিয়া, স্নানান্তে আহার করিবে এই উদ্দেশ্যে, পাত্রটি তীরে রাখিল এবং নদীতে অবতরণ করিল।

দৈবযোগে সেই সময়ে বায়ুবেগে একটা তরঙ্গ আসিয়া ঐ ভোজনপাত্রটি ভাসাইয়া লইয়া গেল। নদীতে তখন পূর্ব্বকথিত সেই গজাচার্য্য হস্তীদিগকে স্নান করাইতেছিলেন; ভোজ্য পাত্রটি ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি উহা দেখিয়া তুলিলেন এবং অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" তাহারা বলিল, "প্রভু, এ অন্ন ও কুক্কুট মাংস।" তিনি উহা আচ্ছাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া ভার্য্যার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া

পাঠাইলেন, "আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ যেন ইহা খোলা না হয়।"

এদিকে সেই কাঠুরিয়া স্নান করিতে গিয়া পেট পুরিয়া বালুকা মিশ্রিত জল খাইয়াছিল। (সে তীরে উঠিয়া দেখিল, পাত্রটি নাই)। তখন সে পলায়ন করিল।

এই সময়ে গজাচার্য্যের কুলোপগ সেই দিব্যচক্ষু তাপস ভাবিতেছিলেন, "আমার এই প্রিয়শিষ্য কি কখনও গজাচার্য্যের পদ ত্যাগ করিবে না? কবেই ইহার সৌভাগ্যোদয় হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দিব্য চক্ষু দ্বারা ঐ কাঠুরিয়াকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অগ্রেই গজাচার্য্যের গৃহে বসিয়া রহিলেন।

গজাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া তাপসকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং সেই ভোজ্যপাত্রটি আনাইয়া বলিলেন, "অগ্রে এই তাপসকে অন্ন, মাংস ও জল পরিবেষণ কর।" তাপস অন্ন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মাংস দিতে চাহিলে উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমি এই মাংস বণ্টন করিব।" গজাচার্য্য বলিলেন, "সে ত সৌভাগ্যের কথা।" তখন তাপস স্থূল মাংস সমস্ত এক ভাগে রাখিয়া উহা গজাচার্য্যকে খাইতে দিলেন; উপরিভাগের মাংস তাঁহার ভার্য্যাকে দিলেন এবং অস্থিসংলগ্ন মাংস নিজে খাইলেন। আহারাবসানে তাপস গজাচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে রাজা হইবে; সাবধান, যেন মতিবিভ্রম না হয়।" অনন্তর তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দিবসে এক সামন্তরাজ আসিয়া বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। বারাণসীরাজ গজাচার্য্যকে রাজবেশ পরাইয়া ও হস্তীতে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন এবং নিজে অজ্ঞাতবেশে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত মিশিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবেগে একটা শর আসিয়া রাজার দেহে বিদ্ধ করিল। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা নিহত হইয়াছেন জানিয়া গজাচার্য্য ভাণ্ডার হইতে বহু ধন আনাইলেন এবং ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবে, তাহারা প্রচুর পুরস্কার পাইবে। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সৈন্য মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাভূত ও নিহত করিল।

যুদ্ধান্তে অমাত্যগণ মৃতরাজার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক, কাহাকে রাজা করা যায়, এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, 'ভূতপূর্ব্ব রাজা যখন নিজের জীবদ্দশাতে গজাচার্য্যকে রাজাবেশ দান করিয়াছিলেন, এবং গজাচার্য্য যখন নিজে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেই রাজপদে বরণ করা উচিত।" অনন্তর তাঁহারা গজাচার্য্যকে রাজপদে ও তাঁহার ভার্য্যাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি বোধিসত্ত্বও রাজার কুলোপগ হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :

“ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীবান অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিংবা মূঢ়জন
লক্ষ্মীর কৃপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।
সর্ব্বত্র দেখিতে পাই ভাগ্যের প্রভাব;
স্থানে, অস্থানেতে লোকে ধন করে লাভ;
পাপী আর পুণ্যবানে ভেদ কোন নাই
অনুগ্রহ লভিবারে কমলার ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথা দুইটি বলিয়া শাস্তা কহিলেন, “গৃহপতি, এই সকল ব্যক্তির সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি। সেই সুকৃতিবলে, যেখানে রত্নের আকর নাই, সেখানেও লোকে রত্ন লাভ করিয়া থাকে।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাসমূহ বলিলেন :

“সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বসুখের আগার
আছে বিদ্যমান এক বিচিত্র ভাণ্ডার।[১]
দেবতা, মানব কিংবা, যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।
কমনীয় কান্তি, আর সুমধুর স্বর,
সুগঠিত দেহ, আর রূপ মনোহর,
প্রভুত্ব সর্ব্বতোব্যাপী—যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।
রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, সার্ব্বভৌম অধিকার,
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব, নাহি তুল্য কিছু যার;
ত্রিভুবনে যেথা যেথা লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।
লভিলে যাহারে সুখী মানবের মন,
লভিলে যাহারে তুষ্ট হন দেবগণ,
নির্ব্বাণ—যাহাতে সর্ব্ব দুঃখের বিলয়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।
মৈত্রীভাব—হয় যাহে বিশ্বের উদ্ধার,—

[১]। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলকেই ভাণ্ডার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহজন্মে লোকের যে সৌভাগ্য দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল।

বিমুক্তি—বিজ্ঞান হ'তে উদ্ভব যাহার,—
ইন্দ্রিয়সংযম—যাহা শান্তির উপায়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।
তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স, পারমিতাচয়
প্রত্যেকবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি যার বলে হয়,—
দুঃখের নিবৃত্তিহেতু লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।
বিচিত্র ভাণ্ডার এই বর্ণিতে কে পারে
অপার ঐশ্বর্য্য এর? ব্যক্ত চরাচরে;
সুধীর, পণ্ডিত আর পুণ্যশীল জন
নিয়ত করেন এর মহিমা কীর্ত্তন।"

সর্ব্বশেষে সেই কুক্কুট অনাথপিণ্ডদের ভাগ্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূত আধারচতুষ্টয় বর্ণনা করিয়া এই গাথা বলিল :

কুক্কুট, মণিকা, আরক্ষণদণ্ড, পুণ্যলক্ষণার শির,
সৌভাগ্য আগার হইল শ্রেষ্ঠীর, ফলে পূর্ব্ব সুকৃতির।"

[**সমবধান :** তখন স্থবির আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই কুলোপগ তাপস।]

---

২৮৫. মণিশূকর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে সুন্দরীর প্রাণহত্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, সে সময়ে ভগবানের মান ও মর্য্যাদা সমক্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকের খন্ধক নামক অংশে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :

পঞ্চ মহানদীর সম্মেলনে যেমন বৃহৎ জলোচ্ছ্বাসের উদ্ভব হয়, তৎকালে বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘের উপহারাদি প্রাপ্তির সেইরূপ উপচয় হইয়াছিল। ইহাতে তীর্থিকদিগের আয় হ্রাস হইল; তাহারা সূর্য্যোদয়ে খদ্যোৎবৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এইজন্য তাহারা সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, 'শ্রমণ গৌতমের অভ্যুদয়কালাবধি আমাদের আয়ের হ্রাস হইয়াছে; লোকে আর আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করে না; কেহ কেহ এখন আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না। অতএব দেখিতে হইতেছে, কাহারও সহিত মিলিত হইয়া শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটনাপূর্ব্বক তাহার লাভ ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করিতে পারা যায় কি না।' অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'সুন্দরীর সহিত একযোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।' এই

নিমিত্ত একদিন সুন্দরী যখন তাহাদের উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইল, তখন তাহারা ঐ রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিল না। সুন্দরী পুনঃ পুনঃ আলাপের চেষ্টা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভুগণ! আপনারা কি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন?" তাহারা উত্তর দিল, "বল কি ভগিনি? শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে নিয়ত বিরক্ত করিতেছে; তাহার উপদ্রবে যে আমাদের লাভের পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং মানমর্য্যাদা কমিয়াছে ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?" "আমি এ সম্বন্ধে কি করিতে পারি?" "তুমি, ভগিনি, পরম রূপবতী এবং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পন্না; তুমি শ্রমণ গৌতমের অযশঃ ঘটাও; অনেকেই তোমার কথা বিশ্বাস করিবে এবং তাহা হইলে গৌতমের উপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে। সুন্দরী "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তীর্থিকদিগকে প্রণাম করিয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেল। তদবধি সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন বহুলোকে শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া নগরে ফিরিত, ঠিক সেই সময়ে মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, কর্পূর, কটুকফল[১] প্রভৃতি লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "সুন্দরী, কোথায় যাইতেছ," তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতেছি; আমি তাঁহার সহিত একই গন্ধকুটীরে অবস্থিতি করি।" অনন্তর তীর্থিকদিগের কোন না কোন উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক সে প্রাতঃকালে আবার জেতবনপথ অবলম্বন করিয়া নগরাভিমুখে ফিরিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "কি গো সুন্দরী। কোথায় গিয়াছিলে?" তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "শ্রমণ গৌতমের সহিত গন্ধকুটীরে রাত্রি যাপন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি।"

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে তীর্থিকগণ কতিপয় ধূর্ত্তকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বলিল, ''যাও, সুন্দরীকে নিহত করিয়া গৌতমের গন্ধকুটীর-সমীপস্থ আবর্জ্জনাস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিয়া আইস।" পাষণ্ডেরা তাহাই করিল! তখন তীর্থিকেরা "সুন্দরীকে দেখিতে পাই না কেন?" এইরূপে কোলাহল করিতে করিতে রাজাকে জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "আপনারা কি সন্দেহ করেন?" তাহারা বলিল, "সে এ কয় দিন জেতবনে যাতায়াত করিয়াছিল; কিন্তু সেখানে তাহার কি হইল জানি না।" ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "তোমরা গিয়া সুন্দরীর অনুসন্ধান কর।" তখন তীর্থিকেরা কতিপয় রাজভৃত্য সঙ্গে লইয়া জেতবনে-গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান আরম্ভ করিল এবং

---

[১]। কটুকফল—কক্কোল (ইহা হইতে একপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়)। ইংরাজী অনুবাদক এ শব্দের 'চাটনি' বা 'আচার' এই অর্থ করিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবর্জ্জনাস্তূপের উপর সুন্দরীর মৃতদেহ পাইয়া উহা মস্তকে তুলিয়া নগরে লইয়া গেল। তাহারা রাজাকে বলিল, ''শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ গুরুর পাপ ঢাকিবার জন্য সুন্দরীকে মারিয়া আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল।" রাজা বলিলেন, "নগরে গিয়া এই কথা ঘোষণা কর।" তীর্থিকেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "তোমরা আসিয়া শাক্যপুত্রের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।" অনন্তর তাহারা রাজদ্বারে ফিরিয়া গেল; রাজা সুন্দরীর মৃতদেহ আমক শ্মশানে মঞ্চোপরি রাখাইয়া তাহার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। আর্য্য শ্রাবকগণ ব্যতীত শ্রাবস্তীর অপর সমস্ত অধিবাসী নগরের ভিতরে, বাহিরে, উপবনে, অরণ্যে ভিক্ষুদিগের দোষকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।"

ভিক্ষুগণ তথাগতকে যথাসময়ে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে তোমরা এই গাথায় জনসাধারণকে ভৎর্সনা কর :

"করিবে অভূতবাদী[১] নিরয়গমন,
করি বলে 'করি নাই' আর সেইজন।
এ দু'য়ে প্রভেদ, কিছু দেখা নাহি যায়;
পরলোকে উভয়েই তুল্যদণ্ড পায়।'

এদিকে রাজা কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সুন্দরীকে অন্য কেহ মারিয়াছে কি না।" তখন, ধূর্ত্তেরা সুন্দরীর প্রাণবধার্থ যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহাতে সুরা ক্রয় করিয়া পান করিয়াছিল এবং উন্মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অপর একজনকে বলিতেছিল, "তুমি সুন্দরীকে এক আঘাতে নিহত করিয়া আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছ এবং সেই জন্য যে অর্থ পাইয়াছ তদ্দারা সুরাপান করিতেছ।" ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারীরা ভাবিল, "তবে ত প্রকৃত অপরাধী জানা গেল।" তাহারা ধূর্ত্তদিগকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাই কি সুন্দরীকে নিহত করিয়াছ?" তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ মহারাজ।" "কে তোমাদিগকে মারিতে বলিয়াছিল?" "তীর্থিকগণ।" তখন রাজা তীর্থিকদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "তোমরা সুন্দরীকে বহন করিয়া নগরের সর্ব্বত্র গমন কর এবং বল যে শ্রমণ গৌতমের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার অভিপ্রায়ে আমরাই সুন্দরীর প্রাণবধ করিয়াছি, ইহাতে গৌতমের বা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কোন অপরাধ নাই; সমস্ত দোষ আমাদের।" তীর্থিকেরা

---

[১]। অভূতবাদী—মিথ্যাবাদী (অভূত অর্থাৎ যাহা হয় নাই তাহা যে বলে)।

বাধ্য হইয়া তাহাই করিল।

এই ঘটনার পর, যে সকল লোক পূর্ব্বে গৌতমের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের অনেকেই এখন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল; তীর্থিকেরাও নরহত্যাজনিত দণ্ডভোগ করিয়া অতঃপর আর কোন কুচক্র করিতে পারিল না; বৌদ্ধদিগের মানসম্ভ্রম পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিকেরা ভাবিয়াছিল বুদ্ধের মুখে চূণ কালি দিবে; কিন্তু তাহারা নিজেদেরই মুখে চূণ কালি দিয়াছে; বৌদ্ধদিগের উপহারাদিপ্রাপ্তি ও মানপ্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করা অসম্ভব। জাতিমণিকে[১] কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা যেমন বিফল, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিফল। পুরাকালে কেহ কেহ জাতিমণি কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই চেষ্টার ফলে উহার ঔজ্জ্বল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে বাসনাই সমস্ত দুঃখের আকর। সুতরাং তিনি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং তিনটি পর্ব্বতরাজি অতিক্রমপূর্ব্বক একস্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই পর্ণশালার অদূরে এক মণিগুহায় ত্রিশটা শূকর থাকিত। গুহার নিকট এক সিংহ বিচরণ করিত; মণির উপরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িত এবং তদ্দর্শনে শূকরদিগের বড় ভয় হইত। এইরূপে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকায় তাহাদের শরীর শীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর শূকরেরা ভাবিল, 'এই মণি স্বচ্ছ বলিয়াই আমরা সিংহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই; আমরা ইহাকে মলিন ও বিবর্ণ করিব।' এই পরামর্শ করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী এক সরোবর হইতে কর্দ্দম আনিয়া মণিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শূকর-লোমে ঘৃষ্ট হইয়া মণির প্রসন্নতা পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি হইল। তখন শুকরেরা নিরূপায় হইয়া বলিল, "এস, তাপসকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, মণিকে বিবর্ণ করিবার কোন উপায় আছে কি না।" তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিল :

---

[১]। জাতিমণি—প্রকৃত মণি, উৎকৃষ্ট মণি।

ত্রিংশতি শূকর মোরা সপ্তবর্ষকাল
আছি এই গুহা মধ্যে; বাসনা মোদের
উজ্জ্বল মণির আভা করিতে বিনাশ।
কর্দ্দম আনিয়া কিন্তু হায়, দ্বিজবর,
যতই ঘর্ষণ করি মণিরে আমরা,
ততই বর্দ্ধিত হয় ঔজ্জ্বল্য ইহার।
জিজ্ঞাসি তোমায় তাই, বল দয়া করি,
কিরূপে মণির আভা হইবে মলিন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

এ নহে সামান্য মণি, বৈদূর্য্য ইহার নাম।
মসৃণ, বিমল অতি নয়নের অভিরাম।
নাশিতে ঔজ্জ্বল্য এর শকতি কাহার(ও) নাই
সে হেতু, শূকরগণ, চলি যাও অন্য ঠাঁই।

শূকরেরা বোধিসত্ত্বের পরামর্শ শুনিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৮৬. শালূক-জাতক[১]

[কোন ভিক্ষু এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা যাইবে।

শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি নাকি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে বলিল "হাঁ, প্রভু।" "কাহার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা?" "অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর জন্য।" "এই কুমারী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বকালে ইহারই বিবাহের সময় তোমার মাংসে বরযাত্রীদিগের ভুরিভোজন হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোজন্ম গ্রহণ

---

[১]। এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের মুনিক-জাতকের (৩০) সাদৃশ্য বিবেচ্য। ঈষপের "গোবৎস ও যণ্ড" নামক কথাও ইহার অনুরূপ।

করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম হইয়াছিল মহালোহিত। চুল্ললোহিত নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাঁহারা উভয়েই কোন গ্রামবাসীর গৃহে কাজ করিতেন। এই গৃহে এক বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ছিল। একদা তাহাকে গোত্রান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল।

কন্যাকর্ত্তার গৃহে-শালূকনামে এক শূকর থাকিত। সে নিম্নতলস্থ একটি মঞ্চে শয়ন করিত। বিবাহের ভোজে এই শূকর মারিয়া প্রচুর মাংস পাওয়া যাইবে, এই আশায় গৃহস্বামী ইহাকে যাউ ও ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া একদিন চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, 'দাদা, আমরা এই গৃহস্থের কত কাজ করি; আমাদেরই পরিশ্রমে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; অথচ এ ব্যক্তি আমাদিগকে পলাল ও ঘাস ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে দেয় না; কিন্তু এই শূকরটাকে যাউ ও ভাত খাইতে দিতেছে; নিম্নতলের মঞ্চের উপর শোওয়াইতেছে। এ শূকর ইহাদের কি উপকার করিবে?" ইহার উত্তরে মহালোহিত বলিলেন, "ভাই, তুমি এই শূকরের যাউ ও ভাত খাওয়া দেখিয়া লোভ করিও না; গৃহস্থ সঙ্কল্প করিয়াছে যে, কুমারীর বিবাহদিবসে ইহাকে বধ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সেই মাংস ভোজন করাইবে; সেই জন্যই ইহাকে স্থূলাঙ্গ করিবার চেষ্টায় আছে। তুমি কয়েকদিন পরেই দেখিতে পাইবে, লোকে ইহাকে মঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া যাইবে, কাটিয়া কাটিয়া টুকরা করিবে এবং আগন্তুকদিগকে সেই মাংস খাইতে দিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিলেন :

শালূক যে অন্ন এবে করিছে ভক্ষণ,
তাহাই হইবে তার বিনাশ-কারণ।
অতএব লোভ তাহে বিহিত না হয়,
ভুসি খেয়ে খুসী থাক, বলিনু তোমায়।
ইহাতেই আয়ুষ্কাল হইবে বর্দ্ধিত;
কদাচ এ খাদ্যে তব হবে না অহিত।
যখন আসিবে বর, সঙ্গে ল'য়ে বন্ধুজন,
তখন(ই) হইবে হায় শালূকের বিনশন।

ইহার কতিপয় দিন পরেই বিবাহের বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহে উপনীত হইল। তখন কন্যাকর্ত্তা শালূককে নিহত করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। গরু দুইটি এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের ভুসিই ভাল।

অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

মঞ্চ হ'তে শূকরেরে টানিয়া লইল,
ভূমিতে ফেলিয়া তারে নিহত করিল।

ইহা দেখি গরুদুটি ভাবে মনে মনে,
কাজ নাই আমাদের উত্তম ভোজনে।

অনন্তর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন সেই স্থূলকুমারী ছিল সেই স্থূলকুমারী; এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল শালূক; আনন্দ ছিলেন চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

---

২৮৭. লাভগর্হ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে স্থবির সারিপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারীক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু স্থবিরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কিরূপে লাভ করিতে হয়, কি করিলে চীবরাদি পাওয়া যায়, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।" স্থবির উত্তর দিলেন, "শ্রমণেরা চারিটি উপায়ে লাভবান হইতে পারেন। তাঁহারা শ্রামণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ও নির্লজ্জ হইয়া, উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিবেন; তাঁহারা পরনিন্দারত হইবেন; তাঁহারা নটগণের ন্যায় চলিবেন এবং তাঁহারা যেখানে সেখানে, যাহা মুখে আসিবে, অবাধে বলিবেন।" সারিপুত্র এইরূপে লাভপ্রাপ্তির উপায় ব্যাখ্যা করিলে সেই ভিক্ষু এই সকল উপায়ের নিন্দা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন স্থবির শাস্তার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও লাভোপায়ের নিন্দা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যখন বয়স্ ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি তিন বেদে এবং অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপনকার্য্যে দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চশত ছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই ছাত্রদিগের মধ্যে একজন শীলাচার-সম্পন্ন ছিল; সে একদা আচার্য্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কি উপায়ে লাভবান হয়?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, লোকে চতুর্ব্বিধ উপায়ে লাভ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

যে জন উন্মত্তবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য,
পরনিন্দাপরায়ণ কিংবা সেই জন;
যে জন নটের মত লজ্জা ত্যজি অবিরত
ভাবে কিসে পরপ্রীতি হবে উৎপাদন,—
অযাচিতভাবে যেবা, নির্দ্দোষেরে দোষী বলি,
অম্লানবদনে নিজ মর্য্যাদা বাড়ায়
জেন তুমি এই সার, হেন চতুর্ব্বিধ নর
মূর্খমণ্ডলীর কাছে বহুধন পায়।

শিষ্য আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া অর্থলাভকে নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিল :

ধিক্ সেই যশে আর ধিক্ সেই ধনে,
অধর্ম্ম, অগতি হয় যাহার কারণে।
ত্যজি গৃহ ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ
নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যাশরণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব, তাও ভাল বলি;
অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

শিষ্য এইরূপে প্রব্রজ্যার প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিল এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যথাধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহার গুণে সে সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইল।

[**সমবধান :** তখন এই লাভগর্হক ভিক্ষু ছিল সেই মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

২৮৮. মৎস্যদান-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক অসাধু বণিক্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[২]]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বোধ জন্মিয়াছিল, তখন তিনি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

---

[১]। পাঠান্তর 'মচ্ছুদ্দান' জাতক। অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা দেখা যায় :—'মচ্ছবগ্‌গো' অর্থাৎ মৎস্যসমূহ।

[২]। কুটবাণিজ-জাতক (৯৮)।

বোধিসত্ত্বের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন দুই ভ্রাতা একদিন পৈতৃক প্রাপ্য আদায়ের জন্য কোন গ্রামে গিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ পাইলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময় নৌকার প্রতীক্ষায় নদীর ঘাটে বসিয়া পত্রপুট হইতে অন্ন আহার করিলেন। বোধিসত্ত্ব অতিরিক্ত অন্নগুলি মৎস্যদিগের জন্য গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দানের ফল নদীদেবতাকে অর্পণ করিলেন। দেবতা পুণ্যফল লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; তাঁহার দিব্য শক্তি বৃদ্ধি হইল; এবং ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। বোধিসত্ত্ব সৈকত ভূমিতে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছু চৌর প্রকৃতির লোক ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সহস্র কার্ষাপণ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, উহা যে থলিতে ছিল, ঠিক সেই মত আর একটা থলি পাথরের কুচি দিয়া পূরিয়া উহার পার্শ্বে রাখিয়া দিল।

অনন্তর দুই সহোদর নৌকায় উঠিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠ নৌকার উপর পড়িয়া যাইবার ছলে, পাথরকুচির থলিটা নদীতে ফেলিয়া দিব মনে করিয়া, কাহণের থলিটিই ফেলিয়া দিল এবং অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা, সর্ব্বনাশ হইল, কাহণের থলিটি যে জলে পড়িয়া গেল!" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জলে পড়িয়া গেলে আর কি করা যাইবে? তুমি ইহার জন্য দুঃখ করিও না।"

কিন্তু নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিলেন 'এই ব্যক্তি আমাকে যে পুণ্যফল দান করিয়াছে, তাহাতে আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে, দৈবশক্তিরও উপচয় ঘটিয়াছে; আমাকে ইহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিজের অনুভাববলে সেই থলিটিকে একটি মহামুখ মৎস্যদ্বারা গিলাইলেন এবং স্বয়ং তাহার রক্ষার ভার লইলেন।

বোধিসত্ত্বের অসাধু অনুজ গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিল, 'দাদাকে কি ঠকানই ঠকাইয়াছি।' কিন্তু সে যখন থলি খুলিয়া দেখিল যে উহাতে পাথরকুচি, তখন তাহার বুক শুকাইয়া গেল; সে খাটিয়ার কোণা ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে কৈবর্ত্তেরা মাছ ধরিবার জন্য নদীতে জাল ফেলিল এবং নদী-দেবতার প্রভাববলে সেই মহামুখ মৎস্য জালে পড়িল। কৈবর্ত্তেরা তাহাকে ধরিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে প্রবেশ করিল। লোকে প্রকাণ্ড মাছ দেখিয়া উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিল; কৈবর্ত্তেরা বলিল, "হাজার কাহণ ও সাত মাষা দিলে এই মাছ কিনিতে পার।" "হাজার কাহণ দামের মাছ ত কখনও দেখি নাই," ইহা বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পরিহাস করিতে লাগিল। কৈবর্ত্তেরা মাছ লইয়া বোধিসত্ত্বের

দ্বারে গমন করিয়া বলিল, "আপনি এই মাছ কিনুন।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার মূল্য কত?" "ইহার দাম সাত মাষা; আপনি সাত মাষা দিয়া ইহা লউন।" "অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া কি মূল্য চাহিয়াছিলে?" "অন্য কাহাকেও বেচিতে হইলে হাজার কাহণ ও সাত মাষা লইব; আপনি কিন্তু সাত মাষা দিলেই পাইবেন।"

বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে সাত মাষা দিয়া মৎস্যটা ক্রয় করিলেন এবং উহা ভার্য্যার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের পত্নী মাছটার পেট চিবিবার সময় উহার মধ্যে হাজার কাহণের থলি দেখিতে পাইয়া স্বামীকে জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহা দেখিবামাত্র নিজের থলি বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, "কৈবর্ত্তেরা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া এই মৎস্যের জন্য হাজার কাহণ ও সাত মাষা মূল্য চাহিয়াছিল; কিন্তু এই হাজার কাহণ আমারই সম্পত্তি বলিয়া আমার নিকট সাত মাষা মাত্র লইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা না বুঝিবে, কিছুতেই তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যাইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

হাজার কাহণ,— তারও অধিক একটা মাছের দাম!
করবে বিশ্বাস, কেউ কি ইহা? ভাবে 'কি শুনলাম!'
কিন্‌লেম আমি সাত মাষায় তায় দৈবের কৃপাবলে;
পেলে এ দরে, কিনব আমি যত আছে মাছ জলে।

বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি কারণে আমি এই নষ্ট কার্ষাপণগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম?' তখন নদী-দেবতা আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি গঙ্গাদেবী; তুমি ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন মৎস্যদিগকে দিবার সময় তাহার পুণ্যফল আমাকে দান করিয়াছিলে। সেই জন্য আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি।" এই ভাব বিশদ করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাটি বলিলেন :

মৎস্যে দিলা খাদ্য নিজে, পুণ্যফল তার মোরে
অযাচিত করিলে অর্পণ;
সেই তব পুণ্যদান, সে পূজা তোমার স্মরি
রক্ষিলাম আমি তব ধন।

অনন্তর নদীদেবতা বোধিসত্ত্বকে তাঁহার কনিষ্ঠের কূট কর্ম্ম সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "পাপিষ্ঠের এখন বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে শয্যায় পড়িয়া আছে; শঠের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমি তোমার নষ্ট ধনের পুনরুদ্ধার করিয়া আনিয়াছি; সাবধান, ইহা যেন আবার নষ্ট না হয়; তোমার কনিষ্ঠকে ইহার কোন অংশ দিও না, সমস্তই নিজে ভোগ করিও।" ইহা বলিতে

বলিতে তিনি বোধিসত্ত্বকে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি শুনাইলেন :

শঠের শ্রীবৃদ্ধি না হয় কখন;
দেবতার প্রীতি না লভে সে জন,
বঞ্চিয়া ভ্রাতায় পৈতৃক সম্পত্তি
করে আত্মসাৎ যে প্রদুষ্টমতি।

বোধিসত্ত্বের বিশ্বাসঘাতক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্ষাপণগুলির কোন অংশ না পায়, এই উদ্দেশ্যেই নদীদেবতা উক্তরূপ বলিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি ভ্রাতাকে নিরাশ করিতে পারিব না।" অনন্তর তিনি কনিষ্ঠকে উহা হইতে পঞ্চশত কার্ষাপণ দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই কূটবণিক ছিল সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।]

---

২৮৯. নানাচ্ছন্দ-জাতক

[আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তার নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে জেতবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু একাদশনিপাতে জ্যোৎস্না-জাতকে (৪৫৬) বলা যাইবে :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদ প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্বের পিতার এক পুরোহিত পদচ্যুত হইয়া অতি হীনাবস্থায় এক জীর্ণ গৃহে বাস করিতেন। একদা বোধিসত্ত্ব অজ্ঞাতবেশে, রাত্রিকালে নগরের কোন স্থানে কি হইতেছে, দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, এই সময়ে কয়েকজন চোর, কোথাও চুরি করিয়া, মদের দোকানে মদ খাইয়া এবং একটা ঘটে কিছু মদ লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। তাহারা বোধিসত্ত্বকে পথে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি, বাপু?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করিল। অনন্তর ধূর্ত্তেরা তাহাদের মদের ঘট তুলিয়া লইল, বোধিসত্ত্বের উত্তরীয় বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল এবং নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিল।

উক্ত দুর্গত ব্রাহ্মণ তখন গৃহের বাহিরে গিয়া পথে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। রাজা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী, "কি হইয়াছে, আর্য্য?" বলিয়া ছুটিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, রাজার কি হইল না হইল, তাহাতে এখন আপনার কি প্রয়োজন? যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারাই সে কথা ভাবিবেন।" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি কিয়দ্দূর গিয়া ধূর্ত্তদিগকে বলিলেন, "দোহাই তোমাদের; আমি বড় গরীব; উত্তরীয় খানা লইয়া আমায় ছাড়িয়া দাও।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলায় ধূর্ত্তদিগের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের বাসস্থানটি ভালরূপে দেখিয়া লইলেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" এ কথাও বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। অনন্তর তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্যগণ, আপনারা গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।"

"আমার পক্ষে শুভ দেখিলেন, কি অশুভ দেখিলেন?" "সমস্তই শুভ।" "গ্রহণ হয় নাই ত?" "না, গ্রহণ হয় নাই।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বতন পুরোহিতকে আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "যাও, অমুক বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আচার্য্য, আপনি গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" "হাঁ, মহারাজ।" "গ্রহণ হইয়াছিল কি?" "হইয়াছিল, মহারাজ! গত রাত্রিতে আপনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"যিনি নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহার এইরূপ লোক হওয়া চাই। ইহা বলিয়া রাজা অন্য ব্রাহ্মণদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্বিজবর, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি; আপনি কি বর চান বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করুন।"

ব্রাহ্মণ গৃহে গিয়া, পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দাসী, এই চারিজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। বলত, আমি কি প্রার্থনা করিব।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমার জন্য একশত ধেনু আনিবেন।" ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম ছিল ছত্র। সে বলিল, "আমার জন্য একখানা রথ চাহিবেন; তাহার

অশ্বগুলি যেন উৎকৃষ্ট জাতীয় ও কুমুদশুভ্র হয়।” পুত্রবধূ বলিলেন, “আমি মণিকুণ্ডলাদি সর্ব্ববিধ অলঙ্কার চাই।” ব্রাহ্মণের দাসীর নাম ছিল পূর্ণা। সে বলিল, “আমি চাই উদূখল, মুষল ও শূর্প।” ব্রাহ্মণের কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছিল যে রাজার নিকট একখানি ভাল গ্রাম প্রার্থনা করিবেন। তিনি ফিরিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ঠাকুর! ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?” ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ মহারাজ; কিন্তু আমাদের এক এক জনের এক এক রূপ ইচ্ছা।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

এক গৃহে থাকি মোরা প্রাণী পাঁচজন,
বিভিন্ন বাসনা করি হৃদয়ে পোষণ।
আমি চাই একখানি সুবৃহৎ গ্রাম,
শতধেনু পেলে পূরে স্ত্রীর মনস্কাম;
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত রথে আরোহণ,
পুত্রের এ ইচ্ছা, দেব, করি নিবেদন;
মণি-কুণ্ডলের সাধ পুত্রবধূমনে;
এক সঙ্গে এত ইচ্ছা পূরিবে কেমনে?
দাসীর ইচ্ছার কথা ভাবি হাসি পায়,
বলিহারি বুদ্ধি তার, উদূখল চায়!

রাজা আজ্ঞা দিলেন, “বেশ, সকলকেই তাহাদের ইচ্ছানুরূপ দান কর :

সুবৃহৎ গ্রাম দাও ব্রাহ্মণেরে; ব্রাহ্মণীকে দাও ধেনু একশত;
তনয়ের তরে দাও ইহাদের উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত এক রথ;
পুলকিত হোক পুত্রবধূ পরি মণিতে খচিত কুণ্ডল-যুগল;
সুবুদ্ধি পূর্ণার পূর্ণ মনস্কাম হো’ক এইবার পেয়ে উদূখল।”

এইরূপে বোধিসত্ত্ব, ব্রাহ্মণ যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, সমস্ত দান করিলেন এবং আরও নানারূপে তাঁহার সম্মান করিয়া বলিলেন, “আপনি এখন হইতে আমার কার্য্যভার গ্রহণ করুন।” তদবধি ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের পারিষদ হইয়া রহিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

---

২৯০. শীলমীমাংসা-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে এক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে শীলমীমাংসা জাতকে বলা হইয়াছে :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার পুরোহিত[২] নিজের শীলবল পরীক্ষা করিবার জন্য রাজশ্রেষ্ঠীর হিরণ্যফলক হইতে দুই দিন এক একটি কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, তৃতীয় দিবসে ধনরক্ষকেরা তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। যাইবার সময় পুরোহিত পথে দেখিতে পাইলেন, অহিতুণ্ডিকেরা একটা সাপ খেলাইতেছে।

রাজা পুরোহিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছি! আপনি এমন কাজ করিতে গেলেন কেন?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি নিজের শীলবল পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছি।"

শীল সম কিছু নাই ত্রিভুবনে,
অশেষ কল্যাণ লভি শীলগুণে।
বিষধর সর্প, কিন্তু শীলবান,
তেই কেহ তার না বধে পরাণ।
তাই আমি বলি, শীলের সমান
নাহি কিছু আর মঙ্গলনিদান।
শীলের প্রশংসা যত বিজ্ঞজন
শতমুখে সদা করেন কীর্ত্তন।
দেখিবারে পাই যত শীলবান
আর্য্যপথে সদা করেন প্রয়াণ।
জ্ঞাতিজন-প্রিয়, মিত্রানন্দকর,
ধন্য ধরাধামে শীলবান নর।
দেহান্তে গমন দিব্যধামে তাঁর;
শীলের মাহাত্ম্য কি বর্ণিব আর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে তিনটি গাথাদ্বারা শীলের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং

---

[১]। প্রথম খণ্ডের ৯৬ম-জাতক এবং পরবর্ত্তী ৩০৫ম, ৩৩০ম ও ৩৬২ম জাতক দ্রষ্টব্য। ৮৬ম জাতক একবার না পড়িয়া লইলে এই জাতকের ভাব সুস্পষ্ট ঝুঝা যাইবে না।

[২]। তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত।

রাজাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, “মহারাজ, আমার গৃহে পিতৃলব্ধ, মাতৃলব্ধ, স্বোপার্জ্জিত এবং ভবৎ প্রদত্ত এত ধন আছে যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি নিজের শীলবল পরীক্ষার জন্য আমি ধনাগার হইতে এই কার্ষাপণদ্বয় অপহরণ করিয়াছি। এখন আমি বুঝিলাম জগতে জাতি, গোত্র, কুল প্রভৃতি অতি তুচ্ছ; শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আপনি অনুমতি দিন।” রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; শেষে অগত্যা অনুমতি দিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন ও ব্রহ্মালোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই শীলমীমাংসক পুরোহিত।]

---

২৯১. ভদ্রঘট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক ভাগিনেয়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি মাতার ও পিতার নিকট হইতে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ পাইয়া তাহার সমস্তই পানব্যসনে নষ্ট করিয়াছিল এবং শেষে রিক্তহস্তে মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অনাথপিণ্ডদ তাহাকে এক সহস্র সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, “তুমি ইহা দ্বারা ব্যবসায় আরম্ভ কর।” কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি যুবক তাহাও উড়াইয়া দিল এবং পুনর্ব্বার মাতুলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। অনাথপিণ্ডদ এবার তাহাকে পঞ্চশত সুবর্ণ দিলেন। যুবক তাহাও নষ্ট করিয়া আসিলে অনাথপিণ্ডদ তাহাকে দুই খানি স্থূল বস্ত্র দান করিলেন। সে পানব্যসনে তাহাও বিক্রয় করিল; কিন্তু শেষে যখন অনাথপিণ্ডদের নিকট গেল, তখন তিনি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। হতভাগ্য নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অন্যের দ্বারস্থ হইয়া[১] প্রাণত্যাগ করিল। লোকে তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিল। অনাথপিণ্ডদ বিহারে গিয়া শাস্তার নিকট ভাগিনেয়ের সমস্ত কাহিনী বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “যাহাকে আমি পুরাকালে সর্ব্বকামদ কুম্ভ দিয়াও পরিতৃপ্ত করিতে পারি নাই তাহাকে তুমি কিরূপে তৃপ্ত করিতে পারিতে?” অনন্তর অনাথপিণ্ডদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

---

[১]। মূলে ‘পরকুড্ডম্ নিস্সায়’ এইরূপ আছে; পাঠান্তর ‘কুটং’। কুড্ড-প্রাচীর; কুট = কুট অর্থাৎ শিখর বা চূড়া। শেষোক্ত পাঠে কোন অর্থ হয় না। প্রথম পাঠে ‘প্রাচীর’ এই অর্থে গৃহ বা দ্বার বা প্রাচীরের পাশে’ এই অর্থ বুঝাইতে পারে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে চল্লিশ কোটি ধন ভূগর্ভে নিহিত ছিল।

বোধিসত্ত্বের একটি মাত্র পুত্র ছিল। তিনি দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুর পর শক্রত্ব লাভপূর্ব্বক দেবতাদিগের রাজা হইলেন; তখন সেই পুত্র রাজপথের উপর এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল এবং বহুনর্ম্মসহচরে পরিবৃত হইয়া সেখানে বসিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। সে লঙ্ঘননর্ত্তক, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিতে লাগিল; স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অত্যন্ত আসক্ত হইল; অবিরত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাধ্য, উন্মত্তের ন্যায় কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; অচিরে সেই চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি ও গৃহোপকরণ নিঃশেষ করিল এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল।

শক্র এক দিন চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশা জানিতে পারিলেন এবং পুত্রস্নেহের প্রভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া একটি সর্ব্বকামদ ঘট প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, এই ঘটটীকে সাবধানে রাখিবে, যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। ইহা যতদিন তোমার নিকট অক্ষত থাকিবে, ততদিন তোমার ধনের অভাব হইবে না। দেখিও, ইহার রক্ষাসম্বন্ধে যেন কোন ত্রুটি না হয়। পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

ইহার পর বোধিসত্ত্বের পুত্র দিবারাত্র মদ খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্তর একদিন উন্মত্ত অবস্থায় সে ঐ ঘটটী বার বার ঊর্দ্ধে ছাড়িয়া ধরিতে লাগিল; কিন্তু একবার সে ধরিতে পারিল না, কাজেই ঘটটী মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে পুনর্ব্বার যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই হইল, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভগ্ন মৃৎপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিল, এবং শেষে কোন এক ব্যক্তির প্রাচীরপার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শাস্তা এইরূপে অতীত কথা সমাপনপূর্ব্বক অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটি বলিলেন :

সর্ব্বকামপ্রদ কুম্ভ পেয়ে ধূর্ত্ত যত দিন
করেছিল রক্ষা সযতনে,
ভুঞ্জি নানাবিধ সুখ, কাটাইল ততদিন;
অত্যাসক্ত যদিও ব্যসনে।
কিন্তু দর্পে, মত্ততায়, ভাঙ্গি সেই ঘট, হায়,
পায় মূর্খ অশেষ যাতনা,
নাহি বস্ত্র পরিবার, পেটে ভাত নাই তার,

ফাটে বুক দেখি বিড়ম্বনা।
মূর্খজন লব্ধধন অমিত ব্যয়ের দোষে
মুহূর্ত্তেতে নিঃশেষ করিয়া
ভুঞ্জে নানা দুঃখ শেষে, ভুঞ্জিল ধূর্ত্তক যথা
কামপ্রদ কুম্ভেরে ভাঙ্গিয়া।

[**সমবধান :** তখন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ভাগিনেয় ছিল সেই ভদ্রঘটভঙ্গকারী ধূর্ত্ত, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

----

২৯২. সুপত্র-জাতক

[স্থবির সারিপুত্র বিম্বাদেবীকে রুই মাছের ঝোল এবং টাট্‌কা ঘি-মিশান ভাত আনিয়া দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অভ্যন্তর-জাতকে (২৮১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এই জাতকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও সেইরূপ। এবারও বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল; এবং রাহুলভদ্র সারিপুত্রকে সেই কথা জানাইয়াছিলেন। সারিপুত্র রাহুলকে আসনশালায় বসাইয়া রাখিয়া নিজে কোশলরাজের ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে রোহিত মৎস্যের সূপ ও নবঘৃত-মিশ্রিত অন্ন আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। রাহুল এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া মাতাকে খাওয়াইলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ বিম্বাদেবীর পীড়োপশম হইল। এদিকে রাজা লোক পাঠাইয়া, কাহার জন্য সারিপুত্র ঐ সকল দ্রব্য লইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন এবং তদবধি স্থবিরার জন্য উক্তরূপ খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ধর্ম্মসেনাপতি এইরূপ খাদ্য দিয়া নাকি স্থবিরার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা এখানে বসিয়া কি বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র যে কেবল এবারই রাহুলমাতাকে তাঁহার অভীপ্সিত খাদ্য দিতেছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর অশীতি সহস্র কাকের নেতা হইয়াছিলেন। এই

কাকরাজের নাম ছিল সুপত্র; সুস্পর্শা নাম্নী কাকী ছিলেন তাঁহার অগ্রমহিষী এবং সুমুখ ছিলেন তাঁহার সেনাপতি। বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র কাকপরিবৃত হইয়া বারাণসীর নিকটে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন সুস্পর্শাকে সঙ্গে লইয়া আহারসংগ্রহার্থে বিচরণ করিবার সময় বারাণসীরাজের পাকশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজার সূপকার রাজার জন্য মৎস্যমাংসের নানারূপ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সে সমস্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ পাত্রগুলির মুখ খুলিয়া বসিয়াছিল। মৎস্যমাংসাদির গন্ধে সুস্পর্শার মনে রাজখাদ্য আহার করিবার বাসনা জন্মিল; কিন্তু সে দিন তিনি কোন কথা বলিলেন না।

দ্বিতীয় দিন বোধিসত্ত্ব যখন সুস্পর্শাকে বলিলেন, “এস ভদ্রে, আমরা চরায় যাই,” তখন সুস্পর্শা বলিলেন, “আপনি যান; আমার মনে একটা খাদ্যের জন্য বড় সাধ জন্মিয়াছে।” বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সাধ?” ‘বারাণসীরাজের খাদ্য খাইব এই সাধ। কিন্তু তাহা পাওয়া ত আমার সাধ্যাতীত; কাজেই এ প্রাণ রাখিব না।”

এই কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুমুখ সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজকে বিষণ্ন দেখিতেছি কেন?” বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই মহারাজ।” অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্ব ও সুস্পর্শা উভয়কেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আজ আপনারা এখানেই থাকুন; আমি গিয়া খাদ্য আনয়ন করিতেছি।”

অনন্তর সুমুখ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কাকদিগকে সমবেত করিয়া ও তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, “এস, আমরা গিয়া রাজখাদ্য লইয়া আসি।” তিনি কাকদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন, রাজার রন্ধনশালার অবিদূরে তাহাদিগকে দলে দলে নানাস্থানে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং আটটি কাকবীরের সহিত পাকশালার ছাদের উপর বসিলেন। কোন সময়ে লোকে রাজার ভোজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবে, সুমুখ এখান হইতে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং অনুচরদিগকে বলিলেন, “পাচক যখন রাজার খাদ্য লইয়া যাইবে, তখন তাহার হস্ত হইতে খাদ্যভাণ্ডগুলি মাটিতে ফেলিবার ভার আমি লইলাম। ভাণ্ডগুলি পড়িয়া গেলে সেই সঙ্গে আমারও প্রাণান্ত হইবে; কিন্তু তোমরা তাহাতে ভীত হইও না; তোমরা চারিটি কাকে মুখ পূরিয়া অন্ন এবং চারিটি কাকে মুখ পূরিয়া মৎস্য মাংস লইয়া সস্ত্রীক মহারাজকে ভোজন করাইবে। যদি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, ‘সেনাপতি কোথায়,’ তাহা হইলে বলিবে, তিনি পশ্চাৎ আসিতেছেন।”

এদিকে সূপকার ভোজ্য দ্রব্যগুলি সাজাইয়া বাঁকে করিয়া রাজভবনাভিমুখে চলিল। সে যেমন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সুমুখ কাকদিগকে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং উড়িয়া গিয়া খাদ্যবাহকের বক্ষঃস্থলে বসিলেন, প্রসারিত নখ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, শল্যসদৃশ তুণ্ড দ্বারা তাহার নাসাগ্র ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং উঠিয়া দুই পা দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া রাখিলেন। রাজা তখন উচ্চতলে পা-চারি করিতেছিলেন; তিনি মহাবাতায়ন হইতে সুমুখের এই কাণ্ড দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ভোজ্যবাহকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাণ্ডগুলি ফেলিয়া কাকটাকে ধর।" ভোজ্যবাহক রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভাণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিল এবং সুমুখকে বজ্রমষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "এখানে লইয়া আয়।"

এদিকে সেই আটটা কাক গিয়া যে যত পারিল রাজভোজ্য খাইল এবং অবশিষ্ট খাদ্য হইতে সুমুখ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে মুখ পূরিয়া অন্ন মাংসাদি লইয়া গেল। তখন অপর সমস্ত কাকও যাহা বাকী ছিল, খাইয়া ফেলিল। উক্ত অষ্ট কাক গিয়া সস্ত্রীক কাকরাজকে ভোজন করাইল; সুস্পর্শার দোহদনিবৃত্তি হইল।

ভোজ্যবাহক সুমুখকে লইয়া রাজার নিকট গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার সম্মান রক্ষা করিলে না, ভোজ্যবাহকের নাকটা ভাঙ্গিয়া দিলে, ভোজ্যভাণ্ডগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে, নিজের জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিলে! এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিলে কেন?" সুমুখ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা বারাণসীর নিকটে বাস করেন। আমি তাঁহার সেনাপতি। তাঁহার ভার্য্যা সুস্পর্শা আপনার খাদ্য আহার করিবেন এইরূপ দোহদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সাধের কথা আমাকে বলেন। আমি তখন আমার জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখন রাজার জন্য খাদ্য প্রেরণ করিয়াছি; আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। এখন বুঝিলেন, মহারাজ, আমি কিজন্য এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" এই সমস্ত কথা আরও বিশদ করিবার জন্য সুমুখ নিম্নলিখিত গাথা তিনটি বলিলেন :

কাকেশ সুপত্র, অশীতি সহস্র কাক যাঁর অনুচর,
কাশীর অদূরে বসতি তাঁহার, শুন কাশী নরেশ্বর।
মহিষী তাঁহার সুস্পর্শা রূপসী রাজার রন্ধনাগারে
সুপক্ক মৎস্যের পাইয়া গন্ধ চাহিলা খাইবারে।
সদ্যোপক্ক যাহা রাজার খাদ্য, খাইতে তাঁহার আশ;
পূরাতে সে সাধ দূতরূপে হেথা এসেছি তোমার পাশ।
প্রভুর কার্য্য করেছি সাধন বাহকের ভাঙ্গি নাসা;

যে দণ্ড ইচ্ছা দাও মহারাজ; ছেড়েছি প্রাণের আশা।

সুমুখের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমরা মানুষের মহোপকার করিয়াও তাহাদের সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারি না। তাহাদিগকে গ্রাম প্রভৃতি দান করি; তথাপি আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন লোক পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই প্রাণী সামান্য কাক হইয়াও নিজের রাজার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে! এ অতীব সদ্‌গুণসম্পন্ন, মিষ্টভাষী ও ধার্ম্মিক।' ফলতঃ তিনি সুমুখের গুণে এত প্রসন্ন হইলেন যে তাঁহাকে একটি শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। কিন্তু সুমুখ ঐ শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা বারাণসীরাজেরই প্রতিপূজা করিলেন এবং তাঁহার নিকট সুপত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সুপত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিলেন এবং নিজে যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন, সুপত্র ও সুমুখের জন্যও তাহাই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অন্যান্য কাকের জন্যও প্রতিদিন প্রচুর তণ্ডুল পাক করাইবার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সুপত্রের উপদেশানুসারে সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন এবং নিজে পঞ্চশীল পালন করিতে লাগিলেন। সুপত্রের উপদেশগুলি সপ্তশতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই কাক-সেনাপতি; রাহুলমাতা ছিলেন সুস্পর্শা এবং আমি ছিলাম সুপত্র।]

---

২৯৩. কায়নির্ব্বিণ্ন-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্যক্তি নাকি পাণ্ডুরোগে এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, বৈদ্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণও নিতান্ত হতাশ হইয়া ভাবিতেন, "আহা! এমন কোন লোক কি ভাগ্যবলে পাওয়া যাইবে, যিনি ইহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন?" শেষে ঐ ব্যক্তি কামনা করিলেন, "আমি যদি আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার কয়েক দিন পরেই কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া সেই ব্যক্তি নীরোগ হইলেন এবং জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তিনি শাস্তার নিকট প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

---

[১]। অর্থাৎ দেহ অনিত্য ও ব্যাধির আগার বলিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ। পাঠান্তর 'কায়বিচ্ছিন্দ'।

অনন্তর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক পাণ্ডুরোগী, আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রজ্যা লইব এই চিন্তা করিয়া প্রথমে প্রব্রজ্যা, শেষে অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এই ব্যক্তি নহেন, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে আরোগ্য লাভের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যেরা তাঁহার আরোগ্যবিধান করিতে পারিলেন না, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রেরাও নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব।" ইহার পর তিনি কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া নীরোগ হইলেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া বলিলেন, "অহো! আমি এতদিন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিলাম!" এই সময়ে আবেগের ভরে তিনি নিম্নলিখিত গাথা তিনটি বলিয়াছিলেন :

জীবের পীড়নে রত শত শত রোগ;
তাদের একটি মাত্র করিলাম ভোগ।
এমনই কঠিন কিন্তু পীড়ন ইহার,
কলেবর হ'ল মোর অস্থিচর্মসার।
তপ্তপাংশুস্পর্শে যথা কুসুম শুকায়,
রোগগ্রস্ত জীবদেহ সেই দশা পায়।
নানা শব-উপাদানে দেহ বিনির্ম্মিত,
বীভৎস, অশুচি ইহা, অতীব ঘৃণিত।
কিন্তু অন্ধ জীব, যাহা অশুচি-আকর,
তাহাকেই শুচি জ্ঞানে করে সমাদর।
অপ্রিয়ে আসক্ত হয় প্রিয় ভাবি মনে;
দুঃখ হ'তে মুক্ত জীব হইবে কেমনে?
ধিক্ দেহে, পূতিময়, ঘৃণার ভাজন,
অশুচি, আতুর, সর্ব্বব্যাধি-নিকেতন।

আসক্ত এহেন দেহে মূঢ় জীবগণ
সুপথ ত্যজিয়া করে কুপথে গমন।
পুণ্যাত্মা দেহান্তে পুর্নজন্ম লভে যথা,
দেহাসক্ত জীব কভু নাহি যায় তথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেহের অশুচিভাব উপলব্ধি করিলেন এবং ইহা যে নিয়ত আতুর, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কাজেই দেহের উপর তাঁহার বিরাগ জন্মিল; তিনি ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তচ্ছ্রবণে বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন আমিই ছিলাম সেই তাপস।]

---

২৯৪. জম্বু-খাদক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ও কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন আয় হ্রাস হইতেছিল, তখন কোকালিক দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন : 'দেবদত্ত মহাসম্মতের[১] বংশজাত এবং ইক্ষাকুকুলের ধুরন্ধর; তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; তিনি ত্রিপিটক বিশারদ, ধ্যানশীল, মধুরভাষী ও ধর্ম্মকথক। তোমরা তাঁহাকে অকাতরে দান কর।' এদিকে দেবদত্তও বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছেন। তিনি বহুশাস্ত্র-বিশারদ ও ধর্ম্মকথক। তোমরা দানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান কর।" তাঁহারা উভয়ে এইরূপে পরস্পরের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দেবদত্ত ও কোকালিক পরস্পরের অলীক গুণকীর্ত্তন করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই দুই জনে যে কেবল এজন্মে পরস্পরের কল্পিত গুণকীর্ত্তন করিয়া ভোজন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ করিয়াছিল।"

---

[১]। বৌদ্ধমতে ইনি পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বতমনুস্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্তকালে যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার মনুষ্যের আবির্ভাব হয়, তখন সকলে ইঁহাকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এই জন্যই ইঁহার নাম হইয়াছিল 'মহাসম্মত'।

অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন জম্বুবনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে এক কাক একদা একটা জম্বুবৃক্ষের শাখায় বসিয়া জম্বুফল খাইতেছিল। সেই সময়ে এক শৃগাল গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাককে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আমি এই কাকের অলীক গুণ কীর্ত্তনদ্বারা জম্বু খাইবার উপায় করি।" অনন্তর সে কাকের স্তুতিবাদসূচক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

কে হে তুমি জম্বুশাখে করিছ কূজন,
ময়ূরশাবকসম প্রিয়দরশন?
নিশ্চল, সুন্দর কায়, স্বরে সুধা ক্ষরি যায়।
কলকণ্ঠ কত পক্ষী দেখিবারে পাই;
সবে কিন্তু পরাজয় মানে তব ঠাঁই

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা দ্বারা শৃগালের প্রতিপ্রশংসা করিল :

ভদ্রবংশে জন্ম যার, জানে সেই জন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
শার্দ্দূল-শাবকসম রূপ তব অনুপম;
এস, বন্ধু, খাও জাম উদর পূরিয়া;
দিতেছি তোমার তরে ভূতলে ফেলিয়া।

ইহা বলিয়া কাক শাখায় ঝাঁকি দিয়া ফল ফেলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের অলীক স্তুতিবাদপূর্ব্বক জাম খাইতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

চিরদিন এই রীতি দেখিবারে পাই,
মিথ্যাবাদী আসি জুটে মিথ্যাবাদি-ঠাঁই;
বায়স বান্তাদ[১] জানি পক্ষীকুলাঙ্গার,
পূতিমাংস শৃগালের পবিত্র আহার।
সেই হেতু আসি হেথা ধূর্ত্ত দুইজন,
একে করে অপরের প্রশংসা কীর্ত্তন।

এই গাথা বলিবার পর সেই দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া কাক ও

---

[১]। যে বমনোত্থ দ্রব্য ভোজন করে।

শৃগালকে ভয় দেখাইলেন। তখন তাহারা সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ্‌বর্ণিত কাক ও শৃগালের গল্প এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ ২৯৫-সংখ্যক জাতক তুলনা করা যাইতে পারে।

---

২৯৫. অন্ত-জাতক[১]

[শাস্তা এই কথাও জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্ত ও কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের সদৃশ।]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামসন্নিহিত এণ্ডরকবৃক্ষ-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন গ্রামে একটা বুড়া গরু মারা গিয়াছিল; লোকে তাহার মৃতদেহটা টানিয়া লইয়া সেই এরণ্ডবনে ফেলিয়া দিয়াছিল। এক শৃগাল গিয়া তাহার মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর একটা কাক গিয়া এরণ্ড-শাখায় বসিল এবং শৃগালকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, "ইহার মিথ্যা স্তুতিবাদ দ্বারা মাংস খাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

বৃষস্কন্ধ, কেসরি-বিক্রম, মহাশয়,
মৃগরাজ নাম তব বুঝিনু নিশ্চয়।
প্রসাদ পাইতে হেথা আসিয়াছে দাস;
লভিয়া কিঞ্চিৎ মাংস পূরিবে কি আশ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল দ্বিতীয় গাথা বলিল :

ভদ্র বংশে জন্ম যার, জানে সেইজন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
এস হে ময়ূরগ্রীব বায়স-পুঙ্গব;
খাও মাংস সঙ্গে মোর, যত ইচ্ছা তব।

তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :

পশুর অধম ধূর্ত্ত শিবা, পক্ষীর অধম কাক,
কাণে আঙ্গুল দেয় লোকে শুন্‌লে যাহার ডাক;

---

[১]। অন্ত = অধম।

বৃক্ষের অধম এরণ্ডক, বলে সর্ব্বজন;
তিন অধমের এক ঠাঁই হয়েছে মেলন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

----

২৯৬. সমুদ্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে স্থবির উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অপরিমাণ পানভোজন করিতেন। শকটপূর্ণ ভক্ষ্যভোজ্যেও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বর্ষাকালে তিনি যুগপৎ দুই তিনটি বিহারে বাসা লইয়া কোথাও পাদুকা রাখিয়া দিতেন, কোথাও যষ্টি, কোথাও উদকতুম্ব রাখিয়া দিতেন এবং স্বয়ং এক বিহারে অবস্থিতি করিতেন। তিনি কোন জনপদস্থ বিহারে গিয়া তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে উপকরণ-সম্পন্ন দেখিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট আর্য্যবংশ-লক্ষণ বলিতেন।[১] তাহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিতেন এবং স্ব স্ব চীবর পরিত্যাগ করিয়া সেইগুলি পরিধান করিতেন। তখন উপনন্দ ঐ পরিত্যক্ত চীবরপাত্রাদি গাড়ীতে পূরিয়া জেতবনে লইয়া যাইতেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, আয়ুষ্মান শাক্যপুত্র উপনন্দ অতিভোজী ও অতিলোভী। তিনি অন্যের নিকট ধর্ম্মকথা বলেন, আর নিজে শকটপূর্ণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পাত্রচীবর প্রভৃতি উপকরণ লইয়া আসেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন, "উপনন্দ আর্য্যবংশ-লক্ষণ বলিয়া অন্যায় করিয়াছে। অন্যের সদাচার প্রশংসা করিবার পূর্ব্বে নিজের বাসনা সংযত করাই কর্ত্তব্য।

অগ্রে নিজে ধর্ম্মপথে হও অগ্রসর,
শেষে হও অপরের শাসনে তৎপর।

---

[১]। সঙ্গীতি-সূত্রে চতুর্ব্বিধ আর্য্যবংশ অর্থাৎ নির্দ্দোষ ভিক্ষুর পরিচয় দেখা যায়–যিনি যে চীবর পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে ভোজ্য পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে শয্যা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট এবং যিনি কেবল ধ্যানেই সন্তোষ লাভ করেন। উপনন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে আর্য্যবংশদিগের গুণকীর্ত্তনদ্বারা তিনি জনপদবাসী ভিক্ষুদিগের মনে বিষয়-বিরাগ জন্মাইবেন; সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব চীবরাদি উৎকৃষ্ট উপকরণসমূহ পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি নিজে ঐ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিবেন।

প্রকৃত পণ্ডিত তিনি, ধর্ম্মপরায়ণ,
স্বার্থচিন্তা সদা যিনি করেন বর্জ্জন।”[১]

[শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপদের উল্লিখিত গাথা শুনাইয়া এবং উপনন্দের নিন্দা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “ভিক্ষুগণ, উপনন্দ যে কেবল এজন্মেই দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে তাহা নহে; সে পূর্ব্বজন্মেও মহাসমূদ্রের উদক রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন এক উদক-কাক সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া যাইবার সময়ে মৎস্য ও পক্ষীদিগকে অতিরিক্ত জলপান হইতে বিরত করিবার মানসে বলিতেছিল, “সমুদ্রের জল প্রমাণ করিও; সাবধান যেন বেশী পান করিয়া ফেলিও না।” তাহাকে দেখিয়া সমুদ্র-দেবতা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

কে তুমিহে যাও ছুটি, লবণসমুদ্রোপরি? ফুরাইবে জল এই ভয়ে
কে তুমি বারণ কর মৎস্যমকরের দলে পিতে জল তৃষ্ণার সময়ে?

ইহা শুনিয়া সমুদ্রকাক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :

শকুনি অনন্তপায়ী খ্যাত আমি চরাচরে
কিছুতেই কভু মোর তৃষ্ণা শান্তি নাহি করে।
সরিৎফুলের পতি সীমাহীন এ সাগর
নিঃশেষে করিব পান এই ইচ্ছা নিরন্তর।

তখন সাগরদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ভাটায় কমিয়া যায়, জোয়ারেতে বৃদ্ধি পায়,
জলহীন মহোদধি হয় কি কখন?
পান করি বারিবিন্দু, শুষিবে অনন্ত সিন্ধু
হেন চিন্তা করে শুধু প্রমত্ত যে জন।

ইহা বলিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক উদক-কাকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাহা দেখিয়া সে পলাইয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন উপনন্দ ছিল সেই উদক-রাক্ষস এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্র-দেবতা।]

---

[১]। ধম্মপদ (অত্তবগ্গ)—১৫৮।

২৯৭. কামবিলাপ-জাতক

[এক ভিক্ষু তাহার পূর্ব্বপত্নীর বিরহে শুষ্যমান হইতেছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পুষ্পরক্ত-জাতকে (১৪৭) বলা হইয়াছে। অতীত বস্তুর জন্য ইন্দ্রিয়-জাতক (৪২৩) দ্রষ্টব্য।]

* * *

এইরূপে রাজপুরুষেরা উক্ত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় শূলে চড়াইয়া দিল। সে শূলে আরোপিত হইয়া দেখিল একটা কাক আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। তখন সে নিজের দারুণ যাতনা ভুলিয়া গিয়া প্রিয়পত্নীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে কাককে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিল :

পক্ষযুগে দিয়া ভর যেথা ইচ্ছা যাইবারে, হে পাখি, শকতি তব আছে;
বিলম্বকারণ মম, বামোরূ প্রিয়ারে বলো, এই ভিক্ষা মাগি তব কাছে।
আমার বধের তরে, খড়্গ, শূল হাতে লয়ে, আসিয়াছে ঘাতকের দল;
জানে না এসব চণ্ডী; বিলম্ব দেখিয়া মম ক্রোধ তাই করিছে কেবল।

ভাবি আমি সেই কথা মনে বড় পাই ব্যথা, বলো'তারে, ধরি তব পায়;
শূলে করি আরোহণ এই যে যাতনা মোর, কোন ছার তার তুলনায়।

উৎপল জিনিয়া আভা বর্ম্ম মম মনলোভা, র'ল তার ভোগের কারণ;
উপধান অভ্যন্তরে পাইবে সে দেখিবারে স্বর্ণময় বিবিধ ভূষণ;
সুকোমল পরিপাটি র'ল বারাণসী শাটী আর(ও) মূল্যবান দ্রব্য নানা,
সর্ব্বস্ব দিলাম তায়; পাইয়া এ সব তার তৃপ্ত হোক অর্থের বাসনা।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে হতভাগ্য দেহত্যাগপূর্ব্বক নিরয়গমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ভার্য্যা ছিল সেই হতভাগ্যের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র, যিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন।]

☞ এই জাতকটিকে একখানি "কাকদূত" বলা যাইতে পারে।

---

২৯৮. উড়ুম্বর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস

করিতেন। পাষাণ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটি অতি রমণীয় ছিল—চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিকটেই নির্ম্মল জল, অনতিদূরে ভিক্ষাচর্য্যার জন্য গ্রাম, গ্রামবাসীরাও সকলে প্রসন্নচিত্ত ও দানশীল।

একদা কোন ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে সেই বিহারে উপস্থিত হইলেন। বিহারবাসী স্থবির তাঁহার যথারীতি সৎকার করিলেন এবং পরদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং পরদিন পুনর্ব্বার আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল।

এই বিহারে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর আগন্তুক ভিক্ষু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'একটা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্থবিরটাকে বঞ্চনা করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া এই বিহার আত্মসাৎ করিতে হইবে।' অতঃপর তিনি একদিন স্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কখনও ভগবান বুদ্ধের দর্শনলাভ করিয়াছ কি?" স্থবির উত্তর দিলেন, "না ভাই, বিহারের তত্ত্বাবধান করিতে পারে, এখানে এমন লোক পাওয়া দুর্ঘট, সেই জন্যই আমি ভগবানের নিকট যাইতে পারি নাই।" "তার জন্য ভাবনা কি? তুমি ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যতদিন না ফিরিবে, ততদিন আমিই এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" বিহারবাসী স্থবির বলিলেন, "ভাই, তুমি অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ।" অনন্তর তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া গেলেন, "দেখ, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন যেন এই স্থবিরের কোন কষ্ট না হয়।"

তদবধি আগন্তুক, বিহারবাসী ভিক্ষুর প্রকৃত ও কল্পিত নানাবিধ দোষের উল্লেখ করিয়া, গ্রামবাসীর মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিহারবাসী স্থবির শাস্তার দর্শন লাভ করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু আগন্তুক তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। তিনি অতিকষ্টে কোথাও রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করিলেন; কিন্তু গ্রামবাসীরাও তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা করিল না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইলেন।

ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি, অমুক ভিক্ষু নাকি অমুক ভিক্ষুকে তাঁহার বিহার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নিজেই সেখানে বাস করিতেছেন!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ঐ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও ইহাকে ইহার বাসস্থান হইতে বিদূরিত করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। তখন বর্ষাকালে এক একবার সাতদিন ধরিয়া অবিরত বারিপাত হইত। একটা রক্তমুখ মর্কট সেই সময়ে কোন গিরিগুহায় বাস করিত। ঐ গুহা এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে ইহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদিন রক্তমুখ মর্কট গুহাদ্বারে পরমসুখে বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক কৃষ্ণমুখ মহামর্কট[১] বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। সে রক্তমুখকে সুখাসীন দেখিয়া ভাবিল, 'কোন উপায়ে ইহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই গুহায় বাস করিতে হইবে।' অনন্তর, সে যেন কতই আহার করিয়াছে দেখাইবার জন্য, পেট ফুলাইয়া রক্তমুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

বট, কদ্‌বেল, যগডুবুরের ফল পেকেছে কত।
ক্ষুধায় তবু পাচ্ছ কষ্ট বোকাটীর মত।
যাইবে চল আমার সাথে, ছিড়ুঁবে সে সব দুই হাতে,
খাবে তুমি পেট পুরিয়া ইচ্ছা হবে যত।

রক্তমুখ এই বিশ্বাস করিয়া পক্কফল-ভোজনার্থ ব্যগ্র হইল। সে গুহা হইতে বাহির হইয়া ইতঃস্ততঃ ফল অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া গুহায় ফিরিয়া গেল। সেখানে দেখে কৃষ্ণমুখ গুহার ভিতরে বসিয়া আছে। তখন সে কৃষ্ণমুখকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

গাছ-পাকা ফল খেয়ে আজি পেলাম যে সুখ ভাই
বৃদ্ধের যারা করে সেবা, তারাও পাঁয় তাহাই।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণমুখ তৃতীয় গাথা বলিল :

বনজ বনজে বঞ্চে, বানর বানরে; অন্যে নাহি পারে;
ভাল তুমি, তবু সাধ্য নাহি অপরের বঞ্চিতে তোমারে।
আমি পুরাতন ঘুঘু, কি সাধ্য তোমার, ভুলাতে আমায়?
বন ফলহীন এবে; যাও চলি তুমি যথা ইচ্ছা হয়।

তখন রক্তমুখ নিরূপায় হইয়া প্রস্থান করিল।

[**সমবধান :** তখন এই বিহারবাসী ভিক্ষু ছিল সেই ক্ষুদ্র মর্কট, এই আগন্তুক ভিক্ষু ছিল সেই মহামর্কট এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

[১]। হনুমান বানর।

২৯৯. কোমায়পুত্র-জাতক

[শাস্তা পূর্বারামে অবস্থিতিকালে কতিপয় রূঢ়স্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যে প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে অবস্থিতি করিতেন, ইঁহারা নিম্নতলে থাকিতেন এবং কে কি দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ইহা লইয়া পরস্পর কলহ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন; শাস্তা একদিন মহামৌদ্গাল্যায়নকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই সকল ভিক্ষুকে একটু ভয় প্রদর্শন কর।" এই আদেশানুসারে মহামৌদ্গাল্যায়ন আকাশে উত্থিত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রাসাদের ভিত্তি স্পর্শ করিলেন; অমনি আসমুদ্র সমস্ত প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল; ভিক্ষুগণ মরণভয়ে তৎক্ষণাৎ বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন।

অতঃপর ঐ ভিক্ষুদিগের দুর্ব্যবহারের কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অমুক অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন; তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা বুঝিতে পারেন না; ধর্ম্মকর্ম্মও করেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ভিক্ষুগণ কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দুরাচার ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল কোমায়পুত্র। তিনি কালক্রমে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কতিপয় দুরাচার তপস্বীও সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা কৃৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি তাপসজনোচিত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল অরণ্য হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া উদর সেবা করিতেন এবং হাস্যপরিহাসে ও আমোদপ্রমোদে সময় কাটাইতেন। তাঁহাদের একটা মর্কট ছিল; সেও তাঁহাদের ন্যায় দুরাচার হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিত।

তাপসগণ এই আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস করিয়া একদা লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ লোকালয়ে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মর্কটটা তাঁহাদিগকে যেরূপ মুখভঙ্গী প্রভৃতি দেখাইত, বোধিসত্ত্বকেও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উহার মুখের নিকট অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন।' "যাহারা সুশিক্ষিত তাপসদিগের

নিকট থাকে, তাহাদের সদাচারসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহাদের আচরণ সভ্য হইবে এবং তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইবে।" এই উপদেশ শুনিয়া মর্কটটা তদবধি শীলবান ও আচারসম্পন্ন হইল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র প্রস্থান করিলেন; তাপসেরাও লবণ ও অম্ল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন; কিন্তু মর্কটটা আর অঙ্গভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল না। তখন একজন তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় খেলা কর না কেন?" এই প্রশ্ন করিবারকালে তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

পূর্ব্বে তুমি সামনে মোদের খেলতে খেলা কত
এখন কেন খেলনা আর পূর্ব্বকার মত?
বানর যেমন করে খেলা, খেল পুনর্ব্বার;
শিষ্ট শান্ত বানর দেখলে জ্বলে যায় হাড়।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :

পণ্ডিতের অগ্রগণ্য শ্রীকোমারস্বামী,
তাঁর মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি আমি।
ভেবনা আমারে পূর্ব্বে ভাবিতে যেমন;
হইয়াছি এবে আমি ধ্যান-পরায়ণ।

তখন ঐ তপস্বী নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

বর্ষুক পর্জন্য বৃষ্টি যত ইচ্ছা হয় তত,
পাষাণে রোপিত বীজ হয় নাক অঙ্কুরিত।
সত্য বটে শুনিয়াছ তত্ত্বকথা বহু তুমি;
তথাপি মর্কটে কভু নাহি লভে ধ্যান-ভূমি।

[**সমবধান :** তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই দুরাচার তাপসের দল এবং আমি ছিলাম কোমায়পুত্র।]

---

৩০০. বৃক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে পুরাণ বন্ধুত্ব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তদ্‌বৃত্তান্ত বিনয়পিটকে (মহাবগ্‌গ ১,৩১,৩) সবিস্তর বিবৃত আছে। এখানে উহা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া যাইতেছে—আয়ুষ্মান উপসেন প্রব্রজ্যাগ্রহণের দুই বৎসর পরেই একদা জনৈক একবার্ষিক সার্দ্ধবিহারিকের সহিত শাস্তাকে বন্দনা করিতে গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিরস্কার-ভোগান্তে শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তৎপরে ক্রমে

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন, অর্হত্ত্বলাভ করিলেন, নিঃস্পৃহত্ত্ব প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিত হইলেন, ভিক্ষুজনোচিত ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ[১] নিজে ধারণ করিলেন ও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং ভগবান যখন মাসত্রয়ের জন্য নির্জনবাস করিতেছিলেন, তখন অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে ও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সাধুকার পাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এখন হইতে ধুতাঙ্গধর ভিক্ষুরা যখন ইচ্ছা আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।"

শাস্তার অনুগ্রহলাভান্তে উপসেন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তদবধি ভিক্ষুরা শাস্তার সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্ব্বে ধুতাঙ্গ ধারণ করিতেন, কিন্তু শাস্তা নির্জ্জন বাস হইতে বাহির হইলেই স্ব স্ব মলিন বস্ত্র-খণ্ড-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন চীবর পরিধান করিতেন।

একদিন শাস্তা বহুসংখ্যক শিষ্যসহ ভিক্ষুদিগের শয়নকক্ষ পরিদর্শন করিবার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল মলিনবস্ত্রখণ্ড দেখিতে পাইয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "এই ভিক্ষুদিগের ধুতাঙ্গধারণ বৃকের পোষধব্রতের ন্যায় অচিরস্থায়ী।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন একটা বৃক গঙ্গাতীরে কোন পাষাণপৃষ্ঠে বাস করিত। একবার শীতকালে হঠাৎ জল বৃদ্ধি হইয়া ঐ পাষাণ পরিবেষ্টিত করিল। বৃক পাষাণ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রাণ

---

[১]। ধুতাঙ্গ বা ধূতগুণ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে ধুতাঙ্গগুলির নাম নির্দ্দেশে একটু ভ্রম আছে। ধুতাঙ্গগুলি এই : পাংশুকুলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পিণ্ডপাতিকাঙ্গ, সাপদানচারিকাঙ্গ, ঐকাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, অভ্যকাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তরিকাঙ্গং, নৈষদ্যিকাঙ্গ। যে সকল ভিক্ষু বৈখানসদিগের ন্যায় অরণ্যে বাস করিতেন, ধুতাঙ্গগুলি তাঁহাদেরই প্রতিপাল্য। মনুসংহিতায় (৬ষ্ঠ অধ্যায়) বানপ্রস্থধর্ম্মের বর্ণনা আছে। ২৩শ শ্লোকে দেখা যায় বানপ্রস্থ "গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তুস্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।" সম্ভবতঃ এই 'অভ্রাবকাশিক' শব্দটি বৌদ্ধদিগের সাহিত্যে 'আভ্যবকাশিক' হইয়াছে। মেধাতিথি অভ্রাবকাশিক শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন : অভ্রাণি এব অবকাশ আশ্রয়ো যস্মিন্ দেশে দেবো বর্ষতি তং প্রদেশমাশ্রয়েদ্ বর্ষনিবারণার্থং ছত্রবস্ত্রাণি ন গৃহ্নীয়াৎ।

বাঁচাইল বটে, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব ঘটিল, খাদ্যান্বেষণে বহির্গমনের পথও রুদ্ধ হইল। এদিকে ক্রমেই জল বাড়িতে লাগিল। তখন বৃক ভাবিল, "তাই ত, এখানে না পাইতেছি খাদ্য, না পাইতেছি বাহিরে যাইবার পথ। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা বরং পোষধব্রত অবলম্বন করা ভাল।" অনন্তর সে পোষধ পালনের অভিপ্রায়ে তদবধি শীলসমূহ পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

এদিকে শক্র ধ্যানবলে বৃকের এই দুর্ব্বল সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার ভণ্ডামি প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ছাগরূপ ধারণপূর্ব্বক অদূরে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃক ভাবিল, 'পোষধব্রত অন্য একদিন পালন করিলেই চলিবে।' সে উঠিয়া ছাগরূপী শক্রকে ধরিবার জন্য লম্ফ দিল; শক্রও ইতস্ততঃ এরূপভাবে লাফাইতে লাগিলেন যে, কিছুতেই ধরা দিলেন না। বৃক তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া শেষে নিবৃত্ত হইল, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং "যাহা হউক, পোষধব্রত ত ভঙ্গ হইল না," মনকে এই প্রবোধ দিয়া শয়ন করিল।

তখন শক্র আত্মরূপ পুনঃ গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অরে ধূর্ত্ত! তোর মত দুর্ব্বলচিত্ত প্রাণী পোষধব্রত লইয়া কি করিবে? তুই জানিতে পারিস্ নাই যে আমি শক্র; সেই জন্যই ছাগমাংস খাইতে এত লোলুপ হইয়াছিলি।" এইরূপে বৃকের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়া এবং তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া শক্র দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হিংসা-পরায়ণ, খায় রক্তমাংস অবিরত,
এহেন বৃকের সাধ লইবে পোষধ-ব্রত।
জানি ইহা দিলা দেখা শক্র ছাগরূপ ধরি;
অমনি ছুটিল বৃক জপ তপ পরিহরি!
দুর্ব্বল হৃদয় লোকে সেইরূপ এ সংসারে
প্রথমে সঙ্কল্প করে অসাধ্যেরে সাধিবারে;
কিন্তু সেই ব্রতভঙ্গ করি তারা অবশেষে
ছাগলুব্ধ বৃকবৎ পড়ে প্রলোভনবশে।

(এই তিনটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা)

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম শক্র।]

☞ বৃকের ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে জবশকুন-জাতক (৩০৮) এবং হিতোপদেশের কঙ্কণলোভী পথিকের গল্প দ্রষ্টব্য। Lessing- কর্ত্তৃক সংগৃহীত আখ্যায়িকাবলীতে 'মৃত্যুশয্যায় বৃক' নামে গল্প আছে। বৃক মৃত্যুকালে নিজের পাপ খ্যাপন করিতে করিতে বলিল, 'একদিন আমি একটা মেষশাবককে কাছে পাইয়াও উদরস্থ করি

নাই।' শৃগাল তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, 'তখন আপনি দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলেন।'

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক (দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

*   *   *

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র

রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

E-mail: tpsocietybd@gmail.com